মানিক গ্রন্থাবলী

প্রথম প্রকাশ

১৯৪০

'ফর্শা নাকি? তা তুমি এনে পিরীত কোরো, আমি ওতে নেই।'

সুরবালা তখন তামাসা করে বলে, 'সূয্যিবাবুকে বিয়ে করবি?'

তার তামাসায় রম্ভা হাসে না, তামাসা করে না। হঠাৎ নিরীহ শান্ত বনে গিয়ে চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'হুঁ'।

সুরবালা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রম্ভা তামাসা করছে না এটুকু টের পেয়েই সে অবাক হয়। ভাবে একি উদ্ভট পছন্দ বাবা মেয়ের! বিশ বাইশ বছরের রোগা হ্যাংলা এক ছোকরা, চালচুলো নেই বললে চলে, গাঁয়ের বাইরে যাওয়ার হুকুম যার নেই, রোজ যাকে পাঁচনিখে থানায় হাজিরা দিতে হয় আর দাগী চোরের মত ঘরে আছে কিনা জানতে চৌকীদার কানাই গভীর রাতে নাম ধরে হাঁক দিয়ে যায়, তাকে মনে ধরেছে রম্ভার এত বর থাকতে! যেমন পাগল তার শ্বশুর, তেমনি পাগল তার এ মেয়ে।

রাত্রে চুপি চুপি শ্যামলালকে কথাটা সে জানিয়ে দেয়। শ্যামলাল শুনে ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'বাড়ী ঢুকতে দেয়া উচিত নয় ছোঁড়াকে। বাবা যে কি দেখেছে ছোঁড়ার মধ্যে, হাঁ করে বসে গিলবে কথাগুলো। গুরু ঠাকুর এয়েছেন যেন, খাতির কত!'

'মেয়ের বাপ নয় গো শালি, মেয়েও কথা গেলেন হাঁ করে। এ্যাদ্দিন কি টের পেয়েছি ছুঁড়ির মনে কি আছে?'

কথাটা নিয়ে বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে ক'দিন গুঞ্জন চলে—রম্ভা ছাড়া। বীরেশ্বরের মেজ ছেলে জীবনলালের বৌ মায়া অন্য সকলের সামনে গম্ভীর মুখে বলে, 'মাগো! একি কাণ্ড?'—তারপর রম্ভাকে একা পেলে একগাল হেসে শুধোয়, 'আমায় কেন বলিস নি অ্যাদ্দিন? বল ভাই সব, বলতে হবে।'

অ্যাদ্দিন বলার কি ছিল রম্ভা ভেবে পায় না। সূর্যাকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই এর চেয়ে বেশী কি বলার আছে তাও সে ভেবে পায় না।

ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কথাটা একটু নাড়াচাড়া করেই চুপ করে যায়। শ্যামলাল একবার সূর্যা সম্পর্কে বাবাকে সতর্ক করতে গিয়ে এত বয়সে এমন প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিল, যা প্রায় গালের সামিল। বীরেশ্বরের কাছে আবার এবিষয়ে কথা তোলার সাহস কারো ছিল না।

বর্ষায় ঝুমুরিয়া ও ঝুমুরিয়ার চারিদিক কাদায় কাদাময় হয়ে যায়। লোনা জলের বন্যাও আসে কোন কোন বছর, সর্ব্বনাশ করে দিয়ে যায়। বৃষ্টি মাথায় করে জলকাদা ভেঙ্গে সূর্য্যকে পাঁচনিখে যেতে আসতে হয় বলে এ বছর সূর্য্যের জন্য মমতা আর যে অপ্রত্যক্ষ শক্তি বেচারীকে কষ্ট দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে রাগটা রম্ভার যেন বেশী হয়। জোরে বর্ষা নামলেই নিজেকে তার মনে হয় বন্দিনী, ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে সে হাতে হাত কচলায়। তারপর ধৈর্য্য হারিয়ে উঠানে নেমে জলে ভিজে আসে এবং অসময়ে ঝোঁকের মাথায় চুল ভেজানোর আপশোষে নিজের ওপর রাগ করে গুম্ খেয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ ওঘরে গিয়ে বলে, 'বাবা, শুনছো? সেই গপ্পোটা বলো দিকি। সেই যে কার সঙ্গে কোথায় ক'মাস ধরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলে ধরা দেয়ার আগে?'

বীরেশ্বর মনে মনে খুসী হয়। বাইরে বিরক্তি জানিয়ে বলে, 'হাজারবার তো শুনলি।'

তা ঠিক। শুনে শুনে সে কাহিনীর খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত রম্ভার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু পেঁয়াজলঙ্কা দেয়া পুরাণো চালভাজার মত বেশ লাগবে বাদলার দিনে আবার সেই পুরাণো রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে।

'আবার বলো।'

চৌকীর এক কোণে পা তুলে দু'হাতে বুকের কাছে হাঁটু জড়িয়ে বসে হাঁটুর জোড়ে থুতনি রেখে রম্ভা গল্প শোনে। গল্প শেষ হলে খানিক চুপ করে থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'গরীব হলে তো মানুষ কষ্ট পাবেই, না?'

বীরেশ্বর গরীবের কষ্ট পাওয়ার কথা কিছু বলে নি। প্রশ্নটা সে বুঝতে পারে না।

রম্ভা আপন মনে বলে, 'তবে যে সূর্য্যবাবু বলে বড়লোকদের জন্য গরীবরা কষ্ট পায়? বড়লোকরা চোর, ডাকাত?'

বীরেশ্বর ভেবে চিন্তে বলে, 'হাঁ, গরীবরা সব দেশে কষ্ট পায়। তবে আমাদের মত নয়, এই আর কি।'

বর্ষার পর মেয়েকে নিয়ে বীরেশ্বরের একবার কলকাতা যেতে হল।

লোকনাথ দত্ত কলকাতায় থাকেন। কয়েকটা কারখানা আছে, মস্ত বড়লোক। তার বাপের ছোটখাট জমিদারী ছিল ঝুমুরিয়া ও আশেপাশের গাঁয়ে। এখন সামান্য অবশিষ্ট আছে। বাকীটুকুও যাক, লোকনাথ অবশ্য ত মোটেই চান না, তবে এই সামান্য আয়ের জমিদারীটুকুর জন্য নিজে তিনি আর বিশেষ মাথা ঘামাতে বা কষ্ট করতে রাজী নন। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই ঝুমুরিয়ার বাড়ীর থেকে জমিদারীটুকু দেখা শোনা করতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর বড় ছেলে বিদেশে চাকুরী করে। পরিবার প্রতিপালন ও বাপের দায়িত্ব পালন করার ভার পড়েছে অন্য ছেলেটির ঘাড়ে। তার নাম শশাঙ্ক। সে ঘরবাড়ী আগলায় আর যতদূর সম্ভব কম পরিশ্রমে খাজনাপত্র যা কিছু আদায় করে তাই দিয়ে মা, বোন আর বৌয়ের ভরণপোষণ চালায়।

শশাঙ্ক কলকাতায় যাবে। তার সঙ্গে কালীঘাটে কালী দর্শন ও গঙ্গাস্নান করতে যাবে তার মা আর রম্ভার পিসী।

রম্ভা প্রথমে আবদার এবং তারপর জিদ ধরল, সেও পিসীর সঙ্গে কলকাতা যাবে। বেশ, ফিরে আর সে আসবে না, আসতে চায় না। হয় গঙ্গায় ডুবে নয় হাওয়া গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে। আর যেতে যদি তাকে না দেওয়া হয়, বাড়ীর কাছেই পুকুর আছে, দড়িরও কিছু অভাব নেই ঘরে।

মেয়ের জন্য এতদিন যত যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার জ্বালাটা এবার বীরেশ্বরের পড়ল গিয়ে মেয়ের ওপরে। কাটারি নিয়ে সে রম্ভাকে কাটতে গেল। চকচকে ধারালো সে কাটারি, বীরেশ্বর রাগের মাথায় কোপ বসিয়ে দিলে মানুষ একঘায়েই হয়তো দু'খণ্ড হয়ে যাবে—কটা কোপ বসিয়ে সে ক্ষান্ত হবে কেউ জানে না। বাড়ীর কেউ, ছেলেরা পর্য্যন্ত, বাপকে গিয়ে আটকাতে ভরসা পেল না। রম্ভার মা বেঁচে থাকলে কি করত বলা যায় না।

রম্ভা গলা বাড়িয়ে দিল না বটে কিন্তু এক পা না নড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কাটারির কোপের প্রতীক্ষায়। বীরেশ্বর যেন থ' বনে গেল কাছাকাছি গিয়ে মেয়েকে দেখে। মেয়ের দুঃসাহসে নয়, মেয়েকেই দেখে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে জেনেও বাপেরা সহজে জানতে পারে না ছেলেমেয়ে ঠিক কেমন আর কত বড় হয়েছে, বিশেষ করে মেয়ের বেলায়। আজ বিশেষভাবে নজর পড়ায় মেয়ের বদলে এক যুবতীকে দেখে সে যেন চমকে গেল।

এত বেড়ে গেছে রম্ভা!

কাটারি দিয়ে মেয়েকে অবশ্য বীরেশ্বর কাটত না। বদমেজাজী হলেই মানুষ তো আর পাগল্ হয় না। তবে কাটতে গিয়ে রম্ভাকে এভাবে না দেখলে সে হয়তো পিসী আর শশাঙ্কের মা সঙ্গে থাকবে এই ভরসায় মেয়েকে শশাঙ্কের হেফাজতেই কলকাতা বেড়িয়ে আসতে পাঠিয়ে দিত। এবার সে ভাবল, সর্ব্বনাশ! সে নিজে সঙ্গে না থাকলে এই মেয়ে কি কারো সঙ্গে কোথাও যেতে দেওয়া যায়! সেই সঙ্গে একথাও সে ভাবল যে কি সর্ব্বনাশ! এখনো মেয়ের সে বিয়ে দেয় নি!

রম্ভা আর তার পিসীকে নিয়ে বীরেশ্বরকে অগত্যা নিজেই শশাঙ্কের সঙ্গে কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হল। অল্প বয়সে রম্ভা একবার কলকাতা গিয়েছিল, আবছা আবছা মনে আছে দালান, রাজপথ, গাড়ীঘোড়া মানুষের দিশেহারা ভিড়ের সমারোহ। রওনা হওয়ার দিন সকালে রম্ভা যখন উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে আছে, সূর্য্য এল। ক্লিষ্ট মুখে ম্লান হেসে বলল, 'আমারও এমন যেতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায়!'

সূর্য্যকে দেখেই হঠাৎ উত্তেজনা কমবার প্রক্রিয়ায় রম্ভার বুকে তোলপাড উঠেছিল। সে কথা কইতে পারল না।

'একটা কিন্তু সুখবর আছে। এখন থেকে হপ্তায় একবার পাঁচনিখে গেলেই চলবে।'

শুনে রম্ভা ভাবল যে বর্ষার আগে এটা হলে কত কষ্ট বাঁচত সূর্য্যবাবুর! কালও রম্ভা সূর্য্যকে দেখেছে কিন্তু আজ গাঁ ছেড়ে দূরে যাবার চেতনা নিয়ে সূর্য্যকে তার বড় বেশী জীর্ণ শীর্ণ ঠেকল, মনে হল তার যেন অসুখ হয়েছে, কঠিন অসুখ। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রম্ভার। কলকাতা সে যাচ্ছে বটে মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, কিন্তু শৈশবে একবার এবং এত বড় হয়ে আরেকবার যে কলকাতা যায়, যাওয়াতে কি তার দিনের হিসাব থাকে? ফিরে আসবার কথা কি সে ভাবতে পারে যাবার সময়? অনেক দূরের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে ওঠা পর্য্যন্ত রম্ভা তাই কাতর হয়ে রইল। তারপর রেলগাড়ীতে চেপে চলার আনন্দ ও উদ্দীপনার মাদক রসে রম্ভার যখন নেশা ধরে গেল, গতিশীল জড় ও জীবন্ত সব কিছুকে তীব্রভাবে ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, তখন সূর্য্যর কথা তার মনেই রইল না।

কলকাতায় পৌঁছে তারাও শশাঙ্কের সঙ্গে লোকনাথের প্রকাণ্ড বাড়ীতে

উঠল। তাদের মত অনাহুত ও তুচ্ছ আত্মীয়-পরের অস্থায়ী বসবাসের জন্য বাড়ীতে স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে।

এই বাড়ীতে রামপালের সঙ্গে দেখা হল রম্ভার।

লোকনাথের একটি কাঠের গোলা ও আসবার তৈরীর মস্ত কারখানা আছে। বিস্তৃত অঙ্গনে করাতিরা চেরে নানা কাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি, কারখানার মধ্যে তৈরী হয় নানা ধাঁচের ও নানা দামের চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক কোচ আলমারি। রামপাল এখানে মিস্ত্রির কাজ করে।

প্রথমে সে কমদামী সাধারণ আসবাব তৈরীর কাজ আরম্ভ করেছিল, তারপর অল্পদিনে সে দামী সৌখীন জিনিষ তৈরীর কাজে লেগেছে। তার হাতের কাজ বড সুন্দর হয়, তৈরী জিনিষের কারুকার্য্য একটা সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ পায়। কয়েক টুকরো দামী কাঠ নিয়ে সে খানিকটা ফাঁকি দিয়ে ও খানিকটা অবসর সময়ে ছোট একটি সুদৃশ্য কাঠের বাক্স তৈরী করছিল, কারুকার্য্য যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কারখানার ম্যানেজার স্বয়ং উমাপদর কাছে একদিন ধরা পড়ে। এসব বজ্জাতি উমাপদর সয় না। গালাগালি খেয়ে রামপাল সেদিন হয়তো বরখাস্ত হয়ে যেত, বাক্সটি দেখে হঠাৎ স্ত্রী লিলির কথা উমাপদর মনে পড়ে যাওয়ায় জিনিষটাই শুধু সে বাজেয়াপ্ত করে নিল।

গম্ভীর মুখে বলল, 'কাজে ফাঁকি দিও না।'

বাক্সটি নিয়ে উমাপদ চলে যায়. রামপাল বলল, 'একটু বাকী আছে বাবু।'

নেড়ে চেড়ে দেখে কোন ক্রটি কিন্তু উমাপদর চোখে ধরা পড়ল না। '—কেন, এই তো বেশ হয়েছে।'

তারপর রামপালের তৈরী অনেকগুলি ছোট ছোট কাঠের জিনিষ লিলির ঘরের শোভাবর্দ্ধন করেছে। সময় লেগেছে অনেক। রামপাল বড় আস্তে ধীরে সুস্থে কাজ করে।

রামপাল মানুষটাও ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির, কাজের সময় ছাড়া অন্য সময় একটু আলস্যপ্রিয়। কথা সে কম বলে, শোয়া বসা সব অবস্থাতেই নড়াচড়া কম করে, অনেক বিষয়েই আগ্রহ দেখায় কম। পাঁচজনের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা হাসি তামাসা সমস্তই সে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু তাকে মনে হয় আনমনা। উত্তেজিত আলোচনার মধ্যেও চোখ তার মাঝে মাঝে বুজে যায়, ভাবুক মনে হয় তাকে। তার এই খাপছাড়া প্রকৃতির জন্য

অন্য করাতি আর মিস্ত্রী মজুরদের কাছে তার অস্তিত্ব একটু স্পষ্ট। অনেকে এজন্য তাকে পছন্দ করে না। তার নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত ভাবের মধ্যে অনড় অচল হয়ে বসার ভঙ্গির মধ্যে, মুখ বুজে চিন্তা ভাবনা করার মধ্যে সাধু, পণ্ডিত, পূজারী আর বাবুদের সঙ্গে সাদৃশ্যের যেটুকু ইঙ্গিত আছে সেটা এদের সংস্কারকে পীড়ন করে। রামপাল রাগারাগি হানাহানি অশ্লীল আলাপ, হাসাহাসি আর বাহাদুরী সকলের সঙ্গে সমান তালে করে না বলে তাকে কেমন বেজাত ভেবে এরা বিদ্বেষ অনুভব করে। তবে মাঝে মাঝে ধেনো খেলে রামপাল বেশ ভালরকম মাতামাতি হৈহুল্লোড় করে, বিদ্বেষের ভাবটা সাময়িকভাবে একেবারে উপে যায় এবং পরে আবার ফিরে এলেও জোরালো হতে পায় না। নির্বিরোধী স্বভাবের জন্য রামপালের প্রতি অনেকের একটু টানও আছে, যারা নিজেরাই নিরীহ গোবেচারী মানুষ এবং যারা শেষ পর্য্যন্ত মানুক না মানুক সব বিষয়ে বুড়োদের পরামর্শ নিতে ও হিতোপদেশ শুনতে চায়, বুড়োদের জ্ঞানী ও গুণী বলে জেনে শ্রদ্ধা করে। রামপালের মধ্যে এরা স্থবিরের গুণাবলীর প্রতিফলন অনুভব করে।

মাঝে মাঝে কিন্তু অকারণে তার মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা দেখা দেয়, দেশী মদ খেয়ে হৈ চৈ করার সঙ্গে যার কোন মিল নেই। বড় সে ছটফট করে, কাজ কামাই করে সহরময় ঘুরে বেড়ায়, কখনো কখনো সামান্য কারণে মারামারি পর্য্যন্ত করে বসে। তবে দু'চার দিনেই এভাবটা তার কেটে যায়।

উমাপদ কারখানার মালিক লোকনাথের ভাগ্নে। বড়লোক মামাটামার চেয়ে তাদের ভাগ্নেটাগ্নেরা চিরকালই বেশী দড় হয়। উমাপদর কর্ত্তালিতে সমস্ত কারখানা জুড়ে জোরালো অসন্তোষ গুমরে বাড়ছিল, একদিন সে নাথু করাতিকে মেরে বসায় হাঙ্গামা বেধে গেল। করাতিরা স্বভাবতই বদমেজাজী আর অপমান-কাতর হয়। বিশেষত দোষ না করে অন্যায় গালাগালি শুনতে তাদের বেশী লাগে। বেমাপে চিরে দামী কাঠ নষ্ট করেছে বলে উমাপদ তাকে গাল দিতে আরম্ভ করায় নাথুর সইল না।

'খপর্দ্দার বাবু, মুখ সামলে।'

পায়ের কাছে কাঠের একটা গোঁজ পড়ে ছিল। উমাপদ সেটা তুলে ছুঁড়ে মারল। লাগল নাথুর মাথার পাশে। রক্তারক্তি হয়ে গেল।

উমাপদ সেদিন হয়তো খুন হয়ে যেত, তাকে বাঁচালো রামপাল নিজের দেহ দিয়ে তাকে আড়াল করে সে হাঁকতে লাগল : 'খুন হয়ে

যাবে, সবাই মিলে মারলে খুন হয়ে যাবে···খুন! পুলিশ হাঙ্গামা! হুঁসিয়ার!'

উমাপদ ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে কোন রকমে আপিস ঘরে পালাল।

করাতি ও মিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে আরম্ভ করল জটলা। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অবস্থায় রামপালের কাজে তারা বিরক্ত হয়েছে। নাথু তার চাটগাঁ'র ভাষায় অকথ্য গালাগালি দিতে লাগল রামপালকে।

রামপাল কৈফিয়ত দিয়ে বলল, 'একটা লোক মেরে দু'চার জন ফাঁসি গিয়ে, দশ বিশজন জেল খেটে লাভ কি হত শুনি!'

'খুন কিসের? খুন কিসের? দু'চার ঘা খেত শালা।'

এ অবস্থাতেও রামপালের মুখে হাসি দেখা দিল।

'ভদ্দরলোকের ব্যাটা—তোমরা দু'চার জন এক ঘা করে দিলেই রক্ত হেগে মরে যেত।'

কথাটা সকলের ভাল লাগল। উমাপদকে এ একটা গাল দেওয়ার সামিল। এ একটা ঘোষণা—উমাপদর জীবন ঠুনকো, তারা কিন্তু সহজে মরে না।

'নাথুকে যে মারল তার কি হবে?' শ্রীপতি মিস্ত্রী শুধোল।

'মাপ চাইবে।'

হ্যাঁ, মাপ চাইতে হবে উমাপদকে। হেড মিস্ত্রী গণি সাক্ষী, বেমাপে চিরে নাথু কাঠ নষ্ট করেনি, গণি যেমন বলেছিল সেই মাপে চিরেছে। নিজে ভুল করে উমাপদ গাল দিয়েছে নাথুকে, মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মাপ না চেয়ে সে আজ যাক দিকি কারখানার বাইরে! মাপ তাকে এখুনি চাইতে হবে। তাকে কারখানা থেকে না সরালে কেউ কাজ করবে না।

উমাপদকে সরাবার কথাটা শুধু ভাসা ভাসাভাবে উঠে রইল, দু'চার-জন বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। সকলের সায় পেয়ে সমবেত দাবীর স্পষ্ট রূপ নেওয়া স্থগিত রইল উমাপদর মাপ চাওয়া চুকে যাবার জন্য। ওটা আগে চাই, এখুনি চাই।

দায়িত্বটা আপনা থেকে পড়ল গিয়ে রামপালের ঘাড়ে। সে উমাপদকে বাঁচিয়েছে, মাপ চাওয়ার কথা পেড়েছে, ঘটনাস্রোতকে এ পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিনা নির্ব্বাচনেই সে তাই মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হয়ে গেল। শুধু

মধ্যস্থ নয়, দায়ীও হল। মুখে কেউ কিছু না বললেও এটা স্পষ্ট হয়ে রইল যে তাকেই উমাপদকে দিয়ে মাপ চাওয়াতে হবে।

এটা নেতা হওয়ার সামিল। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে রামপাল করাতি ও মিস্ত্রিদের নেতা হয়ে গেল। উমাপদর কাছ থেকে মাপ চাওয়া আদায় করার ভারটা তার এবং এই কাজটা করার জন্য সে কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিতে বললেও এখন সবাই তা পালন করবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাজটা সম্পন্ন করতে না পারলে অবশ্য তার মুস্কিল আছে।

ভেবে চিন্তে রামপাল উমাপদর কাছে গেল।

'ওরা কি বলছে, রামপাল ?

'বড় হাঙ্গামা হয়েছে, বাবু। নাথুকে না মারলেই পারতেন। ওর দোষ নেই। গণি মিস্ত্রী সোয়া ইঞ্চি বলেছিল, নাথু সেই মাপে চিরেছে। আপনার ভুল হয়েছিল।'

উমাপদ চটে বলল, 'তাই কি ? ভুল হয়েছিল বলে আমার মুখের ওপর হুমকি দেবে ?'

রামপাল তখন অবস্থাটা বুঝিয়ে দিল। মাপ না চাইলে উমাপদকে কারখানা থেকে বার হতে দেওয়া হবে না। রাগের মাথায় সবাই হয়তো অপিস ঘরে এসেই—

'অ্যাঁ !' উমাপদর মুখ আবার শুকিয়ে গেল। 'নাথুকে মেরেছি তো ওদের সকলের কি ?'

'সবাই ক্ষেপে গেছে।'

টেবিলে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে দামী পেনের মসৃণ গোড়াটা ঠোঁটে বুলিয়ে বুলিয়ে উমাপদ ভাবে। আক্রোশ আর ভয়ের উত্তেজনায় মনে তার আলোড়ন চলতে থাকে অনিশ্চয়তার। কি করবে ? কি করা যায় ? লোকনাথ দত্তের বড় ভাগ্নে হয়ে, কারখানার বড় ম্যানেজার হয়ে মাপ চাইবে একটা করাতির কাছে ? সকলের সামনে মাপ চাইবে ! কিন্তু খুন হওয়ার চেয়ে এখনকার মত মাপ চেয়ে বাঁচা কি ভাল নয় ? পরে নয় দেখা যাবে কার ঘাড়ে কটা মাথা ! অথবা যদি—

'কি করি বলত রামপাল।'

'আজ্ঞে মাপ না চেয়ে রেহাই নেই।'

রেহাই নেই! রেহাই নেই! ছোটলোক কুলিমজুরের কি আস্পর্দ্ধা! ‘আচ্ছা, বলোগে আমি আসছি।’

রামপাল বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উমাপদ পুলিশে ফোন করে দিল।

পুলিশ আসতেও সময় লাগে। প্রতীক্ষা করতে করতে সকলের উত্তেজনা বাড়তে থাকে, তারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। মিনিট কুড়ি পরে রামপাল তাগিদ দিতে এল।

‘বলোগে আসছি। নাথুর খুব লেগেছে, না? বলোগে নাথুকে আমি একশো টাকা দেব—ক্ষতিপূরণ দেব। এই হিসাবটা দেখেই আসছি।’

এখন এই অবস্থায় উমাপদ হিসাব দেখছে!

খানিক পরেই লরী বোঝাই পুলিশ এসে কারখানা দখল করে বসল। করাতি ও মিস্ত্রীরা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করত না, ক্ষমাপ্রার্থী উমাপদর বদলে হঠাৎ পুলিশের আমদানী হওয়ায় সকলেই অল্প বিস্তর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

সময় দিলে করাতি ও মিস্ত্রীরা আপনা থেকেই চলে যেত। তবে জনতা পালাতে আরম্ভ করলেও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কর্ত্তব্য রীতিমত পালন করার প্রথা পুলিশ মেনে চলে। গোটা কয়েক মাথা একটু ফাটল, কয়েকজন ঘা কতক মার ও গুঁতো খেল।

রামপাল মধ্যস্থ, তাই দলে ভেড়েনি। একটু তফাতে একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে বিড়ি টানতে টানতে আপিস ঘরের দিকে তাকিয়ে ছিল, কখন উমাপদ বেরিয়ে আসে। অঙ্গন সাফ হয়ে যাবার পর দেখা গেল সে একা তখনও কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে আছে।

উমাপদ বেরিয়ে এসেছিল। রামপালকে দেখিয়ে সে বলল, ‘ওই ব্যাটা পালের গোদা, ওই সকলকে ক্ষেপিয়ে আমায় ডাকতে গিয়েছিল। অ্যারেষ্ট করুন।’

অপরাহ্নে লোকনাথ নিজে গিয়ে রামপালকে ছাড়িয়ে আনলেন এবং পুলিশের হাঙ্গামা চাপা দেবার ব্যবস্থা করে এলেন। কারখানার হাঙ্গামা তিনিই মেটাবেন, সে পর্য্যন্ত কারখানায় পুলিশ পাহারা থাকলেই হবে, আর কিছু দরকার নেই।

উমাপদ মামার কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্পনায় গেঁথে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। কারখানার কর্ম্মচারীদের কাছে লোকনাথ আসল ব্যাপারের

খুঁটিনাটি সব শুনেছিলেন। তাঁর কাছে মিথ্যা বলার জন্য উমাপদকে তিনি বকলেন এবং পুলিশে ফোন করার জন্য তার বুদ্ধির তারিফ করলেন। তাঁর আরও কারবার ও কারখানা আছে। এটা তাঁর জানাই ছিল কারখানা চালাতে গেলে মাঝে মাঝে লোকদের সঙ্গে গোলমাল হয়। অশিক্ষিত নেশাখোর ছোটলোক তো সব! বাড়ীতে একটা চাকর থাকলে তার সঙ্গে পর্য্যন্ত খিটমিটি না বেধে যায় না, কারখানায় অমন কতলোক কাজ করে!

রামপালকে তিনি একেবারে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। উমাপদকে বাঁচাবার জন্য প্রশংসা করলেন এবং দশ টাকা পুরস্কার দিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদ করে বললেন, 'কাল আমি সব মিটিয়ে দেব।'

লোকনাথ জানতেন শ্রীপতি মিস্ত্রী তাঁর কাঠের কারখানার লোকদের দলপতি, সকলের হয়ে সেই এতদিন অভাব অভিযোগের কথা জানিয়েছে, কথাবার্ত্তা চালিয়েছে। রামপালকে হঠাৎ ওদের নেতা হতে দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন।

রামপালকে জলখাবার দেবার হুকুম হয়েছিল। প্রজা জমিদার-বাড়ী এলে তাকে খেতে দেবার সেকেলে প্রথাটা লোকনাথের বাপ মেনে চলতেন, ব্যবসায়ী হলেও লোকনাথের আমলে সেটা টিকে আছে। খিদেও রামপালের পেয়েছিল প্রচণ্ড। চাকরের সঙ্গে সে বাড়ীর আনাচে খেতে গেল। রামপালের শ্রেণীর লোকদের খাওয়াবার জন্য মুড়ি, চিড়ে, ছাতু আর আটার রুটির স্থায়ী বরাদ্দ আছে। গুড় দিয়ে যা খুসী খেতে পারে। সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধা আছে। অবশ্য সে পরিমাণে সকলে পায় না. খায়ও না।

'কি নেবে?'

'দাও যা খুসী।'

হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে রামপালের, বিতৃষ্ণা জেগেছে। গারদে বসে উমাপদর চালাকি আর প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদানে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে তার বিস্ময় আর ক্রোধের সীমা থাকে নি। হঠাৎ লোকনাথ স্বয়ং গিয়ে তাকে মুক্ত করে নিজের গাড়ীতে চাপিয়ে আদর করে বাড়ী আনায় রাগ দুঃখ তার চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটা ভুল হয়েছিল, সেটা সংশোধন হল ভেবে সে পরম স্বস্তিও বোধ করেছিল। পুরস্কারের দশটা টাকা সে নিয়েছিল, গারদে গিয়ে কষ্ট পাওয়ার মজুরি হিসাবে। এখন হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে যে এ তো

শুধু তার প্রতি ভুল করার প্রতিকার হল, এতে তার তো খুসী হওয়া উচিত হয় নি! নাথু মার খেয়েছে, উমাপদ মাপ চায় নি, ফাঁকি দিয়ে পুলিশ ডেকেছে, কয়েকজন আহত হয়েছে—এসবের কোন প্রতিকার হয় নি।

লোকনাথ বলছে, কাল সব মিটিয়ে দেবে।

কিন্তু তাকে তো দেখতে হবে ঠিকমত মিটমাট যাতে হয়? ঠিকমত মিটমাট কি হওয়া উচিত তাকে তো স্থির করতে হবে ভেবেচিন্তে আর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে? এমন একটা মীমাংসা চাই তো লোকনাথ যা মেনে নেবে এবং ওরাও যাতে খুসী হবে?

হঠাৎ নেতা হয়েই রামপাল ঠিক নেতার মতই ভাবতে শিখেচে। মুড়ির সঙ্গে বাতাসা পেয়েও খেয়ে সে স্বাদ পেল না। কেবল খিদের তাগিদে মুড়ি চিবিয়ে গেল।

এমন সময় বাপের সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখে রম্ভা ফিরে এল। অন্য অনেকের মতই রামপাল তাকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু রম্ভার মনে হল এ যেন সেভাবে দেখা নয়।

আনাচের অন্দর থেকে খানিক পরে রম্ভা একবার বেরিয়ে এল রামপালকে আরেকবার দেখবে বলে। বাড়ীর কত পুরুষের চোখে সে দেখেছে তার পরিহিত শাড়ী সেমিজ ভেদ করা চাউনি। তার মধ্যে উমাপদর চাউনিটাই সবচেয়ে তেজী, চোখ দিয়ে সে যেন তার সর্ব্বাঙ্গ আঁচড়ায়। রামপালের মত মানানসই একটি পুরুষের মিষ্টি দৃষ্টি দেখে তাই রম্ভার চেতনায় ঘা লেগেছিল। অন্দরে গিয়ে তার কেবলি মনে হচ্ছিল লোকটাকে আরেকবার না দেখলে তার চলবে না, ভুল দেখেছে কি না এ সংশয়টা মেটাতেই হবে।

খাওয়া শেষ করে রামপাল তখন চলে গেছে।

লোকনাথের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীতে লোক অনেক, আত্মীয় কুটুম্ব আশ্রিত আশ্রিতা চাকর ঠাকুর দাই দাসী মালী ঝাড়ুদার দারোয়ান ইত্যাদি নানা জাতের হরেকরকম মানুষ। মানুষ পুষে লোকনাথ সুখ পায়, তার কাছে সংসারে যত পোষ্য যত সমারোহ কর্ত্তা হবার বাহাদুরিও ততখানি। বাজে লোকের ভিড়ে সংসারের আসল মানুষদের কোন অসুবিধা হয় না। এক বাড়ীতে বাস করলেও তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক। আসলেরা ভিড়ের

সান্নিধ্য শুধু ততটুকু মঞ্জুর করে, তাদের জীবনযাত্রার কলরব ঠিক ততটুকু কানে আসতে দেয়, যা বরদাস্ত করতে কষ্ট নেই, গর্ব্ব আছে। বাড়ীর যে পরিমাণ স্থান এরা পেয়েছে এদের দাবীর জোরে তা এদের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী। এত বড় বাড়ীতেও তাই অন্যদের স্থানের অকুলান হয়, বাস করতে হয় একটু ঘেঁষাঘেঁষি কোনঠাসা হয়ে। অবশ্য তাও কি কম ভাগ্য?

নানা গণ্ডীতে, নানা প্রক্রিয়ায় বিচিত্র শব্দ তুলে এ বাড়ীর জীবনধারা বয়ে যায়। ভোর চারটে থেকে মানুষের ঘুমই ভাঙ্গে বেলা দশটা, এগারটা পর্য্যন্ত। যাদের কাজ করতে হয় তারা কাজ আরম্ভ করে। আর যাদের কোন কাজ নেই তারা আরম্ভ করে সময় কাটাবার চেষ্টা, শুয়ে বসে হাই তুলে আড্ডা দিয়ে গল্প করে তাস খেলে রেডিও শুনে। সাধারণ কথার একটানা গুঞ্জন ছাপিয়ে কাণে আসে ডাকাডাকি, ধমকানি, কলহ, ছোট ছেলের কান্না, ঠাকুর ঘরে আরতির শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতি শব্দ। উপরের স্তরের মেয়েপুরুষদের জীবন সব সময়েই শ্লথ মন্থর, সকালের দিকে আরও ঝিমিয়ে থাকে। পুরুষেরা তবু লোকনাথের বিভিন্ন আপিসে মোটা বেতনে হাল্কা কাজের চাকরী করতে যায়, মেয়েদের কাজের অভাবটাই সাংঘাতিক। সকলের চেয়ে নিশ্চল জবুথবু ও শব্দহীন লোকনাথের তিরানব্বই বছরের বুড়ী মা, এদের অলস জীবনের চরম প্রতীকের মত।

বাড়ীতে দু'বেলা সব চেয়ে সমারোহ হয় চারটি রান্নাঘরে। এক ঘরে লোকনাথ ও তার আপনজনের, এক ঘরে পরের পর্য্যায়ের সম্পর্কিতদের, এক ঘরে নিরামিষ এবং এক ঘরে বাকী সকলের। শেষের রান্নাঘরে অন্ন ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু না থাকলেও পরিমাণটা হয় বিপুল। তবু সকলের শেষে যারা খায়, শেষে ছাড়া খাবার অধিকার যাদের নেই, তাদের প্রায়ই সব জিনিষ কম পড়ে। কোনদিন থাকে শুধু আধপেটা ভাত আর একটু ডাল, কোনদিন থাকে শুধু দুটি শুকনো নুন ভাত, কোনদিন কিছুই থাকে না। হিসেব করেই দেওয়া হয় সব জিনিষ, কিন্তু সেটা মাথা পিছু হিসেব, খিদের হিসেব নয়।

পোষ্য পোষা নিয়ে বড় ছেলে হীরেনের সঙ্গে লোকনাথের একটু মতানৈক্য আছে। তবে হীরেনের পক্ষে অনৈক্যটা সম্পূর্ণ নীতিগত ব্যাপার। এই আবেষ্টনীতে মানুষ হওয়ার ফলে বাড়ীর অবস্থাটা তার এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে পরিবর্ত্তন ঘটানোর বিশেষ জোরালো তাগিদ

সে অনুভব করে না। কেবল এই এক বিষয়ে নয়, বেশ খানিকটা পিতৃভক্তি থাকলেও বাপের সঙ্গে তার তেমন বনে না। ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে একটা সমালোচনার ভাব থাকাটা তার কারণ। বাপকে সে পুরোপুরি অনুমোদন করতে পারে না। প্রচুর বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও লোকনাথের মনেও ছেলের সম্বন্ধে পুরাপুরি সায় নেই। তবে মতানৈক্য থাকলেও বাপ ছেলের মধ্যে এপর্য্যন্ত তেমন মনোমালিন্য ঘটেনি। অমিলের মধ্যেও মিল থাকায় খানিকটা সামঞ্জস্য হয়েছে, মতামত ও পছন্দ অপছন্দের অতীত পিতৃভক্তি আর বাৎসল্য বাকীটা সামলে রেখেছে।

সম্প্রতি উমাপদকে উপলক্ষ করে দু'জনের মধ্যে খাঁটি একটা মনোমালিন্য ঘটবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। কাঠের কারখানায় গোলমাল হবার আগে থেকেই উমাপদর ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা তার কাণে আসছিল ; একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য চাপও পড়ছিল তার উপর। চাপ দিচ্ছিল কৃষ্ণেন্দু আর মমতা। দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের বলাটাই হীরেনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এদের দু'জনের চাপের সঙ্গে তার নিজের মনের সঙ্গতি ঘটায় ব্যাপারটা গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশী। উমাপদকে সে পছন্দ করে না। কেবল অপছন্দ নয়, এই পিসতুতো দাদাটির উপর তার মনে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবও বহুদিন থেকে সঞ্চারিত হয়ে এসেছে। বাড়ীর মানুষগুলির অমার্জ্জিত স্থূল মানসিকতা সে শুধু অবজ্ঞা আর উদাসীনতা দিয়ে বরদাস্ত করে যায়, তার আগেকার যুগের মানুষ বলে ক্ষমা করে কিন্তু প্রায় সমবয়সী ও সুশিক্ষিত উমাপদর রুচিহীন কৃষ্টিহীন ভোঁতা অনুদার জীবনযাপন তাকে পীড়ন করে।

কিন্তু মুখে উপদেশ বা ধমক দিতে লোকনাথের আপত্তি না থাকলেও উমাপদর স্বভাবের সংশোধন হওয়ার মত শাসন করতে লোকনাথ রাজী নন। উমাপদর ব্যবহারে তিনি দোষের বিশেষ কিছু দেখতে পান না বলে শুধু নয়, তাকে শাসন করার একটু মুস্কিলও আছে।

জীবন-বীমার কোম্পানী খুলে লোকনাথ প্রথম ব্যবসায় জীবন আরম্ভ করেন তাঁর ভগ্নীপতি রাখালের সঙ্গে, উমাপদ যার ছেলে। সে কোম্পানীর অর্দ্ধেক অংশীদার ছিল রাখাল। কোম্পানী যখন দাঁড়িয়ে গিয়ে দিন দিন বড় হচ্ছে এবং পরামর্শ চলছে অন্য কারবার পত্তন করবার তখন রাখাল

মারা যায়। তারপর অন্য কারবার লোকনাথ একাই কয়েকটা গড়ে তুলেছেন, সেগুলিতে উমাপদর কোন অংশ না থাকলেও জীবন-বীমা কোম্পানীটির সে অর্দ্ধেকের মালিক। কোম্পানী আরও অনেক ফেঁপেছে, বহু টাকার কারবার দাঁড়িয়েছে।

রাখালের মৃত্যুর সময় উমাপদ ছোট ছিল। যতদিন পারা যায় লোকনাথ তাকে লেখাপড়া নিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন, তারপর তাকে ব্যাপৃত রেখেছেন অন্য কারবার চালাবার কাজ শিখিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে। জীবন-বীমা কোম্পানীর ধারে কাছেও তাকে ভিড়তে দেয় নি। সে ইচ্ছাও তাঁর নেই। ওই একটি কোম্পানীর ভিতরের ব্যাপার তিনি উমাপদকে জানতে দিতেও চান না, পরিচালনার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে দিতেও চান না।

উমাপদ মাঝে মাঝে আজকাল একটু গম্ভীর মুখে এই কোম্পানীটি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে স্বরু করেছে, নানা প্রশ্ন করেছে। দু'একবার আপনা থেকে কোম্পানীর আপিসে ঘুরেও এসেছে ইতিমধ্যে। লোকনাথ জানেন, একদিন এই ব্যাপার নিয়েই ভাগ্নের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধবে, উমাপদ পাওনা দাবী করবে। কিন্তু তার এখনো দেরী আছে। আরও কতকগুলি বছর তিনি উমাপদকে সামলে চলতে পারবেন। এখন অকারণে ওর স্বাধীনতা খর্ব্ব করার চেষ্টা করতে গিয়ে ওর স্বাধীন হবার প্রবৃত্তি উস্কে দিয়ে লাভ কি হবে? তাও কুলী মজুরদের সঙ্গে একটু কড়া ব্যবহার করার জন্যে!

হীরেন এটুকু বোঝে না। বুঝবার মত বুদ্ধিও তার নেই ভেবে লোকনাথের আপশোষ হয়—রাগও হয়। ভয় হয় এই ভেবে যে সঙ্গ দোষে ছেলেটার বুদ্ধি একেবারে বিগড়ে না যায়।

কৃষ্ণেন্দু আর মমতার সঙ্গে হীরেন পাটনায় এক কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছিল। এসব কনফারেন্সে হীরেন কেন যায় লোকনাথের মাথায় ঢোকে না,—যারা জেল খেটেছে আর দরকার হলে আবার জেলে যাবে তাদের এই কনফারেন্সে? তবে হীরেন কলকাতায় না থাকায় এক বিষয়ে রক্ষা পাওয়া গেছে। কাঠের গোলার ঘটনাটা নিয়ে সে নিশ্চয় বাড়াবাড়ি করত।

ফিরে এসে গোলমাল করবে। কিন্তু তিনি নিজে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছেন আর উমাপদকে আচ্ছা করে শাসন করে দিয়েছেন বলে হয়তো অল্পেই তাকে ঠাণ্ডা করা যাবে। শ্রীপতি যে কৃষ্ণেন্দুকে টেলিগ্রাম করে দেবে লোকনাথের

জানা ছিল না। রামপাল কিছু করতে পারবে এ বিশ্বাস শ্রীপতির ছিল না। সেই সঙ্গে কারখানায় তার পদটিতে রামপাল উড়ে এসে জুড়ে বসবে এ ভয়ও ছিল।

শ্রীপতিকে মধ্যস্থ করেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা হল: বাকী রাতটা এক রকম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে ভোরবেলাই রামপাল হাজির হল লোকনাথের বাড়ী। রাত্রির আলোচনায় কি হলে তারা খুসী হবে স্থির করে ফেলা হয়েছিল, লোকনাথকে সর্ত্তগুলি জানিয়ে দিতে তার তর সইছিল না। শ্রীপতি জানলে রামপালকে আটকে রাখার চেষ্টা করত, নতুবা তার সঙ্গে যেত। রামপাল একা লোকনাথের সঙ্গে কথা চালাবে পরামর্শ সভায় এমন কোন কথা হয় নি।

সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল। ন'টার আগে লোকনাথ কারো সঙ্গে দেখা করেন না,—নিজের দরকারে অথবা বিশেষ লোক ছাড়া।

অস্থিরতা চেপে বসে থাকতে থাকতে রামপালের আবার খিদে পায়। জলখাবার নিয়ে খেতে গিয়ে আবার সে স্বাদ পায় না। তার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে কৌতুহলী বীরেশ্বর। রম্ভা যোগ দেয় পরে।

'হাজত যাও নি তুমি ?' বীরেশ্বর দরদের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

'যাই বা না যাই।' উদাসভাবে রামপাল জবাব দেয়।

'তাই বলছিলাম। ওই এক কাজ জানে পুলিশ, ধরে ধরে হাজতে পোরা। আমি জানিনে ? ঘুরে আসিনি কবার জেল থেকে ?' বীরেশ্বর গরম হয়ে ওঠে। তার জেলে যাওয়ার কাহিনী শুনতে শুনতে রামপালের উদাসীন ভাব কেটে যায়।

'কর্ত্তা ভাল করেছেন তোমায় ছাডিয়ে এনে। কর্ত্তা লোক ভাল।'

এ কথায় রামপাল সায় দিতে পারে না। কাল রাত্রে সকলের আলোচনা শুনে এই জ্ঞানটুকু তার জন্মেছে যে তার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিকারের জন্য লোকনাথ তাকে ছাড়িয়ে আনেন নি, হাঙ্গামাটা চাপা দেওয়াই ছিল তার সকল উদ্দেশ্য।

'ভালো ? হা, ভালোই বটে ! কেউ বলে না ভাল।'

'সূর্য্যবাবুও তাই বলেন। বড়লোকেরা লোক ভাল না।' রম্ভা তার উত্তেজিত জোরালো সমর্থন জানায়। তার চোখ দুটি বিস্ময়কর দীপ্তিতে চক

চক করে। নিশ্বাস তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই একটু দ্রুত হয়ে উঠেছে। রামপালের চোখে মুখে আজ উদাসীন নির্বিকার ভাব নেই, চাপা অস্থিরতা এক অদম্য রুদ্ধ শক্তির থমথমে অভিব্যক্তি এনে দিয়েছে। কথা তার ঝাঁজালো কিন্তু মানে বোঝা সহজ। গরীব মিস্ত্রিমজুরদের হয়ে সে লড়াই করেছে বড়লোক বাবুদের সঙ্গে, হাজতে গিয়েছে, তারপর বাড়ী বয়ে লড়াই করতে এসেছে স্বয়ং বড় কর্ত্তার সঙ্গে! রম্ভার কেবলি মনে হতে থাকে এ লোকটি যেন ঝুমুরিয়ার জীর্ণশীর্ণ অশক্ত শ্রীহীন সূর্য্যের সুস্থ সবল রূপবান প্রতিনিধি—শক্তিশালী, সক্ষম। সহরের আলো দেখে রম্ভার মনে হয় নি এ তার গাঁয়ের প্রদীপ আর ডিবরির আলোরই উজ্জ্বল চোখ ঝলসানো রূপ। ঝুমুরিয়ার কালো সূর্য্যের ক্ষয়িষ্ণু প্রাণশক্তি দিয়ে জীইয়ে রাখা শিখাটিই আজ রামপালের প্রদীপ্ত অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে তাকে অভিভূত করে দিল।

লোকনাথ রামপালকে দর্শন দিলেন সাড়ে ন'টার সময়। বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল আবার?'

রামপালের বক্তব্য শুনে বললেন, 'বটে?' আগে মিটমাট না করে দিলে কেউ কাজ করবে না? ওদের বলগে বাপু, ওসব ওস্তাদি চলবে না আমার সঙ্গে। কাজ যদি বন্ধ করে তো কিছুই করব না আমি।'

রাগে লোকনাথ গরগর করতে থাকেন। তার কথা শুনতে শুনতে রামপালেরও মনে হয় কথাগুলি তিনি খাঁটিই বলছেন। খোঁজখবর না নিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ না করে, ব্যাপারটা ভালরকম বিবেচনা করে না দেখে, হঠাৎ কি করে তিনি মিটমাট করে দেন! তিনি ব্যস্ত মানুষ, কিছুদিন সময়ও তো লাগবে তাঁর সব বুঝে শুনে নিতে। ততদিন কি কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে কারখানায়? তিনি কথা দিয়েছেন মিটিয়ে দেবেন, কারো নালিশ করার কিছু থাকবে না, তাই কি যথেষ্ট নয়?

'আজ্ঞে তাই বলি গে' বুঝিয়ে।'

লোকনাথ শান্ত হয়ে নরম সুরে বললেন, 'কি বলে ওরা কাল জানিয়ে যেও।'

রামপালের কথা শুনে কেবল শ্রীপতি নয়, আরও অনেকেই হাসল। কারো কারো চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিও দেখা গেল। এখানে এদের কথা শুনতে শুনতে রামপালের মনে হল, এরাও তো ঠিক কথাই বলছে। বোকার মত সে-ই

লোকনাথের সহজ চালটি ধরতে পারে নি! তাই বটে, কারখানায় কাজ বন্ধ করা এখন খুব কঠিন নয়, কিন্তু কয়েকদিন কাজ করার পর আস্তে আস্তে সকলের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এলে সেটা তো সহজ হবে না! তখন দুটো মিষ্টি কথা বললেই হয় তো লোকনাথ ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারবেন। মীমাংসার সর্ত্ত সম্পর্কে মোটামুটিভাবে প্রতিশ্রুতি না পেয়ে কাজ আরম্ভ করা তো উচিত হবে না।

ন'টার আগে লোকনাথের সঙ্গে দেখা হবে না জেনেও রামপাল পরদিন সাতটার খানিক পরেই আবার তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। টের পেয়ে খুশী হল যে রম্ভাও তার অপেক্ষা করছিল।

বীরেশ্বরের এখানে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। ইতিমধ্যেই বাড়ীর একজন ড্রাইভারের সঙ্গে তার একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভারটিকে সে হয়তো মেরেই বসত কিন্তু তার আগেই উমাপদ নিজে এসে ড্রাইভারটিকে ধমকে দেওয়ায় ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে পারে নি। অতিথির মান আরও বাড়াবার জন্ত উমাপদ বলেছিল, 'তুমি বললে ওকে ডিসমিস করে দিই বীরেশ্বর।'

বীরেশ্বর তাতে একটু অপমান বোধ করেছিল। এরকম পিঠচাপড়ানো খাতির তার সহ্য হয় না। সে যেন অসহায়, অরক্ষিত মানুষ, উমাপদর অধীন। ড্রাইভারকে ধমকে বড়ই সে অনুগ্রহ করল তাকে। এরকম অনুগ্রহ উমাপদ তাকে আরও করবার চেষ্টা করেছে, তাতেও অপমান বোধ করেছে বীরেশ্বর। তাছাড়া, এখানে বড় বেশী পরাধীন শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে হয়। লোকনাথের কাছে যে ব্যবহার আশা করেছিল তাও সে পায় নি। কোন ব্যবহারই পায় নি।

মেয়ে সায় দিতেই সে ঝুমুরিয়া ফিরে যাবার আয়োজন করল। রম্ভারও এখানে বড় খারাপ লাগছিল। বড়লোকের বাড়ী বলেই প্রথম থেকে তার বিতৃষ্ণা জাগে নি, এখানে বাস করতে করতে তার অস্বস্তি বাড়ছিল। রামপালের সঙ্গে জানাশোনা হবার পর থেকেই তার কেবলি মনে হয়েছে যে সে শত্রুপুরীতে বাস করছে, অস্বস্তি যেন পরিণত হয়েছে বিদ্বেষে।

খবর শুনে উমাপদ বিষণ্ণ হয়ে শশাঙ্ককে বলল, 'ওরা আর কিছুদিন থেকে যাক না শশাঙ্ক ?'

শশাঙ্ক বয়সে বড়। কিন্তু লোকনাথের সঙ্গে উমাপদের সম্পর্ক বেশী ঘনিষ্ঠ কিনা, তাই সে তাকে তুমি বলে।

শশাঙ্ক চিন্তিত হয়ে বলল, 'থাকবে কি ?'

'বীরেশ্বরকে একটা কাজে লাগাব ভাবছি। ভাল মাইনে।'

'কাজ করবে কি ?

'বলেই দেখ না ?'

'বলে লাভ হবে কি কিছু ?'

রক্ত মাংসের দেবতাদের প্রশ্ন ও প্রস্তাবকে নাকচ করা জবাব দ্বিধাসন্দেহ ভরা প্রশ্নের দ্বারা দেওয়াই শশাঙ্কের স্বভাব।

তার ধারণা, এতে উভয় পক্ষেরই সম্মান বজায় থাকে।

'বললে দোষ কি ?'

'কি দোষ ?'

শশাঙ্কের রকম দেখে উমাপদ দমে যায়। অতি উদাসীন ভাব অবলম্বন ক'রে বলে, 'থাকগে তবে, বলে কাজ নেই। একটা লোক দরকার ছিল তাই, নইলে বীরেশ্বর থাকলো বা গেল, আমার কি ?'

উমাপদ নিজেই বীরেশ্বরকে বলতে পারে। কিন্তু সে যদি অনুরোধ না রাখে ? তাতে বড়ই অপমান হবে।

শশাঙ্ক চলে গিয়েছিল, খানিক পরেই জুতো জামা পরে সে ফিরে এল। সলজ্জ একটু হেসে বলল, 'পাঁচটা টাকা হবে ভাই ?'

'টাকা নেই।'

মুখখানা ম্লান করে শশাঙ্ক ফিরে যাচ্ছে, উমাপদ হঠাৎ তাকে ডেকে বলল, 'শশাঙ্ক, দাঁড়াও টাকা দিচ্ছি।'

দাঁড়াতে বললেও উমাপদ তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে না। শোবার ঘরের পাশে তার বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। পাঁচ টাকার একখানি নোটের বদলে দশ টাকার কয়েকখানা নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

'তোমার স্ত্রী তোমার কথা শোনে শশাঙ্ক ?'

শশাঙ্ক গাল উথলানো হাসি হাসে।—'শোনে না? চোখ কান বুঝে শোনে। সহুরে মেয়ে নাকি যে কথা শুনবে না?'

বলি বলি করেও বলতে উমাপদর বাধে। মনটা বড় তিতো হয়ে যায়। ভয় ও ভদ্রতার বাধায় বল্‌তে না পারার তিক্ততা। দু' একদিনের মধ্যে রম্ভা নাগালের বাইরে চলে যাবে,—হয়তো চিরদিনের জন্য! রম্ভা হয়তো ভাববে, কি কাপুরুষ বাবুটা, কি ভীরু!

কথাটা বলতে শেষের চিন্তাটাই তাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শশাঙ্ক রম্ভাকে বলে গেল সে যেন আজ দিগম্বরীর ঘরে শোয়। রাত্রে সে বাড়ী ফিরবে না।

উমাপদর বৌ লিলি বড় ঘুমকাতুরে। মাস আষ্টেকের একটি তার ছেলে আছে, অন্ধ ছেলে। দশটার আগেই ঘরে এসে ছেলেকে মাই দিতে দিতে দশ মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে। উমাপদ ঘুম ভাঙ্গালে কান্নার একেবারে বন্যা বইয়ে দেয়। ছেলেটা নির্জীব, বেশী জ্বালাতন করে না। চিঁ চিঁ করে একটু সে কাঁদলেই ঘুমের মধ্যেই লিলি আবার তার মুখে মাই গুঁজে দেয়। একটা দাই আছে ছেলে রাখার, কিন্তু লিলি তাকে ছেলে দিতে চায় না। ছেলে ছাড়া তার ঘুমোতে কষ্ট হয়। নেহাৎ যেদিন বেশীরকম জ্বালাতন করে, অসুখের জন্য মাই না টেনে কাঁদে, শুধু সেদিন দাইকে ডেকে এনে তার জিম্মা করে দেওয়া হয়। দাইয়ের কাছে ছেলে কাঁদে কি না কাঁদে লিলি বা উমাপদ কেউ টেরও পায় না, দাইয়ের ঘর অনেক তফাতে। ঘুমের ঘোরে লিলি শুধু মাঝে মাঝে বিছানাটা হাতড়ায়।

আজ লিলি ঘরে এল প্রায় সাড়ে দশটায়। নিজের খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে উমাপদ তখন বই পড়ছে, বিলাতের নতুন যুগের এক আদর্শ বীরের কাহিনী —কপর্দ্দকশূন্য বেকার এক তরুণ বুদ্ধি খাটিয়ে বাছা বাছা ধনী ঠকিয়ে কি করে নিজে বড়লোক হয়ে প্রতারণার চালবাজিতে হারমানা ওই একজন ধনীর মেয়েকেই ভালবেসে বিয়ে করে সুখী হল। বইখানার একুশটি এডিসন হয়েছে —চার বছরের মধ্যে।

ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে লিলি বলল, 'শুনছ? ডাক্তার দেখাবে বলেছিলে যে আজ?

'মনে ছিল না'।

'তা কেন মনে থাকবে? কেমন ঘায়ের মত হয়ে গেছে প্যাঁচড়াগুলো, নিজের হলে বুঝতে। খোকারও হচ্ছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কাল ডাক্তার ডাকব।'

'বড় ডাক্তার ডেকো।'

'ডাকব।'

ঘুম-কাতুরে লিলির মান অভিমান কলহ বিলাপের জের টানার ক্ষমতা নেই, শুতে পারলেই সে বাঁচে।

সে শুয়ে পড়তেই বই রেখে উমাপদ বেরিয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানে। একতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে শশাঙ্কের ঘরে যেতে হলে এই বারান্দা পার হতে হয়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রম্ভা এল।

সমস্ত বাড়ী তখনো সজাগ। এ বারান্দা দিয়ে লোক যাওয়া আসা করছে। কোন ঘরের আলোই প্রায় নেভেনি।

'আমার স্ত্রী তোমায় একবার ডাকছিলেন রম্ভা।'

'এত রাতে? শুনে আসি যাই তবে।'

উমাপদ তাকে শয়নঘরের বদলে বসবার ঘরে নিয়ে গেল।

বলল, 'বোসো' একটু আলাপ করি তোমার সঙ্গে। তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ আজকালের মধ্যে?'

রম্ভা বলল, 'উনি কই?'

উমাপদ সংক্ষেপে বলল, 'বোসো। ভয় কি?'

ভয়? কথাটা রম্ভার ভাল লাগল না। এ বাড়ীর এরকম অনেক ঘরেই ঢুকে সে একটু অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই বলে পালিশ করা মেঝে রঙীন দেয়াল ঝালরপর্দার আর চকচকে ঝকঝকে আসবাব আলোয় ঝলমল করছে দেখে সে ভয় পেয়েছে ভাবল লোকটা!

ভয় পাওয়ার অন্য মানেটা রম্ভা তখনো আন্দাজ করতে পারেনি। তারপর উমাপদ এসে তার বাঁ হাতটি ধরে অতি মৃদু ও মিহি এবং একটু ধরা গলায় কথা বলতে সুরু করায় চকিতে রম্ভা সব আন্দাজ করে নিল। একটু তার ভয় হল এবার। গোলমাল হলে একটা কেলেঙ্কারি না হয়! হাত নিয়ে

হঠাৎ টানাটানি করতে তার সাহস হল না। উমাপদর মুখ দেখে আরো বেশী ভয়ে ও বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। প্রথম এসে উমাপদর যে মুখখানা তার এত সুন্দর আর কোমল মনে হয়েছিল সে মুখে যেন ঝুমুরিয়ার নিতাই পাগলার মুখের ছাপ পড়েছে, চোখ দুটি অবিকল এক রকম! বিনানুমতিতে পুরুষ হঠাৎ হাত ধরেছে এ অভিজ্ঞতা রম্ভার ছিল। ঝুমুরিয়ার কালীবর্দ্ধনও পুকুরঘাটের নির্জ্জন গাছতলায় এর চেয়েও জোরে তার হাত চেপে ধরেছিল, তার মুখ তো এমন দেখায় নি, বরং সে মুখের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকে প্রায় অবশ করে রেখেছিল। কালীবর্দ্ধনের বেলা রাগ হয়েছিল, ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যাবার পরেও বহুক্ষণ গা জ্বালা করেছিল রাগে। এখন রম্ভার কেমন ঘেন্না করতে লাগল, মনে হল উমাপদর স্পর্শ যেন অশুচি।

উমাপদর মুখের দিকে রম্ভা আর তাকাতে পারল না। মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিগম্বরী বারান্দার এদিকের কোণের ছোট ঘরখানিতে দরজার সামনে যেন রম্ভার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে ঢুকেই সে জিজ্ঞেস করল, 'উমা ঠাকুরপো কি বলছিল রে তোকে?'

'কিছু না।'

'কিছু না কিলো ছুঁড়ি? তোকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল দেখলাম না নিজের চোখে?'

'শুধোচ্ছিলেন আমরা কবে যাব।'

দিগম্বরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রম্ভার মুখের দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'একথা শুধোবার জন্য একটা সোমত্থ মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবার দরকার! উমা ঠাকুরপোর কাণ্ডজ্ঞান নেই সত্যি।'

দিগম্বরীকে সব খুলে বলার জন্য রম্ভার মনটা আকুলি বিকুলি করছিল। কিন্তু একথা বলা যায় না। উমাপদকে খাতির করে নয়, মমতা করেও নয়। জানাজানি হয়ে বীরেশ্বরের কানে উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। ভাগ্নেবাবুকে কীচক বধ করে হয়তো সে ফাঁসি যাবে। একজন তার হাত ধরেছে বলে বাপ তার ফাঁসি যাবে, এটা রম্ভার মোটেই সঙ্গত মনে হল না।

'এত রাতে তুই যে ওপরে এলি?'

'তোমার কর্তাই তো আসতে বলল দিগুদিদি ?'

দিগম্বরী আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'উনি আসতে বললেন ?'

আজ রাত্রে ফিরবে না বলে শশাঙ্ক রম্ভাকে তার কাছে শুতে বলে গেছে শুনেও দিগম্বরীর বিস্ময় কমে না। কথাটা সে বিশ্বাস করতে চায় না।

'রাত্রে ফিরবেন না ? আমায় তো বলেন নি কিছু।'

'বলেন নি ?'

'না। তুই ভুল শুনেছিস রম্ভা। রাতে উনি বাড়ী ফিরবেন না, সেকথা আমায় না বলে তোকে বলে যাবেন ? তোর মাথা খারাপ হয়েছে। কি শুনতে কি শুনেছিস তুই !'

রম্ভার কথা সে কানেই তুলতে চায় না। বলে, 'আমি বলে ভাত এনে ঢেকে রাখলাম ওঁর জন্যে, উনি ফিরবেন না !'

রম্ভা মুচকি হেসে বলে, 'বলে যেতে সাহস হয় নি হয় তো।'

দিগম্বর চটে বলে, 'চোপাস্ নি রম্ভা। সাহস আবার কি ? স্ত্রীকে বলে যেতে সোয়ামীর সাহস ! এমনি বাইরে গিয়ে কোথাও আটকে গেলেন, সে হল ভিন্ন কথা। রাতে ফিরবেন না ঠিক করে গেলেন, তোকে বললেন আর আমায় বললেন না, এ কখনো হয় ?'

দিগম্বরীর দিশেহারা ভাব দেখে রম্ভা চুপ করে থাকে। একটা সহজ সাধারণ কথাকে দিগম্বরী কেন এত বাড়িয়ে তুলছে তাও সে ভেবে পায় না। সমস্ত দুপুরটা সহর দেখে বেড়িয়ে সে শ্রান্তি বোধ করছিল। হাই তুলে সে জিজ্ঞেস করে, 'খেয়ে এসেছো তো দিগুদিদি ?'

দিগম্বরী গালে হাত দিয়ে বলে, 'শোন মেয়ের কথা। ওনার আগে খাবো কি লো ?'

রম্ভা চেয়ে দেখে, একটি আসনের সামনে একটি মাত্র থালা এবং গেলাস। পাশে অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্রগুলি আছে, কিন্তু আর থালাও নেই, গেলাসও নেই। বুঝেও সে না বোঝার ভান করে।

'পাতে খাবে বুঝি কত্তার ?'

দিগম্বরী জবাব দেয় না।

'ভাতে যদি কম পড়ে দিগুদিদি ?'

দিগম্বরী চুপ করে থাকে।

স্বামীই হোক আর যেই হোক একজন আরেকজনের পাতে বসে খাবে এটা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার নয় রম্ভার কাছে, সে নিজেও কতবার কতজনের পাতে খেয়েছে। দিগম্বরীর নীরবতার মানে সে বুঝতে পারল না।

'সোয়ামীর পাতে না খেলে কি হয় দিগুদিদি?'

'পাপ হয়।'

'কেন? ভুক্ লাগলে মানুষ খাবে নি?'

'সোয়ামীর আগে মেয়ে মানুষের ভুক লাগবে কেন লো ছুঁড়ি? আগে সোয়ামী হোক, তখন বুঝবি।'

'চাইনি বাবা!' বলে এত দুঃখেও রম্ভা হেসে ফেলল। তখন ফিরে এল শশাঙ্ক। তার অবস্থা একটু টলমল, যা দেখে জয়ের গর্ব্বে রম্ভার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাবার মুখটা দিগম্বরীর ফসকে গেল।

'আপনি বলে ফিরবেন না?'

'একটা কথা কইতে এয়েছি।'

বলে শশাঙ্ক ইসারা করে দিগম্বরীকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। মিনিট দুই পরে উমাপদ ঘরে ঢোকামাত্র বাইরে থেকে কে যেন শিকল তুলে দিল দরজায়।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম রম্ভা।'

রম্ভা অনড় অচল হয়ে বসে তাকিয়ে রইল।

'একটা উপহার এনেছি তোমার জন্য।'

উমাপদ একটি ঝলমলে সোনার নেকলেশ রম্ভার সামনে মেলে ধরল। বিদ্যুতের আলোয় প্রতি মুহূর্ত্তে শত তীক্ষ্ণ চমক চমকাতে লাগল।

রম্ভার মনে হল, এ লোকটা চোখ আর গয়না দিয়ে খুঁচিয়ে আর আঁচড়িয়েই শুধু কেবল পিরীত করতে জানে আর কোন পথ জানে না।

'নাও? এটা তোমার। তোমায় দিলাম।'

রম্ভা নীরবে মাথা নাড়ল।

যতক্ষণ পারা যায় নিজেকে সে সংযত রেখে চলবে। লাথি যদি মারতে হয় মানুষটাকে মারবে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে। বিশ্রী একটা ফাঁদে যে সে পড়েছে রম্ভা সেটা ভাল ভাবেই টের পাচ্ছিল। গণ্ডগোল এড়িয়ে যাবার ভরসা

তার বিশেষ ছিল না। এ লোকটার লজ্জাসরম নেই, কেলেঙ্কারির ভয়ও বোধ হয় বিশেষ করে না। শশাঙ্ক আর দিগম্বরী এর দলে জুটে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এ এখন ধীরে সুস্থে যা খুশী করে যাবে। সে অবশ্য সহ্য করে যাবে যতক্ষণ পারে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। বন্ধ ঘরে এ যখন তাকে একা পেয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে সে অবস্থার সৃষ্টি হতে যখন গোলমালের ভয়ে চুপ করে থাকলে তার চলবে না! ভয় দেখাবে? উমাপদকে ভয় দেখিয়ে দেখবে কি হয়?

এইসব ভাবছে রম্ভা, শিকল খুলে দিগম্বরী ঘরে ঢুকল। সমস্ত ষড়যন্ত্র সমস্ত কদর্য্যতা হাল্কা হাসিতে শূন্যে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, 'চটলেন ঠাকুরপো, বৌদির তামাসায়?'

উমাপদ বলল, 'না।'

দরজার বাইরে থেকে শশাঙ্ক চাপা গর্জ্জন করে ডাকল, 'শুনছো? বাইরে শুনে যাও।'

দিগম্বরী বলল, 'ঠাকুরপো বসুন।'

শশাঙ্ক আবার ডাকল, 'এই! শুনে যাও বাইরে—শুনে যাও বলছি।'

দিগম্বরী প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কি হল ঠাকুরপো, বসুন না?'

তখন উমাপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। শশাঙ্ক ঘরে ঢুকেই দিগম্বরীর গালে বসিয়ে দিল একটা চড়। রম্ভার দিকে তাকিয়ে দিগম্বরী ধমকে উঠল, 'কি দেখছিস হাঁ করে? পালাতে পারিস নে বোকা হাবা ছুঁড়ি? বেরো—বেরো আমার ঘর থেকে।'

শশাঙ্ক আবার চড় মারে আর বলতে থাকে, 'তোর তাতে কি? তোর তাতে কি এলো গেলো হারামজাদি মাগি?'

দিগম্বরী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'তোমার অকল্যাণ হবে যে গো। এ পাপ তোমার সইবে না, অকল্যাণ হবে তোমার।' নত হয়ে শশাঙ্কের পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আমায় মেরে ফ্যালো, আমি পারব না।'

শশাঙ্কের লাথি খেয়ে সে মেঝেতে একটা গড়ান দিয়ে ওঠে। গায়ে লেগে কাঁসার পিকদানিটা যায় উল্টে। সঞ্চিত পানের পিক মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ায় মনে হয় যেন রক্তারক্তি হয়ে গেল।

শশাঙ্কের চোখ পিট্ পিট্ করে। বিছানায় উঠে উল্টানো পিকদানিটার

দিকে চেয়ে সে গুম্ খেয়ে বসে থাকে। দিগম্বরী মেঝে সাফ করা সুরু করলে তাকে দেখতে দেখতে শশাঙ্কের মনে হয়, বৌটা তো তার মন্দ নয় দেখতে! খাসা গড়ন, কোমল রঙ, মোলায়েম মুখ। রূপসী তো এমন কিছু কম নয় দিগম্বরী! আর ভাল যে কত তার তুলনা হয় না। সাত বছর তাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে—দেবতার মত পূজা করে। তার অকল্যাণ হবে বলে তাকে অন্যায় পর্য্যস্ত করতে দেয় না। সাত বছর ধরে দিগম্বরী—এখন যাকে আশ্চর্য্যরকম সুন্দরী দেখাচ্ছে—দৈনন্দিন অসংখ্য পূজার কথা ভাবতে ভাবতে গর্ব্বে শশাঙ্কের বুক ফুলে ওঠে। কে বলে সে মানুষ নয় মানুষের মত, পুরুষ নয় পুরুষের মত?

কলসীর জলে মেঝে ধুয়ে ঘরের নালা দিয়ে দিগম্বরী জল বার করে দেয়, ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছে ফেলে, দরজা খোলে না। শশাঙ্ক তাকে দেখছে, শশাঙ্ক চিন্তামগ্ন হয়েছে, এ সব সে না তাকিয়েই টের পায়। সে শশাঙ্কের কথার প্রতীক্ষা করে থাকে। সে জানে শশাঙ্কই প্রথমে কথা বলবে।

'লেগেছে নাকি?'

সজল চোখে হাসি মুখে মৃদু উদাসীনতা অভিমান ও অভিযোগ মেশানো সুরে দিগম্বরী জবাব দেয়, 'না।'

'সহরে এসে বিলিতী খাবার সখ হল একটু।'

'দিশি বিলিতী কিছুই ওসব তোমার সয় না। যা খাও না, যা সয় না, কেন খেয়ে কষ্ট পাও?

এই স্নেহের অনুযোগের জবাব শশাঙ্ক দিতে না পারায় দিগম্বরী সুর পালটে বললে, 'ভাত খাবে না এখন?'

শশাঙ্ক খায়। খেতে খেতেই বাঁ হাতে একবার দিগম্বরীর গাল টিপে দেয়। কৃতার্থ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে দিগম্বরী বলে, 'ধেৎ!'

খাওয়া দাওয়া চুকবার পর শোয়া। দিগম্বরীকে বুকে টেনে নিয়ে শশাঙ্ক বলে, 'তুমি বড় ভাল দিগু।'

রোমাঞ্চিত দিগম্বরী গদগদ ভাষায় বলে, 'কাল কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসব তোমার জন্যে। তোমার সময়টা যাতে ভাল হয়।' বলতে বলতে অসহ্য আবেগে দিগম্বরী যেন ক্ষেপে যায়, হু হু করে কেঁদে বলে, 'তোমার জন্যে আমি মরতে পারি, 'জানো? জানো তোমার জন্যে আমি নাখোবার মরতেপারি?'

বাইরে পা দেওয়ামাত্র দিগম্বরীর ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রম্ভা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। রাগে ক্ষোভে বুকটা তার জ্বলে যেতে থাকে। হাত পা থর থর করে কাঁপছে টের পেয়ে এগিয়ে গিয়ে রেলিংটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে। চুপচাপ সব সয়ে যাবার কষ্টটাই এখন তার অসহ্য মনে হয়। উমাপদর চেয়ে রাগটা তার বেশী হয়েছিল শশাঙ্কের উপর। উমাপদ কেঁচো শ্রেণীর অপদার্থ জীব, এখনো রম্ভার মনের গভীর অবজ্ঞা ঠেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মাথা তুলতে পারছিল না। একটা বঁটি এনে শশাঙ্ককে কেটে ফেলবার সাধটা তার প্রায় অদম্য হয়ে উঠেছে।

দিগম্বরী ধমকে ঘর থেকে বার করে না দিলে সে হয়তো গেলাস বাটি ছুঁড়ে শশাঙ্ককে মেরে বসত।

শশাঙ্কের পায়ে ধরে দিগম্বরীর নাকি কান্নার কথা কানে আসতে রম্ভা সেখান থেকে সরে গেল। শশাঙ্ক যখন ফিরে এসেছে, নীচে গিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়তে তার বাধা নেই। রম্ভা দেরী করছিল দম নেবার জন্য। একটু শান্ত হয়ে নীচে না গেলে বীরেশ্বর হয়তো তার মুখ দেখে আর কথা শুনে কিছু সন্দেহ করে বসবে। গায়ের জ্বালায় ঝোঁকের মাথায় নিজেই হয়তো সে বাপের কাছে সব বলে বসবে। সত্য কথা বলতে কি, বীরেশ্বরকে সব জানিয়ে উমাপদকে যত না হোক, শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্য রম্ভার ভিতরটা আকুলি বিকুলি করছিল। বাপের বদমেজাজের জন্য বাপের কাছে কোন কোন কথা গোপন করার প্রয়োজনটাও রম্ভা অল্পকাল হল অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, গোপন করা এখনো অভ্যাস হয় নি।

বারান্দা প্যাসেজ আর সিঁড়িতে বাড়ীটা রম্ভার কাছে গোলকধাঁধার মত ঠেকে। তেতালায় অন্দরের পিছন দিকে পূর্বোত্তর অংশটি নির্জ্জন। দুতিনটি পাক দিয়ে রম্ভা সেখানে পৌঁছল। চাঁদ ছিল বাড়ীর এই পিছন দিকে, সরু বারান্দাটি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একপ্রান্তে লোহার প্যাচানো সিঁড়ি, একেবারে নীচে থেকে উঠে এসে ছাদে চলে গেছে। বারান্দার অন্য প্রান্তটি শেষ হয়েছে একতলা বন্ধ ঘরের দরজায়। নীচের ছোট উঠানটিতে পড়েছে সামনে গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী দু'টির ইঁট বার করা পিছনের দেওয়ালের ছায়া। ভেসে আসছে ঘর ধোয়া আর বাসন মাজার শব্দ। এত জোরে এরা ঝাঁটা চালায়! এত আওয়াজ তোলে বাসনপত্রের! লোকনাথের ছোট ছেলেটির

বাঁশী এখনো বেজে চলেছে। উপরের খোলা ছাদ থেকে ভেসে আসছে লোকনাথের সন্ন্যাসী ভাই সোমনাথের গম্ভীর উঁচুগলার সাধন সঙ্গীত। ঝুমুরিয়ায় এখন গভীর রাত, ঘরে ঘরে সব ঘুমিয়ে আছে। এ বাড়ীতে অর্দ্ধেক মানুষ এখনো জেগে। ঘরে গিয়েছে, হয়তো শুয়েও পড়েছে, কিন্তু চোখে ঘুম নেই!

ঘুমের কথা ভাবতে গিয়ে রম্ভার ধীরে ধীরে ঘুম পায়। গায়ের জ্বালাও জুড়িয়ে আসে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাবে ভাবছে, কোণের অন্ধকার ঘরের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে লোকনাথের বিধবা বোন কালীতারা। সেখানে খানিকটা স্থানে জ্যোৎস্না পড়েনি। প্রতিফলিত স্তিমিত আলোয় একখানা সাদা ধবধবে থান কাপড় যেন ডাইনীর মায়ায় আপনা থেকে ভাঁজ হয়ে মানুষের রূপ নিয়ে রম্ভাকে আঁতকে দিতে চেয়েছে।

'কে ওখানে?' কালীতারা কাছে এগিয়ে আসে।

'আমি রম্ভা।'

'রম্ভা কে? নতুন ঝি? এখানে কি করছিস?'

'ঝি নই। ঝুমুরিয়া থেকে এয়েছি শশাঙ্ক বাবুর সাথে।'

'তা বেশ করেছো। এখানে কি করছ শুনি এত রাতে?'

কি ঝাঁঝ কালীতারারার কথার। যেন কামড়ে দিতে চায়।

'কি আর করব? দাঁড়িয়ে আছি।'

ঝাঁঝালো গলায় ফোঁস করা জবাব দিয়ে ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ রম্ভা গট গট করে লোহার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দু'দিন আগে এই কালীতারাই তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেছিল। কি মিষ্টিই লেগেছিল কথাগুলি রম্ভার কাছে! কি ভালোই লেগেছিল সেদিন মানুষটাকে!

সিঁড়ির শেষে শুধু একজনের সঙ্গে রম্ভার দেখা হল,—ঝাড়ুদার সুখলাল। মাত্র কয়েক ধাপ ওপর উঠেছিল, রম্ভাকে নামতে দেখে নেমে গিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। ঝাড়ুদার সুখলাল আশ্চর্য্যরকম সুপুরুষ। কোন রাজা মহারাজা কিম্বা দেশী বা বিদেশী সম্ভ্রান্তঘরের রূপবান পুরুষের ঔরসে তার জন্ম হয়েছে সে জানে না। জানবার দরকারও নেই। কিছু এসে যায় না। সমাজ তাকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যে স্তরে তার স্থান তার চেয়ে নীচু স্তর তো আর নেই, কারো তাই ক্ষমতাও নেই তাকে নীচে নামায় বা বর্জ্জন করে। আস্তাকুঁড় থেকে আবর্জ্জনাকে বর্জ্জন করার ঠাঁই কই?

পিসী জেগে ছিল। রম্ভা ডাকতেই উঠে দরজা খুলে দিল। বীরেশ্বর ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার ঘুম ভাঙ্গল না। শুয়ে পড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রম্ভাও ঘুমিয়ে পড়ল।

কালীতারা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে। রম্ভার বেয়াদপিতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। সামান্য একটু আঘাত পেলেই নিজের জন্য কালীতারার কান্না পায়। খানিকটা সীমাবদ্ধ আকাশে কিছু ছড়ান সাদা মেঘে জ্যোৎস্নার ছোঁয়াচ দেখতে দেখতে সে যেন হৃদয় জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা ব্যথার অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করে। চোখ দু'টি তার সজল হয়ে আসে।

ওপরে উঠে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সুখলাল সন্তর্পণে কালীতারার অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে কালীতারাকে তন্ময় দেখে বেরিয়ে এসে তার বাহুমূলে আস্তে টোকা দিল।

'আজ যা। যা বলছি।'

কালীতারার গলা আবেগের শ্লেষ্মায় ভেজা। চোখ তার চাঁদমাখা ওপরের চাঁদোয়ায়। মুখ তার ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, যেন ওপর হতে সুধার ধারা মুখে ঝরে পড়বে তারই তৃষ্ণার্ত্ত প্রতীক্ষায়—কাত করা শিশি থেকে রোগীর হাঁ করা মুখে ওষুধ ঝরে পড়ার সেই বিজ্ঞাপনের ছবির মত। সুখলালের দিকে সে চেয়েও দেখল না। সুখলাল চকিতে উধাও হয়ে গেল।

কালীতারা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে চলল তার ভাবাবেগ। সে মাঝবয়সী। তার দেহ মোটা। অন্তহীন অবসরের মৃদু সৌখীন একটানা ঘষায় মনের তার ছালচামড়া উঠে গেছে অনেককাল, তার আত্মদর্শনে কাঁচা মাংসের লালিমা। কোথায় গেলে কি করলে তাঁকে পাওয়া যায় যিনি জীবন-দেবতা—এ ব্যাকুলতা একবার জাগলে আর রক্ষা নেই, কালীতারার নেশা ধরে যায়। এবং নেশা একবার ধরলে চড়্‌চড়, করে নেশা চড়তেই থাকে।

প্রায় যখন আর সইছে না কালীতারার, তখন হঠাৎ সে নীরেনের বাঁশী আর সোমনাথের সাধন সঙ্গীত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। গটগট করে নীরেনের ঘরে গিয়ে হাত থেকে বাঁশীটা ছিনিয়ে নিয়ে গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'গলায় রক্ত উঠে মরবি?'

ভাইপোকে শাসন করে কালীতারা যায় ছাতে

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু, হীরেন, মমতা ও আরিফ কলকাতা পৌছল। আরিফ মমতার বাবার অতিশয় প্রিয় ছিল। মমতার বাপ বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক, নাম আছে। একালের বৈজ্ঞানিকদেরও সেকেলে ঋষিদের মত সমসাময়িকদের সম্পর্কে দারুণ ঈর্ষা থাকলেও ছাত্রের মেধা থাকলে তাকে প্রায় ছেলের মতই ভালবাসতে পারেন। আরিফকে মমতার বাবা প্রায় ছেলের মতই ভালবাসতেন। কিন্তু হঠাৎ ডক্টরেটের চেয়ে দেশের স্বাধীনতাকে বেশী মূল্যবান মনে করে রিসার্চ্চ বন্ধ করে স্বদেশীপনা আরম্ভ করার পর থেকে আরিফকে তিনি বড় অপছন্দ করছেন।

আরিফ বলেছিল, 'দেশে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন। নোবেল প্রাইজ পর্য্যন্ত পেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু আমার দেশের কি লাভ হয়েছে?' মমতার বাবা বলেছিলেন, 'দেশের মর্য্যাদা বেড়েছে—পৃথিবীর লোক জেনেছে আমরা তুচ্ছ নই। আমাদের মাথা আছে।'

আরিফ বলেছিল, 'তার তো কোন প্রমাণ পাই না। পৃথিবীর লোক জানে আমরা অসভ্য—জংলী। ইংরেজ আমাদের সভ্য করেছে। আমরা এমন অসভ্য যে ধর্ম্ম নিয়ে হানাহানি করি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সামলে চলেছে। আমার কি মনে হয় জানেন? আমরা যখন আমাদের দু'চারজন বড় বড় লোককে নিয়ে গৌরব করি—সমস্ত জগৎ হাসে! আমাদের গৌরব করার যদি কিছু সাজে সেটা শুধু গান্ধী, জিন্না, জহরলালের দৌলতে—অবিশ্যি আরও নাম করা যায়। ওঁরা কেউ বৈজ্ঞানিক নন।'

মমতার বাবা বলেছিলেন, 'আরিফ, তুমি ভুল করেছ! দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব সকলের তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে সবাই কি পলিটিক্স্ নিয়ে মেতে থাকবে? দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য চুলোয় যাবে? স্কুল কলেজ উঠে যাবে?'

মমতা মাঝখান থেকে মন্তব্য করেছিল, 'আপনি সত্যি ভুল করেছেন। আপনার ব্রিলিয়াণ্ট ফিউচার—'

আরিফ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'ব্রিলিয়াণ্ট? ডক্টরেক্ট ডিগ্রি পাব, একটা প্রফেসারি পাব, ছেলে খেলার একটা ল্যাবরেটারীতে কাজ পাব। হয়তো

ভিটামিন সম্পর্কে মস্ত একটা আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব। আমার দেশের কোটি কোটি কঙ্কালের গায়ে এক আউন্স মাংস বাড়বে?'

মমতার প্রতিরোধ শুনেও তার বাবা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি মমতার মত তর্ক করতে শিখেছ আরিফ।' আরিফ মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় নি। তার দৃষ্টি দেখে মমতার মনে হয়েছিল তার অজান্তে সে ফকির হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় আগামী দিনের এক জ্ঞানের রাজ্য—সম্রাটের চেয়ে বড় জ্ঞানীর গৌরব—ত্যাগ করার ফকিরী নিয়েছে আরিফ।

পরে আরিফ তাকে বলেছিল, 'উনি ভেবেছেন তুমি আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছ মমতা।'

মমতা গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'তাকি সত্যি নয়?'

আরিফ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল।—'বোধ হয় সত্যি, বোধ হয় সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি বৈকি, নিশ্চয় সত্যি।' তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলেছিল, 'সায়ান্টিষ্ট হয়ে তাই বা বলি কি করে! আমার কোন দোষ নেই—আমার বেলা তুমি শুধু ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করেছো। মাথা তুমি বিগড়ে দিচ্ছ হীরেন বাবুর।'

মমতা তখন আরিফের দু'কাঁধে দু'হাত রেখে বলেছিল, 'আরিফ!

'বেগম সাহেব?'

'তোমার একটা বিশ্রী বদ্‌খত ধারণা আছে। আমি জানি আছে।'

'কি ধারণা?'

'আমি তোমায় ভালোবাসি কিন্তু তুমি মুসলিম বলে—'

'ভালবাসো না?'

তা নয়। তোমার ধারণার কথা বলছি। তুমি ভাবছ, তোমায় আমি ভালবাসি। কিন্তু তুমি মুসলিম বলে তোমায় বিয়ে করতে রাজী নই।'

'বিয়ে? বিয়ের কথা কোনদিন বলি নি।'

'তাইত্তো বলছি।'

মেধাবী উচ্চাভিলাষী আরিফের যে কি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে মমতা সেটা টের পেয়েছে পাটনা কনফারেন্সে তার বক্তৃতা শুনে। হীরেন বক্তৃতা দিয়ে বেশ হাততালি পেয়েছিল। মমতা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে হীরেন এমন

ঘষামাজা যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতে পারে। গর্ব্বের তার সীমা থাকে নি। সমসাময়িক মানব সভ্যতার পটভূমিকায় ভারতের সমস্যাগুলির এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ সে খুব কম শুনেছে। আরিফের বক্তৃতা হাততালির তারিফ পেল না। সভা যেন চাবুক খেয়ে সম্বিত পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাবরাজ্য থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এল। পুলিশ রিপোর্টাররা এতক্ষণ অনেকটা গা-ছাড়া ভাবে টুকছিল, তারাও চমকে উঠে জোরে পেন্সিল চেপে ধরল। প্রথমে মমতার মনে হয়েছিল আরিফ বড় তীব্র বড় ঝাঁঝালো কথা বলছে। মাথা গরম হয়ে উঠছে আরিফের। তারপর সে বুঝতে পারল, আরিফ উত্তেজিত হয়নি, মার্জ্জিত সুশ্রাব্য সাজানো গোছানো ভাষার বদলে সোজা স্পষ্ট কাটা কাটা বলছে বলেই এত রূঢ় আর তীব্র শোনাচ্ছে তার কথা।

সেই থেকে সভার সুর যেন বদলে গেল। পরে যাঁরা বললেন বক্তৃতা অনেকটা মাটির পৃথিবী ঘেঁষে ঘেঁষেই চলতে লাগল। সভার শেষে মমতা দু'হাতে আরিফের হাত চেপে ধরল।

'আরিফ, আর দু'একবার এ রকম বক্তৃতা শোনালে আমি তোমায় ভালবেসে ফেলব।'

বলতে বলতে সে তাকিয়ে দেখল, হীরেনের মুখখানা ঈর্ষায় একটু লম্বা হয়ে গেল।

কাজেই খানিক পরে মমতা তাকে বলল, 'তুমিও সুন্দর বলেছ।'

কৃষ্ণেন্দু কাছে ছিল। সে একটু হাসল।

মমতা তাকে বলল, 'তুমি কিছুই বলতে পার না কেষ্টদা। ঠিক যেন অফিসিয়াল রিপোর্ট পড়ছ মনে হয়, একটানা একঘেয়ে। এরা সব নতুন, তুমি পাকা লোক হয়েও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পার না। লোকে তোমার কথা শোনে কেন তাই ভাবি।'

'লোকের কথা বাদ দাও। তুমি শোন কেন?'

'তোমার মনে ব্যথা লাগবে বলে।'

কথা বলতে বলতে দুজনে কয়েক হাত তফাতে সরে গিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু মমতার বাহুতে আঙুল দিয়ে আঘাত করে বলল, 'মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড় কষ্ট হয়, না? হীরেন দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না?

না, ও মানুষ নয় ?'

'তাই ভাবছি।'

'কতকাল ভাববে ? ভাবতে ভাবতে তো বছর কেটে গেল।'

'তুমি কি ওর হয়ে ঘটকালি করছ কেষ্টদা ?'

'তোমার কাছে ঘটকালি ? তোমায় চিনিনে আমি ? বেচারার যদি বা কোন চান্স থেকে থাকে, কেউ বলতে এলে তুমি বেঁকে বসবে না ? বন্ধুর হয়ে একটু ওকালতি করছি বলতে পার। একটু অন্যায় হচ্ছে মমতা। এবার ওকে তোমার রেহাই দেওয়া উচিত।'

'তোমার হুকুমে ?'

রাগ হলে মমতা মুখ উঁচু করে একটু সামনে হেলে দাঁড়ায়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে গাল দিয়ে কলহ করতে দাঁড়াবার মেয়েলী ভঙ্গিতে।

কৃষ্ণেন্দুর মুখে জয়ের ছাপ দেখে ঠোঁট কামড়ে মমতা শরীর আলগা করে দিল। বলল, 'সম্পত্তি জ্ঞানটি বেশ টনটনে ভাবছ তো ?'

কৃষ্ণেন্দু সায় দিয়ে বলল, 'তা তোমার একটু অহঙ্কার আছে বৈকি !'

'সম্পত্তিজ্ঞান আর অহঙ্কার বুঝি এক ?'

'কিছু না থাকলে কি নিয়ে অহঙ্কার হবে ? হীরেন ফসকে যেতে পারে জানলে কবে তুমি মন স্থির করে ফেলতে।'

'তা ঠিক। বলতাম ফসকে যাও।'

'কিন্তু ওদিকে তুমি নিশ্চিন্ত, তাই ওর কথা না ভেবে কেবল নিজের হিসেব করছ। ছেড়ে দিতে সাধ নেই, ধরা দিতেও ভরসা পাচ্ছ না। হীরেনকে জানতে বুঝতে তোমার বাকী নেই—থাকা উচিত নয়। এতকাল মেলামেশা করেও ওকে যদি না বুঝে থাকো, কোনদিন বুঝতে পারবে না। আসল কথা তা নয় মমতা। তোমার সমস্যা ভিন্ন। তুমি বেশ ভাল করেই জানো তোমার এখানকার জীবনকে কতটুকু কাটছাঁট করতে হবে, কতটুকু কম্প্রোমাইজ, কতটুকু ত্যাগ দরকার হবে। এ দাম দেবে কিনা, যা পাবে এ দাম দিয়ে তা কেনা উচিত কিনা সেটাই তুমি ঠিক করতে পারছ না। ভেবে পাচ্ছ না ঠকবে না জিতবে।'

কথা কইতে কইতে তারা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে এসে পড়েছিল। মমতা জোরে নিশ্বাস টেনে মুখোমুখি হয়ে বলল, 'তুমি যে আমায় সোসাইটি বাজারের

মেয়ে বানিয়ে দিলে কেষ্টদা! মস্ত বড় লোকের ছেলে বলে ওকে খেলিয়ে তুলছি এটুকু বলতে ছাড়লে কেন?'

কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেলল, 'খেলাবার দরকার ফুরিয়ে যাবার পরেও ওকে খেলাচ্ছ বলে।'

মমতা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার হৃদয়টা তো উড়িয়ে দিলে। আমি শুধু হিসেব করি!'

কৃষ্ণেন্দু হাসি মুখেই বলল, 'তোমায় গাল দিই নি ভাই। হৃদয় উড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক বরং বলেছি তোমার জোরালো একটা হৃদয় আছে। কোন জমিতে বন্যা আসে জানো তো? নীচু সেঁতসেঁতে জমিতে। প্রেমের বন্যা আসাটা হৃদয়ের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। সে বন্যায় ভেসে যাওয়া তো রীতিমত ছ্যাবলামি করা। হিসেব করবে না? এত বড় একটা ব্যাপারে? একেবারে খাতাপত্র নিয়ে বসে হিসেব করবে। তাছাড়া এতো ফ্রি লভের কথা নয়, বিয়ের ব্যাপার। তাও আবার হিন্দুমতে। আমি বলতে চাই, হিসেব হয়ে গেছে, এবার ইতস্তত: না করে মন স্থির করে ফেল।'

কৃষ্ণেন্দু ফিরবার জন্য পা বাড়াতে মমতা তার জামা ধরে আটকে রাখল। বলল, 'তুমি কিছুই বোঝ নি কেষ্টদা। ওসব হিসেব বহুদিন চুকে গেছে। আমার আসল সমস্যা ছিল ভিন্ন। আমার ভাবনা হল, ওকে আমার সঙ্গে কাজে নামাতে পারব কি না। আমার সঙ্গে মানে, আমাদের কাজে। আমি চাষী মজুরদের জন্য খাটব আর আমার স্বামী মিলের মালিক হয়ে তাদের রক্ত শুষবেন, তাতো হয় না।'

'তুমি কি চাও বাপের সম্পত্তি ত্যাগ করে এসে হীরেন আমাদের সঙ্গে কাজ করবে?'

'তা কেন? আমরা কি মিল তুলে দিতে চাইছি? ও আদর্শ কারখানা করবে, মজুরদের অধিকার স্বীকার করে নেবে, সংগঠন গড়ে তুলতে কাজ করবে, আন্দোলন চালাবে—হাসছো নাকি কেষ্টদা?'

'না ভাই, হাসি নি।'

কৃষ্ণেন্দু একটা সিগারেট ধরাল। মমতা তার মন্তব্য শুনবার প্রত্যাশা করছে টের পেয়েও চুপ করে রইল।

খানিক অপেক্ষা করে মমতা বলল, 'শুনবে তবে? আমি মন এক রকম

ঠিক করে ফেলেছি। ওর মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে কেষ্টদা, একটা বিদ্রোহের ভাব আছে, তুমিও বোধ হয় যার পরিচয় পাও নি। দেশের জন্য সত্যিকার দরদ আছে, আমাদের কাজে সহানুভূতি আছে। আমি জানি, ওকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারব।'

কৃষ্ণেন্দু তর্ক না করে সংক্ষেপে বলল, 'পারবে না।'

মমতা মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'ও আমার জন্য সব করবে।'

আত্মবিশ্বাসের জ্যোতিতে মমতার টানা চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে থাকে। তার মুখ উজ্জ্বল দেখায়। কৃষ্ণেন্দুর মনে হয়, মমতাকে এত সুন্দর সে কখনো দেখেনি। বেতনাদিতে তার বাপের মাসিক আয় হাজার দেড়েক টাকা কিন্তু মমতা কখনো সাধারণ মিলের শাড়ী ছাড়া দামী কাপড় পরে না। সুন্দরী মেয়েকেও যে সাজসজ্জা রূপ-প্রসাধনের অভাবে দর্শকের অনভ্যস্ত চোখে তেমন সুন্দরী দেখায় না, মমতা যেন তার প্রমাণের মত। একটু দ্বিধা করে কৃষ্ণেন্দু অন্তরের প্রতিবাদ জোর করে অবহেলা করে বলে, 'মমতা, জগতে এমন পুরুষ নেই যে প্রেমের জন্য নিজেকে বদলাতে পারে। একটি মেয়েকে ভালবেসে তার জন্য মানুষ হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু নতুন মানুষ, ভিন্ন মানুষ হতে পারে না। পুরুষটির মধ্যে যা আছে তাকেই মেয়েটি বিকাশ করতে পারে, পরিণত করতে পারে, নতুন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ থাকলে আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু স্ফুলিঙ্গটি থাকা চাই। এইখানে প্রেমের শক্তির সীমা। হীরেন তোমায় ভালবাসে, তুমি মজুরদের ভালবাসো। শুধু এইজন্য মজুরদের ভালবাসার ক্ষমতা হীরেনের কোনদিন হবে না। হীরেনের মধ্যে অনেক কিছু আছে, ওকে দিয়ে তুমি অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারবে সত্যি, কিন্তু তুমি যে সব অনেক কিছুর কল্পনা করছ তা কল্পনাই থেকে যাবে।'

মমতা চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, 'দেখবে? প্রমাণ চাও? কাঠের কারখানার হাঙ্গামার ব্যাপারটাতেই প্রমাণ দেব চল।'

'কি প্রমাণ দেবে?'

'তুমি কিছু কোরো না। আমি হীরেনকে দিয়ে মিস্ত্রীরা যা চায় তার চেয়ে বেশী পাইয়ে দেব।'

'তাতে কি প্রমাণ হবে?'

'দেখো। দেখে নিও।'

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে গেল। মমতা এখন বুঝেও বুঝবে না। সে বুঝতে চায় না। আত্মবিরোধের আপোষ মীমাংসার শর্ত্ত নিজে স্থির করে নিজেই সে গ্রহণ করেছে। এতদিনের সঞ্চিত চাপা আবেগ মুক্তির পথ পাবে। উৎসাহে উত্তেজনায় মমতা হঠাৎ টগবগিয়ে উঠেছে।

এদিকে রামপালের অস্থায়ী নেতৃত্ব ও দায়িত্বের অবসান ঘটে গেল। শ্রীপতির ঈর্ষা ও আশঙ্কার ফলে নয়, লোকনাথের সঙ্গে রামপালের আলোচনার ব্যর্থতায়। এসব ব্যাপারে রামপাল যে নেহাৎ কাঁচা, নেহাৎ ছেলেমানুষ এটা টের পেয়ে সকলে আস্থা হারিয়েছে। রাগ কেউ করেনি অনেকে বরং তার সরলতা বনাম বোকামিতে বেশ খানিকটা কৌতুক বোধ করেছে।

রামপালকে সকলে বারণ করে দিয়েছে সে যেন আর লোকনাথের কাছে দরবার করতে না যায়। অপমানে অভিমানে মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠেছে রামপালের। এ নিষ্ঠুর অবিচারের মানে সে বুঝতে পারে নি। একেবারে সুরু করা থেকে, সকলের হাতে উমাপদর খুন হয়ে যাওয়া নিবারণ করা থেকে, এ ব্যাপারটা সে নিয়ন্ত্রণ করে আসেনি এ পর্য্যন্ত? একমাত্র সেই কি হাজতে যায় নি এ ব্যাপারে? কেন তবে তাকে বাদ দেওয়া হবে? যে কাজ সে আরম্ভ করেছে কেন তা শেষ করতে দেওয়া হবে না? রামপাল অনুরোধ জানিয়েছে, আরেকবার তাকে সুযোগ দেওয়া হোক। কেউ কানে তোলে নি। রামপাল উত্তেজিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে লোকনাথকে পটাতে না পারলে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে উমাপদকে মেরে আধমরা করে দশ বছর জেল খাটবে। তার আস্ফালনে কেউ বিশ্বাস করে নি, অনেকে টিটকারি দিয়েছে। শ্রীপতি তাকে জানিয়ে দিয়েছে, পরদিন কৃষ্ণেন্দু আসছে, যা করবার সেই করবে, রামপালের আর বাহাদুরী করবার দরকার নেই। সে কেরামতি দেখিয়েছে অনেক, আর না দেখালেও চলবে। তখন রামপাল ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হয়ে চুপ করে গেছে। খানিক পরে নীরবে উঠে চলে গেছে আসর ছেড়ে।

শ্রীপতি ও গণি কৃষ্ণেন্দুদের আনতে স্টেশনে এসেছিল। দিনটা সুরু হয়েছে বাদলায়। কাঠগোলার কাছে মিস্ত্রী ও করাতিরা অপেক্ষা করছিল। স্টেশন থেকে সেখানে যাবার পথে ট্যাক্সিতে শ্রীপতি সব জানাল। তাকে প্রশ্ন করল মমতা। কৃষ্ণেন্দু প্রায় আগাগোড়াই নির্ব্বিকার ভাবে শুনে গেল। মমতা

আগেই তাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে দিয়েছিল। রামপালের সম্বন্ধে সে কেবল কয়েকটি প্রশ্ন করল। উমাপদকে রামপাল সকলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল শুনে সে যেন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছে মনে হল। শ্রীপতি এই তুচ্ছ ঘটনাটি উল্লেখ করাও দরকার মনে করে নি, কিন্তু কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল: 'নাথুকে মারবার পর সকলে কি করল? চুপ করে রইল?

'সবাই ক্ষেপে গিয়েছিল। তাইতো বলছি কেষ্টবাবু, নাথুর অপমান সবাই গা পেতে নিয়েছে।'

'তখন কেউ কিছু করে নি? নাথুকে মারবার সময়?'

গণি উৎসাহিত হয়ে বলল, 'করেনি? সবাই তেড়ে গিয়েছিল মারতে। উমাবাবু খুন হয়ে যেতেন।'

শ্রীপতি অনুযোগের স্বরে বলল, 'রামপাল কিছু করতে দিলে না কেষ্টবাবু। সবাইকে ঠেকিয়ে রাখল। ওর জন্যে নইলে কি পুলিশ আনতে পারে? উমাবাবু উদিকে পুলিশকে ফোন করেছেন, ও এসে আমাদের ভাঁওতা দিয়ে বসিয়ে রাখলো চুপচাপ—উমাবাবু আসছেন, উমাবাবু মাপ চাইবেন, উমাবাবু নাথুকে একশো টাকা দেবেন, আরও কত কি!'

কৃষ্ণেন্দুর ভ্রুকুটি দেখে গণি আরেকটু ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলল, 'রামপাল নিজে ভাঁওতা দেয় নি। ও লোক ভাল, বুদ্ধি একটু কম। উমাবাবু যা বলে দিয়েছেন, ও এসে আমাদের তাই বলেছে। ওর দোষ নেই।'

শ্রীপতি খোঁচা দিয়ে বলল, 'দোষ নেই কিসের? ফফরদালালি করতে আসে কেন যেচে?'

কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করল, 'রামপাল সবাইকে ঠেকাল কেন গণি? উমাবাবুকে খাতির করে?'

গণি জবাব দিল, 'না, খুন হয়ে যাবেন বলে। খুন হলে পুলিশ আসবে, দু'চারজন ফাঁসিতে লটকাবে—কাজটা ঠিক করেছিল।'

'ওর বুদ্ধি কম বলছ কেন তবে?' মন্তব্য করে কৃষ্ণেন্দু তখনকার মত চুপ করে গেল। কিন্তু পরে আবার প্রশ্ন করল, 'পুলিশ শুধু রামপালকে অ্যারেষ্ট করল কেন?'

গণি বলল, 'বোকা তো, সবাই মার খেয়ে পালাল, ও ঠায় বসে রইল। উমাবাবু ওকে ধরিয়ে দিলেন।'

মমতা হীরেনের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'শুনছ? রামপাল ওর প্রাণ বাঁচাল, রামপালকে ভুলিয়ে উনি পুলিশ ডাকলেন, শেষে রামপালকেই ধরিয়ে দিলেন। এর একটা বিহিত করা চাই। তুমি যদি কিছু না কর—'

একবার তার চোখে চোখ মিলিয়ে বাইরে তাকিয়ে হীরেন কাঠ হয়ে বসে রইল। আরিফ স্টেশন থেকেই বাড়ী চলে গেছে। একটা ট্যাক্সিতে তারা গাদা হয়ে বসেছে—শ্রীপতি ও গণির সঙ্গে। গণি বসেছে মমতার পাশে, গা-ঘেঁষে, চেপে। তার দোষ নেই। সে নিরুপায়। মমতা ঠেলে সরে এসে শেষ প্রান্তে একটু স্থান করে গণিকে ডেকে সেখানে নিজের পাশে বসিয়েছে। মমতার কোমল দেহের কতখানি অংশের কত নিবিড় স্পর্শ গণি পাচ্ছে এ পাশে বসে নিজের একটানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকেই হীরেন তা অনুমান করতে পারছিল। জেদি একগুঁয়ে শক্ত মমতার শরীরটা যে এত নরম এতদিন হীরেন ভাবতেও পারে নি, এতদিন সে ছিল প্রাণের প্রাচুর্য্যে স্বতোৎসারিত সদা উৎফুল্ল সুন্দর একটি অনিবার্য্য তীব্র আকর্ষণ, মর্ম্মান্তিক রূপে কাম্য।

ফাঁদে যেন আটকা পড়েছে মনে হয় হীরেনের। তাকে বেঁধে কয়েকটা বিপরীত শক্তি একসঙ্গে বিভিন্ন দিকে টানছে। শ্রীপতি ও গণি এমন ভাবে কথা বলছে, সে যেন উপস্থিত নেই। মমতা ও কৃষ্ণেন্দু সায় দিয়ে যাচ্ছে। কাঠের কারখানা যেন তার বাপের নয়, উমাপদ যেন তার ভাই নয়, তার বাপ ভাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি ও গণির যা খুসী বলে যাওয়া যেন মোটেই অসঙ্গত নয়! প্রথমে একান্তে ওদের কাছে সব শুনে নিয়ে মমতা তাকে বলতে পারত, কৃষ্ণেন্দু বলতে পারত। তার সামনে ওরা কি বলে এ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে?

কৃষ্ণেন্দুকে সিগারেট ধরাতে দেশলাই দিতে গিয়ে গণি কি মমতার বুকে কনুই ঠেকাবে?

'এই রোখকে।'

ফুটপাথ ঘেঁসে ট্যাক্সি দাঁড়াল, আইন বাঁচানো পাতলা কাপড়ে ঢাকা অকথ্য যৌবনের ফোলা একটি ন্যাংটো স্ত্রীলোকের বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো পুরুষত্বহানির অব্যর্থ ওষুধ বিক্রী এক দোকানের সামনে! হীরেন লক্ষ্য করল, কুঁজো হয়ে বসে টাকওলা চোখা নাক ঘুমন্ত শকুনির মত দোকানদারটি মোটর থামার শব্দে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আশার ঔৎসুক্যে সিধা হয়ে বসেছে। হীরেনের ইচ্ছা হল, হাসে। এগার বছর আগে কলেজে সেকেণ্ড

ইয়ারে পড়বার সময় একদিন এমনি ভাবে, হয়ত প্রায় এমনি সময়ে, কলেজ যাবার পথে এই খানে গাড়ী থামিয়ে এই লোকটির কাছ থেকে বশীকরণ কবচ কিনেছিল। ক্লাশের একটি মেয়েকে বশ করতে চেয়ে। মেয়েটির নাম আজ মনে নেই। চেহারাও কল্পনা হয়ে গেছে। শুধু মনে আছে তার সর্ব্বাঙ্গের স্পষ্ট উদ্ধত আহ্বান, হাসি কথা বিতরণের প্রাণঘাতী কার্পণ্য আর অন্তহীন অবহেলা। কবচ ধারণ করে আলাপ জমাতে গিয়ে সে পাত্তা পায় নি। তারপর একদিন, অত্যন্ত হঠাৎ একদিন তাকে গাড়ীতে উঠতে দেখে মেয়েটি এসে বলেছিল, আপনার নিজের গাড়ী? বাড়ী পৌছে দেবেন আমায়? তৃতীয় দিন বাড়ী পৌছে দেবার পথে সে হঠাৎ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাঁধে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিয়েছিল। বশীকরণ কবচের এই অব্যর্থ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে সে সেইদিন সন্ধ্যায় দশটাকার নোট ভরা খাম এই মহাপুরুষ দোকানীর হাতে দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে আর কোন দিন গাড়ীতে তোলে নি। তিন দিন তার কাছে অর্থহীন বাজে কৈফিয়ৎ শোনার পর মেয়েটি মুখ গম্ভীর করে তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু সে ঘটনা জানে।

'মনে আছে কেষ্ট? সেই বশীকরণ কবচ?

তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে সে কথা ঘুরিয়ে নিল। বলল যে শ্রীপতি আর গণি নেমে গিয়ে কাঠের কারখানায় চলে যাক, সকলকে কাজে লাগতে বলুক। আজকেই মীমাংসা হয়ে যাবে—। 'তুমি বলেছিলে না বিহিত করতে হবে? বাড়ী গিয়ে এখুনি বিহিত করছি।'

মমতা খুসী হয়ে বলল, 'সব কথা শোনা হল না কিন্তু।'

হীরেন প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'আর শুনতে হবে না।'

কিছু দূরে খালের ব্রিজ দেখা যাচ্ছিল। ওখানে মোড় ঘুরে খাল পাড়ের রাস্তা ধরে খানিক এগোলেই লোকনাথের কাঠের কারখানা।

কৃষ্ণেন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'একেবারে ঘুরে গেলে হত না পাঁচ মিনিটের জন্যে, সবাই অপেক্ষা করছে।'

হীরেন সংক্ষেপে বলল, 'দরকার নেই।'

লোকনাথ তার সদর বৈঠকখানায় তিনজনকে অভ্যর্থনা করলেন। মমতাকে

বললেন, 'এসো মা বোসো।' কৃষ্ণেন্দুকে বললেন, 'কেষ্টবাবু যে!' দমক মারা ভঙ্গিতে মুখ তুলে ছেলের দিকে একনজর তাকিয়ে সামনের দেয়ালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া অথবা তার পাশে সম্রাট এডওয়ার্ডকে সম্বোধন করে বললেন, 'হঠাৎ কোথায় চলে যাও, বলেও যাও না একবার যাবার আগে।'

'বাড়ীতে সবাই জানে। আপনাকে বলেনি?'

'আঁ?' লোকনাথ গড়গড়ার নলে একটি মাত্র টান দিলেন, হ্যাঁ, বলেছে বৈকি। চলে যাবার পরে শুনলাম। আমায় জানিয়ে যাবার কথা বলছিলাম। দরকারী কথা থাকে, পরামর্শ থাকে। বড় হয়েছ, দায়িত্ব গ্রহণ করছ, সব তো বুঝে শুনে নিতে হবে তোমাকেই। আমি আর কদিন?' আরেকবার নলে টান দিলেন, 'যাক গে।'

ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, উদার, মহৎ, আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ, কুটিল, সাবধানী ও হিংস্র। এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির সমবেত ওজন একা আয়ত্ত করে যেন লোকনাথ ভারিক্কি হয়েছেন। আধহাত উঁচু চৌকীতে বিছানো ফরাসের এককোণে হীরেনকে মাথা নীচু করে সন্তর্পণে বসতে দেখে মমতার বুকটা একবার ধড়াস্ করে ওঠে, মনে হয় কোন আশা নেই, সব ভুল। ঘরের সাজসজ্জা ও আসবাব পত্র সমস্তই যেন লোকনাথের পক্ষ নিয়ে নিঃশব্দ মাহাত্ম্যে তাদের দমন করতে চায়। প্রকাণ্ড ঘরে বসবার ব্যবস্থা দু'রকম। ভিতরের দিকের দেওয়াল ছুঁয়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত মস্ত ফরাস। ঘরের মাঝামাঝি বিরাট এক টেবিল, তার চওড়া প্রান্তের একদিকে লোকনাথের নিজস্ব গদি আঁটা একটি এবং বাকী তিনদিকে গদিহীন গোটা দশেক চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে তিনটি সোফা। আসবাবগুলি সব লোকনাথের কারখানায় তৈরী কিন্তু আশ্চর্য্য রকম সাদাসিধে, মোটা এবং ভারী।

মমতার আশঙ্কা বাতিল হয়ে যেতে কিন্তু বেশী দেরী হল না। সে যে প্রমাণ দেখাবে বলেছিল। আসল কথা আরম্ভ হবার দশ মিনিটের মধ্যে সে প্রমাণ সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে বসল। হীরেন ও লোকনাথের মধ্যে এমন সংঘর্ষ বাধল যে মনে হল বাপ ব্যাটায় বুঝি চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাইরে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার সার্সিতে আওয়াজ হচ্ছে চিড়ে ভাজার। লোকনাথ ফরাসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল টানছিলেন, গরম হতে হতে নিজের অজান্তেই সরতে সরতে কখন ফরাসের

প্রান্তে এসে পা নামিয়ে বসেছেন। হাতের সঙ্গে গড়গড়ার নলটা কাঁপছিল, হঠাৎ সেটা তিনি ছুড়ে দিলেন। দু'হাতে ফরাসের প্রান্ত চেপে ধরে মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। মেঝে মাত্র আধহাত নীচে। হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে রইল। হাতে ভর দিয়ে তিনি যেন দোল খাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, দোল খেতে খেতে ডিগবাজী খাবার কসরৎ দেখাবেন, কুর্ত্তা গায়ে সরুপাড় কোঁচানো ধুতি পরা অভিনব এক অভিজাত অ্যামেচার ম্যাজিকওয়ালার মত হঠাৎ-জাগা খেয়াল-খুসীতে একটু তামাসা করবেন। শুধু বসবার ভঙ্গিতেই হঠাৎ তিনি যেন ওজন হালকা হয়ে গেলেন! এটা দেখবার চোখ অবশ্য ছিল শুধু কৃষ্ণেন্দুর। সে একটু নিশ্চিন্ত হল।

লোকনাথ কথাও বললেন ভিন্ন সুরে। অত্যন্ত গম্ভীর ও মর্ম্মাহত ভঙ্গিতে। 'তুমি ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে আমায় কাবু করতে চাও?'

'না—ভয় দেখানো হুমকি দেবার কোন কথা নেই। একটা বিশ্রী অন্যায় হয়েছে, আমি তার প্রতিকার করতে চাই। আমি আপনার বড় ছেলে, আমার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, আমার নিশ্চয় এটুকু অধিকার আছে। আপনি যদি তা স্বীকার না করেন, বিদায় হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় কি আছে বলুন?'

লোকনাথ হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়ায় হীরেনও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। একটু থেমে সে বুদ্ধিমানের মত যোগ দিল, 'উমাপদ সোজাসুজি কাউকে মেরেছে শুনলে আমার এত রাগ হত না বাবা। একজনকে মেরে সবাইকে ধাপ্পা দিয়ে ফের আবার পুলিশ আনিয়ে সবাইকে সে মার খাইয়েছে। কি বীভৎস নোংরা কাণ্ড!'

'নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওরকম অবস্থায় পড়লে তুমিও পুলিশ ডাকতে।'

'না। পুলিশ না ডেকে গলায় দড়ি দিতাম। কিন্তু এও জানবেন, ওরকম অবস্থাতে উমাপদরাই পড়ে, আমি কখনও পড়তাম না। একজনকে কেন, আমি আপনার যে কোন কারখানায় গিয়ে অন্যায় করে যদি দশজনকেও জখম করি, অপমান করি, তারা আমার কাছেই নালিশ করবে, আমাকে মারতে আসবে না।'

মমতা সগর্বে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকাল। কৃষ্ণেন্দু পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ চাঁচছিল, মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে মাথাটা বার কয়েক অর্থহীন অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতে নেড়ে দিল।

লোকনাথ বললেন, 'যাই হোক, অন্যায় করে থাকলেও উমাকে তো আর চাবুক মেরে শাসন করা যাবে না। তুমি কি নিয়ে তর্কাতর্কি রাগারাগি করছ বুঝতে পারছি না হীরেন। আমি তো অনেক আগেই ঠিক করেছি উমা আর ওখানে যাবে না।'

তিনজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। এতক্ষণ লড়ায়ের পর লোকনাথ এত সহজে লড়ায়ের আসল কারণটাই এমন আচমকা উড়িয়ে দিতে পারেন, এ যেন তাদের বিশ্বাস হতে চাইল না।

লোকনাথ নির্বিকার। বলে চললেন, 'আমি তো পাগল নই। সব ব্যাটা ওখানে এমন ধারা ক্ষেপে রয়েছে, উমাকে আমি যেতে দেব কোন ভরসায়? মাথায় যদি একজন লাঠিই মেরে বসে হঠাৎ?' পিছু হটে গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল তুলে নিয়ে লোকনাথ প্রায় চোখ বুজে ফেললেন।

হীরেন বলল, 'আরও দুটো দাবী আছে। যাদের চোট লেগেছে তারা একমাসের মাইনে কম্পেনশেসান পাবে। আর—'

লোকনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'ওতে আমায় টানো কেন? তুমি অর্ডার দিলেই তো হবে। যাকে যা দেবার তুমিই দিও।'

'উমাপদকে মাপ চাইতে হবে।'

লোকনাথ ধীরে ধীরে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। মুখের চেহারায় স্পষ্ট সঙ্কেত দেখা গেল ক্রোধে তিনি এইবার ফেটে যাবেন। কিন্তু ফেটে তিনি গেলেন না। হীরেনের বদলে কৃষ্ণেন্দুকে উদ্দেশ করে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কেষ্টবাবু, একি পাগলামি আপনাদের? উমা আর কারখানায় যাবে না স্বীকার করলাম, তবু তাকে মাপ চাইতে হবে? আপনি ওদের জানেন, আপনাকেই বলি। যে কারণেই আমি উমাকে কারখানায় যেতে না দিই, ওরা জানবে ওরাই তাকে সরিয়েছে। এতে ওদের পায়া কত ভারী হয়ে যাবে বলুন তো?'

কৃষ্ণেন্দু মৃদুস্বরে বলল, 'পায়া ভারী হবে না, তবে ভবিষ্যতে এরকম অন্যায় আরেকটু কম সহ্য করবার সাহস জন্মাবে।'

লোকনাথ বললেন, 'তার মানেই তাই। মাপটাপ উমা চাইবে না।

আপনারা যদি বাড়াবাড়ি করেন, আমি পুলিশ পাহারা বসিয়ে উমাকে কারখানায় পাঠাব।'

কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে বলল, 'না দত্ত মহাশয়, উমাবাবুকে মাপ চাইতে হবে না। এ ক'দিন কারখানায় যান নি, আর যখন যাবেনও না, মাপ চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কি বল মমতা?'

মমতা সায় দিয়ে বলল, 'তা ঠিক।'

হীরেন কি বলতে গিয়ে চুপ করে বসে রইল, ঘরে এসে প্রথমে যেমন শিথিল ভঙ্গিতে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসেছিল, তেমনি ভাবে। লোকনাথ উঠে অন্দরে যাওয়ামাত্র সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মমতা বা কৃষ্ণেন্দু কারো সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

'এ আবার কি?' কৃষ্ণেন্দু শুধোল।

মমতা হাসি মুখে বলল, 'কিছু না।'

বাড়ীর জনসাতেক মানুষকে এড়িয়ে দ্রুতপদে গিয়ে মমতা হীরেনের নাগাল ধরল তার ঘরে।

খানিক পরে হীরেন এসেছে শুনে কালীতারাও হন্তদন্ত হয়ে সে ঘরে এল।

'হীরেন এলি?' বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে কালীতারা দেখল, হীরেন আর সেই তেজী বদ মেয়েটা পরস্পরকে জাপটে ধরে আছে।

'হীরু! এসব কি? মমতা! ছি বাছা ছি।' বলতে বলতে মাথা ঘুরে কালীতারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

চেয়ারে পা তুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দু সবে একটু চিন্তা করবার আয়োজন করছে, মমতার মতই সাধারণ মিলের সাড়ী পরা একটি জমকালো গেঁয়ো মেয়েকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে পা নামিয়ে বসল। ট্রেনের লম্বা জার্নি ও অতিরিক্ত সিগারেট টানার ফলে চোখ দুটি তার একটু জ্বালা করছিল, রম্ভাকে দেখে যেন জুড়িয়ে গেল চোখ। হৃদয়ে বিস্মৃত স্বস্তি ও শান্তি আসার মতই বাইরে যেন আবির্ভাব হল রম্ভার। রম্ভাকে তার মনে হল চেনা। এ বাড়ীতেই কি আগে কোন দিন রম্ভাকে দেখেছে? অথবা চোখে ভাল লাগায় মনে হচ্ছে চেনা, প্রকৃতির কোন এক অদেখা পটের শোভা দেখে মুগ্ধ হলে যেমন ভাললাগা মানুষ, ভাললাগা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জ্যোৎস্না রাত, ভাললাগা

পাহাড় বন নদী সাগর সব কিছু মনে পড়তে থাকে? সার্সি বন্ধ ঘরে তামাক ও সিগারেট পুড়ছে, রম্ভা নাক সিটকে বলল, 'মাগো কি দুর্গন্ধ! আমি রম্ভা, কেষ্টবাবু। ঝুমুরিয়ার সেই বীরেশ্বর সামন্তের মেয়ে। সেই যে সেবারের বন্যায়—'

'ও, তুমি সেই রম্ভা?'

কৃষ্ণেন্দু উঠে দুটি জানালার সার্সি খুলে দিল। চারবছর আগে সে বন্যায় রিলিফ কাজ করার জন্য ঝুমুরিয়া গিয়েছিল, ঝুমুরিয়ায় একটি কেন্দ্র খুলেছিল। বীরেশ্বর তাদের আদর করে ডেকে নিজের বাড়ীতে রেখেছিল, নিজে সপরিবারে এবং লোকজন জুটিয়ে রিলিফের কাজে তাদের সাহায্য করেছিল অনেক। বীরেশ্বরের বাড়ীতে ছোট একটা হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। রম্ভা তখন কর্ম্মীদেব আর হাসপাতালের অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রয়োজন মেটাতে সারাদিন ছুটোছুটি করত। তার অদ্ভুত উৎসাহ ও আগ্রহের কথা কৃষ্ণেন্দুর মনে আছে। আর মনে আছে তার একটি বিশেষ আবদারের কথা। নীলিমা হাসপাতালে কাজ করার সময় শাড়ীর ওপর একটি অ্যাপ্রণ লাগিয়ে নিত। একদিন রম্ভা এসে চুপি চুপি কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, আমায় এরকম একটা দেবেন, আমি আরো বেশী কাজ করব? নীলিমার একটি অ্যাপ্রণ পেয়ে খুশীতে ডগমগ হয়ে সে সেটিকে কোমরে বেঁধেছিল, কেচে সাফ করে শুকোতে দেওয়ার সময় ছাড়া বোধ হয় দিনরাত্রি কখনো সেটি সে খুলতো না, ঘুমোবার সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকত। রম্ভা তখন ছোট ছিল, অনেক ছোট।

'তুমি খুব বেড়ে গেছ রম্ভা।'

'বয়স হয় নি?'

কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে পুরানো আলাপ ঝালাই করতে রম্ভা আসে নি, এসেছে রামপালের হয়ে কলহ করতে। মেঘলা ভোরে রুক্ষ এলোমেলো চুল খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখ ও রাতজাগা চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে রামপাল এসে হাজির হতে মনটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে কিম্বা ঘটবে ভেবে। রামপালের কাছে সব শুনে তারও রাগের সীমা থাকে নি। একি অন্যায় লাঞ্ছনা একটা মানুষের ওপর, আকাশে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলা নিজের কর্ত্তালি বজায় রাখার জন্য? নিজে এসে সব করবে বলে তার করে রামপালকে সকলের কাছে এভাবে অপদস্থ

করার অধিকার কে দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুকে? কি অন্যায় কৃষ্ণেন্দুর, কি আস্পদ্দা!

রামপাল অবশ্য রম্ভার কাছে দুঃখ জানাতে আসে নি। উমাপদকে সে মারবে। এই বাড়ীতে বাড়ী-ভরা আত্মীয়স্বজন লোকজনের মধ্যে উমাপদকে মারতে মারতে আধমরা করে ছাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে। মিস্ত্রীরা দেখুক তাকে তারা যা ভেবেছে সে তা নয়। কৃষ্ণেন্দু এসে শুদ্ধক দলের সমর্থন বা সাহায্য রামপালের দরকার হয় নি, একাই সে উমাপদকে শাস্তি দিয়ে মিস্ত্রীদের মান রেখেছে, কৃষ্ণেন্দুর না এলেও চলত।

রম্ভার মনে হয়েছিল মিস্ত্রীদের মান রাখতে নয়, গত রাত্রির অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে তারই মান রাখতে এসেছে রামপাল। বুকে আলোড়ন উঠেছিল রম্ভার। চুপি চুপি বলবে নাকি রামপালকে কাল রাত্রির কথা, উমাপদর সঙ্গে শশাঙ্কও যাতে কিছু শাস্তি পায়? রামপালের সবল বাহু দুটির দিকে চেয়ে চোখে তার কিছুক্ষণ পলক পড়ে নি, মনে হয়েছিল সে বুঝি দ্রৌপদী, তার ভীম এসেছে দুটি কীচককে বধ করতে।

কিন্তু না, তা হয় না রম্ভা মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলেছিল বীরেশ্বরের কথা শুনে। বীরেশ্বর বলেছিল, 'তুমি খ্যাপা না পাগল? উমাবাবুকে মারবে কেন? তোমার কি করেছে উমাবাবু? গোলমাল মিস্ত্রীদের সাথে, দশজনের সাথে। মিটমাট হবে দশজনের সাথে, যা করার তারা করবে দশজনে মিলে। তুমি গায়ে পড়ে এসে হাঙ্গামা কেলেঙ্কারি করবে কি জন্যে? হাঁ, তোমায় যদি অপমান করতেন কি মারতেন তখন তুমি দু'ঘা বসিয়ে দিতে, সে ভাল কথা। কদিন কেটে গেল, তুমি কবার এলে গেলে এবাড়ী, আজ বলা নেই কওয়া নেই উমাবাবুকে হঠাৎ মারতে যাবে কি রকম?'

তাই বটে। রম্ভাও সায় দিয়েছিল এ কথায়। দলের কাছে নিজের মান বাঁচাতে উমাপদকে মারা চলে না রামপালের। তার গত রাতের অপমানের ঝালও ঝাড়ানো যায় না রামপালকে দিয়ে। রম্ভার মনে পড়ে, ভীমকে পর্য্যন্ত কীচক বধ করতে হয়েছিল কৌশলে, গোপনে। রামপালকে তো আর বলা যায় না তুমি সেই রকম কোন উপায়ে চুপি চুপি উমাবাবু আর শশাঙ্ককে কিছু শাস্তি দিও—মেরে ফেলো না, কিন্তু খুব মেরো, দুজনে যাতে কেঁদে ককিয়ে পায়ে ধরে মাপ চায়, রম্ভার কাছে না, রামপালকে এ সব বলা যায় না ওকে জড়ানো যায় না তার ব্যাপারে।

কৃষ্ণেন্দুকে কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায়, যে সে কেমন ধারা মানুষ, রামপালের সঙ্গে তার শত্রুতা কেন।

রম্ভার কথা ধাঁধার মত ঠেকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে।

'আমি রামপালের কি করলাম রম্ভা? দু'একবার দেখেছি মাত্র, ভাল করে ওকে চিনি না আমি, আমার কেন শত্রুতা থাকবে ওর সঙ্গে? আমি ছিলাম পাটনায়—'

'আপনি তো তার করে সবাইকে বারণ করে দিলেন ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ওকে, অপদস্থ করলেন। অন্য কেউ আজে বাজে লোক হলে কথা কইতাম না কেষ্টদা। এমন লোক কিন্তু খুঁজে পাবেন নাকো আর একটা। জানেন, পুলিশ আসতে সবাই পালালে, ও একা দাঁড়িয়ে রইল, ধরা দিল। হাঙ্গামা মেটাবার জন্য কত করেছে জানেন? মিটমাট না করলে উমাবাবুকে মেরে দশ বছর জেল খাটতে পর্য্যন্ত রাজী আছে। আপনি না আপশোষ করতেন খাঁটি লোক, কাজের লোক মেলা বড় কষ্ট? আরও কত কি বলতেন বড় বড় কথা মনে নেই ভাবছেন?—সব মনে আছে। আপনিই কিনা শেষে নিজের কর্তালি বজায় রাখতে হিংসে করে ওর মন ভেঙ্গে দিলেন, দমিয়ে দিলেন মানুষটাকে!'

ব্যাপার খানিকটা বোধগম্য হওয়ায় এবার কৃষ্ণেন্দু প্রশ্ন করে, 'রামপাল তোমার কোন ভাই রম্ভা? তোমার ভাইদের নাম ভুলে গেছি।' রম্ভা রাগ করে বলে, 'ভাই? ভাই হতে যাবে কেন আমার? আমার কেউ হয় না। এই তো কদিন আগে চেনা হল কলকাতায় এসে। বেশ মানুষ আপনি।'

রম্ভা কলহ করে আর তাকে দেখে কৃষ্ণেন্দুর মনে পড়ে যায় স্টেশনে মমতার কলহের ভঙ্গি ও কথা। রম্ভা সত্যই কোমরের কাপড় জড়িয়েছে। কলহ করার জন্য এখানে এসে নয়, আগে থেকেই জড়ানো ছিল, মনের মধ্যে ঝগড়া ভাঁজতে ভাঁজতে মসগুল হয়ে আসায় জড়ানো আঁচল খুলতে ভুলে গেছে। ছোট কথা নিয়ে, মিছে নালিশ ধরে, ছেলেমানুষী কলহ করছে রম্ভা কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর মনে হয় মমতার নিজেকে নিয়ে কলহ করার চেয়ে জোরালো আর জমজমাট হয়ে উঠেছে পরের জন্য রম্ভার ঝগড়া। রম্ভার বিরোধ তেজী,

আন্তরিকতায় সহজ ও স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাস দ্বিধাসংশয়হীন অ-টলমল, জিদ সহিষ্ণু। এত অল্প সময়ের মধ্যে রম্ভার সম্বন্ধে এতবড় ব্যাপক একটা আন্দাজ করা কৃষ্ণেন্দুর পক্ষে অবশ্য মমতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। মমতার বিরোধিতা, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস আর একগুঁয়েমির স্বরূপ তার জানা ছিল বলে।

যা বলার ছিল প্রাণ ভরে বলে নিয়ে খানিক অপেক্ষা করে রম্ভা বলে, 'কথা কন না যে? কীই বা বলবেন, বলার কিছু থাকলে তো!'

কৃষ্ণেন্দু তখন আত্মসমর্পণ করে কৈফিয়ৎ জানায়, বলে,'আমার দোষ নেই রম্ভা, আমি কিছু করি নি। রামপালের কথা আমি কিছুই লিখিনি টেলি-গ্রামে। এসব কিছু জানলে তো লিখবো? আমি শুধু কবে আসব জানিয়েছিলাম। দুঃখ করো না, আমি রামপালের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইব।'

'ক'ন না কথা। সে তো বসেই আছে ওঘরে। ডাকব?'

রামপালকে না ডাকিয়ে কৃষ্ণেন্দু নিজেই বীরেশ্বরের ঘরে গেল। বীরেশ্বরের সঙ্গেও আলাপ করবে! মাঝখানে বহুদিন কেটে গেলেও এই স্বাধীনচেতা এবং চাষীর পক্ষে আশ্চর্য্য রকম সংস্কার-মুক্ত খাপছাড়া লোকটিকে সে ভোলে নি।

পরিচয় হবার পর প্রথমে ভেবেছিল ঝুমুরিয়ায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করে বীরেশ্বরকে ভার দেবে। বীরেশ্বরের মেজাজ আন্দাজ করার পর কৃষ্ণেন্দুর ভরসা হয় নি। আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী লোক দিয়েও কাজ চলে কিন্তু তীব্র অভিমানের তাপে এত বেশী মাথা গরম হলে বিপদ হয়। বীরেশ্বরকে কৃষ্ণেন্দু কাজে লাগাতে পারেনি, কিন্তু ভুলতেও পারেনি তাকে।

কৃষ্ণেন্দু আলাপ করতে জানে চমৎকার। অচেনা লোকের সঙ্গে অল্প সময়ে সে ভাব জমাতে পারে। নানা আবেষ্টনীর নানা ধাঁচের মানুষের বিচিত্র মন ও আচরণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার অভিজ্ঞতায় তার অকারণ সমালোচনার আদিম প্রবৃত্তি এত বেশী চাপা পড়ে গিয়েছে যে তার কথা ও ব্যবহার মানুষের মধ্যে অমিল বা বিরোধিতার অনুভূতি জাগায় না। অসহায় অসুস্থ জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বল হৃদয় মনের অসংখ্য বিকার আর ছদ্মবেশ প্রথম বয়সে মানুষ জাতটার উপরে কৃষ্ণেন্দুর অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিয়েছিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হবার দাওয়াই পেয়ে সেই আবেগজ্বরের উপশম হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মানুষের সম্পর্কে খানিকটা নির্ব্বিকার ও প্রায় নির্ব্বিচার বন্ধুত্ববোধ। কোন মানুষকেই সে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাও করে না, তুচ্ছ ও ভাবে না। একক ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মানুষের কাজ ও অকাজ করার বিস্ময়কর প্রচ্ছন্ন প্রেরণা মোটামুটি অনুমান করতে শিখে মানুষ সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ তার কমে গিয়েছে।

ভুল বোঝা আর অর্থহীন অকারণ ছেলেমানুষী অভিমানের জন্য রামপালকে সে একটু তিরস্কার করল, কিন্তু এত পরিষ্কার করে তার ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে এমন বন্ধুর মত এটা সে করল যে রাগ করার বদলে নিজের অপদার্থতায় বিমর্ষ হয়ে গেল রামপাল। তার হয়ে ওকালতি করার পাগলামীর জন্য রম্ভার করতে লাগল লজ্জা, রামপালের সম্পর্কে আজ এই প্রথম ক্ষীণ একটু সংশয় জেগে মনটাও তার খারাপ হয়ে গেল খানিক। বেশী বড় কি ভেবেছে সে রামপালকে, সে যা নয়? কৃষ্ণেন্দু নতুন একটা পরিচয় পাইয়ে দিল রামপালের। এখনো ওকে চিনতে কি বাকী আছে তবে?

রামপালকে উৎসাহ দেবার জন্য কৃষ্ণেন্দু তখন বলল, 'দুঃখ কোরো না ভাই। তোমার যদি নিষ্ঠা থাকে, দরদ থাকে, ওরা নিজে থেকেই তোমায় একদিন মানবে। আজ তোমাকে ভুল বুঝেছে, কাল ভুল ভেঙ্গে যাবে। নিজেই ভেবে দ্যাখো, উমাবাবুকে মারতে দেওনি বলে সবাই রাগ করেছিল কিন্তু রাগ করলে কি হবে, মনে মনে তো সবাই টের পেয়েছিল কাজটা তুমি ঠিক করেছ, আপনা থেকে সকলে তাই তোমায় মেনে নিয়েছিল। কারো বলে দিতে হয়নি। ব্যাপারটা শুনে আমি বড় খুশী হয়েছি রামপাল তোমার প্রশংসা করেছি!'

শুনে রামপালের বিমর্ষভাব কেটে গেল রম্ভা মনে স্বস্তি পেল এবং দু'জনের চোখে চোখে তাকানো দেখে কৃষ্ণেন্দুর লাগল চমক। ধীর স্থির শান্ত মানুষ সে, কত অভিজ্ঞতায় গড়া আবেগহীন বাস্তববোধ, হঠাৎ তীব্র আলো লাগা চোখের মত মন কিনা তার ঝাঁকি খেয়ে অন্ধ হয়ে গেল এদের ভালবাসার চাহনির ছোঁয়াতে!

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হলেও নিজের স্নায়ুমণ্ডলীতে এই আকস্মিক উত্তেজনা ঘটার ব্যাপারটা কৃষ্ণেন্দুর কাছে প্রথমে বড় দুর্ব্বোধ্য মনে হল। এটা কোন

আঘাতের প্রতিক্রিয়া ? দুটি মানুষের প্রেম হয়েছে জানাটা তো এমন কিছু অঘটন নয় যে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে বলেই এমন ভাবে নাড়া লাগবে ? এ রহস্য কোনদিনই কৃষ্ণেন্দুর সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করার মত সময়ও তার ছিল না। আগে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও আয়ত্ত না করে ওরকম বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ কাজেও লাগত না। অন্ততঃ নিজেকে সন্তুষ্ট করার মত করে নিজস্ব রহস্য ভেদ করার তাগিদটা কৃষ্ণেন্দুর মধ্যে চিরদিনই জোরালো। অবসর মত ভেবেচিন্তে পরে কয়েকটি যোগাযোগ খুঁজে বার করে সে বুঝেছিল যে খাপছাড়া অনৈসর্গিক কিছু ঘটেনি। হীরেন ও মমতার প্রেম নিয়ে সে খানিককটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। অনাত্মীয়, সদ্য পরিচিত রামপালের হয়ে রত্নার হৃদয়গ্রাহী সতেজ কলহ তার মনে একটা রহস্য সৃষ্টি করেছিল। দু'জনের ভালবাসা হয়েছে জানামাত্র সে রহস্য গিয়েছিল ফেটে। কেবল তাই নয়, তার স্মরণ আছে, দুজনের মুখের ভাব ও দৃষ্টিবিনিময় দেখে সে অনুভব করেছিল যে একটা কল্পনাতীতরূপে নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে এমন প্রচণ্ড উন্মাদনার সঙ্গে ওরা দু'জন পরস্পরকে কামনা করেছে যা তার কাছে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।

একজন মনোবৈজ্ঞানিক ডাক্তার বন্ধু আছে কৃষ্ণেন্দুর। নাম মৃণ্ময় সরকার। কথা প্রসঙ্গে একদিন কৌতূহলের বশে কৃষ্ণেন্দু তাকে তার এই অভিজ্ঞতার বিবরণ জানাল।

বন্ধু হেসে বলল, 'তোমার আন্দাজটা মিথ্যে নয়, তবে গৌণ। আসল কারণ ভিন্ন।'

'কি কারণ ?'

'তুমি একজন যোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং এককালে ঘোরতর রোমান্টিক ছিলে, এই কারণ। কাজের নেশায় আত্মভোলা হয়ে থাক কিনা, তাই আচমকা সহানুভূতির ঝনঝনানিতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। অভ্যাস তো নেই।'

ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে কৃষ্ণেন্দুর একটা সাম্প্রতিক অস্পষ্ট ধারণা সমর্থন পেয়েছিল। সমস্ত স্বীকৃত সত্যগুলিকে নতুন দৃষ্টি বিচার করার, যাচাই কষে নেবার দিন এসেছে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে নয়, বৈজ্ঞানিকের। মনকে, আত্মাকে নিছক মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলে মানতে হলে পৃথিবীর অধিকাংশ

মানুষের হৃদয় আজ নৈরাশ্যের ভারে টন টন করবে। কিন্তু এই নৈরাশ্যও একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল বলে মেনে নিয়ে মানুষকে শিখতে হবে অন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে উৎফুল্ল হবার কায়দা। নিজেকে যন্ত্র বলে জানতে —তা সে যত জটিল, যত কোমল, যত বিস্ময়কর যন্ত্রই হোক—ও মানতে না শেখা পর্য্যন্ত মানুষের নিস্তার নেই।

কত দিনে মানুষের এই সহজ বুদ্ধি আসবে কে জানে। যন্ত্র বলতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন মেটাতে মানুষেরই সৃষ্টি করা কলকব্জার কথা মনে আসে, বাধা শুধু এইটুকু। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পার্থক্যটাই যেন সব॥

বেলা প্রায় বারোটার সময় কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে রামপাল চলে গেল, তাড়াতাড়ি নাওয়া-খাওয়া সেরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাপের সঙ্গে রম্ভা রওনা হল ঝুমুরিয়া, বেলা তিনটের গাড়ী। জীবনে কখনো এতটুকু স্বাদ পায় নি এমন এক দুঃসহ ব্যাকুলতায় রম্ভার দেহমন তখন অস্থির করছে। এ কি অসুখ রম্ভা জানে না। জ্বর আসছে?

'বমি বমি লাগছে বাবা। পান কেনো।'

বীরেশ্বর মেয়েকে পান কিনে দেয়। বলে, 'শুবি? শো একটু। কমে যাবে।'

পান তিতো লাগে। চিবানো পান ফেলে দিয়ে রম্ভা আরও জড়ো-সড়ো হয়ে জানালা ঘেঁসে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখে চাওয়া ছাড়া আর কোন ইঙ্গিতটুকুও তো বিনিময় হয় নি তার আর রামপালের মধ্যে, সে কেন বুঝতে পারবে তার শরীর আর মনে কেন এই দুরন্ত বিপ্লব। রামপালের সঙ্গে আর তার কোন দিন দেখা হবে না ভেবে শুধু মন কেমন করলে সে তার মানে বুঝতে পারত। মন কেমন করার অভিজ্ঞতা তার আছে। এই কটা দিন কি তার মন কেমন করে নি ঝুমুরিয়ার আপনজনদের জন্যে, বিশেষ করে ভাইপো ভাইঝিগুলির জন্যে, আরও বিশেষ করে বড় ভায়ের ছোট ছেলে পচাটার জন্যে? রামপালকে তার বড় ভাল লেগেছে। হ্যাঁ, কামনাও সে করেছে রামপালকে। আলিঙ্গন কল্পনা করে রোমাঞ্চ হয়েছে তার। এ সব সহজ বোধগম্য কথা। সুতরাং রামপালের সঙ্গ পাবার জন্য মন খারাপ হওয়া, এ গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ভিন্নমুখী গাড়ীতে চেপে আবার কলকাতা ফিরে যাবার অদম্য সাধ জাগা,

এ সব রম্ভা বুঝতে পারত। সে সুস্থ সবল মেয়ে, কখনো বিষাদের চর্চ্চা করে নি, তবু ব্যাথার্ত্তা মেয়েগুলির মত হতাশ কান্না হৃদয়ের কুলে কুলে ছাপিয়ে উঠলেও সে ধারণা করতে পারত ব্যাপারখানা কি,—সে কি আর পীরিতের, মিলন ও বিরহের কথা জানে না, বর্ণনা শোনে নি রাধার বিরহ বেদনার? কিন্তু এতো তা নয়। তার শুধু অসহ্য উদ্বেগ আর অস্থিরতা। একটা মানুষের জন্য কেউ এমন ভয়ানক অশান্ত হতে পারে যে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা পর্য্যন্ত তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, এটা কল্পনা করার ক্ষমতা রম্ভা কোথায় পাবে?

ঝুমুরিয়ায় পৌছে রম্ভা একটু শান্ত হল। সে বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে আর একদিনে কালি পড়েছে তার চোখের নীচে।

রামপাল ও রম্ভার আর কোন দিন দেখা পর্য্যন্তও না হতে পারত কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ঘটকালিতে তাদের একেবারে বিয়ে হয়ে গেল। তাকে দিয়ে ঘটকালিটা করাল কিন্তু মমতা। রম্ভা ঝুমুরিয়া চলে যাবার দিন তিনেক পরে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে মমতা যাচ্ছে খালধারের মজুর বস্তিতে মেয়েদের এক সাপ্তাহিক মজলিস গড়বার আয়োজন করতে, রামপাল ও রম্ভার কাহিনী শুনে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। সম্প্রতি সে কারণে অকারণে উল্লাস বোধ করছিল।

'ওদের বিয়ে হয় না?'

'কি জানি। হয় বোধ হয়।'

'এক কাজ কর। মেয়েটির বাবার কাছে চিঠি লিখে দাও।'

'রামপালকে একবার জিজ্ঞেস করব না?'

'ওকে জিজ্ঞেস করেই লেখো।'

কৃষ্ণেন্দু একটু ভেবে বলল, 'চিঠি লিখে কাজ নেই, বীরেশ্বর শীগগির কলকাতা আসবে আরেকবার, মুখেই বলব তখন।'

মমতা অসহিষ্ণু হয়ে বলছিল, 'না না, কালকেই তুমি চিঠি লিখে দাও কেষ্টদা। আমার মতলব আছে।'

'মতলব?'

'আছে। আমাদের বাড়ীতে একদিনে দু'টি বর বিয়ে করতে যাবে—হীরেন আর রামপাল। ঝুমুরিয়া থেকে ওদের সকলকে আমি আনাব। সেদিন সব একাকার করে দেব আমি। পাশাপাশি বিয়ে হবে, এক আসরে

সবাই একত্র বসবে. পাশাপাশি বসে খাবে—ভদ্রলোক, মজুর, চাষী সবাই ! ওঃ, আমার ধৈর্য্য ধরছে না কেষ্টদা ! কালকেই তুমি চিঠি লেখো ।'

মমতার এ পাগলামিতে কৃষ্ণেন্দু সায় দেয় নি, রামপালের সঙ্গে কথা বলে বীরেশ্বরকে চিঠি লিখেছিল। বীরেশ্বর কলকাতা এসে বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি করে গেল কিন্তু মমতার মতলব মানতে সে কিছুতেই রাজী হল না। বিয়ে যদি হয়, বিয়ে হবে ঝুমুরিয়ায়, বীরেশ্বরের নিজের বাড়ীতে। কলকাতায় এসে পরের বাড়ীতে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না।

মমতা দমে গিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করছিল, 'ও কেন আপত্তি করল কেষ্টদা ? ওর তো লাভ হত, সবদিক দিয়ে, সব খরচ আমি দিতাম।'

কৃষ্ণেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'সবাই তো লাভ চায় না মমতা। ওকে তুমি চেনো না। তোমার প্রস্তাব শুনে অপমান বোধ করে যে রেগে ওঠে নি তাই অনেক ভাগ্যি বলে জেনো।'

হীরেন ও মমতার বিয়ে হল আশ্বিনের গোড়ায়, পূজোর দিন সাতেক আগে। লোকনাথের বাড়ীতে খুব ধূমধামের সঙ্গে পূজো হয়, শিল্পচাতুর্য্যে অপরূপ দামী প্রতিমা আসে। এবার বিয়ের সমারোহ শেষ হতে না হতে পুজোর সমারোহ আরম্ভ হওয়ায় আনন্দ-ক্লান্ত উৎসব-শ্রান্ত বাড়ী বোঝাই মানুষগুলির কাছে বিজয়া যেন মুক্তির স্বস্তি নিয়ে এল। লোকনাথের কারখানাগুলির সমস্ত লোকেরা এবং মমতার নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসা মজুর ও ধাঙ্গড়রা সবশুদ্ধ তিন দিন পাত পেতে গেল।

রামপাল ও রম্ভার বিয়ে হল আশ্বিনের শেষ দিকে, পূজোর পর। কৃষ্ণেন্দু, মমতা, হীরেন, আরিফ ও দীনেশ নামে কুড়ি একুশ বছরের একটি উৎসাহী ছেলে এই পাঁচজন ভদ্রলোক বর রামপাল ও তার মজুর মিস্ত্রী সঙ্গীদের সাথে বরযাত্রী এল ঝুমুরিয়ায়।

দুই

স্বামীর ঘর করতে এসেই রম্ভা টের পায়, সে এক নতুন জগতে এসে পড়েছে, ঝুমুরিয়ায় তার এত দিনের পরিচিত জগতের সঙ্গে যার মিল বড়ই কম। স্থানের সঙ্কীর্ণতা আর আলো বাতাসের অভাবটাই প্রথমে যেন তার দম আটকে দিতে চায়। দিনের বেলাতেও ছায়ান্ধকার এতটুকু সেঁতসেঁতে

বাড়ীতে একগাদা পাকাপোক্ত হৃদয়হীন অদ্ভুত খাপছাড়া মানুষের ভিড় তাকে সারাদিন অনুভব করায় যে সে যেন হাট-বাজারের জেলখানাতে বন্দিনী। ঝুমুরিয়ার খোলা মাঠঘাট বন প্রান্তরের জন্য তার মন কাঁদে না। উঁচু মাটির ভিটায় বড় বড় ঘর, মস্ত উঠানে সকাল থেকে সন্ধ্যাতক রোদের ছড়াছড়ি, দেহের অনাবৃত অংশের ত্বকে ক্ষীণতম বায়ু সঞ্চালনের অনুভূতি আর বাড়ী ভরা গেঁয়ো আপনজনগুলির সাহচর্য্য, এই সমস্তের অভাবটাই তার প্রায় অসহ্য মনে হয়। গৃহের চারিদিকে গাঁ অথবা সহর, সদরে দাঁড়িয়ে জানালায় তাকিয়ে মাটি তৃণ গাছপালা খড়ো ঘর আর দিগন্ত প্রসারিত আকাশ কেন চোখে পড়ে না, খোয়া তোলা গলি ও নোংরা নর্দ্দমা পেরিয়েই খোলার ঘরে দৃষ্টি কেন আটকে যায় এসব বড় কথা নয় রম্ভার কাছে, বাপের বাড়ীর সঙ্গে স্বামীর বাড়ীর পার্থক্যটাই তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ঠেলে তার নড়তে চড়তে কষ্ট হয়, গুমোটের মত ভারি বাতাস টেনে টেনে শ্বাস নিতে নয়, ধোঁয়াটে অস্বচ্ছলতা দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রাখে।

রামপাল ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কি হল, কি হল তোমার বৌ?'

'কই না। কিছু তো হয় নি।'

'কাঁদ কেন?'

'কই কাঁদলাম?'

'মুখ যে ভার ভার?

'ধেৎ।'

রামপাল তার হাত ধরে। রোয়াক কি উঠান কি ঘর খেয়াল থাকে না রামপালের। রম্ভা ঘরে পালায়। ছোট সোদা-গন্ধী আধ অন্ধকার ঘর, সেখানে রামপাল তাকে মহাসমারোহে ভালবাসে, তাকে ভালবাসায়। কে জানে তখন সকাল কি দুপুর কি সন্ধ্যা, রম্ভা গা ধুতে যাচ্ছিল কি দুর্গার রান্নাঘরে রাঁধছিল কিম্বা আনমনে ভাবছিল ঝুমুরিয়ার কথা। গোড়ায় ক'দিন রামপাল কাজে যায় নি, তারপরেও মাঝে মাঝে কামাই করছে। রম্ভার আবেগেও আগ্রহ কম থাকে না, কিন্তু রামপালের উদ্দাম ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে যেতে পারে পারে না বলে নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। বাড়ীটা পছন্দসই নয় আর বাড়ীর মানুষগুলি একটু খাপছাড়া বলে তার আপশোষ হবে কেন? ঝুমুরিয়ার বাড়ীতে তো তার রামপাল ছিল না, মিলনের এই পরম উৎসব

ছিল না, তাদের দু'জনের জীবন তো এভাবে ভরাট হয়ে উঠবার সুযোগ পায় নি অবর্ণনীয় রসে, আনন্দে, উপভোগে? তবে কেন সে বিশ্ব-সংসার ভুলে যেতে পারে না রামপালের মত? সে কি স্বার্থপর? মনটা কি তার ছোট? একসঙ্গে সব কি সে চায় নিজের জন্য—বিয়ের আগে যা ছিল তাও থাকবে, বিয়ের পরে যা পেয়েছে তাও থাকবে?

'তুমি বড় কঠিন বৌ।' রামপাল সখেদে নালিশ জানায়।

'কেন গো?'

'এত করে মন পাই না।'

'যাঃ, মন তো নিয়ে নিয়েছো সেই কবে।'

ত্রুটি হচ্ছে? অন্যায় করছে? যতটা সাড়া দেওয়া উচিত ছিল দিতে পারছে না, যতটা খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত ছিল নিতে পারছে না? অথবা বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর ঘরে এলে প্রথমটা এরকম হয় মেয়েদের?

মানিয়ে নেবার জন্য খাপ খাইয়ে নেবার জন্য রম্ভা উঠে পড়ে লেগে যায়। রামপালকে আরও বেশী করে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে, বাড়ীর মানুষগুলির সঙ্গে মিতালি জমায়।

বাড়ীর ধাঁচটা অদ্ভুত—গলি থেকে লম্বা হয়ে এসে চ্যাটালো গোলাকার হয়ে গেছে। লম্বা অংশে দু'হাত চওড়া উঠান, চব্বিশ ঘণ্টা ভিজে থাকে। দুপাশে আধ হাত উঁচু আর দেড় হাত চওড়া দাওয়া এবং দু'খানি করে ঘর। ভিতরের দিকে চ্যাপ্টাকোণ ত্রিভুজের মত প্রায় গোলাকার কিছু বড় উঠান ঘিরে আরও কতগুলি ঘর আছে। একখানা করে নিয়েই অধিকাংশ ভাড়াটে বসবাস করে, কেবল পরেশ আর গোপালের ঘর দু'খানা করে। গোপালের রোজগার একটু ভাল এবং সংসারটিও বড়। একটি ছোটখাট দর্জির দোকান তার আছে। এবাড়ীতে পরেশের সঙ্গেই রামপালের ভাব বেশী। পরেশের স্ত্রী দুর্গা এতকাল রামপালকে রেঁধে খাইয়েছে স্বামী আর দেওরদের সঙ্গে, রামপাল খরচ দিয়ে এসেছে মাসে মাসে। রম্ভা আসবার পরে দ্বিতীয় মাসেও এই ব্যবস্থা বজায় আছে, যদিও রম্ভার ভিন্ন সংসার পাতার কথাটা কয়েকবার উঠেছে ভাসাভাসা ভাবে। দেশে রামপালের বাপ মা ভাইবোন কেউ না থাকলেও আত্মীয়স্বজন ছিল, বিয়েতে কিন্তু সে তাদের কাউকে ডাকে নি। দুর্গাই রম্ভাকে বরণ করে ঘরে তুলেছে, আচার নিয়ম

পালন করেছে, আদর যত্ন দেখিয়েছে, নতুন বৌয়ের জন্য শাশুড়ী ননদের যা কিছু করার থাকে সব সে করেছে একা। বয়স তার বেশী নয়, দুটি ছেলের মধ্যে বড়টির বয়েস হবে বছর তিনেক, ছোটটি এখনো মাই টানে, কিন্তু ক'বছর একা সংসার চালিয়ে তার রকম-সকম হয়েছে পাকা গিন্নীর মত। রম্ভাকে ভালবেসে দরদ করতে শিখলেও তার সখি সে হয়ে উঠতে পারে নি, তার ব্যবহারে একটু গুরুজন গুরুজন ভাব রয়ে গেছে।

পরেশের দু'ভায়ের নাম সুরেশ আর নরেশ। সুরেশ একটু গম্ভীর রগচটা ধরণের যুবক, সুবালা নামে তার চেয়ে চার-পাঁচ বছর বয়সে বড় পাড়ার একটি হাফ-গেরস্ত মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ভাব জমিয়ে দিন কাটাচ্ছে। লোকনাথের কাঠের কারখানাতে সেও মিস্ত্রীর কাজ করে। রোজগারের অর্দ্ধেক এনে দেয় দাদার হাতে, বাকী অর্দ্ধেক সম্ভবতঃ খরচ করে সুবালার পিছনে। ভাল একটি মেয়ে দেখে তার বিয়ে দেবার জন্য পরেশ ও দুর্গার চেষ্টার বিরাম নেই দু'বছর ধরে, কিন্তু সুরেশ নির্ব্বিকার। অথচ আশ্চর্য্য এই, সুবালার প্রেমে হাবুডুবু খাবার কোন লক্ষণও তার দেখা যায় না। রাতগুলি বেশীর ভাগ তার বাড়ীতেই কাটে। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায়, রাতে সে বাড়ী ফেরেনি, কিশোর নরেশ দুয়ার না দিয়েই একা ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে।

নরেশ ছেলেটা বড় চঞ্চল, চালাক আর অবাধ্য। এই বয়সে ছেলেটা যে কি করে এমনভাবে পেকে গিয়েছে রম্ভা ভেবে পায় না। আরও সে ভেবে পায় না কি করে এর সঙ্গে এত সহজে তার এমন ভাব হয়ে গেল যে শাসন করার বদলে ছোঁড়াটার পাকামিকে প্রশ্রয় দিতে তার ভাল লাগছে।

এখানে আসবার পরদিন বিশেষ দরকারে রামপাল বেলা তিনটের সময় অনিচ্ছার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, খালি ঘরে রম্ভা তাকিয়ে আছে মাটি লেপা দেয়ালে বসানো একরত্তি জানালা দিয়ে গলির ওপারের দুটি বাড়ীর ফাঁকে খানিক তফাতের খালের অংশটুকুর দিকে। বিড়ির গন্ধে উদভ্রান্ত হয়ে ভাবল, একটু সময়ের জন্যও তবে কি রামপাল তাকে ছেড়ে যেতে পারল না, ফিরে এল বেরিয়ে গিয়ে! তারপর রম্ভা চেয়ে ছাখে কি পাশ থেকে রোগা একটি হাত এগিয়ে এসে তার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিচ্ছে ছোট একটি কৌটো!

ফিরে তাকাতে বিড়িতে জোরে টান দিয়ে যেন প্রায় বুক ফুলিয়ে নরেশ বাহাদুরীর হাসি হাসল। নতুন বৌকে সে ছ'পয়সার এতটুকু একটি কৌটো উপহার দিয়েছে—কৌটোর ওপরে আবার একরত্তি আশি আঁটা!

'টেঁপিকে দেখিও না। এ্যাঁ? মেয়েটা ভীষণ হিংসুটে।'

'টেঁপি কে?'

'ওই যে ওবাড়ীর সোনামাসীর মেয়ে টেঁপি। বোলো না ওকে।'

'এটা টেঁপির নাকি? নিয়ে যাও বাবু তোমার টেঁপির জিনিষ। আমি চাই নে।'

নরেশ উদারভাবে বলেছিল, 'তাতে কি, নাও না। কিছু হবে না।'

পরে রম্ভা সোনামাসীর পরিচয় পেয়েছিল, তার আহ্লাদী মেয়েরও। সোনামাসী গলির আরও ভিতরে কয়েকটা বাড়ী পেরিয়ে এক বাড়ীতে থাকে। কাবুলীওলার ব্যবসা চালিয়ে সোনামাসী নিজের সংসার চালায়। পুঁজি তার সামান্য, স্বামী মরবার পর গায়ের সব গয়না আর ঘরের সব বাড়তি বাসনকোসন বেচে দিয়ে টাকা কটা সংগ্রহ করেছিল। সংসার বলতে সে নিজে আর তার ওই মেয়ে টেঁপি, খরচ বেশী নেই। একটি টাকা তার বাইরে গেলে কদিনের মধ্যে পাঁচ সিকে হয়ে ফিরে আসে। দশ বছর ধরে সোনামাসী মেয়েকে দুধ ভাতও খাইয়েছে, পুঁজির টাকাও বাড়িয়েছে। ব্যবসাটা সে আয়ত্ত করেছে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে। প্রথম প্রথম দু'চার টাকা তার মারা গিয়েছিল, লোক চিনতে ভুল করেছিল, বেশী সুদের লোভ সামলাতে পারে নি। এখন সে আর ঠকে না, তাকে ঠকিয়ে পার পাবার ক্ষমতা আছে এমন লোককে সে টাকা কখনো ধার দেয় না, বাজে লোকের সঙ্গে কারবার করে না। কার কাছ থেকে কি ভাবে টাকা আদায় করতে হবে তাও সে নির্ভুলভাবে জানে। কারো কাছে ধন্না দেয়, কার কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, কাউকে দেয় গলা ফাটিয়ে অকথ্য গালাগালি আর কাউকে দেখায় ভয়। আবার কারো কারো বেলা সময় পার হয়ে গেলেও কখনো তাগিদ দেয় না। সে জানে যে তার তাগিদের চেয়েও এ সব লোকের কাছে চক্ষুলজ্জার তাগিদ ঢের বেশী জোরালো। হাতে এখন টাকা নেই বলেই তার টাকা ফেরত দিচ্ছে না, এখন গিয়ে টাকা চেয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে দিলে তারই বিপদ।

এমন যে সোনামাসী, গায়ের রঙ যার খাদ মেশানো পেতলের মত, তার বারো বছরের ট্যাবটেবে ছিচকাঁদুনে মেয়ে টেঁপির সঙ্গে নরেশের বড় ভাব।

দুর্গা বারণ করে ভয় দেখায়। বলে, তোর কি মরণ নেই রে লক্ষ্মীছাড়া, সোনামাসীর ঘরে আদর খেতে যাস? ঘরের আদরে পেট ভরে না তোর? ও মেয়ে দিয়ে ব্যবসা করবে সোনামাসী, তাও কি টের পাসনে তুই হাড়হাবাতে? ফের যাবি তো তোর দাদাকে বলে হাড় গুঁড়িয়ে দেব বলে রাখছি।'

নরেশ অম্লান বদনে মিথ্যা বলে, 'যাই না তো। তোমার খালি বাজে সন্দ।'

এরা ছাড়া আছে মোটা শিবু, রোগা শরৎ, বুড়ো গগন, ক্ষান্ত পিসী, রাণীর মা, পাগলা ইত্যাদি আরও কয়েকজন ভাড়াটে।

গোপালের সাতটি ছেলে মেয়ে, বড়টির বয়স পনের বছর। গোপালের বৌ ন'মাস পোয়াতি। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাক লেগে যায়, ভাবা যায় না পেটের ভারে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়া সে কিসের জোরে ঠেকিয়ে রেখেছে। চুল ওঠা মাথায় টাকের মত চওড়া সীঁথিতে ছটাক খানেক সিঁদুর, কপালের ফ্যাকাসে ঢিলে কালো চামড়ায় চওড়া সিঁদুরের ফোঁটা, সাদাটে গভীর চোখ, ঠিক যেন যন্ত্রণায় জোরে চাপা কোঁচকানো ঠোঁট আর জীর্ণশীর্ণ পেটমোটা কঙ্কালসার দেহ দেখে পাড়ায় কাণাকাণি চলে যে ছেলে বিয়োবার সুখ ভোগ করতে কোন উপদেবী—হয়তো বা গর্ভটর্ভ নষ্ট করার পাপে উপদেবী হয়েছিল এমন কেউ—মা হবার সুখ ভোগ করতে গোপালের স্ত্রীকে ভর করে আছে। বছর বছর ছেলে মেয়ে হয় অনেকের, জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন মায়েরও কোন অভাব নেই কিন্তু এমন চেহারা নিয়ে এত ছেলে বিইয়ে যে কেউ নিজেও বেঁচে থাকে, বিয়োনো ছেলে মেয়েগুলিও সবকটা বেঁচে থাকে—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ কখনো দ্যাখে নি।

মা ও ছেলেমেয়েগুলি সবাই যেন এই মরে তো এই মরে—অথচ একটাও মরে না! এ রহস্য কি মাগ্‌না সম্ভব হয়?

শুধু কি তাই? গোপালের বৌ যে অমন তেজের সঙ্গে ঝগড়া করে সে তেজ সে পায় কোথায়?

ক্ষান্ত পিসীর ছেলে বিন্দেও মিস্ত্রী। বিশেষ কোন দক্ষতা নেই, সাধারণ

মজুর মিস্ত্রীর বেতন পায়। বছর খানেক বিয়ে করেছে। একখানার বেশী ঘর ভাড়া নেবার ক্ষমতা তার নেই, বিয়ের পর মাকে কোথায় যেন কোন আত্মীয়ের কাছে সরাবার ফিকিরে ছিল, পেরে ওঠে নি। ক্ষান্ত পিসীর দু'একটা গয়না আর সত্তর আশী টাকা নগদ আছে। জোর তাই খাটানো চলে নি একেবারেই। প্রায় সত্তর বছরের বুড়ী, আজ মরে কি কাল মরে ঠিক নেই, তার ওপর জোরই বা খাটানো যায় কি করে? ছেলের বিয়ের পর বর্ষা নামা পর্য্যন্ত মাসখানেক ক্ষান্ত পিসী এখানে সেখানে রাত কাটিয়েছে, তারপর মাঝখানে একটুকরো চট টানিয়ে ক্ষান্ত পিসীর বিছানা করতে হয়েছে বিন্দে ও তার নতুন বৌয়ের বিছানার ঠিক আড়াই হাত তফাতে। কদিন মরার মত নিঃশব্দ হয়ে থেকেছে বিন্দে আর তার বৌ। তারপর শোনা গেছে তাদের চাপা গলায় ফিসফিসানি প্রেমালাপ ও প্রেমের মৃদু ইঙ্গিত। তারও পরে ছেলেবৌয়ের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্ষান্ত পিসীর।

শিউশরণের বাড়ী গয়া জেলায়। প্রায় আট ন' বছর ধরে সে এ বাড়ীতে থেকে একনিষ্ঠভাবে দু'টি সাধনা করে গেছে, গোঁপ পাকানো ও টাকা জমানো। মাঝে মাঝে সে দেশে যেত, সম্প্রতি দেশে গিয়ে একটি চতুর্দ্দশী মোটাসোটা বৌ নিয়ে ফিরে এসেছে। গলায় হাসুলী, পায়ে মল, হাতে চারটি রূপার ও গণ্ডা দুই কাঁচের চুড়ি পরা, হলদে কাপড় জড়ানো ছিটের জামা গায়ে বিশালস্তনী বৌটিকে শিউশরণ যে অত্যন্ত ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৌয়ের প্রতি তার একান্ত আনুগত্যে।

ঘরের কাজ আর বৌয়ের সেবা করায় তার উৎসাহের যেন অন্ত নেই।

পাশের ঘর থেকে রাণী রাত্রে তাদের প্রেমালাপ শোনে এবং সকালে সকলকে শুনিয়ে খিল খিল করে হাসে।

সরযূ প্রায় ধমকের সুরে অবজ্ঞা ভরে বলে, 'নেহি নেহি। মেরা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।'

শিউশরণ মিনতি করে, তোষামোদ করে, পায়েও নাকি ধরে। তারপর সব চুপচাপ। গাঁজার উৎকট গন্ধ ভেসে আসে খানিক পরে। তারও পরে উদাস কণ্ঠে শিউশরণ ভজন গান ধরে। আহা, তার করুণ ভজন শুনে চোখে নাকি জল আসে রাণীর!

শিউশরণের ভজন থামার পর চোখে প্রায় ঘুম নেমে এসেছে রাণীর, সরযূর ভর্ৎসনা শুনে সে সজাগ হয়ে ওঠে।

'ইয়ে কা জবরদস্তি? সরম নাহি তুমারা?'

'চোপরও!'

প্রচণ্ড চড়ের শব্দে রাণী নাকি চমকে যায়। ভাবে, সরযূ কি শেষে চড় পর্য্যন্ত মেরে বসল স্বামীর গালে? সরযূর কান্না কাণে আসতে সে বুঝতে পারে, না, শিউশরণই বিদ্রোহ করেছে।

'মাগী যেন কি, না রম্ভাদি?

রম্ভা আসল খবর জানে। রাণীর মত সস্তা মজা পাওয়ার বদলে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। সরযূ একটু উঁচু বংশের মেয়ে শিউশরণের চেয়ে। টাকার জোরে শিউশরণ তাকে বিয়ে করে এনেছে। প্রায় সত্তর টাকা বেশী খরচ করে। শিউশরণের স্পর্শ এখনো অপমান বোধ হয় সরযূর, বিতৃষ্ণা জাগে। রম্ভা নিশ্বাস ফেলে ভাবে, বয়সটা শিউশরণের কম হলেও হয় তো নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ হত সরযূর পক্ষে।

অপস্থান, নর্দমা ও পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ—কলতলায় জলের জন্য, ছেলেমেয়ের ঝগড়ার জন্য, বেসামাল মেয়েমানুষের দিকে পুরুষের একটু তাকানোর জন্য, নিছক হিংসার জন্য আর শুধু ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য কোন্দল, পরস্পরের বাঁচনমরণে ব্যঙ্গাত্মক উদাসীনতা আর ছলচাতুরী হীনতা দীনতা নির্ম্মম পাশবিকতায় বিষাক্ত তার এই নূতন আবেষ্টনীতেও মায়া মমতা উদারতা, আত্মনাশী নির্বাক সহিষ্ণুতা আর মহত্তর বৃহত্তর কিছুর কামনা খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে রম্ভা আত্মরক্ষা করে।

রম্ভা যখন প্রথম জেনেছিল তাদের পাশের বাড়ীর পরের বাড়ীতে সাতটি মেয়ে থাকে—কেউ কেউ নিজের মা কিম্বা ভায়ের সঙ্গেই থাকে—যে সাতটি মেয়ের যে কোনো একজনকে যে কোন পুরুষ এসে একটি টাকা দিয়ে সম্ভোগ করে যেতে পারে, রম্ভার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। পাগলের মত সে রামপালকে বলেছিল, আমায় নিয়ে চলো—অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমি মরে যাব এখানে থাকলে।

তাকে বুঝিয়েছিল দুর্গা।

'কোথায় যাবি? ভদ্রপাড়ায়? কলকাতায় ভদ্রপাড়া নেই।'

উমাপদর কথা, কালীতারা জীবনলালের কথা মনে পড়ে যায়, রম্ভার গা জ্বালা করে।

'কোথাও নেই?'

'আছে। বাবুদের পাড়া আছে। বাবু বর একটা জুটিয়ে নিলেই পারতিস—দেখতিস পাড়াশুদ্ধ সতীলক্ষ্মীরা একটা স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করছে? খোলার বাড়ীর পাড়ায় ওরকম বাড়ী দু'চারটে থাকবেই বোন।' দুর্গা ভ্রুকুটি করে, খোঁচা দিয়ে বলে, 'আমি তো একজনকে নিয়ে এ বাড়ীতে কাটালাম পাঁচ ছ'বছর। ওসব হতভাগিদের সবাইকে জানি আমি। ওদের কষ্ট দেখে দয়া হয়—ঘেন্না তো হয়না বাছা তোমার মত!'

রম্ভা সব তেজ হারিয়ে কাতরভাবে বলে, ঘেন্না নয় দুগ্‌গাদি, ঘেন্না নয়। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার, বুক ফেটে যাচ্ছে।'

ভাবপ্রবণতার আক্রমণে রম্ভাও কাবু হয়ে পড়ে! কিন্তু সামলে নেয়, সইয়ে নেয় রম্ভা, চারিদিকের সঙ্কীর্ণ কুঁকড়ে যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্য্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, তার ধৈর্য্য আসে। বিরোধ ও বিতৃষ্ণা উবে যায়। কষ্ট থাকে, মনের মধ্যে প্রতিবাদের নিরুপায় নালিশের কষ্ট, কিন্তু তাতে আর তীব্র জ্বালা থাকে না। গাঁয়ের জীবনে নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচে, জীবনের গ্লানি ও আবর্জ্জনাও ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সঙ্কীর্ণ স্থানে গাদা-গাদি করে আছে উর্দ্ধশ্বাস স্বার্থপর নিস্পিষ্ট মানুষ। এই স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা তার কেটে যায়। একদিন দুপুরবেলা যেচে পাড়ার কয়েকটি দেহবেচা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসে সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করে। এদের সম্বন্ধে তার একটা উদ্ভট, বীভৎস ধারণা ছিল, তার মনে হত এদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই বুঝি পচা গন্ধ এসে নাকে লাগবে। বরং দেখে সে অবাক হল, গেরস্ত অনেক মেয়ের চেয়ে এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে. অন্য মানুষের মতই এদের সুখদুঃখ স্নেহ মায়া আছে, ভালমন্দ উচিত অনুচিত বোধ আছে, এমন কি উদারতা পর্য্যন্ত আছে খানিকটা!

বাড়ীর সকলকে আর পাড়ার অন্য বাড়ীর যে ক'জনকে পারে একদিন ডেকে এনে একত্র করে সামাজিক সম্পর্কের ভূমিকা স্থাপনের একটা উপলক্ষ খুঁজছিল রম্ভা। ভোজ দেওয়া যায় না, সে অনেক খরচ, বিয়ে-টিয়ের মত মস্ত ব্যাপার ছাড়া চলে না। অকারণে বা খাপছাড়া কারণে সকলকে ডেকে এনে শসা বাতাসাও খাওয়ানো যায় না, সবাই কি ভাববে। ভেবে চিন্তে এক পূর্ণিমায় রম্ভা সবাইকে সিন্নী খাওয়াবার আয়োজন করল। পাকা কলা আর ময়দা দিয়ে রম্ভা সাদাসিদে সিন্নী বানাল। পঁচিশজনের সিন্নীতে দুধ পড়ল সের দেড়েক। তবু, তাই অনেক বলতে হবে। পঁচিশ ত্রিশ জনকে এই সিন্নীই বা খাওয়াতে পারে কজন? ক'জনের ঘরে ছেলেপিলে বিশেষ বিশেষ তিথিতেও এক ঢোঁক দুধ গিলতে পায়?

সিন্নী খাওয়ানো উপলক্ষে রামপাল সকলকে কীর্ত্তন গেয়ে শোনায়। অন্য গানও গায়,—প্রেমের গান, বিরহের গান মিলনের গান। শুধু যাত্রা পাঁচালী আর বোষ্টম ভিখারীর গান নয়, রবীন্দ্রনাথের দু'চার খানা গানও রামপাল জানে। সে গান ইথরে স্পন্দিত হয়, প্রাসাদ শিখরের আলো ঝলমল কক্ষের বাতায়ন থেকে ফুটপাতের কুষ্ঠরোগীর কাণে ভেসে আসে, স্বামী-শিবের তপস্যার অঙ্গ হিসাবে ঘরে ঘরে কুমারী মেয়ে ডাল-সিদ্ধ হবার অবকাশে যে গান গেয়ে গলা সাধে, গান জানলে কাঠেচেরা করাতিও আপনা থেকে সে গান দু'চার খানা শিখে ফ্যালে। দেশী-বিলাতী মেশানো সুরের বদলে হয়তো রামপ্রসাদী সুরে গায়—গানের সুরেতে পরাণখানিরে পাতি পথের 'পরে,—কিন্তু গায়। উপরের স্তর থেকে এমনিভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সবকিছু নীচের স্তরে পৌঁছয়।

রামপালের হারমোনিয়ম নেই, বাঁয়া তবলা আছে। হারমোনিয়াম ভাড়া করে আনা হয় পাড়ার গিরি বাড়ীউলির কাছ থেকে, ঝাঁঝালো আওয়াজের হারমোনিয়ম। রামপাল তবলা বাজাতে জানে না, তবলা বাজায় নগেন অথবা বিষ্টু। বিষ্টুর হাতটাই বেশী মিঠে, তাকেই প্রথমে সকলে অনুরোধ জানায়, সে যদি নেহাৎ বাজাতে রাজী না হয়, বিনিয়ে বিনিয়ে কেবলি বলে যে আঙ্গুলের তার বড্ড ব্যথা, নগেনকে তখন বাজাতে বলা হয়। নগেন যেন বাজাবার জন্য ওৎ পেতে থাকে, প্রত্যাশায় উত্তেজনায় ঘন ঘন ঠোঁট চাটে আর চোখ মিট মিট করে। ডাকামাত্র উঠে এসে জোরে

তবলায় চাঁটি দেয়, শুধু গজদন্ত দু'টির বদলে দু'সারি দাঁত হাসিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, যতক্ষণ বাজায় সে দাঁত আর ভাল করে ঢাকা পড়ে না। আগাগোড়া চোখ বন্ধ করে মাথা দোলায়, রামপালের গান অথবা নিজের বাজনার তালে সে মসগুল ঠিক করে বলার উপায় থাকে না।

আজও হয়তো তারই বেতালা বাজনার সঙ্গে রামপালকে গাইতে হত, কারখানায় বিষ্টুর হাতে চোট লেগেছে। পরেশের ঘর থেকে লণ্ঠন এনে এ ঘরের দাওয়ায় পুরুষ শ্রোতাদের কাছে নামিয়ে রেখে দুর্গা বলল, 'আজকের দিনটি তুমি বাজাও গো বিষ্টু দাদা, শুনছো? ওস্তাদি ক্ষয়ে যায় তো যাবে, বলে দিনু এক কথা।'

মেয়েদের মধ্যে বসে বিষ্টুর বোনের সঙ্গেই রম্ভা কথা বলছিল। এক নজর তার দিকে তাকিয়ে বিষ্টু উঠে এসে বাঁয়া তবলার সামনে বসল।

চাঁদ উঠেছে কিন্তু উঠানে দাওয়ায় এখনো জ্যোস্নার ছায়া, শুধু এক ফালি রূপালী আলো নিমাইএর ঘরের পাশ কাটিয়ে কলতলায় এসে পড়েছে। দু'টি লণ্ঠনের আলোয় গান শুরু হল। রম্ভার ঘরের দাওয়ায় আর দাওয়ার নীচে উঠানে পুরুষেরা বসেছে, পরেশের ঘরের সামনে মেয়েরা। দশ বারটা বিড়ি এক সঙ্গে জ্বলছে, তবলা বাঁধতে বিষ্টু এত সময় নিয়েছে যে অনেকে বিড়ি না ধরিয়ে পারে নি। তা সময় নিক বিষ্টু, কারো তাতে আপত্তি নেই, গুণীর মর্য্যাদা তারা জানে। শুধু, কড়া পোড়া ভোঁতা ভাদগুল জীবনে রস জোটে এত কম যে লজেঞ্জুস-লোভী শিশুর মত ধৈর্য্য ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাসী-আবেগের চর্চ্চাটা এদিকে কম নয় কিনা, ধর্ম্মে কর্ম্মে পুরাণে গাথায় ঘরকন্না আত্মীয়তার বন্ধুত্বে কলহে বিবাদে ভাবপ্রবণতার ছড়াছড়ি। এখন লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে বোঝা যায় না, দিনের আলো হলে দেখা যেত গান শুনতে শুনতে মেয়ে পুরুষের মুখে যে ভাব ফুটেছে পুরাণো কলসীর শ্যাওলাটে সিক্ততার কথাই তা মনে পড়িয়ে দেয়। ঘামের মত প্রতি লোমকূপ থেকে যেন অবিরত চুঁয়োচ্ছে ভাব।

রামপাল আজ পুরাণো সুরে একটি নতুন গান ধরেছে।

রাই পাগলিনী পণ করেছে গো

যে কাঁদায় তারে কাঁদাতে হবে।

পায়ে ধরে ঢের মান ভেঙ্গেছে গো

(আজ) কেঁদে কেঁদে মান ভাঙ্গাতে হবে।
নিজে সে কাঁদেনা বাঁশীরে কাঁদায়
প্রেম তার খেলা রাধা মরে যায়—

মোটা শিবু চোখ বুজে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, যেন কার অনুরোধ উপরোধ নীরবে প্রত্যাখ্যান করছে। খাদ্যের অভাবে এদের কারো দেহ পুষ্ট হয় না, দু'একজন শুধু শিবুর মত মুটিয়ে যায়। তাদের উন্মাদনার অভিব্যক্তি এই রকম ধীর স্থির শিথিল। অন্য সকলের মধ্যে অস্থিরতা জাগে। গগন নড়ে চড়ে বসে, জগু ঘন ঘন পলক ফেলে, শরৎ মুখ ফাঁক করে ঠিক গ্রীষ্মকালের কুকুরের মত হাঁপায়, বিন্দে পা নাচায়, অভ্যাসে উবু হয়ে বসায় ফেলনার হাঁটু ঠক ঠক করে কাঁপে, গোপালের শরীরটা আধ মিনিট অন্তর শক্ত আর ঢিল হয়ে যায়। রম্ভার কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জাগিয়ে দুর্গা তার মুখে স্তন গুঁজে দেয়, মুখে আঙ্গুল গুঁজে পুঁটু আঙ্গুলটা কামড়ে থাকে, সৈরভী অবিরাম পান চিবোয়, মিনিটে মিনিটে ক্ষান্ত পিসী দোক্তা গুঁড়ো মুখে ফেলতে থাকে, রাণী তার সই পুষ্পের গায়ে শুধু ঠেস দিয়ে নয় রীতিমত চাপ দিয়ে বসে থাকে, জগদম্বা বার বার রাণীর মার কানে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে যায়, মনটা ক্যামোন করছে গো,—মেয়াটার তরে মনটা ক্যামোন করছে। গান ভুলে এদিকে মন দিলে শোনা যায়, ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দ, নড়াচড়ার শব্দ, সোনারূপা কাঁচের চুড়ি আর সোনা তামা পিতলের বালায় ঠোকা-ঠুকির টিন্ টিন্ শব্দ, সমস্ত মিলে এক অদ্ভুত মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে।

ভাসা ভাসা ছাড়া ছাড়া ভাবে রম্ভা রামপালের গান শুনছিল, আসরে বসে তাকে আসর মাতানো গান গাইতে সে আগে কখনো ছাখে নি। শুধু শুনেছিল, স্বামী তার চমৎকার কীর্ত্তন গাইতে পারে। রামপাল গান ধরবার কিছুক্ষণ পর থেকে রম্ভা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রামপালের মুখের দিকে। গানের সুরে গা তার রি-রি করে, প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হয় এই বুঝি রামপালের আধ-বোজা চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে। এ ন্যাকামি রম্ভার সয় না। এত বড় জোয়ান মদ্দ পুরুষ কি করে যে নিজে গান গেয়ে নিজে এমন কাতর হয়ে পড়ে মেয়ে-হ্যাংলা রোগা প্যাটকা মন-উড়ু-উড়ু হ্যালাক্ষ্যাপা ছোঁড়ার মত। হঠাৎ সে উঠে ঘরে চলে যায়। এক অকথ্য বিষাদে তার বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়।

নতুন জীবনের নতুন আবেষ্টনীকে জেনে বুঝে সইয়ে নেবার সঙ্গে রামপালকেও সে জানতে বুঝতে থাকে—মানুষটা ক্রমে ক্রমে নানা দিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। এবং এই দিক দিয়ে তার আঘাত আসে সব চেয়ে কঠিন। কাঠগোলার গোলমালের ব্যাপারে রামপালের ছেলেমানুষী দেখিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু যখন ভর্ৎসনা করেছিল, একটা খটকা বেধেছিল রম্ভার মনে। রামপালের মেয়েমানুষের মত অভিমানী খেয়ালী শিল্পীমনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে এখন সে বুঝতে পারে সেদিন তার ভুল হয় নি। বুঝেও কিছুদিন রম্ভা বুঝতে চায় নি। জোর করে মনে করতে চেয়েছিল পিরীতের প্রথম দিশেহারা খেলার আবেগে মানুষ এরকম ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী আর আরামপ্রিয় হয়, খেয়ালী হয়, এলোমেলো চিন্তা করে। কিন্তু দিবারাত্রি যার সঙ্গে বসবাস দহরম মহরম তার আসল প্রকৃতি কদিন না চিনে থাকা যায়। ঝুমুরিয়ার সূর্য্যকে পর্য্যন্ত একদিন রামপালের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয়েছিল রম্ভার, ভেবেছিল সূর্য্য মুখে যেসব কথা বলত তার রামপাল সেই সব কথা কাজে পরিণত করবে। এখন সে টের পেয়েছে, ওসব চিন্তাই রামপালের নেই। কাঠগোলার ব্যাপারটাতে অবস্থার ফেরে জড়িয়ে গিয়ে দু'দিনের জন্য তার একটু নেতৃত্ব করার ঝোঁক চেপেছিল মাত্র। দেশ ও দশের জন্য বড় কাজ করে গৌরব অর্জ্জন করার তাগিদ সে অনুভব করে না। তার চেয়ে কাঠের সৌখীন জিনিষ তৈরী করা আর কীর্ত্তন গাওয়ার দিকে তার ঝোঁক বেশী।

হতাশায় কালো হয়ে যায় রম্ভার দিনগুলি, মনে হয় জীবনটা ভেস্তে গেল চিরদিনের জন্য, পায়ের নীচে আর সে মাটি পাবে না, অর্থহীন, সস্তা আর পচা জীবনটা টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন কৃত্রিম অবাঞ্ছিত শূন্যতায়। কি বিশ্রী ভুল, কি ক্রুর তামাসা! ক্ষোভে রম্ভার বুক জ্বলে যায়, রামপালের সান্নিধ্য পীড়ন করে তাকে, তার বুকভরা ভালবাসা যেন বিরাগে পরিণত হয়ে গেছে।

ভয়ে ভাবনায় উদ্বেগে অভিমানে রামপাল ম্লান হয়ে যায়, তার আদর নেয় না রম্ভা, সাড়া দেয় না, এক অভূতপূর্ব্ব ভীতিকর গাম্ভীর্য্যে তার চোখ মুখ থমথম করে,—একি সর্ব্বনাশ! কাতর হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বৌ, কি হয়েছে? তার এই ছেলেমিপানার বাড়াবাড়ি আরও খারাপ লাগে রম্ভার, আরও তার মন খারাপ হয়ে যায়। আবেষ্টনীর চাপে একবার তার মনে হয়েছিল জেলখানায় কয়েদ হয়েছে। এ অনুভূতিকে আমল না দিয়ে

দমন করে প্রায় কাটিয়ে উঠেছিল। এবার আরও প্রবল হয়ে ওঠে তার ফাঁদে আটকা পড়ার, চিরজন্মের জন্য আটকা পড়ার, প্রাণান্তকর অনুভূতি। বন্দীত্ব বোধের পীড়নটাই, তার কাছে চিরদিন সবচেয়ে অসহ্য।

কারো কাছে খুলে বলবার উপায় নেই। কেউ বুঝবে না। তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে সাধ যায়। নিজের হাত পা কামড়ে, দেয়ালে মাথা ঠুকে, মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে, চীৎকার করে তার নালিশ জানাতে ইচ্ছা করে ভাগ্যের এই কুৎসিৎ জুয়াচুরির বিরুদ্ধে।

কিন্তু কিছুই রম্ভা করে না। দাঁতে দাঁত কামড়ে ভাবে, না, না, না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করা হবে না। যদি ভুল হয়, যদি অন্যায় করে বসে? নিজের জীবনটা যদি তার নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, হোক। রামপাল তাকে ধরে বেঁধে বিয়ে করে নি, আমি এই আর আমি ওই বলে ভুলায়ও নি তাকে। তার কি অধিকার আছে রামপালের জীবনটা নষ্ট করার? আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দেবার? বড় কোন উদ্দেশ্যের জন্য যদি হত, রামপালের জীবন বা আত্মীয়বন্ধুর অশান্তির চেয়ে যার দাম বেশী, তা হলেও কথা ছিল। ওরকম কোন সুযোগ বা পথ যদি কখনো পাওয়া যায়, সে ভিন্ন কথা। নিজের তার যোগ্যতা কতটুকু তাই তার জানা নেই, তার কি সাজে বাহাদুরী করা? শুধু তার নিজের ভাল লাগছে না বলে? নিজের পছন্দ অপছন্দের খাতিরে?

না, না, না। সে ধৈর্য্য ধরে থাকবে।

রামপালের সঙ্গে সে তাই সামান্য কথা কাটাকাটি পর্য্যন্ত করে না, বিতৃষ্ণার ভাব দেখায় না। বাইরে কথাবার্তায় চালচলনে অতিমাত্রায় ধীরস্থির শান্ত হয়ে থাকে। সেটা বড়ই খাপছাড়া ঠেকে রামপালের কাছে। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রম্ভা দূর করতে পারে না, যাতে রামপাল ভয় পায়। রামপালের সোহাগ সে দূরে ঠেলে দেয় না, কিন্তু নিজে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতাও তার হয় না। যাতে তার আদর নিচ্ছে না ভেবে রামপাল কাতর হয়ে পড়ে।

পরের পূর্ণিমায় দুর্গা সিন্নী খাওয়াবার এবং রামপালের গানের আসর বসাবার আয়োজন করল। ঘটনা ঘটল একটা। যে সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু এসে আশার আলো দেখিয়ে রম্ভাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

রামপালের গান যখন বেশ জমেছে, উপস্থিত সকলের মধ্যে দেখা দিয়েছে যথারীতি প্রতিক্রিয়া, ছেলের মুখে মাই গুঁজে দুর্গা আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে পড়েছে সুরের নেশায়, হঠাৎ গানে বাধা পড়ল।

পাগলা ও আরেকজন অচেনা মানুষ নরেশকে ধরাধরি করে এনে দাওয়ায় বসিয়ে দিল। থামে ঠেস দিয়ে বসে বুকের কাছে মাথা নামিয়ে নরেশ ধুঁকতে লাগল। তার মুখে রক্ত, গেঞ্জি ও কাপড়ে রক্তের দাগ।

এক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতার পর সকলে প্রায় একসঙ্গে কলরব করে ওঠে। এ অবস্থায় স্বাওরকে দেখেও দুর্গা এতক্ষণের গা ঝিমঝিম করা গানের নেশা কাটিয়ে কিছু বুঝতে পারে নি. সকলের ফেটেপড়া কোলাহল যেন ঝাঁকি দিয়ে তাকে সচেতন করে দেয়। ছেলের মুখ থেকে স্তনের বোঁটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সেইখানে দড়াম করে আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে সকলের আওয়াজ ছাপিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে ওঠে, 'ওগো, মাগো! ইকি!'

এর গা-মাড়িয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পরক্ষণে সে গিয়ে হাজির হয় নরেশের কাছে।

পাগলা বলে, 'কেষ্টবাবু মেরে লাশ করেছেন।'

দুর্গার ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে রম্ভা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কেষ্টবাবু?'

পাগলা সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ, কেষ্টবাবু। বাপরে বাপ, কি আথালি পিথালি মারটা লাগালে! ভয় হল কি মেরেই বুঝি ফেলেন!'

শুনে কলরব থামিয়ে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। পাগলার কথায় কারো বিশ্বাস হতে চায় না। কৃষ্ণেন্দুকে এরা মেয়েপুরুষ সকলেই জানে, অনেকদিন থেকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানে। বড় সে ভালবাসে তাদের, তাদের ভালর জন্য চেষ্টার তার কামাই নেই, একবার সে জেলে গেছে তাদের জন্য। আজ নিজে সে নরেশকে মেরে আধমরা করে দিয়েছে!

'কেন মারলেন?' পরেশ শুধোল।

পাগলা এদিক ওদিক তাকায়, হঠাৎ একবার মুচকে হেসেই গম্ভীর হয়ে যায়, মাথা নেড়ে বলে, 'দোষঘাট নইলে কি এমনি মেরেছে, তেমন লোক কেষ্টবাবু নয়। যাক্ গা মারুক, ও কথা বাদ দাও।' পাগলার সঙ্গী মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে বলে, 'সে বড় কেলেঙ্কারির কথা। এ ছোঁড়া বড়

বজ্জাত। আজ দুপুরে সোনামাসীর ঘরে ঢুকে—'

আজ দুপুরে সোনামাসী তাগাদায় বার হয়েছিল, টেঁপি ঘরে ছিল একা। নরেশ নাকি তখন ঘরে ঢুকে কেলেঙ্কারি করেছে। কৃষ্ণেন্দু তাকে এই অপরাধে মেরেছে।

'কখন মারলেন?' 'কোথায়?' 'কে কে ছিল?' 'কেষ্টবাবু কই?' চারিদিক থেকে প্রশ্ন আসে একঝাঁক। পাগলার সঙ্গী বলে, 'সোনামাসী দুজনকে নিয়ে নালিশ করতে গিয়েছিল কেষ্টবাবুর বাড়ী। কেষ্টবাবু এই খানিক আগে বাড়ী ফিরলেন। টেঁপিকে সব শুধোলেন, তারপর পিটিয়ে দিলেন নরেশকে।' সে থামতেই আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন ওঠে।

জেরায় বিব্রত পাগলার সঙ্গী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'আমি আর কিছু জানিনে বাবু, পাগলাকে শুধোও।'

পাগলাও আর কিছু জানে না। সকলে হতাশভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এরকম কেলেঙ্কারী সংসারে অনেক ঘটে, শোনামাত্র টের পাওয়া যায় কি ঘটেছে। এ ব্যাপারের মাথামুণ্ড কিছুই যে বোঝা গেল না। কৃষ্ণেন্দু মেরে আধমরা করে দেয় এমন একটা কাণ্ড করল নরেশ দুপুরবেলা, আবার সন্ধ্যার সময় সোনামাসী মেয়েকে নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে নালিশ করতে গেলে সেও সঙ্গে গেল। তাছাড়া, সোনামাসী ঘরে না থাক, বাড়ীতে আরও অনেক ভাড়াটে বাস করে, দুপুরবেলা একটা হৈ চৈ হয়ে থাকলে এতক্ষণ পাড়ার কারো তো সেটা অজানা থাকার কথা নয়। জগু আর সৈরভী ও-বাড়ীর বাসিন্দা। জগু নয় কাজে গিয়েছিল, তার বৌ আর বোন এবং সৈরভী তো মরে থাকেনি! সারাটা দুপুর যে বাড়ীতে এমন একটা কাণ্ড ঘটল তবু ওরা কিছু টের পেল না, গান শুনতে এসেই সবিস্তারে গল্প করল না ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফোঁড়ন দিয়ে? সকলে এদের প্রশ্ন করে, এরা হতভম্বের মত বলে যে কিছুই তারা জানে না। শুধু সৈরভীর কাছে শোনা যায়, নরেশকে সে দুপুরবেলা বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল। তা, ও ছোঁড়া তো আজকাল যখন তখন ও বাড়ীতে যায়, সোনামাসী বেশ খাতির করে ওকে।

'ও মাগীর পেটে পেটে প্যাঁচ, ভগবান জানে কি মতলব করেছে। সাতবচ্ছর এক বাড়ীতে রইছি, চার গণ্ডা পয়সা চাইলে একটি পয়সা সুদ নেয়, ও মাগী পারে না কি!'

দুর্গা ইতিমধ্যে জল এনে নরেশকে কুলকুচো করিয়েছে, মুখ ধুইয়ে ঘাড়ে মাথায় জল থাপড়ে দিয়ে পাখা হাতে বাতাস করছে। কানে তার যাচ্ছে সব কথাই কিন্তু ন্যাওরের শুশ্রূষা ছাড়া সব বিষয়ে সে যেন উদাসীন, কারো দিকে তাকাবারও সময় নেই। সুরেশ এতক্ষণ গুম্ খেয়ে ছিল, মুখ না ফিরিয়ে থেকে থেকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ভাই-এর দিকে। কৃষ্ণেন্দু এমন মার মেরেছে যে দু'টো চড়চাপড় দেবারও তার উপায় নেই, এই আপশোষ গুমরে উঠছিল তার মনে। হঠাৎ তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে সে বার করে নিয়ে আসে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, নরেশের সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে, 'এই শুয়োর হারামজাদা! বল কি করেছিস? সব্বায়ের সামনে বল—কেষ্টবাবু রেয়াৎ করেছে, আমি তোকে খুন করব।

দুর্গা ফোঁস করে ওঠে, 'না জেনে না শুনে তোমার অত চোটপাট কিসের গো? নিজে কত সাধু। খুন করবে! ভাইকে যে খুন করেছে তাকে খুন করবে যাওনা, বুঝি কেমন মরদ?'

একজন লাঠি ছিনিয়ে নেয়, দু'তিন জন সুরেশকে টেনে নিয়ে যায় দূরে। দুর্গা তখনও চেঁচাচ্ছে: ইবার আসুক তোমার কেষ্টবাবু, একবারটি পা দিক উঠোনে, গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দোব। জজ ম্যাজিষ্টর! মেয়্যা করবে ছেনালি, সবটুকু দোষ চাপবে ছেলের ঘাড়ে। দারোগাবাবু! জজ ম্যাজিষ্টর!...

গজ্ গজ্ করতে করতে ন্যাওরকে ধরে তুলে দুর্গা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। রম্ভা সকলকে শুনিয়ে বলে, 'তা আমিও বলি, অত কথায় কাজ কি তোমাদের! যা শুনবার সব শুনবে আজ নয় তো কাল, চাপা তো রইবে না কিছু, চুপ মেরে যাও না সবাই এখন?'

চুপ অবশ্য কেউ করে না, সেটা অসম্ভব। রামপাল আবার গান আরম্ভ করে, কিন্তু গান আর জমে না। রামপাল নিজে কিছুক্ষণের মধ্যে মসগুল হয়ে যায় এবং তারি মত ভাববিলাসী কয়েকজন মেয়েপুরুষ মন দিয়ে তার গান শোনে, অন্য সকলে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যায়। থেকে থেকে এখানে ওখানে চাপা হাসি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কৌতূহল চাপতে না পেরে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ দুর্গার ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দেয়, কেউ একেবারে ভেতরে গিয়ে বিছানায় বসে, আত্মীয়তা জমাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু দুর্গা তাদের আমল দেয় না। চুপি চুপি অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, কি হয়েছিল জেনে তোমার দরকার ? বলে, বাইরে গিয়ে গান শোন না, ছেলেটা জিরোক ?'

দুর্গা নিজেই কি জানে কি হয়েছে যে দশজনকে বলবে ? জানবার জন্য তার নিজের মনটাই করছে ছটফট। নিরিবিলি যে দুটো কথা কইবে দ্যাওরের সঙ্গে তারও কি উপায় আছে ছাই ! মেজাজ তার ক্রমেই চড়ছিল। পাঁচসাত জনকে বিদেয় করার পর ক্ষান্তপিসী ঘরে আসতেই তাকে ঠেলে বার করে সে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে খিল চড়িয়ে দিল। শুধু রম্ভা রইল ঘরে। দুর্গার ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। গেঞ্জি ছেড়ে কাপড় বদলে নরেশ চৌকির শেষপ্রান্তে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। বসে ছিল, এখন আর সে ধুঁকছে না, কিন্তু মাথাটা ঝুঁকিয়েই রেখেছে। হয়তো মারের জন্য নয়, লজ্জাতেই মাথা তুলতে পারছে না ছেলেটা। দুর্গা চৌকিতে উঠে সাগ্রহে তার কাছে এগিয়ে গেল। একবার সে তাকায় রম্ভার দিকে, চোখে চোখে দু'জনের কথা হয় আর রম্ভার মুখে ফুটে ওঠে মৃদু কৌতুকের হাসি।

তখন নীচু গলায় দুর্গা বলে নরেশকে, 'হলতো ? কাণ্ড করলে তো দিনদুকুরে ? কত করে বললাম, অত ব্যাকুল হোয়ো না গো ছোটকত্তা, টেঁপির সাথে বিয়ে তোমার ঘটিয়ে দেব। সবুর বুঝি সইল না ?'—হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে উঠেই দুর্গা মুখে আঁচল গুঁজে দেয়। তার আর জিজ্ঞাসা করা হয় না ব্যাপারটা কি হয়েছিল, নিজের জিজ্ঞাসার ভূমিকাতেই কাবু হয়ে পড়ে নিজে।

রম্ভা বলে, 'হেসো না দিদি, এ হাসির কথা নয়। এ নিয়ে কাণ্ড হবে ঢের, সোনামাসী ছাড়বে নি, উঁহুঁ। শোন বলি নরেশ, খুলে বলো দিকি সবকথা, ঢেকোনি কিছু - ভর লাগছে আমার। সোনামাসী বুঝি হঠাৎ ঘরে ফিরে এল ? কি বললে এসে ?'

নরেশ মুখ তুলে তাকায়, কিছু বলে না। এখনো তার বিহ্বল ভাব কেটে যায়নি। চোখ দুটি তার অল্প লাল হয়ে উঠেছে। দুর্গা আর রম্ভার কৌতুহল সে মেটায় না, একটি কথাও তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। পালা করে দু'জনে জেরা করে, তোষামোদ করে, ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করে অনেকক্ষণ, নরেশ কিন্তু মুখ খোলে না কিছুতেই, কোণঠাসা প্রহৃত অবোধ

শিশুর মত ভীত অসহায় দৃষ্টিতে শুধু তাকাতে থাকে একবার দুর্গা একবার রম্ভার মুখের দিকে।

ঘরের চালা থেকে দেয়াল বেয়ে জ্যোস্না উঠানে নামতে নামতেই আজ গানের আসরে ভাঙ্গন ধরল। একজন দু'জন করে উঠে যেতে যেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসর একরকম হয়ে গেল খালি। মেয়েদের মধ্যে শুধু রইল রাণী, পুষ্প আর জগদম্বা এবং পুরুষদের মধ্যে রইল শরৎ, বিন্দে, ফেলনা আর গোপাল। রামপাল গেয়েই চলেছে। গোড়ায় বেশী লোক উপস্থিত না থাকলে রামপাল নিরুৎসাহ বোধ করে, কিছুক্ষণ গান গাইবার পর আসর আস্ত কি ভাঙ্গা এটা তার খেয়ালও থাকে না। অঙ্গন যদি এখন জনহীন অরণ্য হয়ে যায় তবু সে আপন মনে গেয়ে চলবে।

কিন্তু গানে আবার বাধা পড়ল। হঠাৎ গান বাজনা সব বন্ধ হয়ে যেতে সকলে তাকিয়ে দ্যাখে, কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে।

এ বাড়ীতে এবং এ পাড়ার অনেক বাড়ীতে মাঝে মাঝে বিনা খবরে হাজির হওয়া তার নতুন নয়। অন্যদিন কেউ ব্যস্ত বা বিস্মিত হত না। আজ তাকে দেখেই আকস্মিক উত্তেজনা অনুভব করে সকলে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল আর সেই সঙ্গে বোধ করতে লাগল অস্বস্তি। দোষ করুক আর যাই করুক, এ বাড়ীর একটি ছেলেকে সে অমানুষিক প্রহার করেছে, এখনো দু'ঘণ্টা হয়নি।

রম্ভা মোড়া এনে দিল। বসে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'নরেশ মরেনি তো রম্ভা?'

রম্ভা বলল, 'না।'

কৃষ্ণেন্দু উঠানে পা দিলেই দুর্গা তাকে গাল দেবে বলেছিল। মনে হয়েছিল, ছ'মাস এক বছর পরেও যদি কৃষ্ণেন্দু আসে, মনে সে রাগ পুষে রাখবে, গাল না দিয়ে ছাড়বে না। দু'ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণেন্দু হাজির হল, দুর্গার কিন্তু সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অন্যদিন খাতির করতে এগিয়ে আসে, একটু ব্যস্ত হয়, আজ দাওয়ায় কাঠ হয়ে বসে রইল—এইমাত্র।

নরেশ আর টেঁপির ব্যাপারটা জানা গেল কৃষ্ণেন্দুর কাছে।

সুরেশকে সম্বোধন করে সে বলল, 'ভাইটিকে তো তোমার মারলাম আচ্ছা করে সুরেশ, ভাবলাম, মেরেছি বেশ করেছি, তোমায় একবার বলে যাওয়া উচিত।'

ব্যাপারটা বিশ্রী, তবে এতক্ষণ সকলে যা অনুমান করছিল সেরকম কিছু নয়। সোনামাসীর জমানো টাকা আর সোনামাসীর মেয়েকে নিয়ে নরেশ পালিয়ে যাবার আয়োজন করেছিল। শুধু টেঁপিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব থাকলে হয়তো বাধা পড়ত না, টেঁপি চুপি চুপি বেরিয়ে আসত আর দু'জনে চলে যেত যেদিকে দু'চোখ যায়। কিন্তু টাকা তো চাই! সন্ধ্যা থেকে সোনামাসী ঘর আগলে বসে থাকে, আদায়ে বার হয় শুধু দিনের বেলা। বাড়ীতেও লোক থাকে অনেক। দুপুর বেলা শুধু যে যার ঘরে ঘুমোয়। তাই আজ দুপুরে সোনামাসী তাগিদে বেরিয়ে যাওয়ায় পর নরেশ গিয়ে সোনামাসীর টিনের তোরঙ্গ ভেঙ্গেছে, চৌকির নীচে গর্ত্ত খুঁড়েছে, টেঁপির কাছে জেনে নিয়ে আরও যেখানে যেখানে টাকা লুকানো ছিল, সব খুঁজে বার করেছে। জগুর বৌ কি করতে তার ঘরের বাইরে এসেছিল, সে ঘরে ফিরে গেলেই দু'জনে বেরিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ সোনামাসী এসে হাজির। বিকেল পর্য্যন্ত ঘরে খিল দিয়ে সোনামাসী নরেশকে আটকে রেখেছে, একটু একটু করে জেনে নিয়েছে সব কথা, তারপর ঘরে তালা দিয়ে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছে গিয়েছে নালিশ করতে। পথে নরেশ একবার পালাবার উপক্রম করেছিল, সোনামাসী তাকে শাসিয়েছে, পালাস্ যদি তো পুলিশ ডাকব। কৃষ্ণেন্দুর বাড়ী গিয়ে দু'জনকে আগলে ঠায় বসে থেকেছে তার বাড়ী ফিরবার অপেক্ষায়।

'ছোঁড়াকে মারতাম না সুরেশ। চোর তো নয়, জবরদস্তিও করেনি মেয়েটার ওপর। ভাবলাম দুজনের মধ্যে যখন এই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, দু'জনের বিয়ে দিলে মন্দ হবে না। সোনামাসীও রাজী হল। আমি সেই কথা বুঝিয়ে বলতে গেলাম ওকে যে এসব কুবুদ্ধি করে হাঙ্গামা বাধাস নে, এই মাসে তোদের বিয়ে দোব। তা উনি কি জবাব দিলেন শুনবে? যে মেয়ে বেরিয়ে যায় তাকে উনি বিয়ে করবেন না, ও নষ্ট মেয়ে।'

সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। খানিক পরে উঠানের এক প্রান্ত থেকে প্রশ্ন আসে, 'এটা কি আপনার উচিত হলগো কেষ্টবাবু?'

কানাই-এর বৌ লক্ষ্মী কখন ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার ধাপে বসেছে কেউ লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্মী কখনো গানের আসরে আসে না, গল্প করতেও নয়। হয় ঘরে কাজ করে, নয় তফাতে ওই ধাপে চুপ করে বসে থাকে।

'কেন রোগা বৌ ?'

'সব যে জানাজানি করে দিলেন, কলঙ্ক রটল না মেয়েটার ?'

কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাকে বড়ই বিপন্ন মনে হল। তারপর গলা সাফ করে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'কলঙ্ক রটাই ভাল রোগা বৌ।'

'ওমা, ইকি কথা বলেন কেষ্টবাবু !'

'মেয়েটা কম পাজী নয় রোগা বৌ। পীরিত করেছে, পালিয়ে যেত, সে ভিন্ন কথা। মার টাকাগুলি বাগিয়ে পালাচ্ছিল কি বলে, এত আদর যত্নে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে না ? নরেশকে আমি মারলাম, মেয়েটারও তো সাজা হওয়া উচিত।'

'সাজা হল সোনামাসীর।'

'তাও হওয়া উচিত। মেয়েকে অমন আল্লাদী করল কেন ? তাছাড়া কি জান রোগা বৌ, সোনামাসীর সয়তানী বুদ্ধি কম নয়। বিয়ে হলে পণের টাকা পাবে বেশী, মেয়েটা থাকবে কাছাকাছি, তাই না মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল।'

লক্ষ্মী আর কিছু বলল না। তার মুখে শুধু ফুটে উঠল অবজ্ঞার হাসি, অল্প আলোয় যা কারো চোখে পড়ল না।

যাওয়ার আগে কৃষ্ণেন্দু রম্ভাকে জিজ্ঞেস করে, 'শরীর ভাল নেই ?'

রম্ভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'ও ! মন ভাল নেই তবে। কষ্ট হচ্ছে বাপের বাড়ীর জন্যে ?'

রম্ভার চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা। লক্ষ্য করে কৃষ্ণেন্দু নড়েচড়ে বসে। ভাল করে তাকায় রম্ভার দিকে। খানিক ভেবে বলে, 'চলো তোমার ঘরে যাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'আমরা ভাইবোন দুটো ঘরোয়া কথা বলব। কেউ যেন এসো না।'

খোলা দরজার কাছেই কৃষ্ণেন্দু বসে। সবাই যাতে তাকে দেখতে পায়। এটা সাধারণ দরকারী সতর্কতা। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক এখানকার জগতে বড় ঠুনকো। যতই তাকে শ্রদ্ধা করুক সবাই, অন্তরালে যুবতী মেয়ের সঙ্গে মাখামাখি করলে অন্ততঃ দু'চারটা মনে খটকা লাগবেই। কিছু বলবে না কেউ,

বাতিলও করবে না তাকে। ধর্মের বিকারে সংস্কার জন্মেছে একটা। গুরু মোহন্ত সাধু মহাপুরুষ খেলাচ্ছলে মেয়ে বৌকে সম্ভোগ করলে সেটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেয়া যায়। গোপাল ভাঁড়ের সে গল্প তো আকাশ থেকে মাগনা নামে নি যে গুরু এসে গেরস্ত বাড়ীর বৌয়ের কানে মন্ত্র দেয়—তুমি রাধা আমি শ্যাম। বিশেষ ভক্তিভাজনদের সম্পর্কে যৌন ঈর্ষা নির্জ্জীব। তবু, মিছামিছি দু'চারটা মনেও খটকা বাধিয়ে লাভ কি ?

'কি হয়েছে রম্ভা ?' জানবার জোরালো সস্নেহ দাবীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খুলে বল। স্পষ্ট করে বল। তুমি দশটা মেয়ের মত নও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দশবার দশরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতে হলে মনে দুঃখ পাব। ভাবব, তোমায় যা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। বলো কি হয়েছে।'

'কার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমায় ?

'সে কি ?'

'আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমারি ভুল হয়েছিল।'

'দোষ দাও বা না দাও তোমার খুশী। ভুলটা কিসের ?'

এই সেদিন কোমরে আঁচল জড়িয়ে পিছনে ঘাড় বাঁকিয়ে রম্ভা গায়ে পড়ে কলহ করেছিল তার সঙ্গে, আজ সে মাথা নীচু করে আঁচলের প্রান্ত জড়ায় আঙ্গুলে। কত শঙ্কার কাঁটা যে ফোটে কৃষ্ণেন্দুর বুকে।

রম্ভা ধীরে ধীরে বলে, 'খালি গাইয়ে বাজিয়ে আল্‌সে লোক তা জানতাম না। দেশের কাজে অ্যাতটুকু ঝোঁক নেই। আপনি যেমন খাঁটি লোক খোঁজেন, ও তেমনি বলে ঝগড়া করেছিলাম না আপনার সঙ্গে ? ও ঠিক তার উল্টো। দশজনকে দিয়ে কিছু করাবে দূরে থাক, নিজে কখনো কিছু করবে না। আপনি সভা করলেন সেদিন খালপারে, কত বললাম নিয়ে যেতে। বললে পিত্যয় যাবেন ? হেসে উড়িয়ে দিলে, ও সভাটভা নাকি সব বাজে হাঙ্গামার ব্যাপার। সিদ্ধি খেয়ে হৈ চৈ করলে দুগ্‌গাদির সোয়ামীর সাথে।'

আরও নানা কথা বলে রম্ভা, বক্তব্য তার ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়, কৃষ্ণেন্দু যতটা আশা করেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। কৃষ্ণেন্দু বিস্ময়ের সঙ্গে শোনে। শুধু আদর্শ নয়, এতখানি জোরালো স্বভাবগত আদর্শনিষ্ঠা সে যেন রম্ভার মধ্যে প্রত্যাশা করে নি, তাকে আর দশটি মেয়ের মত মনে না করা সত্ত্বেও।

কে যেন কাঁদছে পাশের বাড়ীতে, রোগে ভুগে কে বুঝি মরেছে তার জন্য। খাঁকারি দিয়ে গলা শানিয়ে কে গালাগালি দিচ্ছে। খানিক তফাতে বিশৃঙ্খল কোলাহল। আশে পাশে উচ্চকণ্ঠ, শিশুর কান্না। বেসুরা বাঁশের বাঁশী আর হারমোনিয়মের আওয়াজ ছাপানো ঘুঙুরের আওয়াজ। বুড়ো সাতকড়ি কাশছে ওপাশের বাড়ীতে।

'তুমি ভুল করছ রম্ভা। ছি। স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর।' ইচ্ছে করে কৃষ্ণেন্দু গলার আওয়াজ অতিরিক্ত কড়া করে। রম্ভা মুখ তুলে চোখ মেলে সোজা তাকায়।

'রামপাল খাঁটি চিজ। সব মাল মশলা আছে ওর মধ্যে। শুধু ঠিকমত গড়েপিটে ওঠে নি। সবাই তো সুযোগ পায় না। ওকে তুমি হাল্কা ভাবছ, মোটেই তা নয়। মনের মোড়টা ওর ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। ওকে যদি তৈরী করে নেওয়া যায় রম্ভা—' কৃষ্ণেন্দুকে উত্তেজিত, উদ্দীপ্ত মনে হয়, '—জাগিয়ে দেওয়া যায় ওকে, ওর তুলনা থাকবে না। তাই তো ভাবছিলাম আমি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হল, তুমি ওর চেতনা এনে দেবে। একটা দুটো তিনটে বছর বাদে ওর মধ্যে আমি একজন আদর্শ কর্ম্মী পাব। তুমি এর মধ্যে হাল ছেড়ে হতাশ হয়ে বসে আছ?'

কৃষ্ণেন্দু চলে যায়, রামপাল লাউ-চিংড়ি দিয়ে ভাত খায়, নিজে খেয়ে দুর্গাকে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে রাখতে সাহায্য করে রম্ভা ঘরে যায়, পান সেজে নিজে খেয়ে রামপালের মুখে একটা গুঁজে দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'কি সুন্দর তুমি গাইতে পার!'

তাই বটে, তাই বটে। রম্ভার দেহ মন সায় দেয়, তাই বটে, তাই বটে। এ খাঁটি মানুষ। সে যে অনেক বড় বড় কাজের কথা ভাবে, এই মানুষটাকে কাজের মানুষে পরিণত করানোর চেয়ে বড় কাজ তার কি থাকতে পারে?

মাঝখানে কিছুদিনের ব্যবধানের পর রামপালের আলিঙ্গনে আবার তার রোমাঞ্চ হয়। রম্ভা তাকে অনেক দিন পরে আগের মত জোরে বুকে চেপে ধরেছে অনুভব করে রামপালের সুস্থ সবল দেহ উল্লসিত হয়ে ওঠে।

'ও রম্ভা, ও বৌ। ঝুমুরিয়া নিয়ে যাব তোকে। দু'চার দিনের মধ্যে নিয়ে যাব।'

'কেন গো মশায়, কেন?'

'ঘুরে আসবি। মন খুশী করে আসবি। তোকে আমি খুশী করতে চাই বৌ।'

রম্ভা বলে, 'শোন। ঝুমুরিয়া যাব'খন ওমাসে। কাল যাও দিকিন একবার কেষ্টবাবুর কাছে। বলবে রম্ভা ডেকেছে আরেক দিন।'

এদিকে হীরেন বলে, 'না মমতা, তা হয় না। তোমার বন্ধুদের এনে আড্ডা দাও, পার্টি দাও, এখানে যাও, ওখানে যাও, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা ভদ্র অভদ্র কুলি মজুর তোমার কাছে যাতায়াত করবে, এ বাড়িতে তা কি চলে?

'ওরাই তো আমার বন্ধু।'

'ওদের নিয়ে অন্য কোথাও মিটিং কর, ওদের বস্তিতে যাও, কোথাও একটা অপিস মত করে সেখানে দু'এক ঘণ্টা ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর, এসবে আমি তো আপত্তি করছি না। কিন্তু যতই হোক তুমি এ বাড়ীর বৌ। এ বাড়ীতে কি তোমার হৈ চৈ করা চলে?

ঐশ্বর্য্যের নিশীথ গুঞ্জন, নীরেনের বাঁশী, সোমনাথের সাধন সঙ্গীত, রঙীন ঘর, দামী আসবাব, বিস্ফুরিত আলো। মমতার পরণে শুধু সাদা মিলের শাড়ী, কানে শুধু ছোট দুটি দুল। মমতার চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে ঠোঁট কামড়ে থাকে। দু'জনের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে ঘরের মধ্যে।

'তবে চলো আমরা অন্য বাড়ীতে যাই।' মমতা বলে।

'অন্য বাড়ীতে?'

'এ বাড়ীটা পচা, সেকেলে। চলো ভিন্ন একটা বাড়ীতে আমরা নিজের মনে স্বাধীনভাবে থাকবো।' হীরেনের গলা জড়িয়ে মমতা আলগোছে তার কপালে চুমু খায়, 'আমাকে গড়ে তুলতে হবে তো তোমায়? অনেক বড়লোকী চাল ভোলাতে হবে তোমায়। তোমায় আমি বিপ্লবী করে ছাড়ব।' হীরেনের গালে গাল ঠেকিয়ে রেখে সে যোগ দেয়, 'ছাখো, বলেছিলাম পাঁচ বছর বন্ধ রাখবো—তোমার কথায় রাজী হলাম তো একটা ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত, যখনি হোক? তুমিও আমার কথা রাখো। ভিন্ন একটা বাড়ী নাও। এখানে আমার দম আটকে আসছে। কত কি করব ভেবে রেখেছি, এখানে থাকলে কিছুই হবে না। এমন করে সবাই এখানে তাকায় আমার দিকে।'

মমতার নিবিড় স্পর্শে কোটি বসন্তের উন্মাদনা ঘনিয়ে আসে, সব তুচ্ছ হয়ে যায় জগতে। কত দীর্ঘ সাধনার পর, কত বিষণ্ন দিন ও বিনিদ্র রজনী যাপনের পর মমতাকে সে লাভ করেছে! তা ছাড়া, বড় অশান্তিও সৃষ্টি হয়েছে বাড়ীতে নতুন বৌয়ের চালচলন নিয়ে।

অন্তঃপুরের অলস-বিলাসী মেয়েলি জীবনের মৃদু শান্ত ছন্দ সে মেনে নেবে কেউ তা আশা করে নি, কলেজে পড়া একেলে চপল মেয়ে হিসেবেই তাকে মেনে নিতে সকলে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু একি মেয়েরে বাবা! বাড়ীর কারো সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইবার তার সময় হয় না, অথচ বাইরের আজে বাজে লোকের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার অন্ত নেই, যত ভবঘুরে বয়াটে ছোঁড়া আর কুলি মজুরের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা! যখন ইচ্ছা বেরিয়ে যাচ্ছে, একা কিম্বা যার তার সঙ্গে, যখন ইচ্ছা ফিরে আসছে, রাত যে কত হয়েছে গ্রাহ্যও নেই। আর যদিই বা দুটো কথা বলে কারো সঙ্গে, কি সে কথা বলার ঢং! যেন কোথাকার মহারাণী এসেছেন চাষাভূষোর ঘরে দয়া করে বেড়াতে!

লোকনাথের মুখ অন্ধকার, আত্মীয় কুটুম্বের মুখ বাঁকা, ছোটদের মুখ বিষণ্ন, দাসদাসীর মুখ সয়তানি কৌতুকে উজ্জ্বল। চারিদিকে অবিরাম গুজগুজানি ফিসফিসানি ও ক্রুদ্ধ তীব্র মন্তব্য—হীরেন জানে সমস্তই মমতার সমালোচনা।

সে তাই একটা বাড়ীভাড়া নেয় পার্ক ষ্ট্রীটে। লোকনাথ তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন।

কোনো মধ্যবিত্ত পাড়ায় অল্প টাকায় সাধারণ একটি ছোটখাট বাড়ী বা বাড়ীর অংশ ভাড়া নেবার ইচ্ছা ছিল মমতার। কিন্তু এ আব্দার শুনে এমন করে তাকিয়েছিল হীরেন, যেন বলতে চাইছে, তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ভিন্ন হলাম, তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও? ছোট বাড়ীতে গরীবের মতো থাকবার সাধটা মমতা তাই চেপে যায়।

সব বিষয়ে মমতার বাড়াবাড়ির জন্য একটু যা জর্জ্জরিত থাকে হীরেন, নতুবা সে পরম সুখেই দিন কাটায় নতুন বাড়ীতে।

মমতার কাছ থেকে অযাচিতভাবে একটু স্নেহভরা সেবা যত্ন পাবার জন্য তার মনের গহনে সে লালায়িত হয়ে থাকে,—যে সেবা যত্নের স্বাদ পেয়েছিল মায়ের কাছে, তার বাড়ির মেয়েরা যা আজো স্বামী পুত্রকে দিচ্ছে, দিগম্বরী

যার নমুনা দেখিয়েছে চমকপ্রদ। কান গরম হয়ে ওঠে হীরেনের। স্ত্রীকে দাসীভাবে পেতে সাধ যায়, একি অসভ্য অসংস্কৃত মন তার, ওরকম দশ বিশটা মেয়েকে সে তো বিয়ে করতে পারত, মমতাকে বিয়ে করার তবে তার কি দরকার ছিল? এত ভালবাসে মমতা তাকে, তাতেও তার মন ওঠে না? মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি অতিক্রম করে আসার অহঙ্কারকে তুষ্ট করতে হীরেন সব বিষয়ে মমতাকে স্বাধীনতা দেয়, তার কোনো কাজের সমালোচনা করে না। স্ত্রী তার সাথী, তার বন্ধু।

মমতার সঙ্গে একা থাকার সময় ছাড়া নিজেকে তার সাথীহীন বন্ধুহীন একাকী মনে হয়, পরিত্যক্ত মনে হয়। মমতা ও তার মেয়ে-পুরুষ বন্ধুদের মধ্যেই যেন তার এই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি চরমে উঠে যায়। নিজেকে মনে হয় অন্য এক জগতের মানুষ। অথচ দূরে সরে থাকবার উপায় তার নেই। মমতা চায় সে তার পরিচিত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করুক, নবযুগের এত যে নতুন চিন্তাধারা সে সঞ্চয় করেছে বই থেকে, বাস্তব উপলব্ধিতে সার্থক হোক সে-সব।

মমতা বলে, 'তোমার মুখ ভার কেন?'

হীরেন বলে, 'কই না? শরীরটা ভাল নেই।'

মমতার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন এক মুহূর্ত্তে হীরেনকে কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ, উল্লসিত করে দেয়। এবং হৃদয় মন হঠাৎ জুড়িয়ে যাওয়ায় সে ভাল করে টের পায় হৃদয় মন তার কেমন জ্বালায় জ্বলছিল।

'শরীর খারাপ? কি হয়েছে? আমায় বলো নি কেন আগে?' মমতা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে। বলে, 'তোমার আজ বেরিয়ে কাজ নেই, আমি কোথাও যাব না।' সব এনগেজমেণ্ট বাতিল করে, যে আসুক তাকেই সে বাড়ী নেই বলে দেবার জন্য দরোয়ানকে হুকুম দিয়ে, মমতা নিজে সঙ্গে থেকে হীরেনকে বিশ্রাম করায়।

মমতার রূপ ও আকর্ষণ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে মনে হয় হীরেনের। প্রেমের নদীতে জোয়ার এসেছে ভাঁটার পর কলোচ্ছ্বাসে। সস্তা ছিটের ব্লাউজ ঢাকা ও দুটি স্তনের দাম কি কোটি টাকা? এ মক্ষি কোমর কোথায় পেল সে? মোটা মিলের রঙিন শাড়িতে সে কি ইচ্ছে করে ঢেকে রাখে নিজের কোমর থেকে পা তক্, কামনায় যাতে পুড়ে না যায় তার প্রিয়তম?

গলায় কলসী বাইন্ধ্যা গংগায় ডুইব্যা গ্যাছে।

দীর্ঘনিশ্বাসে যেন হৃদপিণ্ডটা বেরিয়ে আসে হীরেনের। শরীর ভাল নেই, তার শরীর ভাল নেই! ভাল না থাকা শরীরটা এখন যদি চায় মমতার শরীরটাকে, কি ভালগার না জানি তাকে ভাববে মমতা!

এর চেয়ে মরণ ভাল নয় কি? অথবা লাথি মেরে চুরমার করে ফেলা এই নিষ্ঠুর রূপসীকে?

সাদা আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালিয়ে মোটা মিলের রঙীন শাড়ি আর ছিটের ব্লাউজ খুলে সিল্কের সূক্ষ্ম রাত্রিবাস গায়ে চাপিয়ে বিছানায় এসে অভিমানের ভানে মমতা বলে, 'নিজেকে কেন এত চেপে রাখ বলত? চোখ দেখে টের পাই না আমি? বড্ড ছেলেমানুষ তুমি। হ্যাভলক এলিসের ক'খানা বই তোমার জন্য কিনে আনব।'

'শরীরটা ভাল নেই।'

'ও!'

শরৎ শেষের স্নিগ্ধতা তপ্ত সহরের নিশ্বাস শুষছে। কুয়াসায় সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াটে, তার বেশির ভাগ খাঁটি ধোঁয়া, কয়লা খনির কয়লার ধোঁয়া, যেখানে মেয়ে-মজুর পুরুষের সঙ্গে কয়লা কাটতে কাটতে কয়লা-কালো ছেলে বিইয়ে ফেলে। আরিফ এলো একদিন সন্ধ্যার সময় মমতার বাড়ীতে, সঙ্গে তার পুলিশের লোক।

সিঁড়ির নীচের হলে দাঁড়ালো তারা মুখোমুখি।

মমতা বলল, 'আরিফ! কি হয়েছে আরিফ?'

আরিফ বলল, 'যাচ্ছি মমতা।'

'যাচ্ছ? যাচ্ছ মানে?'

'জেলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'দেশের লোককে জাগতে বলে পরপর কটা লেকচার দিয়েছি বলে বোধ হয়। ঠিক জানিনে। বিচার-টিচার হবে না। উনি খুব ভদ্রলোক—ওই যে উনি, যিনি আমায় নিতে এসেছেন। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করব বলামাত্র রাজী হলেন। ভাখো, হাতকড়া পর্য্যন্ত পরান নি। অতদূরে দাঁড়িয়ে আমার

ওপর শুধু চোখের নজর রেখেছেন। আমি ভেতরে ঢুকে খিড়কি দিয়ে পালিয়ে গেলে বেচারী কি বিপদেই পড়বেন। কিন্তু উনি নাকি আমাদের বিশ্বাস করেন। নিজেই বললেন, আমরা যদি কথা দি, মরে গেলেও নাকি সে কথা রাখি। রীতিমতো যেন শ্রদ্ধা করেন আমাদের!—কেমন আছো?

'আরিফ!'

দুহাতে আরিফকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুমু খেয়ে মমতা বলে; 'আরিফ! আমায় শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। আমায় চুমু খাও।'

মমতা জানত, হীরেন বাড়ী আছে। হীরেন যে তার পিছু পিছু নেমে আসবে, তাও সে জানত। কিন্তু আদর্শবাদী মেয়ে বলে জানতো না, কিসে কি হয়।

সিঁড়ির মাথায় হীরেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নামবার জন্য উঁচু করা পাটিকে উঁচু করে রেখেই। তাকিয়ে ছাখে মমতার আলিঙ্গন ও চুম্বন, আরিফের নাম ধরে তার আবেগভরা ব্যাকুল ডাক শোনে। হঠাৎ কি করে বসবে এই ভয়ে দিশেহারা হয়ে তারপর সে ঘরে চলে যায়। ইজি-চেয়ারে তাকে চিৎ হয়ে পড়তে হয়। বুঝতে পারে, তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। বিরাট একটা এলোপাথাড়ি আন্দোলন তাকে গ্রাস করেছে সম্পূর্ণরূপে, তার রক্তমাংসে অস্থি-মজ্জায় প্রমত্ত অস্থিরতা অথচ কি যেন একটা স্তব্ধ হয়ে গেছে ভেতরে, মরে গেছে। উঠে গিয়ে একেবারে গোটা চারেক এ্যাসপিরিন গিলে হীরেন আবার ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দেয়। বন্যতা, গুণ্ডামি চলবে না। সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। অ্যাসপিরিন খেয়ে হোক, শিরা কেটে রক্ত বার করে হোক, ভদ্র তাকে থাকতেই হবে।

চোখের জলে ঝাপ্সা চোখ নিয়ে মমতা ঘরে আসে, ধপ করে বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

'আরিফ এসেছিল।'

'জানি।'

'একবার গেলে না নীচে? ওকে অ্যারেষ্ট করেছে।'

'অ্যারেষ্ট করেছে? ও!' সন্ধ্যার সময় প্রকাশ্য হল ঘরে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে মমতার ওরকম আচরণের মানেটা হীরেন বুঝতে পারছিল না। এতবড় বাড়ী, এতগুলি নির্জ্জন ঘর, আরিফকে কোন ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেই হত। এবার

সে বুঝতে পারে, আত্মহারা হয়ে মমতা সতর্কতা ভুলে গিয়েছিল। এখানকার প্রায় অসহনীয় মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও এক সিনিক ফাজিল বন্ধুর বিশেষ প্রিয় একটি তামাসার কথা হীরেনের মনে পড়ে যায়; সিফিলিস আর প্রেম গোপন থাকে না। একদিন হাসি পেত কথাটা শুনে। আজ শব্দগুলি যেন ভারি ধারালো শাবল হয়ে মনের মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়ায়, খুঁড়ে ফেলতে থাকে তার মন।

'এমন খারাপ হয়ে গেছে মনটা। কান্না পাচ্ছে সত্যি।'

হীরেন কথা বলে না। এবার সচেতন হয়ে ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোমার ?'

'মাথা ধরেছে।'

'অ্যাসপিরিন খাবে ?'

'খেয়েছি।'

মমতা ব্যথিত চোখে খানিকক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে। মৃদুস্বরে বলে, 'আরিফকে তুমি পছন্দ কর না।'

'সেটা কি আমার অপরাধ ? তোমার সঙ্গে ওর ছেলেবেলা থেকে ভাব, ভালবাসা। আমার সঙ্গে দুদিনের পরিচয়।'

'আমার সঙ্গেও তো তাই, আমায় পছন্দ হল কি করে তোমার ?'

'তোমার কথা ভিন্ন।'

কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মমতা উঠে এসে আলগোছে ইজিচেয়ারের হাতায় বসে হীরেনের একটি হাত দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, 'তা নয়। আরিফকে পছন্দ কর না কেন বলব ? ওর সম্বন্ধে তোমার ভীষণ জেলাসি ছিল।'

কথায় ব্যবহারে কি করে এত সহজ, এত অন্তরঙ্গভাব বজায় রেখে চলেছে মমতা ? আরিফের বুক থেকে খসে তার কাছে এসে আপন হওয়া কি এতই পুরাণো আর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে মমতার ? কিন্তু তাই বা কি করে হয় ? এতকাল প্রতিদিন গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে যাবার পথে আরিফ তো তার সঙ্গে দেখা করে যেতে আসেনি। আপনি আরিফের বেদনায় কাবু হয়ে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য স্বামীকে পরিহার করে তার কাছ থেকে দূরে থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল মমতার পক্ষে, আরিফের জন্য বুকভরা দুঃখ নিয়ে তার কাছে

এসে প্রতিদিনের মত তার আপন সে হচ্ছে কি করে? হীরেন অনুভব করে, মমতা তার সহানুভূতি চায়। আরিফের জন্য মনে সে ব্যথা পেয়েছে, তাই স্বামীর কাছে সমবেদনা আশা করছে, সান্ত্বনা খুঁজছে! মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে হীরেনের। একেবারে চারটে অ্যাসপিরিণ খাওয়ার জন্য কিনা কে জানে!

হাত ছাড়িয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'একটু ঘুরে আসি।' জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে আবার বলে, 'ঘুরে আসি একটু।'

'আমিও যাব চলো। বড় বিশ্রী লাগছে।'

'না, না। একটা দরকার আছে আমার।'

প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় হীরেনের কথা। প্রায় সে ছিটকে পালিয়ে যায় ঘর থেকে।

শুধু ঘর থেকে নয়, মমতার নাগালের সীমা থেকেও যেন চিরদিনের জন্য। মমতাকে ঘিরে উপগ্রহের মত পাক খাওয়াই ছিল যেন তার জীবনের গতি, মাধ্যাকর্ষণের মত অদৃশ্য বাঁধনটা ছিঁড়ে যাওয়ায় ছিটকে সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। কোথায় সে থাকে কি সে করে মমতা জানতে পারে না। কথা সে কয় ভাসা ভাসা, অল্প দু'চারটে কথা। কাজ করার ছুতোয় কাজের ঘরে ঢোকে বাড়ী ফিরে, রাত বারটা একটায় খোঁজ নিতে গিয়ে মমতা ছাখে সেই ঘরেই বাড়তি বিছানাটিতে সে ঘুমিয়ে আছে। মাথা ঘুরে যায় মমতার। তার সঙ্গ পাবার জন্য কাজ যার চুলোয় গিয়েছিল, গভীর রাত্রে ঘুম পেলে যে তার কাছে ছেলেমানুষের মত নালিশ জানাত মানুষের ঘুম পাওয়ার বিরুদ্ধে, তাকে ছাড়াই তার দিবারাত্র কাটছে, ঘুম আসছে মমতাহীন শূন্য বিছানায়!

মমতা জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে তোমার? আমায় বলো। বলতে হবে আমাকে।'

'কি হবে? কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি? একি অন্যায় কথা। তুমি ভাব আমার ধৈর্য্যের সীমা নেই?' মমতার স্বর কড়া, ঝাঁঝালো।

'আমি তো কিছু করি নি তোমার? আমি নিজের মনে আছি।'

'হঠাৎ কেন তুমি নিজের মনে থাকবে? কারণ আছে নিশ্চয়। আমার জানবার অধিকার আছে কারণ কি!,

ধৈর্য্যের সীমা আছে! কারণ জানবার অধিকার আছে! দিগম্বরীর কথা ভাবে হীরেন, শশাঙ্কের মত স্বামীকেও যে দেবতার মত পূজা করে। তার বাড়ীর বৌদের কথা ভাবে হীরেন, যাদের স্বামী-অন্ত প্রাণ। অঙ্গ স্পর্শ করতে দেওয়া দূরে থাক, প্রেমালু চোখে পরপুরুষ তাকালে পর্যন্ত যারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মমতার ম্লান বিবর্ণ মুখ আর সকাতর চোখে কঠিন আত্মনিষ্ঠার, অনমনীয় আত্মমর্যাদার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখে জ্বালাভরা উদ্ধত বেদনার সঙ্গে হীরেনের মনে হয়, সে যদি ওদের মত হত!

শেষে একদিন রাত এগারটার সময় হীরেন মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে আসে। কাজের ঘরে গিয়ে শূন্য বিছানায় শোয়ার বদলে শোয়ার ঘরে যায়। মমতা বলে, 'তুমি ড্রিঙ্ক করেছ!'

'করেছি।'

'কেন?'

'তোমার জন্য।'

'তার মানে

'মানেই তো বলতে এলাম। স্ত্রী যদি হতে না পারবে, আমার স্ত্রী হয়েছিলে কেন? আমি কি তোমার ক্রীতদাস?'

'হেঁয়ালি কোরো না। আজ ঘুমোও, যা বলবার কাল বোলো। এসো। শোবে এসো। ও আলোটা জ্বেলেছ কেন? নিভিয়ে দিয়ে এসো। আমি তোমায় ঘুমপাড়িয়ে দিচ্ছি।'

মমতার খোলা কাঁধ, আধ ঢাকা বুক, কোমরের বাঁকা ভাঁজ দেখে হীরেন চোখ বোজে। ভাবে, এত মদ খেয়েও একটু বেপরোয়া হবার সাহস তার হল না মমতার কাছে! নেশা তিতো হয়ে যায়, জীবন বিষাক্ত।

'এখানে থাকতে আমার ভাল লাগছে না মমু। কাল আমরা ওবাড়ীতে চলে যাব। বাবাকে দুঃখ দিয়ে, সবার মনে কষ্ট দিয়ে—'

মমতা চুপ করে থাকে।

'এসব তোমায় ছাড়তে হবে মমু।'

'কোন সব?'

'এই যার তার সঙ্গে মেশা, যেখানে সেখানে যাওয়া। মমু, আমার চেয়ে এসব কি তোমার কাছে বড়, আমি তোমায় এত ভালবাসি?'

মমতা চুপ করে থাকে বিছানায়, মাতাল হীরেন চুপ করে থাকে চেয়ারে। হীরেন ভাবে, মমতা তাকে শুতে ডাকবে। মমতা ভাবে, হীরেন এসে তাকে বলবে, নেশার খেয়ালে কি বলেছি, আমায় মাপ কর।

পরদিন নেশা কেটে গেলে হীরেন কথা ফিরিয়ে নেবে, এ আশাও মমতার পূর্ণ হয় না। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ খেয়াল করা কথা তো সে বলে নি যে নেশার সঙ্গে কথাগুলিও উড়ে যাবে অর্থহীন বিকার গুঁড়োনো ধূলোর মত। কদিন ধরে মনের মধ্যে যে চিন্তা পাক খাচ্ছিল কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল না হীরেন, মদের নেশা শুধু সেটা প্রকাশ করার প্রেরণা জুগিয়েছে তাকে।

মমতা তবু অবিশ্বাসের স্বরে বলে, 'সত্যি সত্যি তুমি আমায় ফেলে ওবাড়ী চলে যাবে?'

'তোমায় ফেলে কেন? তুমি যাবে না?'

'সাধ করে কেউ জেলে যায়? তুমি যে বিধিনিষেধ জারি করেছ সে সব মানতে হলে আমায় পর্দ্দানশীন হয়ে থাকতে হবে ওখানে। সেটা কি তুমি সম্ভব মনে কর আমার পক্ষে? আমি অবাক হয়ে গেছি হীরেন, বুঝতে পারছিনা তুমি কি করে এমন হয়ে গেলে। মনে হয় তামাসা করছ। কিন্তু তোমার মুখ দেখলে টের পাই ভেতরে সত্যি যন্ত্রণা ভোগ করছ তুমি। তারপর কাল ড্রিঙ্ক করে এলে। কেন? এমন তো নয় যে আমায় তুমি জানতে না চিনতে না। আমি তো বদলাই নি, যেমন ছিলাম তেমন আছি। আমি কি ভাবি, কি করি, কি চাই সব জেনে শুনেই আমায় বিয়ে করেছিলে। আজ তোমার মতিগতি বদলে গেল কেন হঠাৎ?' মমতার ঠোঁটের দুটি প্রান্ত কাঁপতে থাকে। সে-ই না ভেবেছিল হীরেনের মতিগতি বদলে দেবে—অন্যদিকে? তার যেটুকু রক্ষণশীলতা আছে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ফেলবে, বৈপ্লবিক অভিসন্ধি সঞ্চার করবে তার চিন্তার উৎসে, কত- কাজ করিয়ে নেবে তাকে দিয়ে—তার সঙ্গে মিলে, দু'জনে একসঙ্গে। আরম্ভ হতে না হতে কি সব শেষ হয়ে যেতে বসেছে?

নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকায় হীরেনের রাগ হয়। মমতাকে সে পাগলের মত ভালবেসেছিল, কথায় ব্যবহারে ইঙ্গিতে সঙ্কেতে একনিষ্ঠ আনুগত্য ঘোষণা করেছিল অসংখ্যবার, সম্মতি না পেলেও পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে-ই

বার বার মমতাকে ভিক্ষা চেয়েছিল,—এই যুক্তি ভুলে মমতা আজ তাকে কাবু করতে চায়। প্রমাণ করতে চায় সে অন্যায় করেছে, সে-ই অপরাধী।

'আমি ভেবেছিলাম', হীরেন বলে, 'বিয়ের পর এসব ঝোঁক তোমার কমে যাবে।'

'তাই নাকি? ঝাঁঝাঁলো ব্যঙ্গের সুরে মমতা বলে, 'তুমি ভেবেছিলে আর পাঁচটি ফ্যাশনে মেয়ের মত ছেলেমানুষী করছি, বিয়ে হলে সেরে যাবে? সব ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়ে ঘর-কন্না করব?' মমতা সজোরে মাথা নাড়ে, বলে, 'না, তুমি তা ভাবোনি হীরেন। ওরকম ভাববার কোন সুযোগ তোমাকে আমি দিইনি। তুমি বরং জানতে বিয়ে করলে আমার কাজের ক্ষতি হতে পারে ভেবেই আমি অনেকদিন তোমার প্রস্তাবে রাজী হই নি। আমার প্রকৃতিও তুমি জানতে। বাধা দেওয়ার বদলে আমার কাজে তুমি সাহায্য করবে মনে করেই শেষে আমি রাজি হই, তাও তুমি জানতে।' বলতে বলতে মমতার মুখের কাঠিন্য মিলিয়ে গিয়ে গভীর বিষাদের ছাপ ঘনিয়ে আসে, চোখ বুজে একবার ঢোক গিলে সোজা হীরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এক হতে পারে, আমায় তুমি ভালবাসোনি। এমন জোরালো আকর্ষণ বোধ করেছিলে যে তোমার ভুল হয়েছিল। এখন সেটা কেটে গেছে। ওরকম হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, খুলে বল না? সব পরিষ্কার হয়ে যাক। জোড়াতালি দিয়ে লাভ কি?'

হীরেন গোঁয়ারের মত বলে, 'তোমায় আমি আগের চেয়েও এখন বেশী ভালবাসি। তাই না আজ আমার এই দশা। তোমার খেয়ালে বাঁদর নাচছি।'

মমতার মুখ লাল হয়ে যায়।

হীরেন আবার বলে, 'আমি ভালবাসি কিন্তু তুমি ভালবাসো না। আমি বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাসো না। তুমি ভালবাসো আরিফকে।'

'তুমি কি পাগল?' মমতা বলে হতভম্বের মত।

'পাগল হতেই বসেছি মমু।'

মমতা আত্মসম্বরণ করে। বিচিত্র চিন্তা ও অনুভূতির প্রবল আলোড়ন চলতে থাকলেও এতক্ষণে হীরেনের অদ্ভুত পরিবর্তনের কারণটার হদিস পেয়ে তার যেন ধাঁধাঁ কেটে যায়। সামনে ঝুঁকে সাগ্রহে সে বলে, 'এই ভাবনা

মাথায় ঢুকিয়ে কদিন তুমি এ রকম পাগলামি করছ? মুখ ফুটে বলতে পার নি আমায়? তুমি এমন সেন্টিমেন্টাল তাতো জানতাম না হীরেন! শোন বলি। আরিফ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সকলের চেয়ে ঘনিষ্ঠ, আপন বন্ধু, তার বেশী কিছু নয়। তুমি কি মনে কর ওকে ভালবাসলে ওর বদলে তোমায় বিয়ে করতাম?'

হীরেন উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে, 'ভুল তো হয় মানুষের। সব সময় নিজের মন—'

মমতা জোর দিয়ে বলে, 'না, আমার ভুল হয় নি। আমি নিজের মন জানি।' একটু দ্বিধা ভরে মমতা তাকায় হীরেনের দিকে, একটু ইতস্ততঃ করে। হীরেনের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি সংস্কারমুক্ত ও বাস্তবধর্মী সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ জন্মে গেছে গত কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতায়। হঠাৎ মন স্থির করে সে বলে, 'খোলাখুলি সব বলছি শোন। আগে, অনেকদিন আগের কথা বলছি, দু'একবার আমারও খটকা লেগেছিল, আরিফকে ভালবাসি কি না! কিন্তু সে সন্দেহ অল্পদিনেই মিটে গেছে। দু'চারবার এমনও হয়েছে যে ওর জন্য আমি জোরালো সেক্‌স্ আর্জ অনুভব করেছি। যোগাযোগ হলে হয়তো কিছু ঘটেও যেতে পারত আমাদের মধ্যে। আর এও বলছি, কিছু ঘটলে আমি আপশোষ করতাম না, মনে করতাম না পাপ করেছি।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

মমতা মৃদু হেসে বলে, 'বুঝলে তো এবার? আরিফ শুধু ঘনিষ্ঠ আপন জন, বন্ধু। ভালো আমি তোমাকেই বাসি।'

'আমাকেই ভালবাসো? তবে তার প্রমাণ দাও?'

'প্রমাণ দেব?'

হীরেন হঠাৎ উঠে এসে পাগলের মত মমতাকে প্রায় চেয়ার থেকে ছিনিয়ে বুকে তুলে নেয়, এলোপাথাড়ি বিশ পঁচিশটা চুমু খায় তার মুখে মাথায় ঘাড়ে।—'ও বাড়ীতে যাও বা না যাও, এইটুকু তুমি কর আমার জন্যে। দেশের কাজ সমাজের সেবা তোমায় ছাড়তে বলি না, এভাবে না করে অন্যভাবে কর? রেবা, মালতী, মিসেস সেন, এরাও তো কাজ করছে? ওদের মত একটু শুধু সংযত কর নিজেকে। ঘরের দিকে একটু মন দাও, আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে

একটু ভাব কর, সামাজিক জীবনটা একটু আমায় ভোগ করতে দাও তোমার সঙ্গে। তুমি তো জানো মমু, কখনো কোন বিষয়ে তোমার ওপর আমি জোর খাটাব না? এ জীবন আমার সইছে না। আমার মুখ চেয়ে এইটুকু তুমি কর আমার জন্যে।'

মমতা ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

'এইটুকু!' কঠিন বিদ্রূপের তীব্র তীক্ষ্ণ হাসি ঝলকে ওঠে তার মুখে। 'আমার সব কিছু ছেঁটে ফেলতে হবে—সে হল তুচ্ছ সামান্য এইটুকু! দশজন হালকা অপদার্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, পার্টি দিয়ে, গান বাজনা গল্পগুজব পরচর্চা করে আর তোমাদের ফ্যামিলি পলিটিক্স নিয়ে মেতে থেকে জীবন কাটালে তুমি আমার ভালবাসার প্রমাণ পাবে? তুমি তো ভারি সস্তা ভালবাসা চাও! এ-রকম ভালবাসা দেবার মত মেয়ের তো অভাব ছিল না হীরেন? ও-রকম একজনকে বেছে নিলে না কেন? উথলে ওঠা ভালবাসায় তোমায় সে ভাসিয়ে দিত।'

মমতা কেঁদে ফেলে। হীরেন স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তিন

ঝুমুরিয়ার ক্রোশ দুই তফাতে একখানি বিচ্ছিন্ন শালবন। এটি ছাড়া এ অঞ্চলে আশেপাশে শালবন একরকম নেই। পথের ধারে মাঠে প্রান্তরে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়ানো গাছ চোখে পড়ে, বড়জোর কোথাও উঁচু ডাঙ্গায় ছোট একটি চাপড়া, বন না বলে যাকে শালের বাগান বলা চলে। চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্র ও ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই ছোট শালবনটি যেন পৃথিবীর গায়ে নয়নাভিরাম প্রাগৈতিহাসিক জন্মচিহ্নের মত।

বন কাটার কাজ চলছে কিছুদিন ধরে। উত্তরের খানিকটা অংশ ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। ডালপালা ছাঁটা ডগা কাটা সিধা লম্বা দৈত্য-দানবের লাঠির মত শত শত শালের স্তূপ জমেছে একস্থানে, শত শত গাছ সবুজ শাখাপত্র নিয়ে হুমড়ি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে। সারাদিন গাছ কাটা, ডালপালা ছাঁটা, জ্বালানি কাঠের টুকরোগুলি কাটা, আগে কাটা আধশুকনো কাণ্ডগুলি দুটি লরী আর অনেকগুলি গরুর গাড়ীতে বোঝাই দেওয়ার কাজ চলেছে অবিরাম, উর্ধ্বশ্বাসে। আধ মাইল তফাতে পাকা রাস্তা, এদিকে রেল ষ্টেশন থেকে ওদিকে

চলে গেছে সাগরতীরের বালিয়াড়ি বহুল সহরে। মাঠ ও ফসলভরা ক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে ওই রাস্তা পর্যন্ত লরী ও গাড়ী চলাচলের একটা পথ গড়ে উঠেছে দু'টি সমান্তরাল গভীর রেখায়। দরকার মত ক্ষেতের আল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাকার দাগের সঙ্কীর্ণতা আঁকা বাঁকা গতি দেখে অনুমান করা যায় ক্ষেতের ফসল যতদূর সম্ভব কম নষ্ট করার দিকে নিয়ামকদের নজর আছে খানিকটা!

গাছ কেটে চালান দেওয়ার কাজ সাধারণতঃ ধীরে সুস্থে শিথিল গতিতেই চলে। কিন্তু গোড়ায় মজুরের অভাবে এবং কণ্ট্রাক্টর হেরম্ব চক্রবর্তী অন্যত্র বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এতদিন কাজ ভাল এগোয় নি। খতে লেখা হিসাব মত সময় গুরুতর রকম সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সময় কিছু বাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে, তাই এত তাড়াহুড়ো। গাছগুলি কাটার পর ভাল করে শুকোলে রস মরে হাল্কা হয়, গাড়ীতে বেশী বোঝা চাপানো চলে। কিন্তু সে সময়ও নেই—মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান রাখা হয়েছে গাছ কাটা আর চালান দেওয়ার মধ্যে। চেষ্টা চলেছে আরও গোটা দুই লরী ও কতগুলি গরুর গাড়ী সংগ্রহের।

অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দূরে তাকালে দেখা যায় অস্পষ্ট কুয়াশা রূপ নিচ্ছে। আজকের মত কাজ শেষ। স্থানীয় মজুররা ঝুমুরিয়া, নিতাইপুর, মহিষালি প্রভৃতি কাছাকাছি গাঁয়ে তাদের কুঁড়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে। কয়েকজন বিহারী মজুরও গাঁয়ের দিকে চলেছে। এরা গাঁয়ের লোক নয়, ঘর-টান এদের নেই, কিন্তু বনের ধারে এখানে বিনা ভাড়ায় অস্থায়ী কুটির তৈরী করে দিতে চাইলেও তারা এখানে রাত কাটাতে রাজী নয়, লোকালয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে তারা বাস করতে ভালবাসে, এক বাড়ীতে নয়তো এক ঘরে যতজন মিলে একসঙ্গে থাকা সম্ভব। মেয়েপুরুষ সাঁওতাল মজুররাই শুধু এখানে অস্থায়ী ঘর-সংসার পেতে বসেছে। ডালপালা লতাপাতা দিয়ে নিজেরাই তারা তিন চার হাত উঁচু ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছে, ঠিক যেন বয়স্ক শিশুদের খেলার ঘর। ফাঁকায় মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, বাঁশের চোঙায় তেল রাখে, পুরু কাগজের মত ঘন মোটা কাপড় কোমরে জড়ায় আর পিঠে ছেলে বাঁধার বা গায়ে দেবার চাদর করে, কাঠের চিরুণীতে চুল আঁচড়ায়, খোঁপায় ফুল গোঁজে আর বাবরিতে লাল কাপড়ের ফালি জড়ায়, শালপাতার মোটা বিড়ি বানিয়ে

টানে, মেয়েপুরুষে ভাত বা মহুয়ার মদ খায় আর আগুন জ্বেলে মাদল বাজিয়ে নাচে গায়—সুস্থ সবল সুশ্রী কালো দেহ আর সরল স্বাধীন দৃঢ় মন নিয়ে হিংসাদ্বেষহীন নির্ভয় নিশ্চিন্ত নির্লোভ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝে না। দলের দলেরই দান, দলের ইচ্ছায় সে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, প্রধান সম্মানীয়া—সভ্য জগতের স্বাধিকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্য মাত্র।

চেরা তক্তার মেঝে ও দেয়ালের উপর খড়ের পাতলা ছাউনী দেওয়া চারকোণা ঘরটির সামনে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে হেরম্ব চক্রবর্ত্তী সরু একটা চুরুট টানতে টানতে কুঁচকে বনের দিকে চেয়েছিল। তার নিজের চোখের নেশার কুয়াশায় দৃষ্টি একটু ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। দিনে সে কখনো মদ ছোঁয় না, আজ মনটা বড় বেশী বিগড়ে থাকায় অনেক দিনের অভ্যাসটাও বিগড়ে গেছে।

পিঠে বাঁধা শিশুকে সামনে ঘুরিয়ে এনে তার মুখে মাই গুঁজে দিয়ে সাঁওতাল রমণী সামনে দিয়ে চলে যায়, হেরম্বের নেশায় টনটনে কল্পনা দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে তার সাত ছেলের মা আগুনের মত উজ্জ্বলবর্ণা সুন্দরী স্ত্রীর আবছা মূর্তি। তার দশ বছরের বিয়ে করা বৌ, এত দিনের এত শান্ত, এত ভাল, এত কোমল বৌ, হঠাৎ তার সঙ্গে এমন বেয়াদবি সুরু করেছে যে মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে হেরম্বের। সতীরাণী যে কি করে এমন অবাধ্য, এত শক্ত হল হেরম্ব কল্পনাও করতে পারে না। পাঁচ ছ'মাস দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, তারপর দেখা হবার প্রথম দিন থেকে গত পনের ষোল দিন ধরে একটানা একগুঁয়ে অবাধ্যতা! আষাঢ়ের প্রথমে ভারি মাসে সতীরাণী প্রসব হতে এসেছিল পচেটদলে তার বাপের বাড়ীতে, তখন থেকে হেরম্ব বনখালির কণ্ট্রাক্ট আর ট্রেডিং সিণ্ডিকেটের সঙ্গে মামলা নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত হয়েছিল, একদিনের জন্য পচেটদলে আসতে পারে নি, কিন্তু নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে সতীরাণী আর শ্বশুরের নামে। সতীরাণীকে বাপের বাড়ী পাঠালেই তার বাবা মেয়ে আর নাতি নাতনীর জন্য যত খরচ হওয়া উচিত তার অনেক বেশী টাকা বরাবর নানা ছলে তার কাছ থেকে আদায় করেন। টাকা সে পাঠিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ, মনে মনে শুধু একটু হাসে পঞ্চাশ পঁচাত্তরটা টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্য

শ্বশুরের সুদীর্ঘ ফাঁকা কৈফিয়ৎ পড়ে। এবারও সে চাওয়ামাত্র টাকা পাঠিয়েছে। দ্বিধা করে নি, প্রশ্ন করে নি, দেরী করে নি। এ কথাটা বোধ হয় সতীরাণীর মনে নেই। বোধ হয় সে ভুলে গেছে যে হেরম্ব টাকা না দিলে বাপের বাড়ীর অসীম আদর তার কবে বিষিয়ে যেত—এখন থেকে টাকা পাঠান যদি সে বন্ধ করে দেয়, কয়েক মাসের মধ্যেই সে টের পাবে বাপ ভাই আর স্বামী এদের মধ্যে কে তার বেশী আপন।

ছেলে হবার ভয়?

সাত ছেলের মার ছেলে হবার ভয়?

সাতবার যে গর্ভধারণ করেছে বিনা দ্বিধায়, আট ন' মাস পূর্ণ হলে হেরম্ব বুদ্ধি বিবেচনা পূর্বক যার নিজের ও গর্ভের সন্তানের অনিষ্ট হওয়া নিবারণের জন্য বৈঠকখানায় শুয়েছে, বাইরে রাত কাটিয়েছে, বলা মাত্র যাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে, কোন প্রয়োজন না থাকলেও কলকাতা থেকে ট্রেইনড্ নার্স আনিয়ে যার কাছে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রসবের অনেক আগে থেকে—সে কিনা আজ তার সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় শুতে অস্বীকার করছে আবার সন্তান ধারণ করবার ভয়ে!

সতীরাণী যে বছর-বিয়োনী নারী, এ দোষ যেন হেরম্বের!

স্বাস্থ্য যদি তার খারাপ হত, প্রসব হতে যদি সে কষ্ট পেয়ে থাকতো, তা হলেও হেরম্ব তার আতঙ্কের মানে বুঝতে পারত। কোন কারণ থাক বা না থাক নিছক অর্থহীন আতঙ্ক হলেও হেরম্ব তা মেনে নিত। সতীরাণী এসে যদি আবদার করত তার কাছে, কেঁদে যদি তার পায়ে ধরত, কিম্বা তার মানটা শুধু বজায় রেখে যদি বলত যে কিছুকাল তারা তফাৎ থাকবে, হেরম্ব হাসি-মুখে সায় দিত। প্রসব হতে ছ'মাস করে সতীরাণী যে তফাতে থাকে, কাজের চাপে হেরম্ব যে মাঝে মাঝে মাসে দু'চারদিনের বেশী এবং কখনো দু'তিন মাস বাড়ী আসতে পারে না, সতীরাণীকে ছাড়া কি চলে না হেরম্বের? মেয়েমানুষের কি অভাব আছে জগতে?

এই জ্বালাটাই হেরম্ব ভুলতে পারে না যে বিয়ের দশ বছর পরে সতীরাণী তাকে এতখানি ছোটলোক ভেবেছে যে স্ত্রী ও সন্তানের জননীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে আলাদা এটুকু সে জানে না! আজ আছে কাল নেই মেয়েমানুষের মতই সে যেন ব্যবহার করে এসেছে সতীরাণীর সঙ্গে দশ বছর ধরে! এত কষ্ট

করে এত টকো সে যে রোজগার করছে তা যে শুধু সতীরাণীর জন্য, এতটুকুও কি সে বোঝে না? আর ইচ্ছা করলে সে যে প্রচণ্ড শাস্তি দিতে পারে তাকে, চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে পারে, একটা মাসোহারা দিয়ে আরেকটা বিয়ে করতে পারে সাত দিনের মধ্যে, এ জ্ঞানও কি সতীরাণীর নেই?

নেই বলেই তো মনে হয়।

'ত্যাগ করো। করো ত্যাগ।' এই জবাব দিয়েছিল সতীরাণী, বলেছিল, 'করো বিয়ে। বিয়ে করো। আমি বাঁচি।'

হেরম্ব ঝগড়া করে নি, ভয়ও দেখায় নি। সতীরাণীকে শুধু এই সত্যটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে যার সঙ্গে তার চিরকাল কাটাতে হবে, যার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জবাব দিয়েছিল সতীরাণী সেই উপদেশের!

কি স্পর্দ্ধা একটা গরীবের মেয়ের যাকে সে দাসদাসী আত্মীয় কুটুম্ব ভরা অট্টালিকার কর্ত্রী করেছে, যার কোন সখ কোন আব্‌দার সে অপূর্ণ রাখে নি!

পরাজয়ের জিদ্ বজায় না থাকায়, অসহ্য আক্রোশে হেরম্বের মন পুড়ে যেতে থাকে। একবার, শুধু একটিবার যদি সতীরাণী নত হত, হুকুম মানত! পাঁচ বছরের জন্য সে রেহাই দিত তাকে—দশ বছরের জন্য রেহাই দিত। গৃহিনীর সমস্ত অধিকার দিয়ে এতদিন যেমন রেখেছিল তেমনি মাথায় করে রাখত কিন্তু নিজে কোনদিন স্বামীর অধিকার দাবী করত না।

খানিক তফাতে নতুন বসানো টিউবওয়েল থেকে একটি সাঁওতাল মেয়ে হাঁড়িতে জল ভরে, হেরম্ব চেয়ে থাকে তার দিকে। অল্পদিনের মধ্যে মেয়েটির সন্তান হবে, প্রথম সন্তান। মেয়েটির বয়স উনিশ কুড়ির কম নয়। সাঁওতালদের সঙ্গে হেরম্বের ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। কম বয়সে কোন সাঁওতাল মেয়েকে সে মা হতে ছাখেনি। সারা জীবনে ছ'সাতটির বেশী ছেলে-মেয়ে হয়েছে এমন সাঁওতাল রমণীও দেখেছে কদাচিৎ। পূর্ণগর্ভা মেয়েটির জলতোলা দেখতে দেখতে এ-সত্যটা হেরম্বের মনে পড়ে যায় যে সাঁওতাল মেয়েদের দুটি সন্তানের মধ্যে কম করেও সাধারণতঃ দু-তিন বছরের ব্যবধান থাকে।

মেয়েটিকে সে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। খাঁটি সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর পুরুষ কে?'

'নানকু।'

নান্‌কু দলের প্রধান কানাইয়ার ছেলে ! বয়স তার চব্বিশের কাছে। তখন হেরম্বের মনে পড়ে যায় নান্‌কু ও এই মেয়েটির বিবাহোৎসবের কথা। মধুজোলের বনে শাল কাটাতে সে তখন সাঁওতালী গাঁ গড়পায় আস্তানা করেছিল। মধুজোলের বনের ছোট একটা অংশ পেয়েছিল কিন্তু সেই অংশটুকুও ঝুমুরিয়ার এই বনের প্রায় সাতগুণ বড় ছিল এবং ঠিক এবারের মতই সময়ের টানাটানিতে বিব্রত হয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়েছিল উর্ধ্বশ্বাসে। গড়পার স্থায়ী বাসিন্দা হেমন্ত সাঁওতালের এই মেয়েটির সঙ্গে তখন যাযাবর দলের নান্‌কুর ভালবাসা হয়। কেবল মেয়ের বাপ নয়, গড়পার গাঁয়ের সাঁওতাল সমাজ এ বিয়েতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু এমনি এক মৃদু শীতল সন্ধ্যায় নানকুর সঙ্গে মেয়েটি চলে আসে বনের প্রান্তে এ দলের শিবিরে। তীর বর্শা বা টাঙ্গির আঘাতে ঘায়েল হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নান্‌কু গড়পার শেষ মাটির ঘরখানার পঁচিশ হাত তফাতে জামগাছের নীচে শিয়ালকাঁটার ঝোপে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিয়েটা হয়েছিল যথারীতি এবং যথেষ্ট উৎসবের সঙ্গে কিন্তু দু'পক্ষের ঝগড়াটা সামলাতে হয়েছিল হেরম্বকে। মিটমাট সে করতে পেরেছিল কিন্তু সেটা তার টাকার জোর, 'গণ্যমান্যতার জোর বা দারোগা পুলিশের খাতিরের জোরে সম্ভব হয়নি। সাঁওতাল সমাজের একজন বলে গণ্য হবার অধিকার আগে থেকে পাওয়া না থাকলে মধ্যস্থ হয়ে মিটমাটের চেষ্টা করার সুযোগও সে পেত না। বছর দুই আগে সাঁওতালদের এক বড় পরবের দিনে সাঁওতালদের এক বিরাট মেলায় তাকে সাঁওতাল হবার অধিকার দেওয়া হয়—প্রায় পনের বছর ওদের সঙ্গে মেলামেশার পর।

উগ্র প্রতিক্রিয়ার বদলে হেরম্বের মন আত্ম নিগ্রহের জ্বালাময় বিষাদে ভরে যায়। প্রথম জীবনে প্রথম গুরুতর নৈতিক বা ব্যবহারিক অন্যায় করার পর যেমন হত তেমনি অস্থিরতা তাকে আকুল করে তোলে। চুরুট ছুঁড়ে ফেলে সে ডাকে, 'ভরত !'

কাঠের ঘর থেকে ছিটের গলাবন্ধ কোট গায়ে শীর্ণকায় মাঝবয়সী ভরত বেরিয়ে আসে। বসন্তের ছাপের মত মুখভরা অসংখ্য ব্রণের দাগ, চোখা নাকের নীচে বাবুয়ানি ছাঁটা গোঁফ, লোমবহুল মোটা ভুরু শোভিত কোটরগত একজোড়া গোল কটা চোখ। পায়ে বাদামী ক্যাম্বিশের জুতো, চলাফেরায় শব্দ হয় না। হেরম্বের সে পুরানো বিশ্বাসী অনুচর ও সেবায়েৎ।

'আরও খানিকটা চোলাই মদ চেয়ে আন দিকি।'

'হুইস্কি খান না?'

'না না, চোলাই নিয়ে আয়।'

'ব্রাণ্ডির বোতলটা খোলাই হয় নি, সখ করে আনলেন। খুলব? চোলাই টোলাই আপনার সয় না বাবু। পাঁটখানেক তো হয়েছে, আর কেন?

'যা যা, বকিসনে বেশী!'

হেরম্ব মিঠে ভাবেই ধমক দেয়। ভরতের ওপর সে কখনো রাগ করে না। প্রভুভক্ত প্রসাদলোভী উচ্ছিষ্টভোজী এই লোকটির প্রতি তার একটা বিশেষ স্নেহার্দ্র প্রশ্রয়ের ভাব আছে। ভরত যে তাকে সত্য—সত্যই দেবতা মনে করে এবং মদ থেকে তার সব রকম উচ্ছিষ্ট দেবতার প্রসাদ বলে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করে, অল্পদিনে আগে তার এক চমকপ্রদ প্রমাণ পেয়ে হেরম্ব অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

গত ফাল্গুনের কথা। বনখালিতে সে নিজে উপস্থিত থেকে বন কাটাচ্ছে। যত টাকাই আজ তার হয়ে থাক, যত লোকজন রাখাই সম্ভব হোক, হেরম্ব কখনো পরকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দূরে থাকে না, যেখানে তার কাজ সেখানে সে সব সময় হাজির। এই একটি নিষ্ঠা তাকে সাফল্য দিয়েছে, সাফল্য লাভের পরেও এ নিষ্ঠা সে হারায় নি। নইলে পুলিশের এক জমাদারের ছেলে হয়ে জন্মে, প্রথম বয়সে দু'শো একশো টাকার ছোট ছোট কণ্ট্রাক্ট নিয়ে আরম্ভ করে আজ মাঝ বয়সে লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কারবার করার সৌভাগ্য সে কোথায় পেত?

ভরত নিজেই যোগাড় যন্ত্র করে কান্তপুর গাঁয়ের এক গরীব গেরস্ত ঘরের রাধা নামে একটি মেয়েকে জুটিয়ে এনে দিয়েছে। রাধার বাপ ছিল না, সৎ ভাইদের কাছে সে মানুষ। একদিন এই রোগা ছিপছিপে মেয়েটির চুলের মৃদু রুক্ষতা আর মুখের বিষাদকরুণ শ্রী দেখে হেরম্বের মনে হয়েছিল কলকাতার বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়েদের একজন বুঝি প্রসাধনের বালাই চুকিয়ে শুধু রঙচটা ছেঁড়া একখানা তাঁতের শাড়ীতে গা ঢেকে গাঁয়ে এসে একটি জীর্ণ শীর্ণ গরুর গলায় বাঁধা দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লিভার একটু খারাপ ছিল হেরম্বের, বনের মধ্যে তাঁবুতে বাস করছিল একা, তায় আবার বসন্তকাল। চাপা পড়া মর্চে ধরা প্রাথমিক কাব্য কল্পনার আবর্জনার স্তূপ নাড়া খেয়ে একটু উতলা ও উৎসুক

করে তুলেছিল হেরম্বকে। রাধাকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল কলকাতায়, বাড়ীভাড়া করে দিলে বালীগঞ্জে, বাড়ী আর রাধাকে সাজিয়েছিল হাল ফ্যাসানে। কত কল্পনাই সে করেছিল ওই মিঠে একটা অপ্রাপ্য কোন কিছুর জন্য হঠাৎ জাগা পিপাসায়। ভেবেছিল, দু'দিনে ফুরিয়ে যেতে দেবে না রাধার সঙ্গে সম্পর্ক, ওকে সে পড়াবে, গান শেখাবে, নাচ শেখাবে, আদব-কায়দা শেখাবে, ঘষেমেজে দাঁড় করাবে আশে পাশের বাড়ীগুলির তরুণীগুলির চেয়েও অপূর্ব বস্তুতে। আর ওকে গড়ে তোলার সঙ্গে গড়ে তুলবে ওর হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের মিহি মধুর কারবার।

কিন্তু রাধা শুধু কাঁদে। তাঁবুতে এসে ঢোকা থেকে রেলগাড়ীতে চড়া থেকে, বালীগঞ্জে বাড়ীতে ঢোকা থেকে, পুতুলের মত সাজা থেকে হাপুস নয়নে শুধু কাঁদে। হেরম্বের আদর আহ্লাদে ভোলে না, উজ্জ্বল রঙীন ভবিষ্যতের বর্ণনায় কাণ দেয় না,—হেরম্বের লোমশ বুকে, স্প্রিং-এর খাটের কোমল শয্যায়, সোফায় চেয়ারে, কার্পেট ও ঝকঝকে তকতকে মেঝেতে সে শুধু ককিয়ে ককিয়ে কাঁদে! আর শুধু কি তার কান্না, কাছে এনে সাজিয়ে গুজিয়ে নেবার পর কোথায় যে উপে গিয়েছিল তার মুখের সেই হাইক্লাশ কালচারী পেলবতার ছাপ! প্রথম দিন সাবান ঘষবার সময় যে ময়লা উঠেছিল তার মুখ থেকে তার সঙ্গেই বোধ হয় সেই ম্লানিমাটুকুও উঠে গিয়েছিল।

সাতদিনে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হেরম্বের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। শুধু একটি আকর্ষণ তাকে আরও কয়েকটা দিন রাধার জন্য কলকাতায় আটকে রেখেছিল, তার আলিঙ্গনে রাধার বিস্ফারিত চোখে অতি অদ্ভুত এক ভয়ার্ত বিহ্বলতা। জীবনে একবার একজনের চোখে শুধু হেরম্ব এই দৃষ্টি দেখেছিল—মৃত্যু ঘনিয়ে আসবার সময় তার এক সচেতন আত্মীয়ের চোখে। প্রথমদিন এই দৃষ্টি দেখে এক অনির্দিষ্ট ভয়ঙ্কর আতঙ্কে হেরম্বের হৃদ্‌স্পন্দন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, এত জোরে সে চেপে ধরেছিল রাধাকে যে মুখ তার কালি হয়ে গিয়েছিল, চেতনা হারিয়ে চোখ বুজে এসে তার সেই সাংঘাতিক দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছিল।

রাধার চোখে মৃত্যুকে আরেকবার দর্শন করার কৌতূহল কি জোরালো বিকারেই যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল হেরম্বের। নবদীক্ষিত তান্ত্রিক শব-সাধকের মত সে ক্রন্দনরতা রাধাকে দেখে ভেবে পেত না তার এই ক্ষীণ দুর্বল দেহে

কোথায় লুকিয়ে আছে সেই অতল গভীর ভয়ানক রহস্য দেখা শেষ হলেই যার স্বরূপ সে নিজেও আর মনে করতে পারে না। শেষে একদিন কাছে টানা মাত্র অস্ফুট শব্দ করে রাধা চোখ বুজে অচেতন হয়ে গিয়েছিল, বুকে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ স্পন্দন অনুভব করতে না পেরে হেরম্বের মনে হয়েছিল সে বুঝি মরেই গিয়েছে। পরদিন হেরম্ব জোর পালিয়ে গিয়েছিল তার বনখালির তাঁবুতে।

আসবাবপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বেচা হয়ে গিয়েছিল, বাকী সব তার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভরতের ওপর ভার ছিল ভেলায় করে রাধাকে জীবন সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার অর্থাৎ শহরের বিশেষ কোন একখানা ঘর ঠিক করে কিছু জিনিষপত্র আর টাকা দিয়ে তাকে ফেলে পালাবার ব্যবস্থা করা। কয়েকদিন পরে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে ভরত একেবারে বনখালির তাঁবুতে উপস্থিত হওয়ায় তাই বড় রাগ হয়েছিল।

'ওকে আবার নিয়ে এলি যে শূয়ার?'

'একটা কথা আছে বাবু।'

'ওরে ব্যাটা! ওরে শালা! ওরে হারামজাদা!'

'বাবু, আপনি যদি অনুমতি করেন, ওকে আমি বিয়ে করব।'

বিয়ে করবে! ভরতের হাতেই রাধাকে হেরম্ব ছেড়ে দিয়ে এসেছিল, সখ হয়ে থাকলে যতদিন ইচ্ছা রাধাকে ভোগদখল করার কোন বাধাই ভরতের ছিল না, কিন্তু তাতে ভরতের মন ওঠে নি। হেরম্বের এই উচ্ছিষ্ট মেয়েটিকে ভরত যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করবে। বৌ করে নিয়ে যাবে দেশের বাড়ীতে তার মা বোনের কাছে, সংসার পাতবে ওকে নিয়ে। কত পাগল যে থাকে সংসারে!

রাধার সৎ মা ও ভাইদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভরত রাধাকে বাড়ীতে রেখে এসেছিল। কয়েকদিন পরে দেশের গাঁ থেকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এসে যথারীতি রাধাকে বিয়ে করেছিল; ভোজ খাইয়েছিল গাঁ শুদ্ধ লোককে। বিয়ের জন্য হেরম্ব তাকে টাকা দিয়েছিল পাঁচশো।

রাধার নাকি আবার ছেলেপিলে হবে। ক'মাস আগে মার চিঠিতে খবর পেয়ে ভরত এমন ব্যস্ত হয়ে ক'দিনের ছুটি নিয়ে বৌকে দেখতে দেশে ছুটেছিল যে মনে মনে হাসি পেয়েছিল হেরম্বের।

চোলাই মদ চালায় হেরম্ব ভরতকে চমকে দিয়ে, ভয় পাইয়ে। চড়া কড়া নেশার চেয়েও অদ্বিতীয় কিছু একটা চাইছে হেরম্ব, অজ্ঞান হতে চায়? ভরত জানে, না দিয়ে উপায় নেই। যখন সে আপত্তি করেছিল, তখন বন্ধ করলে করতে পারত, তারপর আরও কিছু চোলাই যখন দিয়েছে এখন আর ঠেকানো যাবে না বাবুকে। ভয়ে বুক কাঁপে ভরতের। দেবতার মধ্যে শিবের মত, মানুষের মধ্যে এই হেরম্ব। আজ সে ক্ষেপেছে। প্রলয় ঘটে যাবে আজ পৃথিবীতে—ঝুমুরিয়ার উত্তরে এই অর্দ্ধেক পালক-তোলা পাখার মত শালবনের ধারে।

বলে, 'বাবু, শোবেন?'

'আন্ তোর বৌকে, শোব। ছেলে হবে! শূয়ারকা বাচ্চার ছেলে হবে। ওটা কার ছেলে জানিস?'

'আমার সে তো ভাগা বাবু!'

হেরম্বের প্রচণ্ড হাসি ছড়িয়ে যায় চারিদিকে—অসভ্য, কুৎসিত, অশ্লীল হাসি। টিউবওয়েলের কাছে সাঁওতাল মেয়েটার মনে পড়ে যায় সর্বাঙ্গে কাদা মাখা দুটো মহিষের ফোঁস্ ফোসানি লড়াই। তার রাগ হয়। হেরম্বও সাঁওতাল। সাঁওতাল হয়ে সে এমন অসভ্যতা করে, বর্বর পশুর মত হাসে!

'জল নেয় কে?' ভরতকে শুধোয় হেরম্ব।

ভরত ভাবে, সর্বনাশ! বলে, 'কে জানে কে। থাক্না বাবু, থাক্ না বাবু।'

'তুই আমার চাকর না মুনিব রে শালা?'

'চাকর, হুজুর। চাকর।'

'বল্ তবে, জল নেয় কে।'

'কুনাইয়ার মেয়ে ওপা।' ভরত ঢোঁক গেলে. 'মানুকের সাথে ওর বিয়ে হবে ও মাসে।'

'ওপা? শোন্ এদিক শুনে যা।' হেরম্ব ডাকে, হঠাৎ জাগা ভদ্র চালাকিতে গলা সংযত করে।

ওপা এসে দাঁড়ায়। হেরম্ব সাঁওতাল, তাদেরি দলের সাঁওতাল, ওপার ভয় নেই। সাঁওতাল মেয়ের চেয়ে সুন্দর দেহের গড়ন পৃথিবীর কোন দেশের কোন

মেয়ের নেই। সতীরাণী অবশ্য ফরসা, দুধে আলতা রঙ। ওপার মত সাঁওতালী ছাঁদের একটু যেন ইঙ্গিত ছিল সতীরাণীর দেহে—বিয়ের সময়। মদের নেশায় চাঁদের আলোয় মৃত্যুর চেয়ে অবশ্যম্ভাবী একটা সীমান্ত যেন ওপা হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। হেরম্বের বিয়ের শানাই বাজছে সাঁওতালী বাঁশের বাঁশীতে।

'ভিতরে চল্। আয়।'

'না।'

পালাতে চাইলে ওপা পালাতে পারত। কিন্তু সে পালাবে কেন? মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার উপক্রম করেছে, হাত ধরে টেনে তাকে হেরম্ব নিয়ে গেল তাঁবুর ভেতরে। ওপার চকচকে দাঁত লাল হয়ে গেল হেরেম্বের গলার বাঁ দিকের রক্তে। এক কামড়ে নেশা কেটে গেল হেরম্বের। হেরম্ব ছেড়ে দিতে ওপা তারই রক্ত মেশানো লাল থুথু ফেলল তার মুখে।

ঘাড় হেঁট করে হেরম্ব বলল, 'যা তুই ওপা! যা, প্রধানকে বলিস বেশী মদ খেয়েছি।'

হেরম্ব জানে, এসব বাজে ওজর। মদ খেয়ে মরে গেলেও কোন সাঁওতাল কোনদিন কোন অনিচ্ছুক মেয়ের হাত ধরে টানে না—মনেও থাকে না, মানেও বোঝে না, এ রকম হাত ধরে টানবার। ওপা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার টাঙ্গি হাতে আসবে তার বাপ, ভাই অথবা ভবিষ্যৎ স্বামী। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে।

'ভরত, বন্দুক দে।'

'বাবু, এক কাজ করেন, পায়ে পড়ি আপনার। লরীটা নিয়ে পালিয়ে যান।'

'পালাব? কেন পালাব? ওরে শূয়ার, কটা সাঁওতালের ভয়ে আমাকে তুই পালাতে বলিস্!' ঘোৎ ঘোৎ করে হেরম্ব, ভরতকে বুঝি মেরেই বসে। গলায় দাঁতের স্পষ্ট দাগ আর গর্ত—রক্ত চুইয়ে ঘাড়ে নেমেছে। হঠাৎ মেজাজ বদলে যাওয়ায় ভরতকে ছোট চাপড় মেরে বলে, 'তুই বুঝি ভাবলি ভয়ে ওপাকে ছেড়ে দিলাম? শোন ব্যাটা বলি শেখ্। বাঙ্গালী মেয়ে কি করে? চেপে ধরলেই ভয়ে নয় রে ব্যাটা, প্রেমে!—যত ভয় থাক, বিতৃষ্ণা থাক, ঘেন্না থাক, চেপে ধরলেই সব ভুলে যায়, এলিয়ে পড়ে। বুঝলি? তাইতে হঠাৎ

কেমন খেয়াল হল, দেখি সাঁওতাল মেয়ে কি করে। দেখলি তো কি করে? খেয়ালটা না জাগলেই ভাল ছিল রে ভরত! দে 'বন্দুক।' রাত গভীর হয়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, বন্দুকটা বালিশের পাশে রেখে হেরম্ব শোয়। আসুক ওপার বাপ ভাই হবু স্বামী, কাটুক তাকে। মরণের চেয়ে ঘুম এখন বড়, অনিবার্য। হয়তো আজ রাতে ওরা কেউ আসবে না। কাল বিচার হবে তার।

খুব ভোরে ওঠাই হেরম্বের অভ্যাস। নেশা করে রাত জাগলেও ছাড়া ছাড়া এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নে সতীরাণীর নাগাল পেয়ে পেয়ে না পাবার পর ঘুম ভেঙ্গে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ানো মাত্র সব যেন এক মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল হেরম্বের কাছে। সন্ধ্যায় উগ্র নেশার প্রতিক্রিয়া যেন সুরু হল অভাবনীয় শূন্যতায়।

রাতারাতি সাঁওতালরা চলে গেছে। তাদের কুকুর নেই, মুর্গী নেই, গাছের ডালে বাঁধা হাঁড়ি নেই, সকলের ডাকাডাকি নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে ডগায় ন্যাকড়া জড়ানো মাটিতে পোঁতা কচি বাঁশটি। লতাপাতা ডালপালার কুঁড়েগুলি তারা ভেঙ্গেচুরে মাটিতে লুটিয়ে রেখে দিয়ে গিয়েছে!

হেরম্বকে ওরা ত্যাগ করেছে, বর্জন করেছে। নিজের জটিল কৃত্রিম ভারাক্রান্ত জীবন যাপনের সাথে সাথে সরল সহজ ও সংযত একটা জীবন সে যাপন করে চলেছিল অনেকগুলি বছর ধরে ওদের সঙ্গে, সে এক রীতিমত সুদীর্ঘ সাধনায়। ওদের দলের একজন হবার অধিকার পেয়েছিল তারই পুরস্কার স্বরূপ। ওরা তাকে আজ বাতিল করে দিয়েছে। সে আর সাঁওতাল নয়।

তাকে কিছু না বলে, বোঝাপড়ার সুযোগ না দিয়ে, সবাই চলে গেল? সতীরাণীর অবাধ্যতার চেয়ে একদল অসভ্য নরনারীর এই নির্বিরোধ নিঃশব্দ অবজ্ঞা যেন আরও বেশী অসহ্য মনে হয় হেরম্বের। সতীরাণীকে নোয়ানো যায়। হ্যাঁ হেরম্ব জানে, হুকুমে না আসুক, হাত ধরে টানলে না আসুক, দাবী করার বদলে একটু সকাতর ব্যথাজীর্ণ অসুস্থতার ভান করলেই সতীরাণী ছিটকে এসে তার বক্ষলগ্না হবে। কিন্তু এই সব অসভ্য বুনো মানুষগুলির কাছে ওসব উঁচুদরের ভাবপ্রবণতার কোন দাম নেই, সত্য সত্যই অসুস্থ হয়ে সে যদি গিয়ে পড়ে ওদের মধ্যে, তার জন্য যা দরকার সব ওরা করবে এখনো,

পৌঁছে দেবে কোনো সভ্য ভদ্রলোকের বাড়ী কিম্বা সদরের হাসপাতালে কিন্তু ওদেরই একজন হবার অধিকার আর সে পাবে না। পায়ে ধরে কাঁদলেও নয়।

মুহ্যমানের মত হেরম্ব বনের দিকে তাকায়। কি আরক্ত সূর্য উঠছে বনের কর্তিত অংশের ফাঁকে, না কাটলে এখনো ওই শাল গাছের আড়ালে থাকত মৃদু কুয়াসায় ক্রুদ্ধ টকটকে লাল এই সূর্য।

জীবনে আজ প্রথম হেরম্ব অনুভব করে সে বড় একা, বড় অসহায়, বড় দুর্বল, বড় দুঃখী। বাকী শালবনের দিকে চেয়ে জীবনে আজ তার প্রথম কর্মোন্মাদনার বদলে জাগে গভীর অবসাদ, আলস্যের অনুরাগ। এ বন কাটতে হবে তাকে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাটতেই হবে! কেন? কার কাছে সে কি অপরাধ করেছে যে কনট্রাক্টের পর কনট্রাক্টের মর্যাদা রাখতে তাকেই খাটতে হবে উর্দ্ধশ্বাসে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত? কে সে? কে আছে তার? কার জন্য, কিসের জন্য এই কঠোর সংগ্রাম?

জীবনে এই প্রথম বলেই হয়তো বেলা বাড়ার সঙ্গে এই সহৃদয় বৈরাগ্যের ভার হেরম্বের কমে আসে, শুধু থেকে যায় একটা অনভ্যস্ত অস্থিরতা, অজানা বিষাদের ছাপ।

বন কাটতে হবে বৈকি। বাপ্‌রে, এত টাকা খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এখন সময়মত কাজটা না করলে কি লোকসানটাই দিতে হবে তাকে! দু'সপ্তাহ সময় বাড়াবার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে হেরম্ব লোকের সন্ধানে ঝুমুরিয়ায় যায়। ঝুমুরিয়া ও তার আশেপাশে গাঁ থেকে লোক সংগ্রহ করে সাঁওতালদের অভাব পুরণ করতে হবে। মুস্কিল এই যে এখন ধান কাটার সময়। গেঁয়ো নিষ্কর্মা মজুররা পর্যন্ত ধান কাটার কাজে লেগে গেছে। ধান পাকলে তা ঘরে তুলতে দেরী করলে চলে না। গরীব তো চাষীরা। বড় গরীব।

ধান কাটতে হবে বৈকি। তা, হেরম্বের বনটাও তো কাটতে হবে তাড়াতাড়ি। বনটা কাটা হোক, তারপর সবাই মিলে সারাবছর ধরে ধান কাটুক, কোন আপত্তি নেই হেরম্বের।

আপত্তি বীরেশ্বরের। এবং যেহেতু ঝুমুরিয়ায় বীরেশ্বরের প্রতিপত্তি কম নয়, আপত্তি অনেকের, দু'চারজন ছাড়া। বীরেশ্বর মাথা নেড়ে বলে, 'তা হয় না। ধান নষ্ট হয়ে যাবে। বন তো রইল, ধান কেটে সবাই যাবে'খন বন কাটতে।'

'নবাব খাঞ্জা খাঁর মত কথা কইছ দেখি তুমি ?'

'গাল দেবেন না জামাই বাবু। ওটা সয় না।'

হেরম্ব চোখ পাকিয়ে তাকায়। বীরেশ্বর চোখ পাকায় না, সোজা তাকিয়ে থাকে তার চোখের দিকে। চোখের তার পলক পড়ে কিন্তু পাল্লায় হার মেনে চোখ নামে না। হেরম্বের মনে হয়, বীরেশ্বরের পিছনে দাঁড়ানো জন ষাটেক লোকের প্রায় ষাট জোড়া চোখ যেন বীরেশ্বরের চোখের মারফতে তার দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। জমিদারের জামাই সে, একজন প্রজা তাকে তুমি সম্বোধন করছে! কারো তাতে বিস্ময় নেই, আতঙ্ক নেই! চটে উঠে বজ্জাত কথাটা বলা বোধহয় উচিত হয় নি লোকটাকে। অবশ্য, পা থেকে জুতো খুলে লোকটার গালে বসিয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য, তবে কিনা গরজটা এখন তার। আপাততঃ এ পাগলাকে না চটানোই বোধ হয় উচিত।

হেরম্ব রাগ সামলে বলে, 'ধান কাটো না তোমরা, কে বারণ করছে। আমার শুধু জন কুড়ি পঁচিশ লোক দরকার। বাকী সবাই ধান কাটো।' বীরেশ্বরকে ডিঙিয়ে অন্য সকলকে শুনিয়ে সে বলে, 'চড়া মজুরী দেব—দেড়া বাড়তি টাইম। রোজ বাড়তি টাইম পাবে।

ক্ষেত মজুর যারা উপস্থিত ছিল তারা উসখুস করে। ক্ষেত তাদের নেই, ধান কাটা আর শালবন কাটা তাদের কাছে সমান। উদ্ধত দৃষ্টিতে তারা কেউ হেরম্বের দিকে তাকায় নি, ওটা হেরম্বের কল্পনা মাত্র। হেরম্বের সঙ্গে বীরেশ্বরের কথা কাটাকাটির স্পর্দ্ধায় তারা ভয়ে বিস্ময়ে থ' বনে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। হেরম্বের মনে হয়েছিল ওরা বুঝি বীরেশ্বরের চাউনিকেই নকল করছে।

জালালুদ্দিন দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বরের পাশে। বীরেশ্বরের চেয়ে তার বয়স বেশী, চুল দাড়ি প্রায় সাদা হয়ে গেছে। তরুণ কিশোরের মত ছিপছিপে ঋজু দেহ, গেঞ্জিহীন দেহে ফুলকাটা পাতলা কাপড়ের ময়লা পাঞ্জাবী, লাল ও সবুজের চেককাটা লুঙ্গি, লোমের মত মোলায়েম সাদা বাবরি চুল, টানা দুটি চোখে মোলায়েম স্বগত কৌতুক। এই স্থূল জগৎ আর গুরুভার জীবন যেন অতিশয় মজার ব্যাপার এত কালের বেঁচে থাকা অতীতের সঞ্চিত সুখদুঃখ আশা নিরাশা আনন্দ বেদনায় স্তূপাকার অভিজ্ঞতা যেন একটি মাত্র সরল অনুভূতিতে পরিণত হয়ে বুড়োবয়সের প্রতিটি মুহূর্তের বর্তমানকে তাজা

তামাসা করে রেখেছে। জালালুদ্দিনের আটটি ছেলেমেয়ে, বাইশটি নাতি নাতনি আর তিনটি পুতি পুতনী—মরাহাজা বাদ দিয়ে। কাছে সবাই থাকে না. জীবিকার জন্য ছড়িয়ে গেছে কাছে ও দূরে। যারা আছে তাদের নিয়েই তার মস্ত সংসার, বীরেশ্বরের সংসারের মত।

সাংসারিক মিলের জন্যই হয়তো দু'জনের মিতালি, নয়তো দু'জনের প্রকৃতিতে মিল বড় কম। বীরেশ্বর রগচটা বদমেজাজী, জালালুদ্দিন ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এমনিতে মনে করাই কঠিন যে জালালুদ্দিনের মধ্যে তেজ বলে কিছু আছে। গাঁয়ের জীবনে, চাষীর জীবনে, ছোটখাট সংঘর্ষ লেগেই থাকে এর সঙ্গে অথবা ওর সঙ্গে। বিবাদ করতে বড়ই নারাজী জালালুদ্দিন।

বিবাদ বাধার কারণগুলিকেই সে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে, বিবাদের সূত্রপাতে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও অপর পক্ষকে জিতিয়ে দিয়ে নিজে হার মেনে আপোষ রফা করে, বড় স্বার্থের সংঘাতেও তার স্বার্থই বরাবর বাতিল হয়ে যায়। সন্দেহ জাগে যে মানুষটা বুঝি অপদার্থ, ভীরু। বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয় যে এই নরম দুর্বল সাদাসিদে মানুষটা এতকাল ধরে এত প্যাঁচ আর এত চালাকিভরা হৃদয়হীন কঠোর জীবন সংগ্রামে অনেকের চেয়ে বেশ খানিকটা ভালভাবেই টিঁকল কি করে! কিন্তু দু'চার বার গুরুতর ব্যাপারে এই মাটির মানুষটিকেই যারা আগুনে পোড়া লোহার চেয়ে শক্ত হতে দেখেছে, কৌতুকভরা দৃষ্টির বদলে দু'চোখে আবিষ্কার করেছে জেহাদ ঘোষণা, তাদের সন্দেহ সমস্যা সব মিটে গেছে। নায়েব দীনু সরকারকে এই জালালুদ্দিন একবার হাটের চালার খুঁটিতে বেঁধে হাটশুদ্ধ লোকের কাছে তার বদ মতলবের খুঁটিনাটি সব কথা স্বীকার করিয়ে প্রায় জেলে যেতে বসেছিল। ভয় আর লোভ দেখিয়ে ঝুমুরিয়ার তিনটি মুসলমান যুবককে দিয়ে এমন একটা কাজ করাতে যাচ্ছিল দীনু সরকার, যার ফলে গাঁয়ের হিন্দু মুসলমানে একটা বড়রকম মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার ঘটে যেত। জালালুদ্দিনকে সেই নায়েবের শত্রুতায় অনেক অন্যায় অত্যাচার সইতে হয়েছে। হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে নায়েব মারা না গেলে কোথাকার জল কোথায় গড়াত বলা যায় না। এ ধরণের কীর্তি আরও আছে জালালুদ্দিনের। লোকে এখনো গল্প করে।

কথা সে কম বলে। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর।—'চারগুণ মজুরি দিলেও এ গাঁয়ের কেউ যাবে না। যে যাবে তার মুশকিল আছে।'

সবাই শুনল। ক্ষেত মজুরদের 'উস্‌খুসানি থেমে গেল। কয়েকজনের চোখে শুধু ফুটে উঠল কুটিল, দ্বিধাগ্রস্থ প্রতিবাদ।

ধনা মাইতি নীচু গলায় বলল, 'জবরদস্তি বটে বাবা।'

কাদের সায় দিল।

হেরম্ব কি ভাবল সেই জানে, বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনের সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি না করে জোর গলায় হাঁক দিয়ে বলল, 'তোমাদের কোন ভয় নেই। কোন মুস্কিল হবে না। যে জুলুম করবে তাকে আমি দেখে নেব। ডবল পয়সা পাবে সবাই. চলে এসো।'

এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল জোতদার নিতাই চক্রবর্তীর বাড়ীর দিকে। নিতাইয়ের বাড়ী থেকে সে গেল আবদুল-এর বাড়ী।

নিতাই চক্রবর্তী নথিপত্র দেখছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিসাব করছিল কার কাছ থেকে কতটা বেশী আদায় করা সম্ভব হতে পারে। শুভদিন, লক্ষ্মীর আশীর্বাদ কুড়িয়ে গুছিয়ে ছিনিয়ে সংগ্রহ করবার দিন আসন্ন, চাপা উত্তেজনায় নিতাই চক্রবর্তীকে রীতিমতো উন্মনা দেখাচ্ছে। তার গোলায় পড়েছে গোবর মাটির নতুন প্রলেপ। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কপালে চন্দনের ফোঁটা।

'বীরেশ্বর ?' জিভে ক্রোধ ও বিরক্তির টকাস্‌ আওয়াজ করে নিতাই বলে, 'ও ব্যাটা চিরকাল জ্বালালে। অনাথ মণ্ডল ওদের প্রধান, সে পর্যন্ত ব্যাটাকে ডরায়। তা আপনি ভাববেন না জামাইবাবু, লোক পাবেন।' চিন্তিতভাবে নিতাই মাথা দোলায়, 'ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে, এই যা অসুবিধে। নয় তো লোকের অভাব কি! তা আপনি ভাববেন না জামাইবাবু! লোক, পাবেন।'

আবদুল হাই-এর বয়স চল্লিশের ওপর, গোলগাল চর্বি-স্নিগ্ধ লাবণ্যময় চেহারা, হাসিখুসী অমায়িক ব্যবহার। অত্যন্ত চালাক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ গ্রাম্য রাজনীতিতে, মামলা মোকদ্দমায় এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই।

হাসিমুখে কথা বলতে বলতেই একবার হাই তুলে এক মুহূর্তের জন্য সে আড়চোখে খাপছাড়া দৃষ্টিতে তাকাল হেরম্বের দিকে, মনে মনে বলল, হুঁ,

ফ্যাকড়া বাধাতে এসেছ আমাদের মধ্যে। তোমাকে লোক যোগান দিতে জালাল মিঞার সাথে লড়াই বাধাব আমি!

মুখে বলল, 'হাঁ, হাঁ, চেষ্টা করব বৈকি বাবু। তবে কি জানেন, বীরেশ্বরকে সবাই ডরায়। জালাল মিঞার সাথে বড় ভাব। ফের দেখুন, ধান কাটাও সুরু হয়ে গেছে—এই যা মুস্কিল আর কি।'

ঝুমুরিয়া আর তার আশপাশের পাঁচনিখে, সাতাইখুনী, গদাধরপুর এসব গ্রাম থেকে যে কজন লোক পেল হেরম্ব তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোণা যায়। এ যে শুধু বীরেশ্বরের প্রভাবে হল তা অবশ্য নয়, চার পাঁচটি গ্রাম দূরে থাক, শুধু ঝুমুরিয়ার সিকি ভাগ লোককেও বুঝিয়ে শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে হুকুম মানাবার ক্ষমতাও তার ছিল কিনা সন্দেহ। সময়টাই গেল হেরম্বের বিপক্ষে। ফসল কাটায় শুধু চাষীর নয় জমিদার, জোতদার, ভাগীদার, মহাজন সকলের স্বার্থই জড়িয়ে আছে। অন্য সময় হলে একা নিতাই চক্রবর্তী একদিনে বিশ ত্রিশজন লোক জুটিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারত বন কাটতে, এখন সে তিনজন প্রায় অকেজো বুড়োকে পাঠিয়ে হেরম্বের মান ও নিজের কথা বজায় রাখল। বনটা বড হলে বেশীদিন মোটা মজুরিতে কাজ করার সম্ভাবনা থাকলেও হয়তো অনেকে লোভে পড়ে কারো হুমকি না মেনে মাঠের কাজ ফেলে চলে যেত। কয়েকটা দিনের ডবল মজুরির লোভে যাদের সঙ্গে চিরদিনের স্থায়ী সম্বন্ধ তাদের চটানো অনেকেরই ভাল মনে হল না। বাইরে থেকে যারা এসেছিল ধান কাটার মরসুমে মাঠের কাজ করতে, এখানে যাদের কেউ নেই, তারাই শুধু বন কাটতে গেল। এখানে যাদের ঘর কিন্তু ফসলের সময় ছাড়া সারাটা বছর যারা বিদেশে জীবিকা অর্জন করে তারাও প্রায় কেউ হেরম্বের ডাকে সাড়া দিল না। হেরম্ব কিন্তু দায়ী করল বীরেশ্বরকে। যারা সাহায্য করতে পারত তারাও যে মুখে তাকে কথা দিয়েও কাজের বেলায় অনুগত লোকজনকে বারণ করে দিয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই যে বীরেশ্বরের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো বিদ্বেষ পোষণ করে, এসব হেরম্বের মনে এল না। বীরেশ্বর ছাড়া আর কেউ সোজাসুজি স্পষ্টভাবে তার বিরোধিতা করেনি বলেই একা বীরেশ্বরই দায়ী হয়ে রইল তার মনে।

শ্বশুরের কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়ার ইচ্ছা হেরম্বের ছিল না। সেখানে সতীরাণী আছে। কিন্তু অন্যভাবে চেষ্টা করারও সময় ছিল না। শ্বশুরের

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হওয়ায় বীরেশ্বরের উপর রাগটা তার আরও কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল।

হুকুম ধমক আর লাঠির গুঁতোয় দুদিনের মধ্যে শ'খানেক মানুষকে হেরম্বের বন কাটতে যেতে হল। ঝুমুরিয়ার মানুষেরাই লাঠির গুঁতো খেল বেশী— ঝুমুরিয়া থেকেই বেশী লোককে যেতে হল মাঠ ছেড়ে বনে।

পাঁচনিখের দারোগা শৈলেন দাস বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনকে এ দুদিন থানার গারদে আটকে রেখে সদরে চালান দিল, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টা এবং মারপিটের অভিযোগে। পুলিশকে মারপিট নয়—ধনা, কাদের ও আরও কয়েকজনকে।

ধনা ও কাদেরকে বীরেশ্বর সত্যই মেরেছিল। জালালুদ্দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল শুধু প্রতিবাদ করতে—জ্বর গায়ে।

শৈলেন দাসের বয়স মোটে আটাশ বছর। ফর্সা রঙ, ছিপছিপে গড়ন সুশ্রী চেহারা। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে, সতর্ক, বুদ্ধিমান, উৎসাহী। একটা কথা শৈলেন জানে ও বিশ্বাস করে যে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি করতে নেই, যতটুকু প্রাপ্য হেরম্বের তার বেশী খুসী তাকে করার গরজ শৈলেনের ছিল না।

শৈলেনের ভেবেচিন্তে হিসেব করে লেখা রিপোর্টে তাই ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর রূপ নিল না। বীরেশ্বরের সাজা হল একমাস জেল এবং একশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস হাজতবাস। জালালুদ্দিনেরর শুধু তিন সপ্তাহ হাজতবাস। তার বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ ছিল না। বীরেশ্বরের কাছ থেকে জরিমানা আদায় হলে অর্দ্ধেক টাকা ধনা ও কেদার পাবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

ধনা ও কেদার পাবে তার জরিমানার টাকার ভাগ! শুনেই মাথা বিগড়ে গেল বীরেশ্বরের। জরিমানা দিতে সে অস্বীকার করল। ছেলেদের বলে দিল, তারা যদি জরিমানার টাকা দাখিল করে, হাজত থেকে বেরিয়ে সে তাদের মুখদর্শন করবে না।

রম্ভা ঝুমুরিয়া এল দিন গুণে, হাজত-ফেরত বাপকে আদর করে ঘরে তুলবে। খবর সে পেয়েছিল যথাসময়েই, তাকে নিয়ে অবিলম্বে ঝুমুরিয়া

রওনা হবার জন্য রামপালের আগ্রহও কম ছিল না। রম্ভা দিন পিছিয়ে দিয়েছিল। বাপ নেই, সে কিসের বাপের বাড়ী। বাপের কথা ভেবে মিছিমিছি কান্না পাবে শুধু।

কলকাতায় বাপের কথা ভাবে নি রম্ভা, তার কান্না পায় নি? সত্য কথা বলতে কি, খবর শুনে বেশ ভালরকম কান্নাই তার পেয়েছিল। চালাক একগুঁয়ে মেয়ে কিনা, কান্নাটা তাই সে গিয়েছিল চেপে। মুখখানা একটু ম্লান পর্যন্ত করল না। ভাবল, রামপাল দেখুক এবং শিখুক যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জেলে যাওয়ার গৌরব কত, কেমন ওটা সৌভাগ্যের বিষয়

'কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

রম্ভা সগর্বে বলেছিল, 'কিসের কষ্ট?'

বলে' রামপাল একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে দেখে শুধরে নিয়ে বলেছিল, 'ওমা, কষ্ট হচ্ছে না? তোমার বাবা জেলে গেলে কষ্ট হয় না তোমার? কিন্তু কি বুকের পাটা ভাবো দিকি বাবার! গাঁয়ের কেউ কথাটি কইলে না, শুধু আমার বাবা জমিদারের লোক পুলিশের লোক সবার সামনে তাল ঠুকে দাঁড়াল। বাবা সকলের পুজো পাওয়ার যুগ্যি নয়?' এতক্ষণে চোখ ছল ছল করে এসেছিল রম্ভার, পট পট করে কবার পলক ফেলে ধরা গলায় বলেছিল, 'কষ্ট হলে করছি কি বলো? সুযিদা বলত, এদেশে মানুষের মত মানুষ যে হবে জেলে তাকে যেতে হবেই, এম্‌নি দেশ এটা। সত্যি না কথাটা? গান্ধীজি থেকে সুরু করে নাম কর দিকি একটা বড় মানুষের, আদ্দেক জীবন যে জেলে কাটায় নি?'

রম্ভা আজকাল অনবরত এইরকম সোজা স্পষ্ট প্রোপাগাণ্ডা চালাতে আরম্ভ করেছিল, কোন একটা উপলক্ষ পেলেই হল। কেবল রামপাল নয়, বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে। জানাশোনা কথারই পুনরাবৃত্তি রম্ভার আন্তরিকতায় আবার নতুন করে সকলের মন স্পর্শ করে, একটা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য অস্বস্তিবোধ জাগায় সকলের মধ্যে, আধভোলা তাকে তোলা নালিশগুলি আবার কিছুক্ষণের জন্য গুমরে ওঠে বুকের মধ্যে, কেউ মুচকে হেসে বলে, 'ও বাবা, স্বদেশী মেয়ে তুমি?' আগে হয় তো রম্ভা রেগে যেত হাসি দেখে এবং মন্তব্য শুনে, আজকাল সেও হেসে জবাব দেয়, 'নয় তো কি বিদেশী মেয়ে? মেম?'

ঝুমুরিয়া পৌঁছেই রম্ভা শুধোয়, 'বাবা ছাড়া পাবে কবে?'

শ্যামলাল বলে, 'আরও একমাস।'

ব্যাপার শুনে আগুন হয়ে ওঠে রম্ভা। বীরেশ্বর বারণ করেছে বলে জরিমানার টাকা জমা দেওয়া হয় নি! এমনি সব বাপ-ভক্ত উপযুক্ত ছেলে বীরেশ্বরের! বাপ একটু রাগ করবে, এসে দুটো মন্দ কথা বলবে বলে ভয় হয়েছে সবার! এই একটা ছুতো পেয়ে বাপকে ছেলেরা জেলে পচাচ্ছে একশোটা টাকার জন্যে—ভোগ করছে সেই বাপের টাকাপয়সা জমি-জমা!

'বাবা যদি আত্মঘাতী হতে যেত, ঠেকাতে না বাবাকে? রাগের ভয়ে আত্মঘাতী হতে দিতে বাবাকে?'

মুখ কালো করে সবাই শোনে। এ বিষয়ে যে অনেক আলোচনা হয়েছে বাড়ীতে, বীরেশ্বরের বারণ অমান্য করেও যে জরিমানা দেবার কথাটা তারা ভেবেছে অনেকবার কিন্তু মনস্থির করতে পারে নি শেষ পর্যন্ত, এসব রম্ভাকে কেউ বলে না। দ্বিধাসংশয়হীন তীব্র ভাষায় এমন জোরের সঙ্গেই রম্ভা বলে দিয়েছে তাদের কি করা উচিত ছিল যে মনস্থির করতে না পারাটাই মস্ত অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বটে। তাই বটে! রাগ না হয় করতই বীরেশ্বর, এসে দুটো গাল মন্দই দিত, তাই বলে বুড়ো বাপকে জেল থেকে খালাস করে না আনার কোন মানে হয়? মেরে তো আর সে ফেলত না বাড়ীর সবাইকে।

সকলে চুপ করে থাকে। ছোট ভাই মোহনলাল, এ বাড়ীতে যে সকলের চেয়ে রোগা আর বেঁটে, সেই একা প্রতিবাদ করে রম্ভার ঝাঁঝালো সমালোচনার, বলে, 'অত চোটপাট করিস নে ছোড়দি, বাবা তোর একার বাবা নাকি? আমরা ছাড়িয়ে আনতাম বাবাকে, বাবার মনে কষ্ট হবে বলে আনি নি।'

'কিসের কষ্ট?' রম্ভা শুধোয় অবাক হয়ে।

'ধনা আর কাদের যে জরিমানার টাকা পাবে?'

'ধনা পাক মনা পাক কাদের পাক ফাদের পাক, মোদের তাতে কি?'

এ প্রশ্নের লাগসই নতুন জবাব মোহন খুঁজে পায় না। সে শুধু বলে, 'বাবার মনে কষ্ট হবে।'

পরদিন শ্যামলাল জরিমানার টাকা জমা দিতে সদরে গেল। টাকা জমা হয়ে গেল সেইদিন, ছাড়পত্র পেয়ে বীরেশ্বরের বাড়ী ফিরতে লেগে গেলে পাঁচ

দিন। কার অত খরচ পড়েছে পুরাণো নথিপত্র ঘাঁটবার? হবে, সব হবে, ধীরে সুস্থে। এতই যদি ব্যস্ত তারা, এতকাল জমা দেয় নি কেন টাকা? পুরো একটা মাস কি ঘুমোচ্ছিল তারা?

শেষে দেবনারায়ণ উকীল বললেন, 'দাও দিকি দশটা টাকা।'

তৈলাভাবেই শেষ চাকা ঘুরছিল না। তেল পাওয়া মাত্র চাকা ঘুরে গেল। বীরেশ্বর ছাড়া পেল সেইদিন।

দেখা গেল বীরেশ্বর রাগ করে নি। সে শুধু একবার আফশোষ করে বলল, কি দরকার ছিল অতগুলো টাকা নষ্ট করার? কটা দিন বেশ কেটে যেত।'

'বড্ড রোগা হয়ে গেছ বাবা।' রম্ভা বলে।

বীরেশ্বর হাসে।— 'তবে কি মোটা হব?''

রম্ভা এক বাটি দুধ এগিয়ে দেয়। 'দুধটা খাও দিকি আগে।'

দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করে, 'কত ধান বরবাদ গেল?'

'এই গেছে কিছু।' শ্যামলাল জবাব দেয়।

'মোদের কথা শুধোই নি। গাঁ শুদ্ধ ধরে?

'তা মোটমাট মন্দ যায় নি। সবচেয়ে বেশী গেছে ভূতো, ননী, কালীপদ আর রহমতের। আদ্দেকও ঘরে তুলতে পারে নি। কম বেশী সবারি গেছে।'

'এত গেল?' বীরেশ্বর এক চুমুকে জাম বাটি ভরা দুধ শেষ করে ফেলে। —'মোদের কত গেল?'

'এই গেল কিছু।'

'কত?' বীরেশ্বর গর্জন করে ওঠে, 'ছাপাসনে কিছু। সোজা কথা বলতে শিখিস নি?'

শ্যামলালের বদলে জীবনলাল জবাব দেয়, 'ডাঙ্গা জমির প্রায় সব নষ্ট।' হেরম্ববাবু সারাদিন লরী চালাল কিনা ক্ষেতের ওপর।

'দখিন জমির আল ডিঙ্গোতে লরীর একটা চাকা ভেঙ্গেছে বাবা।' মোহনলাল যোগ দেয়। সাত বিঘে জমির পাকা ফসল চাকায় পেষার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটা চাকা যে অন্ততঃ লরীটার জখম হয়েছে তাতে মোহনকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হয়।

বীরেশ্বরের বাড়ীর সামনে লাউ কুমড়োর মাচা। ডাইনের মাচায় ঝুলছে অনেকগুলি বড় আর কচি লাউ। এই সবুজ সফল মাচা থেকে চোখ তুলে উত্তরে তাকিয়ে কেমন একটা শূন্যতার অনুভূতি জাগে বীরেশ্বরের। অনেক দিনের চেনা মানুষ যেন গোঁপ দাড়ি কামিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তরে শাল বনের চিহ্ন নেই, পৃথিবীর উত্তরে মুখটা যেন চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

মনটা নুয়ে বাঁকা হয়ে যায় বীরেশ্বরের। জীবনে আর কখনো সে এমন জগদ্দল পাষাণের মত ভারি জমাট বাঁধা বিষাদ অনুভব করে নি। আজ তার প্রথম মনে হয় মানুষটা সে সুস্থ স্বাভাবিক নয়, সে সত্যই খ্যাপা, পাগলাটে, খাপছাড়া। লোকে যে বলে তাই ঠিক, মাথায় তার পোকা আছে। এতদিন কার সঙ্গে সে লড়াই করে এল, কিসের সঙ্গে? ভগবান জানেন, লড়াই সে করেছে অবিরাম। বাইরে বড় সংঘর্ষের সুযোগ তার বেশী জোটেনি, দৈনন্দিন জীবনের অনেক অনিয়ম, অনাচার, অবিচার অন্যায়ও সে সয়ে গেছে নিরুপায় ধৈর্যের সঙ্গে, কিন্তু মন তার মহত্তর অসঙ্গতিকেও মেনে নেয় নি, উদ্যত, উদ্ধত প্রতিবাদ গুমরে গুমরে গর্জন করেছে। সব তার মাথার বিকারের লক্ষণ—চড়া বায়ুর প্রমাণ। কি এসে গেছে তার প্রতিবাদে? যা ঘটবার সবই ঘটেছে, কেউ ঠেকাতে পারে নি। এই হয় তো নিয়ম জগতের। ঝড় এসে ঘর ভাঙ্গে বলে ঝড়ের নামে নালিশ করে কে যে এটা উচিত নয়, এ অন্যায়, এ অত্যাচার? পাগল করে। মাথা যার খারাপ বীরেশ্বরের মত।

সূর্য এসে সামনে দাঁড়ায়।

'খবর পেয়ে দেখতে এলাম।'

মাঘের মিঠা রোদে কেমন প্রাণশূন্য মনে হয় সূর্যের রক্তহীন শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ, তার স্তিমিত নিবু নিবু চোখ।

'খপর অনেকই পেয়েছে।'

সূর্য হাসে। সত্যই হাসে। কি করে যে হাসে ভগবান জানেন।

'আসবে। সবাই আসবে। বাজারে আদ্দেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের আদ্দেক ছেলে বেরিয়ে এসেছে। দল বেঁধে প্রসেসন করে সবাই আসবে। আসবে কি, আসছে।'

বিষণ্ণ রোদ দীপ্ত হয়ে ওঠে বীরেশ্বরের চোখে। অসীম শূন্যতা পূর্ণ হয়ে

যায় অদৃশ্য মানুষের অশ্রুত কলরবে। নিতাই, সুদেব, বলাই, রামপদের বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকগুলি চোখ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এতক্ষণে খেয়াল হয়। খেয়াল হয় রম্ভা সঙ্গে আছে গোড়া থেকে।

'প্রসেসন ?' বীরেশ্বর বলে।

'আপনি বলেছেন সবাইকে প্রসেসন করতে! এ কাজ আপনার।' কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে রম্ভা বলে।

'একজন দুজন করে এলোমেলো ভাবে আসত, আমি ভাবলাম, সবাই দল বেঁধে আসুক। আমার কোন বাহাদুরী নেই রম্ভা।'

'আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। দুধ খাবেন একটু ?'

'একদিন একটু দুধ খাইয়ে মোটা করে দেবে ?'

'একদিন কেন, রোজ খাবেন। দুধ খান না বুঝি ? তাই এমন চেহারা হয়েছে। কেন খান না দুধ ?'

'কে খাওয়াবে দুধ ?'

আধঘণ্টা পরে শোভাযাত্রা আসে, রাঘব মহান্তির বাড়ী ও দোকানের সামনে রাস্তার বাঁক ঘুরে। দূর থেকেই শোভাযাত্রার লোকসংখ্যা আন্দাজ করে বীরেশ্বর অভিভূত হয়ে পড়ে, রম্ভার বুক দশহাত হয়ে ওঠে। অপ্রশস্ত মেটে রাস্তা, পাঁচ ছ'জনের বেশী পাশাপাশি হাঁটতে পারে না, শোভাযাত্রা তাই অত্যন্ত লম্বা হয়ে পড়েছে। বীরেশ্বরের বাড়ীর পাশে আমবাগান পেরিয়েই তার খুড়তুতো ভাই কাশীশ্বরের বাড়ী, শেষ প্রান্ত রাস্তার বাঁক ঘুরে আসতে আসতে শোভাযাত্রার মাথা প্রায় কাশীশ্বরের বাড়ীর সামনে এসে পড়ে। শোভাযাত্রার নিঃশব্দ অগ্রগতি রম্ভার কাছে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। ছেলেবুড়ো মিলে, এতগুলি গেঁয়ো মানুষ দল বেঁধে আসছে বীরেশ্বরকে সম্বর্দ্ধনা করতে, তাদের সারি দেওয়াতে শৃঙ্খলা নেই, পদক্ষেপও এলোমেলো অথচ হৈ চৈ চেঁচামেচি দূরে থাক, এতগুলি লোকের শুধু কথা বলাবলিতে যে কলরব গড়ে উঠত, তা পর্যন্ত শোনা যায় না। বীরেশ্বরের মুক্তি যেন পরম শোকাবহ ঘটনা, আনন্দের বদলে সকলে শোক প্রকাশ করতে আসছে।

শোভাযাত্রার সামনে জালালুদ্দিনের ভাই মহীউদ্দিনকে এবং তার পিছনে গ্রামের অনেক পরিচিত মুসলমানকে দেখে বীরেশ্বর সকলের স্তব্ধতার মানে বুঝতে পারে। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য গাঁয়ের অর্দ্ধেকের বেশী হিন্দু

মুসলমান একত্র হয়েছে কেন তাও সে টের পায়। জালালুদ্দিন তার জন্য এই সম্মান ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে রেখে গেছে।

জ্বর গায়ে জালালুদ্দিন জেলে গিয়েছিল। দিন পনের পরে সে নিম্যুনিয়ায় মারা যায়।

চার

কৃষ্ণেন্দু থাকে নরোত্তম দাস লেনে ছোট একটি বাড়ীতে, তার দাদা পূর্ণেন্দুর সঙ্গে। বয়সে পূর্ণেন্দু তার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, পড়াশোনা করেছেন অনেক, এককালে কিছুদিন দেশের কাজে উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এখন ধীর স্থির সংসারী নিরীহ ভালমানুষ। ছোট ভাইটিকে তিনি অনেকটা বড়দাদার মত শ্রদ্ধা করেন। চাকরী করে সংসার চালিয়ে একঘেয়ে জীবন-যাপন করার জন্য তার মনে বিশেষ কোন ক্ষোভ নেই, কারণ তিনি সত্যই বিশ্বাস করেন এবং অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকারও করেন যে বড় কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি উপযুক্ত নন। বলেন, 'আমরা তো অপদার্থ, আমাদের জীবনের দাম কি? কলেজে পড়ার সময় যোয়ান বয়সে একবার জেল খাটলাম ছ'মাস, বাস্, খতম হয়ে গেল দেশের কাজ। কেষ্ট তেমন নয়। ও একটানা চালিয়ে যাচ্ছে। বিয়ে যখন করল, ভেবেছিলাম এবার বুঝি ঢিল পড়বে। ও কি সেই ছেলে? বিয়ের একমাসের মধ্যে বৌমাকে পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দিল! ওর সঙ্গে আমাদের তুলনা?'

পূর্ণেন্দুর স্ত্রী কনক বিয়ের সময় কলেজে পড়ার আলস্যে বেশ মোটা সোটা ছিল, পাঁচটি ছেলেমেয়ে বিইয়ে আর সংসারের কাজে অবিশ্রাম খেটে খেটে মেদ ক্ষয়ে গিয়ে এখন বেশ ছিপছিপে চেহারা হয়েছে।

সে হেসে বলে, 'ওটা ঠাকুরপোর গায়ের ঝাল ঝাড়া, আমায় টানতে পারেনি কিনা।'

আজ সে হেসে একথা বলে, কিন্তু একদিন গায়ের জ্বালাতে সংসারে তীব্র অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু আর সন্ধ্যাকে তাড়িয়েই দিয়েছিল বাড়ী থেকে। তাড়িয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যাকে নীচু করার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর। একদিন বানিয়ে সে একটা গল্প বলেছিল কৃষ্ণেন্দুকে। হীরেন তখন

সর্বদা এ বাড়ীতে আসত যেত। স্বচক্ষে সে দেখেছে হীরেন আর সন্ধ্যা—

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'তাই নাকি? তবে তো মুস্কিল!'

মুস্কিল? শুধু মুস্কিল? কনকের এটা সহ্য হয় নি।

'আমার বাড়ীতে এসব চলবে না ঠাকুরপো। তুমি অন্য কোথাও যাও।'

তারপর কৃষ্ণেন্দু যখন জেলে, একটি মেয়েকে জন্ম দিয়ে সন্ধ্যা মরে যায়। সন্ধ্যা কাছে থেকে যে বিকার সৃষ্টি করেছিল কনকের মনে, তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল সন্ধ্যা দূরে যাবার পর থেকেই। সন্ধ্যা মরে গেছে শুনে কনকের প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়। একদিন জেলে দেখা করতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণেন্দুর কাছে সে স্বীকার করে আসে তার বজ্জাতির কথা। কৃষ্ণেন্দুর মেয়েকেও একরকম ছিনিয়ে নিয়ে আসে তার দিদিমার কাছ থেকে। কনকের মাই টেনেই সে বড় হয়েছে। এখন তার বছর চারেক বয়স, সবাই পুতুল বলে ডাকে। কৃষ্ণেন্দুব চেহারা যেমন হোক, সন্ধ্যার রূপ দেখে চোখে পলক পড়ত না মানুষের, মনে হত সে বুঝি মাখন দিয়ে গড়া পুতুল। মেয়েটাও অনেকটা মায়ের মত হয়েছে।

সেদিন আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে আছে বিকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। রাত সাড়ে এগারোটার সময় বাড়ী ফিরে কৃষ্ণেন্দু জামা খুলতে যাবে, উত্তেজনার একটা ঝাপটার মত হাজির হল মমতা।

পাশের ঘরে কনকের কাছে বসেই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তবু সে হাঁপাচ্ছে। এটুকু আসার পরিশ্রমে অবশ্য নয়, উত্তেজনায়। 'দাঁড়াও, বলছি। দম নিয়ে নি।'

কৃষ্ণেন্দু আর জামা খুললো না।

কৃষ্ণেন্দু অত্যন্ত লম্বা, যেরকম লম্বা হলে লোকে তালগাছ বলে থাকে। রোগা বলে তাকে আরও বেশী লম্বা দেখায়। রোগাও সে এক অদ্ভুত ধরনের,মোটা মোটা হাড় ছাড়া গায়ে তার কোথাও মাংস নেই। দেহের স্বাভাবিক গড়নটাই তার এইরকম, রোগে ভুগে মাংসের অপচয় ঘটে রোগা হয়নি বলে এবং শরীরের সঙ্গে মানানসই ধাঁচের লম্বাটে মুখে শীর্ণতা চোখে পড়ে না বলে, জামা গায়ে থাকলে তাকে বিশেষ খারাপ দেখায় না, খালি গায়ে তাকে দেখায় হাড়গিলের মত। মানুষের সামনে এজন্য সহজে সে জামা খুলতে চায় না—এত যে সে তেজী, আত্মবিশ্বাসী, ন্যাকামি-অভিমান-বিরোধী মানুষ, এই একটি তুচ্ছ বিষয়ে দুর্বলতা সে জয় করতে পারেনি। গায়ে তার খানিকটা হাফ-পাঞ্জাবী ও খানিকটা ফতুয়ার

মত হাতকাটা জামা—সর্বদা ও সর্বত্র এই রকম জামাই সে পরে। এও একটা দুর্বলতা বৈকি। সাধারণ সার্ট পাঞ্জাবীর চেয়ে এই জামাতে যে তাকে ভাল মানায়, বেশ দেখায় তাকে এই জামা পরলে, লোকের ধারণা হয় সে বিলাসিতা-বিমুখ ফ্যাশন-বিদ্রোহী সহজ মানুষ, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ, আনমনে সে নিজেই তা জানে। চওড়া কপালের দুটি প্রান্তের বাঁক তার সুডৌল, বড় বড় চুলে টেরি না কেটে সে তাই সোজাসুজি পিছনে ঠেলে চুল আঁচড়ায়। লম্বাটে চিবুক, খাড়া নাক দিব্যি মানানসই, কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি অত্যন্ত খাপছাড়া দেখায়।

এদিকে দম নিতে নিতে কি হয় মমতার, হুস করে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আর নিজের অনভ্যস্ত কান্নায় নিজেই কেমন ভড়কে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে সেটা থামাতে চেষ্টা করে। হাতের চাপেই কান্নাটা যেন থামে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শান্ত হয়।

বলে, 'এটা কি হল ?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'একটু কাঁদলে, আর কিছু নয়। চাপা না দিয়ে প্রাণভরে কেঁদে নিলে পারতে মমু।'

মমতা আর একবার চোখ মুছে বলে, 'না আর দরকার নেই। আমারও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল, কি যেন হওয়া উচিত, হচ্ছেনা, জোলাপ নেবার পর যেমন হয়।' বলে' গম্ভীর হয় মমতা। গুরুতর কথা গম্ভীর না হয়ে বলা যায় না, বলা উচিতও নয়।—'শোন। ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। হীরেন আমায় ত্যাগ করেছে। মানে, ও আমায় ত্যাগ করেছে, আমিও ওকে ত্যাগ কবেছি। আমাদের বনল না।'

কৃষ্ণেন্দু বলতে যায়, 'প্রথম কলহ হলে—'

মমতা প্রায় ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ কর। দাম্পত্য কলহ কাকে বলে আমি জানি। এ তা নয়। তোমার কথাই ঠিক হল কেষ্টদা। ওকে গড়ে নিতে পারলাম না, আরও বিগড়ে গেল। মানুষ ভেবেছিলাম ওকে, বেরিয়ে পড়লো অমানুষ।'

'ওতো অমানুষ নয় ?'

'নয় ? শোন তবে।'

অনেক সময় লাগে বলতে। অতি বোধগম্য কথাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে কি কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারবে। কনক ধৈর্য হারিয়ে বার বার এসে

উঁকি দিয়ে যায়, বলে যে কৃষ্ণেন্দু খেয়ে নিলেই পারত, এ রকম অনিয়মে কদিন তার শরীর টিকবে। শেষে সে রীতিমত রাগ করেই বলে যায়, 'বেশ, গল্প করো তোমরা সারারাত। আমি গিয়ে শুলাম।'

খিদেয় ঝিমিয়ে আসে কৃষ্ণেন্দুর শ্রান্ত শরীর। সহানুভূতির বদলে বোধ করে বিরক্তি, জাগে একটা ভাষাহীন কঠিন প্রতিবাদ। মমতার সঙ্কটের বিবরণ সে শোনে সমালোচকের মত, দরদী বন্ধুর মত নয়। তার মনে হয়, মমতা যেন তাকেও জড়িয়ে ফেলতে চাইছে তার দাম্পত্য জীবনের দুর্ঘটনার সঙ্গে, দায়িত্ব আরোপ করতে চাইছে তার ঘাড়ে। মমতা তাকে সব বলছে সেইভাবে, নালিশ না করেও মানুষ যেভাবে দুর্ভাগ্যের জন্য নালিশের ভঙ্গিতেই ভগবানকে জানায়, আমার তো কোন দোষ নেই, তবে কেন এমন হল ভগবান ?

'কেন তুমি অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেষ্টদা ? কেন তুমি অত করে বলতে গিয়েছিলে ওর হয়ে ? আর কিছুদিন গেলে হয় তো ওকে ঠিকমত চিনতে পারতাম।'

শুনে বড় রাগ হয় কৃষ্ণেন্দুর। মমতার নরম গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবার জন্য হাতটা তার নিসপিস করে ওঠে। ফুটন্ত ক্রোধের বুদবুদের মত কতগুলি গাল মনের মধ্যে ফুটে উঠে ফেটে যায়—বড়লোকের স্বার্থপর খেয়ালী হতভাগা নচ্ছার মেয়ে—ন্যাকা মেয়ে !

'তোমায় দোষ দিচ্ছিনা কেষ্টদা। আমিই ভুল করেছিলাম। আমি শুধু বলছি কি—'

রম্ভাও বলেছিল। এরকম হিসাব করে নয়, গোড়াতে প্রাণের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে—কার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আমার ? নালিশ রম্ভাও করে নি, তাকে আত্মীয় ভেবে ওভাবে কথাটা বলেছিল, তার বিয়ের ব্যাপারে কোন সংস্রব ছিল না এমন আপন জনের কাছেও সে ওভাবেই দুঃখ নিবেদনের ভূমিকা করত। মমতাও হয়তো নালিশ করছে না, দোষ দিচ্ছে না। নিজের দায়িত্বে এতবড় ভুল করার চিন্তাটা শুধু তার সইছে না। ভুল করার সমর্থনে যত পারে যুক্তি আবিষ্কার করে সে শুধু দায়িত্ববোধটা একটু হালকা করতে চায়। নিজের ওপর এবার বিরক্তি জাগে কৃষ্ণেন্দুর। দায়িত্ব আছে বৈকি তার, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে সে কি কাজ করতে দেয়নি এদের হৃদয় মনের ওপর, যারা আকৃষ্ট হয়েছে তার দিকে, আপন বলে জেনেছে তাকে, শ্রদ্ধা করতে শিখেছে তার বুদ্ধি

বিবেচনাকে, আপদে বিপদে সঙ্কটে সমস্যায় ছুটে আসছে তারই কাছে সমবেদনার দাবী নিয়ে, পরামর্শ চেয়ে ?

'বড় খিদে পেয়েছে মমু।'

'খিদে পেয়েছে !'

'সারাদিন ঘুরেছি। চান করে খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে আলোচনা করব।'

'আলোচনা করার কিছু নেই। কি করব তা আমি ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু তুমি খেয়ে নাও। আমি সত্যি বড় স্বার্থপর—খালি নিজের কথা ভাবি।' মমতা থামে।—'নাইবে ? নেও না এতরাত্রে। মুখ হাত ধুয়ে নাও শুধু।'

দ্বিধাহীন স্পষ্ট নির্দেশ। নিজের অধিকার মমতা সত্যই জানে—একটু বেশী-রকম জানে।

কৃষ্ণেন্দু চান করে খেতে বসলে মমতা তাকে জানায়, সব সে ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে চির জীবনের মত—স্বামীকে, বাপকে, আত্মীয়স্বজনকে, ভদ্রলোকের সংসর্গকে। আর আপশোষ নয়, একসঙ্গে দুটি জগতে বাস করার মিথ্যা চেষ্টা নয়, যাদের নিয়ে তার কাজ তাদের মধ্যে সে নেমে যাবে এবার। বাড়ী পর্যন্ত সে আর ফিরে যাবে না। না, আজ রাত্রের জন্যেও নয়। নিজের বাড়িতেও দু'রাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। আজ সে এখানে ঘুমোবে—কৃষ্ণেন্দুর বাড়িতে। তারপর বস্তিতে হোক, গ্রামে হোক, যেখানে কৃষ্ণেন্দু তাকে কাজে লাগাবে সেইখানে চলে যাবে।

না, দু'নৌকায় আর সে পা দেবে না। বাকী জীবনের খানিকটা নয়, সবটা সে খরচ করবে চাষী মজুরদের জন্য। ওদের মধ্যে ওদের মত হয়ে থাকবে, ওদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে ওদের একজন হয়ে কাজ করবে ওদের জন্য। মমতা শান্ত হয়েছিল, আবার তার মধ্যে উত্তেজনা ঘনিয়ে আসে। কিন্তু কথা সে বলে ধীর ভাবেই, উত্তেজনা প্রকাশ পায় শুধু তার চোখে আর যুদ্ধ ঘোষণার উদ্ধত ভঙ্গিতে।

কনক গিয়ে রাগ করে শুয়েছিল, কিন্তু ছিল সজাগ হয়েই, কান পেতে। উঠে এসে বাড়া ভাত সে-ই কৃষ্ণেন্দুর সামনে ধরে দিয়েছে। গেলাসের জল ফেলে নতুন করে জল গড়িয়ে দিয়েছে। মমতার কথা শুনতে শুনতে তার মুখ হাঁ হয়ে আসে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই ? কি বলছ এসব ?'

মমতা বিরক্ত হয়ে বলে, 'চুপ কর বৌদি। তুমি এসব বুঝবে না।'

মমতা কোনদিনই কনককে বিশেষ কেয়ার করে না, এসব রাঁধা-বাড়া ছেলে-মানুষ-করা সঙ্কীর্ণমনা সাধারণ আত্মপরিতৃপ্ত মেয়েদের প্রতি তার একটা দারুণ অবজ্ঞার ভাব আছে—বিশেষতঃ যে সব মেয়ের কিছু করার সুযোগ ছিল। এরকম হবার জন্যেই যারা মানুষ হয়েছে ঘরের মধ্যে, তাদের বরং সে ক্ষমা করতে পারে, সইতে পারে, কিন্তু নামকরা কংগ্রেস নেতা নিরঞ্জন বসুর মেয়ে হয়ে, পূর্ণেন্দুর স্ত্রী আর কৃষ্ণেন্দুর বৌদি হয়ে যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ঘরের কোণে এই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক জীবন বেছে নিতে পারে, তাকে পছন্দ করা মমতার পক্ষে অসম্ভব। অথচ মাঝে মাঝে বেশ ভালই লাগে কনককে তার! নিজের স্বামী-পুত্র-ঠাওরকে স্নেহ করার তার অদ্ভুত ক্ষমতা সময় সময় অসতর্ক মুহূর্তে মমতার অবহেলার বর্ম ভেদ করে মর্ম স্পর্শ করে তাকে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়। পরক্ষণে মনে মনে হেসে সে অবশ্য সামলে নেয় নিজেকে। এতো উচ্ছ্বাস, এতো ভাবপ্রবণতা, নিছক দাসীর মনোবৃত্তি।

কথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দু একদিন একথা স্বীকার করেছিল, বলেছিল, 'নিশ্চয়। তবে কি জানো, ওদের পক্ষে এই ভাল। এইরকম প্রকৃতি দাঁড়িয়ে গেছে, এভাবে স্নেহ করতে না পারলেই বিগড়ে যাবে, এমনি তীব্রতার সঙ্গে তখন সবাইকে হিংসা করবে—নিজেব লোককে শুধু নয়, পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে। কত মেয়ে ওরকম হয়ে যায়, তুমি নিজেও তো দেখেছ। রমেশ বসুর স্ত্রীকে মনে নেই? দিনরাত ঝগড়া করছে বাড়ীর আর পাড়ার লোকের সঙ্গে, স্বামীকে এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দিচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা সবসময় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, ছেলের বৌ দিনরাত কাঁদছে আর গলায় দড়ি দেবার কথা ভাবছে—ওর স্নেহ করার নেশা মিটলে এমন হত না। ওরকম হওয়ার চেয়ে স্নেহপাগল হওয়া কি ভাল নয়? যার যেমন প্রকৃতি, উপায় কি বলো!'

মমতা বলেছিল, 'নিজের প্রকৃতি বদলাতে পারে না মানুষ? চেষ্টা করলে সংযত করতে পারে না নিজেকে?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'পারে বৈকি, কিন্তু সে বড় কঠিন চেষ্টা। ভাবের আবেগে ফাঁসি যাওয়া বরং সহজ, ভাবপ্রবণতা সংযত করার চেয়ে। রীতিমত সাধনার ব্যাপার। নিজে নিজে একা একাজ কি সম্ভব সকলের পক্ষে? একজন মহাপুরুষ বহুকাল একটানা চেষ্টা করলে তবে এসব মানুষের স্বভাব বদল করতে

পারেন।'—কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল, 'যদিও মহাপুরুষ নই, আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম বৌদিকে বদল করে দলে টানতে। শেষে দেখলাম, সব কাজ বন্ধ করে অর্দ্ধেক জীবন বৌদির পেছনে লেগে থাকলে তবে যদি কিছু করতে পারি। তার চেয়ে বৌদি যেমন আছেন তেমনি থাকতে দেওয়াই ভাল।'

কৃষ্ণেন্দু নীরবে খেয়ে যায়। কতকগুলি কাজ কৃষ্ণেন্দু বড়ই আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে করে, তার মধ্যে খাওয়া একটা। তিন জনেই চুপচাপ। ঘুম ভেঙ্গে পুতুল এসে বাপের গা ঘেঁষে বসে পড়ে। পাতে তখন অবশিষ্ট আছে তিনটি পটোলের মোরব্বা। পুতুল গাল ঘষে কৃষ্ণেন্দুর বাহুতে। মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে।

কনকও হাসে—'দুষ্ট মেয়ে!'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নাড়ে।—'না।'

কনক বলে, 'দাও না ঠাকুরপো আধখানা ভেঙ্গে? তুমি যেন কি!'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'না'।

কনক বলে, 'দাঁড়া পুতুল, আমি দিচ্ছি তোকে।'

আস্ত একটি মোরব্বা এনে সে বাড়িয়ে দেয় পুতুলের দিকে, বলে, 'নে। ধর।'

পুতুল নড়ে না, হাতও বাড়ায় না। কৃষ্ণেন্দুর গায়ে ঠেস দিয়ে তেমনি ভাবে বসে থেকে একান্ত নির্বিকার ভাবে বলে, 'খাব না তো।'

মুখ লাল হয়ে যায় কনকের। বাড়ানো হাত ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে সে মর্মাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খাও পুতুল, নাও। জেঠিমা দিচ্ছে যে?'

তখন পুতুল সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। হাতের মোরব্বাটি উঠানে ছুঁড়ে দিয়ে কনক উঠে চলে যায় ঘরে। পাতের একটি মোরব্বা মেয়ের হাতে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'খেয়ে নিয়ে জেঠিমাকে হাত ধুয়ে দিতে বলবে, কেমন?'

মমতা মন্তব্য করে, 'তোমার মনটা তো বড় দুর্বল কেষ্টদা? দেবে না বলে আবার দিলে, বৌদির একটু ছেলেমানুষী অভিমান হয়েছে বলে? ডিসিপ্লিন নষ্ট করলে?'

কৃষ্ণেন্দু আনমনে বলে, 'হ্যাঁ, দুর্বল বৈকি। নিশ্চয় দুর্বল। মানুষের মনটা কি জানো—' হঠাৎ সে সচেতন হয়,—'কি বলছিলে? ডিসিপ্লিন নষ্ট করলাম? ওইটুকু মেয়ের আবার ডিসিপ্লিন কিসের?'

'গোড়াতেই দিলে না কেন তবে ?'

কৃষ্ণেন্দু যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মমতার মুখের দিকে। —'আমাকে তুমি কি ভাব বল দিকি মমু ? মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো ? আমাকে তুমি মানুষ ভাবো না, যন্ত্রটন্ত্র মনে কর। আমি যাই বলি যাই করি, সব কিছুর একটা বিশেষ মানে থাকা চাই তোমার কাছে, উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন বলত ?'

'কি জানি। সত্যি ওরকম ভাবি নাকি তোমাকে ?'

'মনে তো হয়। বেশী মিষ্টি খেলে পুতুলের পেট কামড়ায়, তাই প্রথমে না বলেছিলাম। একটা মোরব্বা খেলেই যে পেট কামড়াবে তার কোন মানে নেই। তাই শেষে বললাম, খাও। অত কড়াকড়ি করা যায় না খুঁটিনাটি সব বিষয়ে।'

'তাই নাকি ?' খোঁচা দিয়ে মমতা বলে, 'কড়াকড়ি কিছু কম করা হয়েছে বলে তো মনে হয় না ? তুমি বললে, নিও না, বাস্, ওইটুকু মেয়ে বৌদির কাছ থেকে খাবার নিলে না। তুমি বললে, নাও। অমনি ও হাত বাড়িয়ে দিলে। এতো প্রায় মিলিটারি ডিসিপ্লিন ! এটা আপনা থেকে শিখেছে মেয়েটা, না ?'

এবার কৃষ্ণেন্দুর মুখ কৌতুকের হাসিতে ভরে যায়,—'বৌদি ঠিক বলেছে মমু, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি ভাবছ আমার ভয়ে পুতুল বৌদির কাছে খাবারটা নিতে চায় নি ? কি বুদ্ধি তোমার ! আমি দেব না বলায় ওর অভিমান হয়েছিল। আমি হার মেনে নিতে না বললে ও কি করে মোরব্বা নেয় ? ছোট ছেলেমেয়ের অভিমানও চেনা না ? চিনবে, নিজের হোক, তখন টের পাবে—'

'এ জন্মে আর আশা নেই টের পাবার।'

ঘরে এসে তারা বসেছে। পুতুলের সঙ্গে কনক এসে বলে, 'তোমার মেয়েকে নিয়ে আর পারি নে ঠাকুরপো। মাথা তো খেলে ওর তুমি আস্কারা দিয়ে দিয়ে ? এত করলাম, কিছুতে শোয়াতে পারলাম না মেয়েকে !'

কৃষ্ণেন্দু কড়া গলায় বলে, 'পুতুল ! শীগ্‌গির শুয়ে থাক গে।'

'শোব না যাও !' সোজা এগিয়ে এসে পুতুল কৃষ্ণেন্দুর কোল দখল করে বসে পড়ে। মমতার দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দু অসহায়ের মত বলে, 'একদম ডিসিপ্লিন মানে না মমু।'

'খুঁচিও না কেষ্টদা, ভাল হবে না। আমার বলে মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে,

তুমি তামাসা জুড়লে আমার সঙ্গে। নিজে তো খেলে পেট ভরে, আমি যে এখনো—'

কনক বলে, 'খাওনি এখনো? বেশ!'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'বলতে পার নি?'

'খেয়াল ছিল নাকি যে বলব?'

'কি এখন খাওয়াই তোমাকে আমি!' বলতে বলতে কনক লুচি আর বেগুন ভাজতে যায়। একটু পরেই ষ্টোভের আওয়াজ কানে আসে। মমতার এতক্ষণে খেয়াল হয়, তার জীবনের এত বড় ওলোটপালোট সম্বন্ধে কৃষ্ণেন্দু এ পর্যন্ত একটি কথাও বলে নি।

'কই, কিছু ত বললে না তুমি?'

'কি বলব?'

'কি বলবে! কিছুই বলার নেই তোমার? তুমি বুঝি এখনো ভাবছ আমি ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে বসেছি, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'ঝোঁকের মাথায় কিনা জানি না মমু। তবু আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ!'

মমতা ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু তাকে সমর্থন করবে না, ভুল সংশোধনের চেষ্টাকে ভুল মনে করবে, এটা সে কল্পনাও করতে পারে নি। ষ্টোভের আওয়াজের মতই একটা সশব্দ ক্ষোভ যেন পাক দিয়ে উঠে তার সমস্ত সংযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, মনে হয় এই মুহূর্তে উদ্ভট খাপছাড়া কিছু একটা না করলে, সে বাঁচবে না। হীরেন তাকে সস্তা মনে করে, তাকে হার মানায়। কৃষ্ণেন্দু মনে করে ভুল করাই তার স্বভাব।

মমতার ক্ষোভটা অভিমানে পরিণত হতে হতে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'কি আর তোমায় বলব মমু, আমি নিজেই থতমত খেয়ে গিয়েছি। ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এড়িয়ে যেতে পারবে। তা হল না। এতদিন ভাসা ভাসা ভাবে চলছিল, সখ করে নিজেকে কষ্ট দেবার মজা টের পাওনি, এবার বুঝবে। মনটা ঘুরিয়ে নিতে পার না মমু? আমি জানি, তুমি একটু মন বুঝে চললে, একটু প্রশ্রয় দিলে, হীরেন বদলে যাবে।'

'তুমি আমায় কি ভাব বল ত?'

'তুমি জান না তোমায় আমি কি ভাবি?'

'জানতাম, আজ খটকা লাগছে। সখ করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি মানে? সব আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি, এ হল আমার সখ! এরকম সখ কটা মেয়ের মধ্যে তুমি দেখেছ কেষ্টদা? সখ দুদিনে মিটে যাবে। তুমি বুঝি তাই ভাবছ? ভাবছ আমি পারব না? সখ মিটে গেলে ফিরে যাব? কি ধারণা তোমার আমার সম্বন্ধে। সুপ্রভা, কুন্তলা, কল্যাণী এরা যা পারছে, আম তা পারব না!'

'তুমি পারবে না বলি নি। কি ভাবে পারবে সেটাই ঠাউরে উঠতে পারছি না। সুপ্রভারা যতটা পারে ততটা করছে—আনন্দের সঙ্গে করছে। ওদের সব সময় নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না। নিজেকে পীড়ন করার দরকার হয় না। তুমি ওদের মত সহজভাবে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবে না মমু, যতই চেষ্টা কর। হয় তুমি ওদের ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে, অসাধারণ কাজ করবে, নয় তোমার কাজের বিশেষ কোন মূল্য থাকবে না, জিদের বশে মনের জোরে কোন মতে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবে। আদর্শের জন্য হঠাৎ ত্যাগ করা আর আদর্শের জন্য হাসি মুখে দিনের পর দিন খেটে যাওয়া ভিন্ন জিনিস। ত্যাগ করলেই যে কাজও করা যাবে এমন কোন মানে নেই। ত্যাগের দুঃখ বরণ করা যায়, সওয়া যায়। মনে দুঃখ নিয়ে কাজ করা যায় কি? কাজ করে সুখ পাওয়া চাই—আনন্দ থাকা চাই, উৎসাহ থাকা চাই কাজের পিছনে।'

'হীরেনের জন্য খুব কষ্ট হবে সত্যি কিন্তু—'

'শুধু হীরেনের জন্য নয়। ও দুঃখের কথা বলি নি। এ দুঃখ তো কাজের আনন্দই বাড়ায়—কাজটাই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় মানুষের—অবশ্য যদি কাজের দিকে মন যায়। আমি বলছি নতুন জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা। তোমার হয় তো ভাল লাগবে না, তবু তোমাকে জোর করে চালিয়ে যেতে হবে। তখন তোমাকে দিয়ে যেটুকু কাজ হবে, যে কেউ তা পারবে।'

'ভাল লাগবে না? এতদিন যা করছি তা ভাল লাগবে না?'

'এতদিন যে একভাবে করেছ। এখন অন্যভাবে করতে চাইছ।'

'অন্যভাবে মানে?'

'মানে? এই যেমন ধর, কানুর ছেলে আর বৌটার বসন্ত হয়েছে শুনে ছুটে দেখতে গিয়েছিলে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে টাকা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এসেছিলে। তুমি চাইছ এবার থেকে ও অবস্থায় শুধু ওইটুকু না করে একেবারে শিয়রে বসে সেবা করবে।'

'তাই যদি হয়? সেবা করতে পারব না ভাবছ তুমি?'

'পারবে না কেন? কিন্তু ভাল লাগবে কি না তাই ভাবছি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও ওদের জন্য আমার আসলে দরদ নেই?'

'দরদ থাকাটাই সব নয় মমু। হীরেনের জন্য তোমার দরদ কম নয়, কিন্তু ওর জন্য তো—'

মমতা অধীর হয়ে বলে, 'এসব আজে বাজে তর্ক রাখো কেষ্টদা। কাল থেকে আমায় কাজে লাগিয়ে দাও।'

সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দু একটু ভাবে।

'নিজের বাড়ী ফিরে যাবে না কেন মমু? তোমার বাবা কি দোষ করলেন?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। হীরেন কি মনে করে জানো? আমার বাবার অনেক টাকা আছে বলে আমার এত তেজ, কাউকে গ্রাহ্য করি না। তোমার মত হীরেনও বিশ্বাস করে না, আমি সত্যি কুলি মজুরকে ভালবাসি, ওদের জন্য প্রাণ দিতে পারি। বড় লোকের মেয়ে হয়ে জন্মে যেন মস্ত অপরাধ করেছি।'

হীরেনের জন্য? হীরেনকে মমতা দেখাতে চায় তার মধ্যে ভেজাল নেই, সে খাঁটি সোনা? কৃষ্ণেন্দু জানে এটা খাপছাড়া কিছু নয়, দোষেরও নয় মমতার পক্ষে। নিজেদের কক্ষচ্যুত করার সাধ মমতাদের এইরকম কারণ থেকেই জাগা স্বাভাবিক। এরকম একটা অথবা কতগুলি সাধারণ কারণ না থাকলে নতুন আবেষ্টনীতে নতুন জীবনে নতুন সার্থকতা খুঁজবার কথাটা এদের মনেই বা পড়বে কেন। তার নিজের বেলাতেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে নি? অভাগাদের চেয়ে তাকে বেশী টেনেছিল ওদের হয়ে লড়াই করার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, বাহাদুরীর মোহ। তবু মানুষের কাছে অকস্মাৎ নৈর্ব্যক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করার মত বোকামি যে কিছু নেই, কৃষ্ণেন্দু আজ যেন তা ভুলে যায়। মমতাকে তার মনে হয় নিজের মনের মোহের বাষ্পে ফাঁপিয়ে তোলা ফানুষ। মনে হয়, মমতাকে সে চিনতেই পারে নি এতকাল—চিনতে চায় নি বলে। নিছক নিজের প্রয়োজনেই সে এই সুন্দরী শিক্ষিতা ভাবময়ী বুদ্ধি-বিলাসিনী বালীগঞ্জী ধাঁচের সাধারণ ধনী-কন্যাটিতে অসাধারণত্ব আরোপ করে কাছাকাছি রেখেছে। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যেমন রেখেছে এই নিরালা গৃহের কোণে কনকের ঘরোয়া স্নেহ যত্ন, পুতুলের মায়া আর ঘুমের বিশ্রাম, তেমনি রেখেছে রূঢ় বাস্তবতার ঘষায় ছড়ে যাওয়া মনের জন্য মমতার সাহচর্যের মলম। মমতার মধ্যে যেটুকু খাপছাড়া সে

শুধু তারই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। ওর জগতের অন্য যে কোন মেয়ে এভাবে তার সংস্পর্শে এলে মমতার মত হতে পারত!)

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে হাকিমের রায় দেওয়ার সুরে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'বেশ। কাল সুপ্রভা চাঁটগা যাবে। তুমিও ওর সঙ্গে যেও।'

কিন্তু বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে ধাতস্থ হয়ে কৃষ্ণেন্দু মত বদলায়। নিজেকে বড় অপদার্থ মনে হয় তার। এত দিন কেটে গেল এত কাজে, এত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল, এখনো তার এ দুর্বলতা রয়ে গেছে! কবে আর তবে সে জয় করতে পারবে মনের এই দীনতা? কবে সংশোধন হবে? মন যার গড়ে উঠতে সে দেয় নি, কেন সে তার কাছে অসম্ভব প্রত্যাশা রাখে, তাকে বিদায় করে হিংস্র সমালোচকের মত? শাস্তি দিতে, ভেঙ্গে ফেলতে চায়? অনেকক্ষণ ছটফট করে কৃষ্ণেন্দু ঘুমায়। নরেশকে যেদিন সে মেরেছিল, সেদিন রাত্রেও বিছানায় শুয়ে সে এমনিভাবেই ছটফট করেছিল।

তাই, বাস্তবের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নেবার সুযোগ মমতাকে দেওয়া কৃষ্ণেন্দু উচিত বিবেচনা করল বলে, অজানা অচেনা চাটগাঁর বদলে মমতা বাস করতে এল রস্তাদের বাড়ী। বস্তি তার চেনা, বস্তির মানুষের সঙ্গে তার কারবার ছিল। এদের সঙ্গেই তার আগে ঘনিষ্ঠতা হোক।

এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হল সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়াবাড়িই করতে চাইছিল মমতা। রাতারাতি একটা বিপ্লব না হলে তার চলছিল না—নিজের জীবনে। হীরেনকে তার বুঝিয়ে দিতে হবে তার জীবনে আপোষ নেই, জোড়াতালি সে চায় না। কৃষ্ণেন্দুর কাছেও প্রমাণ দিতে হবে প্রাসাদের চেয়ে খোলার ঘর তার প্রিয়।

'তুমি মিথ্যে ভাবছ। মিছে তর্ক তুলছ আমার শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার রুচি অভ্যাসের। দেখো, সাতদিনের মধ্যে আমি ওদের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যাব।'

'তা হলে তো মুস্কিল। শেষে তোমায় না ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝাতে হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার দরকার। গা রগড়ালে মাটি উঠবে না তো মমু?'

বাড়ীতে ঘর খালি ছিল না একটিও। সুরেশ আর নরেশকে ঘর ছেড়ে দিতে

হয় মমতার জন্য। নরেশের থাকার ব্যবস্থা হয় দুর্গার ঘরে। দর্জি গোপালেরও দু'খানা ঘর, তার পরিবারের মেয়েপুরুষ কজনকে চেলে নিয়ে একটা ঘরে তার দুই ছেলে আর জামাইয়ের সঙ্গে সুরেশকে থাকতে দেওয়া হবে স্থির হল। কাজ থেকে বাড়ী ফিরে খবর শুনে সুরেশ গেল চটে।

'ধুত্তেরি যতো সব—ওই শালী এসে থাকবে এখেনে, ওই বেম্মো মাগী? থাকো তোমরা—আমি বাবা চললাম।' বলে সে সুবালার ওখানে চলে গেল। দিন তিনেক সত্যই তার টিকিটি দেখা গেল না।

মমতা নিজে এসেছিল। মিষ্টি করে হেসে সুন্দর করে সবাইকে জানিয়ে গিয়েছিল যে তাকে যেন সবাই আপন মনে করে। ভদ্রলোকদের সে ঘেন্না করে, তাই একেবারে ছোটলোক বনে গিয়ে এদের সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

সে চলে যাবার পর লক্ষ্মী সকলের মনের ভাবকে প্রথমে ভাষা দিল, 'মোরা ছোট লোক!'

দুর্গা বিশদ করে বলল, 'খালি ডিঙ্গি মেরে বেড়ালে বিগড়ে যাবে না মাথা মেয়েলোকের? বাপ সোয়ামীর টাকায় মোটর চাপেন, পুরুষ চাখেন. কিচির-মিচির করেন দিনরাত। কতকাল আর ভাল লাগে বল? এমনি ঢং করতে হয় তখন।'

'মোদের তরে জীবন দেবে গো জীবন দেবে!' বলে বিন্দের বৌ।

'এখানে জীবন দিতে আসা কেন?' পুষ্প শুধোয়।

'টাকার গরম বড় গরম!' ক্ষান্ত পিসী মন্তব্য করে।

রম্ভা মোড় ঘুরিয়ে দেয় কথার।—'কি যে বল সব তোমরা? ছি ছি! বড়লোকমি দেখলে কোথা ওর, টাকার গরম? কেষ্টবাবুর শিষ্য উনি জানো না? নিজে গড়ে পিটে মানুষ করেছেন ওকে কেষ্টবাবু?'

সবই চেপে গেল তারপর, শুধু লক্ষ্মী ছাড়া।

'রাজা করেছেন।' বলল লক্ষ্মী।

ধুয়ে মুছে সাফ করে রাখা হল ঘরখানা মমতার জন্য। জিনিষপত্র সামান্যই সঙ্গে আনল মমতা। একটি বড় আর একটি মাঝারি চামড়ার স্যুটকেশ,বিছানাপত্র এবং বেতের বাস্কেটে একজনের মত সস্ত কেনা কম দামী বাটি ঘটি গেলাস কেটলি চায়ের কাপ ইত্যাদি তৈজসপত্র। আসবাব এলো না একটিও। পায়ার নীচে ইঁট

দিয়ে উঁচু করা পুরানো যে তক্তাপোষটি ছিল ঘরে, তাতেই পাতা হল বিছানা। দড়ি টাঙ্গিয়ে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল কাপড় জামা গামছা। ভুল করে মমতা মস্ত ভারি তোয়ালে এনে বসেছিল, কিন্তু স্যুটকেশ থেকে সেটা বার না করে একটা গামছা কিনে আনিয়ে ভুলটা সে সংশোধন করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। আসবাবের অভাবের দিক দিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হল মমতার। রম্ভার ঘরে, দুর্গার ঘরে, গোপালের ঘরে কাঠের আনলা আছে, দু'একটা চেয়ার আছে কাঠ আর লোহার, টেবিলও যে নেই কেরোসিন কাঠের তাও নয়।

কোথায় খাবে মমতা? কি খাবে?

রম্ভার সংসারে, তারা যা খায়।

সকালে পৌঁছেই কথাটা খোলসা করে নিল মমতা।—'শোন বলি, দুজনে আমরা ভাগাভাগি করে রাঁধব। তোমরা যা খাচ্ছ আমিও তাই খাব, বেশী কিছু আয়োজন করতে পাবে না আমার জন্যে। আমি খাব বলে যদি একটা পদও বেশী রান্না কর ভাই, ভারি রাগ করব কিন্তু বলে রাখছি।'

'কি করে জানবেন আমরা কি খাই, কি খাওয়াই আপনাকে?

'সে আমি টের পাব। তুমি বলতে বললাম যে আমাকে?

'বলব—বলব। অভ্যেস কি সহজে কাটান যায়? কিন্তু এত কষ্ট করবেন কেন? নিজের পয়সায় খাবেন যখন, ভাল জিনিস খাবেন। আমাদের খাওয়া আপনার সইবে কেন?'

'সইবে। যত ভাবছ, অত দুধ ঘি পোলাও খাই না আমি। শাক চচ্চড়ি খেতে জানি।'

কিন্তু আসবাবহীন সোঁদাগন্ধী আধো-আঁধার ঘরে তক্তাপোষে বিছানা পেতে দড়িতে কাপড় ঝুলিয়ে শাকচচ্চড়ি খেয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেও সকলের খাপছাড়া অভ্যর্থনা তাকে অপ্রস্তুত করে দিল। কাল এ বাড়ীতে আসামাত্র সকলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, মৃদু উত্তেজনা, হাসি মুখ আর নিরীহ সম্মানসূচক ভঙ্গি দিয়ে নীরব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল: এসেছেন? আমরা খুশী হয়েছি! আজ সে ভাবে সবাই তো এল না। রম্ভা, দুর্গা, নরেশ, রামপাল এরা কজন মাত্র এল। চৌকাঠ ডিঙ্গোবার সময় ভিতর থেকে কলরব কানে এসেছিল, ভিতরে ঢোকা মাত্র সে কলরব হঠাৎ গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে। তার আবির্ভাব যে সবাই শুধু টের পেয়েছে তা নয়, মমতা বুঝতে পেরেছিল, সবাই রীতিমত প্রতীক্ষা করছিল কখন

সে আসে! অথচ যে যার কাজেই আটকে রইল, কাছে এল না। উঠানে কলতলায় যারা ছিল তারা শুধু ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখল দু'চারবার। বাসন হাতে সামনে দিয়ে যাবার সময় বিন্দের বৌ দাঁড়ালো না, একটু হাসি দেখিয়ে চলে গেল।

পরে অবশ্য সকলেই এল, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েক পরে। এক সঙ্গে নয়, একে দু'য়ে। তার অপকর্মের সূচনার সময় এরা যেন দায়ভাগী হবার ভয়ে কাছে ঘেঁষেনি, নিজের দায়িত্বে তাকে আরম্ভ করার অবসর দিয়ে কর্তব্য পালন করতে এসেছে,—দু'চার মিনিটের জন্য। আসে আর দু'চার কথা বলে চলে যায়। সকলের অস্বস্তিবোধ, তাকে এড়াবার চেষ্টা, মমতাকে বিস্মিত এবং আহত করে।

দুর্গা এক সময় গম্ভীর মুখে তাকে জানায়: 'এখানে আসা ঠিক হয় নি আপনার। কদ্দিন গা ঢাকা দিতে পারবেন এখেনে? পাড়ায় জানাজানি হবে, পুলিশের কানে খবর যাবে। দূর দেশে পালিয়ে যেতে পারতেন কোথাও।'

'পুলিশের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছি ভেবেছ নাকি তোমরা?'

'খ্যান্ নি?' দুর্গার গলার স্বরে চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

'ও! তাই তোমরা ভয় পেয়েছ! কিন্তু কাল যে তোমাদের বলে গেলাম, তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে এসেছি?'

'বলে তো গ্যালেন।'

রম্ভাকে মমতা বলল, 'এরা এসব কি ভাবছে রম্ভা?'

'এরা ভাবতেই পারছে না আপনি কেন এখানে এসে থাকবেন। কাল বিন্দে পুলিশের কথাটা তুলল, সবাই ভাবল তাই হবে বুঝি তাহলে। সত্যি নয়, না?'

উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন। সত্যি হলে যেন ভারি খুশী হয় রম্ভা!

'না না, সত্যি নয়। কি সব আজগুবি কথা! তুমি এক কাজ কর তো ভাই, সবাইকে ডাকো একবার। ভাল করে বুঝিয়ে বলি।'

রম্ভা ভেবেচিন্তে বলল, 'থাক না কি দরকার? যে যা ভাবছে ভাবুক। আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে দুদিনে।'

কিন্তু মমতার কি ধৈর্য ধরে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল না, 'না তুমি ডেকে আনো ওদের।'

তবু ইতস্ততঃ করে রম্ভা।—'কি লাভ হবে বলুন? এ কথাটা বুঝিয়ে দেবেন, ওরা আরেকটা কথা ভাববে! একটা লাগসই কারণ তো থাকা চাই আপনার এখানে আসার? মিছিমিছি এমন কেউ আসে?'

'কারণ তো বলেছি সবাইকে?'

'ওটা সবাই ঠিক ধরতে পারছে না।'

মমতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এত করে বুঝিয়ে দেবার পরেও তার এখানে আসার সহজ সরল সঙ্গত ও মহান কারণটা সবাই ধরতে পারছে না! খাপছাড়া উদ্ভট কারণ আবিষ্কারের প্রয়োজন হচ্ছে এখানে তার আবির্ভাবকে স্বীকার করতে!

'তুমিও বোধ হয় পারছ না ধরতে?'

'তা নয়, মানে আর কি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

খানিক গুম্ হয়ে থেকে মমতা বলল, 'ডাকো তো সবাইকে।'

নিজেকে ব্যাখ্যা করে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিল মমতা। তাদের জন্য সে স্বামী ছেড়েছে, স্বামীর ঘর ছেড়েছে, বাড়ী ছেড়েছে, আত্মীয় বন্ধু সবাইকে ছেড়েছে, তাদের সঙ্গে সে যে এক হয়ে যেতে চায় এবং কেন চায়, সমস্তই সে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল সকলকে।

তবু, এমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকেই সবাই শুনল কথাগুলি যে তারা বুঝল কি বুঝল না এ বিষয়ে বেশ একটু খটকা রয়ে গেল মমতার মনে।

তারপর রম্ভার রান্নাঘরে গিয়ে মমতার মনটা হোঁচট খেল নোংরামিতে। ব্যথায় কনকনিয়ে উঠল মনটা। এসব বাড়ীতে সে এসেছে অনেকবার কিন্তু কারো রান্নাঘরে ঢোকে নি কোনদিন। প্রথমে মনে হল, ধোঁয়ার কালচে মারা সেঁতসেঁতে নিরন্ধ্র সঙ্কীর্ণতাটাই বুঝি চরম নোংরামি। তারপর চোখে পড়ল চলটা তোলা এবড়ো-খেবড়ো মেঝে, শীতকালে পথে পড়া ভিখিরির চামড়ার মত দেয়ালের ফাটল ধরা ফোঁড়া ওঠা গোবর-মাটির চোলকা, ধুলো তেল কালি ল্যাপটানো হাঁড়ি কলসী, তেলমসলার পাত্র রাখার আধ হাত উঁচু বেদী, জল বেরোবার নালা, ভাতের হাঁড়ি, তরকারীর ঝুড়ি, কয়লা রাখার ভাঙা কড়াই, মাকড়সা, টিকটিকি, আরশোলা।

রম্ভা কথা কয়। মমতা ঠায় বসে থাকে পিঁড়িতে। ক্রমে ক্রমে তার চোখে ধরা পড়ে, রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে রান্নাঘরটি, যতটা সাধ্য ও সম্ভব

ততটা। নোংরামি যা আছে সেটা স্বাভাবিক, কারো ক্ষমতা নেই সেটা দূর করে, কয়লা ধুয়ে কালি সাফ করার মত। বাসনগুলি মেজে ঝকঝকে করেছে রম্ভা, কিন্তু এই গর্ত আর ফাটল ধরা মেঝেকে সে ধুয়ে মুছে কি করে মার্বেল পাথর করবে, কি করে তাড়াবে আনাচে কানাচে নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে যে আর্সোলার দল শুঁড় নাড়ছে তাদের!

স্নানের আগে মমতা গেল পায়খানায়। ফিরে এল বিবর্ণ মৃতপ্রায় হয়ে। দশ বছর বয়সে প্রৌঢ় প্রাইভেট টিউটর ধরণীবাবু অত্যাচার করার পর যে অবস্থা হয়েছিল তেমনি দেহমন নিয়ে।

সাবান হাতে স্নান করতে গেল কলতলায়। পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে! চোখ! চারিদিকে চোখ!

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গায়ের জোরে সায়া ব্লাউজ খুলে ফেলল। গুমোটের গরমে সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে, কিন্তু জল ঢালতে ঠিক যেন জ্বরতপ্ত গায়ের মত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার গা।

ছারপোকার কামড়ে রাত্রে তার ঘুম হল না। তক্তাপোষ আর মনের ছারপোকার কামড়ে।

সারাদিনে একজনকেও সে আপন মনে করতে পারে নি। নিজের টনটনে স্নায়ুগুলিকে স্বস্তি দিতে সে ঘরে ঘরে ঘুরেছে সারাটা দুপুর। মেয়েপুরুষের আসর বসিয়ে সন্ধ্যার পর সকলের সঙ্গে গল্প করেছে, নিজে গান গেয়ে শুনিয়েছে আর রামপালের গান শুনেছে, কথা কইবার চেষ্টা করেছে ভোঁতা অমার্জিত ভাষায়, হাসবার চেষ্টা করেছে অভদ্র রকমে। ঘরে ঘরে সবাই হয়ে থেকেছে ভীত, সন্ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ; আসরে সবাই হয়ে থেকেছে কাঠ। যদি বা দু'চার জন হেসেছে কখনো, সে হাসি হয়েছে সম্মানীয়া একজনের হাস্যকর পাগলামী দেখে ঝি-চাকর যেভাবে হাসে! আর লণ্ঠনের আলোয় সে কি বিষণ্ণ হতাশ সন্ধ্যা—বিষণ্ণতার ঘনায়মান রাত্রি! কোনমতেই মমতা শেষপর্যন্ত সেই গুরুভার গভীর নিরাশার ক্রমিক সঞ্চারকে ঠেকাতে পারে নি। ঝিমিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে।

আরও কি ভয়ানক শ্বাসরোধ করা ফাঁদে সে পড়েছে ছাখো! হার মানা মানে দাঁড়িয়ে গেছে শুধু হীরেন আর কৃষ্ণেন্দুর কাছে নয় এদের কাছেও হার মানা! এদের আপন না করে এখন পালিয়ে গেলে এরা তাকে টিটকারি দেবে, কোন মর্যাদাই আর থাকবে না তার এদের কাছে। রাতদুপুরে কি অসহায় যে

নিজেকে মনে হয় মমতার ! সুযোগ পেয়ে শৈশবের ভূতের ভয় পর্যন্ত যেন ভিড় করে আসে তাকে কাবু করতে !

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু আসে। বলে, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার মনু ? ছি, কত করে তোমায় বললাম—'

মমতা উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে, 'কি বললে ? দোহাই তোমার, উপদেশ দিও না। আমি জানি, তুমি আমার মন ভাঙতে এসেছো। প্রমাণ করতে এসেছ তোমার কথাই ঠিক। তা হবে না কেষ্টদা, আমায় তুমি তেমন মেয়ে পাও নি।'

'তাই দেখছি।'

'কি দেখছো ? চেহারা খারাপ হয়ে গেছে একদিনে ? চোখের নীচে কালি পড়েছে ? আমিও আয়নায় দেখেছি নিজের চেহারা। এটুকু তো হবেই। আমি কি আরাম করতে এসেছি এখানে ?'

কৃষ্ণেন্দু চলে যাবার আগে কি যেন সব রম্ভা তাকে বলে চুপি চুপি। বুকটা জলে যায় মমতার। রম্ভা নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুকে তার কালকের পাগলামির বর্ণনা শোনাচ্ছে।

পাগলামি ? কিসের পাগলামি ! এরা তো মনে করবেই এদের ভালো করার চেষ্টাকে পাগলামি, সেজন্য তার দমে গেলে তো চলবে না ! অন্ধকারের বঞ্চিত জীব এরা, এরা কি করে প্রত্যাশা করবে যে আলোর জগৎ থেকে কেউ তাদের এই নরকে নেমে আসতে পারে তাদের আলো দেবার জন্য। চোখ এদের ঝলসে গেছে, এরা চমকে গেছে, ভড়কে গেছে, ভয় পেয়েছে, অবিশ্বাস করছে।

'কদিন তুমি এসো না কেষ্টদা। আমি না ডাকলে এসো না।'

'বেশ।'

আহত ও ব্যাহত একগুঁয়ে জেদী অভিমানী মানুষের উদ্দীপ্ত উদ্যমে মমতা আবার লড়াই শুরু করে। নতুন করে ভাবে। মনে হয় তার আত্মবিশ্বাসে যেন জোয়ার এসেছে নতুন করে। সোজাসুজি আপন করা আর আপন হওয়ার স্পষ্ট মুখর অনাবৃত চেষ্টা সে ছেড়ে দেয়। ভাবে যে কাজের মধ্যে এদের কাছে টানতে হবে, এদের ভালো করার চেষ্টা দিয়ে, সংস্কার ও সংশোধনের সাহায্যে। এখানকার জীবনটা সইয়ে নেবার পক্ষে তার নিজেরও তাতে সাহায্য হবে।

চোখ মেলে তাকায় মমতা আর চারিদিকে ছোটবড় অসংখ্য ত্রুটি চোখে পড়ে, কথার, কাজের, ব্যবহারের, স্বভাবের, জ্ঞানের, বুদ্ধির, চিন্তার, ধারণার, ভাবের,

অনুভূতির—সব কিছুর খুঁত! তার খাতিরে একটা দুটো দিন সকলে সংযত হয়ে থাকে, অত্যন্ত রূঢ় ও স্থূল স্বরূপগুলির প্রকাশ চেপে রাখে কোনমতে, কিন্তু তারপর আর ধৈর্য থাকে না কারো। কতদিন থাকবে মমতা তারো তো ঠিক নেই, তার মুখ চেয়ে কাঁহাতক মানুষ স্বভাব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভদ্রভাবে চলতে পারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য? ঝগড়া, গালাগালি, হীনতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, দুর্নীতি, মাতলামি সব একে একে আবির্ভূত হতে থাকে সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত অন্তর্দ্ধানের প্রয়োজন শেষ করে, সঙ্কোচের বাধা ঠেলে।

মমতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুঝতে পারে, মাঝে মাঝে এসে আর মাঝে মাঝে কাছে ডেকে যাদের সে চিনত, এরা তারা নয়। ধরা এরা তার কাছে কোনদিন দেয় নি। নিজে সে যে পরিচয় নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছে এদের জন্য, এরা নির্বিবাদে সেই পরিচয়ই গ্রহণ করেছে তার কাছে পরিচিত হবার জন্য! বাছা বাছা দুঃখের কথা বলেছে, নিরীহ ভীরু হয়ে থেকেছে, সায় দিয়ে গেছে তার কথায় ও ইচ্ছায়। এদের সে যেমন ভাবতে চেয়েছিল এরা তাকে তেমনি ভাবতে দিয়েছে। কখনো প্রতিবাদ করে নি। নিজেদের আসল জীবন থেকে এমন একটি টুকরোও তার সামনে উপস্থিত করে নি, তার ধারণার সঙ্গে যা খাপ খায় না। কত কথাই এদের মত শত শত মেয়ে-পুরুষ বলেছে তার কাছে, তবু কেন যে কোনদিন কেউ নিজেকে চিনিয়ে দেবার জন্য একটি কথাও বলে নি, সেটাও মমতা এখন বুঝতে পারে। এরা জানে না পরিচয় দিতে। এরা জানে না পরিচয় দেবার প্রয়োজন। এরা মানেই জানে না পরিচয় দেবার। এরা জানেও না নিজেদের পরিচয় কি!

কি সে ভেবেছিল এদের! বঞ্চিত নিপীড়িত দুঃখী ও নিরীহ একদল মানুষ, ধুঁকতে ধুঁকতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে প্রাণহীন ভোঁতা শূন্য জীবন যাপন করে। আঘাত পেলে কাঁদে, দু'হাত শূন্যে তুলে আকাশের দিকে মুখ করে বলে, ভগবান!—আবার ঝিমিয়ে যায়। অথচ চোখের সামনে আজ সে দেখেছে এদেরই একটানা বিস্ফোরণের মত সংশয়হীন প্রাণপূর্ণ প্রচণ্ড সংঘাতময় আত্মঘাতী জীবনের লীলা।

পাড়ার কয়েকটি বাড়ী ঘুরে এসে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। আগে যেমন জানত তেমনি যেন হয়ে গেল ওসব বাড়ীর মানুষগুলি তার সামনে, জীবনটা তাদের চলে গেল নেপথ্যে—অন্য জগতের অপরিচিত মানুষের সামনে রুগ্ন শিশুর যেমন যায়।

মমতার মনে হল, এদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে গেছে—অনেক দূরে চলে গেছে এরা। ব্যবধান অবশ্য যা থাকবার তা ছিলই - মমতার কাছে সেটা ধরা পড়ছে মাত্র। কিন্তু সেজন্য বিব্রত বা বিচলিত হওয়ার বদলে সে যেন খুসীই হল ভেবে চিন্তে। একটা গুরুতর সত্য সে আবিষ্কার করেছে, কৃষ্ণেন্দুও হয় তো যার হদিস পায় নি। সে উৎসাহ বোধ করে। কোমর বেঁধে উঠে পড়ে কাজে লেগে যায়। বলে, 'না। কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়া চলবে না। ঝগড়া করে লাভ কি বলো? জলের পরিমাণ কি তাতে বাড়বে? সবারি জল চাই—সবাই যাতে জল পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এক বাড়ীতে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হলে কি কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে এই নিয়ে ঝগড়া করা চলে? তুমি তো দু'কলসী নিয়েছ ক্ষান্ত পিসী, এবার রাণীর মাকে দু'কলসী নিতে দাও। গোপাল তুমি পুরুষ হয়ে ঝগড়া করতে এসেছ মেয়েদের সঙ্গে? তোমাদের বেশী জল দরকার তা জানি। আমি আজ হিসেব করে নিয়ম বেঁধে দেব, কার পর কে নেবে, কতটা করে নেবে। দু'তিন দফায় জল নিতে হবে তোমাদের। একজন হাড়ি কলসী বালতি সব ভর্তি করবে আর আরেকজনের জলের জন্য রান্নাবান্না বন্ধ হয়ে থাকবে, সেটা তো ভাল নয়।'

গোপালের বৌ বলে, 'ওতে কি টানাটানি কমবে দিদিমণি? সবার কুলোয় না জলে। ক'বাঁক জল যদি আনিয়ে দ্যান মালীকে দিয়ে রাস্তার কল থেকে—'

'বেশ তো। সবাই মিলে চাঁদা তুলে—'

'চাঁদা? এর জন্যে আবার চাঁদা?' রাণীর মা তোষামোদের হাসি হেসে বলে, 'দুটো কি তিনটে টাকা তো নেবে মালী। ঘরে আপনার লাখ টাকা পচছে, দুটো তিনটে টাকার জন্যে চাঁদা তুলবেন কি বলছেন, মাগো মা হাসির কথা!'

সুযোগ পেয়ে মমতা তাদের দশ কথা শুনিয়ে দেয়। ভাল ভাল কথা, খাঁটি উপদেশ। নিজেদের উপর নির্ভর না করে পরের ভরসায় থাকলে তাদের যে কোনদিন কিছু হবে না এই বিষয়ে উপদেশ।

'জল আনার ব্যবস্থা আমি করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তোমরা নিজেরা মিলে মিশে ব্যবস্থাটা করে নিলেই আমি খুশি হতাম।'

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন ওঠে চারিদিকে।

'ও বাবা, কাজ নেই জলে মোদের, খুসী মনে না দিলে।'

'তিনটে টাকার জন্য এত!'

'এতকাল চলে নি মোদের? মিলেমিশে চালাইনি মোরা?'

মমতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'তোমরা রাগ করছ কেন? কথা বুঝছ না কেন আমার? তোমাদের কি এই একটা অভাব? এটা মিটলেই সব দুঃখদুর্দশা শেষ হয়ে যাবে? সবাই মিলে না করলে দুঃখ তোমাদের কোনদিন ঘুচবে না। কিসে মিলবে তোমরা? এই সব অভাবের প্রতিকার চেয়ে কাজ করার তাগিদেই মিল হবে তোমাদের। প্রথমে এ বাড়ীর সবাই মিলবে, তারপর পাড়ার সবাই, তারপর দেশ জুড়ে। তখন কে ঠেকাবে তোমাদের? এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছি তোমাদের। আবোল তাবোল কথা মনে আসছে কেন তোমাদের?

'মনটাই যে মোদের আবোল তাবোল গো দিদিমণি!' বলে লক্ষ্মী হাসে।

পরদিন ভোরে উঠে মমতা খালধারে একটু বেড়াতে গেছে, ফিরে এসে ছাখে, কলতলায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। তার তালিকা অনুসারে প্রথম দফায় প্রয়োজন মত প্রত্যেক পরিবারের এক থেকে তিন বালতি বা কলসী জল পাবার কথা। গোপালের বৌ বিরাট একটি বালতি এনেছে কোথা থেকে, রাণীর মা এনেছে তার চাল রাখার মাটির জালাটি! এই হল ঝগড়ার একটা কারণ। আরেকটি কারণ হয়েছে শিউশরণ। বিতরণের প্রথাটা কাল মেনে নিলেও আজ সে গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। লোক কম হলেই জল কম লাগবে কেন তার মানে সে বোঝে না। লোক কম বলে ঘরের ভাড়া কি কম নেওয়া হয় তার কাছে? গোড়ায় বেশী তেজ দেখায় নি শিউশরণ, জগদম্বা আর পুষ্প তার পক্ষ নেওয়ার পর সে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠেছে।

দু'বাঁক জল দিয়েই মালী চলে গেছে, আর সে জল দিতে পারবে না। চার টিন জলের মধ্যে রম্ভা আর দুর্গা নিয়েছিল দু'টিন, গোপালের বৌ নিয়েছিল দেড় টিন। অন্যেরা আড় চোখে দেখেছিল চেয়ে চেয়ে। আধ টিন জল নিয়ে মালী যেই গেছে বিন্দের ঘরের দিকে, সে কি রাগ আর গালাগালি বিন্দের! টিন উল্টে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে সে বলেছে, 'যা যা ওদের দিগে যা। দিদিমণির পেয়ারের লোককে দিগে যা। ওখানে টিন টিন জল দিয়ে দু'ঘটি জল নিয়ে কুলকুচো করাতে এসেছো ব্যাটাচ্ছেলে? ফের জল দিতে এসে অপমান করবি তো মাথা ফাটিয়ে দেব তোর।'

বিবরণ শুনে কথা সরে না মমতার মুখে, সে থ' বনে যায়। মনে মনে বলে, এরা শিশু না সয়তান? অ্যাঁ, শিশু না সয়তান এরা?

মমতা বলে, 'রোজ সন্ধ্যার পর আমি তোমাদের এক ঘণ্টা করে বই পড়ে শোনাব। সকলে হাজির থাকবে কিন্তু।'

প্রথম দিন প্রায় সকলেই হাজির থাকে। বেশ উৎসাহ দেখা যায় সকলের। রামপালের কীর্তন শোনার মত উৎসুক মনে হয় সকলকে। পরদিন আসর প্রায় খালি পড়ে থাকে, রম্ভা দুর্গা পরেশ নরেশ আর লক্ষ্মী ছাড়া কেউ আসে না মমতার মূল্যবান পড়া শুনতে। ডাকতে গেলে বলে, 'আসছি, দিদিমণি আসছি।' কিন্তু আসে না।

মমতা বলে, 'তোমরা এত বোকা কেন? এক বাড়ীতে এতগুলি উনুন জ্বলে, কত পয়সা নষ্ট হয়। এতগুলি হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধ হয়, মিছিমিছি কত বেশী খাটুনি। সবাই মিলে একসাথে রান্নার ব্যবস্থা করলে কত পয়সা আর পরিশ্রম বাঁচে বল দিকি? আচমকা এটা করা যাবে না জানি। কটা দিন যাক, আমি সব ঠিক করে দেব। এ ব্যবস্থা করে তবে আমি নড়ব এখান থেকে।'

শুনে আশঙ্কায় সকলের মুখ লম্বা হয়ে যায়।

এমনি কত কথাই যে বলে মমতা, কত সংশোধন ও পরিবর্তন আনবার চেষ্টাই সে যে করে!

সমষ্টিগত জীবনেই শুধু নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও। সর্বদা সে যেন ওৎ পেতে থাকে কখন কে কি অন্যায় করেছে, কার কি ভুল হচ্ছে। কদর্যতা আর বীভৎসতা যত অসহ্য হয়ে উঠছে তার কাছে, তত সে মরিয়া হয়ে মেতে যাচ্ছে এই সব হতভাগা হতভাগিনীদের জীবনের আবর্জনা সাফ করার কাজে। এদের কিছু করলে তবে তো তার মুক্তি, তবে তো সে এখান থেকে চলে গিয়েও বলতে পারবে, দেখলে তো পালিয়ে আসিনি, আমি এই করেছি আর ওই করেছি ওদের জন্য। তার জন্য তাই এখানে কেউ সাধ মিটিয়ে অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করতে পারে না, প্রাণ কেঁদে ওঠে সকলের সেই অনুচ্চারিত শব্দ গ্যাসে। ছেলে মেয়েকে মারতে পারে না, গা চুলকোতে পারে না, পিক ফেলতে পারে না, খোস প্যাঁচড়ায় ওষুধ না মাখিয়ে রেহাই পায় না; রান্নায় ঝালমশলার স্বাদ পায় না, মুখরোচক অখাদ্য খাওয়া হয় না, নেশা করা যায় না, আরও কত কি।

তাছাড়া, সবাই টের পেয়েছে এতটুকু উপকার পাবার ভরসা তার কাছে নেই। একে একে কয়েকজন নানাভাবে দুঃখ ও প্রয়োজন জানিয়ে টাকা চেয়ে গেছে তার কাছে। টাকা দিয়ে কারো উপকার করতে মমতা অস্বীকার

করেছে। বলেছে, 'আমার কি টাকা আছে যে দেব? আমি যে তোমাদের মত গরীব।'

তাছাড়া, তার কথা শুনে মেয়েরা কিছু অবাধ্য হতে শেখায় আর মেয়েদের উচিতমত শাসন করতে না পারায় পুরুষরা বিরক্ত হয়েছে। মেয়েরা বিরক্ত হয়েছে পুরুষদের এক একজনের সঙ্গে যখন তখন একা একা সে গুজগাজ ফিসফাস করে বলে।

কয়েকদিনের মধ্যে তাই চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা তুলতে আরম্ভ করে। কেবল কথা না শোনার বিদ্রোহ নয়, ঝাঁঝালো আক্রমণ। হৃদয়ে হৃদয়ে গভীর বিদ্বেষ গুমরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দ্বিধা ভয় সঙ্কোচের বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। মমতা চমকে উঠে দিশেহারা হয়ে যায়।

বিন্দের বৌ দশমাস পোয়াতি। বিন্দের বৌকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করে মমতা, লজ্জায় কাঠ হয়ে জবাব দেয় বিন্দের বৌ, মানে বুঝতে পারে না তার প্রশ্নের, মনে মনে ভাবে যে পাগল নাকি মানুষটা? তারপর মমতা লাগে বিন্দের পিছনে। তাকে বোঝায় যে, বৌকে তার এখন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, নয় তো ভিন্ন শোয়া উচিত তাদের। এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই বিন্দের? সে কি পশু? বিন্দের কাছে ব্যাপার শুনে বিন্দের বৌ বোঝাপাড়া করতে আসে।

বলে, 'কত আর ঢং করবে দিদি? ঢং দেখে বাঁচিনে তোমার।' তুমিই তাকে বলে বিন্দের বৌ। এখানে এসে অনেক চেষ্টা করেও 'মমতা' কাউকে তুমি বলাতে পারে নি, আজ বিন্দের বৌ নিজে থেকেই অন্তরঙ্গ সম্বোধনটা ব্যবহার করে। 'গড় করি তোমার পায়ে দিদি, ধম্মো দেখালে বটে মেয়ে মানষের। একসাথে শুই বা না শুই তোমার তাতে কি শুনি? মতলব বুঝিনে তোমার আমি? সে গুড়ে বালি তোমার দিদি, ওদিকে নজর দিও না। বাপের বাড়ী যাই তো ওকে সাথে নিয়ে ঢাক বাজিয়ে যাব, তোমার খপ্পরে রেখে যাব ভেবো না। নিজের সোয়ামী ছেড়ে পরের সোয়ামী নিয়ে টানাটানি, দড়ি জোটে না গলায়?...'

সৈরভীকে তার স্বামী মারে। কোনদিন সোহাগ করে, কোনদিন মারে। কোনদিন সোহাগ করে মারে, কোনদিন মেরেও সোহাগ করে। একরাত্রে সে কব্জী আর কনুই ধরে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করেছে সৈরভীর হাত, সৈরভী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে 'বাবাগো, মাগো, মেরে ফেল্লে গো,' বাড়ীর লোক কেউ শুনছে

কেউ শুনছে না, কেউ হাই তুলে তুড়ি দিচ্ছে—মমতার মাথাটা গেল বিগড়ে।

রামপালকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়ে সৈরভীর ঘরের দরজা খোলাল। রঙ্গমঞ্চের রাণীর মত জিজ্ঞেস করল, 'তোমায় মারছিল সৈরভী?'

হাতের অসহ্য যন্ত্রণায় সৈরভীর মাথাটাও তখন বিগড়ে গেছে। সে কেঁদে ককিয়ে বলল, 'একেবারে মেরে ফেলেছে দিদিমণি, মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে হাতটা।'

এতকাল মমতা শুধু গুজব শুনেছে যে পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে মারে। সর্বাঙ্গ তার ঝিম ঝিম করছিল, প্রাণে উথলে উঠছিল ফুটন্ত প্রতিহিংসা, হীরেনকে আঘাত করতে হবে। রামপালকে সে হুকুম দিল, 'ওর হাতটা মুচড়ে দাও তো রামপাল। জোরে মুচড়ে দাও।' রম্ভা রামপালের গেঞ্জি ধরে টেনে রেখে বলল, 'আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে দিদিমণি? তুমি এর মধ্যে যেও না।'

রামপালের তখন চড়া নেশার অবস্থা। গুমোটের গরমে শুতে গিয়ে মমতা গায়ে জামা রাখে নি। শুধু শাড়ীর আঁচলা সে ভাল করে জড়াতেও জানে না গায়ে। বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত চোখে রামপাল তার অর্দ্ধ অনাবৃত পিঠ আর বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মমতা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে: 'ওর হাতটা মুচড়ে দিলে না রামপাল? কথা শুনতে পাও না?'

বাঁ হাতে রামপাল একটু ঠেলে দেয় রম্ভাকে, রম্ভা পাঁচ হাত পিছু হটে যায়। এগিয়ে গিয়ে রামপাল সৈরভীর স্বামীর হাতটা ধরে মুচড়ে দেয়। মট করে হাতটা ভেঙ্গে যায়। হাঙ্গামার হদিশ পেয়ে অনেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে জমা হয়েছিল দুয়ারের কাছে। সৈরভীর স্বামীর হাত ভাঙ্গার শব্দটা শুনতে পায় সকলেই।

স্বামীর গগনভেদী আর্তনাদে বোধ হয় জ্ঞান ফিরে আসে সৈরভীর। বোধ হয় তার মনে পড়ে যায় যে এই লোকটা তাকে খাওয়ায় পরায়—ভাল রোজগার করে, ভাল খাওয়ায় পরায়, সোহাগ করে, ভালবাসে—কষ্টের মাঝে শুধু একটু মারে। ঝড়ের মত ছুটে এসে স্বেচ্ছায় সে মমতাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কামড় বসায় রামপালের হাতে। তারপর আরম্ভ করে আহত স্বামীকে বুকে আগলে নিয়ে হৈ চৈ হা-হুতাশ। মেঝে থেকে উঠতে উঠতে তাদের দুজনকে এভাবে একান্ত কাছাকাছি দেখে মমতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে গোপাল ভাঁড়ীয় কমিকে পরিণত হয়ে যায়। লম্বা চওড়া স্থূলকায়া সৈরভীর পাশে এমন বেঁটে রোগা ক্ষীণকায় দেখায় তার স্বামীকে!

হাঙ্গামা মিটতে রাত আড়াইটে বেজে গেল। হাঙ্গামা কি কম। ডাক্তার এনে সৈরভীর স্বামীর ভাঙ্গা হাড় সেট করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কত টাকা পেলে সৈরভী আর তার স্বামী মেনে নেবে আজ রাতে কিছুই ঘটেনি সেটা স্থির করা, উত্তেজনা কমিয়ে হৈ চৈ থামিয়ে সকলের ঘরে যাওয়া—বড় বড় গুরুতর সব ব্যাপারের জের।

এ পর্যন্ত রম্ভা উপস্থিত থাকে, হাঙ্গামা মেটাতে সাহায্যও করে। তারপর হেঁটমাথা মমতাকে বলে, 'কাল আপনি চলে যাবেন এখান থেকে।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই সে গট গট করে চলে যায়।

তক্তাপোষে মাথা হেঁট করে বসে থাকে মমতা। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে রামপাল। ইতিমধ্যে গণ্ডগোলের ফাঁকে শ্রীপদর সঙ্গে সে আরও খানিকটা দেশী মদ খেয়েছে।

'শোবে যাও রামপাল।'

'যাই।'

বলে মমতাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রামপাল তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। সৈরভীর চেয়েও উঁচুগ্রামের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে রাত্রির স্তব্ধতা চিরে যায়। রাগ করে চলে গেলেও রম্ভা শোয় নি, দুয়ারের বাইরেই ছিল। বিয়ের পর আজ দ্বিতীয়বার রামপাল মদ খেয়েছে। মাতাল রামপালকে ভগবানের নামে ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেবার ভরসা তার ছিল না।

'খাটাসের মত চেঁচিও না দিদিমণি।' মমতাকেই রম্ভা ভৎর্সনা করে। তার গলার আওয়াজেই শিথিল হয়ে যায় রামপালের আলিঙ্গন। মমতাকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে গিয়ে টলে পড়বার উপক্রম করে মমতার কাঁধ ধরে সে সামলে দেয়। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে রম্ভা ফিরে আসে।

সে বোঝাপড়া করতে এসেছে ভেবে মমতা বলে, 'এই নিয়ে তুমি রামপালের ওপর রাগ কোরো না রম্ভা। ওর মাথাটা নিশ্চয় হঠাৎ—'

'ও আবার কি দোষ করল?'

মমতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।—'তুমি তবে রাগ করনি রম্ভা?'

'রাগ যদি করি আপনার ওপর করব, ওর ওপর করব কেন?'

'ও! তুমি তাই ভাবছ?'

রম্ভা একটু চুপ করে থাকে।

'দিদিমণি, আপনার মোটে কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওদের কাছে আপনি হলেন আকাশের পরী, রূপকথার রাজকন্যে। এমনিতে কি ওরা ভাবতেও পারে আপনার হাতটি ধরার কথা? কিন্তু আপনি যদি এসে গায়ে পড়ে যা তা সুরু করে দ্যান, মাথা ঘুরে যাবে না ওদের? ও আজ মদ খেয়েছে আপনার জন্যে। কদিন থেকে অস্থির চঞ্চল হয়ে ছিল, শ্রীপদ খাওয়াতে চাইলে না বলতে পারে নি। বাড়ীর সবাই জানে, আপনার মাথায় ছিট আছে। ভদ্রলোক আপনার রোচে না, মনের মত পুরুষ খুঁজতে আপনি এখানে এসেছেন, ওকে আপনার পছন্দ হয়েছে। নইলে ওর সঙ্গে এত কি হাসি মস্‌করা আপনার?'

'হাসি মস্‌করা? আমি কারখানার কথা আলোচনা করেছি।'

মমতার সকাতর ভাব দেখে রম্ভা হেসে ফেলে।—'তা জানি। আপনার মন জানতে বাকী আছে আমার? বড় বোকা আপনি। আপনার মনে কি আছে এখানে কে জানতে যাবে? এরা দেখবে আপনার ব্যাভার। কোন পুরুষের সঙ্গে ওভাবে কখনো দেখেছেন আমাদের কাউকে মিশতে? পাঁচ সাত জনের সামনে করলেই হত আলোচনা!'

রম্ভা ঘরে গেল। ধুক ধুক বুক বেজে রাত্রি কাটল মমতার। সকালে যখন সূর্য উঠবে, সবাই জাগল, তখনও সে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে রইল।

ঘুম ভাঙ্গল শান্ত, স্তব্ধ মন নিয়ে। সব কাজ, সব উদ্যম, সবরকম নড়াচড়া আর চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে গভীর বিতৃষ্ণা। আলস্যই শান্তি, আলস্যই জীবন—নিশ্চিন্ত মনে গা ঢেলে দেওয়া। শুয়ে থাকার আরাম কি নিবিড়!

মেঝেতে মাদুরে বসে কৃষ্ণেন্দু কথা বলছিল রম্ভার সঙ্গে। রম্ভা তাকে খবর দিয়ে ডেকে এনেছে।

রম্ভা বলল মমতাকে, 'আপনার সাহস আছে। কত কাণ্ডের পর দরজা বন্ধ না করেই ঘুমিয়েছেন? জ্বরের রুগীর মত দেখাচ্ছে আপনাকে। বসুন, চা আনি। চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন।'

রম্ভা বেরিয়ে গেলে বিনা ভূমিকায় কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তোমায় তো যেতে হবে এখান থেকে।'

'যেতে হবেই?'

'তাই মনে হচ্ছে! এরা কেউ চায় না তুমি এখানে থাকো। সবাইকে এমন চটালে কি করে বল তো?'

'আমি সত্যি অপদার্থ কেষ্টদা।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওসব বিচার করব আমি। আমার ওখানেই যাই চলো?'

'চলো।'

দুজনকে চা এনে দিয়ে রম্ভা কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাল। কৃষ্ণেন্দু নীরবে মাথা হেলাতে সে যেন স্বস্তি বোধ করল স্পষ্ট। বোঝা গেল, তার মনে আশঙ্কা ছিল জিদের বশে মমতা হয়তো এখান থেকে নড়তে রাজী নাও হতে পারে। একবার ফুঁসিয়ে উঠেই আবার নির্জীব হয়ে গেল মমতার মনটা।

রম্ভা বলল, 'ও তোমায় বলতে বলে গেছে দিদিমণি, নিজে গিয়ে মাপ চেয়ে আসবে তোমার কাছে। কাজে যেতে হল কিনা, নইলে আজকেই মাপ চেয়ে যেত।'

মমতা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তোমার কাছে মাপ চেয়েছে তো?'

'শুধু মাপ চাইবে? প্রাচিত্তির করবে।' রম্ভাও হেসে জবাব দিল।

বস্তি এলাকা পার হয়ে তাদের গাড়ি বড় রাস্তার গাড়ির ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে মমতা বলে, 'ব্যাপারটা রম্ভা এত সহজ ভাবে কি করে নিল ভেবে পাই না। ভাণ করছিল নিশ্চয়!'

'ভাণ করবে কেন? আমাদের দেখাতে যে ওর মনটা খুব উদার? না, আমাদের খাতির করতে?'

'তুমি কি তবে বলতে চাও এই নিয়ে ওদের ঝগড়া হবে না? অশান্তি সৃষ্টি হবে না?'

'ঝগড়া হতে পারে, অশান্তি সৃষ্টি হবে না। ওরা বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে ব্যবহারের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করে। ওর কাছে রামপালের আচরণটা শুধু অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে ফেলেছে, আর কিছু নয়। এর মধ্যে আর কোন জটিলতা নেই ওর কাছে।'

কৃষ্ণেন্দু ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন তার দেখা পাওয়া গেল না। রাত্রে বাড়ি ফিরে স্নান করে সে খেতে বসলে মমতা সামনে বসল, শিষ্যার মত অনুগত ভাবে। এবার কি করা যায়। তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। কোন কাজের যোগ্যতাই তার নেই। সারাদিন ভেবেও সে আবিষ্কার করতে পারেনি পৃথিবীতে কি দরকারে সে লাগতে পারে।

কৃষ্ণেন্দু তাকে ভরসা দেয়।

'আমি তোমাকে কাজ দেব। জগতে কাজের অভাব আছে? অত হতাশ হয়োনা। নিজেকে অপদার্থ মনে করার কোন কারণ ঘটেনি। একটা প্রবাদ আছে জানো তো, যার কাজ তারে সাজে অন্যে করলে লাঠি বাজে? যে কাজ তোমার নয়, তাই তুমি করতে গিয়েছিলে, লাঠিও বেজেছে। বলা যায়, তুমি ভুল করেছ। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় না কোন কাজের যোগ্যতা তোমার নেই। মন খারাপ করো না। কত বড় একটা অভিজ্ঞতা হল বল দিকি? তার দাম কি কম?'

'কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেছে সব বিষয়ে। যে রকম ভেবেছিলাম কিছুই যেন সেরকম হল না। হীরেনের জন্যও তো সে রকম মন খারাপ হল না? এটা অদ্ভুত ঠেকেছে কেষ্টদা, সবই কি ফাঁকি আমার মধ্যে?'

'বিষাদ জমজমাট হয় নি, না? কি করে হবে বলো? বিরহ বেদনাকেও জোরালো করতে হলে কালচার করা দরকার হয়। রীতিমতো সাধনার ব্যাপার। তোমারও হত, কিন্তু তুমি তো মোটে সুযোগ দিলে না। নিজেকে নিয়ে আড়ালে সরে যেতে, একলাটি নিজের মনে শুধু ভাবতে যে বিচ্ছেদ যখন হয়েছে একজনের সঙ্গে আর বাঁচা কেন, দেখতে বিরহ কেমন চড় চড় করে চড়ে যায়, কি অসহ্য হতে পারে বিরহ!'

'ভালবাসা, বিরহ এসব তবে মনের বিকার তোমার কাছে? প্রশ্রয় দিলে বাড়ে, নইলে নির্জীব হয়ে থাকে?'

'পাগল, ভালবাসাকে বিকার ভাবতে পারি,ভালবাসার ক্ষমতাই যখন মানসিক সুস্থতার সব চেয়ে বড় লক্ষণ? কিন্তু ভালবাসাও তো মনেরি ধর্ম। অনুশীলনের নিয়মটা ভালবাসার বেলাতেও বাদ পড়ে না, বিরহের বেলাতেও নয়।'

'কিন্তু আর একটা মুস্কিল হয়েছে। বিরহের অভাবটা নয় বুঝলাম। কিন্তু বিতৃষ্ণা? বিরহ না হলে কি বিতৃষ্ণা হয়? ওর কাছে ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম। ভাবতেও এমন বিশ্রী লাগছে!'

কৃষ্ণেন্দু ভাতের গরাস মুখে তুলছিল, নামিয়ে রাখল।

মমতা হাই তুলে বলল, 'আরও শুনবে? আরিফের জন্য আমার মন কেমন করছে।'

কৃষ্ণেন্দু মাথা নীচু করে খেয়ে যায়। তাদের এখন আর মোটেই গুরু ও শিষ্যার মত মনে হয় না।

'কেন মন কেমন করেছে জানি না। কিছুই বলার নেই?'

'না।'

'ভাবনার কথা কিন্তু। ভালবেসে বিয়ে করা স্বামীর জন্যে বিতৃষ্ণা, ভাল না বেসে বিয়ে না করা বন্ধুর জন্য মন কেমন করা। ব্যাপারটা বোঝা দরকার।'

'কি হবে বুঝে?'

'আগে তো বুঝি, তারপর ওটা বিবেচনা করা যাবে। হীরেনকে একটা খবর দেবে, আমায় এসে নিয়ে যাবার জন্যে? বলে দিও এসে একটু যেন সাধাসাধি করে।'

পুতুল এসে বসে কৃষ্ণেন্দুর কাছে। মমতা হাত বাড়িয়ে দেয়। পুতুল সরে যায় কৃষ্ণেন্দুর আরও গা ঘেঁষে।

'পুতুলও চায় না আমাকে।'

'মন খারাপ কোরো না মমু। এসব মুডকে প্রশ্রয় দিতে নেই।'

মমতা শুনতে পায় না। বলে, 'উঃ, আমি কি অসুখী কেষ্টদা। আমি যদি রম্ভা হতাম!'

•

মাসখানেক পরে একদিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে মমতাকে জানাল, রম্ভা তাকে সন্ধ্যার পর সিন্নী খাবার নেমন্তন্ন করেছে।

'রম্ভা নেমন্তন্ন করেছে, না তুমি রম্ভাকে দিয়ে করিয়েছ?'

'রম্ভাই করেছে। তবে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল তোমায় বলা উচিত হবে কিনা, তুমি রাগ করবে কি না।'

'আমায় নেবে সঙ্গে? তোমার অজ্ঞাতবাসের জায়গাটি দেখে আসব।' হীরেন বলল।

'তুমি যাবে? সবাই অবাক হয়ে যাবে তোমায় দেখে!' মমতা বলল উৎসাহিত হয়ে।

সন্ধ্যার পর তারা পৌঁছল। গানের আসর বসেছিল কিন্তু গান আরম্ভ করা হয়নি, এদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। হীরেনকে দেখে চোখের পলকে আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলে শুধু অবাক নয় একেবারে যেন হয়ে গেল হতভম্ব।

দাওয়ায় তাদের জন্য বসবার বিশেষ ব্যবস্থা করা ছিল। রম্ভা তাদের সিন্নী আর ফল এনে দিল। তারপর শুরু হল রামপালের গান।

রামপাল আজ স্বদেশী গান ধরেছে।

কৃষ্ণেন্দু চেয়ে দেখল, হাসি আর গর্ব মুখে ফুটিয়ে রামপালের দিকে তাকিয়ে রম্ভা গান শুনছে।

দুটি গানের পর কৃষ্ণেন্দু উঠে দাঁড়াল, বলল, 'কাছেই একটা কাজ আছে, সেরে আসছি এক্ষুণি।'

হীরেন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বলল, 'চল, আমিও যাব।'

দু'জনে যখন রাস্তায় পৌঁছল, অধিকাংশ গেরস্থ বাড়ী আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেতরের দিকে গলির ডাইনে বাঁয়ে এবং দু'পাশের সরু সরু শাখা-গলির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর অনেক রূপজীবিনী বাস করে। এই বাড়ীগুলি এখনো পুরোদস্তুর সজাগ। মানুষের আসা যাওয়ার বিরাম এখনো হয় নি, গানবাজনা চেঁচামেচিতে খোলার ঘরগুলি হুল্লোড়িত হয়ে আছে। গলির মোড়ে পথের ধারে এবং বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে অনেক স্ত্রীলোক এখনো প্রতীক্ষা করছে। বেচাকেনা চলছে পান বিড়ি আর ডিম মাংসের দোকানে। পুলিশ মন্থর পদে হাঁটছে, টুংটাং শব্দে রিক্সা আনাগোনা করছে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক চোখে পড়ছে অনেক!

'এসব মেয়ের অনেকের স্বামী আছে জানিস হীরেন? স্বামীপুত্র নিয়ে রীতিমত ঘর সংসার করে। স্বামীর উপার্জনে চলে না, স্ত্রীও তাই এভাবে কিছু উপায় করে। সন্ধ্যার পর রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, কেউ এলে দরদস্তুর ক'রে ঘরে নিয়ে যায়, স্বামী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করে। হয়তো ঘরের সামনেই বারান্দায় বসে বিড়ি টানে, ছেলেমেয়ে সামলায়। ভাবতে পারিস, চোখের সামনে আরেকজন পুরুষ স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল?'

'পারি। এরা তো অশিক্ষিত ছোটলোক, আমায় একজন নিজে ডেকে নিয়ে আদর করে ঘরে বসিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত, সে শিক্ষিত ভদ্রলোক, পাড়ায় মানসম্ভ্রম আছে, মোটামুটি উপার্জনও আছে। বাপ মেয়েকে, ভাই বোনকে, স্বামী স্ত্রীকে ভাড়া দিয়ে টাকা রোজগার করে, সংসারে এটা তোর এই পাড়ায় প্রথম ঘটছে না।'

'ওসব ভদ্র পাষণ্ডের কথা বলি নি। এ পাড়ায় অশিক্ষিত ছোট লোকের মধ্যেও ওরকম মানুষ আছে। আমি যাদের কথা বলছি, তারা আলাদা জাতের

লোক, নিরীহ, শান্ত, ভালোমানুষ। কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলে এরা খুসী থাকে টাকার জন্য পাপ করার তাগিদ এদের মধ্যে নেই। আমি কয়েকজনকে জানি, বিয়ের পর কয়েকবছর এভাবে টাকা রোজগারের কথা স্বামী-স্ত্রী কল্পনাও করতে পারত না। দু'তিনটি ছেলেমেয়ে হবার পর যখন আর উপায় রইল না তখন বাধ্য হয়ে এই পথ নিল। এদের প্রবৃত্তি নীড় বাঁধবার, ভাঙ্গাবার নয়। শুধু ঘর গেরস্থালি বজায় রাখবার জন্য এসব মেয়ে পাপ করে, স্বামী মুখ বুজে থাকে। এতবড় পাপ হজম করে সুখে শান্তিতে সংসার করার সাধ্য তোমার আমার নেই, ওদের সয়ে যায়, গরীব কিনা। সব চেয়ে আশ্চর্য এইটুকু। ওই দিকটা বাদ দিয়ে এদের দ্যাখো, অবিকল আর দশটি গরীব গৃহস্থের মত জীবন কাটাচ্ছে, না জানা থাকলে দেখে কিছু টেরও পাবে না। স্বামী বাজার করছে, ঘরের কাজে সাহায্য করছে, কাজে যাচ্ছে, বৌ রান্না করছে, বাসন মাজছে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করছে, স্নেহমমতা মান অভিমানের পালা চলছে, সব একরকম। ঘরকন্নাকে বড় করে পাপকে ছোট করে নিয়েছে বলেই বোধ হয় এটা সম্ভব হয়েছে। পুরুষ যেমন কলকারখানায় গতর খাটিয়ে রোজগার করছে বৌও তেমনি গতর খাটিয়েই রোজগার করছে, সেটা পরপুরুষের আলিঙ্গন সইতে গতর খাটানো হোক, আর যাই হোক। ব্যাপারটা ওরা বোধহয় এই ভাবে নেয়।'

'সহরের বস্তিটস্তিতে এরকম ঘটে।'

'সহরের বস্তি? গাঁয়ে এমন কত দেখেছি। তোদের একটা ধারণা আছে সহরের বস্তিতে জগতের যত নোংরামি জড়ো হয়েছে, বস্তির বাইরে কোথাও দারিদ্র্য নেই, দুর্নীতি নেই। গাঁয়ে যারা সত্যি গরীব, সমাজের নীচুস্তরের জীব, তাদের মধ্যে কিছুদিন থেকে আয়, দেখতে পাবি বেঁচে থাকার জন্য তাদেরও নীতির বাঁধন কত ঢিল করতে হয়েছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের চেহারা দেখিস নি। গড়পড়তা আমাদের কত রোজগার তার হিসেবটা পড়ে মাথা চুলকে শুধু ভাবিস, তাইতো, আমরা সত্যি বড় গরীব। গরীব হওয়ার মানে যেন শুধু গরীব হওয়া—আর কিছু নয়। ছেঁড়া কাপড় পরা, পেট ভরে খেতে না পাওয়া, কঙ্কালসার দেহ নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা—এই হল দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ রূপ। দেশে যেন কয়েক কোটি গরু ছাগল বাস করে, ঘাস বিচালির অভাবে তাদের শুধু হাড়গোড় বেরিয়ে পড়ছে—আর কিছু হয়নি।'

পাঁচ

লোকনাথ কয়েকমাস আগে একটি রঙের কারখানা কিনেছিলেন। কারখানায় যারা কাজ করত তাদের মধ্যে সাতজন ছিল মুসলমান, তিনমাসে একে একে তাদের তিনজনকে বিদায় করা হয়েছিল। কদিন আগে বাকী চারজনকে হঠাৎ তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল বাধার আগেই খবর পেয়ে কৃষ্ণেন্দু লোকনাথের সঙ্গে দেখা করেছিল। লোকনাথ অজুহাত দিয়েছেন, ওই সাতজন দল বেঁধে ঘোঁট পাকিয়ে নানা ভাবে কাজে অসুবিধা ঘটাচ্ছিল, তাই তিনি ওদের ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

'ঘোঁট পাকাচ্ছিল কেন?'

'ওসমান আলির জন্য।'

কারখানার আগে যিনি মালিক ছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন ম্যানেজার,—নামে। ওসমান আলি ছিল একাধারে তাঁর সহকারী ও কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারিদের সর্দার। মালিক হিসাবেই হোক আর ম্যানেজার হিসাবেই হোক আগেকার মালিক-ম্যানেজার সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন ওসমানকে, কারখানার কাজে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ করতেন না। লোকনাথ কাঠের কারখানার হাঙ্গামার পর এখানে উমাপদকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। আফিসে বসে ওসমানের মারফত উমাপদ ম্যানেজারি করলে কোন গোলমাল হবার কারণ ছিল না, যেমন কাজ চলছিল তেমনি চলত, কিন্তু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছেঁটে ফেলে, কারখানার উন্নতির চেষ্টা না করে, নিজের চোখে কাজ কর্ম না দেখে, পুতুল সেজে বসে থাকতে উমাপদ রাজী হল না। যুক্তির দিক থেকে, উমাপদের ম্যানেজারির বিরুদ্ধে ওসমানের বলবার কিছু ছিল না, প্রথম থেকে এই ব্যবস্থায় কাজ করে এলে তার ক্ষোভও জাগত না। কিন্তু শুধু যুক্তি নিয়ে মানুষের চলে না, দায়িত্ব ও ক্ষমতা অকারণে আইনসঙ্গত ভাবে কেড়ে নিলেও মানুষ জ্বালা বোধ করে। তাছাড়া কাগজে কলমে ম্যানেজার হবার আশাও ওসমানের ছিল। সে আই, এস্-সি পাশ করেছে, এতকাল কারখানায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা অসঙ্গত হত না। তার বদলে তার মাইনে শুধু পাঁচটাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

লোকনাথ বললেন, 'মুসলমান বলে একজনকেও তাড়াইনি কেষ্টবাবু। ওরা ভাল কাজ করছিল, আমার কাজ নিয়ে কথা। প্রত্যেকে দোষ করেছে, তবে বিদেয় দিয়েছি।'

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'আপনি ভারি অন্যায় করেছেন।'

লোকনাথ চটে গেলেন।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'গোড়ায় ওসমানের সঙ্গে বুঝাপড়া করে নেওয়া আপনার উচিত ছিল। নতুন ম্যানেজার আসবে, নতুন ব্যবস্থা হবে, ওসমানকে কি অবস্থায় কি কাজ করতে হবে, এসব ওকে আগে বলে দিতেন। সোজাসুজি এসব না করে আপনারা ওর সঙ্গে আরম্ভ করলেন লড়াই,—যেমন চলছিল তেমনি চলতে দিলেন কিছুদিন, তারপর আস্তে আস্তে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ওকে অপদস্থ করতে লাগলেন। কি দরকার ছিল তার? ভাবলেন বুঝি যে আপনার কারখানা, আপনার মাইনে করা লোক, যা ব্যবস্থা করবেন তাই চলবে?'

হীরেনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু ওসমানের খোঁজে গেল। খাল আর ট্রাম লাইনের মাঝামাঝি ওসমানের ছোট্ট পাকা বাড়ী, ট্রাম লাইন থেকে চওড়া যে গলিটা এঁকে বেঁকে দক্ষিণে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমেই সরু আর নোংরা হয়ে এ অঞ্চলের দরিদ্রতম মুসলমান পাড়ায় পৌঁচেছে, তারই ধারে। ওসমানের বাড়ীটি আগাগোড়া সাদা চুনকাম করা। পাশেই একটি পুকুর। পুকুরের অপর তীরে কতকগুলি ছোট ছোট খোলার বাড়ী কেমন যেন তিন দিকের বাড়ীগুলি থেকে পৃথক হয়ে আছে। ওখানে একদল ধাঙ্গড় বাস করে। একটী পাকা বাড়ীর পিছন দিকে উঁচু দেয়াল, খানিকটা আবর্জনা ভরা পতিত জমি, ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, এইসব মিলে এত কাছে রেখেও অন্য সব বাড়ী থেকে ধাঙ্গড়দের ঘরগুলিকে কত যেন দূরে সরিয়ে রেখেছে।

ওসমান আগে গলি ধরে আরো এগিয়ে মুসলমান পাড়ার একটি খোলার ঘরেই থাকত। অবস্থা ভাল হওয়ায় খানিকটা তফাতে সরে এসে দেড় কাঠা জমি কিনে একতালা বাড়ীটি করেছে। এখানে দাঁড়ালে এই গলির মোড়ে ট্রাম রাস্তার উপরে উঁচু প্রাচীর ঘেরা বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে একজন ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর প্রকাণ্ড বাড়ীর খানিকটা চোখে পড়ে। ওসমান হয়তো মবারক সাহেবের ওই বাড়ীটির পাশে ওইরকম আরেকটি বাড়ী তুলবার স্বপ্ন ছাখে তার এই একতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

ওসমান বাড়ীতেই ছিল, সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলল, 'কেষ্টবাবু! আসেন, আসেন। ছালাম।'

হীরেনের দিকে সে তাকিয়েও দেখল না। অবজ্ঞাটা এতই স্পষ্ট যে হীরেনের ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর মত সে উদার নয়, নির্বিকারও নয়। কৃষ্ণেন্দু ঠিক এই অবস্থায় পড়লে ওসমানের ব্যবহারকে অপমান বলে গ্রহণ করতেই অস্বীকার করত, যেচে হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলত, প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিত যে জটিল ব্যাপারটার একটা মীমাংসার জন্য তার সঙ্গে যে পরামর্শ করতে এসেছে বন্ধুভাবে। তবে হীরেনের সহ্যশক্তি আছে। কোন অবস্থাতেই সহজে সে বিচলিত হয় না। কৃষ্ণেন্দুকে ওসমানের সম্মান দেখানোর বহর দেখে তার মত অন্য কেউ হয়তো বলে বসত, তোমরা কথা বলো ইন্দু, আমি চললাম,—বলে, গটগট করে হাঁটতে আরম্ভ করে দিত। হীরেন চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণেন্দুকে বসতে দেবার জন্য ওসমান ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কোথায় বা বেচারী বসতে দেবে অতিথিকে! বাড়ীর সামনে তার একহাত চওড়া একটু রোয়াক। তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে সে একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে এল। কিন্তু চেয়ার পাতবে কোথায়, বাড়ী তার রাস্তার ঠিক ওপরে, রাস্তায় ছাড়া চেয়ার পাতবার জায়গা নেই। বাড়ীর কোণে পুকুরের দিকে একটু ঢালু জায়গা আছে, ওখানেই চেয়ারটা সে পাতবে কি? কিন্তু ওখানে বাড়ীর ছায়া পড়ে নি, এই কড়া রোদে কি মানুষকে চেয়ার পেতে বসতে দেওয়া যায়? লজ্জিত অপদস্ত ওসমান অসহায় ভাবে জায়গাটুকুর দিকে তাকাতে লাগল, হাত থেকে চেয়ারটা নামিয়ে রাখবার খেয়ালও তার হল না।

কৃষ্ণেন্দু হেসে বলল, 'চলুন ভেতরে গিয়ে বসি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হবে। দেবেন তো আলাপ করিয়ে?'

বলতে বলতে সে রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল, হীরেনকেও ডেকে বসাল। আহত করুণ চোখে ওসমান তাকিয়ে রইল তার দিকে। দেখে মনে হতে লাগল, এতবড় একটা সবল তেজী মানুষ গৃহে সমাগত ভদ্রলোককে মনের মত সমাদর করতে না পেরে যেন ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত শিশুর মত কাতর হয়ে পড়েছে।

কত কষ্টে এই বাড়ীটুকু সে তুলেছে কেউ তা জানে না। জমি কিনে দু'খানা ঘর তুলতে তার নগদ টাকা ফুরিয়ে গেছে, সামনের এই দেয়াল আর রোয়াক করেছে টাকা ধার নিয়ে। এখন তার মনে হতে থাকে, এসব না করলেই হত।

তার খোলার বাড়ীর সামনে চওড়া বারান্দায় চৌকী থাকত, নতুন একখানা পাটি বা মাদুর বিছিয়ে মানুষকে বসতে দিলে না হত ভদ্রতার ত্রুটি, না হত বেমানান।

'তামাসা করছি আলি সা'ব।'

'নিশ্চয়! তামাসা বুঝিনা কেষ্টবাবু?' ওসমানও হাসবার চেষ্টা করল।

'তবে পর্দা একদিন আপনাদের ঘুচাতে হবে। আমার ছেলের কাছে আপনার ছেলের বৌ পর্দা রাখবে না।'

'ঠিক কথা। কি জানেন কেষ্টবাবু, আমারও একদিন ঝোঁক ছিল। কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছি, সাদি করেছি তিন কি চার সাল। বাবার এক ধমকে ঝোঁক কেটে গেল।'

'আপনার ছেলের ঝোঁক কাটবে না। তার বাবা তাকে ধমক দেবে না। কি বলেন?'

'খোদা জানেন। ধমক না দেই, হয়তো স্রেফ মার লাগাব।'

ওসমান অনেকটা সামলে উঠেছে। কৃষ্ণেন্দুর কথা ও ব্যবহার নিজের অজ্ঞাতসারেই তার মনে কাজ করছিল, সে শুধু বুঝতে পারছিল মানুষটাকে আজ তার বিশেষ করে ভাল লাগছে। মানুষের সহজ ও শান্ত ভাব অতিশয় সংক্রামক, অন্যের গভীর উত্তেজনাও অল্প সময়ে ফুরিয়ে দিতে পারে। ঝির ঝির করে অপরাহ্নের বাতাস বইতে সুরু করেছিল, তিনজনেরই ঘামে ভেজা শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাসন হাতে একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক মাটির খাঁজে বাঁশ বসানো ধাপে পা দিয়ে তালগাছের গুঁড়িতে তৈরী পুকুরের ঘাটে নেমে গেল। ওসমান সরে এসে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

'এঁকে চেনেন না?' কৃষ্ণেন্দু শুধোল।

ওসমান সায় দিয়ে শুধু বলল, 'চিনি।' তারপর এক মুহূর্তে কি ভেবে অমায়িক ভাবেই হীরনকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছেন?'

হীরেন সম্পর্কে ওসমানের ভদ্রতার অভাবটা কৃষ্ণেন্দু ঠিক মত বুঝে উঠতে পারছিল না। শত্রু বাড়ীতে এলে তাকে খাতির করে, এই প্রকৃতি ওসমানের। এতক্ষণে সে টের পেলে যে হীরেনকে শত্রু ভেবে নয়, সে তার ভূতপূর্ব মনিবের ছেলে বলে ওসমানের ভয় হয়েছে তার বিনয়কে হয়তো সে তার বাপের বেতনভোগী মানুষের স্বাভাবিক দীনতা হিসাবে গ্রহণ করবে, প্রভু যে ভাবে ভৃত্যের নম্রতাকে গ্রহণ করে সেই ভাবে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দু হীরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত দেরী করে কেন রাস্কেলটা, ওকি ওসমানের কথার জবাব দেনে না? যদি ও তুমি বলে বসে ওসমানকে!

হীরেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে যেন সচেতন হয়ে উঠল। বলল, 'ভালই আছি। আপনার খবর ভাল?'

চোখের পলকে ওসমানের মুখের ভাব বদলে গেল। খুসী হয়ে তার মধুর গম্ভীর আওয়াজে সে বলল, 'চলছে একরকম। আপনি যে গরীবের বাড়ী পায়ের ধূলো দেবেন—'

হীরেন আর টানতে পারল না, ক্লিষ্টভাবে একটু হেসে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'বলেন কি!'

কৃষ্ণেন্দুর ওপর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। মমতা ফিরে আসবার পর থেকে হীরেন যেচে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছে, কুলিমজুরদের আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে জানবার জন্যে। তার এই পরাজয়ের উদারতায় মমতা যদি খুসী হয় এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে আলাদা ব্যাপার। ওসমান তো গরীব নয়, কথায় ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে এখানে কৃষ্ণেন্দু কি বলে তাকে নিয়ে এল?

তারপর তারই সামনে ওসমানের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু যখন কারখানার গণ্ডগোলের বিষয় আলোচনা শুরু করল, রাগে হীরেনের রক্তে যেন আগুন ধরে গেল একেবারে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একথা পর্যন্ত তার মনে হল যে, কৃষ্ণেন্দু তার বন্ধু নয়, আর দশটি বড়লোকের ছেলের মত তাকেও কৃষ্ণেন্দু ঘৃণা করে, তাকে নিয়ে এই রকম মজা করার জন্যই সে বন্ধুত্বের ভাণটা বজায় রেখে চলে তার সঙ্গে।

লোকনাথকে যেমন বলেছিল, ওসমানকেও তেমনি ভাবেই কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আপনি বড় অন্যায় করেছেন, আলি সা'ব। এত হাঙ্গামা করবার কি দরকার ছিল আপনার? আপনার কদর ওরা বুঝল না, আপনি কাজ ছেড়ে দিলেন, হাঙ্গামা চুকে গেল। আপনার কি কাজের অভাব হত কিছু? বেলেঘাটার বসাকবাবু আজ গেলে কাল আপনাকে কাজে লাগিয়ে দেবে। ম'বুব, আজিজ, আমিরুদ্দীন, এদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতে গেলেন কি বলে?'

ওসমান মুখ অন্ধকার করে বলল, 'কেষ্টবাবু, আপনি যদি বলেন আমি মুছলমান ওরাও মুছলমান, তাই ওদের বেছে নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছি—'

'তা জানি। অন্য সবাই এলে তাদের নিয়েও ঘোঁট পাকাতেন, তারা

যদি নিজে থেকে আসত। তাদের আপনি ডাকেন নি, এদের ডেকেছেন।'

'আমি ডাকলে ওরা আসবে কেন? আমি মুছলমান।'

'এবার জবাব দিন আলি সা'ব। আপনাকে ছাড়িয়ে দিয়ে লোকনাথবাবু তবে কি দোষ করেছেন? পাঁচ সাত বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন লোককে দিয়ে আপনি কাজ করালেন, তারপর যখন নতুন মালিক এসে আপনাকে ছাড়িয়ে দিল, সাতজন মুছলমান ছাড়া আর কেউ আপনার দলে গেল না। কেমন কাজ করেছিলেন আপনি সাত বছর? জাতভাইদের দিকে টেনে বাকী সকলের ওপর অন্যায় করেছিলেন নিশ্চয়। আপনি যদি এমন লোক, আপনাকে কি করে রাখা চলবে বলুন?'

ওসমান কথা বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে চলল, 'আরেকটা মানে হতে পারে। আপনি ব্যবহার করতেন ভাল কিন্তু ওই বাকী লোকগুলি খারাপ লোক, আপনি মুছলমান শুধু এইজন্য আপনাকে দেখতে পারত না। বেশ কথা। তাই ধরে নিলাম। কিন্তু তাহলেও লোকনাথবাবু আপনাকে বাহাল রাখতেন কি করে বলুন? চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন লোকের মধ্যে ত্রিশ জনেরও বেশী যাকে পছন্দ করে না, তাকে সর্দার রেখে কি কারখানা চলে? আপনার সব বাজে অজুহাত আলি সা'ব। আপনার রাগ হয়েছিল, রাগের জ্বালায় ম'বুব, আজিজদের ক্ষেপিয়ে আপনি গায়ের জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন। আপনি চুপচাপ চলে এলে ওরা কাজ করে যেত, এমন কষ্টে পড়ত না। ওদের ইজ্জৎ রাখতে আপনি কোথায় জান দেবেন, নিজের ফাঁকা ইজ্জত রাখতে, গায়ের ঝাল ঝাড়তে, আপনি ওদের মারলেন।'

ওসমান অনেকক্ষণ গুম খেয়ে রইল। তারপর ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আপনি বড় কড়া কড়া কথা বলেন কেষ্টবাবু।'

'খাঁটি খাঁটি কথা বলি আলি সা'ব। এমনি ওদের প্রাণটুকু ধুক ধুক করছে, নিজেদের ভালর জন্য ওদের দিয়ে কিছু করানো প্রাণান্ত ব্যাপার, আপনি আমি যদি আপনার আমার আজেবাজে কাজে ওদের প্রাণটুকু ফুঁকে দিই ওরা যায় কোথায় বলুন? কটা লোক দরদ করে ওদের? আপনার একটু দরদ আছে, আপনিও যদি ওদের কথা আগে না ভেবে নিজের কথা ভাবেন, দুদিন পরে ওরা কবরে যাবে। না আলি সা'ব, আপনার আমার মান অপমান নেই। আপনাকে তাড়ালে চুপ করে আপনি চলে আসবেন। নজর রাখবেন যারা রইল তাদের

দিকে। ওদের একজনকে যখন অন্যায় করে তাড়াবে, তখন ফোঁস করে উঠে বলবেন—খপর্দার।'

'ওদেরও তাড়িয়েছে।'

'কাজের বদলে ঘোঁট করায় তাড়িয়েছে, কাজ করতে গেলেই ফিরিয়ে নেবে। হীরেনবাবুকে তাইতো সঙ্গে আনলাম। জিজ্ঞেস করুন।'

ওসমান কিছু জিজ্ঞেস করল না। হীরেনও চুপ করে বসে রইল। এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করে এতক্ষণের আলোচনাকে একেবারে যেন বাতিল করে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ বলে বসল, 'এক গেলাস জল দিন তো আলিসা'ব।'

ওসমান ব্যস্ত হয়ে ভিতরে চলে গেল।

জল আসাতে কিন্তু দেরী হতে লাগল অদ্ভুত রকম। চাপা গলায় ওসমান ও দুটি নারীকণ্ঠের বাদানুবাদ মাঝে মাঝে কাণে ভেসে আসতে লাগল। জল আনতে গিয়ে ওসমান কি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছে? গেলাস নেই বলে তাড়াতাড়ি গেলাস মেজে দিতে বলেছে? অথবা শুধু জল না দিয়ে অতিথিকে আরও কিছু দেবার হাঙ্গামা নিয়ে তর্ক আর আলোচনা শুরু হয়েছে?

কৃষ্ণেন্দু ও হীরেন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, ওসমান এসে সবিনয়ে বলল, 'ভেতরে আসবেন একবার?'

শুধু কৃষ্ণেন্দুকে নয়, হীরেনকেও সে ভেতরে যাবার আহ্বান জানাল।

ওসমান যে সত্যসত্যই তাদের বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, দুজনে তা কল্পনাও করতে পারে নি। এমন কয়েকজন মুসলমান বন্ধু কৃষ্ণেন্দুর আছে, নতুন জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে যাদের ওসমানের চেয়ে শতগুণ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তার চেয়ে যারা ঢের বেশী দুঃসাহসী। মনে প্রাণে পর্দার বিরোধী হয়েও তারা আত্মীয় পরিজন পাড়াপ্রতিবেশীর মতামতকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

ছোট উঠানটি পরিচ্ছন্ন। এক কোণে একটি মাত্র মাটির টবে একটি অজানা চারা; ফুল ফোটেনি। একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত টাঙ্গানো লোহার তারে একটি দু'রঙা লুঙ্গি ও একটি গাঢ় হলুদ রঙের পাতলা ফিনফিনে শাড়ী শুকোচ্ছে। একটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, জানলার পাট অল্প একটু ফাঁক করে একজন কেউ উঁকি দিচ্ছে বোঝা যায়। ওসমান তাদের অন্য ঘরটিতে

নিয়ে গেল। খাটে শুধু তোষকের ওপর রঙীন স্তোয় বোনা সস্তা চেক চাদর পাতা। খাটটি বহুকালের পুরানো, অতিরিক্ত বাহারের কাজ ও বাহুল্য নক্সায় ভরা। এখন রঙ চটে গেছে, নানা স্থানে মেরামত করা হয়েছে, একটি পায়া একদম বাদ দিয়ে সাধারণ কাঠের সাধারণ একটি পায়া বসাতে হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় খাটটি নিলামে কেনা। এ ছাড়া, ছোট একটি টেবিল, কাঠের একটি চেয়ার ও সস্তা একটি ক্যাম্প চেয়ার ঘরের আসবাব। ইটের ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে ঘরে তৈরী পাড়ের ঘেরাটোপ দেওয়া দুটি বাক্স একপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে। দেয়ালে তিনটি ছবি টাঙ্গানো, তিনটিই মাসিকপত্র থেকে সংগ্রহ করা। একটি নুরজাহানের, একটি রঙিন পাখীর, অন্যটি রক্তগোলাপ হাতে ওমর খৈয়ামের।

বাইরে যে চেয়ারটি নিয়ে গিয়েছিল, ওসমান সেটিও নিয়ে আসে। ব্যস্তভাবে সে ঘরে বাইরে আনাগোনা করে, সমাদর জানানোর চেষ্টায় অর্থহীন কথা বলে। ছেলেমানুষের মত সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার এই উত্তেজনার আসল কারণটি তখনো কৃষ্ণেন্দু অনুমান করতে পারে নি, একসময় সে হাসিমুখে অনুযোগ দিয়ে বলে, 'অত খাতির করবেন না, আলি সা'ব। মুস্কিলে ফেলে দিচ্ছেন যে আমাদের!'

বলতে বলতে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মুখখানা সুশ্রী ও কোমল, গায়ে কব্জি-হাতা জামা, পরণে ফিকে সবুজ শাড়ী, পায়ে জরি বসানো চটি। ঘরে ঢুকেই দ্বিধাভরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আরও দু'পা এগিয়ে এল। মেঝের দিকেই সে তাকিয়ে রইল, একবার শুধু চকিতের জন্য তার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি তাদের দিকে ঝিলিক দেওয়ার মত খেলে গেল।

ওসমান পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আমার স্ত্রী। ইনি কৃষ্ণেন্দু বাবু, ইনি হীরেন বাবু।'

ব্যস্ত সমস্ত ভাব কেটে গিয়ে ওসমান এখন শান্ত ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে আমিনার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করে। আমিনার অবস্থা সে ভাল করেই বুঝতে পারছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হাস্যকর হয়ে না যায়, এখন ওসমানের এই আশঙ্কা। বেশী কিছু আশা করে না সে আমিনার কাছে। পাঁচ ছ'মাস আগে কৃষ্ণেন্দুর বাড়ীতে তার বৌদিদি কেমন সহজভাবে তাকে অভ্যর্থনা

জানিয়েছিল, তার সঙ্গে আলাপ করেছিল, ওসমানের মনে পড়তে থাকে। ওদের অভ্যাস আছে, ওদের কথা আলাদা। জীবনে আজ এই প্রথমবারের চেষ্টায় আমিনা কেন ওদের মত হতে পারবে। সে যেন শুধু ভেঙে না পড়ে, হঠাৎ যেন পালিয়ে না যায়!

কৃষ্ণেন্দু তার চেয়ারটি আমিনার কাছে এগিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'বসুন।'

আমিনা অস্ফুটস্বরে কি বলল বোঝা গেল না। চেয়ারের পিঠে একটি হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণেন্দু অধ্যবসায়ী, সহজে হার মানে না।

'বাড়ীর ভেতর চড়াও হয়ে আপনাকে বড়ই জ্বালাতন করলাম।'

আমিনা একবার চোখ তুলে তাকাল।

'উপেনবাবু আর জলধর বাবুর মেয়েদের সঙ্গে আপনি খুব মেলামেশা করেন শুনেছিলাম। ওঁরা আমায় বলেন নি, আমার সামনে ওঁরা বার হন না। আমার বৌদির কাছে শুনেছি।

আমিনার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল।

'আমাদের বাড়ীটা একটু দূরে। আপনি তো আর যাবেন না, বৌদিকে একদিন নিয়ে আসব।'

আমিনা মৃদুস্বরে বলল, 'আনবেন। আনবেন তো?' সংক্ষিপ্ত বিরামের পর সে আবার যোগ দিল, 'আমিও যাব।'

আমিনার কথার সুর আশ্চর্য রকম মিষ্টি। মিহি গলার মৃদু উচ্চারণে ক্ষীণ একটু ঝঙ্কারের আভাস মিশে থাকায় তার কথা পাখীর কূজনের মত অপূর্ব শোনায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিধাসঙ্কোচের ভাব তার অনেকটা কেটে গেল। লেখাপড়া সে বিশেষ জানে না, বাইরের জগতকে একরকম চেনে না। ওসমান নিজে তাকে কিছু কিছু পড়তে শিখিয়েছে, তারই মারফত বাইরের জগতের দুটি একটি খবর সে পায়। অতিথি দু'জনকে সে আম আর দোকানের খাবার খেতে দিল। বার বার কৃষ্ণেন্দুকে মনে করিয়ে দিল বৌদিকে নিয়ে সে যেন একদিন বেড়াতে আসে। আধ ঘণ্টা একটি অপরিণত শৈশব-আশ্রয়ী মনের সংস্পর্শে কাটিয়ে হীরেন মুগ্ধ ও কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ হয়ে বিদায় নিল।

'ম'বুব, আজিজদের বলে আসি চলুন আলি সা'ব, কাল থেকে ওরা যেন কাজে লাগে।' কৃষ্ণেন্দু বলল।

ওসমান বলল, 'আপনি কেন যাবেন ? ডেকে পাঠাচ্ছি ওদের।'

'চলুন না আমরাই যাই। তাতে দোষ নেই আলি সা'ব।'

অনিচ্ছুক ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু গলি ধরে এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে পথ হয়ে এল সঙ্কীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। পথের ধারে জলের কলের কাছে বালতি কলসী নিয়ে পাঁচ সাতটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ চুল, রুগ্ন দেহ, সায়া সেমিজের অভাববশতঃ ময়লা শাড়িখানিই দুফেরতা জড়ানো। পথের ধারে চাল ডাল তেল মসলার দোকানে নারী পুরুষ দৈনিক সওদা কিনছে, দু'এক আধ-পয়সার। এরা তেল, নুন পর্যন্ত দিন কিনে দিনের প্রয়োজন মেটায়, একসঙ্গে কয়েকটা দিনের সওদা কিনে রাখবার পয়সা নেই। একটি খোট্টা মেয়ে তিনটি ছাগল তাড়িয়ে ডাইনের একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ল, তকমা আঁটা এক চাপরাসী এলুমিনিয়ামের পাত্র হাতে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কোন এক বাবুর ছেলে ছাগলের দুধ খায়। কোথা থেকে ভিজে কাপড়ে আবির্ভূতা হয়ে একটি স্থূলাঙ্গী বাঙ্গালী যুবতী ওই বাড়ীতেই প্রবেশ করার সময় কৃষ্ণেন্দুর সামনে নির্ভীক নির্লজ্জতার সঙ্গে চাপরাসীকে বিলোল কটাক্ষ হানল, অকারণে থমকে দাঁড়িয়ে ভাল করে নিজেকে ঢাকবার ছলে মুহূর্তের জন্য বুকের আবরণ সরিয়ে দিল, তারপর ক্রুদ্ধ উপেক্ষার ভঙ্গিতে নাক সিঁটকে মুখ উঁচু করে ভেতরে চলে গেল।

হীরেনের চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে কৃষ্ণেন্দু একটু হাসল।

'এটা বিজ্ঞাপন ভাই। পাঁজীর বিজ্ঞাপনের চেয়ে অশ্লীল ঠেকল ? চাপরাসীটা যদি কেনে, আজ ওর আট আনা রোজগার হবে, কাল কুঁচো চিংড়ি আনিয়ে পেট ভরে ভাত খাবে। জোরালো শরীর বলে ওর খিদের তাগিদটা একটু বেশী। ব্যায়রামে ভুগে যখন শরীরটা ভেঙ্গে পড়বে, খিদে কমে যাবে, তখন আর এরকম অভদ্রতা করবে না।'

'ওকে চিনিস ?'

'চিনি। ওর নাম কালী। ভীষণ দজ্জাল। বেচারীর কপালটা বড় মন্দ। না খেয়ে না খেয়ে স্বভাবটা বেশ নরম হয়ে আসে, একজন কাউকে পাকড়িয়ে তার সঙ্গে কয়েকদিন খুব ভাল ব্যবহার করে। পেটভরে খেয়ে গায়ে জোর হলে আবার আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। কাউকে নিজে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, কেউ আপনার থেকে পালায়।'

বাঁ দিকে দু'হাত চওড়া একটা গলির মধ্যে প্রথমেই ম'বুবের বাড়ী। তিনজনে

গলিতে ঢুকতেই কয়েকটা মুরগী উচ্চকিত হয়ে পালিয়ে গেল। গলির দুদিকেই টিন আর খোলার ঘর, পুরানো এবং জীর্ণ। আবরু রক্ষার জন্য দু'পাশের বাড়ীতেই এখানে ওখানে জীর্ণ চটের পর্দা ঝুলছে। তবু দরজার ফাঁক দিয়ে ম'বুবের উঠানের খানিকটা চোখে পড়ে। সেখানে কতগুলি ঘুঁটে গাদা করা, কাছে শুয়ে হাঁপাচ্ছে একটা লোমওঠা ঘেয়ো কুকুর। চোখ ফিরিয়ে নিতে কৃষ্ণেন্দুর নজরে পড়ল, এদিকের বাড়ীর ঠিক সামনের ঘরখানার ভেতরে একটি পনের ষোল বছরের ছেলে এই অবেলায় পড়াশোনা করছে। ঘরটি খুব ছোট, ভেতরে আবছা অন্ধকার। বেড়ার গায়ে ছোট জানালাটিতে বাঁশের বাতা বসানো। মাটির মেঝেতে চাটাই-এর আসন পেতে ছেলেটি বসেছে, সামনে একটি কেরোসিন কাঠের চৌকো বাক্স হয়েছে তার টেবিল, তাতে কয়েকটি বই খাতা আর দোয়াত কলম। একটি বই খুলে অল্প আলোর জন্য বইয়ের পাতার ওপর ঝুঁকে ছেলেটি একমনে পড়ে চলেছে।

বাড়ীটা নেওয়াজের। কৃষ্ণেন্দু আনমনে বাঁশের বাতা বসানো জানালার ফাঁকে অধ্যয়নরত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। কার কাছে সে শুনেছিল নেওয়াজের ছেলে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। এতদিন খবর নেয়নি কেন ?

ম'বুব, আজিজ, নেওয়াজের গোলমালটা মিটেও মিটল না। ওসমান বেলেঘাটার বসাকদের কারখানায় ঢুকেছে, এদের সাতজনকে লোকনাথের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা আর কোন গোলমাল করতে চায়নি, কিন্তু উমাপদ ছাড়বার ছেলে নয়, সে এদের পেছনে লেগেছে। এদের ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা তার ছিল না, কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন লোকনাথকে বুঝিয়ে রাজী করানোয় সে আর কিছু বলতে পারে নি। সেই রাগটা সে ঝাড়তে আরম্ভ করল এই বেচারীদের ওপর। ওই ছোট কারখানার সামান্য ব্যাপারটা যে কতখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল, হিন্দু-মুসলমান মজুরদের মধ্যে ধর্মগত একটা বড় রকম হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা তলে তলে আরম্ভ করে দিয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেরই কয়েকজন ওস্তাদ ব্যক্তি, সেটা বুঝবার ক্ষমতা উমাপদর ছিল না। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

লোকনাথের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন, 'কেষ্টবাবু, দয়া করে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন না।'

সেদিন সকালে ভারতের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গের লাভজনক

ব্যাপারে উৎসাহী একজন নাম করা ধনী হিন্দু নেতা যে লোকনাথের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণেন্দু তা জানত না।

ভেবে চিন্তে সে কারখানার সব মজুরকে জড়ো করে হীরেনকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

হীরেন যায় অনিচ্ছার সঙ্গে কিন্তু বিনা প্রতিবাদে।

প্রতিবাদ করে না, কিন্তু আপশোষ জানায়। নিশ্বাস ফেলে বলে, 'ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমার সয় না কেষ্ট।'

'অশান্তিটা কিসের?' কৃষ্ণেন্দু শুধোয়।

'এই ঘরে মমতাকে নিয়ে, বাইরে তোকে নিয়ে।'

বলে সে একটু হাসবার চেষ্টা করে। ভীরু অপরাধীর মত কেমন এক ধরনের হাসি। তার জীবনে অশান্তি কথাটা যেন অন্যায়, তারই দোষ। এ ভাবটা হীরেনের দিন দিন বাড়ছিল। মমতা আর কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে যতদূর সম্ভব লোপ করে দেয়—তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ভাল-লাগা ভাল-না-লাগার কথা মুখে এলে উচ্চারণ করেই গিলে ফেলে। ভেতরটা তার পুড়ছে। ঘুঁটের মত ধীরে ধীরে গোপনে। এটাও সে মানতে চায় না—জ্বালাটা পর্যন্ত। সে কি ছোট লোক, অমার্জিত, অসভ্য, স্বার্থপর যে আরিফ জেলে আছে, মমতা শান্ত হয়ে ফিরে এসে সন্ধি করেছে, তবু সে ঈর্ষায় জ্বলবে, সর্বদা মনে হবে মমতা তাকে ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে, ঠকাবে।

যদি সে ভাবতে পারত যে মেয়ে জাতটাই এরকম। এটা ভাবতে গেলেই দিগম্বরীর কথা মনে ভেসে আসে—গেঁয়ো অশিক্ষিতা দিগম্বরী, স্বামী ছাড়া যার জগতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই, সেবা আর শ্রদ্ধা যার স্বভাব।

কৃষ্ণেন্দু হয়তো তাকে তুচ্ছ অনাবশ্যক মনে করে এ সন্দেহের জ্বালাটা যখন বেড়ে যায়, নিজেকে বড় একা মনে হয় হীরেনের, গভীর বিষাদ ঘনিয়ে আসে।

সন্দেহ সত্য হয়ে দাঁড়াবার ভয়ে সে কৃষ্ণেন্দুর ওপরে বন্ধুত্বের জোর খাটায় না, নির্বিরোধ ব্যবহারের চেষ্টা করে।

তাই, কৃষ্ণেন্দুকে চটাবে না বলে হীরেন মজুরদের সভায় গেল। দু'চার জন ছাড়া লোকনাথের কারখানার সকলে প্রায় একসময়েই মিস্ত্রীঘরে এসে জড়ো হল। কারখানা থেকে তারা সোজা এখানে এসেছে। কৃষ্ণেন্দু তাদের জন্য

খাবার যোগাড় করে রেখেছিল,—রুটি, তরকারী আর একটি করে গুড়ের সন্দেশ। পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষগুলি এই খাদ্য উদরস্থ করে যখন ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটী জল খেল, স্পষ্ট অনুভব করা গেল তাদের উপস্থিতির প্রকৃতিই যেন বদলে গেছে। অধীর উত্তেজনাপ্রবণ মানুষগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল ধীর ও শান্ত। এ বিষয়ে কৃষ্ণেন্দুর অভিজ্ঞতা আছে। সে জানে, পেট ঠাণ্ডা না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করার ক্ষমতা এদের হয় না।

আলোচনার গোড়াতেই জানা গেল, ম'বুব আজিজদের সম্পর্কে কারখানার অন্য সকলের মনে এতটুকু বিরুদ্ধভাব নেই, অনেকদিন তারা একসঙ্গে কাজ করছে। প্রতিবাদ না করলেও ওদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা তারা সমর্থন করে না। ক্ষমতা থাকলে প্রতিবাদও তারা করত।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তাই তোমাদের করতে হবে।'

এদের মধ্যে দীননাথ সবচেয়ে বিচক্ষণ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল আর গায়ের ফতুয়াটীর জন্য তাকে আরও বিচক্ষণ দেখায়। হীরেনের দিকে এক নজর তাকিয়ে সে উদাসভাবে বলল, 'আমরা কি করতে পারি বলুন ?'

'এরা সাতজন যা করে, তোমরাও তাই করবে। এদের একজনকে উমাপদ বাবু অপমান করলে বাকী ছ'জন গা পেতে নেয়, এবার থেকে তোমরা সবাই গা পেতে নেবে। দরকার হলে ওদের সঙ্গে তোমরাও বেরিয়ে আসবে কাজ ছেড়ে দিয়ে।'

কেউ কথা বলে না। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনতে শুনতে বার বার সকলের দৃষ্টি পড়তে থাকে হীরেনের ওপর। এই সভায় হীরেনের উপস্থিতি তাদের কাছে ধাঁধাঁর মত হয়ে উঠেছে, সকলেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে; প্রথমে সকলে ভেবেছিল মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দেবার জন্য সে এসেছে, কর্তৃপক্ষ থেকে সে তাদের ভরসা দেবে যে ভবিষ্যতে কারখানার কারো প্রতি কোনরকম দুর্ব্যবহার করা হবে না। আপোষ আলোচনার পরিবর্তে যখন প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা উঠল, হীরেনের সামনেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উমাপদর সমালোচনা করে কৃষ্ণেন্দু যখন বুঝিয়ে দিতে লাগল, ওই একটি লোকের গোঁয়ার্তুমির জন্যই বিশ্রী ব্যাপারটা সৃষ্টি হয়েছে এবং সে আর লোকনাথের একগুঁয়েমির জন্যই ব্যাপারটা মেটানো যাচ্ছে না, সকলে তখন এমন বিব্রত হয়ে পড়ল বলবার নয়। কারো কারো একথাও মনে হল যে এমনিভাবে বাপভাই-এর নিন্দা শুনিয়ে

অপমান করার উদ্দেশ্যেই হয়তো কৃষ্ণেন্দু ভুলিয়ে-ভালিয়ে হীরেনকে সভায় এনে হাজির করেছে।

হীরেনও প্রথমে কল্পনা করতে পারেনি তাকে ডেকে এনে কৃষ্ণেন্দু এভাবে অপদস্থ করবে। তারও ধারণা ছিল, সকলের অভিযোগ শুনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে বলে সে কথা দেবে, এইটুকু কৃষ্ণেন্দু তার কাছে আশা করে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে যতই সে অস্বীকার করুক তাকে দিয়েই কৃষ্ণেন্দু যে একটা মীমাংসা করিয়ে ছাড়বে, তাও হীরেন জানত।

প্রথমে অসহ্য বিস্ময় জাগল, তারপর অপমানে দুটি কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কৃষ্ণেন্দুর দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। লোকনাথ বা উমাপদর নিন্দায় যেন হীরেনের কিছু এসে যায় না, তার সামনে কারখানায় স্ট্রাইক শুরু করার পরামর্শ করতে যেন বাধা নেই, সে তাদের লোক, সে বিভীষণ। আগেও অনেকবার মনে হয়েছে, এখন আবার হীরেনের মনে হয়, এই অত্যধিক লম্বা,হাড্ডিসার কুদর্শন পুরুষটি তার সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে হিংস্র শত্রু, এমনিভাবে ফাঁদে ফেলে তাকে আঘাত করার তীব্র আনন্দের জন্য দিনের পর দিন তার বন্ধু হয়ে থাকে। নিকটতম, প্রিয়তম বন্ধু। হৃদয়মন রামময় করে রাখতে চেয়ে, রামের হাতে মরতে চেয়ে, রাবণ রামের শত্রু হয়েছিল। সেও শত্রুতার ভাণ করেনি। জগতের ধনী আর স্ববের প্রতিনিধি হিসাবে সব সময় তাকে ঘৃণা করতে চেয়ে, তাকে আঘাত করার আনন্দ চেয়ে, কৃষ্ণেন্দু নিজেকে তার মিত্র করেছে।

'চুপ কর! ষ্টুপিড, রাস্কেল, চুপ কর বলছি।'

হীরেন উঠে দাঁড়িয়েছে। আকস্মিক স্তব্ধতায় কৃষ্ণেন্দুর বিস্মিত প্রশ্ন কি যে কর্কশ শোনালো বলবার নয়ঃ 'কি হয়েছে?'

হীরেন তার প্রশ্নের জবাব দিল না। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলল, 'শোন বাপু, সকলে মন দিয়ে শোন। এসব বাজে ছেলেমানুষী বুদ্ধি ছেড়ে দাও। ম্যানেজার বাবু তোমাদের কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তুমি যদি সেটা করে দিতে পার, তাহলে তো ভালই হয়।'

এ মন্তব্যও হীরেন কানে তুলল না। ম'বুব সকলের সামনে বসেছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি ম'বুব। দু'তিন মাস ধরে কারখানায় তোমরা নানা রকম গোলমাল করেছিলে, ম্যানেজার বাবুর যদি একটু রাগ হয়ে থাকে তোমাদের ওপর, সেটা কি অদ্ভুত ব্যাপার কিছু? আবার যখন

কাজে লাগলে, সবাই মিলে একবার গেলে না কেন ম্যানেজার বাবুর কাছে, নরমভাবে বললে না কেন ম্যানেজার বাবুকে, আগের কথা মনে করে তিনি যেন রাগ না রাখেন? মানিয়ে চলতে শেখোনি তোমরা।'

এধার থেকে ওসমান বলে উঠল, 'দু'তিন মাস ধরে কেউ কিছু অন্যায় কাজ করেনি হীরেন বাবু। যেচে ম্যানেজার বাবুর কাছে ঘাট মানতে যাবে কেন?'

হীরেন চটে গেল।—'তা যদি বলো—'

'এবার তুই চুপ কর।' কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই আলিসা'ব। হীরেন বাবু যখন কথা দিলেন ম্যানেজার বাবু আর খারাপ ব্যবহার করবেন না, বাস্‌, এইখানে সব কথা খতম হোক।'

সকলে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে হীরেন জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোনদেশী রসিকতা হল?'

'কোনটা?'

'আমার কারখানার কুলিমজুরের কাছে আমায় অপমান করা?'

'অপমান কিসের? কারখানা তোর নয়। ওরা তোর কুলিমজুর নয়। তুই ওদের।'

'আমার হয়ে সেটা বুঝি ঠিক করেছিস তুই?'

'আমি তাই ধরে নিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। ঘরে মমতা, বাইরে তুই। বেশ বাঁদর নাচাচ্ছিস দু'জনে আমাকে।'

আজ আবার একগাদা মদ খেল হীরেন। সেবার হোটেল থেকে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরে মমতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, আজ একটা বেঁটে লোকের সঙ্গে মদ খেতে গেল একটা মেয়ের বাড়ী। তিনদিন সেখানেই তার কাটল।

মমতা ড্রাইভারের হাতে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়ায় তাকে উদ্ধার করে আনল কৃষ্ণেন্দু।

তারপর থেকে হীরেন মাঝে মাঝে মদ খায়।

দিন কাটতে থাকে, হীরেনের মধ্যে মদের পিপাসা জাগবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পাঞ্জাবীর দু'পকেটে পোর্ট বোঝাই করে কোন এক মেয়ের ঘরে গিয়ে হাজির হয়। তাকে দেখেই মেয়েটির দু'চোখ লোভে জ্বল জ্বল

করে ওঠে, বাড়ীর ঘরে ঘরে অন্য মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, পাড়ায় খবর রটে যায়, সেই তিনি এসেছেন !

মেয়েটি তাকে ঘরে নিয়ে বসাতে না বসাতে বেঁটে ফর্সা নিরীহ একটী লোক হাজির হয়। আনন্দ জানায় না, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না, একবার জিজ্ঞাসাও করে না কেমন আছেন। কাল যেন তার হীরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপর সে ফিরে গিয়ে মদ পাঠাতে থাকে, ছোট বড় নানা আকারের নানা বোতলে। একে একে পাঁচ সাতটী দিন কেটে যায়, হীরেন বাড়ী ফেরে না, এ বাড়ীর বাইরেও পা দেয় না। মেয়েটীর ঘরে মদ খায় আর ঘুমায়, ঘুমায় আর মদ খায়। দু'একদিন কাটবার পরেই কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু কি ভাবে যেন আন্দাজ করে নিয়ে আসা শুরু করে, কোন কোনদিন সন্ধ্যার পর মেয়েটির ঘরে ডজনখানেক মানুষের সমাবেশ পর্যন্ত ঘটে যায়। নিরীহ বেঁটে লোকটি ইতিমধ্যে একবারও দেখা দেয় না। দুপুরে হোক, সন্ধ্যায় হোক, রাত্রি তিনটেয় হোক, খবর পাঠানো মাত্র বোতল পাঠিয়ে দেয়।

তারপর খবর আসে কৃষ্ণেন্দুর কাছে। খবর যে দিতে আসে তাকে কৃষ্ণেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'আর দু'চার দিন চালালে মরবে মনে হয় ? যদি মরতে পারে দু'চার দিনে, তবে কটা দিন পরেই যাব।'

আধঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণেন্দু মেয়েটির ঘরে গিয়ে পৌঁছয়। হয়ত দেখা যায় মেয়েটি তার চেনা, আগেও দু'একবার এর ঘর থেকেই হীরেনকে সে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

'কখানা গয়নার দাম তুললে ভাই ?' কৃষ্ণেন্দু তাকে জিজ্ঞেস করে।

'বন্ধুকেই শুধোন না ?' মেয়েটি হাসে, 'মদের দেনা দাঁড়িয়েছে।'

'মদের দেনা, তোমার দেনা, সব মিটিয়ে দেবে ভাই, ভেবোনা।'

'তা দেবে। আনা পাই হিসেব করে দেবে। মদের দামের একশো ভাগের এক ভাগ যদি আমি বখশিস চাই, বলবে, তোমায় দেবো কেন ? তুমি তো কমিশন পাবে।' বলে তুড়ি দিয়ে মেয়েটি মুখে শব্দ করে, 'ফুস্ !'

হয়তো কয়েক ঘণ্টার বিরাম গেছে, হীরেনের নেশা তখন কম। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বালিশ থেকে মাথা তুলবার চেষ্টা করে সে শুধু হাসে। খাটে উঠে জোড়াসন হয়ে বসে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'কিরে হতভাগা !'

'শনি এলে তো ?' হীরেন বলে।

'গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দয়া করে গা তুলুন।'

আগে থেকে অনুমান করে টাকা কৃষ্ণেন্দু সঙ্গে নিয়ে যায়, বন্ধুকে নিয়ে চলে আসবার আগে সব দেনা সে মিটিয়ে দেয়। টাকা সে পরে হীরেনের কাছ থেকে আদায় করে নেবে, নিজের কাজে তার অনেক টাকা দরকার, মদের দাম মিটিয়ে সে টাকা চেয়ে নিতে ভুলে যাওয়ার মত খাতির এ জগতে কারো সঙ্গে তার নেই। বেঁটে ফর্সা নিরীহ লোকটি আসে, টাকা বুঝে নিয়ে চলে যায়।

কৃষ্ণেন্দু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে; 'তোমায় কত দেব ভাই?'

মেয়েটি বলে, 'যা খুসী দিন।'

হীরেন হয়তো এতক্ষণ চোখ বুজে থাকে, কৃষ্ণেন্দু কাকে কত দিচ্ছে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মনোযোগ আছে মনে হয় না। এইবার হঠাৎ সে সজাগ হয়ে ওঠে।

'আজ কি বার?'

'বুধবার।'

'আরেক মঙ্গলবার এসেছিলাম। আজ ধরে ন'দিন। প্রথম দিন ত্রিশ টাকা, তারপর পঁচিশ টাকা করে। ওকে দুশো ত্রিশ টাকা দে।'

মুখ কালো করে কৃষ্ণেন্দুর দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে, 'দেখলেন?'

হীরেন বলে, 'দেখলেন কি? যা কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে তাই দেওয়া হচ্ছে। এক পয়সা কম দিচ্ছি যে ওকে সাক্ষী মানছ?'

কৃষ্ণেন্দু নিঃশব্দে দুশো ত্রিশ টাকা গুণে মেয়েটির হাতে দেয়। নোটগুলি হাতে নিয়ে ভয় বিস্ময় ও বিদ্বেষ মেশানো এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকিয়ে থাকে হীরেনের দিকে।

হীরেনকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ একবার নেমে যায়। চট করে বাড়ীর ভেতর গিয়ে কতকগুলি নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

হীরেন সন্দিগ্ধ মনে বলে, 'তুই ওকে টাকা দিয়ে এলি ইন্দু।'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'না। কিছু ফেলে এসেছিস কিনা দেখে এলাম।'

এতক্ষণ পরে তাকে ভয়ানক গম্ভীর দেখায়। হীরেন আজে বাজে কথা বলে, সে গুম খেয়ে থাকে। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে কৃষ্ণেন্দু বলে, 'টাকা দেবার জন্যে, কিচ্ছু ফেলে এসেছ কিনা দেখবার জন্যে, তোকে আর ফিরে যেতে হবে না। মনে থাকবে?'

তখন হীরেন কাতরভাবে তার চিরন্তন কৈফিয়ত জানায়। বলে, 'ঘরে বাইরে এত অশান্তি আমার সয় না ইন্দু।'

ছয়

কয়েকটি ছোট বড় হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে কৃষ্ণেন্দু বিব্রত হয়ে ছিল। সবগুলিই শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপার। এক সময়ে ছোট বড় এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন কল কারখানায় এত বিভিন্ন কারণে গোলমাল শুরু হতে সে কখনো ছাখে নি। নতুন চেতনার লক্ষণ আবিষ্কার করে পুলকিত হবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়। চেতনা কই? জোরালো একটা অসন্তোষ সাড়া দিচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, এইটুকু শুধু সে অনুভব করতে পারে। অধিকারের দাবী কেউ তুলছে না। কয়েকটা অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার শুধু চাইছে। তাও আবার পুরোপুরি নিজেদের ভেতরকার তাগিদে নয়!

অনেক সঙ্ঘ ও সমিতি তাদের ব্যাপারে কৃষ্ণেন্দুর হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। চেষ্টা করেও কৃষ্ণেন্দু সেখানে আমল পায় না।

'এই নিয়ে ধর্মঘট করবেন না। অনর্থক শক্তি ক্ষয় হবে।' কৃষ্ণেন্দু বলে।

'আপনি ওসব বুঝবেন না।' বলে খদ্দর পরিহিত সোণার চশমা লাগানো ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িযুক্ত সমিতি।

'বুঝব বৈকি। কাল পরশু শুরু করে দিন সাতেক ষ্ট্রাইক চালাতে পারলে ফণ্ডে কিছু টাকা আসবে।'

'তবে তো বুঝতেই পারছেন। টাকা সম্পর্কে আপনার মত জানি না, আমরা টাকাটা খুব দরকারী মনে করি। আমরা দেখেছি, টাকা দিয়ে এদের যত ভাল করা যায়, বক্তৃতা দিয়ে উপদেশ শুনিয়ে তার সিকিও হয় না। প্রোপাগাণ্ডার পেছনেও আমরা টাকা খরচ করি না যে তা নয়।'

'চিন্তামণি মিল কি খুব বেশী টাকা দেবে?'

'মন্দ দেবে না। তাই বা পাচ্ছি কোথা বলুন?'

'কিন্তু এরা যদি অর্ডারটা না পায়—ষ্ট্রাইক স্থরু হলে পাবেও না—এদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবেছেন কি? এদের কাজ কমিয়ে ফেলতে হবে। বহু লোককে ছাড়িয়ে দেবে।'

'তেমনি চিন্তামণি যদি অর্ডারটা পায়, ওদের কাজ বাড়াতে হবে। বহু লোকও নেবে।'

'খুব বেশী নেবে কি ? বাজার মন্দা চলছে, ওরা অন্য কাজ কমিয়ে দেবে। আপনারা কার লাভ দেখছেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বুঝবেন না।'

এই সময় ঝুমুরিয়া থেকে বীরেশ্বর একদিন তার সঙ্গে এসে দেখা করল। তার সাহায্য ও পরামর্শ চায়।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে একটা পাকা রাস্তা শ্রীনাথপুর হয়ে সদরে চলে গেছে। মাইল দশেক পশ্চিমে খড়্গপুরের পথ। শ্রীনাথপুর থেকে একটি নতুন রাস্তা ঝুমুরিয়ার পাশ দিয়ে নিয়ে খড়্গপুরের রাস্তায় মিলিয়ে দেওয়া হবে। ঝুমুরিয়ার আগের ও পরের মাইল পাঁচেক পথ তৈরী করে দেবার কনট্রাক্ট হেরম্ব চক্রবর্তীর। অন্য কাজের ভিড়ে নিজে সে প্রথমে রাস্তা তৈরীর কাজটার দিকে বিশেষ নজর দিতে পারে নি, এতদিন কাজও এগোয় নি একেবারেই। সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসায় হেরম্ব এবার প্রবল বেগে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে নানা অত্যাচার। রাস্তার বাকী অংশ যারা ঠিকে নিয়েছে প্রথম থেকে আশেপাশের সাঁওতাল কুলীদের তারা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। হেরম্ব আসা মাত্র তারা কাজ ছেড়ে চলে গেছে। দূর থেকে লোক এনেও হেরম্ব কুলোতে পারছে না। ঝুমুরিয়া আর আশেপাশের গ্রামের তার প্রজাদের ধরে বেঁধে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। যেখানে যার গরুর গাড়ী পাচ্ছে তাই দখল করছে। বর্ষার আগে এখন চাষের জন্য জমি ঠিক করতে হবে, জমি ফেলে রেখে বহু লোককে গাছ আর মাটি কাটতে হচ্ছে, গরুর গাড়ীতে রাস্তার মাল মশলা বইতে হচ্ছে। যেখানে একটু তফাৎ থেকে মাটি আনবার দরকার হয় সেখানে কাছাকাছি ফসলের জমি খুঁড়ে মাটি তোলা হচ্ছে, জমির মালিককে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে খতে। কুলিদের জন্য কম দামে জবরদস্তি চাল কেনা হচ্ছে। এইরকম আরও অনেক কিছু।

বীরেশ্বর এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে হেরম্বের বাড়তি ঠোকাঠুকি চলছিল। তাদের কিছু ভাল ডাঙ্গা জমি রাস্তার কবলে পড়েছে। চার বছর আগে যখন এই জমি কেনা হয়েছিল,চাষের যোগ্য দামী ডাঙ্গা জমি গণ্য করেই তখন দাম ঠিক হয়। পতিত মেঠো জমিকে চাষের জমি বলে ঘোষণা করার জন্য বীরেশ্বর এবং আরও তিনজনের নামে হঠাৎ নালিশ হয়েছে। হেরম্বর শ্বশুর জমিদার, সে স্বীকার করেছে এই জমিতে কোনদিন চাষ হত না। বীরেশ্বর যে দলিল-পত্র দাখিল করেছিল

সেগুলি কাছাকাছি অন্য জমি সম্পর্কে। রাতারাতি ওইসব জমিতে হেরম্ব ছোট ছোট কয়েকটি ঘর তুলে কয়েকজন লোক বসিয়ে দিয়েছিল, তারা ঘোষণা করছে যে বহুকাল ওইখানে তাদের বসবাস, এই জমিতে কখনো লাঙল পড়ে না, ঘর তুলবার জন্য বছরে তারা এত এত খাজনা দেয় বীরেশ্বরকে। এই যে খাজনার রসিদ।

এক রাত্রে ঘেরা জাল ফেলে বীরেশ্বরের পুকুর থেকে দেড়শ' দু'শো টাকার মাছ তুলে হেরম্ব কুলি মজুরদের বিলিয়ে দিয়েছে।

আশেপাশে আরও কুয়ো আছে। বীরেশ্বরের বাড়ির ভেতরের উঠানের কুয়ো থেকে সারাদিন খাবার জল নেবার জন্য লোক আসছিল। দু'তিন দিন চুপচাপ সহ্য করে কাটাল বীরেশ্বর, তার দুই ছেলে আর গাঁয়ের কয়েকটি লোক দা' লাঠি হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের ভেতবে ঢুকতে দেয় নি। এবার কি হবে ভগবান জানেন!

'হেরম্ব চক্রবর্তীর এত রাগ হবার কারণ কি?'

'কারণ তো সব বললাম। আমরা গাঁয়ের অনেকে একত্র হয়ে অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিচ্ছি, এইটাই আসল রাগ। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত একটা ব্যাপারও আছে।'

দু'এক দিনের মধ্যে একবার ঝুমুরিয়া যাবে কথা দিয়ে কৃষ্ণেন্দু তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। যেতে যেতে তার দেরী হয়ে গেল দিন পাঁচেক। বিকাল চারটাব সময় ঝুমুরিয়া পৌঁছে শুনল, দুদিন আগে বীরেশ্বর খুন হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দাঙ্গা বাধো' বাধো' অবস্থায় পুলিশ এসে পড়ে। বীরেশ্বরের দলকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য পুলিশ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে— তারপরেই দেখা যায়, বন্দুকের গুলি লেগে বীরেশ্বর শেষ হয়ে গেছে। পুলিশেব গুলিতে নয়, পুলিশ ফাঁকা আওয়াজই করেছিল, গাদা বন্দুক দিয়ে বীরেশ্বরকে মারা হয়েছে। পরীক্ষার পর জানা গেছে বন্দুকটি বহু পুরাণো ধাঁচের, গুলি বা ছবুরার বদলে পেরেক, লোহার টুকরো, পাথরের কুচি দিয়ে গাদা হয়েছিল। বন্দুকটি কার, কে ছুঁড়েছিল, কিছুই জানা যায় নি। আওয়াজ হওয়ার পর হৈ চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে অনেকক্ষণ কেউ একা খেয়ালও করতে পারে নি যে অন্য বন্দুক ছুঁড়ে কেউ বীরেশ্বকে খুন করেছে।

কৃষ্ণেন্দু গাঁয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি। পরদিন বেলা বারোটার গাড়ীতে সে চলে এল। অন্ততঃ এক সপ্তাহ ঝুমুরিয়ায় থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে। বাড়ী পৌঁছল সে রাত দশটায়।

কনক বলল, 'রম্ভা দু'বার তোমার খোঁজ করে গেছে ঠাকুরপো।'

'রম্ভা খবর পেয়েছে নাকি?'

'খবর জানতে এসেছিল।'

রামপালের বাড়িতে খবর দিতে যাওয়ার আগে হীরেনকে সে ফোন করল। বলল, 'কিছু টাকা খসাতে হবে ভাই। কাল বারোটার মধ্যে হাজার খানেকের একটা চেক ভাঙ্গিয়ে রাখিস।'

'আমার টাকা নেই।'

'রম্ভার বাবা খুন হয়েছে।'

'রামপালের বৌ রম্ভা? কবে? কোথায়?'

খবর দিতে কৃষ্ণেন্দু এত রাতে রামপালের বাড়ী যাবে শুনে হীরেন একটু ভেবে বলল, 'দাঁড়া আমিও আসছি।'

কৃষ্ণেন্দুর গলার আওয়াজ পেয়ে রম্ভা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বলল, 'ভিতরে আসেন মেজবাবু।'

একটি মাত্র বেতের মোড়া রম্ভার সম্বল। মোড়াটি হীরেনকে দিয়ে সে পিঁড়ি পেতে কৃষ্ণেন্দুকে বসতে দিল। রামপালকে আগেই জাগিয়ে দিয়েছিল, আবার সে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার উপক্রম করছে দেখে জোরে জোরে ঠেলা দিয়ে কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ক্যামনধারা মানুষ তুমি?'

উঠে বসে হাতের আড়ালে রামপাল মস্ত হাই তুলল, কৃষ্ণেন্দু আর হীরেনের সম্মান রাখতে চৌকী থেকে নেমে মেঝেতে বসে নিদ্রালস চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

রম্ভার চোখে গভীর ঔৎসুক্য এবং উৎকণ্ঠা। বারবার সে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হল না। মুখচোখের ভাব একান্ত নির্বিকার রেখে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল রামপালকে, 'তোমার শরীর কি ভাল নেই রামপাল?'

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে লজ্জিতভাবে রামপাল বলল, 'আজ্ঞে, যা বলেন।'

'সিদ্ধি গিলেছ, না?'

রামপাল চুপ।

'তুমি একটি অদ্ভুত জীব, রামপাল।' কৃষ্ণেন্দু মৃদু ও অমায়িক হাসির সঙ্গেই বলে, 'তোমার মত আর দেখলাম না। এমন আলসে অকর্মণ্য হয়ে থাক কেমন করে?'

'দিনভর কাঠ চিরি মেজবাবু।'

'আর কেউ চেরে না? তারা তো তোমার মত নিঝুম মেরে যায় না?'

এসব বাজে কথা। রম্ভার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। কৃষ্ণেন্দুকে সে জানে। যত গুরুতর বিষয় হয়, কথা আরম্ভ করতে তার ব্যস্ততা দেখা যায় তত কম, তুচ্ছ কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তত বেশী। ভেতরে সে যে খুব উদাসীন হয়ে থাকে তা নয়, বাইরে এই ভাব দেখায়। অন্যদিন হয়তো তার এই খেয়ালকে রম্ভা প্রশ্রয় দিত, আজ সে আর সবুর করতে পারল না।

'খবর পেয়েছেন কেষ্টবাবু?'

'খবর ভাল নয় রম্ভা।'

শুনে মুখ পাংশু হয়ে যায় রম্ভার।

'জানি বাবাকে জেলে দিবে, ছাড়বে নি।'

'জেল নয় রম্ভা, তোমার বাবার জেল হলে তো বলতাম, খবর ভাল। তোমার বাবা, কি জান রম্ভা,—' কৃষ্ণেন্দুকে একবার ঢোঁক গিলতে হয়,—'বেঁচে নেই।'

রম্ভার বাবা ভাল আছে এই খবরটা যেমন তাচ্ছিল্যভাবে জানানো চলে তার বাবার অপমৃত্যুর সংবাদটাও ঠিক তেমনি ভাবে জানিয়ে দেবে ভেবেছিল, রম্ভা যাতে বুঝতে পারে যে কেবল ছোটখাট ব্যাপারে নয়, মৃত্যুর মত ভয়ানক ব্যাপারেও ভাবপ্রবণতা তার কাছে প্রশ্রয় পায় না, সে পাথরের মত কঠিন। বলার সময় দ্বিধা বোধ করে, রম্ভার বাবাকে খুন করে ফেলা হয়েছে বলতে চেয়ে শুধু সে বেঁচে নেই বলে, নিজের মুখের চেহারা বদলে গেছে টের পেয়ে, কৃষ্ণেন্দু অনেকদিন পরে নিজের কাছে গ্লানিকর লজ্জা বোধ করল। নিজের তার ভাব-প্রবণতা নেই, নিজের সম্বন্ধে এই ধারণা যে তার ভাবপ্রবণতা থেকেই জন্ম নিয়েছে, এটা আর কোন মতেই অস্বীকার করা গেল না। বরং রামপালের অবিচলিত, সম্পূর্ণ না হোক প্রায় অবিচলিত, ভাব দেখে সে মনে মনে একটু ঈর্ষাই যেন বোধ করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল রম্ভা। এ আশঙ্কাও তার মনে মনে ছিল, তাই বাপকে যে তার মেরে ফেলা হয়েছে, স্বাভাবিক মরণ তার ঘটেনি, এটুকু তাকে আর বলে দেবার দরকার হল না। কৃষ্ণেন্দু কি কি বলতে যাচ্ছিল, হীরেন বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ। কাঁদতে দে।'

রম্ভা শুনতে পেয়ে কান্নার মধ্যেই বলল, 'এট্টু কেঁদে নি—এট্টুখানি কেঁদে নি।'

দুর্গা ও লক্ষ্মী একটু পরেই ঘরে ঢুকে রম্ভাকে ঘিরে বসল, নিমাই ও পরেশ দাঁড়িয়ে রইল দুয়ারের কাছে। ব্যাপারটা তাদেরও জানা ছিল, রম্ভার মড়া কান্নার অর্থদ্যোতক শব্দগুলি শুনেই তারা মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারল কি ঘটেছে। ঘটনা নয়, ফলাফলটা।

রম্ভা একা কাঁদলে হয়তো অল্পক্ষণের মধ্যেই কান্না স্থগিত করে দরকারী কথা আলোচনার সুযোগ দিতে পারত, লক্ষ্মী আর দুর্গা তার সঙ্গে যোগ দেওয়ায় কান্নার আবেগ তার ফুলে ফেঁপে উথলে উঠতে লাগল। কান্নায় ভাঁটা পড়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে রাত ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে দেখে কৃষ্ণেন্দু এক সময় বাধা দিয়ে বলল, 'শুধু কেঁদে আর কি করবে রম্ভা, কেঁদো না। এর একটা বিহিত করা চাই।'

'আর কি বিহিত করবেন কেষ্টবাবু।' রম্ভা বলল কাঁদতে কাঁদতে।

'সেই কথাই বলছি রম্ভা। কান্না থামিয়ে শোনো।'

বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টেনে রম্ভা থামল। তবু, থেকে থেকে নাক আর ঠোঁট তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, ভেতর থেকে শোক ঠেলে উঠতে চাইছে। লক্ষ্মী ও দুর্গা মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে আপশোষের আওয়াজ করতে লাগল, হৃদয়ের কোমল অস্থি যেন বেদনার ভারে মচ মচ করছে। হীরেন ভেবেছিল, বাপকে তার গুলি করে মারা হয়েছে শুনে রম্ভা না জানি কি কাণ্ডটাই করবে, এদের শোক করার রকম দেখে সে একটু থ'-ই বনে গেল। রামপালের ব্যাপারটা সে মোটেই বুঝতে পারছিল না। চোখ দুটি রামপালের এতক্ষণ ছল ছল করছিল, মুখখানা অত্যন্ত করুণ করে সে তাকিয়ে ছিল রম্ভার দিকে। আগাগোড়া সে চুপ করে আছে, কোন প্রশ্ন করে নি, মন্তব্য জানায় নি। বৌ-এর শোক দেখে সে যদি হৃদয় বেদনাতে কাতর হয়ে থাকে, উদ্যোগী হয়ে কিছু জানবার বুঝবার কৌতূহল তার নেই কেন? এবার সে বিছানার হাতখানেক পিছনে সরে বেড়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চোখ দু'টি অর্দ্ধেকের বেশী বুজিয়ে দিল। মুখে তার ফুটে রইল সেই অসহায় করুণ ভাব, দীনতার ব্যথা প্রকাশের ভঙ্গির মত। রম্ভার দুঃখে তার সমবেদনা জেগেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই অনুভূতিরই আবেশে নিজে সে যেন হয়ে গেছে বিভোর।

'তুমি যে একেবারে চুপ করে গেলে রামপাল?' হীরেন শুধোল।

'কি বলব বলুন?' রামপাল বলল, ভেজা করুণ গলায়।

'তোমার রাগ হয় না ? গা জ্বালা করে না ?'

'রাগ হলে আর করছি কি !'—চোখ মেলে রামপাল যেন একটু সজাগ হয়ে উঠল, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাও বলি বাবু, শ্বশুরমশায়েরও বাড়াবাড়ি ছিল খানিক। হেরম্ববাবু লোক কি সোজা না মানুষটা সে হেজিপেজি যে তার সাথে গায়ে পড়ে লাগতে যাওয়া ? লাখোপতি লোক। সবাই তার বশ—পুলিশ তক্। পেটে পেটে তার প্যাঁচ। নয়তো পুলিশের ফাঁকা আওয়াজের সাথে পুরাণো গাদা বন্দুক ছুঁড়বার বুদ্ধি কি যার তার মাথায় আসে ? সে সনাক্ত হবে না। হয়তো লাইসেন নেই, কিছু নেই, কেউ জানে না সে বন্দুকের খবর।'

কৃষ্ণেন্দু ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি তবে সব শুনেছ রামপাল ? আমার মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ, এসব কথা শুনতে তোমার ভাল লাগে না।'

রামপাল নির্লিপ্তভাবে বলল, 'মুখ বুজে থাকলে কানে শুনতে বাধা কি কেষ্ট বাবু ? কথা না কইলে তো কালা হয়ে যায় না মানুষ !'

কৃষ্ণেন্দু রেগে বলল, 'কথা কইতে হয় রামপাল। বৌয়ের বাপকে একজন কুকুর বেড়ালের মত গুলি করে মেরেছে শুনলে কথা কইতে হয়। মনে মনে যদি বুঝতেও পেরে থাক বীরেশ্বর বোকামি করেছে, যেমন কর্ম তেমন ফল হয়েছে তার, তবু কথা কইতে হয়।'

শুনে রামপাল দমে গেল। ডান হাতের তালুতে একবার মুখ মুছে বিড়বিড় করে বলল, 'কি জানি কেষ্টবাবু, জানি না। হাঁ, দুঃখু হয় বৈকি আজ্ঞা, নিশ্চয় হয়। শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

তারপর রামপাল আর মুখ খুলল না। কথা কইল কৃষ্ণেন্দু। নিষ্ঠুর সরলতার সঙ্গে কাঁটাছেঁড়া সহজ ভাষায় সে বলে গেল মানুষের ব্যবহারের কথা। বীরেশ্বরের অপমৃত্যু যার নমুনা। এর চেয়ে ভীষণ, এর চেয়ে বীভৎস, এর চেয়ে মর্মান্তিক আলোচ্য বিষয় মানুষ তো আজ পর্যন্ত কল্পনাতেও আবিষ্কার করতে পারে নি, কৃষ্ণেন্দু নিজেকে সামলাতে পারল না। মানুষ ভাগ হয়ে গেল হেরম্ব আর বীরেশ্বরে : যুগযুগান্ত ধরে হাজার হাজার হেরম্বের চোরা গুলিতে কোটি কোটি বীরেশ্বর মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগল। অহরহ যে গভীর ক্ষোভ থমথম করে কৃষ্ণেন্দুর মনে, রক্তার শোকের তাড়নে আজ বুঝি তাতে ঢেউ উঠেছে, কি যে ম্যাজিক এসেছে তার কথায়। রামপালের

খোলার ঘরে আজ মাঝ রাত্রে অনায়াসে যে অদ্ভুত এক প্রভাব সে সৃষ্টি করল, উৎসাহী, চিন্তাশীল দরদী মানুষের বড় বড় আসরে প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে তা কোনদিন পেরে ওঠেনি। সে চুপ করে যাবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনে হতে লাগল, পুরাণো লণ্ঠন থেকে যেমন অবিরাম ক্ষীণ লালচে আলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনিভাবে এই মানুষটার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সারা বিশ্বের নিপীড়িত আত্মার, শুধু আজকের নয় গত এবং আগামী কালেরও, অফুরন্ত স্পন্দন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের নরনারী ক'জন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। আজ তাদের প্রথম ভারবাহী পশুর জীবনের উপলব্ধি এসেছে।

প্রতিবাদ করল রামপাল। সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'এমন করে শোকটা কি উস্কে দিতে হয় কেষ্টবাবু? রাত ভোর গোঙাতে লাগবে।'

দমকা বাতাসে যেমন ধোঁয়া উড়ে যায়, রামপালের মন্তব্যে তেমনি উড়ে গেল এতগুলি হৃদয়ের তীব্র তপ্ত অনুভূতির বাষ্প। মুখে মৃদু হাসি, দেখা দিয়েছে খেয়াল হওয়া মাত্র হীরেন তাড়াতাড়ি মুখখানা অত্যধিক গম্ভীর করে ফেলল। হাঁ বুজে আবার চোখ ছলছলিয়ে এল রম্ভার। খাল ধার থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছে ছোট জানলাটি দিয়ে, জানলার পাটে লেজ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে পোকা ধরছে একটা টিকটিকি। ওদিকে ঘুম ভেঙ্গে কাঁদছে দুর্গার ছেলে।

কথা কইতে মনে হল কৃষ্ণেন্দুর গলাটা যেন একটু ভোঁতা হয়ে গেছে।

'বেশী কাঁদাকাটা কোরো না রম্ভা। কাল এখানকার সব ব্যবস্থা করে পরশু ঝুমুরিয়া যাব। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, তোমার বাবার মরণের একটা বিহিত না করে ফিরব না।'

শুনে রম্ভা আবার কাঁদবার উপক্রম করে বলল, 'আমিও যাব ঝুমুরিয়া।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আমি তো আর তোমায় নিয়ে যেতে পারব না রম্ভা, রামপালকে বল।'

রম্ভা সজল চোখে রামপালের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্য মনে হল রামপাল বুঝি কোন জবাব দেবে না। তারপর ধীরে ধীরে সে বলল, 'তা একবার নিয়ে যেতে হবে বৈকি।'

খানিক পরে কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন বিদায় নিল, নরেশ ঘরের বাইরে দুয়ারের কাছে উবু হয়ে বসে ছিল, সেদিন মার খাওয়ার পর থেকে সহজে সে

কৃষ্ণেন্দুর ধারে কাছে ভিড়তে চায় না। যাবার সময় হঠাৎ সে আজ কৃষ্ণেন্দুর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসল। তার মনের বাষ্প তখনো উপে যায় নি।

'এ আবার কি?'

'কিছু না মেজোবাবু।'

'তুমি একটি আস্ত উল্লুক, নরেশ। ওসব ভক্তি টক্তি আমার কাছে চলবে না।'

'আজ্ঞে না।'

তখন নরম হয়ে কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলি এতদিন?'

নরেশ ঢোঁক গিলে বলল, 'হেথায় হোথায় ছিলাম। আমাকে ঝুমুরিয়া লেবেন সাথে? আমিও একচোট লড়ব মেজোবাবু।'

'কার সাথে লড়বি?'

'হেরম্ববাবুর সাথে।'

কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে হীরেনকে বলল, 'হুকুম দিলে ও এখন হারাকিরি পর্যন্ত করতে পারে হীরেন।'

হীরেন মাথা নেড়ে বলল, 'আমার সন্দেহ আছে। ছুরিটা পেটে ঠেকাতে পারবে, তারপর কি করবে বলা কঠিন। আমি ভাবছি রামপালের কথা। লোকটা এমন অপদার্থ জানতাম না।'

'ওরা সবাই এরকম। কত চেষ্টায় ওদের কাছে কতটুকু সাড়া পাই জানলে চোখে তোর জল আসত। চেহারা দেখে মনে হয় রামপালের মধ্যে বুঝি কিছু আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত, ওর সম্বন্ধে তাই বেশী হতাশা জাগে। নয়তো আর দশজনের চেয়ে বেশী অপদার্থ লোকটা নয়।'

দাওয়া থেকে নামবার আগে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে একবার ঘরের মধ্যে তাকাল। রামপাল শুয়ে পড়েছে। গানের মত মিহি সুরে রম্ভা আবার শোক শুরু করেছে। নরেশের আবেদনের জবাব দিতে ভুলে গিয়ে হীরেনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু চলে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে রামপালের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঠেলে ঠেলে তাকে জাগিয়েছে রম্ভা। জাগিয়েই একটু তফাতে সরে গিয়ে সে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুরু করে দিল। একবার সে রামপালের বুকে আসতে চায়, একটু সহানুভূতি চায় তার কাছে।

রামপাল তাকে হঠাৎ সজোরে বুকে চেপে ধরল। আবেগে অথবা ঘুম ভাঙ্গানোর রাগে বুঝতে না পেরে রম্ভা একটু ভয় পেয়ে গেল, আলিঙ্গনে দম আটকে আসায় কান্নাও বন্ধ হয়ে গেল আচমকা।

'এখন তক্ কাঁদছিস্ সোণা? আহা রে। চুক্ চুক্।'

'মুই সইতে লারছি গো, সইতে লারছি।'

'চুক্ চুক্।'

'কাল মোকে নিয়ে চল ঝুমুরিয়া। পরশু তক থাকতে লারব।'

'কাল ঝুমুরিয়া যাবি? নিয়ে যাব। সোণাটি আমার কাঁদিস নে, ঝুমুরিয়া তোকে নিয়ে যাব কাল।'

তখন নিশ্চিন্ত হয়ে রম্ভা গা এলিয়ে দিল। রামপাল তার চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। এখন কয়েকদিন, হয়তো সাতদিন, হয়তো তারও বেশীদিন, রামপাল তাকে পাগলের মত ভালবাসবে।

সাত

পরদিন রম্ভাকে সঙ্গে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া গেল। নিশুতি রাতে রম্ভাকে কথা দিয়েছিল বলে নয়, নিজে সে হিসেব করে দেখল, কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে ঝুমুরিয়া যাওয়াই ভাল। বীরেশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরিয়ার সব হাঙ্গামা যে চুকে গেছে এ ভরসা রামপালের ছিল না। হেরম্ব চক্রবর্তী কেবল বীরেশ্বরকে নিপাত করেই ভালমানুষ হয়ে গেছে কিনা বলা কঠিন। বীরেশ্বরের যোয়ান যোয়ান ব্যাটা আছে তিনটি, বাপের অপমরণকে তারা কি ভাবে গ্রহণ করেছে, একদম চুপচাপ হয়ে গেছে অথবা প্রতিশোধের অন্য কোমর বেঁধে হৈ চৈ কাণ্ড শুরু করেছে, দূর থেকে তাও ঠিকমত অনুমান করা অসম্ভব। বড় ছেলে শ্যামলাল হিসেবী ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তার ওপর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে থাকায় বিশেষভাবে সংসারীও বটে। সে হয়তো কিছু করবে না। মেজো ছেলে জীবনলাল একটু ভাবুক ধরনের, একবার সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল, তারপর বাড়ী ফিরে বিয়ে করে আবার সংসারী হয়েছিল বটে কিন্তু একটি ছেলে রেখে বৌটা তার সম্প্রতি মরে গেছে। তার এই আত্মহারা অবস্থায় সব কিছুই সম্ভব। ছোট মোহনলালের কোন সাংসারিক বন্ধন নেই, বুদ্ধি বিবেচনা আছে কিনা সন্দেহ, রক্তও যে তার

অত্যধিক গরম রামপাল তা ভাল করেই জানে। চুপচাপ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করার ছেলে সে নয়। সে যে কি আরম্ভ করেছে ভগবান জানেন। বীরেশ্বর ছাড়া ঝুমুরিয়ার আরও কয়েকজন হেরম্ব চক্রবর্তীর সঙ্গে শক্রতা করেছিল, তারা অবশ্যই ইতিমধ্যে তার অনুগত হয়ে যায়নি। সুতরাং ঝুমুরিয়ার অবস্থা এখন বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এই অবস্থায় কৃষ্ণেন্দু সেখানে চলেছে বীরেশ্বরের অপমরণের বিহিত করতে। রম্ভাকে সে কথা দিয়েছে। তার গোঁ রামপালের অজানা নয়। ঝুমুরিয়ার মানুষগুলি যদি ঝিমিয়ে পড়ে থাকে, সে গিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। নিবু নিবু আগুনে বাতাস দিয়ে দিয়ে, নেভা আগুনের ছাই-এ তেল ঢেলে, সে আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তখন ঝুমুরিয়ায় বাস করা মোটেই সঙ্গত হবে না।

রম্ভাকে একবার না নিয়ে গেলেও নয়। সবদিক বিবেচনা করে রামপাল তাই কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে ঝুমুরিয়া গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই ভাল মনে করেছে। যদি বোঝে ব্যাপার সুবিধে নয়, একরাত্রি সেখানে বাস করে কৃষ্ণেন্দু গিয়ে পৌছবার আগেই রম্ভাকে নিয়ে কলকাতা ফিরে আসবে। ফিরে যদি রম্ভা আসতে না চায়, জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কাঁদাকাটা যদি একটু করে তো করবে, উপায় কি !

এত সব চিন্তা করে সকাল আটটার গাড়ীতে রম্ভাকে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া রওনা হল। গাড়ীতে ছিল অসম্ভব ভিড়, প্রত্যেকটি থার্ডক্লাস কামরায় গরুছাগলের মত গাদাগাদি করে মানুষ উঠেছিল, চিরদিন যেমন ওঠে। ভিড় ঠেলে উঠবার সময় রম্ভা একবার এঁকে বেঁকে দুলে উঠে বিশ্রীভাবে মুখ বাঁকিয়েছিল।

দাঁতে দাঁত চেপে রামপাল শুধিয়েছিল, 'কেরে ? কোন লোকটা ?'

রম্ভা জবাব দেয়নি। শুধু মাথা নেড়েছিল।

'দেড়া ভাড়ার টিকিট কিনি ?'

'না।'

একদিকের লম্বা বেঞ্চের শেষ প্রান্তে বসেছিল মাঝবয়সী একটি স্ত্রীলোক এবং তাকে পুরুষের স্পর্শ থেকে বাঁচাতে তার এপাশে ছিল কানে আধপোড়া সিগারেট গোঁজা টেরিকাটা তার সঙ্গী। মোলায়েম হাসির সঙ্গে রামপাল সকরুণ আবেদন জানাতে সে রম্ভাকে যায়গা ছেড়ে দিয়ে দু'টি বেঞ্চের মাঝখানে নিজের বোঁচকার ওপর বসল। রামপাল কৃতজ্ঞতাও বোধ করল না, খুসীও হল না। লোকটার

চাউনি সাপের মত—মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত। স্ত্রীলোকের পাশে বসবার সুযোগ রম্ভা পেয়েছে কিন্তু এপাশে তার গোঁফওয়ালা যোয়ান মদ্দ পুরুষ। বিব্রত হয়ে পাশের মানুষকে ঠেলা দিয়ে লোকটি তার আর রম্ভার মধ্যে ব্যবধান বাড়াবার চেষ্টা করেছে বটে, একটু কাত হয়ে রম্ভার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসেছে, তবু গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে আছে খানিকটা।

এত করে বলে রামপাল, মেয়েদের গাড়ীতে রম্ভা কিছুতে যাবে না। কি যে মতিগতি ওর কে জানে। মনে মনে হয়তো সে এইসব চায়, ভিড়ের চাপ, অজানা পুরুষের বজ্জাতি, লোভাতুর দৃষ্টিপাত। মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই!

ঘন ঘন রামপাল তার মুখের দিকে তাকায়। কিছু নেই রম্ভার মুখে। গভীর বিষাদ ছাড়া আর কিছুর হদিস মেলে না। কে ছোঁয় আর কে চায় যেন গ্রাহ্যই নেই তার, ওসবে কিছু যেন আসে যায় না, মানুষের এই সব অপব্যবহার যেন উচিত অনুচিত বিবেচনার পর্যায়েই পড়ে না। এসব কৃষ্ণেন্দু ওকে শিখিয়েছে। অন্দর বাহির একাকার হয়ে যাওয়া ভাল, স্ত্রীলোকের দিকে পুরুষের তাকানো খাবারের দিকে মানুষের তাকানোর মতই স্বাভাবিক, খাদ্যে ক্ষুধাতুর, নারীতে কামাতুর। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এগোবে, ধাক্কা খেলে ধাক্কা দেবে, মাথা উঁচু করে চোখ তুলে তাকাবে। কৃষ্ণেন্দুর কাছে এই সব কথা শুনে মাথাটা রম্ভার বিগড়ে গেছে। ওই শিক্ষা সে কাজে লাগাচ্ছে মাত্র। আর কিছু নয়।

অপরাহ্নে তারা ট্রেণ থেকে নামল। ষ্টেশন থেকে ঝুমুরিয়া প্রায় দু'ক্রোশ পথ, গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। গাড়ী চলতে শুরু করলে রম্ভার মনে হল গাড়োয়ান তার চেনা।

'ঝুমুরিয়া ঘর বটে না?'

'নাহঁক। মোর ঘর পাঁচনিথে। তুমাকে চিনি তালেও মেয়্যা।'

দিব্বি গাড়োয়ানের কাছে ঝুমুরিয়ার খবর পাওয়া গেল। অন্য সব কৃষ্ণেন্দুর কাছে শোনা পুরাণো খবর, নতুন খবর শুধু এই যে ঝুমুরিয়ায় এখন কোন গোলমাল নেই। হাঙ্গামার দিন পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছিল, দু'দিন পরে আরও তিনজনকে ধরে নিয়ে গেছে। না, রম্ভার ভাই তারা নয়, রম্ভার ভায়েরা তিনজনেই সুস্থ শরীরে কাজকর্ম করছে। গাঁ এখন শান্ত, সকলে শিষ্ট ভালমানুষ হয়ে আছে।

শুনে রামপাল অনেকটা নিশ্চিন্ত হল কিন্তু পুরোপুরি খুসী হতে পারল না। মনে তার কি যেন একটা প্যাঁচ আছে, মানুষের এই নিষ্ক্রিয় ভালোমানুষী চিরদিন তার মধ্যে অসমর্থন জাগিয়ে তোলে, মৃদু অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কেবলি মনে হয়, এরকম হওয়া যেন উচিত ছিল না। নিজে সে সবরকম হাঙ্গামা এড়িয়ে চলতে ভালবাসে কিন্তু অন্যের বীর্যহীন সহনশীলতা তার সয় না। তার দিক থেকে ভালই হয়েছে যে ঝুমুরিয়া চুপ করে গেছে, রম্ভাকে ক'দিন বাপের বাড়ী থাকতে দেওয়া চলবে, কাল পরশু টেনে হিঁচড়ে তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার দরকার হবে না, কিন্তু রম্ভার ভাইগুলি, বীরেশ্বরের যোয়ান মর্দ ছেলেগুলি? ঝুমুরিয়ার পুরুষগুলি? ছি!

নতুন রাস্তা ঝুমুরিয়ার কাছাকাছি ষ্টেশনের এই পথকে অতিক্রম করে ঝুমুরিয়ার গা ঘেঁষে গেছে। মোড়ের কাছাকাছি নতুন রাস্তার কাজ এখনো কিছু কিছু চলছে। মোড়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, রাস্তা কতদূর এগিয়েছে। প্রায় সিকি মাইল দূরে বাঁকের কাছে দু'পাশে সারি সারি খোয়ার স্তূপ, আধ পেশা রাস্তায় ছোট বড় তিনটে রোলার, বাঁকের ওদিকে হয়তো আরও আছে। নবীন সামন্তের আমবাগানের প্রান্তে তিনটি ছোট ছোট তাঁবু আর তালপাতার ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী ঘর। একটি তাঁবুর সামনে ভুর করে রাখা দুরমুস, গাঁইতি, কোদাল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। পথের ওপাশে এক সারি গরুর গাড়ী, গাড়োয়ানেরা গরু খুলে প্রকাণ্ড এক শিমূল গাছের নীচে তাদের বেঁধে খড় ও জল দিচ্ছে, গলায় বাঁধা ঘণ্টার সমবেত টুংটাং শব্দ কানে আসছে অনেক মন্দিরে অনেক সন্ধ্যারতিব ইঙ্গিতের মত। একটা লরী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সশব্দে সমুখ দিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। আজের মত কাজ শেষ হয়েছে, কুলীরা অনেকে চলে গেছে, অনেকে এখনো যাচ্ছে। বাঁকের কাছে রাত্রির বিরামের ব্যবস্থায় কতকগুলি মানুষ ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। এখানে ওখানে জ্বলছে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা আগুন।

এই মোড় আর ওই বাঁকের মাঝামাঝি এক অনির্দিষ্ট স্থানের দিকে হাত বাড়িয়ে কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শোচনীয় করে দিব্‌বু বলল, 'ওই হোথা সামন্ত মশায় গুলি খেয়েছে।'

গাড়ী থেমেছিল, আবার চল্‌তে আরম্ভ করল। রম্ভা একটু কাঁদল। গভীর উপভোগ্য বিষাদ ঘনিয়ে এসে রামপালের মন হয়ে গেল উদাস। চর্চা করে করে

তার অল্পশিক্ষিত মনের কল্পনা আশ্চর্যরকম উর্বর হয়ে উঠেছে। সামান্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণকে আশ্রয় করে তার মানসচক্ষে ঘটনা ও আবেষ্টনীর ছবি ফুটে ওঠে। আসন্ন সন্ধ্যায় এই গেঁয়ো পরিবেশ, রম্ভার মনোবেদনার ছোঁয়াচ আর সেই সঙ্গে কল্পনায় আম জাম শাল পিয়ালের সবুজ দৃশ্যপটে দিনান্তের আবছা আলোয় মুখোমুখি দু'দল মানুষ। বীরেশ্বরের বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী দাঁড়ানো পর্যন্ত রামপালের চোখের সামনে বীরেশ্বর কেবলি অতর্কিতে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল।

গাড়ী থেকে নেমে রম্ভা বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার ক্ষণেক পরেই চার পাঁচটি নারী কণ্ঠে কান্না ধ্বনিত হয়ে উঠল। কারা কাঁদে? কেন কাঁদে? ও, বীরেশ্বরের মেয়ে, বৌ ও ছেলের বৌরা শোক করছে। অন্যমনা হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে রামপাল তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

পিঠাপিঠি দু'ভায়ের মধ্যে বয়সের তফাৎ যত কম হওয়া সম্ভব, শ্যামলাল ও জীবনলাল ততটুকু ছোটবড়, কিন্তু দু'জনের চেহারা থেকে সেটা অনুমান করা যায় না। বত্রিশ বছর বয়সে শ্যামলাল ভুঁড়ি বাগিয়ে মাংসপেশী ঢিল করে মুখে ভারিক্কি ভাব এনে নিজের চেহারাটি দাঁড় করিয়েছে চল্লিশ পেরোনো গেরস্তের মত, জীবনলালকে তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। বাপের মত তার শক্ত বাঁধুনির জোরালো দেহ। শ্যামলাল রোগা এবং লম্বা। নতুন গোঁফ তার এখনো তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে যায়নি। অশৌচের খাওয়া, জামাই বাড়ী এলেও অল্পসময়ের মধ্যেই সংক্ষেপে সব চুকে গেল। বড়ঘরের দাওয়ায় চাটাই পেতে তারপর কথা বলতে বসল রামপাল, রম্ভার তিন ভাই এবং তাদের খুড়ো কাশীশ্বর। ছোট কলাবাগানটির ওপাশেই কাশীশ্বরের ঘর। তার অপরিপুষ্ট শীর্ণ দেহে আর পরণের ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে দারিদ্র্যের ছাপ অতি স্পষ্ট। একটু ভাল অবস্থার ভাইপোদের সঙ্গে বসে আলাপ করার ভঙ্গিটাও খাপছাড়া রকমের বিনয়াপন্ন।

খুড়োর দিকে পিছন ফিরে বসে তামাক টানতে টানতে শ্যামলাল ধীরে ধীরে গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারের ইতিহাস রামপালকে বিশদভাবে শুনিয়ে দিল। শুনতে শুনতে রামপালের মনে হল, সে যেন একটু হেরম্ব চক্রবর্তীর দিকে টেনে কথা কইছে, একেবারে সমর্থন করতে না পারলেও খুব বেশী দোষ দেখতে পাচ্ছে না লোকটার। আহা, হেরম্ব চক্রবর্তী কি আর ভালমানুষ দেবতা, তা বলছে না

শ্যামলাল। ওসব লোক ওইরকম হয়। বীরেশ্বর বেশীরকম বাড়াবাড়ি করেছিল। অতটা না করলেই হ'ত।

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কিছুটাক্।' কাশীশ্বর সায় দিল।

'কিসের বাড়াবাড়ি?' ঝাঁঝালো সুরে মোহনলাল জিজ্ঞেস করল। শ্যামলাল একবার তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, কোনজবাব দিল না। হুঁকোটা কাশীশ্বরের কাছে বেড়ায় ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখে উঠে একবার ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এল।

না, হেরম্ব চক্রবর্তীকে পিতার হত্যাকারী বলে ধরে নিতে শ্যামলাল রাজী নয়। কার বন্দুক কোথা থেকে কে ছুঁড়েছিল না জেনে আন্দাজে একজনের ঘাড়ে দোষ চাপালেই তো হয় না। দোষ কার সঠিক জানা গেলে তাকে শাস্তি দেবার জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয় করে পথের ভিখারী হতে সে রাজী আছে, জীবনটাই নয় দিয়ে দেবে। কিন্তু অন্ধকারে ঢিল সে ছুঁড়বে কোনদিকে, কার দিকে?

'সে নয় তো কে ছুঁড়বে বন্দুক?' মোহনলাল মন্তব্য করল।

শ্যামলাল মাথা নেড়ে বলল, 'কে জানে কে ছুঁড়বে। শত্তুর কি একটা ছিল, লোকের পেছনে লাগা রোগ ছিল বাবার।' সজোরে শ্যামলাল নিঃশ্বাস ফেলল। —'ভগবান আছেন। মোদের যে সর্বনাশ করেছে সে ধরা পড়বে। পুলিশ খোঁজ করছে।'

'পুলিশ! পুলিশ ও ব্যাটার দলে।'

মোহনলাল এক একটা ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঝাঁঝালো মন্তব্য করে আর মুখ ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অন্ধকার উঠানের দিকে। মনের জ্বালার তাপে মুখ চোখের যে অবস্থা হয়েছে ছেলেটার, একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলে তেমন হয়। একটু উস্কে দেবার কেউ থাকলে যে কোন মুহূর্তে সে গিয়ে হেরম্বকে খুন করে আসতে পারে।

জীবনলাল কম কথা কয়। সে বলল, 'মোরাও তলে তলে সাক্ষী প্রমাণ খুঁজছি। কেষ্টবাবু এসে পড়লে শলা পরামর্শ মিলত। দাঙ্গার ব্যাপারটাতে মোদের জড়িয়ে দিলে মুস্কিল হয়ে যাবে।'

শ্যামলাল যেন একটু জোর দিয়েই বলল, 'মন করে যে তা জড়াবে না। অ্যাদ্দিনে তবে টেনে লিয়ে যেত।'

দাঙ্গা হয়নি, বাধবার উপক্রম শুধু হয়েছিল। মোট যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাকি দাঙ্গা করার অভিযোগেই চালান দেওয়া হবে। ওরা

আটজনেই অবশ্য হেরম্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সেদিন ঘটনাস্থলে সকলে তারা উপস্থিত ছিল না। শ্যামলালদের তিন ভাইকে কেন যে ধরা হয়নি এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয়েছে সকলের।

শ্যামলাল সেদিন গাঁয়েই ছিল না সত্য কিন্তু বৈকুণ্ঠ দাসও তো ছিল না গাঁয়ে, তাকে দু'দিন পরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জীবন ও মোহন বাপের সঙ্গেই ছিল, ওদের দু'জনকে পুলিশ অনায়াসে ধরতে পারত। সত্য কথা বলতে কি, বীরেশ্বরের ছেলেরা রেহাই পাওয়ায় গাঁয়ের লোক, বিশেষ করে যাদের ধরা হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের ওপর নাকি একটু চটে গেছে। পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বের মানে তারা বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে দু'একজন করে গ্রাম থেকে আটদশজন লোক এসে বীরেশ্বরের ঘরের দাওয়ায় জড়ো হল। তাদের মধ্যে কেউ কৃষ্ণেন্দু কবে আসবে জানতে এসেছে, কৃষ্ণেন্দু এসে পড়েছে শুনে কেউ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে কৃষ্ণেন্দুর প্রতীক্ষা করছে টের পেয়ে রামপাল একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। গ্রামে কৃষ্ণেন্দুর যাতায়াত খুব বেশী নয়, গ্রামের লোকের ওপর তার এতখানি প্রভাব সে কল্পনা করতে পারেনি। অনেকদিন থেকে মুখে মুখে কৃষ্ণেন্দুর বিষয়ে নানা কথা গ্রামে রটেছে, তার সম্বন্ধে গ্রামের লোকের ধারণা গড়ে উঠেছে সেই সব শোনা কথাকে ভিত্তি করে। কৃষ্ণেন্দুর অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি ত্যাগ ও ক্ষমতায় এদের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই, কল্পনায় বড় হতে হতে কৃষ্ণেন্দু এদের কাছে প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠেছে। সকলের কথায় এই মনোভাব-টাই প্রকাশ পেতে লাগল যে কৃষ্ণেন্দু একবার এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যেখানে থেকে যাদের জন্য কৃষ্ণেন্দু কাজ করছে এদের মত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাদের মধ্যেও রামপাল কখনো দেখতে পায় নি। নিজেদের গোলমাল মিটিয়ে দেবার ভার কৃষ্ণেন্দুর হাতে তুলে দেবার জন্য এমন আগ্রহও তাদের দেখা যায় না।

মন দিয়ে সকলের আলাপ আলোচনা শুনতে শুনতে একটা ব্যাপার রামপাল টের পেয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু এসে হেরম্বের অন্যায় অত্যাচারে প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করবে বলে সকলে তার পথ চেয়ে নেই। অত্যাচার যা হয়ে গেছে তার প্রতিকারের জন্য সকলে তারা বিশেষ উৎসুক নয়। আর যেন অত্যাচার না হয়, শান্তিতে ও স্বস্তিতে তারা যেন দিন কাটাতে পারে, এইটুকু শুধু সকলে চায়। কৃষ্ণেন্দু এসে এ ব্যবস্থাটুকু করে দিক্।

কৃষ্ণেন্দু এসে সন্ধির বদলে লড়াই করতে চাইলে এরা সেটা কি ভাবে গ্রহণ করবে ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত্রে রামপালের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, শ্যামলাল এসে নীচু গলায় বলল, 'ঘুমুলে নাকি হে?'

'নাহ্ঁক।'

শ্যামলাল বিছানার ধারে বসল।

'সবার সামনে বলতে পারি নি, ভেতরে ব্যাপার আছে অনেক। ধরে আমাদের নিয়ে যেত তিনজনাকে, অনেক কষ্টে সামলেছি। হেরম্ববাবুর কাছে গেছলাম।'

'বটে?'

'বাবার জন্যে আপশোষ করলেন ঢের। আর বললেন, মোদের মাপ করেছেন। পুলিশকে সামলেছেন উনি। নয়তো তিন ভাইকে মোদের ঘানি টানতে পাথর ভাঙ্গতে হত পাঁচ সাত বছর।'

খানিক অপেক্ষা করে রামপালের সাড়া না পেয়ে শ্যামলাল আবার বলল, 'কি করি বল? সংসার এখনে ঘাড়ে চাপল মোর, আমি ছাড়া দায়িত্ব কার! সবাই মিলে উচ্ছন্ন যাব, ভেবে চিন্তে গিয়ে তাই ঘাট মেনে এলাম বাবুর কাছে। না তো করার কি ছিল বল?'

'বটে তো।'

কিছুক্ষণ বসে শ্যামলাল চলে গেল। সেই যে ঘুম চটে গেল রামপালের, মনে হল ঘুম বুঝি আর আসবে না। রম্ভাও আসে নি। আসবার ভরসাও আর নেই। কোন ঘরে মেয়েদের সঙ্গে সে গল্প করছে অথবা কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাপের বাড়ী এলে এইরকম করে রম্ভা।

অন্ধকার ঘরে খালি বিছানায় একা শুয়ে থেকে রম্ভার ওপরে রামপালের রাগ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। অন্য কোন চিন্তা মনে তার স্থান পেল না।

কৃষ্ণেন্দুকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য ঝুমুরিয়ার কয়েকজন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে যাবে ভেবেছিল। তাদের মনে আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে সকালবেলাই কৃষ্ণেন্দুরা গাঁয়ে এসে হাজির হল। একটা গোটা দিনের চেয়ে একটা রাত ট্রেনে নষ্ট করা ভাল ভেবে হীরেন আর নরেশকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

নরেশকে সে ডাকে নি। নরেশ কিন্তু তাকে তাকে ছিল। ট্রেন ছাড়বার

মিনিটখানেক আগে সে একগাল হাসি নিয়ে তাদের কামরায় উঠে দুজন যাত্রীর মধ্যেকার তিন ইঞ্চি ফাঁকটুকু বসবার মত প্রশস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়ে গেল।

'টিকিট করেছিস?'

'ইস্! টিকিট্! পিলেটফারম টিকিট কেটেছি একটা তাই ব্যাটাদের ভাগ্যি!'

রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁকটা নরেশের চিরন্তন। পয়সা বাঁচানোটা অবশ্য তার আসল উদ্দেশ্য নয়, সর্বদা সতর্ক থাকতে আর এক দরজা দিয়ে চেকারকে উঠতে দেখে আরেক দরজা দিয়ে নেমে যেতে বড়ই তার মজা লাগে। তার মনের বাসনা কৃষ্ণেন্দুর জানা আছে। বিনা টিকিটে একদিন সে দেশদেশান্তর বেড়িয়ে আসবে,—দিল্লী বোম্বাই পুরী মাদ্রাজ সিমলা দার্জিলিং, যেখানে যেদিকে যতদূর রেলগাড়ী যায়, বজ বজ ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বাদ দেবে না। এরকম পাগলামি না থাকলে কি টেঁপিকে নিয়ে এ ছেলে পালাতে চায় কিন্তু ঘরে বসে সর্বসম্মতিক্রমে টেঁপিকে পাওয়ার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে! টেঁপিকে সে চায় নি, চেয়েছিল টেঁপিকে নিয়ে শুধু পালাতে। পরে এটা বুঝতে পেরেছিল বলেই ওকে মারার ক্ষোভটা এত কড়া হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণেন্দুর।

বড় একটা স্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, টিকিটও দেখা হয়। নীচে নেমে গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করাই নিরাপদ ভেবে নরেশ উঠতে যাবে, কৃষ্ণেন্দু তাকে চেপে ধরে জোর করে বসিয়ে দিল। আলপাকার জীর্ণ মলিন কোট গায়ে চেকারকে গাড়ীতে উঠতে দেখে নরেশ আরেকবার ব্যাকুলভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর এক হাতের জোরের সঙ্গেই বা সে পারবে কেন! মৃদু হেসে মাথা নেড়ে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'পালালে চলবে না। বসে থাক্।'

হতভম্ব হয়ে নরেশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অল্পদিন আগে কৃষ্ণেন্দু তাকে মারতে মারতে প্রায় বেহুঁস করে দিয়েছিল, সে তো ভুলবার কথা নয়। আজ আবার তাকে নিয়ে সে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলবার মতলব করেছে অনুমান করবার ব্যাকুলতায় দৃষ্টি যেন তার সেঁটে রইল কৃষ্ণেন্দুর মুখে।

চেকার কাছে এলে কৃষ্ণেন্দু তাকে ছেড়ে দিল।

'আমরা তোমার টিকিটের দাম দিতে পারব না, নরেশ, চেয়ো না কিন্তু। গোড়ায় বললে টিকিট কিনে দিতাম, এখন একটি পয়সা দেব না।'

চেকার টিকেট চায়, নরেশ একদৃষ্টে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে সে কৃষ্ণেন্দুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। দুচোখে তার তাই ভর্ৎসনা ও অনুযোগের যেন সীমা নেই। তার এই নিঃশব্দ অভিযোগের ঔদ্ধত্য এত বেশী স্পষ্ট ও অভিনব যে কৃষ্ণেন্দু মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে একটু অস্বস্তিও বোধ করতে থাকে।

'বেশ লোক আপনি!'

কৃষ্ণেন্দুকে এই কঠোর মন্তব্য শুনিয়ে নরেশ ধাঁ করে তার সার্টের পকেট থেকে এইটুকু একটি চামড়ার ব্যাগ বার করল এবং তার ভেতর থেকে অনেক ভাঁজে ছোট করা আস্ত একটি পাঁচ টাকার নোট বার করে চেকারকে শুধোল, 'চেঞ্জ হবে মশাই?'

সেই থেকে কি যে হল নরেশের, সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে গিয়ে মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে রইল। মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকায় আর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছোট স্টেশনে একদল যাত্রী নেমে যেতে জানালার ধারে গিয়ে মাথাটা বাইরে গলিয়ে বহুক্ষণ একভাবে বসে রইল। হীরেন বাড়ী থেকে দশ বার জনের খাবার সঙ্গে এনেছিল, পথে উপোস করে মারা যাওয়ার আতঙ্কটা তার অতিশয় প্রবল। খাবারের ভাগ নিয়ে নরেশ আনমনে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মুখে পুরতে লাগল। খিদেও যেন তার পায় নি।

কি যে খাপছাড়া মনের গতি এসব পাগলাটে ছেলের! মেরে রক্তপাত করে দেওয়ার পর দেখা হতে যে ভক্তি-গদগদ চিত্তে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসেছিল, সামান্য একটু শিক্ষা দেবার চেষ্টা করায় আজ সে অভিমানে আত্মহারা হয়ে গেছে। কিন্তু অভিমান যদি করে থাকে অভিমানের কথাই কিছু বলুক, অনুযোগ দিক। কৃষ্ণেন্দু ধৈর্য হারিয়ে ফেলল।

'টাকা কোথায় পেলি?'

'চুরি করেছি।'

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে কৃষ্ণেন্দুর মুখে কথা সরল না।

'পরের স্টেশনে পুলিশ ডাকবেন না?'

এ তো অভিমান জানানো নয়, রীতিমত গায়ের ঝাল ঝাড়া। নরেশ যে তার মুখের ওপর ওভাবে কথা বলতে পারে কৃষ্ণেন্দুর দুঃস্বপ্নেও তা সম্ভব হতে পারত কি না সন্দেহ। ছেলেটার কথার ঝাঁঝে হীরেনও থ' বনে রইল। থেমে থেমে মন্থর গতিতে প্যাসেঞ্জার গাড়ী চলেছে। লোকাল প্যাসেঞ্জাররা নেমে গিয়ে

একটু জায়গা হয়েছিল গাড়ীতে, গুটিসুটি হয়ে কোনরকমে শোয়া চলে। শোয়ার আগে কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ আশ্চর্যরকম মোলায়েম গলায় বলল, 'কাজটা একটু অন্যায় হয়ে গেছে নরেশ। অত ভেবে দেখি নি।'

নরেশের কাছে এইভাবে একরকম ক্ষমা চেয়ে কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ঘণ্টা দুই পবে একবার ঘুম ভেঙ্গে ছাখে, নরেশ ওপাশেব বেঞ্চে গিয়ে শুয়েছে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হয়, ছেলেটা তাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছে, এ জীবনে কখনো সে আর তার মন পাবে না। সে গভীর বিষাদ অনুভব করে, সেই সঙ্গে অপবাধ করার একটা কষ্টকর অনুভূতি। ভগবানের মত ভক্তকে কষ্ট দেবার স্বভাবটি সে কেমন চমৎকার আয়ত্ত করেছে! কত অন্যায়ের পাশ কাটিয়ে চলে, তাকে যে মানে না তার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা কখনো করে না, শুধু যে অনুগত তার ভাল করাব উগ্র চেষ্টায় চটকে চটকে সম্পর্কটা তিতো করে দেয়। কত সে সাবধানী আর হিসেবী! যেখানে অধিকাব আছে জানে, যেখানে ধরে মাবলেও প্রতিবাদ আসবে না জানে, সেইখানে দেখায় বাহাদুবী। শুধু কথা বলে যদি কাজ হয় তাতে তার মন ওঠে না, জমকালো প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

সকালে দেখা গেল, কৃষ্ণেন্দুর আশঙ্কাটাই ঠিক, ক্ষমা চেয়ে নবেশের মন ভেজানো যায় নি। কাছে থেকেও সে যেন এক যোজন দূরে সবে গিয়েছে। ঝাঁঝাঁলো কথা সে আর বলল না, অবিশ্বাস্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুকে থেকে থেকে নিরীক্ষণও করল না। কথাবার্তা চালচলন তার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। তবু বেশ বোঝা গেল কৃষ্ণেন্দুর বিরুদ্ধে মন তার ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার অতিরিক্ত ভদ্র ও সংযত ব্যবহারে পদে পদে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল।

কৃষ্ণেন্দুর একটি হাসির কথায় হীরেন হেসে আকুল হয়ে গেল, নবেশের মুখের একটি রেখাও বাঁকল না। তখন আর কোন ভরসাই রইল না যে কৃষ্ণেন্দুকে সে আর কোনদিন ভক্তি করবে।

সারাটা দিন সময় আছে ভেবে শশাঙ্ক কৃষ্ণেন্দুদের অভ্যর্থনার কোন আয়োজনই করে নি। আয়োজন আর কি, দাড়িটা কামিয়ে ফর্সা একখানা কাপড় পরে নিজে একটু ফিটফাট হয়ে থাকত, বাগান ও সদরটা একটু সাফ করিয়ে রাখত।

অতিথির আদর যত্নের অন্য সব আয়োজন করবার ক্ষমতা কই, সে অক্ষম, তার উপার্জন নেই। হীরেনরা কেউ দু'চার দিনের জন্য দেশে এলেও বাড়ীতে পা দিয়েই খরচপত্রের কয়েকটা টাকা শশাঙ্কের হাতে দেয়। শশাঙ্ক তাই দিয়ে তাদের খাতির যত্ন করে। সবটা দিয়ে নয়, কিছু পারিশ্রমিক সে রাখে বৈকি! এবার কৃষ্ণেন্দু তাকে বড় বিপন্ন করল। বাড়ী ঢুকে দু'দণ্ড বসল না, খরচপত্র বাবদ টাকাপয়সা দিল না, পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদির জবাবগুলি ভাল করে দিতে না দিতে সঙ্গী দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বেলা বাড়তে লাগল, তার দেখা নেই। চা জলখাবারের আয়োজন করতেও তো সময় কম লাগে না গাঁয়ে। দুধ চিনি চা সব কিছুই সংগ্রহ করে আনতে হয়। কেনার লোক কম বলে সহরের চেয়ে গাঁয়ে দুধ অনেক সস্তা, কিন্তু দুধের বড অভাব গাঁয়ে। গরু যদি বা থাকে দু'চারটা, রোগা প্যাঁটকা মুমূর্ষু গরু, দুধ দেয় এই এতটুকু। বেশী বেলা হলে দুধও হয়তো শশাঙ্ক একেবারেই যোগাড় করতে পারবে না। দুপুরের খাওয়ার জন্য মাছতরকারী কিনতেও দেড় ক্রোশ দূরে লোক পাঠাতে হবে, সে সব কিনে নিয়ে এলে তবে চড়বে রান্না। শাক চচ্চড়ি দিয়ে তো অতিথিদের ভাত দেওয়া যাবে না! শশাঙ্ক এখন করে কি?

শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক বাড়ীব মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে পবামর্শ করতে গেল। দিগম্বরী সকলের সকালবেলার জলখাবারের ফেন-ভাত নামাচ্ছিল, মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'নিজের পয়সা খরচ করেই সব আনো। ঠাকুরপো তাড়াতাড়ি দরকারী কাজে চলে গেছেন, ফিরে এসে তো টাকা দেবেন? অত ভাববার কি আছে!'

তাই বটে! এই সহজ কথাটা তো তার খেয়াল হয় নি! শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত হয়ে দুধের জন্য লোক পাঠিয়ে নিজেই রাঘব মহান্তির দোকানে চা চিনি প্রভৃতি সওদা আনতে গেল।

বীরেশ্বরের বাড়ী বেশী দূরে নয়, এইটুকু পথ অতিক্রম করতে সম্ভাষণ ও প্রশ্নের বাধায় বারবার হীরেন ও কৃষ্ণেন্দুকে থামতে হল। কখন এল, কতদিন থাকবে কোথায় যাচ্ছে, বাড়ীর খবর কি ইত্যাদি সব কিছুই প্রত্যেকে জানতে চায়, পথে দাঁড় করিয়ে ধীর মন্থর অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্যে জানতে চায়। এরা ঝুমুরিয়ার ভদ্র অধিবাসী। গরীব চাষী মজুরেরা শুধু প্রণাম জানায়, দাঁড় করিয়ে আলাপ করার স্পর্দ্ধা তাদের নেই। নরেশ এক সময় কোথায় সরে পড়ল জানা গেল না।

কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন যখন বীরেশ্বরের বাড়ী পৌছল তখন বেলা হয়েছে, দ্বিতীয় দফা চায়েও আদা দেওয়ার জন্য রামপাল নিন্দে করছে গ্রাম্য রুচির।

কথার অনিবার্য ·অপচয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে চুকিয়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু কাজের কথা পাড়ল। 'সবার আগে তোমাদের সঙ্গে দু'চারটে কথা কয়ে নেওয়া দরকার মনে করছি শ্যামলাল। তোমাদেরি সর্বনাশ হয়ে গেছে বেশী। তারপর অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। চা'টা আনিয়ে দি কিছু?'

'গাড়ী থেকে নেমে স্টেশনে আমরা খেয়ে নিয়েছি, ওসব নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমরা কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করি নি।'

'কিছুই না? কোন পরামর্শ হয় নি তোমাদের?'

'আজ্ঞে না। আপনার পথ চেয়ে ছিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর নি, একি একটা কথা হল?'

হীরেন বলল, 'আহা, অত কথার মারপ্যাঁচ ধ'রো না। সেরকম পরামর্শ হয়েছে বৈকি, অনেক হয়েছে। ও বলতে চায়, পরামর্শের কোন ফল হয় নি।'

শ্যামলাল কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন বাবু। আপনা আপনির ভিত্‌রে উই ছাড়া কি কথা আছে মোদের, কিন্তু কথা কয়ে থই মিলছে না কো।'

কথা কয়ে কৃষ্ণেন্দুও থই পাবে মনে হল না। বাপের মৃত্যুকে এরা তিন ভাই কি ভাবে গ্রহণ করেছে, সেই অত্যাচারের কিরকম প্রতিকার এরা চায়, সে জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে এরা রাজী আছে, এসব মোটামুটি আন্দাজ করে নেবার ইচ্ছা কৃষ্ণেন্দুর ছিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করে একটি স্পষ্ট ধারণাও সে আয়ত্ত করতে পারল না। তিন ভাই কথা কয় তিন রকম, আবার ভিন্ন ভিন্নভাবে ধরলে প্রত্যেকের কথা উল্টোপাল্টা, পরস্পরবিরোধী, অর্থহীন। এখন একজন তার যে কথায় সায় দেয় একটু পরে একেবারে তার বিরুদ্ধ কথাতেও সে-ই আবার সর্বাঙ্গীন সমর্থন জানিয়ে বসে। ক্রমে ক্রমে যখন গাঁয়ের অনেকে এসে পৌছল এবং বিশেষ ভাবে বীরেশ্বরের মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ না থেকে হেরম্ব চক্রবর্তীর অনাচার অত্যাচার সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা আরম্ভ হল তখনও কৃষ্ণেন্দু কারো মনের কূলকিনারা খুঁজে পেল না। প্রতিশোধের বদলে নিছক প্রতিকারের ব্যবস্থাই যে

এরা তার কাছে প্রত্যাশা করছে, এটুকু বুঝতে অবশ্য তার রামপালের চেয়ে বেশী সময় লাগে নি। এটা বুঝতে তার ঝুমুরিয়া আসবার দরকার ছিল না, দূর থেকেই অনুমান করে নিতে পারত। বর্তমান অরাজকতায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এদের দেহমনের, কোনরকমে শান্তিতে থাকার উপায় না খুঁজে লড়াই করতে চাইলেই এদের পক্ষে বিস্ময়কর হত। সে কথা নয়। আরও বেশী হাঙ্গামার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাক, হেরম্বের প্রতি একটা নির্দিষ্ট মনোভাব তো এদের আছে? ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা বিদ্বেষের জ্বালা তো এরা অনুভব করে? মনে মনে কামনা তো এরা করে যে হেরম্বের সর্বনাশ হোক, সে উচ্ছন্ন যাক? সকলের এই মানসিক বিরুদ্ধতার গভীরতা আবিষ্কার করতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রাগ দুঃখ হিংসা দ্বেষ ক্ষোভ বিরক্তি অসন্তোষ সব আছে এই মানুষগুলির মধ্যে, কিন্তু দু' একজন ছাড়া—কমবয়সী দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তেজনাপ্রবণ দু'একজন ছাড়া, সকলেই যেন ক্ষমা করেছে হেরম্বকে। বীভৎস রোগে অকথ্য যন্ত্রণা পেয়ে আজ যদি হেরম্ব মরে যায়, শিয়াল কুকুরে যদি টেনে ছিঁড়ে খায় তার দেহ, সকলের হাড়ে বাতাস লাগবে। তবু তাকে আঘাত করতে কেউ চায় না।

জগৎ দাসের একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেটা হাঙ্গামার দিন বাড়ী থেকেই বার হয় নি, সর্দিজ্বর হয়েছিল। জগৎ বলল, 'দশঘর সাঁওতাল প্রজা আছে, তাদের ছাড়িনি কো। সেই রাগে ছেলেটাকে ধরিয়েছে। বড় চড়া রাগ মানুষটার। চোখ যেন লাল হয়ে আছে জবাফুলের নাখান চব্বিশ ঘণ্টা। মাথা-টাথা বিগড়ে যাবে এবারে, পাগলা হয়ে যাবে। ঘরে বসে ওসব তন্তর সাধন কি সয় মান্ষের, বিষয়ী মান্ষের, কারবার চলে ডাকিনী যোগিনী নিয়ে!'

বিপিন কুমার সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। মানুষটা, জানো কেষ্টবাবু, নেহাৎ মন্দ ছিল নাকো। ওই করে বেঠিক হয়ে গেছে গা মাথাটা।' শিবু নন্দী সেদিন মার খেয়েছিল, বাঁ হাতটা জখম হয়েছে। পুলিশের টানাটানির ভয়ে জখমের কথা সে কাউকে বলে না, সর্বদা গায়ে চাদর জড়িয়ে গোপন করে রাখে। শিবু বলল, 'মোর কথাও তাই। বলি, সংসার যদি করবে তো সংসারী হয়ে সংসারে থাকো, না তো সন্নেসী হয়ে বনে শ্মশানে গিয়ে কর ওসব। রাতভোর মড়ার বুকে আসন পিঁড়ি বসে থেকে ভোরে সিন্দুকের পয়সা গোণা, ও হয় না কো।'

আগেও আলোচনা বহুবার বিপথে চলবার উপক্রম করেছিল, কৃষ্ণেন্দুর জন্য হয়ে ওঠে নি। এবার সে বাধা না দেওয়ায় পূরাদমে তন্ত্রমন্ত্র সাধনভজন সাধু

সন্ন্যাসীর গল্প শুরু হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুর কাটাকাটা কথা আর জেরায় সকলে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দশটা আজে বাজে খেই ছাড়া কথার মিশাল না দিয়ে এতক্ষণ একমনে কেবল একটা বিষয়ে তারা কথা বলতে পারে না, তা সে যতবড় গুরুতর বিষয়ই হোক। হেরম্বের একটি গুরু ছিলেন, একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধু। এখন তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তার অলৌকিক শক্তি ও ক্রিয়াকলাপের কাহিনী শুনতে শুনতে সকলে আরাম বোধ করে। অন্যমনে সেকথা ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণেন্দু খানিক শোনে খানিক শোনে না।

স্নানাহারের তাগিদে একসময় বৈঠক খতম হয়ে যায়। বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সকলের মুখপাত্র হিসাবে জগৎ দাস বলে, 'তবে ওই কথা রইল কেষ্টবাবু?'

'কোন্ কথা?'

হীরেন তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ ওই কথাই রইল বৈকি। চারিদিকের অবস্থা দেখে বুঝে শুনে কেষ্টবাবু যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন।'

এত বেলায় গাঁয়ের পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। গাছে গাছে শুধু হনুমানের লাফালাফি। এ অঞ্চলে খুব হনুমান দেখা যায়। কৃষ্ণেন্দু গম্ভীর বিমর্ষ হয়ে পথ চলছিল, বড় একটা নিমগাছের কাছে দাঁড়িয়ে খনিকক্ষণ সে একপাল হনুমানের লীলাখেলা চেয়ে দেখল। তিনটি হনুমতী উকুন বেছে বেছে পালের গোদার অঙ্গসেবা করছে। সে দুই হাঁটুতে হাত রেখে আরামে চোখ বুজে বসে আছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কি অপরাধে একটি সেবিকাকে সে সজোরে চড় বসিয়ে দিল। লাফিয়ে তফাতে সরে খানিকক্ষণ কিচির মিচির করে সেবিকাটি যেন অভিমান করেই গোদার দিকে পিছন করে বসল এবং সন্তানকে বুকে নিয়ে অবিকল মানুষের ভঙ্গিতে স্তন দিতে লাগল।

হীরেন বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

কৃষ্ণেন্দু চলতে আরম্ভ করে বলল, 'লিভারের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, খিদে তোর কখনো পায় না। মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাই। হেরম্বকে ওরা এত ভয় করে কেন বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ওরাও কেমন হতাশ হয়ে গেছে মনে হল শেষের দিকে।'

'আগাগোড়া শুধু ছ্যাবলামি করলি, ওদের দোষ কি? হেরম্বকে কেন এত ভয় করে সেটা তো ওদের কথাবার্তা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।'

'আমি তো পারলাম না বুঝতে।'

'হেরম্ব ধার্মিক বলে তাকে ওরা ঘাঁটাতে চায় না।'

'হেরম্ব ধার্মিক নাকি?'

'অতবড় একজন তান্ত্রিক সাধুর শিষ্য, নাম করতে লোকের গা ছম ছম করে। নিজেও নাকি সাধন টাধন করে, অমাবস্যার রাত্রিগুলি মড়ার বুকে আসন পিঁড়ি হয়ে কাটিয়ে দেয়। ওদের কাছে সে ভয়ঙ্কর ধার্মিক।'

কৃষ্ণেন্দু থমকে দাঁড়াল। ডাইনে পথের ধারে মাইলের সংখ্যা লেখা মাটিতে পোঁতা শিলের মত পাথরটিতে কে যেন তেলসিঁদুর মাখিয়েছে। একটু দূরে পুকুরের ধারে ছোট একটি মন্দির,—পুরোণো, ভাঙ্গা এবং বটগাছে ধরা।

'তাই হবে। ঠিক!'

হীরেনের অনুমানে সায় দিয়ে হিংস্র চোখে কৃষ্ণেন্দু তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে নিতে হীরেনের হাতে বার বার সিগারেটটা কেঁপে কেঁপে যায়।

'আমি পারলাম না, তুই ধরতে পারলি কেন কথাটা এত সহজে?'

'তুই ওদের সঙ্গে কথা বলছিলি, আমি ওদের কথা শুনছিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হীরেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'দেশ সম্বন্ধে কতগুলি কথা তুই ভুলে থাকিস ভাই। ধর্ম আর সংস্কার যে এদেশের মন কি ভাবে গ্রাস করে আছে খেয়াল থাকলে কেন ওকে সকলে এত ভয় আর খাতির করে তুইও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারতিস। এদেশে ধর্ম ছাড়া কথা নেই। চারিদিকে তার প্রমাণ তো দেখতেই পাস সর্বদা। ধর্মের দোহাই ছাড়া এদেশে রাজনীতি হয় না, আন্দোলন চলে না। এদেশে নেতাকে হতে হয় মহাত্মা। আধ্যাত্মিকতার স্তরে টেনে তুলতে না পারলে এদেশে কিছুই করার উপায় নেই। এটা তোরা ভুলে থাকিস্। ধর্ম আর সংস্কারের কথা শুনলে অবশ্য তোরা বাস্তবপন্থীরা অসন্তুষ্ট হোস, কিন্তু যা আছে তা আছে।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'অসন্তুষ্ট হই কিন্তু ভুলে থাকি না। উপেক্ষা করি। আমরা বলি, অন্নহীন, পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম নেই। আমরা বলি, সমস্ত সংস্কার ভাঙ্গতে হবে।'

হীরেন বলল, 'কেন বলিস? ভাষা শুধু বকবক করার জন্য সৃষ্টি হয় নি, বোঝারও কাজে লাগে। নিজের মন যা বলে শুধু সেই কথা না বলে, যাদের জন্য বলা তারা যা জানে বোঝে আর মানে সে কথা বললেই হয়! শ্রোতার ভাষা না জেনে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি? অন্নহীন পরাধীন অত্যাচারিতের ধর্ম নেই বললে যখন কেউ কানে তোলে না তখন বললেই হয় ওরকম হয়ে থাকা অধর্ম, মহাপাপ—বললেই হয় অন্নাভাব, পরাধীনতা, অত্যাচারের প্রতিবাদ আর প্রতিকারই ধর্ম।'

'তফাৎ কি হল?'

'যারা ধর্ম-খ্যাপা তারা বুঝতে পারে, সাড়া দেয়। এদেশে ধর্ম আর সংস্কারের সর্বব্যাপী প্রভাব যখন অস্বীকার করা যায় না, সে সত্যটাকে মেনে নিয়ে কাজে লাগানোই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ। কিন্তু তোদেব কথা আলাদা। ওসব কাজে লাগাতে তোদের সঙ্কোচ হয়। পাছে তার মানে দাঁড়ায় যে তোরাও মেনে নিয়েছিস, প্রশ্রয় দিয়েছিস। স্বর্গে যেতে হবে, কিন্তু ফ্যাশনেবল পথটি ছাড়া অন্যপথে তোরা চলতে রাজী নোস্।'

কৃষ্ণেন্দু একটু হাসল। নীরবে কিছুক্ষণ পথ চলে বিনা ভূমিকায় হঠাৎ বলল, 'দূরে দূরে না থেকে কাজে নেমে যা না হীরেন? আমার চেয়ে তুই ভাল কাজ করতে পারবি। আমার শুধু সখ, তোর দরদ আছে, ওদের তুই আমার চেয়ে ভাল বুঝিস।

'আমার সত্যি খিদে পেয়েছে ইন্দু।'

নিঃশব্দে বাকী পথ অতিক্রম করে বাড়ীর সামনে পৌঁছে দু'জনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন একই তাগিদে।

'কাজে নামার ইচ্ছে তোর আছে। আমি জানি।'

'তা আছে।'

'তবে?'

'ইচ্ছে থাকলেই কি হয়। আমার সংযম নেই, সহিষ্ণুতা নেই, ধৈর্য নেই। কাজে নামতে ভয় করে ভাই।'

'আজ পর্যন্ত বার দশেক প্রশ্ন করেছি। আজ তবু একটা জবাব দিলি।' বলে হীরেনকে ফেলে কৃষ্ণেন্দু হন হন করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

মাথায় কাপড় তুলে দিগম্বরী বলল, 'চান করবেন না ঠাকুরপো? তবে খেতে বসুন।'

শশাঙ্ক আমতা আমতা করে, বলে, 'হাতে একটি পয়সা নেই, খাবার দাবারের ভাল ব্যবস্থা করতে পারিনি ভাই।'

হীরেন টাকা বার করলে শশাঙ্ক হাত বাড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা চাইতে তার লজ্জা করে নি, টাকা চেয়ে হাত পেতে নিতে সত্যি তার লজ্জা করছে। চাইতে তো হয়নি কোনবার।

হীরেন টাকা বার করলে বরাবর সে বিস্মিত হয়ে গেছে, টাকা নিয়ে অনুযোগ দিয়ে বলেছে, 'কি দরকার ছিল বল ত?'

দুপুরে ঝুমুরিয়ার কয়েকটি ছেলে দেখা করতে এল। তাদের সঙ্গে দেখা গেল নরেশকে। এ পর্যন্ত নরেশের কোন পাত্তা মেলেনি. কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছে সেই জানে। অচেনা গাঁয়ের সমবয়সী অচেনা ছেলেদের দলেই বা সে কি কি করে ভিড়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না। সকলের সঙ্গে ভাবটাও যেন বেশ জমিয়ে নিয়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যে।

কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে ছেলেরা একটা শোভাযাত্রা করতে চায়। এখান থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে সমস্ত গ্রাম ঘুরে তাদের লাইব্রেরীতে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে সভা করে ছেলেরা তাকে অভিনন্দন দেবে।

'এই দুপুর রোদে?'

'আজ্ঞে না। বিকেলে।'

'তোমাদের লাইব্রেরীতে কত বই আছে?'

'একাত্তরখানা হবে। দু'টো ম্যাগাজিন নিই।'

হীরেনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণেন্দুর মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল।

'আজ নয় ভাই, কাল শোভাযাত্রা করব। দুপুরবেলা। শোভাযাত্রা করে একেবারে নতুন রাস্তায় গিয়ে হাজির হব।'

ঘরের অন্যপ্রান্তে হীরেন তাকিয়ায় পিঠ দিয়ে কাত হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে উঠে বসল।

'তাই তবে ঠিক করলি?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথমে আপোষের কথাবার্তাও বলে দেখবি না?'

'না। তাতে কোন লাভ হবে না জানি। ওরা পেয়ে বসবে, এরা আরও ঝিমিয়ে পড়বে।'

'কে জানে!'

হীরেন আর কথা কইল না। ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল, হঠাৎ যেন বিপাকে পড়ে গেছে। দু'টি ছেলে কৃষ্ণেন্দুর মুখ চেনা, কিছুদূর পড়া-শোনা করে বাড়ীতে বসে আছে। দলের হয়ে তারাই এতক্ষণ কথা বলছিল। অনাথ নামে পাঞ্জাবী গায়ে ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে খানিক পরামর্শ করে দু'পা সামনে এগিয়ে এল।

'এরা আপনার কাছে একটা কথা জানতে চায় কেষ্টদা। আপনি কোন দলে?'

'দল? কিসের দল?'

'আপনি যদি মোহনলালের দলে হন, এরা কালকের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারবে না বলছে। আপনাকে নিয়ে আমরা তাহলে বরং আরেকদিন মিটিং করব।' কৃষ্ণেন্দুর দৃষ্টি দেখে অনাথ তার দলের প্রতিনিধির উপযুক্ত গাম্ভীর্য ও ধীরতা বজায় রাখতে পারল না, একটা ঢোঁক গিলে ছেলেমানুষ সে ছেলেমানুষেরই মতই আব্দারের ভঙ্গিতে যোগ দিল, 'আজ বিকেলেই চলুন না আমাদের ওখানে?'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'বোসো দিকি সবাই। তোমরা কারা জেনে নি। একটা পাটি বিছিয়ে দে তো নরেশ।'

নরেশ সকলের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। পাটি আনতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে দিগম্বরী নিজেই একটা পাটি এনে বিছিয়ে দিল। একগাল হেসে বলল, 'বোস বাবারা, বোস। কেষ্টবাবুর কথা শোন।'

হীরেন থতমত খেয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। খাওয়ার সময় দিগম্বরী ঘোমটা দিয়ে নীরবে পরিবেশন করেছিল, তাকে এখন বাড়ীর বুড়ী গিন্নীর ভাষা সুর ও ভঙ্গিতে কথা কইতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার আগে হীরেনের দিকে চেয়ে বুড়োমানুষের মতই নিঃসঙ্কোচে দিগম্বরী বলল, 'বড় মানুষ, নামকরা মানুষ কেউ গাঁয়ে এলে ছেলেরা বড় খুশী হয়। পোড়া গাঁয়ে কেউ তো আসে না সাত জন্মে!'

কৃষ্ণেন্দু ছেলেদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের দল কোনটা?'

'এই এটা। আরও কয়েকজন আছে, তারা আসতে পারে নি।'

গাঁয়ের পনের ষোলটি কিশোর ও তরুণকে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার সে এক বিচিত্র ও গৌরবময় কাহিনী। অনাথ আর সহদেবেরই গৌরব, তারাই দলটা গড়েছে। আগে কিছুই ছিল না ঝুমুরিয়ায়। নমো নমো করে একটিমাত্র বারোয়ারী পূজো হত, সভাসমিতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, নাইটস্কুল, কিছুই ছিল না। এরা সব কিছু গড়ে তুলেছে। বছরে এখন পাঁচ ছ'টি পূজা পার্বণ উপলক্ষে উৎসব হয়, দুর্গাপূজায় এত সমারোহ হয় যে আশেপাশের সব গ্রাম হার মেনেছে। সদর থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আনিয়ে মাঝে মাঝে গাঁয়ে এরা সভা করায়। হেরম্বের কাছ থেকে একটি খেলার মাঠ আদায় করেছে, তাদের টিম এবারে সদরে কাপ খেলায় প্রথম রাউণ্ডে জিতেছিল। পালা করে এরা পাহারা দেওয়ায় গাঁয়ে এখন আর চুরি হয় না। নাইট স্কুলে চাষাভূষাদের পড়ায়। অসুখ বিসুখে সেবা করতে যায়। জঙ্গল সাফ করে, মশা নষ্ট করে, আরও কত কি যে তারা করে হিসাব হয় না।

'আগে কিছুই ছিল না কৃষ্ণেন্দু বাবু। সব আমরা করেছি।'

দুঃখের বিষয়, মোহনলালও একটা দল করেছে, চাষাভূষো ছেলেদের নিয়ে। কাজ তারা কিছুই করে না, অনাথদের দলের সঙ্গে শুধু শত্রুতা করে আর তাদের টিটকারী দেয়।

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'এই ব্যাপার? তা, তোমাদের ভিলেজ পলিটিক্স্ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই ভাই। হেরম্ববাবু বড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, তার একটা বিহিত করতে আমি এসেছি। আমি কোন দলে নই। তোমাদের দলেও নয়, মোহনলালের দলেও নয়। কাল কোন দলের প্রশেসন হবে না, গাঁয়ের লোকের প্রতিবাদের প্রশেসন হবে। এতে দলাদলির কোন কথাই নেই। আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসবে। তোমরাও এসো।'

'আমাদের একটু অসুবিধা আছে।'

'কিসের অসুবিধা?'

'আমরা—আমাদের মতবাদ অন্যরকম।'

কৃষ্ণেন্দু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'মতবাদ? এর মধ্যে আবার মতবাদের কথা আসে কোত্থেকে? একটা লোক যাচ্ছেতাই অত্যাচার করছে, ধরে বেঁধে সকলকে দিয়ে মজুরের কাজ করাচ্ছে, জমি কেড়ে নিয়ে রাস্তা বানাচ্ছে, মাটি তুলে

নিচ্ছে, এসবের যাতে প্রতিকার হয় আমরা সে চেষ্টা করব। তাতে মতবাদের কি আছে ?'

'আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামের উন্নতির জন্য ভাল রাস্তাঘাটের দরকার আছে। রাস্তাটি তৈরী হলে আমাদেরই উপকার হবে।'

কৃষ্ণেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'রাস্তা তৈরী করতে আমরা বাধা দেব না। আমরা অত্যাচারের প্রতিবাদ করব।'

সহদেব রোগা ছিপছিপে ভারি সুদর্শন ছেলে। মুখখানা দেখলেই ভাল বলতে ইচ্ছা করে। সে বলল, 'ও একই কথা। রাস্তা তৈরীতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল বলেই হেরম্ববাবুকে একটু আধটু অত্যাচার করতে হয়েছে। আর বিনা মজুরিতে তিনি তো কাউকে খাটাচ্ছেন না, প্রত্যেককে মজুরি দিচ্ছেন। অবশ্য যারা গোলমাল করে তাদের বেলা—'

অনাথ বলল, 'আপনাকে সত্যি কথা বলি কৃষ্ণেন্দুবাবু, হেরম্ব চক্রবর্তীকে আমারও পছন্দ করি না। তবে এক্ষেত্রে আমাদের পলিসি হচ্ছে, চুপ করে থাকা। রাস্তাটা হচ্ছে, হয়ে যাক। অন্য ব্যাপারে হলে হেরম্ববাবুব অত্যাচার আমরাও সহ্য করতাম না, অনেক আগে আমরাই একটা বিহিত করতাম। আমরা রাস্তা চাই। বর্ষাকালে তিন চার মাস এখানকার রাস্তায় সাইকেল পর্যন্ত চালান যায় না।'

'কি হবে সাইকেল চালিয়ে ? রাস্তা দিয়ে ? গরু ছাগলের চলতে ফিরতে সাইকেল লাগে না, ভাল রাস্তারও দরকার হয় না।'

ছেলেবা চুপ করে থাকে। কৃষ্ণেন্দু মনে মনে নিজের ওপর বিরক্ত হয়। এদের মেজাজ দেখিয়ে, কড়া কড়া কথা শুনিয়ে লাভ কি ?

আবার সে বলে, 'এই সোজা কথাটা কি তোমরা বুঝতে পার না ? রাস্তাঘাটের উন্নতি, লাইব্রেরী, নাইটস্কুল, পূজাপার্বন এ সবের কোন মানে হয় না, গাঁয়ের লোক যদি মানুষ না হয়, যদি শুধু মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করে যায় ? রাস্তাটা কি হেরম্ব তৈরী করে দিচ্ছে ? ঘরের পয়সা খরচ করে ? না, গাঁয়ের লোকের সুবিধার জন্য তৈরী হচ্ছে ? ওদের সুবিধার কথা কর্তারা ভাবলে অনেক আগেই রাস্তা তৈরী হয়ে যেত। রাস্তা হচ্ছে ভালই। কিন্তু ওটা হেরম্বের অনুগ্রহ বা দান ভাবছ কেন ? হেরম্ব তো কন্ট্রাক্টে মোটা টাকা লাভ করবে। রাস্তার জন্যে সকলের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় হবে। এতকাল যে রাস্তাটা হয়নি সেটাই তো হয়েছে ওদের মস্ত অন্যায়।

আজ রাস্তা তৈরীর নামে কড়া জুলুম চলবে আর তোমরা মুখ বুজে থাকবে? দলাদলি বড় হবে তোমাদের? যে গাঁয়ে—' একমুহূর্ত থেমে সে যোগ দেয়, 'যে গাঁয়ে অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে জালালুদ্দিন প্রাণ দিল, বীরেশ্বর প্রাণ দিল, ক'জন জেলে গেল?'

ছেলেরা মুখ ভার করে চলে গেল। নরেশ গেল না, যেখানে বসে ছিল সেইখানে বসে পাটি খুঁটতে লাগল। কেউ কথা কয় না। দিগম্বরী এসে মুখ খুলতে গিয়ে কিছু না বলেই আবার চুপচাপ চলে যায়।

'গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলে এরা। বড় হয়ে এরা ভদ্রলোক হবে!'

'ওরা তো খারাপ ছেলে নয়?' দিগম্বরী বলে।

হীরেন বলে, 'সবাই ওরকম ভদ্রলোক হবে না ইন্দু। সূর্যও এ গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলে।'

'সূর্য? সূর্য এদের দলে থাকত না—মোহনলালের চাষা-ভূষোর দলে যেত।'

চারিদিক দুপুরের মাটিফাটা চড়া রোদ। বাইরে তাকালে দেখা যায় পাক খেয়ে খেয়ে তাপ ওপরে উঠছে, দূরত্ব দুলে দুলে চোখে লাগিয়ে দিচ্ছে ধাঁধাঁ। এই দুপুরবেলা কৃষ্ণেন্দু শোভাযাত্রা করবে, গাঁ শুদ্ধ লোককে দু'মাইল পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে হেরম্বের রাস্তায়, গরুছাগলও যখন গাছের নীচে আর ঘরের কাণাচে ছায়া খুঁজে নিয়ে ধুঁকতে থাকে। প্রকৃতিকে হিসাবে ধরতে কৃষ্ণেন্দুর চিরদিন ভুল হয়ে যায়। গরমে ঘেমে, বর্ষায় ভিজে, শীতে কেঁপে আর বসন্তে হঠাৎ সঞ্জীবিত হয়েও সে যেন স্রেফ ভুলে থাকে সূর্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

'আঁ? রোদ? হোক রোদ। রোদে সকলের তেজ বাড়বে।'

'সেরেছে!' বলে হীরেন নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে, মিট মিট করে তাকায় বন্ধুর দিকে।

'বীরেশ্বর দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিল, তুই বুঝি দাঙ্গা বাধাতে চাস?'

'বীরেশ্বরের পথটা নেওয়া কি ভাল নয়? শহিদ হতে পারব—বীরেশ্বরের কাজটাও হবে।' কৃষ্ণেন্দু পাল্টা প্রশ্ন করল তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে হঠাৎ হীরেনের মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে উঠল। কিছুদিনের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদেই তার দেহমনের স্বাস্থ্য এই শোচনীয় কৌতুক শুরু করেছে তার সঙ্গে, হৃদয়মন একটু গভীরভাবে নাড়া খেলেই মাথার মধ্যে যেন কেমন করে

ওঠে। ব্যাকুল হয়ে সে বলে, 'এদের তুই জানিস না, বুঝিস না। এরা কি ভাবে, কেন ভাবে, কি চায়, কেন চায়,—কিছু না জেনেই তুই এদের নেতা হতে চাস। নিজের খেয়াল মত যা তা একটা কাণ্ড করে এদের সর্বনাশ করে বসবি?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'পাগল হয়েছিস? আমি ইচ্ছে করে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাতে চাইব? ওটা কথার কথা বলছিলাম—যদি কোন কারণে হাঙ্গামা একটা হয়ে যায়, আমি যদি সামলাতে না পারি। আমার উদ্দেশ্য হল, সকলকে একত্র করে জোরালো আন্দোলন সৃষ্টি করা। মিটিং আর প্রসেসনটা যদি সফল হয়, একদিকে হেরম্ব ভয় পেয়ে যাবে, অন্যদিকে এদের ভরসা বাড়বে, জোর বাড়বে। ক্ষেপে আছে অনেকে, কিন্তু তারা আছে ছড়িয়ে—বীরেশ্বর ওদের একসঙ্গে আনতে পারেনি। মানুষটা রগচটা—দশজনের দাঙ্গা করার চেয়ে যে একশো জনের ধমকের জোর বেশী তা ও জানত না। এই কথাটাই মিটিং-এ ভাল করে বুঝিয়ে দেব, কোনরকম হাঙ্গামা না করেও হেরম্বকে অনায়াসে কাবু করা যায়। আমি কি আশা করছি জানিস? যারা চুপ করে আছে, যারা ভয়ে রাস্তায় খাটছে, পরশু তারা আমাদের দলে আসবে।'

'কিন্তু হেরম্ব যদি দাঙ্গা বাধায়? প্রসেসনে কি বীরেশ্বরের মত রগচটা কেউ থাকবে না?'

'সে ভয় তো আছেই।'

হীরেন ভরসা পায় না। সে জানে, কৃষ্ণেন্দু আদর্শবাদী। নতুন যুগের পুরাণো আদর্শবাদী। তার মত মানুষের এরকম মনোভাব জাগলে ফলাফলটা ভাল হয় না। আদর্শবাদীর নিজেকে আঘাত না করতে পারলে স্বস্তি জোটে না কিছুতেই। কৃষ্ণেন্দু তাই করবে। ঝমুরিয়ার লোকেদের কি উপকার হবে সেটা এখন জানেন ভগবান, কৃষ্ণেন্দু ভয়ানক একটা কিছু করবেই। এমন একটা আঘাত সে হেরম্বকে দেবে যার প্রতিঘাত অন্য কাউকে স্পর্শ করুক বা না করুক তার গায়ে এসে লাগবেই।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণেন্দু গাঁয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল দাঙ্গা। পুলিশকে বলে দিতে হবে না কার জন্য দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গাটাও কৃষ্ণেন্দু ভালভাবেই বাধাতে চায়। দুপুরের রোদকে পর্যন্ত সে লোকের মাথা গরম করার কাজে লাগাবে।

'ব্যাপার কি ভয়ানক দাঁড়াতে পারে ভেবেছিস?'

'ভেবেছি বৈকি। ওই ভয়ে তো চুপচাপ বসে থাকা যায় না?'

'দশ বিশটা খুন হতে পারে।'

'তা হতে পারে। নাও হতে পারে।'

ঘরের ঠিক বাইরে টুপ করে একটা আম খসে পড়ার শব্দ কানে এল। সিগারেট টানতে টানতে দু'বার কথা বলতে গিয়ে হীরেন চুপ করে গেল। সেও বাইরে থেকে এসেছে, দাঙ্গাকারীদের নেতা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। অন্ততঃ আগামী দশটা বছর হাজতবাস না করে তার আর বোধ হয় উপায় নেই। মুখ থেকে সিগারেট নামাতে গিয়ে হাতটা থর থর করে কাঁপছে দেখে হীরেন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণও হল। এত বেশী ভয় তো সে পায়নি! অথবা মনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলছে তাকেই ভয় বলে?

এমন সময় নরেশের সঙ্গে এল রম্ভা। হেরম্ব সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দু ঠিক কি ঠিক করেছে জানবার জন্য সে উতলা হয়ে উঠেছে, বেলা পড়ার জন্য ঘরে বসে অপেক্ষা করতে পারে নি। কদিনে তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, সেই মুখ রোদের ঝাঁঝে লাল হওয়ায় লাবণ্যের এমন ক্ষতি হয়েছে যে দেখলে আপশোষ জাগে। রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে আছে। গায়ে জামা দেয় নি, আঁচলটাও জড়িয়েছে অসতর্ক-ভাবে। রম্ভার এমন মূর্তি হীরেন কখনো দেখেনি। হঠাৎ সে মদের পিপাসা অনুভব করে, যে পিপাসা আজকাল মন নাড়া খাবার সঙ্গে এমনি হঠাৎ ক্ষীণ ভাবে জাগে আর মিনিটে মিনিটে জোরালো হতে হতে একেবারে অদম্য হয়ে দাঁড়ায়, অকথ্য যন্ত্রণায় কেবলি সাধ হতে থাকে মদের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবার। এক মুহূর্তে হীরেনের মুখ পাঁশুটে হয়ে যায়, স্নায়ুগুলি শির শির করে ওঠে। কাল যদি তার কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে যেতে হয়, মদ সে পাবে কোথায়! মদ না খেলে তার চলবে না। আজ তার সব খেয়াল আছে, কালও হয়তো কিছু কিছু থাকবে, কিন্তু পিপাসা বাড়তে বাড়তে পরশু তো তার কাছে আত্মীয় বা বন্ধু বলে কিছু থাকবে না, সমাজ সংসার শূন্যে মিলিয়ে যাবে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে থেকে সে নিজের সাময়িক অসহ্য যন্ত্রণা সারায়, মদ তার ওষুধ, চিকিৎসা। মদ না পেলে সে যে পাগল হয়ে যাবে একেবারে!

'শোভাযাত্রা করে কি করবেন কেষ্টবাবু?' রম্ভা জিজ্ঞেস করল।

'দেখি কি করি।'

'দশজনে মিলে চেঁচিয়ে গাঁয়ে পাক দিয়ে এলে ও লোকটার কি হবে! মোর বাপের মরণের আসল বিহিত কিছু করুন কেষ্টবাবু, পায়ে ধরি আপনার।

'আসল বিহিত ? আসল বিহিত মানে কি রম্ভা ?'

'ওকে—ওকে—, ওর নাক কান কেটে দিন, দু'চোখ কানা করে ফেলুন, সবার সামনে খোঁটায় বেঁধে চাবকে দিন। দু'রাত ঘুমোইনি কেষ্টবাবু, ও লোকটার কথা ভাবলে মাথায় আগুন ধরে যায়।'

রম্ভার দু'চোখ জ্বল জ্বল করে, সত্যই যেন চোখের আড়ালে মাথার মধ্যে তার আগুন ধরে গেছে। মুখপোড়া ভগবান তাকে মেয়েমানুষ করেছে, তার ভাইগুলোকে করেছে মেয়েমানুষের বাড়া, নইলে কুকুর বেড়ালের মত তার বাপকে মেরে হেরম্ব কি আজও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে পারে বুক ফুলিয়ে! রম্ভা তাকে দেখে নিত। একচোট দেখে নিত রম্ভা তাকে। ঠোঁটে চেপে চেপে, দাঁতে কেটে কেটে রম্ভা বলে আর তার সেই তেজের প্রকাশ দেখে হীরেন মুগ্ধ হয়ে যায়। প্রথমে রম্ভার শুধু ছিল শোক আর বাপের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাধারণ স্বাভাবিক বিদ্বেষ; সুর করে মড়াকান্নার সঙ্গে কতগুলি ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিতে দিতেই যার জ্বালা কমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রম্ভার জ্বালা যেন হীরেনের মদের পিপাসার মতই ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দিবারাত্রি এই এক চিন্তা তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়ায়, হেরম্বকে শাস্তি দেওয়া। আর কিছু সে ভাবে না, ভাবতে পারে না।

হীরেন বলতে যায়: 'কিন্তু হেরম্ব যে তোমার বাপকে মেরেছে রম্ভা—'

'কে মেরেছে তবে ? কে মেরেছে ?'

তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় রম্ভা যেন আর্তনাদ করে ওঠে। তার চীৎকার শুনে দিগম্বরী ছুটে এসে থমকে দাঁড়ায়। রম্ভা গ্রাহ্যও করে না, গলা একটু নামিয়ে বলতে থাকে আপনারা পুরুষ মানুষ, প্যাঁচালো কথা কয়ে এড়িয়ে যেতে সরম লাগে না ? সিধে কথা বলুন না, পরের জন্য কেন বিপদ ঘাড়ে করবেন!'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'আহা মাথা গরম কর কেন ? তোমার মনের মত ব্যবস্থা করব।'

'কি ব্যবস্থা ?'

'বোসো। বলছি। মাথা ঠাণ্ডা কর আগে।'

দিগম্বরী মুচকে হেসে সরে গেল। সরে গেল বাড়ীর একেবারে অপর প্রান্তে, সেখান থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে প্রতিবেশিনী কার সঙ্গে কথা বলে গলার আওয়াজ কৃষ্ণেন্দুর কানে পৌঁছে দিল, তারপর নিঃশব্দ দ্রুতপদে ফিরে এল এ ঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুধু বোঝা গেল

কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে, কথাগুলি শোনা গেল না। হাসিমুখে ঘাড় কাত করে সে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু গলা কৃষ্ণেন্দুর চড়ল না। মুখে হাসি নিয়েই দিগম্বরী তখন শোবার ঘরে ফিরে গেল, শশাঙ্ককে বলল, ঠাকুরপো কি যেন মতলব আঁটছে। আমরা না বিপদে পড়ি।'

কৃষ্ণেন্দুর কথা শেষ হলে রম্ভা হতাশ ভাবে বলে, 'কিন্তু হেরম্বের কি শাস্তি হবে কেষ্টবাবু? ও নয় আর অত্যাচার না করল, সবাইকে ক্ষতিপূরণ দিল, ওতে ওর কি হবে? মোর বাপকে মেরে ওতো টেক্কা মেরে বেঁচে থাকবে, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।'

'আঁচড় লাগবে রম্ভা। বুকে আঁচড় লাগবে। কেটে কেটে লঙ্কা বাটা লাগিয়ে দেয়ার চেয়ে বেশী জ্বলবে ওর বুকটা—নিজের বুকটা—নিজের জ্বালায় নিজে পুড়ে মরবে। তুমি বুঝতে পার না, এ অঞ্চলে আর কোনদিন ও জুলুম চালাতে পারবে না, মাথা তুলতে পারবে না। কেউ আর ওকে ভয় করবে না। শুধু হেরম্ব নয়, আর যে কেউ অত্যাচার করতে আসবে, এখানকার লোকেরা জানবে কি করে এক হয়ে তার সঙ্গে লড়ে তাকে হারাতে হয়? হেরম্বকে মারলে তো একটা হেরম্ব মরবে, আর এ ভাবে আমরা সব হেরম্বকে ধ্বংস করার কাজ শুরু করতে পারব। বীরেশ্বরের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে।'

আরও কিছুক্ষণ রম্ভাকে বুঝিয়ে কৃষ্ণেন্দু বাইরে যায়। কয়েকজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ক্ষোভে ও হতাশায় রম্ভাকে নিঝুম হয়ে যেতে দেখে হীরেন বলে, 'নরেশ, তুই একটু বাইরে যা দিকি।'

কুরিয়ে কুরিয়ে তার দিকে চেয়ে নরেশ চলে গেলে হীরেন বলে, 'কেন তুমি ভাবছ রম্ভা? হেরম্বের ব্যবস্থা কেষ্ট করবে। ওর মতলব আছে। সব কথা কি ফাঁস করা চলে? তোমায় তাই বাজে কথা বুঝিয়ে গেল। কাল দেখো কি হয়।'

রম্ভাকে যেন বিদ্যুৎ ছোঁয়। চোখ দুটি তার জ্বলে ওঠে।—'কি হবে ছোটবাবু কাল?'

'দেখো। কেষ্টর মতলব ঠিক আছে।'

'কি মতলব? বলুন মোকে। পায়ে ধরি বলুন।'

একটু ইতস্তত: করে হীরেন তার আশঙ্কার কথা এমন ভাবে বলে রম্ভাকে যে

তার মানে দাঁড়ায় এই : দাঙ্গা বাধিয়ে হেরম্বকে বীরেশ্বরের মতই কৌশলে মেরে ফেলবার আশাতেই শোভাযাত্রাটা কৃষ্ণেন্দু বার করছে। কৃষ্ণেন্দুকে চেনে না রম্ভা? হেরম্বকে শেষ না করে সে কলকাতায় ফিরে যাবে?

কৃষ্ণেন্দুর দাঙ্গার পরিকল্পনার কথা শুনে রম্ভার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। নাক কান কাটা নয়, চোখ কানা করা নয়, একেবারে খুন হয়ে যাবে হেরম্ব!

'দাঙ্গা যদি না বাধে ছোটবাবু?'

'বাধবে। কয়েকজন মাথাগরম ছেলেকে তালিম দিয়ে নিয়ে যাবে। আরও কি সব আয়োজন করেছে, আমি সব জানি না।'

সুতরাং খানিক পরে কৃষ্ণেন্দু ফিরে এলে সভয় ভক্তিতে গদগদ হয়ে রম্ভা গলায় আঁচড় জড়িয়ে তার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

'আপনি সত্যিকারের মানুষ। আপনাকে গড় করি কেষ্টবাবু।'

কৃষ্ণেন্দু খুশী হয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছ তো আমার কথা? আমি জানতাম তুমি বুঝতে পারবে রম্ভা।'

বিদায় নিয়ে রম্ভা বারান্দায় গেছে, হীরেন উঠে গিয়ে বলল, 'এসব কথা কাউকে বোলো না রম্ভা।'

'তাই কি বলি ছোট বাবু!'

খুশীতে উত্তেজনায় জোরে কয়েকবার শ্বাস টেনে রম্ভা উঠানে নেমে গেছে, কৃষ্ণেন্দু বেরিয়ে এসে তাকে ডেকে বলল, 'মোহনকে একবার পাঠিয়ে দিও রম্ভা।'

থমকে দাঁড়িয়ে রম্ভা কাছে সরে এল।

'আমার ভাই মোহন?'

'হ্যাঁ, একটু দরকার আছে।'

এ দরকার যে কি দরকার অনুমান করা শক্ত নয়। কয়েকজন মাথাগরম ছেলেকে ক্ষেপিয়ে কৃষ্ণেন্দু দাঙ্গা বাধাবে। রম্ভার ভাই মোহনলালের মাথাটা যথেষ্ট গরম, তাকে দিয়ে ভালভাবেই কাজ চলবে কৃষ্ণেন্দুর। বিবর্ণ মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রম্ভা কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'একাই আসতে বোলো।'

'একা?'

'হ্যাঁ, আগে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ওর দলের কোন ছেলেটা কেমন আমি তো জানি না।'

রম্ভা বলে, 'ওতো একদম ছেলেমানুষ কেষ্টবাবু?'

কৃষ্ণেন্দু বলে, 'তোমার অন্য ভাইগুলি সত্যি মেয়েমানুষেরও অধম রম্ভা। মোহন সেরকম নয়। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে।'

রম্ভার ভীত সন্ত্রস্ত করুণ মুখভঙ্গি দেখে হীরেন মনে মনে কৌতুক বোধ করে। গোড়ায় রম্ভার উদ্ধত ঝাঁঝালো তিরস্কারের অপমানে মনটা বেশ জ্বালাই করেছিল তখন। পরের জন্য সে বিপদ ঘাড়ে করতে চায় না, পুরুষ বলে প্যাঁচালো কথা কয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে রম্ভা। রম্ভার ধারণা মিথ্যা নয় বলে, বিপদ সে সত্যই এড়িয়ে যেতে চায় বলে, রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে বলে, রম্ভার কথা ভুলে গেলেও জ্বালাটা আত্ম-গ্লানি হয়ে জ্বলছিল। এখন রম্ভাকে কাবু হতে দেখে হীরেন একটু আরাম পায়। ভাইকে রেহাই দেবার জন্য রম্ভা এবার নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুর হাতে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা শুরু করে দেবে। আড় চোখে রম্ভার ভাবভঙ্গি দেখতে দেখতে হীরেন তার ভেঙ্গে পড়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে।

রম্ভা তিনবার ঢোঁক গিলে বলে, 'গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বন্ধুর দৃষ্টি দেখে কৃষ্ণেন্দু ভাবে সে বুঝি রম্ভার অপূর্ব্ব দেহসম্পদ দেখছে। ভেবে কৃষ্ণেন্দু একটু বিরক্ত হয়।

তারপর প্রথম সুযোগে হীরেনকে একা পেয়ে দিগম্বরী হাসিমুখে সামনে গিয়ে ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করে, আপনি আমায় এত অবিশ্বাস করেন ঠাকুরপো? ও বাড়ীর রম্ভাকে যেটুকু বিশ্বাস করেন, আমায় সেটুকু বিশ্বাসও করেন না!'

'তা কেন বৌঠান, তা নয়।'

'তাই ঠাকুরপো, তাই। কেন ঢাকছেন? কোনদিন আপনার কাছে কোন অবিশ্বাসের কাজ তো করিনি ঠাকুরপো আমি!'

মুখে অল্প অল্প হাসি দিগম্বরীর লেগেই রইল, চোখের জল গাল বেয়ে নেমে এল সেই হাসিতে। হীরেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার মুখে হাসিকান্নার এই অদ্ভুত সমাবেশের দিকে। মাথা চুলকে বোকার মত একটু হাসল। দিগম্বরী সোজাসুজি কেঁদে ফেললে সে এমন বিব্রত বোধ করত না।

'কি জানেন বৌঠান, শুনুন বলি। রম্ভাকে যা বললাম সে ব্যাপারে ও জড়িয়ে আছে, ওসব কথার সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই। আপনাকে অবিশ্বাস করি বলে গোপন করিনি।'

'বিশ্বাস করেন আমাকে ?'

'করি বৈকি, নিশ্চয় করি ?'

'তবে বলুন। রম্ভাকে বলবেন, আমাকে বলবেন না, সে হবে না ঠাকুরপো। হিংসায় আমি মরে যাব দম ফেটে।' দিগম্বরী আঁচলে চোখ মুছল।

'কি হবে ওসব শুনে ?'

'ওমা! এই বুঝি বিশ্বাস করেন আমাকে ? এই বসলাম আমি এখানে, না শুনে উঠছি না।'

হীরেনের সামনে সে জেঁকে জোড়াসন হয়ে বসে পড়ল।—'নিন্ বলুন এবার চট করে। বৌঠানের কাছে কথা লুকানো, কেমনধারা ঠাকুরপো আপনি ?'

হীরেনের যেন ধাঁধাঁ লেগে যায়। দিগম্বরী আর প্রৌঢ়া গিন্নীর মত কথা বলছে না, ছেলে মানুষী করছে আহ্লাদী কচি খুকীর মত। কথা, স্বর, ভঙ্গী সব তার নিখুঁত। এই দিগম্বরীকে যে আবার গিন্নিবান্নী মনে করা কখনো সম্ভব হয়েছিল তা যেন এখন আর কল্পনাও করা যায় না।

'আপনি তো সবাইকে বলে বেড়াবেন।'

'না। সত্যি কাউকে বলব না। মা কালীর দিব্যি।'

হীরেন তখন খুব সংক্ষেপে তাকে মোটামুটি ব্যাপারটা শুনিয়ে দিল। শোভাযাত্রা করে গিয়ে হেরম্বের দলের সঙ্গে তারা মারামারি করবে। দিগম্বরী চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে সে ভাবল।

'রম্ভার বাপ বেচারাও তাই করতে গিয়েছিল, ঠাকুরপো।'

'জানি।'

'এটা কি ঠিক হবে ? আবার একজন গুলি খেয়ে মরবে, ধর্ পাকড় চলবে—'

হীরেন একটু হাসল।—'এইজন্য আপনাকে কিছু বলতে চাইনি বৌঠান।'

এতক্ষণে দিগম্বরীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। তার ব্যাকুলতা দেখে হীরেনের মনের একটা শুকনো দিক একটু ভিজে গেল। পরের জন্য মেয়েদের এমন দরদ খুব কম দেখা যায়। তাকে একটু শান্ত করার চেষ্টায়

হীরেন হাল্কা সুরে বলল, 'আমাদের জন্য ভাববেন না, গুলি খেয়ে মরলেও আমরা মরব না।'

'ওঁর যদি কোন বিপদ হয়? ওঁকে নিয়ে যদি টানাটানি করে?'

দিগম্বরী শশাঙ্কের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, তার স্বামীর জন্য! তারা মরুক, গাঁয়ের সকলকে ধরে পাকড়ে নিয়ে যাক, সেজন্য দিগম্বরীর অত ভাবনা নেই। শশাঙ্কর কিছু না হয়। হীরেনের মনটা ছাঁৎ করে উঠল। দিগম্বরী কলকাতার বাড়ীতে তাকে অনেক বিস্ময় দিয়েছে, কিন্তু সে সব যেন ছেলেখেলার ম্যাজিক দেখিয়ে ছোট ছেলেকে অবাক করা। এইবার একেবারে তার আঁতে ঘা দিয়ে তাকে সে থ বানিয়ে ছেড়েছে।

সে বলে, 'শশাঙ্কদার বিপদ হবে কেন? ওর সঙ্গে এ ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

দিগম্বরী বলে, 'পুলিশ কি তা শুনবে!'

হীরেন সায় দিয়ে বলে, 'তা শুনবে না! আমরা দু'টি নেতা যখন এ বাড়ীতে আছি—'

'ওগো মা, কি হবে!' দিগম্বরী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

এবার হীরেন যায় চটে। মনটা তার এমনিই সুস্থ ছিল না।

'দেখুন বৌঠান, ন্যাকামি করবেন না। আমরা এদিকে দশ বিশ বছরের জন্য জেলে চলেছি, হয়তো প্রাণটাও যাবে, শশাঙ্কদার কি হবে না হবে তাই ভেবে এখন থেকে আপনি মূর্চ্ছা যেতে বসলেন। শশাঙ্কদা শোভাযাত্রায় থাকবে না, যেতে চাইলেও ওকে আমরা নেব না, আপনার ভয় নেই। তবু যদি ওকে পুলিশে ধরে, ধরবে। বাড়ী বসে বসে একেবারে অপদার্থ অমানুষ হয়ে গেছে, কিছুদিন জেল থেকে ঘুরে এলে হয়তো একটু মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে।'

'মুখ সামলে কথা কইবেন ঠাকুরপো!'

দিগম্বরী ফোঁস করে ওঠে। অসহ্য ক্রোধে কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে হীরেনের দিকে চেয়ে থেকে যোগ দেয়, 'আপনাদের তুলনায় উনি দেবতা, তা জানবেন।'

'গাঁজাখোর ভিক্ষুক দেবতা।'

'দুশ্চরিত্র তো নন্? বাজারে আর কুলিবস্তিতে মেয়ে চেখে বেড়ানোর চেয়ে গাঁজা খাওয়া ভিক্ষে করা ভাল।' দিগম্বরী গটগট করে ঘর থেকে

বেরিয়ে গিয়েই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ফিরে এসে বলে দিয়ে যায়, 'গাঁজা উনি ছেড়ে দিয়েছেন, ভিক্ষেও আর বেশীদিন চাইবেন না আপনাদের কাছে।

তার তেজ দেখে হীরেন বলে, 'বাপ্‌স্‌!'

হীরেন আর কৃষ্ণেন্দু চা খাচ্ছে, শশাঙ্ক একটু লজ্জিভাবে কাছে এল।

'আমাকে একবার সহরে যেতে হচ্ছে ভাই। কটা জিনিস না আনলেই নয়।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'বেশ তো।'

হীরেন জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরছেন?'

'কাল রাতেই ফিরব, নয়তো পরশু সকালে। কদিন পরে যাব বললাম, তা উনি জোর করে আজকেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। চা ফুরিয়ে গেছে। আর সব পরে আনলে চলত, চা পরশুর মধ্যে চাই। ভাল চা আবার ধারে কাছে পাওয়া যায় না।'

হীরেনের সঙ্গে মস্ত এক প্যাকেট দামী চা ছিল, কিন্তু সে চুপ করে রইল। সহর থেকে তাদের কিছু আনবার দরকার আছে কি না জিজেস করে, হীরেনের কাছে কটা টাকা আদায় করে শশাঙ্ক চলে গেল।

'সত্যি সত্যি স্বামীকে তাহলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে!' হীরেন বলল।

'সরিয়ে দিচ্ছে মানে?'

'কাল যদি কোন হাঙ্গামা হয়, উনি যদি বিপদে পড়েন। স্বামীর জন্য এতটা মাথাব্যথা কখনো দেখিনি।'

'তুই যার স্বামী তার?'

'কখনো দেখিনি।'

হীরেন কথাটা বলে নীরবে কয়েকবার মাথা নাড়ল।

'দেখবার চোখ নেই, ইচ্ছা নেই, তাই দেখতে পাওনি। এরকম নাটুকে স্বামীভক্তি ছাড়া আর কিছু তো পছন্দ হয় না।'

'মমতার নাটুকে স্বামী অভক্তির চেয়ে বোধ হয় এটা ভাল।'

ঘনিয়ে আসা সাঁজের ছায়া, গাঢ় হয়ে আসা গুমোট। ধোয়া বারান্দা থেকে পাটি ভেদ করে যেন ভাপসা গরম উঠছে, অঙ্গন থেকে ঝাঁঝ সিধে উঠে যাচ্ছে উপরে খোলা আকাশের দিকে। জীবন আজ গুরুগম্ভীর—দু'জনের কাছে। হিরেনের কাছেও গুরুভার বটে।

'মমতার কথা নিয়ে তোর সঙ্গে কখনো আলোচনা করিনি। কেন জানিস? হয় তুই ভাববি ওর হয়ে ওকালতি করছি, নয় ভাববি আপোষ করিয়ে তোদের সুখী করার ইচ্ছায় যা মনে আসে বানিয়ে বলছি। আরেকটা কারণ ছিল। মমতা নিজেই ও ভারটা নিয়েছে। তোকে ও মানুষ করবে, তোকে সুখী করবে, নিজে সুখী হবে।'

'মানুষ করবে? ও আমায় মানুষ ভাবে না জানি। এটা জানিয়ে জানিয়েই তো আমায় মদ ধরিয়েছে, একধাপ এগিয়ে দিয়েছে মানুষ হবার পথে।'

'এটা তুই ভুল করছিস হীরেন। তোর এই দিগম্বরী বৌদির মত ভক্তিভরে পদসেবা করে না বলে তোর অভিমান জাগে, করলে কিন্তু খুশী হবার বদলে ওকেই তুই অশ্রদ্ধা করতিস। মানুষ তুই চিনিস না। তোর মূল্যজ্ঞান নাই। এর স্বামীভক্তি দেখে ধাঁধাঁ লেগে গেল? এতো অন্ধ আবেগ মাত্র! ধাক্কা খেলে, অন্য পথ পেলে সেইদিকে চলতে আরম্ভ করবে। মমতা দেশকে ভালবেসে, সর্বহারাদের ভালবেসে, তবে তোকে ভালবেসেছে। ওর কোন কোন বুঝবার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে ফাঁকি নেই, ও অনেষ্ট। তোর সঙ্গে সংঘাতটাই তার কতবড় প্রমাণ বুঝতে পারিস না? ভুল বুঝতে পারলে ও সংশোধন করে নেয়, জোড়াতালি দিয়ে চালায় না। ওর মত জেদি একগুঁয়ে তেজী মেয়ে আজ কি ভাবে নিজেকে বদলে ফেলেছে বল্‌তো? তুই যতটুকু অধিকার দিয়েছিস ততটুকু বাইরের কাজ করে খুশী আছে—চব্বিশঘণ্টা যে কাজে ও মেতে থাকতে চায়। বাকী সময় তুই যেমন চাস তেমনি হয়ে চলছে—'

'চলছে বৈকি। ধীর স্থির শান্তশিষ্ট হাসিখুশী উদার—আমার মাতলামির জন্য পর্যন্ত ক্ষোভ নেই, ক্ষমা করে চুকিয়ে দেয়।'

'হীরেন তুই মিথ্যুক। নরক থেকে তোকে তুলে নিয়ে যাবার পর আমার সামনে মমু কেঁদে ফেলছে—তুইও দেখেছিস।'

'সে তো গায়ের জ্বালার কান্না। আমায় মানুষ করতে পারছে না বলে।'

কৃষ্ণেন্দু নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার বিশ্বাস ছিল মমতা পারবে। আজ খটকা লাগছে। মানুষকেই মানুষ করা যায়, তোর মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে গেছে হীরেন।' একটু থেমে বলে, 'মমুর জীবনটাও না নষ্ট হয় তোর জন্যে!'

'কেন? ওর কুলিমজুর আছে, দুদিন বাদে আরিফ ছাড়া পাবে। আমি তো

ওকে বলে দিয়েছি দিনরাত যত খুশী কাজ করুক, আমি কিছু বলব না। বৌদির মত বৌ পেলে খুশী হতাম, তাই বলে আমি শশাঙ্কদা নই।'

কৃষ্ণেন্দু নানা কথা ভাবছিল, আরও কিছু চুপচাপ ভেবে সে বলল, 'স্ত্রী কাছে না থাক, তোর বন্ধু আছে। তুইও শশাঙ্কর দা'র সঙ্গে চলে যা হীরেন।'

'বটে?'

মনে মনে হীরেনও কথাটা ভাবতে আরম্ভ করেছিল। জেলে যাবার সখটা তার বড়ই কম।

কৃষ্ণেন্দু আবার বলল, 'তুই থেকে আর কি করবি? হাঙ্গামা হলে জড়িয়ে পড়বি শুধু। তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল।'

'সবাই বলবে ভয়ে পালিয়ে গেল।'

'কেউ তা বলবে না। এ ব্যাপারে তোর সংশ্রব কি?'

'দেখি ভেবে।'

এটা ছলনা। চলে যাবে ঠিক করেই হীরেন ভাবতে আরম্ভ করেছিল চলে যাবে কি না।

নিজেকে অপরাধী মনে করবার কোন কারণ নেই জেনেও মনটা হীরেনের খুঁত খুঁত করতে থাকে। শশাঙ্ককে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তার সতীসাধ্বী স্ত্রী, স্নেহমমতার গরজে, হয়তো বা ভালবাসারই তাগিদে। তার সঙ্গে সেও যদি সরে যায়, সে যাবে নিজের গরজে, নিজেকে বাঁচাতে। সোজা ভাষায়, বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলে নিজে সে পিট্‌টান দেবে। অথচ কথাটাও আসলে তা নয়। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তার এমন কোন বোঝাপড়া ছিল না, মৌখিক অথবা মানসিক যে রম্ভার বাপের খুন হওয়ার প্রতিবাদে কৃষ্ণেন্দু যাই করুক তাতে তার যোগ দিতে হবে। সে শুধু সঙ্গে এসেছে, তার নিজের খেয়ালে, বেড়াবার জন্য। টাকা দরকার হবে বলে কৃষ্ণেন্দু টাকা চেয়েছিল, সে টাকা দিয়েছে। এ ব্যাপারের সঙ্গে ওইটুকুই তার সম্পর্ক। সঙ্গে এসেছে বলেই যে মারামারিতেও তার যোগ দিতে হবে এমন প্রত্যাশা কৃষ্ণেন্দুর মনেও নিশ্চয় জাগে নি। তাছাড়া হেরম্ব সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দুর এই ব্যবস্থায় তার সমর্থনও নেই। সুতরাং চলে যাওয়াতে তার অন্যায় কি আছে? তাতে ভীরুতার পরিচয় দেওয়া হবে কেন, হীনতার পরিচয়?

এই সময় মোহনকে সঙ্গে নিয়ে রম্ভা আবার এল। হীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবে, আজ অথবা কাল সকালে। মোহনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর

পরামর্শ শুনবার ইচ্ছা তার নেই। ওদের শান্ত নির্বিকার আলাপ শুনলে মনটা তার বিষিয়ে যাবে। শশাঙ্ক চলে গেছে কিনা কে জানে! আজ তার একটু মদ চাই, অল্প একটু। শশাঙ্ক নেশাখোর মানুষ, হয় তো বলতে পারবে কোথায় মদ পাওয়া যায় এই ঝুমুরিয়া গ্রামে। আজ একটু মদ খেয়ে কাল কলকাতা রওনা হয়ে যাবে। তারপর বেশী করে খাবে মদ।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে দিগম্বরী গা খানিকটা উদ্‌লা করে পাখার বাতাস খাচ্ছিল, আনমনে ঠোঁট কামড়ে প্রাচীর-ঘেঁষা পেঁপে গাছের দিকে চেয়ে। লণ্ঠনের আলোয় তাকে দেখে হীরেন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। দিগম্বরীর দেহটি তো সুন্দর! এতবার দেখেও এটা তার কল্পনাতে আসে নি। মমতার বাপের বাড়ীতে মমতা একদিন বলেছিল, 'আমার চেয়ে আমার ঝি ঢের বেশী সুন্দর, শুধু রঙ একটু ময়লা। দেখবে?' সে ঝিকে হীরেন কতবার দেখেছিল তার হিসাব হয় না, কিন্তু সে বুড়ী না যুবতী তাও তার কোনদিন খেয়াল হয় নি। পরদিন একটু কৌশল করে মমতা ঝির নিরাবরণ দেহটি দেখিয়েছিল। সে এক রূপ-ধরা শিল্পীর কল্পনা, অবিশ্বাস্য। অথচ মমতা দেখিয়ে না দিলে সে রূপ তার চোখে পড়ত কি না সন্দেহ। তারপর কাস্তে পেড়ে শাড়ী জড়ান সেই ঝির দেহটি তার সুন্দর মনে হয় নি, ভাল করে চেয়ে দেখে গলা থেকে পা পর্যন্ত ভাল করে ঢাকা সে বেচারীকে তার মনে হয়েছে একটু অশ্লীল। মমতার মত সাজপোষাকে তাকে কি রূপসী মনে হত? সাজ না থাকলে ভিন্ন কথা, কিন্তু একটা বিশেষ ফ্যাসনে শাড়ী জামা গায়ে না জড়ালে মেয়েদের রূপ কি তার কাছে চাপা পড়ে যায়?

উঠানে ঘাস, পায়ের শব্দ হয় না। হীরেনের আবির্ভাব টের পেয়ে শশব্যস্তে দিগম্বরী বলল, 'আসুন ঠাকুরপো, বসুন। চেয়ার এনে দেব? ভাঙ্গা চেয়ার কিন্তু। কেউ দেশে আসেন না, আসবাবপত্তর কিনে দেন না। উনি একবার লিখেছিলেন একটা টেবিল আর কটা চেয়ারের জন্য, জবাব পেলেন, মাদুর আর পাটি হলেই হবে। খুব চটে গেছেন, না? অতটা মেজাজ দেখানো আমার উচিত হয় নি।'

হীরেন জোর দিয়ে বলল, 'বেশ করেছেন। স্বামীর বিপদে স্ত্রীর মাথা গরম হওয়া দোষের নয়। শশাঙ্কদা চলে গেছেন নাকি?'

'আপনাদের বলেই তো গেলেন?'

'এত আগে গেলেন? গাড়ী তো শুনলাম রাত নটায়?'

'দিনে দিনে স্টেশনে পৌঁছে যাবেন। গরমকালে রাস্তায় সাপের ভয়।'

হীরেনের মনে হল, কোনরকমে শশাঙ্ক যদি মরে যেত আর সে যদি দিগম্বরীর শোকটা দেখবার সুযোগ পেত! এই অদ্ভুত সাধের জন্য নিজের কাছেই হীরেন লজ্জা বোধ করল। কতগুলি অদ্ভুত প্রশ্ন তার মনে ভীড় করে আসছে, দিগম্বরীর স্বামীর ঘর করা সম্পর্কে কতগুলি প্রশ্ন, দিগম্বরীকে যা জিজ্ঞাসা করা যায় না। জবাবও হয়ত সে জানে না। কোন দিন ভেবেও দেখে নি। জীবনকে যাচাই আর বিশ্লেষণ করে দেখবার শিক্ষা সে পায়নি, প্রচলিত প্রথায় জীবনকে গ্রহণ করে সুখী হওয়াই তার স্বভাব। তবু দু'একটা প্রশ্ন না করে হীরেন পারল না।

একটু তফাতে দাওয়াতে সে বসতে যাবে, দিগম্বরী ব্যস্ত হয়ে বারণ করে আসন এনে পেতে দিল।

'আপনি কতদূর পড়েছেন বৌদি?'

'আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ ঠাকুরপো। বাংলা বইটই একটু যা পড়তে পারি।'

'কি বই পড়েন?'

'এই রামায়ণ মহাভারত। নাটক নভেল যদি কখনো পাই তো পড়ি।

'নাটক নভেল কি পড়েছেন দু'একখানার নাম করুন না বৌদি?'

'অত কি মনে থাকে ঠাকুরপো? দাঁড়ান, সেদিন একটা বই পড়েছি বটে, ত্রিলোচনবাবুর 'সতীর জয়'। পড়েছেন? সুন্দর বই, পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। এক চরিত্রহীন লম্পটের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হল, বিনা দোষে সন্দেহ করে স্বামী তাকে ত্যাগ করল। তারপর কত দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করে শেষে মেয়েটি আবার সব ফিরে পেল। স্বামীর বসন্ত হয়েছিল, সবাই তাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটি খবর পেয়ে একা যমের সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। ওর স্বামী আবার ওকে গ্রহণ করল, সেই থেকে তার চরিত্রও শুধরে গেল। বইখানা পড়ে দেখবেন ঠাকুরপো।'

'কিন্তু সংসারে কত অসতী মেয়েও তো কখনো দুঃখ কষ্ট না পেয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে দেয়।'

'ছাই দেয়। আর দিলেই বা, এ জীবনটাই তো সব নয়, পরজন্মও তো আছে।'

'পরজন্মের কথা ভেবে বুঝি মেয়েরা সতী হয়?'

দিগম্বরী হেসে ফেলল। দিগম্বরীর হাসিটিও বেশ, পানে রাঙ্গা দাঁতগুলির জন্য বড় মোলায়েম আর মিষ্টি। হাসিমুখেই সে বলল, 'সতীত্ব হল মেয়েদের ধর্ম। এমনিই তারা সতী হয়, ভেবে চিন্তে হয় না ঠাকুরপো।'

হীরেন একটা অস্পষ্ট জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দিগম্বরী একটু ব্যাকুলতার সঙ্গেই বলল, 'উঠছেন কেন, বসুন না একটু? আপনি বড়লোক মানুষ, গরীবের বাড়ী এসে খুব কষ্ট হচ্ছে, না ঠাকুরপো?'

হীরেন আবার বসে জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হচ্ছে কে বলল আপনাকে?'

'একি বলে দিতে হয় ঠাকুরপো! পাড়াগাঁয়ে থাকা তো অভ্যাস নেই আপনাদের। না পাওয়া যায় একটা জিনিস না পাওয়া যায় কিছু। ওখানে আপনার কতগণ্ডা চাকর বাকর, এখানে আমি গেঁয়ো মানুষ—'

'আপনি যা আদর যত্ন করছেন বৌদি—'

দিগম্বরী খুশী হয়ে বলল, 'যান! বাড়াবেন না ঠাকুরপো। আপনার স্ত্রী নাকি কটা পাশ দিয়েছেন? তাই শুধোচ্ছিলেন, আমি কদ্দূর লেখাপড়া করেছি! আমার মত মুখ্যু মেয়েমানুষ দেখে আপনার নিশ্চয় ঘেন্না হয়।'

এমনি আলাপে দিগম্বরী অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিল। তার কথা আর সুরে বরাবর একটা চাপা সম্ভ্রম আর ঈর্ষার ভাব হীরেনকে খুশী করে তুলেছিল। অতি সহজেই সে নিজেকে দিগম্বরীর ঘরোয়া সীমাবদ্ধ মানসিক স্তরে নামিয়ে নিয়ে আলাপ জমিয়ে তুলল। হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে দিগম্বরীর বসবার ভঙ্গী, ঠোঁটে পানের রসের শুকনো দাগ, কানের মাকড়ি, চোখের নম্রতা, চুল বাঁধার কায়দা এই সব লক্ষণ কখনো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কখনো মিলিতভাবে তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল, এই মেয়েটি সাধারণ, কিন্তু এ জগতে শশাঙ্ক ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই ওকে স্পর্শ করে। একগ্লাস জল চাইতে দিগম্বরী তাকে সরবৎ এনে দিল, তারপর আচমকা বলে বসল, 'একটা কথা বলব ঠাকুরপো? ওঁর একটা চাকরী বাকরী করে দিন না? কত চাকরি আপনার গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়ে যাবে।'

হীরেনের প্রথম মনে হল, কোনদিন কোন অবস্থাতেই দিগম্বরী বোধ হয় শশাঙ্কের কথা ভুলতে পারে না। এতক্ষণ যে তার সঙ্গে আলাপ করেছে তাও স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে করেছে। এক মুহূর্তে চিন্তার ভান করে হীরেন বলল,

'শশাঙ্কদার যদি চাকরি করে দিই, দেড়শ' দুশো টাকার চাকরি হয়, আপনিও কলকাতায় গিয়ে থাকবেন তো ?'

দিগম্বরীর মুখের ভাব পরিবর্তনের মানেটা হীরেনের এমন অদ্ভুত রকম স্পষ্ট মনে হল!

'আমাকে কেন ?'

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—মেলামেশার একটা লোক পাবে।' কৈফিয়তটা বড়ই খাপছাড়া শোনাল। কলকাতা সহরে তার স্ত্রীর মেলামেশার লোকের কি এতই অভাব যে মেলামেশার জন্য ঝুমুরিয়া থেকে তাকে লোক নিয়ে যেতে হবে। হীরেনের কিন্তু খেয়ালও ছিল না, সে নিজের চিন্তাতেই মসগুল। দিগম্বরী একবার হীরেনের মুখের দিকে চায় আর মুখ নামিয়ে নেয়, গালে রঙ এসে আবার বিবর্ণ হয়ে যায়, যদিও রঙ তার তেমন ফর্সা নয় বলে সেটা তেমন স্পষ্ট হয় না।

'তা উনি কলকাতায় চাকরি করলে আমিও সেখানে থাকব বৈকি। চাকরি দেবেন ঠাকুরপো ?'

হীরেন একটু হেসে বলল, 'আপনার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে চাকরি করে দিতে পারব কি না ?'

'ওমা, আপনি চাকরি করে দিতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ!' দিগম্বরীও এবার একটু হাসল।

হীরেন বলল, 'চাকরী খালি না থাকে আমার আপিসে চাকরি তৈরী করে দেব। আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি আপনাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করে রাখব'খন। আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতেও তো থাকতে পারেন গিয়ে ? আমার স্ত্রী তাহলে সব সময় আপনার সঙ্গ পাবেন ?'

'আপনার স্ত্রীর কি কোন অসুখ ?'

'মনের অসুখ।'

'ও, বুঝেছি।'

তাদের উপকার করতে হীরেনের আগ্রহের কারণটা এতক্ষণে যেন দিগম্বরী ধরতে পেরেছে মনে হল। শশাঙ্ককে চাকরি দিয়ে তাকে হীরেন বিনা মাইনেতে আরেকটা চাকরী করিয়ে নেবে কিন্তু হীরেনের স্ত্রীর কোন অসুখের কথা তো কৃষ্ণেন্দু বলে নি ? একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

হীরেন গম্ভীরমুখে ভাবছিল, নিজের মনে মাথা নেড়ে সে বলল, 'না, আমাদের বাড়ীতে থাকাটা ঠিক হবে না। একটা ভাড়াটে বাড়ীই ঠিক করে রাখব আপনাদের জন্যে।'

দিগম্বরীকে ধাঁধায় ফেলে হীরেন চলে গেল। একটু ভয় ভয় করতে লাগল দিগম্বরীর। হীরেনের পাতলা পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে গিয়েছিল। অতি মৃদু, অতি অদ্ভুত একটা সুগন্ধ দিগম্বরীর নাকে লাগছিল, আতর কি এসেন্স কে জানে! বড়লোকের ছেলে; এমন সুপুরুষ, সে কেন এলোমেলো কথা বলে? তবে চাকরিটা সে নিশ্চয় করে দেবে—দু'শো টাকার চাকরি। এতদিনে কি তার লক্ষ্মীপূজার ফল ফলল, মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন? নিজের হাতের দিকে চেয়ে দিগম্বরীর চোখে জল আসে। শুধু সরু দু'গাছি চুড়ি। আর কানে দুটি মাকড়ি। আর কিছুই তার নেই—একে একে সব গেছে। হাতে টাকা হলেই আগে সে চুড়ি গড়িয়ে নেবে, তিনগাছি করে। তারপর হার। বিছে হারই তাকে ভাল মানায়।

মোহনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর আলোচনা তখনো শেষ হয় নি। মোহন কয়েকটা বাস্তব প্রশ্ন তুলেছে, কৃষ্ণেন্দু তার জবাব দিচ্ছে।

রম্ভা একমনে শুনছে, ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে তার ভায়ের দিকে। এবারও নরেশ রম্ভার সঙ্গে এসেছে। সে কিছু শুনছে কিনা সন্দেহ। অদ্ভুত বিহ্বল দৃষ্টি, বদ্ধ পাগলের যেন এসেছে আবেশের বিহ্বলতা। রম্ভাকে দ্যাখে অনেকেই, হীরেনও কতবার দেখেছে। নরেশের দেখাটাতে একটু বেশীরকম বাড়িবাড়ি আছে। আগেও নরেশকে সে এ ভাবে রম্ভার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। হয় তো ঠিক এভাবে নয়, এই রকম একাগ্রতার সঙ্গে সকাতর হিংস্র দৃষ্টিতে। আজ তার চোখে যেন উঁকি মারছে হাজার হাজার চাঁদে পাওয়া কিশোর লম্পট।

জামা গায়ে দিয়ে জুতো পরতে পরতে হীরেনের মনে পড়ল টেঁপির ব্যাপারটা। টেঁপিকে নিয়ে নরেশ পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিলন ঘটিয়ে দিতে চাইলে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তার এলোমেলো পাগলামির মানেটা খানিক অনুমান করেছিল শুধু হীরেন। এতো সংসারে হরদম ঘটে। একজন জ্বালায় আর জ্বালাতন করে, আরেকজনকে তাই দরকার হয়। কৃষ্ণেন্দু নরেশকে ভয়ানক মেরেছিল বল হীরেনের বড় রাগ হয়েছিল, এ যেন ধাক্কা খেয়ে একজন আছাড় খেয়েছে বলে তাকে শাসন করা। মার খেয়েও কৃষ্ণেন্দুর প্রতি নরেশের টান আর ভালবাসা দেখে হীরেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, একটুও ঈর্ষাও

তার হয়েছিল বৈকি! আজ জুতোয় পা ঢোকাবার কয়েক মুহূর্তে তার যেন একটা নতুন জ্ঞান জন্মে গেল। নরেশের কৃষ্ণেন্দু-ভক্তির মূল নেই, মূল্যও নেই। কৃষ্ণেন্দুর প্রতি রম্ভার ভক্তিটাই নরেশ অনুভব করে। রম্ভা তাকে ভক্তি করায়।

'কিরে নরেশ!'

নরেশ বোকার মত একটু হাসল।

'রম্ভা যে চুপ চাপ?'

রম্ভা ভুরু কুঁচকেই বলল, 'আপনি নাকি পালাচ্ছেন? পালান—পালান, প্রাণ নিয়ে শীগগির পালান।'

হীরেন রাগ করল না। সহজ ভাবেই বলল, 'পালাচ্ছি না রম্ভা। ফিরে যাচ্ছি।'

'দুদিন পরেই নয় যেতেন! না, ডর লাগছে থাকতে?'

'ডর লাগছে রম্ভা। আমি ভীষণ ভীরু মানুষ।'

রম্ভা একটু ভড়কে গিয়ে চুপ করে রইল। এতক্ষণ বোধ হয় তার খেয়াল হ'ল, সহরে কতখানি সম্মান করে সে হীরেনের সঙ্গে কথা কইত আর কাল থেকে কি স্পর্দ্ধা সে দেখাচ্ছে তার কাছে। তার বাপ খুন হয়ে গেছে বলে সে যেন রাণী মহারাণী হয়ে গেছে, সকলকে ধমক দিতে আর বাধা নেই।

হীরেনের পিছু পিছু বেরিয়ে গিয়ে সদরের কাছে তাকে সে পাকড়াও করল।

'কিছু মনে করবেন না, হীরেন বাবু। মাথা টাথা ঠিক নেই মোর।'

'কিছু মনে করিনি।'

'রাগ করেন নি?'

রম্ভার বেয়াদবির বদলে এই অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা হীরেনকে চটিয়ে দিল। বাড়ীর ঝি অথবা কারখানার মেয়ে মজুরের সঙ্গে কথা বলার মত গম্ভীর মুখে কড়া গলায় সংক্ষেপে বলল, 'না।'

রম্ভা গ্রাহ্যও করল না।—'কখন যাবেন আপনি?'

'কাল সকালে যাব।'

'একটা কাজ তবে করুন হীরেন বাবু। নরেশ ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে যান। এখানে থেকে ও কি করবে?'

'ও যায় তো চলুক।' হীরেন বলল, উদাসীনভাবে।

রম্ভা মিনতি করে বলল, 'ধমক ধামক দিয়ে নিয়ে যান হীরেন বাবু। বড্ড জ্বালাতন করছে আমাকে। এইটুকু বয়সে শয়তানের ধাড়ী হয়ে উঠেছে ছেলেটা।

গাছের একটা পাকা সিঁদুরে আমে চোখ রেখে আরও উদাসীন ভাবে হীরেন বলল, 'তুমি প্রশ্রয় দাও কেন?'

'ওমা! সে কি কথা? কত গাল দিইছি, ঝাঁটাপেটা করব বলেছি'—নরেশকে আসতে দেখে সে থেমে গেল। তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে খানিক তফাৎ দিয়ে কি উদ্দেশ্যে নরেশ কোথায় চলেছিল বলা যায় না, রম্ভা তাকে ডাকল, 'নরেশ শোন, ইদিক আয়। হীরেন বাবুর সাথে তুই কাল কলকাতা ফিরে যাবি, বুঝলি?'

নরেশ কিছু বলার আগেই হীরেন বেরিয়ে গেল। নরেশ কলকাতা যেতে অস্বীকার করলে তার সামনেই হয় তো রম্ভা তাকে ঝাঁটাপেটা করতে চাইবে, সেটা সহ্য করার মত মনের অবস্থা হীরেনের ছিল না।

আবছা অন্ধকারে ঝ্মুরিয়ার কুৎসিৎ গ্রাম্য চেহারা ঢাকা পড়েছে। সকলে বলে তাই হীরেন চিরকাল সায় দিয়ে এসেছে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে কোনদিন খুঁজে পায়নি ঘর বাড়ী বন জঙ্গল মাঠ ঘাট পথের মধ্যে কোথা লুকিয়ে আছে গ্রামের সেই বিখ্যাত শ্রী। খড় টিন বাঁশ কাঠ মাটি দিয়ে গড়া বাড়ীগুলি আদিম স্থাপত্য শিল্পেরও কুৎসিৎ ব্যঙ্গ। বদরঙ্গা একটু তলানি জলের দীঘি, ভাঙ্গা ইটের পুরানো শ্রীহীন ঘাট, আগাছা ভরা পচা মাটির গর্তে পচা ডোবা-পুকুর, এবড়ো খেবড়ো কর্কশ বর্ণহীন মাঠ। আর কি বিশ্রী পোষাক আর চেহারা মানুষগুলির, কি দৃষ্টি-কটু সব গরু বাছুর। এখন ওসব চোখের আড়ালে। হীরেন আরাম পেল।

ধুলোয় ভরা কাঁচা উঁচু পথ দিয়ে চলতে চলতে এক মোড়ে এসে হীরেন দাঁড়াল। গামছা কাঁধে গরু তাড়িয়ে বাড়ী ফিরছিল কার্তিক। মাঝ বয়সী জোয়ান মানুষ, বুকে পিঠে ছড়ানো দাদ। বাঁদিকের গালেও একটু দাদ হয়েছে, বেশী না ছড়ালেও বেশ জমকালো।

'মদের দুকান? বলতি পারতাম বাবু। ওই যে বুড়ো বটগাছ দেখতিছেন ওনার গায়ে হাট। হাটের পিছে মাগিদের ঘর—দু'রশি তফাতে চরণ সা'র দুকান।'

হীরেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। অতি প্রাচীন এক বটগাছের কাছে কতগুলি শূন্য চালা। আজ হাটবাজার নয়। পূর্বে একটু তফাতেই গায়ে গায়ে

লাগান ছোট আট দশখানা টিনের ঘর, অল্প খানিকটা জমির মধ্যে জমাট করা ঘরগুলির মধ্যে দু'হাত চওড়া গলিও আছে। বাইরে দু'তিনটি স্ত্রীলোক দেখা গেল। দেখলেই বোঝা যায় তারা দেহের ব্যবসা করে, অতি গরীব এবং ছোট জাতের মেয়ে। খোঁপা বেঁধে ফুল গুঁজেছে, পান খেয়ে কাল ঠোঁট রাঙ্গিয়েছে, সেমিজ ছাড়াই সস্তা তাঁতের শাড়ী পরেছে, আর দাঁড়িয়েছে ভঙ্গি করে, যে ভঙ্গি এদের অভ্যাস হয়ে যায়।

কিছু দূরেই বাগ্দি পাড়া। দেখলেই চেনা যায়। বিশ্ব যাদের বর্জন করেছে, চারিদিকে অনেক খালি জমি পড়ে থাকতেও যারা একটুখানি জমিতে ছোট ছোট ভাঙ্গাচোরা কুঁড়ে তুলে গড়ে তোলে নিজেদের পাড়া, কত সঙ্কেত আর চিহ্নই যে থাকে তাদের সেই সীমাবদ্ধ জগতের! মানুষ-সমান উঁচু পচা-খড়ের পুরানো কুঁড়ের লেপামোছা তকতকে একটুখানি মাটির দাওয়া, সেখানে সোনারঙের চেরা বাঁশের শিল্প।

এটা ঝুমুরিয়ার এক প্রান্ত। পূর্বদিকে পথটা খানিক সোজা গিয়ে বেঁকতে বেঁকতে স্টেশন থেকে ঝুমুরিয়ায় ঢুকবার পথে মিশেছে। কতগুলি আলো দেখে ও লোকের কলরব শুনে হীরেন এগিয়ে গেল। চরণ সা'র মদের দোকান দেখে সে গেল ভড়কে। টিনের চাল আর মাটির দেয়ালের একটা ঘর, দেয়ালের গায়ে একটা ফোকর দিয়ে মদ বিক্রী হচ্ছে। এদিকে একটা চালার নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে ক্রেতারা সেই মদ খাচ্ছে। লোক মন্দ হয়নি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা হয় দেরীতে, সাড়ে আটটায় মদ বিক্রি বন্ধ। দিনের আলো শেষ হবার আগেই তাই অনেকে রাতের নেশার জোগাড়ে ছুটে আসে। কারো গায়ে সার্ট ফতুয়া, করো শুধু ধুতি বা লুঙ্গি, কারো শুধু গামছার মত ছোট আর ছেঁড়া কিছু কোমরে জড়ান। গেলাস, বাটি, টিনের মগে কেউ মদ নিয়েছে, কারো পাত্রটি মাটির, কেউ বা তৃষ্ণা মেটাচ্ছে সোজা বোতল থেকে। বোতলওয়ালাদের সংখ্যা খুব কম। বোতলের জন্য পয়সা জমা রাখতে হয়।

দেয়ালের ফোকর ঘিরে লোক ছিল, হীরেনকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে পথ ছেড়ে দিল। ফোকরের ওপাশের লোকটির ঘামে ভেজা ভুঁড়িটি শুধু দেখা যায়।

'বিলিতি আছে?'

'নাঃ। এক নম্বর আর দু'নম্বর পাবেন।'

'কোনটা ভাল?

'এক নম্বর।'

একটা একা নম্বর পাঁইট কিনে হীরেন সরে এল। সবাই তাকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। তার মত ভদ্রলোক নিজে এখানে মদ কিনতে আসে না, লোক পাঠিয়ে দেয়। তার চেয়ে অনেক কম দামী জুতো জামা পরা ভদ্রলোক যদি বা কেউ আসে, বোতল কিনেই সে এখান থেকে সরে পড়ে। হীরেন এখানে বসেই খাবে সন্দেহ করে সকলে গভীর বিস্ময় আর অস্বস্তিকর কৌতূহলের সঙ্গে তার চালচলন লক্ষ্য করতে লাগল। এখনো সকলের নেশা জমে নি। ঘণ্টাখানেক পরে হলে হয়ত বেশীর ভাগ লোক তার দিকে চেয়েও দেখত না। দু'চারজন একটু মুচকে হাসত, কেউ পাশেই চাটাই ঝেড়ে বসতে ডেকে তাকে দেখাতে চাইত ভদ্রলোকের খাতির সে জানে।

অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হীরেন আবিষ্কার করল রামপালকে। রামপাল গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিল, হীরেন নাম ধরে ডাকাতে অপরাধীর মত কাছে এল।

'ও রামপাল, এ যে বড় মুস্কিলে পড়লাম। বিলিতি কিছু পাওয়া গেল না।'

'আজ্ঞে এখানে—'

'তুমি এটা খেয়েছো, এক নম্বর না কি ?'

'আজ্ঞে আমি—'

হীরেন অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'ওসব রাখো রামপাল। এটা খাওয়া যাবে কিনা তাই বলো।'

রামপাল সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে জিনিসটা মন্দ নয়, তবে বিলিতির মত কি আর হবে !'

বিক্রীর সময়েই বোতল খুলে দিয়েছিল। অরে একবার শুঁকে দেখে হীরেন বলল 'কিন্তু গন্ধটা একেবারে বিশ্রী। একি খেতে পারব ?'

খানিকটা মদ মুখে ঢেলে গিলে ফেলেই হীরেন বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। রামপাল তৎক্ষণাৎ সেটা কুড়িয়ে আনল।

হীরেন উদাসভাবে বলল, 'তুমি খাবে রামপাল ? খাও। লজ্জা কি, খাও।'

একটু তফাতে সরে হীরেনের দিকে পিছন ফিরে পাঁচ মিনিটেরে মধ্যে রাম পাল বোতলটা খালি করে দিল। অর্দ্ধেক মদ পড়ে গিয়েছিল, নয় তো পাঁচ

মিনিটে এক পাঁইট মদ গিলবার ক্ষমতা রামপাল অর্জন করেনি। ফোকরে গিয়ে বোতল ফিরিয়ে দিয়ে পয়সাও সে নিয়ে এল।

হীরেন করুণ স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার কি হবে রামপাল? বিলিতি কোথায় পাব? বিলিতি নইলে তো আমার চলবে না।'

রামপাল আপশোষ করে বলল, এ লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ে বিলিতি কোথায় পাবেন বাবু। কে আর ওসব খায়, অত দামী জিনিস? এক ওই হেরম্ব বাবু খায়, সদর থেকে ওর বাক্স বোঝাই মদ আসে।'

দুঃসহ অনিবার্য বিপদের মত রাত্রি বাড়তে থাকে। মাথার মধ্যে আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে। আগে জানলে সে সদরে চলে যেত। এখন তাও সম্ভব নয়। কি বোকার মতই সে ভেবেছিল শ্যাম্পেন হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি না হোক, দেশী মদ খেয়েই আজ নেশা করবে—তার দরকারী নেশা, অপরিহার্য নেশা। দেশী মদ যে খাওয়াই যায় না সে কি তা জানত!

আরেকবার চেষ্টা করবে?

রামপাল আরেক পাঁইট মদ নিয়ে এল। একটা টুলও কি করে যেন যোগাড় করল। চালার থানিক দূরে টুলে বসে অতি কষ্টে জল মিশিয়ে কিছু মদ হীরেন পেটে চালান করে দিল। তখন মনে হল খেতে কষ্ট যেন আর বেশী হচ্ছে না। ইচ্ছা করলে এইখানে টুলে বসে বোতলের পর বোতল এই দেশী মদ সে চালিয়ে যেতে পারে। আতঙ্ক কমে গিয়ে একটু স্বস্তি সে বোধ করল কিন্তু বিলিতি মদের তৃষ্ণাটা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

হেরম্বের কাছে বিলিতি মদ আছে।

হেরম্বের কাছে বাক্স ভরা মদ আসে। হেরম্ব যদি বন্ধু হ'ত তাদের! একটু যদি ভাব থাকত তার হেরম্বের সঙ্গে!

চালার নীচে, সাফ করা অঙ্গনে কোলাহল বাড়ছে। ভিড় বেড়েছে এখন। কোথা থেকে এত লোক এল? ঝুমুরিয়া কি খালি হয়ে গেছে, ঘরে ঘরে শুধু নারী আর শিশু? এত লোক মদ খায় কেন, এত গরীব লোক?

'গরীবরা তাড়ি খায়।'

'এরা সব বড়লোক বুঝি?'

'বড়লোক নয় বটে, দু'চার গণ্ডা পয়সা না নিয়ে হেথায় কে আসবে! কিন্তু এসবের চাইতে তাড়ি ভাল বাবু, খাঁটি পচাই ভাল। দেহ ভাল রাখে, গায়ে

জোর করে। দিনভর যারা খাটে, খেতে পায় তারা? তাড়ি খেয়ে, পচাই খেয়ে তারা বেঁচে থাকে।' রামপালের বেশ নেশা হয়েছে, বকতে ভাল লাগছে। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে সে বলতে থাকে, 'বাবুরা আবার মিটিং করে উপদেশ ঝাড়ে, মদ খেও না, তাড়ি খেও না, পয়সা নষ্ট কোরো না। বলি ওরে ছুঁচো পাজী হারামজাদা, তবে খেতে দে—পচাই খাব না তো পেট ভরে খেতে দে, ওষুধ দে—'

'ওষুধ—?'

'মদ খেলে রোগ বালাই কম হয় বাবু। তেজী জিনিস তো। পটলদা বলে—'

'পটলদা কে?'

'মোর স্যাঙাৎ। হেরম্ববাবুর বেয়ারা। পটলদা বলে, পচাই খা, তাড়ি খা, খবর্দার নম্বুরী মাল ছুঁসনি রাম—ওতে ওষুধ মেশাল দেয়। নেশা জমে কিন্তু দেহের দফা শেষ।'

বিক্রী বন্ধ হবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফোকরের কাছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। কয়েকজন চলে গেছে, নতুন কয়েকজন এসেছে। চারিদিকের গোলমালে কান পাতা যায় না। সবাই কথা বলছে, হট্টগোলে নিজের কানে পৌঁছে দিতে চেঁচিয়ে কথা বলছে—বন্ধু বান্ধব চেনা অচেনার মধ্যে সে এক প্রচণ্ড কলরব তুলে আলাপ করা।

দু'চারজন শুধু একেবারে চুপচাপ। অতি দুর্বল অক্ষম রুগ্ন তাদের দেহ, মুখে মৃত্যুর অসম্পূর্ণ ছাপ, একটু একটু মদ খাচ্ছে আর ঢুলছে। কোন নেশাই আর এ জীবনে তাদের কয়েক মুহূর্তের জন্যও উত্তেজিত, জীবন্ত করে দিতে পারবে না।

'দশটা পয়সা দাও বাবু। বাবুগো, দশটা পয়সা দাও।'

বছর চল্লিশ বয়সের একটি স্ত্রীলোক, ময়লা আটহাতি একখানা কাপড় পরা, মুখ বুক আমসির মত শুকনো।

রামপাল ধমক দিল, 'ভাগ।'

চালার নীচে থেকে মাটি আর সুরকির ছাপ মারা ছেঁড়া হাফ প্যাণ্ট পরা একটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে উঠে দাঁড়াবার টাল সামলে স্ত্রীলোকটির সামনে এগিয়ে এল।

'ফের তুই হেথা এইছিস মাসী?'

'তুই যে এইছিস বড়?'

'তুই আর আমি সমান? তুই পুরুষ? তোর মত বজ্জাতি করতে আসি আমি? যা বলছি এখান থেকে, না যাবি তো তোকে আজ—'

'একটু কিনে দে তবে। ও গোপাল, সোনা মানিকটি আমার, দে বাবা একটু কিনে।'

হীরেন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। বোনপোর অশ্রাব্য গালগুলির প্রত্যেকটি কান দিয়ে ঢুকে মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে পরিণত হয়ে যায়। তারপর কোথা থেকে উঠে আসে লুঙ্গি পরা জোয়ান এক মরদ। এক ধাক্কায় বোনপোটিকে পাঁচ হাত তফাতে সরিয়ে দিয়ে সে মাসীকে বলে, 'চল যাই।'

'আগে কিনে দে।'

কোমরে গোঁজা পয়সা বার করে লোকটি দু'তিনবার গোনে। পয়সা আছে মোটে তিন গণ্ডা। একটু সে ইতস্ততঃ করে। একবার চোখ বুলিয়ে নেয় স্ত্রীলোকটির সর্বাঙ্গে। তার মনের দ্বন্দ্ব যেন হীরেনের চোখের সামনে ঘটনা হয়ে ঘটতে থাকে, দুই ঘেয়ো কুকুরের মারামারির মত, দুই বেণের দরদস্তুরের মত। আরও মদ, না এই বুড়ী?—এ সমস্যা যেন দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে লোকটার মুখ। তীব্র অসহ্য কৌতূহলে হীরেন প্রতীক্ষা করে থাকে।

লোকটি ফোকরের কাছে গিয়ে টিনের মগে মদ এনে বলে, 'এক চুমুক খাই?'

স্ত্রীলোকটি বলে, 'আগে আমায় দে।'

মগটা হাতে পেয়েই একচুমুকে সে সবটা মদ গিলে ফেলে, মুখ তুলে মগটা খানিকক্ষণ ধরে থাকে যাতে এক ফোঁটাও না নষ্ট হয়। লোকটি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম করে স্ত্রীলোকটি সামলে নেয়, বারকয়েক মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটির সঙ্গে মিশে যায় চারিদিকের আলোছায়া অন্ধকারে।

হীরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে কিছু হবে না রামপাল। ও কিস্‌সু জানে না। এক নম্বরের বোকা।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'এবার যাওয়া যাক।' হীরেন উঠে দাঁড়াল।

রামপাল নিরাশ হয়ে বলল, 'আর খাবেন না?'

'ও, হ্যাঁ। ঠিক। তিনচারটে বোতল কিনে রাখা যাক।'

বগলে এক একটি বোতল নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। কাছে দূরে দু'টি একটি আলো মিট মিট করছে। চাঁদ উঠেছে আধখানা। মৃদু জ্যোৎস্নায় জীবনের রূপ ঢাকা পড়ে নি। হাটের পাশে টিনের চালের অনেকগুলি ঘরে আলো। একটা সস্তা হারমোনিয়ামের চেরা চেরা আওয়াজ কানে আসছে। কোথায় তারা যাবে কিছু ঠিক নেই। রামপাল কি ওই ঘরগুলির দিকে এসেছে? রম্ভার স্বামী রামপাল? চলুক যেখানে খুশী। ওটাও তো মানুষের আস্তানা।

কৃষ্ণেন্দুকে বিপদের মুখে ফেলে যাবার সঙ্কোচ আর হীরেনের নেই। মন হাল্কা হয়ে গেছে। লাখপতি বাবার ছেলে আর লাখপতি শ্বশুরের জামাই হীরেন আজ কোথায় এই ঝুমুরিয়ার এক প্রান্তে জীবন দেখে বেড়াচ্ছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র, এক হয়ে মিশে গেছে বঞ্চিত নিষ্পেষিত বিকৃত মানুষের সঙ্গে! কৃষ্ণেন্দু নিজেই তো স্বীকার করেছে সে যত সহজে গেঁয়ো অশিক্ষিত মানুষকে বুঝতে পারে, সে তা পারে না। কৃষ্ণেন্দু চুলোয় যাক, তার ভুল পথ, তাকে দিয়ে কিছু হবে না। সে নিজে এবার কাজে নামবে, নিজের সময় দেবে, অর্থ দেবে আর দরকার হলে কৃষ্ণেন্দুর মত জেলে যেতে বা প্রাণ দিতে রাজী থাকবে,—কৃষ্ণেন্দুর মত মাথা গরম করে নয়, যাতে সত্যই কিছু কাজ হয় দেশের। কৃষ্ণেন্দুকে ফেলে সে পালাবে না, সে চলে যাবে কাজ করতে!

বহুদিন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে এসে এখন ঝুমুরিয়ার এক প্রান্তে ধূলোভরা কাঁচা রাস্তায় মৃদু জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হীরেন নিষ্প্রভ তারাবসানো আকাশের দিকে মুখ তুলল। পথ খুঁজে পাবে বলে কি সেই অদৃশ্য শক্তি ঝুমুরিয়ায় আসবার প্রেরণা দিয়েছিল? ভবিষ্যৎ জীবনটা তার যাতে সার্থক হয়, দেশের মানুষকে মানুষ করার চেষ্টায়, নীচে যারা পৃষ্ট হচ্ছে তাদের উপর তুলে আর উপরে যারা অভিশাপের মত চেপে আছে তাদের নীচে নামিয়ে আনার সাধনায়?

মদ খাওয়া সে ছেড়ে দেবে। কলকাতায় ফিরে ডাক্তারের চিকিৎসায় নিজের এই পাগলামিকে জয় করবে। ওষধের পর ওষুধ খাবে ইন্‌জেক্‌শনের পর ইন্‌জেক্‌শন নেবে, কিন্তু মদ আর ছোঁবে না। জীবনে এই তার শেষ মদ খাওয়া।

মমতা খুশী হবে। তাকে শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে, ভালবাসবে। কাজে নামতে চাইলে মমতাকেও সে সঙ্গে নেবে। চিয়াং-কাই-শেক দুজনের মত তারা স্বামী-স্ত্রী—

যাক। এসব ভবিষ্যতের কথা। অনেক দূর ভবিষ্যৎ। রামপাল তাকে টিনের ঘরগুলির কাছে এনে ফেলেছে।

'না, রামপাল। এখানে ঢুকতে পারব না।'

'তবে কোথায় বসে খাবেন?'

হীরেন এ কথার জবাব দিল না। বলল, 'রামপাল?'

'আজ্ঞে?'

'তোমার সেই সাঙাৎ পটলকে দিয়ে কিছু বিলিতি যোগাড় হয় না? যত টাকা চায় দেব। দশ টাকার মাল পঞ্চাশ টাকায় কিনব।'

'বলে দেখা যায়। আপনি বসবেন কোথায়? যেতে আসতে সময় নেবে।'

'আমিও সঙ্গে যাব চল। বোতল চারটে কারো ঘরে রেখে এস। বিলিতি না পেলে এখানে আসব।'

রামপাল দু'হাত চওড়া গলির একটাতে ঢুকে দশমিনিটের মধ্যে ফিরে এল। হেরম্বের আস্তানা প্রায় দু'মাইল দূরে। হীরেনের নেশা হয় নি, রামপালের নেশা কেটে গেছে। দুজনে প্রায় নিঃশব্দে সমস্ত পথটা হেঁটে গেল। কার একটা ছোট একতালা বাড়ী হেরম্ব ভাড়া করেছে, বাড়ীটা নতুন। এখানকার কেউ বিদেশে গিয়ে বড় লোক হয়ে সখ করে বাড়ী তৈরী করেছিল, নিজে বিদেশেই থাকে, সখ চাপলে দেশের বাড়ীতে দু'চারদিন এসে সখের বাস করে যায়। বাড়ীর কাছে তিনটে তাঁবুও পড়েছে হেরম্বের। কাছেই একটা লরী, খানিক তফাতে অনেকগুলি গরুর গাড়ী। ছোট আমবাগানের ধারে কতগুলি পাতার ঘরের কাছে মশাল জালিয়ে কুড়ি বাইশটি স্ত্রীপুরুষ আড্ডা দিচ্ছে। চার পাঁচটা চুল্লীতে হচ্ছে রান্না।

হীরেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। রামপাল গেল তার সাঙাৎ পটলকে খুঁজতে। কিছুক্ষণ পরেই আরও দু'জন লোককে সঙ্গে করে সে ফিরে এল। একজনের হাতে লণ্ঠন, চাকর-বাকর কেউ হবে। আরেকজন মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে নিরীহ চেহারার বাঙ্গালী ভদ্রলোক, পায়ে চটি, গায়ে হাফসার্ট। হাফসার্টটি এইমাত্র গায়ে চড়িয়েছেন বোঝা যায়, হীরেনের সামনে এসে তৃতীয় বোতামটি লাগানো শেষ করলেন।

রামপাল কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'ইনি হেরম্ববাবু।'

হীরেনের মনে হল রামপাল তামাসা করছে। আলোচনা শুনে শুনে কল্পনায়

তাকে সে ভেবে রেখেছিল দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ একগুঁয়ে বদরাগী একটা মানুষ হিসাবে, যে হাণ্টার হাতে ঘুরে বেড়ায় আর মদ খেয়ে যুবতী কুলি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে যায়, পুলিশ যাকে খাতির করে, গ্রামশুদ্ধ লোক যার ভয়ে কাঁপে —তার এমন মাঝবয়সী মুদী দোকানের মালিকের মত নিরীহ গোবেচারী চেহারা!

'হীরেনবাবু তো? আমার নাম শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আপনার চাকরের কাছে শুনলাম, মশায় নাকি বড্ড মুস্কিলে পড়ে গেছেন। তা সেটা আশ্চর্য কি! অমনি হয় মশায়। থাকলে দু'ঢোক খেলাম তো খেলাম না খেলাম তো না খেলাম। কিন্তু না থাকলে তখন আলবৎ চাই! কি বলেন? হা! হা।'

জোরালো কিন্তু ক্ষণিকের হাসি।

'তা দয়া করে যদি এলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন পায়ের ধুলো দিন গরীবের বাড়ীতে।'

হীরেন আমতা আমতা করে বলল, 'আমি ভাবছিলাম একটা কি দুটো বোতল কিনে—অবশ্য আপনার যদি বাড়তি থাকে—'

হেরম্ব হাত জোড় করল।

'আমায় লজ্জা দেবেন না হীরেনবাবু। আপনার কাছে দাম নেবো! নেহাৎ যদি এসে বসে গরীবের সঙ্গে খেতে না চান আধ ডজন নিয়ে যান। দামের কথা বলবেন না।'

লোকটা কি ব্যঙ্গ করছে? বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলবার মতলব করেছে? কৃষ্ণেন্দু আর সে যে তাকে জব্দ করতে ঝুমুরিয়া এসেছে, এ খবরটা হয় তো ও জানে। এতটুকু গ্রামে এ সব কথা চাপা থাকে না। হেরম্বের বুকটা একটু টিপ্ টিপ্ করতে লাগল।

বারান্দার কাছে গিয়ে দেখা গেল, ফর্সা তোয়ালে ঢাকা ছোট একটি টেবিলে মদের বোতল গ্লাস আর ডিস সাজানো রয়েছে। দুদিকে দুটি চেয়ার।

হেরম্ব বলল, 'যাবার সময় যত খুশী নিয়ে যাবেন, কিন্তু অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে বসে একটু খেয়ে আমায় কেতাথ করতে হবে মশায়। লোকনাথবাবুর ছেলেকে একটু এণ্টারটেন করবার ভাগ্য যদি হল আমার, বঞ্চিত করতে পারবেন না দাদা।'

'আপনি আমার বাবাকে চেনেন ?'

'তাঁকে কে না চেনে ? মহাশয় ব্যক্তি—অতি মহাশয় ব্যক্তি। ধূলোমুঠো ধরে সোণা করছেন, আমরা কি তাঁর পায়ের ধূলোর যোগ্য।'

লোকটি ব্রাহ্মণ। ধার্মিক অর্থাৎ সাধন-টাধন কি সব করে বলে গাঁয়ের লোকে ভয়ের সঙ্গে একটু ভক্তিও নাকি করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটার মুখে এতবার তার আর তার বাবার পায়ের ধূলোর উল্লেখ শুনে হীরেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। চেয়ারে বসে, রঙীন পানীয় ভরা বোতলটির দিকে একনজর তাকিয়েই সে খুশী হয়ে উঠেছিল। যেখানে যার কাছে যে অবস্থাতেই পাওয়া যাক, সে ত্রাণ পেয়েছে। এত কষ্ট যে তার হচ্ছিল মদের জন্য এতক্ষণ যেন ভাল করে বুঝতে পারে নি।

দ্বিতীয় গেলাস শেষ করে এনে সে বলল, 'আপনি যে এত ভাল লোক তা জানতাম না হেরম্ববাবু। কলকাতা গেলে—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেকথা বলতে! শীগগির একবার কলকাতা গিয়ে আপনার পিতাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে আসব। একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয় দেব। বাবা খুব খুশী হবেন। আপনাকে একটু এণ্টারটেন করার সুযোগও আমি পাব।'

টেবিলে একসঙ্গে মদ খেতে বসলে অল্পসময়েই হৃদ্যতা জমাট বেঁধে যায়। আলাপ আলোচনা সহজ হয়ে আসে। ভদ্রতা ও অমায়িকতার সীমা কোন পক্ষেই থাকে না।

'হঠাৎ ঝুমুরিয়া বেড়াতে এলেন ভাই ?'

'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। ঝুমুরিয়া তার বাড়ী।

'হাঁ হাঁ, তাই বটে। দু'জন নতুন ভদ্রলোক গাঁয়ে এসেছেন শুনছিলাম বটে। বন্ধুকে নিয়ে এলেন না ?'

'সে এসব খায় টায় না।'

হেরম্ব হাসল দেখে হীরেনও হাসল। তার হাসি গল্প কমে এল রাত এগারটার সময়। ভেতরে তার একটা উদ্বেগ জেগেছে। নেশা চড়াতে চড়াতে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ঠিক নেই। আরও মদ তাকে খেতে হবে, এ পর্যন্ত খেয়ে সে কোনদিন থামতে পারে নি। কিন্তু এখানে তো আর এগোনো যায় না। এবার তার বিদায় নেওয়াই ভাল। কথা বলতেও আর ভাল লাগছে না। চুপচাপ

মমতার কথা ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে। মমতা সতী না অসতী ভেবে ভেবে তার বার করা চাই—আজ রাত্রেই বার করা চাই। চুলচেরা হিসাব করতে হবে সব ঘটনার, মমতার কথাবার্তা আর চালচলনের। কৃষ্ণেন্দু কি যেন সব বলেছে মমতার সম্বন্ধে? কথাগুলি তলিয়ে বুঝতে হবে। মমতা হয়তো ধোঁকা দিয়েছে কৃষ্ণেন্দুকে। যা চালাক মেয়ে মমতা! আর কৃষ্ণেন্দুর মত বোকা তো জগতে নেই।

বিদায় নেবার পালা শেষ হতে সময় লাগল। হীরেনকে বড় ভাল লেগেছে হেরম্বের, আরেকটু বসে যাবে না হীরেন, আরেকটু খাবে না? মদ চেয়ে নিতে হীরেনের বড়ই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, হেরম্ব নিজেই কাগজ মোড়া দুটি বোতল রামপালের জিম্মা করে দিল। পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আপশোষ করে বলল, 'কাল সকালেই যাবেন ভাই? আরেকটা দিন থেকে যান না?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'তবে আর কি বলব! দু'চার দিনের মধ্যে আমিও যাচ্ছি কলকাতা। আপনার বাবার সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দেবেন।'

ঝুমুরিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের কোণে ডুবু ডুবু চাঁদ। কই, কষ্ট তো হীরেনের কমে নি! কড়া আঁচে আবেগের ভিয়ান চড়েছে, আঠার মত যেন ব্যথার তাপে মন জ্বলে গেল। মমতার কথা ভেবে লাভ নেই, চুলচেরা হিসাবে ফল হবে না। মমতা ভাল হোক খারাপ হোক, কিছু তাতে এসে যায় না। সে জানে। তার মন জানে। মমতা তাকে ভালবাসে না, জগতের অন্য সব মেয়ে তাদের স্বামীদের যেমন ভালবাসে। দিগম্বরী যেমন পূজা করে তার স্বামীকে, স্বামী জ্ঞান স্বামী ধ্যান স্বামী সর্বস্ব করে জীবন কাটায়। কি অসহায়, বঞ্চিত জীবন হীরেনের, কি অকথ্য অদ্ভুত তার ভাগ্য! কোন অভাব তার নেই, শুধু সেই জিনিসটি সে পেল না, সকলে যা আপনা থেকে পায়, বিয়ে করা স্ত্রীর শ্রদ্ধা ভালবাসা। শশাঙ্কের মত মানুষ যা পেয়েছে, তার কাছে সেই সুলভ সাধারণ জিনিস আকাশের ওই ডুবু ডুবু চাঁদটির মত অপ্রাপ্য!

না, আরও অনেক মদ খেতে হবে। খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হবে। কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হবে, কিন্তু বাধা দেবে না। কৃষ্ণেন্দু তার ভীষণ যন্ত্রণার কথা জানে। যদিও সে মাঝে মাঝে বলে, এটা তার মাথার একটা দোষ, একটা

অসুখ, চিকিৎসা করালে সেরে যাবে, কিন্তু ওসব কৃষ্ণেন্দুর মুখের কথা। মনে মনে কৃষ্ণেন্দু সব বোঝে। কৃষ্ণেন্দুর মত বন্ধু তার নেই।

'রামপাল?'

'আজ্ঞে?'

'হেরম্ববাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম এ কথাটা গোপন রেখো।'

'আজ্ঞে, তা আর বলতে! ও কথা কি প্রকাশ করা যায়!'

বড় দীঘিটার কাছে পৌঁছে হীরেন রামপালকে একটা বোতল দিয়ে বিদায় করে দিল।

'বাড়ী তক্ পৌঁছে দি' না বাবু?'

'না, তুমি বাড়ী যাও। এটুকু যেতে পারব।'

দিগম্বরী আজ একলা শুয়েছে। হয়ত তার ঘুম আসছে না। শশাঙ্কের কথা ভাবছে। শশাঙ্ককে সে চাকরীটা দেবে। লোকটা অপদার্থ, কোন কাজে লাগবে না, পঁচিশ ত্রিশ টাকার বেশী ওর মাইনে হওয়া উচিত নয়। তবু দিগম্বরীর জন্ম ওকে সে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রাখবে। মমতার সঙ্গে সর্বদা দিগম্বরীর মেলা-মেশার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে হীরেনের আর উৎসাহ ছিল না। এই উদ্ভট কল্পনাকে কি করে প্রশ্রয় দিয়েছিল ভেবে এখন সে বরং আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। মমতা বদলাবে না। এ জগতে এমন কোন শক্তি নেই মমতাকে যা বদলাতে পারে। অন্যকে দেখে কেউ স্বামীভক্তি শিখতে পারে?

শুধু দিগম্বরীর জন্য সে শশাঙ্ককে চাকরীটা দেবে। দিগম্বরী স্বামীকে ভালবাসে বলে, ভক্তি করে বলে—তার অপদার্থ নেশাখোর স্বামী তার জীবন-দেবতা বলে।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিতে দিতে হীরেনের মেজাজ চড়ে গেল, কেউ দরজা খুলল না। তখন সে জুতো পায়ে দরজায় লাথি দিতে আরম্ভ করল। খানিক পরে বোঝা গেল আলো নিয়ে কেউ উঠান পার হয়ে আসছে।

বন্ধ দরজার ওপার থেকে ভীত স্বরে দিগম্বরী শুধোল, 'কে?'

'আমি। হীরেন।'

দিগম্বরী দরজা খুলতেই সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কতক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি, সবাই কি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন?'

দিগম্বরী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিলাম, শুনতে পাইনি। সর্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুরপো, কেষ্ট ঠাকুরপোকে ধরে নিয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার একটু পরেই পুলিশ এসেছিল। কৃষ্ণেন্দুর স্যুটকেশ খুলে, বিছানাপত্র ঘেঁটে, এদিক ওদিক একটু খোঁজাখুজি করে তাকে নিয়ে চলে গেছে। যাবার সময় নাকি মোহনকেও ধরে নিয়ে গেছে।

'কি সর্বনাশ হল ঠাকুরপো।'

'এ সর্বনাশ তো হতই বৌঠান। এ ববং কম সর্বনাশ হল। কিন্তু পুলিশ খবর পেল কি করে?'

'মোহন একটা দল করেছে না, পুলিশ ওকে নাকি ধরব ধরব করছিল।'

'কিন্তু কৃষ্ণেন্দু? ওকে ধরল কেন?'

'তাতো জানি না ঠাকুরপো।'

কৃষ্ণেন্দুকে আগেও দু'বার পুলিশে ধরেছে, কিছুদিন করে জেলও খাটিয়েছে। এত রাত্রে তার ধরা পডার ব্যাপার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। হীরেন দরজা বন্ধ করতে গেল।

দিগম্বরী ভয়ে ভয়ে বলল, 'ঠাকুরপো, এ বাড়ীতে আপনি কেমন করে থাকবেন?'

'কেন?'

'আমি যে একলাটি আছি ঠাকুরপো? পঞ্চুর মাকে আজ রাতে আমার কাছে শুতে বলেছিলাম, সে আসেনি। পুলিশের হাঙ্গামায় ভয় পেয়েছে বোধ হয়।'

'আমি কি তবে এত রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব?'

'একটু যদি সকাল সকাল ফিরতেন ঠাকুরপো।'

'সে কথা ভেবে তো এখন লাভ নেই।'

'লোকে যে নিন্দে করবে ঠাকুরপো, যা তা বলবে।'

হীরেন চটে বলল, 'একটা মাদুর টাদুর দিন, আমি ওই গাছতলায় ঘুমোইগে।'

দিগম্বরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'রাগ করলেন ঠাকুরপো? আপনাকে কখনো গাছতলায় ঘুমোতে দিতে পারি! দিন, দরজাটা বন্ধ করে দিন। লোকে দুকথা বলে তো বলবে। আমরা তো বেশীদিন থাকছি না এখানে, দু'দিন বাদেই কলকাতা চলে যাব।'

সদরের দরজা বন্ধ করে উঠানে নেমে দিগম্বরী কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, 'সব শুনলে উনিও রাগ করবেন না।'

'ওনার রাগ করবার কি আছে?'

'ওমা! আপনি যেন ছেলেমানুষের মত কথা বলেন ঠাকুরপো। খালি বাড়ীতে একলাটি পর-পুরুষের সঙ্গে বৌ রাত কাটালে স্বামী কিছু ভাববে না, একটু চটবে না? তবে আপনার কথা ভিন্ন। আপনি তো পর নন্।'

কৃষ্ণেন্দু আর হীরেন দু'জনের বিছানাই ওলট পালট হয়ে আছে। দুটি স্যুটকেশ খোলা, জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। দিগম্বরী হীরেনের বিছানা ঠিক করে দিল।

'আপনার খাবারটা এনে দি? রান্না কিছু হয় নি, যা হাঙ্গামা গেল। শুধু ভাজা আর মাছের ঝোল। দুধটুধ দিয়ে কোনরকমে খেয়ে নিন।'

'আমি খাব না বৌঠান। খেয়ে এসেছি।'

'ওমা, কোথায় খেলেন?'

'খেয়েছি এক জায়গায়।'

মদের বোতলটার দিকে দিগম্বরী বার বার তাকাচ্ছিল। তারপর চেয়ে দেখছিল হীরেনের মুখ। খানিক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি মদ খান ঠাকুরপো?'

হীরেন জবাব দিল না। একি বোকার মত প্রশ্ন?

'মদের বোতল নয় ওটা?'

হীরেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওটা মদের বোতল। মদ খেয়েছি, আরও খাব। আপনার কিছু ক্ষতি আছে?'

'খেয়েছেন!' দিগম্বরী যেন চমকে গেল। 'আমিও তাই ভাবছিলাম। না ঠাকুরপো, আমার কোন ক্ষতি নেই। এমনি জিজ্ঞেস করলাম। তবে আমি যাই।'

দরজার কাছে পিছিয়ে গিয়ে অনুমতির অপেক্ষায় দিগম্বরী দাঁড়িয়ে রইল।

'যাই, ঠাকুরপো?'

'দাঁড়ান একটু। এক মিনিট।'

সন্দিগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টিতে হীরেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খালি বাড়ীতে তাকে মাতাল জেনে ভয় পেয়েও দিগম্বরী পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে খিল

এঁটে দিল না, এত সম্মান তার, এত খাতির! হাত ধরে সে তাকে টানতে পারে এই ভয়কে চাপা দিয়েও তাকে অখুশী না করার প্রয়োজনটা এত বড় দিগম্বরীর কাছে! তবে, এও হতে পারে যে ভয় হয় তো সে বেশী পায় নি। তাকে হয় তো সে বিশ্বাস করে।

'কি ঠাকুরপো? কি বলছেন?'

'বসুন না একটু? একলা থাকতে ভাল লাগছে না।'

'বসব?'

'একটু বসুন। কথাবার্তা বলি।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন ঘুমোইগে। আপনিও ঘুমিয়ে পড়ুন ঠাকুরপো।'

হীরেন জোর দিয়ে বলল, 'পাঁচ মিনিট বসুন।'

দিগম্বরী ধীরে ধীরে গিয়ে কৃষ্ণেন্দুর এলোমেলো বিছানায় বসল। মুখের ভাব তার ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। বারবার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসছে, তুলে তুলে নামিয়ে নিচ্ছে মুখ।

হীরেনের মনে পড়ল, ঝোঁক এলে সে যাদের ঘরে মদ খেতে যায়, তারা এরকম করে না। তবে দিগম্বরী তাদের মত নয়, দিগম্বরীর অভ্যাস নেই। শশাঙ্ক ছাড়া দিগম্বরী কোন পুরুষকে জানে না, চেনে না, তার জগতে শশাঙ্ক ছাড়া কেউ নেই। তাই সে এরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একটু কাঁপছে। তবু তার ডাকে দিগম্বরী ঘরে এসে বসেছে। শশাঙ্ককে সে চাকরি দেবে বলে। মাসে মাসে শশাঙ্কের মাইনের টাকাটা সে ভোগ করবে বলে,—অবশ্য শশাঙ্কের সঙ্গে ভোগ করবে বলে।

এখনো কি তার উপর বিশ্বাস আছে দিগম্বরীর? এখনো সে কি আশা করছে, সত্যি সত্যি সে তাকে কথা বলবার জন্য ঘরে ডেকে বসিয়েছে? আরেকটু এগোনো যাক। আরও স্পষ্ট, আরও নির্ভুল মীমাংসা হয়ে যাক। তারপর এ যন্ত্রণা থেকে সে ও বেচারীকে মুক্তি দেবে। আর পীড়ন করবে না।

'অত দূরে বসলেন কেন? এখানে এসে বসুন।'

দিগম্বরী সাড়াও দিল না, উঠবার চেষ্টাও করল না।

হীরেন একটা সিগারেট ধরাল। মদের বোতলের কথা তার মনেও ছিল না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে এতক্ষণে সে টের পেল তার হাতও থর থর করে কাঁপছে।

'আমি ভাবছিলাম কি জানেন? সামনের বুধবার মাসের পয়লা তারিখ, একেবারে বুধবার না হোক, সামনের সপ্তাহের মধ্যে যদি শশাঙ্কবাবু কাজে লাগেন মাসের পুরো মাইনেটা পাবেন।'

'সামনের সপ্তাহেই যাবেন,—সোম মঙ্গলবার।'

'সেই ভাল। এখানে এসে বসুন না?'

ওঠবার চেষ্টা দিগম্বরী করে। ওঠে না। হীরেন সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতা দিয়ে পিষতে থাকে। তারপর জুতো খুলে বিছানায় পা তুলে বসে। তারপর দিগম্বরী উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে হীরেনের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একটু বাকী, তারপর হীরেন ওকে মুক্তি দেবে। হাতটি শুধু ধরবে একবার। হাত ধরলে দিগম্বরী কি করে দেখে সে হাসিমুখে সহজভাবে বলবে 'আচ্ছা, আপনি এবার যান।'

লণ্ঠনের কাছে আসায় দিগম্বরীকে স্পষ্ট দেখাচ্ছে। হঠাৎ তার হাত ধরতে হীরেনের সাহস হল না। তার খেয়াল খেলার সীমানা পার হয়ে যেন এতক্ষণে দিগম্বরী রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। হীরেন কোনদিন ভাবতেও পারে নি মানুষ এমন রূপসী হতে পারে! ঝুমুরিয়া ঘুমিয়ে আছে—চারিদিকের সমগ্র ঝুমুরিয়া। এতবড় বাড়ীর একটী ঘরে জেগে আছে শুধু সে আর এই মানবী। এত কাছাকাছি জেগে আছে!

দিগম্বরীর ডান হাতের কব্জি চেপে ধরার পর হীরেনের খেয়াল হল সে তার হাত ধরেছে।

'বোসো।'

'না।'

'বসবে না?'

'না। আমি যাই।'

হীরেন তার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বলল, 'আচ্ছা, যান। আমি ভোরে উঠেই চলে যাব।'

দিগম্বরী গেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল!

'শশাঙ্কদা গেলেই চাকরী পাবেন।'

দিগম্বরী তার পাশে বসল। দু'হাতের মুঠোয় তার হাত ধরে বলল, 'রাগ করলেন ?'

তারপর দিগম্বরীই হাত বাড়িয়ে টেবিলের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

বাইরের ডাকাডাকিতে ভোরে আগে ঘুম ভাঙ্গল দিগম্বরীর। হীরেনকে তুলে দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খিড়কি দিয়ে পালিয়ে গেল কিনা কে জানে। সকলের আগে হীরেনের চোখে পড়ল টেবিলের উপর মদের বোতলটার দিকে। বোতলটা খোলাও হয়নি। তার মদ খাওয়ার ইতিহাসে এটা ঘটল এই প্রথম। মদ না ছুঁয়েও তার বেশ দিন কাটে, কিন্তু যখন আরম্ভ করে তখন বেহুঁস না হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতা তার হয় না।

বাইরে সমানে ডাকাডাকি চলছিল। হীরেন গিয়ে সদর দরজা খুলেই দেখল, পুলিশ। বুকটা তার ধড়াস্ করে উঠল।

তার জন্যই পুলিশ এসেছে। তবে তাকে ধরে নিয়ে যেতে নয়। কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে, কৃষ্ণেন্দু সম্পর্কে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করে, পুলিশ বিদায় নিল। সার্ট গায়ে ধুতিপরা যে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করল, তার কাছেই জানা গেল যে কৃষ্ণেন্দু আর মোহনকে কোন নির্দিষ্ট আইনে গ্রেপ্তার করা হয় নি। আদালতে তাদের বিচার হবে না, জেলও হবে না। কোথাও শুধু আটক রাখা হবে, আর কিছু নয়। ব্যাপার খুব সামান্য।

'কৃষ্ণেন্দু এখানে এসেছে আপনারা খবর পেলেন কি করে ?'

সে শুধু একটু হেসেছিল।

হীরেন একেবারে স্নান করে ফেলল। সমস্ত জগৎ কেমন যেন শান্ত, সহনশীল হয়ে গেছে। গভীর সন্তোষ যেন শুধু মন নয় দেহেরও সম্পদ। নতুন দিনের নতুন রোদ, সুন্দর সোনালী রোদ, পৃথিবীর কোথাও ক্ষোভের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না, জীবনের সীমাহীন প্রান্তর কচি ঘাসে ছেয়ে গেছে। ফাঁকি নেই, নালিশ নেই, সন্দেহ নেই, বিচার নেই—সরল হয়ে গেছে বেঁচে থাকা।

দিগম্বরী চা করে দিল। নির্বাক, উদভ্রান্ত, চিন্তাময়ী দিগম্বরী—নতুন বৌটির মত লজ্জার ভারে সকাতরা, সুখ-বিহ্বলা দিগম্বরী।

হীরেন উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আরে এ কি ! ওসব কিছু নয়, বৌঠান।'

শুনে দিগম্বরী একেবারে কেঁদে ফেলে নালিশ জানাল, 'আপনার কাছে কিছু নয়।'

'আহা, আপনি বোঝেন না কিছু। ওসব মানুষের জীবনে ঘটে যায়। আমাদের দুজনেরি এটুকু স্বাধীনতা, একটু অধিকার আছে। আপনি খারাপ ছিলেন না, খারাপ হয়েও যান নি।'

'আমার যে স্বামী আছে ঠাকুরপো?'

'আমারও তো স্ত্রী আছে।'

'আপনার কথা আলাদা। আপনি পুরুষ মানুষ।'

'আপনিও পুরুষ না হন—মানুষ।'

দিগম্বরীও এক কাপ চা খেল। চোখের জল শুকিয়ে গেল চোখেই। উদভ্রান্ত ভাব কেটে গিয়ে এল থম থমে ভাব। কোনরকম অন্যমনস্কতা তার দেখা গেল না। কিন্তু মনে হল একটা কথাই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে ভাবছে।

'আজকেই চলে যাবেন তো?'

'তাই ভাবছি। থেকে আর কি করব!'

দিগম্বরীর চোখে ঝিলিক খেলে গেল।

'না থেকে আর কি করবেন!'

হীরেন সিগারেট ধরাচ্ছিল, প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত হলে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে নীচু গলায় আপজনকে মনের কথা শোনানোর মত সরলতার সঙ্গে বলল, 'কি জানেন, বৌটার জন্য বড্ড মন কেমন করছে। মনটা কেমন বিগড়ে গিয়েছিল, অনেকদিন বৌটার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি নি। সেজন্য আরও তাড়াতাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনার বৌ খুব সুন্দরী, না ঠাকুরপো?'

'সে তো দেখতেই পাবেন।'

দিগম্বরী রান্না করতে গেল। সকালের গাড়ী আর ধরা যাবে না, একটার গাড়ী ধরতে হলে খেয়ে দেয়ে এগারোটার মধ্যে হীরেনের রওনা হওয়া দরকার। গরুর গাড়ী ঠকর ঠকর করে চলবে। একটার গাড়ীতে গেলেও আজ রাত্রে মমতার সঙ্গে দেখা হবে, তার বাড়ী অথবা বাপের বাড়ী যেখানেই সে থাক। দিনে দেখা হওয়ার চেয়ে একান্তে সমস্ত রাত্রির জন্য দেখা হওয়াই ভাল। তবু দীর্ঘ দিনটা কাটাবার চিন্তায় হীরেন একটু অসহিষ্ণুতা বোধ করে। তার শান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শুধু এই একটি অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

যাবার আগে রম্ভার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া দরকার। রম্ভার মনে নিশ্চয় খুব আঘাত লেগেছে। বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল। সে ব্যবস্থা তো ভেস্তে গেলই, বেচারার ভাইটিকে পর্যন্ত পুলিশে ধরে নিয়ে গেল।

জামা গায়ে দিয়ে হীরেন বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, দিগম্বরী এসে বলল, 'ঠাকুরপো, ওঁকে তো একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হয় আজকেই ফিরে আসবার জন্যে ?'

'তা হয় বৈকি।'

দিগম্বরী সাগ্রহে বলল, 'তবে একটা টেলিগ্রাম লিখে পাঠিয়ে দিন ঠাকুরপো। ওঁর স্বভাব কি জানেন, বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারেন না, নেশাটেশা আরম্ভ করে দেন। বড্ড ভাবনা হচ্ছে আমার।'

'ঠিকানা জানেন তো ? ঠিকানাটা দিয়ে দেবেন, যাবার সময় স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দেব।'

দিগম্বরী মাথা নেড়ে বলল, 'সে বড় দেরী হয়ে যাবে। হয় তো আজকে ফেরবার গাড়ী পাবেন না। এখুনি পাঠিয়ে দিন। ও বাড়ীর শম্ভুর সাইকেল আছে, ক'গণ্ডা পয়সা দিলেই যাবে।'

সদরে দিগম্বরীর এক পিসীর বাড়ীতে শশাঙ্ক উঠেছে। শশাঙ্ককে আজকেই ফিরে আসবার জন্য দিগম্বরীর জোরালো তাগিদ জানানোর বার্তা ও ঠিকানা প্রভৃতি একটা কাগজে লিখে হীরেন বলল, 'আমি তো শম্ভুর বাড়ী চিনি না।'

'কাছেই বাড়ী। সদর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন।'

'শম্ভু ইংরাজী জানে তো বৌঠান ? ফর্মে সব ঠিকমত লিখতে পারবে তো ?'

'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, ইংরেজী জানে না ! ওনার মত, আপনার মত অবিশ্যি জানে না, তবে মন্দ জানে না।'

শম্ভুকে দেখেই হীরেনের মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠল। বছর কুড়ি বয়সের সুশ্রী সবল তরুণ, সুগঠিত সুন্দর দেহ। সোজা মুখের দিকে তাকায় নির্লজ্জের মত কথা বলে, কাচুমাচু করে না।

'আপনার টেলিগ্রাম হলে এক টাকা লাগবে, দিগুদি'র হলে ছ'আনা।'

'আমি কি অপরাধ করলাম ?'

'আপনি বড়লোক। আপনাকে কনসেশন দেব কেন ?'

'বেশ, আমি তা'হলে দু'টাকা দিচ্ছি।'

শম্ভু মাথা নেড়ে বলল, 'এক টাকা। কাজ করে পয়সা নেব, ভিক্ষে তো নিচ্ছিনা আপনার কাছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, এক টাকা নিও। অত মেজাজ করো না ভাই। ভাল মানুষ কখনো মিছিমিছি মেজাজ গরম করে না।'

শম্ভু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল।—'মেজাজ করিনি। আপনার কাছে সবাই মিন মিন করে কথা কয়, কেউ সোজা স্পষ্ট কথা বললে আপনার মনে হয় মেজাজ দেখাচ্ছে।'

'বিনয় মান না? ভদ্রতা?'

'বিনয় মানে তো নেকামি? একেবারে নেতিয়ে পড়া? ওসব বিনয় আর ভদ্রতার ধার ধারি না মশায়। বেশী বিনয় করতে গিয়েই তো আমরা গেলাম, কেবল সেলাম ঠুকতে ইচ্ছে হয়।'

হীরেন দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শম্ভুর সাথে আলাপ করল। শম্ভুর বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। মা মাসী ভাই বোন ভাগনে ভাগ্নিরা আছে। আর আছে কিছু জমি। শম্ভু জমি চাষ করায় আর তার সাইকেল চেপে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করে, তারপর একদিন সদরে গিয়ে সব কিনে আনে।

হীরেন মনে মনে ভেবে রাখল, কিছুদিন পরে একবার এই ছেলেটির খবর নিতে হবে।

তারপর খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে আর খানিকটা কর্তব্যবোধে হীরেন দেখা দিতে গেল রম্ভাকে। একটু সহানুভূতি জানাবে। টাকা পয়সার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবে।

নিজের ভাবেই সে মসগুল। জীবনটা ভাল লাগছে। এক রাত্রে ফুৎকারে উড়ে গিয়েছে সব ক্ষোভ। মন পাক খাচ্ছে বিরহিনী মমতাকে কেন্দ্র করে। মমতা অবাক হয়ে চমকে যাবে, খুশীতে নেতিয়ে পড়বে তার বুকে, হাসি মুখে আর ছল ছল চোখে। আনমনে সে পথ চলে। গাঁয়ের চাপা উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, একক মানুষের মুখে, ঘরের দাওয়ায়, ফকিরের মুদি দোকানের সামনে, রামঘোষের বাড়ীর দক্ষিণে বটগাছ তলায় দু'চার দশজনের জমায়েৎ হয়ে আলাপ করার ভঙ্গিতে, কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু সে তার দিকে চাউনির রকমে —এসব কিছুই তার চোখে পড়ে না।

বাইরে ছিল জীবনলাল। রম্ভাকে ডেকে দিতে বলায় সে ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনিই বরং ভেতরে আসুন বাবু। ওর মেজাজটা ভাল নেই। মোরা কথা কইতে গেলে কামড়ে দিতে আসে।'

রম্ভাকে দেখাল থমথমে। দাওয়ায় উঠবার সিঁড়িতে পা রেখে সে বসেছিল, হীরেনকে দেখে নড়ল না, কথাও বলল না। মুখ বাঁকিয়ে ভুরু পাকিয়ে কোণাচে চোখে চেয়ে রইল একটি কলাগাছের আধলুকানো মোচাটির দিকে। দাওয়ার কোণে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে নরেশ নতুন একটি খড় চিবোচ্ছিল। এখানে এসে নতুন খড়ের বিচিত্র স্বাদে তার মন ভুলেছে। যখন তখন খড় মুখে পুরে চিবোতে থাকে।

'আমি তো আজ যাচ্ছি রম্ভা।'

রম্ভা সাড়া দিল না।

'ভারি দুঃখের ব্যাপার হল রম্ভা। এমন হবে কে ভাবতে পেরেছিল বল। পুলিশ এমন আচমকা ওদের ধরে নিয়ে যাবে—'

রম্ভা একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হীরেন দরদ বোধ করল অসীম। রম্ভার দুঃখের সত্যই তুলনা নেই। ও যে এমন মুহ্যমান হয়ে পড়বে তা আর আশ্চর্য কি। সান্ত্বনা দেবারও কিইবা আছে ওকে!

'মন খারাপ কোরো না রম্ভা। সব অবস্থাতে শক্ত থাকবে এই তো চাই আমরা তোমার কাছে। আমার যা করার আছে তা আমি করব। কেষ্ট আর তোমার ভায়ের জন্য যত টাকা লাগে খরচ করব। তুমি বরং কিছু টাকা রেখে দাও—দরকার হতে পারে।'

এবার রম্ভা ফেটে গেল।

'আপনার টাকায় আমি মুতে দি। লজ্জা করে না? বেহায়া, বজ্জাত কোথাকার। মাতাল, বিশ্বাসঘাতক!'

হীরেনের দুটি কান দুটি ভাঙ্গা কাঁসির মত ঝন ঝন করে বাজে। মানসিক ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে তার আত্মতৃপ্তির বিরাট মহল। মাতাল! বিশ্বাসঘাতক! রামপাল রম্ভার স্বামী। কাল সে রামপালকে সঙ্গী করে মদ খেতে গিয়েছিল হেরম্বের বাড়ী। সে মাতাল, সে বিশ্বাসঘাতক!

কি বিশ্বাসঘাতক রামপাল! একসঙ্গে তারা মদ খেয়েছে তবু রামপাল প্রকাশ

করে দিয়েছে তার গত রাত্রির উন্মত্ততার কথা। কিম্বা অন্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে? হেরম্বের চাকর হয়তো গল্প করেছে। গাঁয়ের কেউ হয়তো দেখেছে। গাঁয়ের সবাই হয়তো জানে তার অপকীর্তির কথা—হেরম্বের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর বন্ধুর দহরম মহরমের কাহিনী হয়তো ছড়িয়ে গিয়েছে দিগদিগন্তে!

'চুপি চুপি ছুরি মারলেই হত কেষ্টবাবুর পিঠে? বজ্রাঘাত হয় না আপনার মত লোকের মাথায়? সাপে কামড়ায় না আপনাদের? কুষ্ঠ হয় না?'

হীরেন প্রায় কাতর ভাবেই প্রতিবাদ জানায়, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ রম্ভা। আমি মাতাল হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক নই।'

রম্ভা ব্যঙ্গ করে বলে, 'নন্? শত্তুরের সঙ্গে চুপি চুপি ভাব করে বন্ধুকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া কেন বিশ্বাসঘাতকতা হবে! ও খুব ভাল কাজ।'

হীরেনের মনে কথা জাগে: 'আমার জন্য কেষ্টর এতটুকু ক্ষতি হয় নি রম্ভা। আমি শুধু হেরম্বের সঙ্গে মদ খেয়েছি' কিন্তু মুখে তার শব্দগুলি উচ্চারিত হয় না। মনের মধ্যেই সে যেন রম্ভার ঝাঁঝালো জবাব শুনতে পায়: 'তা বৈকি। বন্ধুর শত্তুরের সঙ্গে, খুনের সঙ্গে বসেই তো লোকে মদ খায়! বন্ধু যাকে শাস্তি দেবে পরদিন, তার সঙ্গে রাত্তির বেলা চুপি চুপি আড্ডা দিতে যায়।'

হীরেন ধীরে ধীরে চলে যায়, রম্ভা তাকে শুনিয়ে বলে, 'যান্ যান্। কোথায় পালাবেন? সবাইকে বলব আপনার কীর্তির কথা। কলকাতা গিয়ে চাদ্দিকে রটাব, সবাইকে চিনিয়ে দেব আপনি কেমন ধাবা লোক, যে যেখানে আছে।'

কত কল্পনা নিয়ে আজ ঘুম ভেঙ্গেছিল হীরেনের। কি তেজ সঞ্চার হয়েছিল তার রক্তে, কি উৎসাহ জেগেছিল মনে, সব বাধা সরিয়ে কিভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল নিজের মধ্যে। ফিরে পেয়েছিল বিশ্বাস, পথ খুঁজে পেয়েছিল অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধিতে। সব এখন ভেস্তে গেছে, ফেঁসে গেছে, চুপ্‌সে গেছে উবে গেছে।

মমতা শুনবে তার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা। আরো বেশী তাকে ঘৃণা করবে মমতা।

না শুনলেই বা কি। তার মত অপদার্থ, অসংযত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষকে এমনিই ঘৃণা করবে মমতা। ঘৃণা সে করছে—চিরদিন করবে। ঘৃণাটা মনের জোরে চেপে রেখেছে এখন, তার এই কাণ্ডের কথা শুনলে সেটা ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে, জন্মের মত তাকে সে ছেড়ে যাবে।

হীরেন বুঝতে পারে যে এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে মমতা কত উঁচুতে আর সে কত নীচুতে, মমতার কাছে সে কত হীন, কি স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য তাদের মধ্যে। অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কি তার পাওয়া সম্ভব মমতার কাছে?

হীরেন দুঃখ পায়, তার অনুতাপ হয়। হতাশায় বিষাদে ঝিমিয়ে পড়ে। রাগে অভিমানে ফুঁসে ওঠে। হিংসায় জ্বলে যায়। তাই যদি হয়, এমন যদি সে অমানুষ, দেবতা কৃষ্ণেন্দু কেন এল তার জীবনে, কেন বন্ধু করল তাকে? কেন দেবী মমতা তাকে বরণ করল স্বামীর পদে? কি দরকার ছিল ওদের এভাবে কষ্ট দেবার, তার জীবনটা নষ্ট করবার? খারাপ লোক সে, খারাপ হয়েই থাকত। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশে, খারাপ কাজ করে, মনের ফুর্তিতে জীবন কাটিয়ে দিত হেসে খেলে।

সবাই ষড়যন্ত্র করেছে তাকে অসুখী করতে। বিশ্বসংসার তার বিরুদ্ধে। সে একা, তার কেউ নেই। হায়, কেন সে বেঁচে আছে!

বাড়ীর কাছাকাছি সাঁ সাঁ করে সাইকেল এসে তার নাগাল ধরে ব্রেক কষে থেমে যায়। শম্ভু টেলিগ্রামের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'আজ যেতে পারলাম না হীরেন বাবু, মাপ করবেন। জরুরী কাজ পড়েছে।'

দিগম্বরীর টেলিগ্রামের সঙ্গে হীরেন নিজেও একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে চেয়েছিল মমতার নামে, সে যাচ্ছে এই খবর দিয়ে। কাগজ দুটি সে ছিঁড়ে ফেলে।

শম্ভু বলে, 'আপনি তো বুঝতেই পারছেন। চাদ্দিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমি জানতাম না, এইমাত্র খবর পেলাম। অরাজকতা সত্যি আর সয় না হীরেন বাবু। বিনা পথ্যে, অযত্নে, অচিকিৎসায় সূর্যদা মারা গেল। মহীউদ্দীনের বাবা মরল জেলে। মোহনের বাবা খুন হল। তারপর কাল রাতে কেষ্টবাবু আর মোহনকে অ্যারেষ্ট করা হল। ওরা কি খেলা পেয়েছে? আমরা আর সইব না। আমি মোহনের দলের মেম্বার। মহীউদ্দিন আমাদের সেক্রেটারী। ও আমায় গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে বারণ করেছে।'

শম্ভু দম নিয়ে যোগ দেয়, 'আপনিও থেকে যান না হীরেনবাবু? এ সময় চলে যাবেন?'

'দেখি ভেবে।'

ভেবে দেখবার কিছু ছিল না। কৃষ্ণেন্দু আর মোহনের গ্রেপ্তারে গ্রামে

যদি উত্তেজনার সঞ্চার হয়ে থাকে, প্রতিহিংসা নিতে রম্ভা তার বিশ্বাসঘাতকতার, গল্প প্রচার করার আগেই তার চলে যাওয়া ভাল গ্রাম ছেড়ে। মিথ্যা হলেও রম্ভার কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

গরুর গাড়ীর কিচ ক্যাঁচ শব্দ করে ছি ছ্যা, ট্রেনের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয় পালান, পালান! ইউরোপীয় স্বামী স্ত্রী দুটি শ্লথ সংক্ষিপ্ত ভাষায় গল্প করছে, ঠিক কোন দেশের লোক তারা অনুমান করা যায় না। পাঁচ ছ'বছরের ছেলেটি জানালায় কনুই পেতে দু'হাতের তালুতে মুখ রেখে একভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের চলমান জগতের দিকে। বেশ একটু ঝুঁকেই আছে। ভয় করে না ওর বাপমার? হঠাৎ যদি পড়ে যায়?

সরে গিয়ে কাছে বসাটা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। তারপর ছেলেটাকে আরেকটু উঁচু করে চোখের পলকে বাইরে ঠেলে দেওয়া, চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে চেন টেনে গাড়ী থামানো। কত সহজ, কত সংক্ষিপ্ত! স্বামী প্রায় চোখ বুজে কথা বলছে, মুখে পাইপ ঝুলছে শিথিল ভাবে, স্ত্রী তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। কত নিরাপদ, কত স্বাভাবিক ছেলেটাকে বাইরে ঠেলে দেওয়া!

কিন্তু অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।

মনে দাঁড়িপাল্লা খাড়া করে হীরেন ছেলেটিকে এক পাল্লায় আর হেরম্বকে অন্য পাল্লায় চাপায়। কোন দিকে পাল্লা নামে না—নির্মল নিষ্পাপ একটি কচি ছেলে আর অত্যাচারী খুনে হেরম্বের সমান ওজনের টানে দাঁড়িপাল্লা থর থর করে কাঁপে; নিরপেক্ষ মৃত্যুকে জীবনের হিংসা ও প্রেমের আপেক্ষিক বাজী খেলায় হীরেন যোগ দেওয়াতে পারে না।

খড়্গপুরে নেমে মেল ধরেছে। চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে হীরেন ডাইনিং কারে যায়। জরিমানা দিয়ে মদ খাবে। হেরম্বের দেওয়া বোতল দিগম্বরীর বাড়ীতেই রয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। নইলে কি এই অ্যাড্‌ভেঞ্চার তার জুটত—মদ খাবার জন্য গাড়ী থামিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা।

হাওড়ায় নেমে হোটেলে যায়। আরও মদ খেয়ে চেনা মেয়েটার ঘরে যাবে। রাত নটায় তার খেয়াল বদলে যায়। মমতার জন্য মায়া জাগে। মমতার ঝাপসা মুখ বুক কাঁধ পিঠ কোমর নিতম্ব উরু বড় কাম্য, বড় কমনীয় মনে হয়। নিজের বোকামির কথা ভেবে তার হাসি পায়। কি ছেলেমানুষীই সে করেছে সারাদিন—সংসার-অনভিজ্ঞ ভাবপ্রবণ কিশোর প্রেম-পাগলের মত।

,পুরুষ হয়ে একটা মেয়েমানুষকে, নিজের বিয়ে করা বৌকে, বশ করার কৌশল যদি না জানে তবে সে কিসের পুরুষ! অন্যের কাছে মমতার কাছে শুনবার অপেক্ষায় তার থাকবার দরকার? নিজেই সে মমতার কাছে সব খুলে বলবে। বলবে, মমু, তোমার জন্য আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মমু। তোমার জন্য আমি মদ ধরেছি, তোমার জন্য দিগম্বরীর মত স্ত্রীলোককে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমি ডুবে যাচ্ছি মমু, আমায় বাঁচাও।

শুনে মমতা নিশ্চয় গলে যাবে।

আরিফ মোটে ক'দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাবার আগে তার সারা গায়ে অনেকগুলি ছোট বড় ফোড়া উঠেছিল। কতগুলি বসে গিয়েছে, কতগুলি পেকে ফেটে গিয়েছে, দু'একটা যা আছে সেগুলি বসে যাবে না পাকবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফোড়ার জন্য নিজেকে আরিফের সব সময় কেমন নোংরা মনে হয়, দিনে সে তিন চার বার স্নান করে। মাঝখানে একটু জ্বর হয়েছিল, তখনও বাদ দেয়নি।

সকালে সবে সে স্নান করে উঠেছে, মমতা এল। কয়েকটি ফোড়ার ঘা তখনো ভাল করে শুকোয় নি। মমতাই গরম জলে ধুয়ে ঘায়ে আর ফোড়ায় মলম লাগিয়ে দিল।

'আমি মুসলমান হতে পারি না আরিফ?'

'না। মুসলমানী হতে পার।'

'কত শীগগির হতে পারি?'

'যত শীগগির তোমার খুশী।'

'তাহলে চট্‌পট্ আমাকে মুসলমান করে নাও। তারপর চলো আমরা একবার ঝুমুরিয়া যাই।'

জেলে আরিফ গোঁফ রেখেছিল সখ করে। গোঁফের জন্য তার মুখের চেহারা আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। যাবার সময় আঙ্গুল বুলিয়ে তার গোঁফটা পরীক্ষা করে মমতা বলে, 'কাল গোঁফটা কামিয়ে ফেলো।'

কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলালের গ্রেপ্তারের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল। সকলের মধ্যেই কম বেশী তীব্র প্রতিবাদ গুমরে উঠল,

একি অন্যায়! একি অবৈধ, বেআইনী আচরণ পুলিশের, হেরম্বের। দেশভক্ত ত্যাগী একজন নেতা এলেন তাদের গাঁয়ে তাদের ভালর জন্য, বিনা কারণে চুপি চুপি তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া তাদের মধ্য থেকে।' কোন হাঙ্গামা হয় নি, কোন বেআইনী ব্যাপার ঘটে নি, একটা সভা পর্যন্ত করা হয় নি। কেন তবে গ্রেপ্তার হবে কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলাল, আটক থাকবে বিনা বিচারে? কেন চলবে হেরম্বের এ কারসাজি? সরকার কি হেরম্বের হাতের পুতুল? কৃষ্ণেন্দু আগে একবার এসে লড়াই করে গিয়েছিল চাষীদের জন্য। মোহনলাল চাষীদের মধ্যে কাজ করছিল। দু'জনে ধরা পড়ায় চাষীদের মধ্যে রীতিমত উত্তেজনা দেখা দিল। জালালুদ্দীন মারা গিয়েছিল নিমুনিয়ায়। কিন্তু জেলে মারা যাওয়ায় সকলের মনে সে শহীদের স্থান পেয়েছে। এ মনোভাব সকলের মনে আরও স্পষ্ট হয়েছে বীরেশ্বরের কারামুক্তির দিন সূর্যের নেতৃত্বে জালালুদ্দীনের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে যে শোভাযাত্রা ও সভা হয়েছিল তার ফলে। সূর্যও আজ বেঁচে নেই। শোভাযাত্রার সামনে ছিল জালালুদ্দীনের ভাই মহীউদ্দীন। মোহনলালের দল তাকে নেতা করে কোমর বেঁধে লেগে গেছে সকলের অসন্তোষকে আরও গভীর, আরও তীব্র করে তুলবার কাজে।

বীরেশ্বরের অপমৃত্যুতেও চারিদিকে এমন সাড়া জাগে নি। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু এমন উত্তেজনা দেখা দেয় নি। ও যেন খানিকটা ছিল হেরম্ব ও বীরেশ্বরের ব্যক্তিগত কলহের ব্যাপার। হেরম্ব অত্যাচার করছিল সত্য, বীরেশ্বর একা নিজের জন্য লড়তে যায় নি তাও সত্য, কিন্তু তবু হাঙ্গামাটা হয়েছিল বীরেশ্বরের জন্যই। হেরম্বের মত অত্যাচারীকে প্রকৃতির একটা অনিবার্য উৎপাতের মত মেনে নেবার সংস্কার আজও লোকের কেটে যায় নি। জমিদার, ধনী আর প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে আজও তো লড়াই একরকম হয়নি দেশের লোকের, ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রেরণাও যোগান নি নেতারা। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হেরম্বদের সঙ্গে সংগ্রামের ঐতিহ্য তো নেই-ই, বরং আছে মুখ বুজে সব সয়ে যাবার অভ্যাস। তারপর ছিল এই যুক্তি যে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম সেদিন সত্যই হয়েছিল এবং বীরেশ্বরের মৃত্যু ছিল রহস্যজনক, ঠিক কে তাকে মেরেছিল নিঃসন্দেহে জানা যায় নি। বীরেশ্বরের মৃত্যু নিয়ে তাই হৈ চৈ হয়েছিল কিন্তু ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। নেপথ্যে ছিল।

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু নেতা। মোহনলাল প্রিয় এবং একটি জনপ্রিয় দলের নেতা।

অনাথের দলের কয়েকজন ছেলে মোহনলালের দলে এসে যোগ দিয়েছে। হেরম্বের কাছে খেলার মাঠের জন্য টাকা নেওয়া আর ভবিষ্যতে এটা ওটার জন্য আরও টাকা পাবার ভরসা পাওয়া তারা পছন্দ করে নি। টাকা নেওয়ার ব্যাপারেও অনাথ ও সহদেব কেমন যেন রহস্যময়, হিসাবের ব্যাপারে শিথিল। কৃষ্ণেন্দুর আগমনে এরা ক'জন ছাড়াও দলের আরও অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, যোগ দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। নেহাৎ দলপতিদের খাতিরে পেরে ওঠেনি। কৃষ্ণেন্দুর গ্রেপ্তারের খবর পেয়েই এরা ক'জন মহীউদ্দীনের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তারা এদলে আসতে চায়। তারপর একে দু'য়ে আরও কয়েকজন আসতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে ক্রমে খবর ছড়ায়, বেলা বাড়ার সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ে। প্রথমে বিচ্ছিন্ন ভাবে, ছোট ছোট জমায়েতে।

দু'জনের গাড়ী পাশ কাটাবার সময় কার্তিক বলে পাঁচুকে, 'খবর জানিস পাঁচু ?'

'হাঁ। শুনলাম খবর। কাজে যেতে মানা করেছে।'

'কে মানা করেছে ?'

'কানাই বাবু। সিদে কথা বলে দিয়েছে, রাস্তায় খাটতে যাসনি পাঁচু, খবর্দার।'

'বটে ? তবে তো কাণ্ড হবে আজ !'

গাড়ী থামিয়ে দু'জনে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করে। কল্কেয় তামাক দিয়ে নারকেল ছোবড়া তাল পাকিয়ে আগুন করে তামাক খায়। ভদ্রলোক যেতে দেখলে সবিনয়ে সাগ্রহে জানতে চায় ঘটনা কি আর স্বদেশী বাবুরা কি করবে আজ, জানা কথা আরেকবার মন দিয়ে শোনে, ঠিক কি ঘটবে জানতে না পারায় কল্পনা করে বীরেশ্বর যেমন শুরু করেছিল তেমনি একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা, নয়তো ক'বছর আগে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে দেবার মত কোন ব্যাপারের সম্ভাবনা !

জগৎ দাসের ছেলে শিশু, বীরেশ্বরের হাঙ্গামার দিন সর্দি জ্বরের জন্য বাড়ী থেকে বার না হলেও যে ধরা পড়ে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়েছিল, হঠাৎ সে

ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে জগৎ ডেকে বলে, 'কোথা যাস্? এই শিশু! কোথা যাস্ তুই?'

'দেখে আসি কি ব্যাপার।'

'না, তোর যেতে হবে না। ওসব ব্যাপারে তোর গিয়ে কাজ নেই। বাড়ীতে বসে থাক। ছাপ মারা হয়ে আছিস, খেয়াল নেই? কিছু হলে পুলিশ সবার আগে তোকে ধরবে।'

'সে তো বাড়ী বসে থাকলেও ধরবে।'

শিশু উধাও হয়ে যায়। বাপের প্রাণের শঙ্কা নিয়ে জগৎ যতক্ষণ দেখা যায় তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর সামনে দাঁড়ানো কারো প্রস্তাবে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে, যাকগে। এমনিও যা, ওমনিও তাই। যাকগে। সেই থেকে ক্ষেপে আছে ছেলেটা এই যা ভাবনা। যাকগে।

খানিক ভেবে আবার বলে, আমিও যাই তবে। দেখে আসি। ধরে তো আমায়ও নয় ধরবে।

স্বদেবের দাওয়ায় বলাইচরণ, রামপদ, নিখিল, অবিনাশেরা প্রতিদিন জড়ো হয় ভোরে, সূর্য কয়েক হাত উপরে উঠে ভালো করে আলো হলেই তাদের আড্ডা ভাঙ্গে, যে যার বাড়ী যায় দোকানে সওদা কেনার দরকার থাকলে কিনে নিয়ে। রামপদ, নিখিল আর অবিনাশ মধ্য ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার, অঙ্ক ইংরাজী আর বাংলার। উপার্জন তাদের যথাক্রমে তেইশ, সাড়ে চব্বিশ আর উনিশ। তিনজনকেই অবশ্য কাগজে কলমে লিখতে হয় বেশী, স্কুলের গ্রাণ্ট বজায় রাখার জন্য। ভদ্রতা বজায় রেখে বেঁচে থাকতে প্রাণ তিনজনের বেরিয়ে গেছে। আজ তাদের আড্ডা ভাঙ্গতে অনেক দেরী হয়। রামধনের চালা ডিঙ্গিয়ে দাওয়ায় রোদ এসে পড়ার অনেক পরেও তারা ওঠে না। আবদুলের বাইশ বছরের ছেলে রহমান খবর ছড়ানোর কাজে বেরিয়ে আবেদন জানিয়ে গেছে, স্কুলটা বন্ধ রাখার চেষ্টা যেন মাষ্টার মশায়রা করেন। স্কুলে যেন তাঁরা না যান আর বটতলার সভায় উপস্থিত থাকেন। স্কুল বন্ধ রাখার, এমন কি স্কুলে না যাবার ক্ষমতা রামপদ, নিখিল আর অবিনাশের নেই, হেরম্বের শ্বশুরের সে স্কুল। কিন্তু মনে মনে তাঁরা টের পান, তাঁদের কিছুই করতে হবে না, স্কুল আপনা থেকেই বন্ধ থাকবে।

সে দিনকাল তো আর নেই। স্কুলের আট বছরের ছেলে পর্যন্ত আজ দল বেঁধে স্কুল বন্ধ করার কায়দা জানে।

'যাক বাবা, আজ তাহলে ছুটি।' রামপদ বলেন।

'তারকবাবু না খালি স্কুলে আটকে রাখেন চারটে পর্যন্ত।' বলেন অবিনাশ।

'তারকবাবু স্কুলে ঢুকতে পারেন কি ছ্যাখো আগে।' নিখিল বলেন।

সুদেব কম্পাউণ্ডার ডাক্তার, হাতযশ মন্দ নয়। কোন গোলমালে সে কখনো যায় না, কিন্তু নিজের ঘরে আর রোগীর বাড়ীতে সে খানিকটা স্বাধীনচেতা আর স্পষ্টবাদী। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কাউকে খাতির করে কথা কয় না।

'তোমরা দেখছি ছুটি পেয়েই খুশী। ছুটিটাই তোমাদের বড় হল, অ্যাঁ?'

'নিশ্চয়! হেরম্ব ব্যাটা অপঘাতে মরলে ওর অনারে কবে ছুটি পাব দিন গুনছি।'

'তোমরাই তো সায় দিয়েছিলে স্কুলে ধর্মঘট করার জন্যে ভূদেবকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে।'

'সায় দিই নি। চুপ করে ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, ওরে শালা তারকবাবু, কবে তোর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাব।'

'সভা করবে বলছে। সভা করে কি হবে?' স্কুলের কেরাণী বলাইচরণ বলে, তার শীর্ণ মুখখানি হতাশায় বাঁকা করে।

'সভাতেই কাজ হয়। সবাই একত্র হয়। আজ কি ভাবছ সেরকম সভা হবে, শুধু দুটো বক্তৃতা আর হাততালি? তৈরী হয়ে আসবে সবাই। ছোঁড়াগুলো কেমন পাগলের মত ছুটাছুটি করছে দেখছ না? সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, তৈরী করছে।'

'তৈরী সবাই হয়েই আছে।'

এদের বুদ্ধিমানের মত প্রাণহীন কথায় আজ প্রাণের স্বাদ এসেছে। চোখের চাউনি একটু উজ্জ্বল, চোখের পাতা একটু চঞ্চল। থেমে থাকার বদলে বুকটা আজ টিক্ টিক্ করছে। সুদেবের রোগী আসে, নতুন খবর দেয়, ওষুধ নিয়ে চলে যায়। গাঁয়ের ক্রমবর্দ্ধমান উত্তাপ যেন এই শীতল আসরকে আরেকটু গরম করে দেয়। বুড়ো শ্রীধর প্রায় সিধে হয়ে আশ্চর্য রকম দ্রুতপদে চলছিল পা টেনে টেনে, কাছে এসে শ্বাস টেনে টেনে বলে, 'বীরেশ্বরের মেয়েটা বেরিয়েছে। এলো চুল, চোখ রাঙা, আঁচল উড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। একেবারে মহিষমর্দিনী মূর্তি। পেটটা যেন উঁচু ঢেকল!'

স্কুলে হাজির হতে হলে এবার ওঠা চাই। নেয়ে খেয়ে যাবার দরকার হবে না, জামাটা গায়ে দিয়ে যাবার পথে বীরেশ্বরের মেয়েটাকে একবার দেখে যাওয়া চলবে। স্কুল যে আজ বসছে না তাতে আর কারো সন্দেহ নেই।

ঘনশ্যামের চাল ডাল তেল নুনের দোকানের সামনে জড়ো হয় চাষী মেয়ে পুরুষ। সওদা কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করে।

লোমশ বুকে হাত বুলাতে বুলাতে মদন বলে, 'মতলব আছে, আরও মতলব আছে। নয়তো কি এমনি ধরিয়ে দিল ওনাদের? শত্তুর সরাবে সব কটাকে এক এক করে, তদ্দিনে রাস্তা শেষ, তারপর মেয়ে চালান দেবে। রাধা আর বিন্তিকে বেচে লাভ করেছে হাজার হাজার টাকা। করে নি? তবে কি! হাঃ।'

মাতু বলে, 'ভরত না বিয়ে করেছে রাধাকে?'

রাধার মায়ের দূর সম্পর্কের কুটুম হীরু ঘোষ ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, 'মাসীর যেমন মাথা খারাপ। চাকরের সাথে বিয়ে দিতে ও ব্যাটা মেয়ে চুরি করে, না? সব ফাঁকি, চালবাজী—কেউ না নালিশ করতে পারে। মেয়ে চুরির মামলা কর, ভরত বলবে আমার বিয়ে করা বৌ, দশটা লোক সাক্ষী দেবে, হাঁ বিয়ে হয়েছে ঠিক, মন্তর পড়া বিয়ে! নইলে দিতাম না নালিশ ঠুকে রাধার মা যখন কেঁদে এসে পড়লো? দেখে নিতাম না কত বড় বামুনের ছেলে?'

'বামুনের ছেলে এমন হয়, মাগো!'

'হয় না? রাবণ কি ছিল? কুম্ভকর্ণ?'

'আর সয় না বলছি মাইতি মামা, মাইরি। রেত বিরেত একলাটি পেলে দিতাম মাথায় লাঠি বসিয়ে, যা থাকে অদেষ্টে।'

নাটু গোঁসাই বিজ্ঞের মত বলে, 'আরো নাঃ, মেয়ে চুরি নয়। মেয়ে তো ফের দেখতে ভাল হওয়া চাই, হেথা হোথা দু'চারটে পেল তো নিল, নয় তো নয়। রাস্তা করবে আরেকটা—গাঁয়ের বুক দিয়ে। এ রাস্তা থেকে বার করে সিধে টেনে নিয়ে যাবে সা'পুরের রাস্তায়। সড়ক ছোঁবে না, ফসল জমি বসত বাড়ীর ওপর দিয়ে রাস্তা চালাবে। জলের দামে কিনবে সব, দলিল তৈরী হচ্ছে খপর জানি।'

সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। শঙ্কায় ছোট হয়ে যায় চোখ। এতো অসম্ভব নয়, এই রাস্তা তৈরীর মধ্যেই তার অনেক প্রমাণ মিলেছে।

ইয়াকুব বলে, 'শুধু রাস্তার পেটে জমি ঘরদোর যাবে। দু'পাশের ক্ষেত থেকে, ঘরের উঠোন থেকে মাটি তুলবে। মোর ক্ষেতের কি করেছে দ্যাখোনি? মাটি তুলবি এক যাগা থেকে তোল, তা না, হেথায় হোথায় খাবলে তুলেছে। জমির দিকে চাইলে চোখে জল আসে।' বলতে বলতে ইয়াকুব কেঁদে ফেলে হু হু করে।

নাটু গোঁসাই আবার বলে, 'আর ট্যাক্‌সো তো আছে। তিনগুণ ট্যাক্‌সো করবে। পুলিশ তাই এখন খাতির করছে ওকে। এ সুযোগ কি ও ছাড়ে—এই সুযোগে সব বাগিয়ে নেবে।'

এই আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে দুটি ছেলে, বলে, 'দোকান বন্ধ কর ঘনশ্যাম। আজ হরতাল। বটতলার মাঠে সভা হবে ওবেলা, সবাই যাবে। বাঁচতে যদি, চাও; দল বেঁধে সভায় হাজির থেকো। বাঁচতে যদি চাও, উঠে পড়ে লাগো এবার, নইলে সবাই মরবে। তোমাদের বাঁচাতে যারা লড়ছিল, তারা নেই এবার তোমাদের লড়তে হবে···'

আবদুল হাই বলে, 'না কাদের, হিঁদু মোছলমানের বাত এতে উঠবে না। ঢের মোছলমান মার খেয়েছে। জালালুদ্দীন মিঞার ব্যাপারে মোরা চুপচাপ রইলাম, তাতে একটু বিগড়ে আছে সবাই। এবার জবরদস্তি চলবে না, বারণ ভি করা হবে না। যার খুশী যাক।'

হাফিজ আলি সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক বাত। হাঙ্গামা হবে তো উপায় কি!'

আবদুল হাই-এর স্নিগ্ধ মোলায়েম মুখের দিকে চেয়ে কাদেরের বুক একটু কেঁপে যায়। জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দেয় নি সত্য, বীরেশ্বরের বিরুদ্ধে দিয়েছিল। কিন্তু লোকের মনে যেভাবে এক সাথে মিলে গিয়েছে বীরেশ্বর আর জালালুদ্দীনের নাম, ও পার্থক্যটা কি খেয়াল থাকবে কারো? ধনা ও মনার সঙ্গে কেউ আর তফাৎ করবে না, তার স্বধর্মীরাও নয়। গাঁয়ের মোছলমানরা যদি তার বিপক্ষে যায়, আবদুল হাই কি আর তার পক্ষ নেবে! কাদের বাড়ী যায়। বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয় সদরের উদ্দেশ্যে।

শম্ভু এসে রম্ভাকে বলে, 'এমন করে বসে কেন তুমি? কাজের সময় মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকতে বুঝি শিখিয়েছিল সূর্যদা?'

'আমি কি করব শম্ভু?'

'তুমি কি করবে! কোমর বেঁধে গাঁয়ে এলে বিহিত করতে, এখন কাজের সময় বলছ তুমি কি করবে! সভায় যেতে হবে তোমায়—কোমর বাঁধো।'

'সভা?'

'কেন, কেষ্টুবাবু আর মোহন না থাকলে বুঝি সভা হয় না? দেশে আর লোক নেই? ছোট একটা দল বেরোচ্ছে গাঁ ঘুরতে, আসবে তো চলে এসো। ওবেলা সভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে কি ভাবে তোমার বাপ মরেছে, গাঁয়ের সেটা কতবড় কলঙ্ক। বলতে বলতে কেঁদে ফেললে চলবে না কিন্তু।'

সিধে হয়ে বসে দু'হাতে মুখ থেকে এলোমেলো চুল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রম্ভা বলে, 'গাঁয়ের লোক কি আসবে? যা ভীরু সব ছাগল ভেড়ার মত!'

শম্ভু হেসে বলে, 'ওরাই কেমন সিংহ হয়ে ওঠে দেখো। না, সিংহ নয়, বাঘ। সূর্যদা বলত মনে নেই, বাংলার গাঁয়ে বাঘ থাকে?'

'চলো যাই।' বলে সেই বেশে শম্ভুর সঙ্গে যাবার জন্য রম্ভা উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের মধ্যে চৌকীতে বসে ম্লান বিরস মুখে রামপাল রম্ভার দিকে চেয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এসে করুণ স্বরে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার তা দিয়ে দরকার?' রম্ভা বলে পাক দিয়ে তার দিকে ঘুরে, 'তুমি যাও না, মদের পেসাদ পাওগে হেরম্বের।'

রামপাল কাতর হয়ে বলে, 'কেন ওকথা বলছ একশোবার? আমি কি যেচে গিয়েছি? হীরেনবাবু জোর করে নিয়ে গেল তো আমি কি করব।'

'তুমি কি করবে! তোমার জোর নেই? চেহারাটি তো গুণ্ডার মত।'

'নেশার মাথায় আছি, হীরেনবাবু জোর করলেন—'

রম্ভা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রামপালের মুখের দিকে। রামপালের মুখে তার হৃদয় মনের ছাপ রম্ভার চেনা, লজ্জায় অনুতাপে তার মনটা জ্বলছে স্পষ্টই টের পাওয়া যায়।

'এসো মোদের সাথে। রাস্তায় চেঁচাতে হবে, হেরম্ব নিপাত যাক, হেরম্ব নিপাত যাক। হেরম্ব বন্দুক নিয়ে আসুক, পুলিশ এসে ধরে নিক, থামতে পারবে নি। আসবে? বুকের পাটা আছে?'

রামপাল চুপ করে থাকে। কাল রাত্রের দেশী বিলাতীর প্রতিক্রিয়ায় এখনো তার মাথা অনেকটা ভোঁতা হয়ে আছে। রম্ভা কি ক্ষেপে গেছে? এ গাঁয়ে সে

বিদেশী, এ গাঁয়ের সে জামাই, পথে পথে সে হল্লা করবে মাতালের মত, হাঙ্গামা বাধাবে, পুলিশের হাতে পড়বে!

রম্ভা ধিক্কার দিয়ে বলে, 'যাও তুমি, কলকাতা ফিরে যাও। কাঠ চেরোগে আর তাঁবেদারি করগে হীরেনবাবুর।'

বলে শম্ভুর সঙ্গে রম্ভা গট গট করে চলে যায়।

জীবনলাল ধীরে ধীরে এসে কাছে দাঁড়ায়।

'তুমি যেন কেমন ধারা লোক বাবু। কি বলে যেতে দিলে ওকে?'

'ওকি আমার কথা শোনে যে আটকাব?'

জীবনলাল আপশোষ করে বলে, 'পুরুষ মানুষ, বৌকে শাসন করতে পার না? চুলে ধরে মারতে পার না দু'গালে তিন চড়? মোদের ডুবিয়ে ছাড়বে এবার। এই কাণ্ড চলছে চাদ্দিকে, রাস্তায় উনি হৈচৈ করতে গেলেন।'

রামপাল জানতে চায় ব্যাপার কি। এ পর্যন্ত সে ঘর থেকে বার হয়নি, রম্ভার কাছে শুধু শুনেছিল কৃষ্ণেন্দু ও মোহনলালের গ্রেপ্তারের কথা। গাঁয়ের উদ্যত উপদ্রব অশান্তির লক্ষণগুলির বিবরণ জীবনলাল তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। তাদের বাড়ীর কাছে রাঘব মহান্তি গোড়ায় দোকান বন্ধ করতে না চাওয়ায় ঝাঁপ নামিয়ে তাকে সুদ্ধ বাইরে থেকে দোকান বন্ধ করার কাজে উপস্থিত খদ্দেরদের, চিরদিনের শান্তপ্রকৃতি বয়স্ক লোকদের পর্যন্ত, ছেলে ক'জনের সঙ্গে যোগ দিতে দেখে জীবনলাল রীতিমত ভড়কে গিয়েছে।

'এর মধ্যে ওকে তুমি যেতে দিলে, ছেলাপিলা হবে মেয়েটার? এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার নেই?' জীবনলাল ঝাঁঝের সঙ্গে মন্তব্য করে।

রামপাল ভড়কে গিয়ে বলে, 'বটে নাকি! অ্যাঁ?'

দশবারজনের ছোট একটি দল রম্ভাকে সামনে নিয়ে বার হয়, ঝুমুরিয়া ঘুরে পাঁচনিখের দিকে যাবে। মহীউদ্দীনও সঙ্গে থাকে। সকলের সঙ্গে গলা মিশিয়ে রম্ভা চেঁচায় 'অত্যাচারীরা ধ্বংস্ হোক!' 'হেরম্বেরা নিপাত যাক!' 'চাষী মজুরের জয় হোক!' সভার কথাও ঘোষণা করা হয়। রম্ভার গলা সবচেয়ে বেশী খোলে 'হেরম্বরা নিপাত যাক' বলে চেঁচাতে। রুক্ষ চুল তার এলোমেলো হয়ে আছে, রোদের ঝাঁঝে মুখ হয়েছে ঝামা রঙ, কপালে সিঁদুরের টিপ ঘামে গলে হয়েছে সিঁদুরের ফোঁটা, ডান হাতে সে মুঠো করে ধরে আছে আঁচলের প্রান্ত। গ্রামের লোক সভয় বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, রক্তে অনুভব করে হঠাৎ

জাগা চাঞ্চল্য। নতুন লোক জুটে ছোট দলটি ক্রমাগত বড় হয়ে পড়বার উপক্রম ঘটে, মহীউদ্দীন তাদের সরিয়ে দেয়, বলে, 'আমাদের সঙ্গে নয়—সভায় আসবেন, সভায়। অন্যদিকে যান—দশজনকে খবর দিন।'

দলটি উত্তরপাড়া ঘোরা শেষ করেছে রামপাল এসে দলে মিশল। রম্ভার পাশে চলতে চলতে বলল, 'আর না, এবার ফিরে চল। তোমার শরীর ভাল না—'

রম্ভা ভ্রূকুটি করে তাকাল, কথা কইল না।

রামপাল আর কিছু বলতে ভরসা পায় না, নানা কথা ভাবতে ভাবতে দলের সঙ্গে চলতে থাকে। হঠাৎ সে বজ্রনাদে চীৎকার করে ওঠে, 'হেরম্বকে খুন করো! হেরম্বকে খুন করো!'

'আরে! আরে! আরে!' মহীউদ্দীন ধমকে ওঠে, 'কি করছ তুমি? কি বলছ পাগলার মত?'

রামপাল অসহায়ের মত রম্ভার দিকে তাকায়। 'তুমি যে বললে?'

'আমি ওকথা বলতে বলছি? আমরা কি বলছি শুনতে পাওনা, হেরম্বরা নিপাত যাক?'

'ও, হাঁ। ভুলে গেছিলাম।' রামপাল সলজ্জভাবে হাসে, 'মাথার কি ঠিক আছে ছাই। ছেলাপিলা হবে তোমার, তুমি এ রোদের মধ্যে—'

আবার রম্ভার ভ্রূকুটি দেখে রামপাল থেমে যায়।

পাঁচনিখে পৌঁছে রম্ভার শরীর একটু অস্থির অস্থির করতে থাকে, তলপেটে একটা এই-আছে এই-নাই অস্বস্তি পাক দিয়ে ঠেলে উঠতে চায়। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। রোদের তেজ বাড়তে বাড়তে যখন মাথার তালু পুড়িয়ে দিচ্ছে, রাস্তা গরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ থেকে জোরালো হাওয়া না বইলে সকলে তারা আরও বেশী কাবু হয়ে পড়ত। পাঁচনিখের থানার কাছাকাছি রম্ভার হঠাৎ এত জোরে বমি ঠেলে ওঠে যে সে সামলাতে পারে না। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে সে বমি করতে বসে।

চুনকাম করা সাদা দেয়াল থানার, খড়ের পুরু চালা। সামনে কাঁকর বিছানো পথে দু'ভাগ করা ছোট বাগান, তাতে সযত্নে সাজানো ফুলের গাছ। দু'ঘণ্টা আগে একটা রিপোর্ট লিখতে বসে শৈলেন দাস আর চেয়ার ছেড়ে ওঠে নি। সামনে মাত্র কয়েকলাইন লেখা রিপোর্টটা পড়ে আছে। তার উপরে খোলা

ফাউণ্টেন পেন। পেনটি শৈলেন স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল কিন্তু থার্ড ক্লাসের বিদ্যা নিয়েও কল্যাণী মাসে অতিকষ্টে ছ'খানার বেশী চিঠি কখনো লেখে না। কলমটা তাই শৈলেন নিজেই ব্যবহার করে। রিপোর্ট লিখতে আজ তার মন বসছিল না। বিরক্তি আর বিষাদ মেশানো তিক্ততা তাকে উন্মনা করে রেখেছে। মন ভার, বুকে একটা অনির্দিষ্ট নালিশের জ্বালা, কার বা কিসের বিরুদ্ধে জানা নেই। ছ'বছর প্রমোশন বন্ধ। জীবনে বুঝি কিছু করা গেল না। কলেজ জীবনের কথা শৈলেনের মনে পড়ে। ভেসে আসে বন্ধুদের কথা, আদর্শের তর্ক, উত্তেজনা, আনন্দ, বিষাদ ও স্বপ্ন। চারিদিক থেকে নানা খবর এসে পৌছয়। কল্পনায় অতীত জীবনের বন্ধুরা সারি দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আয়, খবর নিয়ে খেলা করি।

মহীউদ্দীনের দলের আওয়াজ দূর থেকে কানে আসে। সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কি করা যায়। হে ভগবান, কি করা যায়। আবার কেন? শেষ হয়ে সব চুকে বুকে যেতে পারে না একেবারে?

জমাদার এসে বলে, 'হুজুর?'

নাঃ, চারিদিক বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। মন খারাপ করলেও চলবে না, মাথা গরম করলেও চলবে না।

'কেতনা আদমি?'

'পন্দরো হোগা।'

'ঠিক হায়। যানে দেও।'

কাছাকাছি এসে আওয়াজ থেমে যাওয়ায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শৈলেন বাইরে গিয়ে কনেষ্টবল ধরণীকে জিজ্ঞাসা করে 'ফিরে গেল?'

'আজ্ঞে না। সঙ্গে একটা মাগী ছিল, বমি করছে। বীরেশ্বরের মেয়ে।'

হঠাৎ কেন রাগ হয়ে গেল শৈলেন জানে না। সজোরে সে এক চপেটাঘাত বসিয়ে দিল ধরণীর গালে।

'মাগী কিরে শূয়ার?'

দুপুরে হেরম্ব এল।

'সভাটার ব্যবস্থা করতে হবে শৈলেনবাবু!

নোটের তাড়াটা মুঠো করে শৈলেন বলে, 'সে তো এমনিও করব ওমনিও করব। কেন মিছিমিছি—

হেরম্ব সবিনয়ে হাসে। 'কি যে বলেন!'

একটু সুস্থ হলে রম্ভা বলে, 'তোমরা এগোও। আমি একটু জিরিয়ে—'

শম্ভু জোর দিয়ে বলে, 'বাড়ী ফিরবে। একটা গাড়ী পেলে হত।'

মহীউদ্দীনও সায় দেয়, জোর দিয়ে বলে, 'তোমার আর আসতে হবে না। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।'

রম্ভা বলে, 'আচ্ছা। তোমরা তবে এগোও শম্ভু, আমি ওর সাথে ফিরে যাব। গাড়ী দরকার হবে না।'

তেঁতুল গাছের ছায়ায় রম্ভা ও রামপালকে রেখে অন্য সকলে এগিয়ে যায়। দূরের সমুদ্রের বাতাস গাছের পাতায় ঝির ঝির আওয়াজ তুলে বইতে থাকে, রম্ভার শরীর ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসে। রামপাল চুপচাপ বিড়ি টানে, গম্ভীর মুখে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। দেহমনে জুত পেলে রম্ভা একটু হাসে তার দিকে চেয়ে।

'বলিস নি যে আমায়?' গভীর অভিমানে রামপাল অনুযোগ দেয়।

'বলতে হবে কেন? চোখ নেই কো তোমার?'

রম্ভার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে রামপাল শুধোয়, 'ক' মাস?'

'তিনমাস চারমাস, কে জানে বাবা, অত কে জানে!'

'বললাম এ রোদে বেরোস নি, বেরোস নি। গোঁয়ার মেয়ে বটে তুমি। হল ত এবার?'

রম্ভা তবু হাসে, 'কি হল? একটু বমি হল তো কি। ও সবার হয়।'

শম্ভুরা একটা গরুর গাড়ী পাঠিয়েছিল, গাড়ী এসে পৌছবার আগেই দুজনে উঠে চলতে আরম্ভ করে। রামপালের গাড়ী সংগ্রহ করে আনার কথা রম্ভা কানেও তোলে না। চলতে চলতে রম্ভা টের পায়, তাকে নিয়ে চারিদিকে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েলি চোখ উঁকি দেয়, বাইরে পুরুষেরা চোখ বড় বড় করে তাকে ছাখে। এ ওর গা টিপে তাকে দেখিয়ে দেয়, আড়দৃষ্টি তার পানে রেখে কথা বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। হাসাহাসিও চলে এখানে ওখানে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। কৌতূহল, বিস্ময় আর উত্তেজনাই বেশী।

ঝুমুরিয়ার রঘু সামন্তের বাড়ীর সামনে অনাথকে ঘিরে কয়েকজন জটলা করছিল, তিরিশ থেকে বিশ বছরের সব ছোকরা। রম্ভাকে দেখেই তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, আরম্ভ হয় অভদ্ররকমের হাসাহাসি আর মন্তব্য—রম্ভা আর

রামপাল কাছে এলে তারা যাতে শুনতে পায় এত জোরে। রামপাল থমকে দাঁড়াতে রম্ভা তার হাত চেপে ধরে জোর করে টেনে এগিয়ে যায়। এখানে একজন সুর করে গান ধরে 'রম্ভা দিদিলো—'

গান তার শুরুতেই আচমকা থেমে যায়।

নরেশের হাতের মস্ত এক মাটির চাপড়া তার মুখে এসে লেগে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নরেশ যে কখন তাদের পিছু নিয়েছিল রম্ভা বা রামপাল টেরও পায় নি।

নরেশের দিকে তেড়ে যেতে গিয়ে অনাথের দল সামনে পড়ে রামপালের। দু'জনের ঘাড় শক্ত করে ধরে রামপাল অন্যদের দিকে সজোরে ঠেলে দেয়, সেই ধাক্কায় পাঁচজন আছাড় খেয়ে পড়ে রাস্তায়। উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে নাগালের বাইরে গিয়ে তারা গাল দিতে আর শাসাতে শুরু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিকে রটে যায় যে ঘোষপাড়ায় দাঙ্গা হয়ে গেছে। হেরম্বের লোকেরা রম্ভাকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, পাড়ার লোক মিলে তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি গুজবটা ছড়ায় যে রম্ভারা বাড়ী পৌঁছানোর আগেই হাঙ্গামার খবরটা সেখানে পৌঁছে যায়। জীবনলাল রাগে ফোঁস ফোঁস করছিল, রম্ভা বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র সে চীৎকার করে ওঠে, 'বাড়ী ঢুকছিস লজ্জা করে না? বেরো তুই, বেরো বাড়ী থেকে।'

শ্যামলাল ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'আঃ, মাথা গরম করছ কেন?'

জীবনলালের তখন চৈতন্য হয় যে রম্ভার মত বোনকে চটানো সঙ্গত নয়, পিছনে তার অনেক শক্তিশালী লোক আছে। রম্ভার সঙ্গে সে গোলমাল করেছে ফিরে এসে একথা শুনলে মোহনলালও কি করে বসবে ঠিক নেই। রম্ভাও যদি গাঁয়ের কটা গুণ্ডা ছোঁড়াকে লেলিয়ে দেয় তার পিছনে! একেবারে সুর বদলে সে তাই বড় ভায়ের সস্নেহ অনুযোগ জানায়, 'ছাখ দিকি তুই কি আরম্ভ করেছিস। গাঁয়ে মুখ দেখাবার উপায় রাখলি না।'

জীবনলালের বৌ মন্তব্য করে একটু তফাৎ থেকে, 'কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাবু গেরস্ত ঘরে! বাপের জন্মে এমনটি দেখি নি আর!'

রম্ভা নাক সিঁটকে জবাব দেয়, 'বাপের জন্মে দেখবে কিসে, কেমন বাপে জন্ম দিয়েছে সেটা তো দেখতে হবে।'

বৌ গলা ছাড়া মাত্র জীবনলাল ধমকে তাকে থামিয়ে দেয়, রম্ভাকে মিনতি করে বলে, 'যা না দিদি তুই এবার কলকাতা ফিরে? রেহাই দে মোদের?'

রম্ভা বলে, 'যাব গো, যাব। থাকতে আসি নি তোমাদের বাড়ী। আজ কালের মধ্যেই যাব, তোমাদের বাপের মরণের একটা বিহিত করে!'

দুপুর থেকেই লোক আসতে শুরু করে বটতলার মাঠে। চড়া রোদকে অগ্রাহ্য করে দুক্রোশ পথ হেঁটে এসে মানুষ প্রকাণ্ড বটগাছটার ঘন ছায়ায় বসে ঘাড় মুছে গামছা নেড়ে হাওয়া খায় গোড়ায় দু'চারজন, তারপর বেলা একটু পড়ে এলে পিল পিল করে চারিদিকের গাঁ থেকে মানুষ আসা আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে লোকারণ্য হয়ে ওঠে বটতলার মাঠ। বড় মেলায় এরকম জনতা হয়, ঝুমুরিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন সভায় এত লোক জমতে কেউ ছাখে নি, উত্তেজিত মানুষের এমন ভিড়। ভীরু ও দুর্বল একক মনে সমধর্মী মানুষের বিরাট সান্নিধ্য তেজস্কর সঞ্জীবনীর কাজ করে, ভীরুতা দুর্বলতা চাপা পড়ে জাগে বেপরোয়া সাহস।

মহীউদ্দীন, শম্ভু এরাও এতটা ভাবতে পারে নি। লোক যথেষ্ট হবে এটা তারা জানত কিন্তু এমন ভিড় হবে আর আগে থেকেই সকলে এত গরম হয়ে থাকবে, এটা তাদের ধারণার বাইরে ছিল! তারা ক'জন সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করে। অন্য কর্মীদের সাবধান করে দেয়। দুরন্ত, অদম্য উল্লাসে রম্ভা এবং আরো অনেকের রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। রামপালের লড়ায়ের কামনা উগ্র হয়ে ওঠে, কাঠ গোলার হাঙ্গামার দিন যতটুকু হয়েছিল তার শতগুণ বেশী।

শৈলেনও এটা ভাবতে পারে নি। জনতার দিকে তাকিয়ে, বিশৃঙ্খলা কমিয়ে জনতাকে সংযত করতে অপটু অনভিজ্ঞ মহীউদ্দীন শম্ভুদের গলদঘর্ম হতে দেখে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে, কিন্তু এ অবস্থার জন্য নয়। এই জনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবার ক্ষমতাও তার নেই, আগে জানলে সদরে খবর পাঠিয়ে ব্যবস্থা করতে পারত। তার সময়ও আর নেই। শৈলেন বুঝতে পারে, একেবারে নিষ্ক্রিয় থেকে কোন মতে সভাটা হয়ে যেতে দেওয়াই এখন শ্রেয়, আর কোন উপায় নেই। সমবেত এই জনশক্তিকে একটু ঘাঁটাতে গেলেই আজ বিপদ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। মহীউদ্দীন আর শম্ভুরাই একমাত্র ভরসা, যদি পারে ওরাই এদের সামলাতে পারবে।

তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে সে হেরম্বের কাছে পাঠিয়ে দেয়। অবস্থা গুরুতর, হেরম্ব যেন তৎক্ষণাৎ তার লোকদের সভায় হাঙ্গামা বাধাতে বারণ করে নির্দেশ পাঠায়, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

চিঠি পড়ে হেরম্ব মনে মনে হাসে। শৈলেন ভয় পেয়ে গেছে? গুরুতর হাঙ্গামাই তো সে চায়! হাঙ্গামা হোক, লাঠি আর গুলি চলুক, গণ্ডায় গণ্ডায় জখম হোক আর মরুক, শৈলেন আর দু'চারটে পুলিশ যদি খুব হয় তো আরো ভাল, পুলিশে গাঁ ছেয়ে যাক, দলে দলে ধরা পড়ুক, এমন শিক্ষা পাক যেন চিরদিনের জন্য বাছাধনেরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাথা তুলতে আর সাহস না পায়।

বটতলার মাঠ থেকে হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনি অস্পষ্ট ভেসে আসে। ভরা বন্দুকের মসৃণ নলে হাত বুলিয়ে হেরম্ব গ্রাস মুখে তোলে।

সূর্য যখন ডুবু ডুবু, হেরম্বেরই গাঁইতি কোদাল শাবল দিয়ে তৈরী রাস্তা খোঁড়া আরম্ভ হল, পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তার লরী আর তাঁবুতে, বন্দুকের গুলি খেয়ে হেরম্বের হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে রামপাল মরে গেল, হেরম্বকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পোড়ানো হল তার বাড়ীর দক্ষিণের চালাঘরের আগুনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আগুন ধরল বীরেশ্বর ও ঝুমুরিয়ার আর পাঁচটি বাড়ীর চালায়। একদল লোক গিয়ে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে এল। শৈলেন আগেই বটতলার মাঠে মারা গিয়েছিল। সভায় আরও মরেছিল তেরজন লোক আর দু'জন পুলিশ। তার মধ্যে ছিল জগৎ দাসের ছেলে শিশু। জখম হয়েছিল বহুলোক।—

দু'দিন পরে আরিফ ও মমতা ঝুমুরিয়া স্টেসনে নামল। নরেশের খোঁজ নিতে পরেশ এবং কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ নিতে পূর্ণেন্দু তাদের সঙ্গে এসেছে। ঝুমুরিয়া ও আশেপাশের গাঁয়ের কয়েকজন সদরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল, বাপ দাদা ভাই ছেলের জামিনের জন্য সদরে গিয়ে চেষ্টা করবে। তাদের মুখ ম্লান, বিষণ্ণ।

'মিছে যাচ্ছেন। বাইরের লোককে গাঁয়ে যেতে দিচ্ছে না।'

আরিফ বলে, 'দেখি চেষ্টা করে।'

কাগজে সংক্ষেপে খবর বেরিয়েছিল, ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ এদের কাছে জানা গেল।

মমতা বলল, 'ইস্! কেষ্টদা থাকলে এসব কিছুই হত না, কেষ্টদা সামলে নিতে পারত।'

'আমরাও তাই বলি। কৃষ্ণেন্দুবাবু আর মোহনলাল গাঁয়ে থাকলে এ কাণ্ড হত না। লোক উঠল ক্ষেপে, গাঁয়ে একটা যোগ্য লোক নেই, কে তাদের সামলায়?

মমতা শুধোয়, 'রম্ভার খবর জানেন কেউ? বীরেশ্বরের মেয়ে রম্ভা?'

'তাকে ধরে নিয়েছে। জেল হবে ক'বছর।'

পরেশ শুধোয়, 'নরেশ বলে একটি ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে—'

'হাঁ বীরেশ্বরের ঘরে ছিল। তার কোন পাত্তা নেই আজ তক।'

'মারা গেছে?'

'মারা গেলে তো জানা যেত, দেহটা থাকত। ছেলেটা একেবারে নিখোঁজ।

সদরের গাড়ী চলে গেলে লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্মে চারজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে বাঁক ঘুরে ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যায়। গাড়ী থেকে যে কজন নেমেছিল, স্টেসন থেকে বেরিয়ে তারাও চোখের আড়াল হয়। ওরা কোন গাঁয়ে যাবে কে জানে।

সমাপ্ত

সহরবাসের ইতিকথা

লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ঘষামাজা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাচক্রে ওসব কিছুই করা হয়নি।

সংশোধন করা উচিত ছিল এরকম খুঁত ও অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকারা বইটিকে যে সমাদর করেছেন এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমি দাবী করছি বইটিতে এবার কোন খুঁত রইল না!

প্রথম সংস্করণে সব চেয়ে বড় অসম্পূর্ণতা ছিল শ্রীপতি আর সন্ধ্যার—একটা পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে দুটি চরিত্রেরই যেন খেই হারিয়ে গিয়েছিল। এই সোজা কথাটা সব লেখকই জানেন যে কোন চরিত্রের বিকাশ বা কাহিনীর গতি এমন জায়গায় থামানো চলে না যাতে প্রশ্ন জাগে: তারপর কি হল? গতিটা কোন পরিণতির দিকে এটুকু অন্তত ধরিয়ে দিতেই হবে—যাতে ধারাটা কল্পনা করে অনুভব করে নেওয়া সম্ভব হয়।

যেমন পীতাম্বর। মোহনের বাড়ী ছেড়ে পীতাম্বর কোথায় গেল কি করল বলার কোন প্রয়োজনই হয় না—অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে কোথাও কম খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে সে তার নতুন পেশা নিয়ে দিন রাত মেতে থাকবে।

কিন্তু শ্রীপতির কথা যেখানে থেমেছে ওখানে তাকে থামানো যায় না, কদমের সংসারটুকুর জন্য গভীর টান এবং গ্রাম্য সংস্কার ও বিশ্বাস ভরা শ্রীপতিকে মোহনের সঙ্গে সহরে টেনে এনে কারখানায় কাজে ঢোকানোর কোন সার্থকতাই থাকে না। কিভাবে তার চেতনা সর্বহারার চেতনায় রূপান্তরিত হল তার একটু সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত তার কথা বলতেই হবে।

এই সব খুঁত ও অসম্পূর্ণতার জন্য মনে খুঁতখুঁতানি ছিল—বর্তমান সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধনের সুযোগ পেয়ে খুশী হয়েছি।

আমি ভূমিকা লেখার জন্যই একটা ভূমিকা জুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। দু'চারটি বইয়ে দু'চার লাইন ভূমিকা হয় তো দিয়েছি। 'সহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সব চেয়ে বড় ভূমিকা জুটল। সংশোধন করতে গিয়ে বইয়ের আকার বেশ খানিকটা বেড়েছে। প্রকাশিত উপন্যাসের নূতন সংস্করণে বেশী রকম পরিবর্তন করা হলে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া লেখকের কর্তব্য বলে মনে করি।

এক

সহর পথে। আসল সহর।

রাস্তা পার হওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকার সময় এই কথা একজনের মনে হইয়াছিল। সহরের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রান্ত ক্লান্ত একজন প্রৌঢ়বয়সী মানুষের।

গতি পথে, বৈচিত্র্য পথে, অস্থিরতা পথে। নদী আর নালার মত বড় বড় রাস্তা আর গলিতে মানুষের স্রোত, ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির প্রয়োজনে সমষ্টির শোভাযাত্রা।

সহরে পথ ছাড়া আর সমস্তই যেন আনুসঙ্গিক।

লাখ লাখ মানুষের কাছাকাছি থাকা চাই, যত কাছে পারে। কিন্তু গায়ে গা ঠেকাইয়া দাঁড়ানোর চেয়ে তো কাছাকাছি আসিবার ক্ষমতা নাই মানুষের, বিরাট এক প্রান্তরে যদি কয়েক লক্ষ মানুষ তেমনিভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকে, তবু সেই ভিড়ের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের দূরত্ব থাকিয়া যাইবে অনেকখানি, কাছে আসিতে প্রয়োজন হইবে পথের।

সহরের মানুষ তাই পথসর্ব্বস্ব।

সকালে পথে বাহির হয়, খোলা পথে অথবা সৌধরূপী দেয়ালঘেরা পথে দিন কাটায়। ঘুমানো দরকার, তাই অনেক রাত্রে শ্রান্ত দেহে শয্যার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। সে শয্যা কারও ফুটপাতে বিছানো ছেঁড়া কাপড়, কারও চৌকিতে বিছানো তোষক, কারও খাটের গদিতে বিছানো ফুল-আঁকা আস্তরণ।

পথ ছাড়া আর সমস্তই কি ফাঁকি?

হাঁটিতে হাঁটিতে পা ব্যথা করিতেছিল। ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সহরের পথে হাঁটিয়া বেড়াইবার ঝোঁক তার কাটিয়া গিয়াছিল। বিড় বিড় করিয়া লোকটি নিজের কাছেই কি যেন সব কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল।

বাস তার গ্রামে, মানুষটি সে গ্রাম্য। দু'দিন আগে একটা কাজে সহরে আসিয়াছিল, আজ সকালে কাজ মিটিয়া গিয়াছে। দুপুরের গাড়ীতেই অনেক দূরের গ্রামটির দিকে তার রওনা হওয়ার কথা ছিল, একটা খেয়ালে ওই গাড়ীতে যাত্রা সে স্থগিত রাখিয়াছে।

কাজ শেষ হওয়া মাত্র একটা মুক্তির অনুভূতি জাগিয়াছিল, বড় বিস্বাদ অনুভূতি। অনেক দিন আগে, পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে, এই সহরে বিদ্যার্থীর জীবন যাপনের সময় মুক্তির যে উদ্‌ভ্রান্ত কামনায় সর্ব্বদা মন ব্যাকুল হইয়া থাকিত, তাই যেন পচিয়া গলিয়া মুক্তির মোহে পরিণত হইয়াছে; অন্ন যেমন পরিণত হয় মদে। পথ চলিবার চিরসাথী বগলের ছাতিটি ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া মানুষটা আজ অকারণে পথে পথে কত যে ঘুরিয়াছে! ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপরাহ্ণ বেলায় রাজপথের এই মস্ত চৌমাথার ধারে কি শ্রান্ত হইয়াই সে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে!

এখন আর কিছুই সে চায় না, পথের ওপারে গিয়ে বাসে উঠিয়া হোটেলে ফিরিয়া যাইবে, নিমীলিত চক্ষে একটু বিশ্রাম করিবে হোটেলের আরামহীন শয্যায় গড়গড়ার নলের অভাবে অস্বস্তিকর আলস্যে, তারপর ছাতিটি বগলে করিয়া পুরাণো ব্যাগটি হাতে ঝুলাইয়া স্টেশনে গিয়া ধরিবে রাতের গাড়ী। সকালে সে গাড়ী তাকে তার গ্রামের কাঁকর-বিছানো নির্জ্জন স্টেশনে নামাইয়া দিবে। স্টেশন হইতে গ্রামের হাট পর্য্যন্ত পাকা বাঁধানো পথ, সেখান হইতে কাঁচা মাটির পথে মাইলখানেক হাঁটিলে তার ঘরের দুয়ার।

কাঁচা মাটির পথ? একি আশ্চর্য্য কথা যে সেই কাঁচা মাটির পথে তাকে সহরের দিকে যাত্রা শুরু করিতে হইয়াছিল, সহরে তার নিজের প্রয়োজন ছিল বলিয়া?

সে পথটিও কি সহরের জন্য?

মাথাটা কেমন গুলাইয়া গেল,—পথের একেবারে মাঝখানে। দুরন্ত বেগে সে পথে অবিশ্রাম গাড়ী চলাচল করিতেছিল। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে এই সহরে সে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল কিন্তু বাস তার গ্রামে, মানুষটা সে গ্রাম্য। দোতলা একটা বাসের নীচে চাপা পড়িয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সে মরিয়া গেল।

পিতা স্বর্গে গেলেন। মনোমোহন ভাবিল, এবার তবে সহরে গিয়াই বাস করা যাক।

গ্রামের জ্ঞানী বৃদ্ধেরা গুজব শুনিয়া বলিলেন, 'জানতাম। আগেই জানতাম বাপ চোখ বুজবার পর বছর ঘুরবে না।'

মা বলিলেন, 'তাই কি হয় বাবা? এখানে যথাসর্ব্বস্ব ফেলে রেখে সবাই মিলে কলকাতা গিয়ে থাকব, এ যে পাগলের মত কথা বলছিস তুই।'

তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিলেন, 'তোর যদি সাধ হয়, যা না তুই, কিছুদিন বেড়িয়ে আয়গে না কলকাতা থেকে ?'

মনোমোহন গম্ভীরভাবে বলিল, 'কিছুদিন বেড়িয়ে আসার কথা হচ্ছে না। কলকাতায় স্থায়ী বাসা করব !'

'ঘরদোরের কি হবে ? বিষয় সম্পত্তির কি হবে ?'—মা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এ সমস্যার সমাধান মনোমোহন মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীতে আশ্রিত এবং আশ্রিতার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। নিজেদের স্বচ্ছলভাবে ভাল ভাবে চলিয়া যায় এরকম বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্বেও কর্ম্মহীন পরাশ্রয়ী ওদের অন্ন যোগাইতে গিয়া কোনদিন তাদের টানাটানি ঘোচে নাই। জোঁকও কষ্ট করিয়া জীবজন্তুর গায়ে নিজেকে সাঁটিয়া দিয়া রক্ত শোষণ করে—নিজের চেষ্টায়। আর এই আশ্রিত আশ্রিতার দলটা তাদের বাড়ীতে বাস করিয়া তাদের অন্নবস্ত্র ধ্বংস করাটাই একমাত্র কাজ বলিয়া মনে করে, জন্মগত অধিকার বলিয়া গণ্য করে ! তবু নিকট হোক, দূর হোক, সম্পর্ক একটা তাদের সকলের সঙ্গেই আছে। কলিকাতায় সঙ্গে নেওয়া না গেলেও এখানে তো তাদের থাকিতে দিতে হইবে।

পিসেমশায় এগার বছর সপরিবারে এ বাড়ীতে বাস করিতেছেন, সম্পর্কের হিসাবে তিনিই সকলের চেয়ে আপন, বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার ভারটা তাঁকে দিয়া গেলেই চলিবে। পিসেমশায় লোকটি তেমন চালাকচতুর নয়, এদিকে আবার টাকা পয়সার ব্যাপারে বিবেকটিও তাঁর তেমন সজাগ নয়। মাঝে মাঝে গ্রামে আসিয়া সে নিজে তদারক করিয়া গেলেও বিষয় সম্পত্তির ক্ষতি কিছু হইবেই। আদায়পত্রের কিছু টাকা মারা যাইবেই।

কিন্তু এই ক্ষতিটা মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

বড় লাভের আশা থাকিলে ছোটখাট অনিবার্য্য ক্ষতিকে মানিয়া নিতে হয়। সহরে সে বসিয়া থাকিবে না,উপার্জন করিবে। নিজে উপস্থিত না থাকায় সম্পত্তির আয় যতটুকু কমিবে আর সহরে বাস করিতে খরচ যতটুকু বাড়িবে, তার চেয়ে অনেক বেশীই সে উপার্জ্জন করিতে পারিবে এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

সহরে টাকা রোজগারের অনেক সুবিধা, অনেক সুযোগ।

কেবল বাড়ীতে নয়, গ্রামেও সাড়া পড়িয়া গেল। এ যাওয়ার মানে সকলেই

জানে, মনোমোহন আর দেশে ফিরিবে না। সহরে যারা যায়, গ্রামে আর তারা ফেরে না।

মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ কবে এ গ্রামে আসিয়াছিলেন, বুড়া পীতাম্বর ঘটক সে খবর রাখে। খবরটা সে সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আগেও গল্পটা সকলে অনেকবার তার কাছে শুনিয়াছে।

একদিন দু'টি যুবক এক সঙ্গে এই গ্রামে আসিয়াছিল, তাদের একজন পীতাম্বরের ঠাকুর্দ্দার বাবা, একজন মনোমোহনের ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দা। আজকের কথা নয়, তারপর শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের কি তখন এ রকম লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছিল? কত শ্রী ছিল গ্রামের, কত ঐশ্বর্য্য ছিল, আজ গ্রামের ভাঙ্গা ঘরদুয়ার দেখিয়া কে তা কল্পনা করিতে পারিবে? মস্ত বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এই গ্রাম (কাছাকাছি নদী নাই, আশেপাশে বিশেষ কোন পণ্য উৎপন্ন হয় না, কোনোদিন হইত কিনা সন্দেহ। তবু কি করিয়া গ্রামটা মস্ত বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা অবশ্য পীতাম্বরকে কেহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলে না)। রাজা এই গ্রামে বাস করিতেন (রাজবাড়ীর একটি ইঁট-পাথরের চিহ্নও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না)। ধরিতে গেলে এ গ্রাম তখন নগর ছিল বলা যায়।

পূর্ব্বপুরুষ দু'জন মলিন বেশে একদিন অবস্থার উন্নতির জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষটি ছিলেন বুদ্ধিমান, অল্পদিনেই তাঁর অবস্থা ফিরিয়া গেল। মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষটি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষটির কল্যাণে কোন রকমে তাঁর দিন কাটিয়া যাইত।

তারপর পীতাম্বরের ধর্ম্মভীরু পূর্ব্বপুরুষটি একদিন তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন, সমস্ত ভার দিয়া গেলেন বন্ধুকে, সরলহৃদয় বন্ধু চিরদিন যেমন তার বিশ্বাসী বন্ধুকে দিয়া যায়। তখনকার দিনে তো তীর্থ ভ্রমণ দু'দিনে সখের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই, তীর্থ সারিয়া আসিতে সময় লাগিত অনেক, ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিত কম। যে যাইত সে একরকম চিরবিদায় নিয়া যাইত।

দু'তিন বছর পরে ঠিক কত বছর পরে পীতাম্বরের মনে নাই, তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধু গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, স্ত্রী-পুত্রের অন্ন জোটে না।

পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষ বলিল, 'বন্ধু, এ কি?'

মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ বলিল, 'কে তোমার বন্ধু ?'

তাই পীতাম্বরের আজ এই অবস্থা। তবে ভগবান আছেন, বন্ধুকে ঠকাইয়া মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ যা পাইয়াছিল, আজ তার সিকির সিকিও নাই। মনোমোহনের বাপও কি সেদিন অপঘাতে মরে নাই, সহরের রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে নাই? পাপের পুরস্কার হাতে হাতে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয় তো ঘটিবেই।

পাপের শাস্তি যাইবে কোথায় ?

'এই যে কলকাতা যাচ্ছে মনোমোহন, ওকে নেওয়াচ্ছে কে? তোমাদের বলে রাখছি শোন, সর্ব্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরি হয়েও যদি না ফিরে আসে দু'দিন পরে ভগবান মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা। ছেলেমেয়ে যে হয়নি ওর, সে কার বিধান? প্রায়শ্চিত্ত ভগবান আর টানবেন না ঠিক করেছেন, ক'পুরুষ ধরে পাপের ধন ক্ষয় করিয়েছেন, ওর বাপটাকে অপঘাতে মেরেছেন, ওকে এবার সর্ব্বস্বান্ত করে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করাবেন, বংশটাও লোপ করে দেবেন।'

পীতাম্বরের গায়ের চামড়া ধবধবে সাদা, প্রথম বয়সে তামাটে ছিল। মাথার চুল, ভুরু, গোঁফ, দাড়ি আর গায়ের লোমগুলি পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। কথাগুলি বলিবার সময় আনমনে পৈতাটি সে আঙুলে জড়াইতেছিল, তার কথাগুলি তাই পৈতা হাতে করিয়া অভিশাপ দেওয়ার মত শোনাইল।

পথের ভিখারী হইয়া একেবারে বংশলোপের অভিশাপ! বছর পাঁচেক মোটে বিবাহ হইয়াছে মনোমোহনের, ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় যায় নাই। এ স্ত্রীর সন্তান না হইলে আরেকটা বিবাহ করিতেই বা তার বাধা কিসের?

পীতাম্বরের বাড়াবাড়িটা অনেকের পছন্দ হইল না। পূর্ব্বপুরুষের গল্প বলিতে চাও বলো কিন্তু কবে কোন যুগে কি ঘটিয়াছিল, সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল কিনা ঠিক নাই, সে প্রসঙ্গ তুলিয়া আজ এভাবে মানুষকে শাপ দেওয়া কেন?

কেহ আপত্তি করিলে পীতাম্বর বলে 'পাগল। আমি কেন শাপ দিতে যাব? আমি বলছি ভগবানের বিচারের কথা।'

পীতাম্বরের এতখানি গায়ের জ্বালার কারণটাও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পীতাম্বর নিজেই বুঝাইয়া দেয়।

'মতিগতি ভাল হলে বংশটা হয়তো বজায় থাকতো কিন্তু ছোঁড়াটা বড়

পাষণ্ড। ওর বাপ অপঘাতে মরেছে, কিন্তু মানুষটা মন্দ ছিল না। মাসকাবারে যখনি গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সাতটি টাকা হাতে তুলে দিয়েছে, হাসিমুখে বলেছে, ধরতে গেলে সব কিছু তো আপনারই ঘটক মশায়, সাতটি করে টাকা আপনার হাতে দিতে লজ্জা হয়—কিন্তু করব কি বলুন, সে অবস্থা তো আর নেই। বাপ মরার পর বছর ঘোরে নি, এ ছোঁড়া কিনা ওমাসে আমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে, স্পষ্ট বলে দিলে এখন থেকে আর একটি পয়সা দিতে পারবে না!'

সকলে মনে মনে বলে, এইজন্য তোমার এত রাগ!

'না দিলি, না দিবি টাকা, আমি কি চেয়েছি তোর কাছে? তোর বাপ ভক্তি করে দিত, তাই না তোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছি? মুখের ওপর কি কথা বললে শোনো। বললে, আপনার হিসেব তো বাবা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন ঘটক মশায়। আমি তো শুনে অবাক। বললাম, 'কিসের হিসেব বাবা? তোমার বাবা স্নেহভক্তি করে দিতেন, হিসেব তো কিছু ছিল না।'

কথা বলিতে বলিতে পীতাম্বর এমন জায়গায় থামিয়া যায় যে শ্রোতাদের প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হয়। একজন প্রশ্ন করে 'তারপর কি হল।

পীতাম্বর বলে, 'আমার কথা শুনে ছোঁড়া যেন খিঁচিয়ে উঠল, আপনার বাপ-দাদার সম্পত্তি ভোগ করার পাপ যেন না লাগে, সেই বাবদে আপনার সাতটাকা করে বরাদ্দ ছিল তো? তা সেই পাপেই যখন বাবাকে অপঘাতে মেরেছেন, আর তো আপনার পাওনা নেই।'

পৈতাটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে পীতাম্বর বলে, 'শুনলে কথা? আমি যেন ওর বাপকে অপঘাতে মেরেছি! আরে, তোর পূর্ব্বপুরুষ করল পাপ, ভগবান তোর বাপকে দিলেন শাস্তি, তার মধ্যে আমাকে তুই জড়াস্ কেন! ভগবানের বিধান উল্টে দেবার ক্ষমতা থাকলে তোর বাপকে কি আমি বাঁচিয়ে রাখতাম না, অমন ভালমানুষ ছিল তোর বাপ?'

একজন শ্রোতা বলিল, 'তোর বাপ অপঘাতে মরেছে, একথাটা বলে বেড়ান আপনার উচিত হয় নি। মাসে মাসে তাহ'লে সাহায্যটা পেতেন।'

পীতাম্বর চটিয়া বলিল, 'সাহায্য? কিসের সাহায্য? আমি কি ভিখিরি যে ওর কাছে সাহায্য চাইতে যাবো? ভিখির হবে ও—দেখে নিও, ভিখিরি হয়ে ও ফিরে আসবে।'

গ্রামের লোকের প্রশ্ন আর উপদেশ বর্ষণে মনোমোহন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কলিকাতা গিয়া বাস করার উদ্দেশ্যটা সকলকে সে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে না, নিজের কাছেই উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট নয়। সহরের কলের জল, বৈদ্যুতিক বাতি, ট্রাম বাস, সিনেমা থিয়েটার, সমারোহ, সভ্যতা এসব কি তাকে টানিতেছে? গ্রামের একঘেয়ে নিরুৎসব শান্ত জীবন ভাল লাগিতেছে না, তাই কি সে সহরের হৈ চৈ চায়? বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপা কি তার চাই? অথবা তার কামনা শুধু নূতনত্ব, পরিবর্ত্তন? এ রকম অনেক প্রশ্ন মনে জাগে, ভালমত একটা জবাবও সে খুঁজিয়া পায় না।

মনের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ শুধু অনেকদিন হইতে স্পষ্ট হইয়া আছে এবং কিভাবে যেন তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে না পারাই তার এই অসন্তোষের কারণ। কেন তা কে জানে! কি যেন সব ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটিতে পারিতেছে না, অনির্দ্দিষ্ট অনেক সম্ভাবনা যেন বাতিল হইয়া যাইতেছে, দূরে কি যেন তার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, কাছে আগাইয়া যাওয়া যাইতেছে না—এমনি এক অনাবশ্যক রহস্যময় অনুভূতি সর্ব্বদা তাকে পীড়ন করে আর গ্রামের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন তার ছট্‌-ফট্‌ করিতে থাকে।

সহরে গিয়া অর্থোপার্জনের কথা অবশ্য সে ভাবে কিন্তু সেটা দেশের সম্পত্তির আয় কম হওয়া ও খরচ বাড়ার মধ্যে সামঞ্জস্য করার হিসাব। সহরে গিয়া অর্থোপার্জন করা আসল উদ্দেশ্য নয়।

সহরে গিয়া কোন উপায়ে যদি লাখপতি হইয়া যাইতে পারে তা হইলে অবশ্য তার আপত্তি কিছু নাই। কিন্তু সহরের আকর্ষণটা তার লাখপতি হওয়ার কামনার জন্য নয়।

নানা আপত্তি তুলিয়া, রাগ করিয়া চোখের জল ফেলিয়া মা ছেলের প্রস্তাবটা বাতিল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন মনোমোহনের প্রচণ্ড ধমকে তার চেষ্টা থামিয়া গেল।

ছেলের কাছে এই তার প্রথম ধমক খাওয়া। স্নেহের নয়, অভিমানের নয়, আদরের নয়, রাগ ও বিরক্তির ধমক। গরম মেজাজে বাড়ীর কর্তা যেভাবে ধমক দেয়।

আজ যেন মা আরেকবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁর ছেলের বাপটি বাঁচিয়া নাই।

তারপর হইতে মা একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। একটি কেবল অনুরোধ জানাইলেন ছেলেকে।

'কর্তার বার্ষিক কাজটা এখানে সেরে যা মনু।'

এ অতি সঙ্গত অনুরোধ। যে মানুষটার সারাজীবন এখানে কাটিয়াছিল, দেশের লোকেও প্রত্যাশা করে যে তার বার্ষিক কাজটা দেশেই সম্পন্ন হইবে। আগে সহরে গিয়া বাসা বাঁধিলেও এই কাজের জন্য সকলকে নিয়া তাকে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য দেশে ফিরিতে হইবেই।

মনোমোহন বলিল, 'বেশ, তাই হবে।'

সহরে যাওয়া মাস তিনেক পিছাইয়া গেল।

মোটে তিন মাস, ত্রিশ বছরের সঙ্গে আর শুধু তিনটি মাস যোগ দেওয়া। সময় বিশেষে তিন মাস সময়ও কত যে দীর্ঘ হইতে পারে! তবে হ্যাঁ, বিদায় তাকে দিতে হইবেই জানিয়া গ্রাম যেন আয়োজন করিয়াছে তার মনোরঞ্জনের, এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এ গ্রামের স্মৃতি যাতে তার কাছে প্রীতিকর হয়। প্রতিদিন ভোরে কে যেন এখন পূবের আম কাঁঠালের বন হইতে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া তুলিয়া সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করে, পাখীদের গান ঝরায়, বিল ছাইয়া পদ্ম ফুল ফোটায়, ধানের ক্ষেতে ঢেউ তোলানো বাতাসে পাঠাইয়া দেয় মুথা ঘাসের মেটে গন্ধ আর গাঁয়ের মানুষের কথায় ব্যবহারে আমদানী করে আন্তরিক প্রীতির অর্ঘ্য।

বিদায় হওয়ার অধীরতার মধ্যেও মাঝে মাঝে গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার কথা ভাবিয়া মনও বেশ খানিকটা কেমন কেমন করে বৈকি।

দুই

নিজে দেখিয়া পছন্দমত একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিবার জন্য মনোমোহন প্রথমে একা কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিল। উঠিল সহরের এক নাম-করা হোটেলে—বাহিরের চাকচিক্যের তুলনায় ভিতরের আভিজাত্য যার বেশী।

কলিকাতায় পছন্দসই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা যে কি হাঙ্গামার ব্যাপার

সেটা মনোমোহনের একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু বাড়ী খোঁজার একটা দিক সে একবার খেয়ালও করে নাই। কেমন একটা যুক্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তার মনে জাগিয়া ছিল যে, সহরে যখন এত রকমের অসংখ্য বাড়ী, কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড় বাছাই করার মতই সহরে পৌছিয়া বাড়ী পছন্দ করিতে কোন কষ্ট হইবে না।

তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর হয়রাণ হইয়া সে বুঝিতে পারিল, একটা বোকামি করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে সহরের জানাশোনা কয়েকজন মানুষকে বাড়ীর খোঁজ নিয়া রাখিতে লিখিয়া,কিছুদিন পরে তার নিজের আসা উচিত ছিল।

বড় মন খারাপ হইয়া গেল।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। চলনসই একটা বাড়ী এখনকার মত ঠিক করিয়া সকলকে আনিয়া নীড় বাঁধিতে কোন বাধা নাই, তারপর ধীরে সুস্থে খোঁজ করিলে ভাল বাড়ী কি একটা পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তিন দিন খুঁজিয়া মনের মত একটা বাড়ী না পাইয়াই মনোমোহনের মনে হইতে লাগিল, সহর যেন তাকে গ্রহণ করিতে চায় না। এ-যেন বিপজ্জনক ইঙ্গিত, তার বাড়ী খোঁজার চেষ্টার এই ব্যর্থতা। সহরে নূতন জীবন তার সার্থক হইবে না।

ভাড়াটে বাড়ী খুঁজিয়া না পাওয়ার ব্যর্থতা বোধ হয় মানুষের একাকীত্বের অনুভূতি তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। সে অবস্থায় হোটেলের তিনতলার ঘরে অনেক রাত্রে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নীচে রাস্তার দিকে চাহিয়া একাকীত্বের ভীরু হতাশার জন্যই বোধ হয় সন্দেহ জাগে যে বিপ্লব হয়তো ভাল নয়, অভ্যাস মানুষের ধর্ম, ভয়াবহ অধর্মের চেয়ে মরণও ভাল।

নূতন আবেষ্টনীতে ঘুম আসে না। রাস্তার দিকে দু'টি বড় বড় জানালা, কিন্তু অপরদিকের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেই ঘরে আর বাতাস ঢোকে না। ফ্যান আছে, খুলিয়া দিলেই পাক্ দেওয়া বাতাস গায়ে লাগে, কিন্তু বহু লোকে যেন সঙ্গে সঙ্গে জোরে শ্বাস টানার মত ফিস্ ফিস শব্দে আপসোস জানাইতে শুরু করিয়া দেয়। জনবিরল পথে সশব্দে বাস চলিয়া যায়, রিক্সার টুন টুন আওয়াজ কানে আসে,—অথচ সহরে তখন রাত্রির স্তব্ধতা সত্য, তার মধ্যে ফাঁকি নাই। অসংখ্য শব্দের বিপুল কলরোল থামিয়া যে গভীর স্তব্ধতা সৃষ্টি হইয়াছে, গ্রামের শ্মশানেও যার তুলনা নাই, মাঝে মাঝে মোটরের গর্জ্জন আর রিক্সার ঘণ্টাধ্বনি তাকে একটু নাড়াও দিতে পারে না।

শুধু স্পষ্ট করিয়া দেয়। কানে যেন তালা লাগিয়া যায় আর শব্দহীনতা দপ দপ করিতে থাকে।

নটা-দশটার সময় হইতে রাত্রি দুটো-তিনটে পর্য্যন্ত শ্রান্ত দেহ যখন ঘুম চাহিয়া পায় না তখন হইতে প্রতিটি মিনিট মনোমোহনের কাছে রাতজাগার কষ্টে ভারি ও মন্থর হইয়া থাকে।

তৃতীয় রাত্রি এমনিভাবে কাটিল।

পরদিন সকালে সে চিন্ময়ের বাড়ী গেল।

অনেকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে এই সাক্ষাতের আনন্দ ও উত্তেজনা মনোমোহন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া একদিন চিন্ময়কে একেবারে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবেঃ তাকে দেখিয়া সে সহরে বাস করিতেছে জানিয়া, সহরের কোন্ পাড়ায় কেমন একটি বাড়ী সে কিভাবে সাজাইয়াছে লক্ষ্য করিয়া, বন্ধু ও অতিথিকে বাড়ীতে আদর-অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থায় নিখুঁত মার্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া চিন্ময় ভাবিবে, কই না, মনোমোহন তো মোটেই পাড়াগেঁয়ে নয়! তিনবার তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া তার সম্বন্ধে যে ধারণা চিন্ময়ের নিশ্চয় জাগিয়াছিল, এতকাল পরে সে ধারণা তার ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একটি সাথীর অভাব তিন দিনের মধ্যেই তাকে এমন কাবু করিয়া দিল যে চমক দেওয়া আঘাতে চিন্ময়ের ধারণা পরিবর্তন করার সাধটা বাতিল না করিয়া পারা গেল না। চিন্ময় আগেই জানিয়া রাখিবে যে সে সহরে বাস করিতে আসিতেছে।

জানুক, উপায় কি।

নাম করা হোটেলটির চার্জ বড় বেশী। মনে মনে খরচের হিসাব আওড়ানো মনোমোহনের অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ক'দিন এই অনাবশ্যক মোটা খরচের চিন্তাটা বড় বিঁধিতেছিল। আজ এই অপব্যয়ের সমর্থনে একটা ভালমত যুক্তি জুটিয়া যাওয়ায় সে স্বস্তি বোধ করিল।

চিন্ময় নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে, সে কোথায় উঠিয়াছে— হোটেলের নামটা তখন নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করা চলিবে!

চিন্ময়ের বাড়ীর সামনে বাগান আছে। কয়েক হাত মোটে চওড়া, তবু নিখুঁত ভাবে সাজানো ফুলের গাছে ঠাসা বাগান। এটা সহরের এই নবোদ্গত অঞ্চলের

ফ্যাশন। তিন কাঠা জমিতে যে বাড়ী করিয়াছে, সে-ও খানিকটা জমি ছাড়িয়া দিয়াছে বাগানের জন্য। তবে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া চিন্ময়ের মস্ত বড় বাড়ী। যত বড় নয়, নির্মাণ-কৌশলে তার চেয়ে বড় মনে হয়।

তাকে দেখিয়াই চিন্ময় খুশী হইয়া বলিল, 'মোহন? আশ্চর্য্য করে দিলে যে!'

অভ্যর্থনার আন্তরিকতাতেই কয়েক বছরের অদর্শনের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া যায়, দু'জনেই স্বস্তি বোধ করে।

আরেক দিক দিয়া মনোমোহন একটু বিস্ময়ও অনুভব করে।

কিছুদিন যোগাযোগ না থাকিলে মনের মধ্যে বন্ধুও কেমন বদ্‌লাইয়া যায়। দেখা হইলে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, এতো ঠিক সে নয়! এতদিন মনের মধ্যে বন্ধু বলিয়া যাকে স্মরণ করিতাম?

বন্ধুর সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া চিন্ময় বলে, 'তুমি সত্যি একটি আশ্চর্য্য মানুষ মোহন। যতবার গাঁ থেকে এসেছ, গাঁয়ের এতটুকু চিহ্ন তোমার কোথাও খুঁজে পাইনি। চুল ছেঁটেছ, তা-ও এখানকাব সেলুনেব ছাঁট। তোমাদের ওখানে সেলুন আছে নাকি? এতকাল গাঁয়ে থেকে এখানে আসবার সময় কি করে গাঁয়ের সব ছাপ ঝেড়ে ফেলে দাও?'

মনোমোহন বলে, 'পুকুর থেকে হাঁস যখন উঠে আসে—'

'গায়ে জল থাকে না। কিন্তু পায়ে পাঁক লেগে থাকে। পাঁক না থাকলেও দেখলেই বোঝা যায় পুকুর থেকে উঠে এসেছে।'

'গেঁয়ো বলেই হয়তো সহুরে সেজেছি।'

'সেজেছ কোথায়? সাজলে তো ধরাই পড়ে যেতে—চেনা যেত সহরের জামাই এসেছো!'

দুজনেই হাসে। দুজনেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। দুজনেই ভাবে যে শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন, আর রুচির দিক দিয়া প্রায় ভিন্ন রকম একজন মানুষের সঙ্গে অনায়াসে কেমন সহজ অন্তরঙ্গতা গড়িয়া তুলিয়াছে!

কিন্তু খানিক পরেই টের পাওয়া যায় দূরে সরিয়া থাকিলে বন্ধুর সঙ্গের সহজ অন্তরঙ্গতা বজায় থাকা এত সহজ নয়।

'তারপর, খবর কি?'

চিন্ময়ের প্রশ্ন শুনিয়া মনোমোহন একটু দমিয়া যায়। অন্তরঙ্গতা বজায় আছে

কিন্তু জীবনের গত কয়েকটি বছরের হিসাবে তারা পরস্পরের অপরিচিত। যতই বিবরণ তারা পরস্পরকে দিক, সেগুলি হইবে শুধু বড় বড় কয়েকটি ঘটনার পরিচয়, অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টের মত। অসংখ্য ক্ষণগুলির খুঁটি-নাটি বিচিত্র বিবরণ পরস্পরের অজানাই থাকিয়া যাইবে।

পাঁচ বছর আগে মনোমোহনের বিবাহের সময় চিন্ময় তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছিল, কয়েকদিন থাকিয়া আসিয়াছিল।

সেই তাদের শেষ দেখা।

তারপর কিছুকাল ধরিয়া মাঝে মাঝে একজন আর একজনকে চিঠি লিখিয়াছে। বছর তুই আগে চিন্ময়ের বিবাহের সময় সে বন্ধুকে মস্ত একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

সে চিঠির আগাগোড়া শুধু এই সমস্যার আলোচনা ছিল, সে কি সুখী হইবে? মোহন তো জানে, চিরদিন সে গ্রামের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, অনাড়ম্বর সহজ শান্ত জীবন সে পছন্দ করে। সন্ধ্যার অবশ্য তুলনা নাই, তাপস অথবা হিরণ্ময়কে বাতিল করিয়া সন্ধ্যা যে তার সঙ্গে জীবন কাটাইতে চাহিবে নিজের এই সৌভাগ্যে এখনও তার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। তবু মনটা মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করে। মনে হয়, সন্ধ্যা যদি সহর হইতে অনেক দূরে কোন পল্লীতে গৃহস্থের অন্তঃপুরে বড় হইত আর বহুদিনের পরিচয়ের বদলে চিরন্তন প্রথামত একদিন তু'একজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়া আসিত এবং আরেকবার সমারোহে গিয়া সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়া আনিত, কি সুখীই সে হইত জীবনে!

মোহন যেমন লাবণ্যকে নিয়া সুখী হইয়াছে।

চিঠি পড়িয়া মোহন ভাবিয়াছিল: এ কোন দেশী নেকামি? গ্রাম্য গৃহস্থের অন্তঃপুরে মানুষ হইলে সন্ধ্যা যে আর এই সন্ধ্যা থাকিত না, এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি কি চিন্ময়ের নাই?

লাবণ্যও চিঠিখানা পড়িয়াছিল, স্বামীর সব চিঠিই সে পড়ে। রাগ করিয়া সে বলিয়াছিল, 'তার মানে আমাকে তোমার বন্ধু মুখ্যু গেঁয়ো ভূত মনে করে।'

চিঠির মানে তাই দাঁড়ায়। তবে মোহন বন্ধুকে জানিত কিনা, তাই সে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল: 'না, ঠিক তা নয়। ওর কাছে গ্রামের মেয়ে হল কতকটা সেকালের ঋষিদের আশ্রমপালিতা কন্যার মত। রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি

সব আছে. কাব্যের নায়িকার মত ভালবাসার খেলা জানে, অথচ এমন সরলা যে কাঁটা গাছে আঁচল আটকে গেল—'

'তুমি থামবে ?'

সে চিঠির জবাব মোহন .দেয় নাই, চিন্ময়ের বিবাহেও আসে নাই। চিন্ময় অনেক অনুযোগ দিয়া আরেকখানা চিঠি লিখিয়াছিল এবং স্পষ্ট উল্লেখ করিযাছিল, সন্ধ্যার সঙ্গে কয়েকদিন কোন গ্রামে গিয়া বেড়াইয়া আসিবাব কথা ভাবিতেছে।

চিঠির জবাব লিখিয়াও চিঠিখানা পোস্ট করিতে মোহন ভুলিয়া গিয়াছিল। তারপর এ পর্য্যন্ত দু'জনেই ছিল চুপচাপ।

খবরাখবরের আদানপ্রদান হইল প্রায় আধ ঘণ্টা, তারপর হঠাৎ মোহন বলিল, 'আসল কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি। সত্যি আমি গেঁয়ো। একজনের সঙ্গে জীবন কাটাতে কেমন লাগছে ?'

'ভালই।'

আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে মোহন ভুলিয়া যায় নাই, চিন্ময় আপনা হইতে বলে কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। চিন্ময়ও বন্ধুর প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকায় আধ ঘণ্টার আলাপে সন্ধ্যার কথা একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। এইবার বিবাহোৎসবে না আসার এবং চিঠির জবাব না দেওয়ার একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করা মোহনের উচিত ছিল।

কর্ত্তব্যটা সে সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেল।

চিঠির ইঙ্গিত ছিল খুব স্পষ্ট। মনোমোহন নিমন্ত্রণ করিলেই চিন্ময় ও সন্ধ্যা কয়েকদিনের জন্য তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিত। মোহন জবাব লিখিয়াও চিঠি ডাকে দেয় নাই।

তার মনে হইয়াছিল, এ চিঠি সন্ধ্যার ফরমাসে লেখা, গ্রাম্য আবেষ্টনীতে তাকে দেখিবার সখ হইয়াছে সন্ধ্যার। সন্ধ্যার কল্পনায় হয়তো সে ফতুয়া গায়ে দেয়, উবু হইয়া বসিয়া পাড়ার দশজনের সঙ্গে খোশ গল্প করে আর তার বাড়ীর শাঁখা সিন্দূর পরা ঘোম্‌টা-টানা মেয়েরা কলসী কাঁখে পুকুরে জল আনিতে যায়। এসব নিজের চোখে দেখিয়া সন্ধ্যার একটু আমোদ পাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে।

খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিতে থাকে, মোহনের জন্য চা আসে, দেয়ালের দামী ঘড়িতে কোমল ক্লান্ত আওয়াজে ধীরে ধীরে দশটা বাজে, সময়ের যেন তাড়াতাড়ি নাই।

সন্ধ্যার কাছে একটা খবর কি চিন্ময় পাঠাইবে না? এবেলা তাকে এখানে খাইয়া যাইতে বলিবে না একবার? শুধু এক কাপ চা আর খাবারে তার অভ্যর্থনার শুরু ও শেষ হইবে?

শেষের দিকে চিন্ময়কে কেমন অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল, তারপর সে এক সময় বলে, 'এমন অসময়ে তুমি এলে মোহন! এখুনি নেয়ে খেয়ে আমায় আপিস ছুটতে হবে।'

'ও, আচ্ছা তা'হলে উঠি।'

নিজের বোকামির জন্য মনোমোহনের আপসোসের সীমা থাকে না। 'এবার তুমি বিদায় হও' বলিবার সুযোগ চিন্ময়কে দেওয়ার আগেই অবস্থা বুঝিয়া তার নিজেরই বিদায় নেওয়া উচিত ছিল।

চিন্ময় কিন্তু ছাড়িতে চায় না, বলে, 'আরে, বোসো বোসো। তোমার এত তাড়া কিসের? তোমার তো আপিস নেই! যতক্ষণ সময় আছে একটু গল্প করা যাক!'

মনোমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার বসে। এদের সঙ্গে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। এরা নিজেরাই ইঙ্গিতে জানায় আপিস যাওয়ার তাগিদ আছে, এবার তুমি বিদায় হও, আবার উঠিতে গেলে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে, এত তাড়া কিসের!

কয়েক মিনিট পরে নিজেই সে আপিসের কথাটা মনে করাইয়া দেয়।

চিন্ময় বলে যে চুলোয় যাক আপিস, সে কি কেরানী যে লেট হইলে বড়বাবু গাল দিবে? বিশেষ একটা দরকারী কাজ আছে তাই না গেলে চলিবে না, নয় তো এতদিন পরে তাদের দেখা হইয়াছে, আজ কি আর চিন্ময় আপিস যাইত?

শুনিয়া মনোমোহন আবার দমিয়া যায়।

আগাগোড়া বিচারে যেন ভুল হইয়া যাইতেছে। চিন্ময় তবে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আপিসের তাগিদ জানায় নাই, অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না বলিয়া আপসোস প্রকাশ করিয়াছিল? যে কোন ছুতোয়

ছেলেমানুষের মত অভিমান করিবার এবং দোষ বাহির করিবার জন্য সে কি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ?

এতো ভাল কথা নয়।

সব অবস্থাতেই আত্মসমালোচনা মানুষকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়। অন্যমনস্ক মানুষকে মনে হয় মনমরা উদাসীন। চিন্ময় দুঃখিত হইয়া ভাবে, জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া মোহন কি ঝিমাইয়া পড়িতেছে ? গ্রামে থাকিয়াও সে কি সংবের বোঁটা-ছেঁড়া মানুষের মত বাসি হইয়া যাইতেছে ?

'ওবেলা তোমার তো কোন কাজ নেই মোহন ?'

'না।'

'সকাল সকাল আপিস থেকে বেরিয়ে তোমায় একেবারে তুলে নিয়ে আসব বাড়ী থেকে। ঠিকানাটা কি তোমার ?'

নামকরা হোটেলের সাহায্যে বন্ধুর কাছে মর্য্যাদা বাড়ানোর সাধ পচিয়া গিয়াছিল। একটু লজ্জার সঙ্গেই মোহন হোটেলের নামটা উচ্চারণ করিল।

'হোটেল ?' চিন্ময় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 'আমি ভাবছিলাম, তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ী উঠেছ বুঝি। কিন্তু ও হোটেল কেন, কলকাতায় আর হোটেল খুঁজে পেলে না ? দশগুণ বেশী চার্জ দিয়ে ওখানে উঠবার মানে ?'

'মোটে দু'চার দিনের জন্য কিনা—'

'দু'চার দিনের জন্য মিছিমিছি টাকা নষ্ট করার কোন মানে হয় ? এক কাজ কর তুমি, ওবেলাই হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে সটান আমার এখানে চলে এসো।'

চিন্ময় একটু হাসিল।

'হোটেলের মত আরামে অবশ্য থাকতে পারবে না, তবে আমি যখন আছি, তুমিও থাকতে পারবে আশা করছি।'

মোহন হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিল না। এ বাড়ীতে দু'চারদিন বাস করার কথা ভাবিতেও তার ভয় হয়।

সত্যই ভয় হয় !

দেখা করিতে আসিয়া দু'চার ঘণ্টা কাটাইয়া যাওয়া এক কথা কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা বাস করা ! দু'চার ঘণ্টা সোফায় শুধু বসিয়া থাকিতে হয়, মুখে শুধু বলিতে হয় কথা। অতিথি হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বাস করা তো সে রকম সহজ

ব্যাপার নয়। পদে পদে তার গ্রাম্যতা ও অসভ্যতা ধরা পড়িতে থাকিবে, বাড়ীর চাকর দাসীরও বুঝিতে বাকী থাকিবে না আধুনিক সভ্য পরিবারে বাস করিতে সে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

'কাল চলে যাচ্ছি, এক বেলার জন্য হাঙ্গামা করে কি হবে?'

চিন্ময়ের বাড়ীতে বাস করার বিপদকে বরণ করার চেয়ে দেশে পালানও ভাল। অবশ্য, কালই যে যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাওয়া ঠিক করিয়াও মানুষ অনেক ছুতায় যাত্রা পিছাইয়া দিতে পারে!

চিন্ময় সায় দিয়া বলিল, 'না, কাল যদি চলে যাও, তবে আর হাঙ্গামা করে লাভ নেই। কিন্তু তুমি কলকাতা এসেছ কেন তাতো বললে না?'

মোহন বলে, চিন্ময় শুনিয়া যায়। শুনিতে শুনিতে এমন মুখের ভাব হয় চিন্ময়ের, বন্ধু যেন আত্মহত্যার পরিকল্পনা শুনাইতেছে!

'সাধ করে দেশের বাড়ী ঘর ছেড়ে এসে তুমি কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে থাকতে চাও?'

'এখনকার মত বাড়ী ভাড়া নেব। তারপর দেখেশুনে কিছু জমি কিনে একটা বাড়ী করবার ইচ্ছা আছে।'

সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্ময় বলে, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ মোহন। তোমার মাথার ঠিক নেই।'

চিন্ময়ও সন্ধ্যাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, সন্ধ্যাও খবর পাইয়া আপনা হইতে উঁকি দিয়া যায় নাই।

সন্ধ্যার কথাটা মোহনকেই উল্লেখ করিতে হইল, তার সহরবাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্ময়ের সঙ্গে আলোচনা ও তর্কের পর বিদায় নেওয়ার সময়। সেই পুরাতন তর্ক, কলেজ জীবনে প্রতিদিন যে তর্কে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আজও ব্যক্তিগত আলোচনাটা মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল বহুরূপী সভ্যতার বহুমুখী পরিণতি ও সম্ভাবনার বিচারে এবং এক মুহূর্তে এতকাল দূরে দূরে থাকার জন্য দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধানটা গিয়াছিল বাতিল হইয়া। একটু যে সঙ্কোচ ছিল তাও কাটিয়া যাওয়ায় মোহনের পক্ষে যাচিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করার দাবী জানানো সহজ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার কথা উঠিতেই চিন্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'বলিনি তোমায়? সন্ধ্যা তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে ?'

'বাপের বাড়ী গেছে, আবার কোথায় ।'

'কবে গেল ?'

'তা পাঁচ ছ'মাস হ'ল বৈকি।'

'পাঁচ ছ'মাস ?'

বিস্ময়ের ভাব ফুটিতে ফুটিতে উত্তেজিত আনন্দের হাসিতে মোহনের মুখ ভরিয়া গেল, দু'হাতে সে চিন্ময়ের ডান হাতটি চাপিয়া ধরিল।—'খোকা, না খুকি ?'

'তার মানে ?'

ইঙ্গিতটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল চিন্ময়ের, তারপর তার মুখেও মৃদু একটু কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল—নিস্তেজ ও অস্থায়ী হাসি।

'ও, তাই বলো ! স্ত্রীরা খোকা বা খুকি প্রসব করতে বেশীদিনের জন্য বাপের বাড়ী যায় আমার এটা মনে ছিল না। তুমি বুঝি সন্ধ্যাকে ওরকম সাধারণ স্ত্রী বলে ধরে রেখেছ ?'

মোহন চুপ করিয়া রহিল।

'খোকাখুকির ব্যাপারেই ও বাপের বাড়ী গেছে বটে, তবে ঠিক উল্টো কারণে ! আমি খোকা খুকি চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম বলে আমাকে ঠেকাবার জন্য। এখন কিছুদিন ওসব হাঙ্গামা চায় না। বছর দুই পরে ফিরে আসবে বলেছে, তারপর যদি দরকার হয়, তোমার ওই কারণে গেলেও যেতে পারে বাপের বাড়ী। তার এখনো অনেক দেরী ভাই, অনেক দেরী।'

মোহন ভড়কাইয়া গিয়াছিল, কতকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝগড়া হয়েছে নাকি তোমাদের ?'

চিন্ময় ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, 'ঝগড়া ? আমরা কি তোমরা যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করব আর দশ মিনিট পরে মুখের দিকে চেয়ে দু'জনেই হেসে ফেলব ? আমাদের মতের অমিল হয়েছে। ওসব তুমি বুঝবে না ভাই, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

ব্যাপারটা মোহন বুঝিতে পারে ভাল ভাবেই। সন্ধ্যার প্রসঙ্গে চিন্ময়ের রাগ আর জ্বালার বহর দেখিয়া সে আর কিছু বলে না।

'চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত হোটেলে থেকো।'

মোহনকে বিদায় না দিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বাড়ীর সামনে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তের মত বাগান, লতার চাঁদোয়ার নীচে কোলাপ্-সিবল গেট।

চিন্ময়ের বাবা কেদারনাথ স্মার্ট আপিসি বেশে গাড়ীতে উঠিতেছিল। গতিস্বপ্নের স্থির প্রতিমূর্ত্তির মত গাড়ীটির পালিশে সূর্য্যের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে মনে হয়। কেদারনাথের কাঁচা পাকা চুল একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছে, টান করা মুখের চামড়া হয়তো একটু শিথিল হইয়াছে, নিস্প্রভ হয় নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিবার পর সে মোহনের সঙ্গে কথা বলিল। মোহন গাড়ী ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কথা না বলিয়া উপায় ছিল না।

'মোহন নাকি?' অনেকদিন পরে তোমায় দেখলাম।'

'ভাল আছেন?'

'আছি এক রকম। কি করছ এখন?'

ছেলের স্কুল-কলেজ জীবনের অনেক অপরিচিত ছেলে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দেখা করিতে আসে, চাকরী চায়। অনেকক্ষণ সাধারণ আলাপের ভূমিকায় সময় নষ্ট করে, প্রত্যেকে আগেই প্রমাণ করিয়া রাখিতে চায় যে অন্ততঃ তার জন্য কেদারের কিছু করা উচিত।

মোহনের বাড়ীর অবস্থা কেদারের মনে ছিল না, তাই প্রথমেই সে জানিতে চাহল, সে বেকার কিনা অথবা কিছু করিতেছে। সময় অযথা নষ্ট হইবে না, মোহনের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা চলিতে পারে তাও বুঝা যাইবে।

মোহন ধীরে ধীরে বলিল, 'দেশেই আছি এখনও পর্য্যন্ত। বাবা মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয়?'

সহানুভূতি জানাইতে কেদার বলিল, 'মারা গেছেন? তাই তো, বড়ই দুঃখের কথা হল!'

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে বলিল, 'চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? চিন্ময় বাড়ীতেই আছে।'

সঙ্গ ত্যাগ করার ভূমিকা হিসাবে বলিল, 'কটা বাজল? দশটা তেত্রিশ! দেরী হয়ে গেল একটু।—যাও।'

'যাও' সে বলিল ড্রাইভারকে। শোঁ করিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

মোহন কখনো চাকরীর জন্য উমেদারী করে নাই কি না তাই কেদারের ব্যবহারে অমায়িকতার জোয়ার আসিবার আগেই ভাঁটা আসিল কেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

এজন্য বিস্মিত হওয়ার অবসর কিন্তু সে পাইল না, বিস্ময় জাগিল অন্য কারণে।

পথের ওপারে দু'টি নূতন তিনতলা বাড়ীর মাঝখানে একটি খোলার বাড়ী, মাটি লেপা দেয়ালে আলকাতরা মাখানো কাঠের গরাদের জানলা। খোলা দরজা দিয়া ভিতরে একটা মাচার খানিকটা অংশ চোখে পড়ে, সবুজ সতেজ পাতার মধ্যে কয়েকটা হলদে ফুল ফুটিয়া আছে, একটি পরিপুষ্ট কুমড়া ঝুলিতেছে।

ম্যাজিক নয়তো? এই পাড়ায় চিন্ময়ের বাড়ীর এত কাছে বাঁশের মাচায় কুমড়ো ফুল এবং ফল!

দুপুরে হোটেলের ঘরে বসিয়া মোহন লাবণ্যশ্রীকে একখানা চিঠি লিখিল। চিঠিখানা লিখিবার জন্যই দামী একখানা প্যাড কিনিয়া আনিল।

লিখিল:

আসিবার আগের দিন তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে তোমায় কাঁদিয়েছিলাম, অতটা বাড়াবাড়ি করা আমার উচিত হয়নি। সারাদিন তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, বিকালে তুমি নিজে খাবার এনে দিয়েছিলে কিন্তু খাইনি, রাত্রে তুমি কাঁদতে আরম্ভ না করলে হয়তো তোমার সঙ্গে ভাব না করেই কলকাতা চলে আসতাম।

আমার ওরকম জিদ চেপেছিল কেন জান? অনেকদিন একসঙ্গে থাকলে ওরকম হয়, সামান্য কারণে আপন জনের সঙ্গে সহজেই খিটিমিটি বেধে যায়। এখন বুঝতে পারছি, এই জন্য বৌদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাওয়া ভাল। আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, সেজন্য ('আমায় মাপ করো' লিখিয়া, একটু ভাবিয়া কথাগুলি মোহন কাটিয়া দিল) মনে দুঃখ রেখো না। সেকথা যাক, তোমায় একটা দরকারী কথা লিখতে চাই। আগেও অনেকবার এ বিষয়ে তোমায় বলেছি কিন্তু সামনাসামনি বলার জন্যই বোধ হয় কথাটা তোমার তেমন

গুরুতর মনে হয়নি, অন্য প্রসঙ্গে চাপা পড়ে গেছে। এখন আমি কাছে নেই, দূর থেকে চিঠি লিখে জানাচ্ছি, হয়তো এবার আমার কথার গুরুত্ব খানিকটা বুঝতে পারবে।

তোমার ছেলেমানুষী এবার না কমালে তো চলবে না লাবু! তুচ্ছ বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠবে, সামান্য অনুযোগে কান্না আসবে, পাছে কেউ কিছু মনে করে ভেবে সর্ব্বদা সকলকে ভয় করে চলবে, জোর করে কিছু চাওয়ার বদলে দশ বছরের মেয়ের মত আব্দার ধরবে আর অভিমান করবে—এ স্বভাব তোমার বদলানো চাই। তুমি যে একটা মানুষ, তোমার যে স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে, তাই যদি তুমি ভুলে থাকো, নিজের জীবনকে তুমি সার্থক করে তুলবে কি করে? বিশেষতঃ কলকাতায় এলে আমাদের জীবনের প্রসার বাড়বে, দশজনের সঙ্গে তোমার মেলামেশা করতে হবে, সামাজিক জীবনে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে, নতুন ব্যবস্থায় সংসার চালাতে আমায় সাহায্য করতে হবে—এখনকার মত ছেলেমানুষ যদি থেকে যাও, এসব তো তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। ফল কি দাঁড়াবে ভেবে দেখো।—

ইতি—

তোমার মোহন

এখনো যে বাড়ী ঠিক হয় নাই, এ খবরটা মোহন লিখিল পুনশ্চে।

দোতলার দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমে মুখ করা চিন্ময়ের একটি নিজস্ব বসিবার ঘর আছে।

বাড়ীর বাকী অংশের যে ঘর ও বারান্দা পার হইয়া এ ঘরে আসিতে হয়, তার সঙ্গে এ ঘরের অমিল নতুন মানুষকে রীতিমত চমক দেয়।

ঘরে কিছু নাই, একেবারেই কিছু নাই। পায়ের নীচে প্রশস্ত মেঝে, চারিদিকে ফাঁকা দেওয়াল, মাথার উপরে শুধু ছাদ!

বসিবার একটি আসন পর্য্যন্ত ঘরে নাই।

অপরিমিত শূন্যতার পরিবেশ জোরে শ্বাস টানিবার প্রেরণা জাগায়।

শুধু একটি সিল্কের লুঙ্গি পরিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে চিন্ময় মেঝেতে বসিয়া পড়ে।

বলে, 'বোসো। ধুলো লাগবে না, ধুলো নেই।'

মোহন বসে।

পাঁচ ছ'বছর আগে ঘরখানা অন্যরকম ছিল। আলতা সিঁদুর গয়না আর রঙীন শাড়িতে জমকালো বৌয়ের বিধবা বেশ ধরার মত ঘরের চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরু নরম ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিবার ব্যবস্থা ছিল আর ছিল বেতের মোড়া ও কাঠের পিঁড়ি। গড়গড়া ও রূপাবাঁধানো হুঁকা ছিল, পানের বাটা ও মসলার পাত্র ছিল, মাটির কুঁজো, পাথরের গ্লাস, তালপাতার পাখা ছিল। দেওয়াল ভরিয়া সাজানো ছিল পটের ছবি ও গ্রাম্য নক্সা।

শূন্য ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইতে বুলাইতে মোহন কেবল একটি কথায় প্রশ্ন করে, 'কেন?'

চিন্ময় বলে, 'কি করব? গ্রামের গেরস্থ ঘরে যা কিছু থাকে সব এনেছি, কমদামী সব জিনিস কিনেছি, কিন্তু ঘরোয়া ভাবটা কিছুতে আনতে পারিনি। কখনো মনে হয়েছে ঘরে জঞ্জাল জমেছে, কখনো মনে হয়েছে নতুন একটা সহুরে ফ্যাসান সৃষ্টি করেছি, কখনো মনে হয়েছে এবার বুঝি ক্যামেরা এনে শুটিং শুরু হবে। কোথায় যেন একটা ফাঁকি ছিল ধরতে পারিনি। সব তাই ছেঁটে ফেলেছি। ফাঁকি বজায় রেখে চলার চেয়ে এই রকম ফাঁকাই ভাল। মাঝে মাঝে এসে বসলে মনটা বেশ শান্ত হয়।'

মোহন জিজ্ঞাসা করে, 'সেই যে তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে ক'দিন ছিলে, তারপর আর গ্রামে গিয়ে থেকেছ কখনো?'

চিন্ময় বলে, 'থাকিনি, তবে মাঝে মাঝে সকালে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসেছি। গত রবিবারের আগের রবিবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। নরেশকে মনে পড়ে? তাদের দেশের বাড়ীতে। তাদের বাড়ীতে অবশ্য বেশীক্ষণ থাকিনি, পুকুর পাড়েই সময় কেটেছিল। মস্ত একটা মাছ ধরেছিলাম। তুলতে কি পারি, অনেকক্ষণ খেলিয়ে তবে তুললাম।'

'কত বড় মাছ?'

'সের দুই হবে।'

দু'সেরি একটা মাছ মস্ত বড় মাছ চিন্ময়ের কাছে!

তাদের মস্ত পুকুরটা এখন জেলেদের কাছে জমা দেওয়া হয়, আজ কাল দু'সেরি মাছ তার কাছেও অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু ওই পুকুর হইতে ছিপে সে কতবার সাত আট সের ওজনের রুই কাতলা ধরিয়াছে—খুব বেশীদিনের কথা নয়।

সে কথা চিন্ময়কে বলিয়া লাভ নাই। সে বুঝিবে না।

বড় মাছ ছিপে গাঁথিয়া ধরার সুখ আর বড় মাছ রান্না করিয়া খাওয়ার সুখের পার্থক্য তার জানা নাই।

মাছ ধরার সুখের স্বাদটা তার জানা আছে কিন্তু সুখটা পাওয়ার আগ্রহ আছে কি? জেলেদের পুকুরটা জমা দিলেও ছিপ ফেলিবার অধিকার সে হারায় নাই। কিন্তু গত কয়েক বছরে কতবার সে পুকুরে ছিপ ফেলিতে গিয়াছে?

একেবারেই তাগিদ অনুভব করে নাই।

মোহন জিজ্ঞাসা করে, 'শীতকালে খালি মেঝেতে বসো কি করে?'

চিন্ময় হঠাৎ জবাব দেয় না।

মোহন বুঝিতে পারে হঠাৎ সে ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছে—মুখ বন্ধ করিয়া সে রাগটা সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিন্ময় মুখ খুলিলে তবে মোহন তার রাগের কারণটা বুঝিতে পারে। তার প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ মনে করিয়' চিন্ময়ের রাগ হইয়াছে।

রাগ আয়ত্তে আসিলে চিন্ময় ধীরে ধীরে বলে, 'হাসি পেলে হেসো মোহন। এর চেয়ে তাতে কম ঘা লাগবে মনে। তুমি পনেরো সের মাছ তুলেছিলে মনে আছে কিন্তু আমি জীবনে কখনো ছিপে মাছ ধরিনি। আট দশ সেরি মাছ তুমি হেসে খেলে তুলে থাকো।'

ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য মোহন সত্যাই শীতকালে খালি মেঝেতে বসার সমস্যাটা টানিয়া আনিয়াছিল। সে লজ্জিতভাবে বলে, 'মনে মনে হাসিনি ভাই, কথাটা শুধু চাপা দিচ্ছিলাম। ছিপে মাছ ধরতে তুমি যে আনাড়ি, সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। মুখে বলে কি হবে?'

সন্ধ্যার সময় চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল,—বড় একটি মাটির প্রদীপ। শূন্য প্রদীপের শিখাকে কাঁপিতে দেখিয়া তখন মোহনের মনে হইল সহর সত্যাই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু গ্রাম কাছে আসে নাই।

লোকালয়ের বাহিরে গৃহহীন তরুহীন প্রান্তরে শুধু একটি আলো সম্বল করিয়া

তারা বসিয়া আছে। অনেকবার তার দেশের গ্রামের উত্তরে রঙ্গনাথের মাঠে বসিয়া সে দূরে আলো জ্বলিতে দেখিয়াছে। সে আলো একটি নয়, অনেকগুলি।

মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সন্ধ্যার কথা না উঠা পর্য্যন্ত কোন কথাই তার ভাল লাগে না। চিন্ময়ের মুখে সন্ধ্যার সঙ্গে তার বিরোধের বিবরণ শুনিয়া তার মনে হয়, এই ঘরখানা যেন সেই মনান্তরের কারণটির সহজ সরল ব্যাখ্যার মত। এত বড় বাড়ীতে এই একটিমাত্র ঘর যেমন চিন্ময়ের পাগলামির প্রত্যক্ষ পরিচয়, সন্ধ্যার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন মিলের মধ্যে একটিমাত্র অমিলও তেমনি তার বিকারের প্রমাণ।

বিবাহের আগে চিন্ময় তাকে চিঠিতে যা লিখিয়াছিল, মোহন আগেই জানিত সে সব বাজে কথা। কোন মন চিরদিন রূপকথার রাজকন্যার গায়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ায় না। রাজকন্যার ঈর্ষা নাই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সুখের ঘরকন্নায় সে বাধা দেয় না। কোন অজানা কারণে মোহনের রাজকন্যা বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যা সাজিলেও সেজন্য সন্ধ্যাকে নিয়া তার অসুখী হওয়ার কথা নয়।

সন্ধ্যা ঘোমটা টানিয়া অন্তঃপুরচারিণী সাজিলেই বরং তার অসুবিধার সীমা থাকিত না। নিজে সে যে জীবন যাপন করে,—এই ঘরে খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে দু'এক ঘণ্টা অবসর যাপন করা ছাড়া—তাতে সন্ধ্যা যেমন আছে তেমনি না হইলে জীবনসঙ্গিনী তাকে করা চলিত না। তাই ঘরে ও বাহিরে সন্ধ্যার সাজপোষাক চালচলনের এতটুকু সংস্কার চিন্ময় দায়ী করে নাই শুনিয়া মোহন আশ্চর্য্য হয় না।

'আমি কিছুই চাইনি ভাই, শুধু একটি ছেলে চেয়েছিলাম। আমার মতে বেশী বয়সে বিয়ে হলে প্রথমেই ছেলেমেয়ে হওয়া ভাল—অন্তত: একটি। ও বললে পাঁচ বছরের মধ্যে ছেলেমেয়ে হওয়া চলবে না, পাঁচ বছর পরে দেখা যাবে। প্রথমে হাসতে হাসতেই আলোচনা হত, তারপর আমি যত জোর করতে লাগলাম, ওর জিদও তত চড়তে লাগল। শেষে একদিন বাবার কাছে চলে গেল। কি বলে গেল জানো? পাঁচ বছর পূর্ণ হলে ফিরে আসবে।'

'পাঁচটা বছর ধৈর্য্য ধরলেই পারতে? দেখতে দেখতে কেটে যেত।'

'কেন? বিয়ে কি ছেলেখেলা? একজন ক'মাস হৈচৈ করে বেড়ানো বন্ধ রাখতে পারবে না বলে আরেকজন পাঁচ বছর ধৈর্য্য ধরবে, আমি ওসব

ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসি না। তাছাড়া, বার্থ কণ্ট্রোল আমার অতি কদর্য্য মনে হয়।'

'তুমি কদর্য্য ভাবলেই তো নেসেসিটি কথা শুনবে না। সভ্য জগতের দরকার, তাই ওটা চল হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামে নিতাই বলে একজন ডাক-পিয়ন আছে। দশ বার বছর বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে ছ'টি। খেতে দিতে পারে না। একদিন পাগলের মত ছুটে এসে আমাদের হাসপাতালের—'

'তোমার হাসপাতাল আছে নাকি ?'

'বাবা একটা করেছিলেন ছোটখাটো। আরও দশ গুণ বড় একটা দরকার, কিন্তু করে কে ? বাবারও অত পয়সা ছিল না, আমারও নেই।' মোহন একটু হাসে, 'নিতাই এসে হাসপাতালের ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গেল। পেটের নতুন ছেলেটাকে পেটেই মারবার জন্য বৌকে কি যেন সব খাইয়ে দিয়েছিল, বৌটা নিজেই মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে ডাক্তার আমার পরামর্শ নিতে এল, নিতাইকে পুলিশে দেবে কি না। আমি বললাম, না, ওকে বার্থ কণ্ট্রোল শিখিয়ে দিন। এ হ'ল বছর দুই আগের কথা। কিন্তু শেখালে কি হবে, ওসব কি ধাতে পোষায় নিতাইদের ? আরেকটি বাচ্চা হয়েছে নিতাই-এর বৌয়ের—এবার আর কোন গোলমাল করে নি। ডাক্তার আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিল। কিন্তু নিতাই বলে অন্য কথা।'

'কি বলে ?'

'বলে, না বাবু, ও সব ভাল নয়। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি বললাম, তবে সেবার ওরকম করতে গিয়েছিলি কেন ? বৌটা মরত নিজে জেল খাটতিস্ ! নিতাই বলল, অত বুঝিনি বাবু। ছেলেপিলে কটার দশা দেখে মরিয়া হয়ে পাপ করেছি।'

'আমার ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আছে।'

চিন্ময় বিরক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর কথা আলোচনা করার সময় গ্রামের নিতাই পিয়নের গল্প আরম্ভ করা বোধ হয় তার উচিত হয় নাই।

কিন্তু গ্রামকে, গ্রামের সরল শান্ত জীবনকে ভালোবাসিতে গেলে নিতাই পিয়নের সমস্যাটা তুচ্ছ করা যায় কেমন করিয়া ? গ্রামের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অশিক্ষা কুসংস্কার এসব বাদ দিয়া গ্রাম্য জীবন কল্পনা করা যায় কি করিয়া।

তাকে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া চিন্ময় বিরক্ত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়, ধীরে ধীরে বলে, 'আসল নীতিটাই তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ মোহন। কারো কারো বেলা সত্যিকারের অজুহাত থাকতে পারে—যেমন ধর, স্বাস্থ্যের জন্য যদি দরকার হয়। কিন্তু খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্বাধীন চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটবে—এসব কি বার্থ কণ্ট্রোলের অজুহাত? নিতাই ছেলেপিলেকে খেতে দিতে পারে না, সেটা একেবারে আলাদা একটা অন্যায়। নিতাই অন্যায়টা মানবে কেন? সে ভগবানের দোহাই দেয়—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। কিন্তু আসলে কথাটা তো ঠিক। আহারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ বাড়বে কমবে—সেজন্য বার্থ কণ্ট্রোল দরকার হয় না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে বলেই মানুষ মরতে মরতে দুর্ভিক্ষ ঠেকাবার ব্যবস্থা করবে। মানুষ জন্মানো বন্ধ করে কি দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায়? গরীব সুখে থাকে?'

হঠাৎ চিন্ময় হাসে।

'প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম ভাই। সন্ধ্যা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে এদিক থেকে একটা উপকার করেছে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে মাথা অনেকটা সাফ হয়ে এসেছে।'

আচমকা সে প্রশ্ন করে, 'তোমার কি তবে এই ব্যাপার? সহরে আসবে, স্বাধীনভাবে দু'জনে স্ফূর্তি করবে, তাই ছেলেমেয়ে চাও না?'

মোহন বলে, 'এবার আমার রাগ করা উচিত। লাবণ্যকে ডাক্তার দেখাতে কলকাতা এসেছিলাম মনে নেই?'

'সত্যি মনে ছিল না ভাই!'

'তোমরা কি এ ঘরেই থাকবে দাদা?'

গত পাঁচ বছরে ঝরণা বড় হয় নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে। চিন্ময় স্নান করিতে যায়, ঝরণার সঙ্গে মোহন যায় নীচে সকলের বসিবার ঘরে।

সেখানে ঝরণার বন্ধু লীলা আর তার স্বামী বসিয়াছিল।

লীলাকে মোহন চিনিত। পাঁচ বছরে সেও বড় হয় নাই, একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের আলোয় ঝরণাকে মোটা মনে হইয়াছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোয় লীলাকে দেখার পর ঝরণার দিকে চাহিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ঝরণা

শুধু স্পষ্ট হইয়াছে, মোটা হয় নাই। অন্য এক যুগের স্বপ্ন সামঞ্জস্য হারানোর ভয়ে কবি ও শিল্পীর মারফতেও কল্পনা যে সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, ঝরণা যেন সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে।

ঝরণা নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন। না হইয়া উপায় কি? তার বিপদ কেউ বুঝিবে না। ঝরণার হাসি মিলানো মুখ ও কঠিন দৃষ্টির তিরস্কারে হঠাৎ সচেতন হইয়া মোহন তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেটের জন্য পকেট হাত্‌ড়াইতে আরম্ভ করে।

লজ্জায় তার কান গরম হইয়া ওঠে।

গ্রামে পুকুরঘাটে একটি স্ত্রীলোক গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া অসভ্য অবিবেচক মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, সহুরে ভাবে সেই রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন ঘটিয়া গেল।

চুপ করিয়া থাকা আরও ভয়ঙ্কর। লীলাকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার মা ভাল আছেন?'

লীলার গলা খুব মৃদু, অতি ধীরে ধীরে সে কথা বলিত। এখনো তার কথা যেন দূর হইতে ক্লান্ত হইয়া কানে আসিয়া পৌঁছায়, কেবল তার নিঃশব্দ ক্ষীণ হাসিতে ধারালো দুষ্টামি আছে মনে হয়!

'মা ভালই আছেন। আমি খুব বুড়ী হয়ে পড়েছি, না? ঝরণার মত আমাকেও তুমি বলতেন, আজ যেন আপনি হয়ে গেছি মনে হচ্ছে?'

আর একটু হইলেই বুদ্ধিমানের মত জবাব দেওয়ার কথাগুলি ফস্‌কাইয়া যাইত, জড়াইয়া জড়াইয়া হয়তো মোহন বলিয়া বসিত, 'না না, তা নয়, তা নয়—।' লীলার চেনা হাসি হঠাৎ তাকে প্রেরণা জোগায়, সে বলে, 'ছ'ফুট একজনকে সঙ্গে এনেছ, হঠাৎ তুমি বলতে কি সাহস হয়?'

সকলে হাসে।

ঝরণা বলে, 'আমায় খোঁচা দেওয়া হল। আজ পর্য্যন্ত পাঁচ ফুট একজন সঙ্গীও জোটাতে পারিনি।'

মোহন স্বস্তি বোধ করে। খুশীও হয়। গ্রামের স্ত্রীলোক গালাগালি দেয়, ক্ষমাও করে নীরবেই। এরা চোখের দৃষ্টিতে শাসন করে আবার ক্ষমাও করে।

পরে সে চিন্ময়কে ব্যাপারটা বলে। সরলভাবে প্রাণ খুলিয়া বলে।

'এমন লজ্জা পেলাম ভাই! আমার মনে কিছু নেই, অবাক হয়ে দেখছিলাম যে কায়দা জানলে কত সিম্পল্ ভাবে রূপকে কি আশ্চর্য্যরকম ফুটিয়ে তোলা যায়। গেঁয়ো মানুষ, খেয়াল ছিল না ওভাবে তাকাতে নেই।'

'তাকালে দোষটা কি? এ হল ঝরণার ন্যাকামি। সবাই দেখবে বলেই তো সাজগোজ করেছে! সোজাসুজি খোলাখুলি স্পষ্টভাবে চেয়ে দেখলেই বুঝি দোষ হয়ে গেল?'

একটু থামিয়া চিন্ময় নালিশের সুরে আবার বলে, 'তোমার কাছে গ্রামের সব কিছুই খারাপ! কেউ অসভ্যতা করলে মেয়েরা সোজাসুজি গালাগালি দেবে—সেটাই তো উচিত। কিন্তু ওরকম কি সত্যি ঘটে? আমি তো দেখেছি একঘাটে মেয়েপুরুষ কয়েক হাত তফাতে নাইছে—পুরুষেরা আগাগোড়া মেয়েদের দিকে পিছন ফিরে থাকে, তাও দেখেছি।'

মোহন বলে, 'তা না হলে কি চলে? সবাইকে পুকুরেই তো যেতে হবে। কাজেই ওরকম নিয়মনীতি দরকার। মেয়েরা নাইছে বলে তুমি একঘণ্টা হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? ওদের দিকে পিছন ফিরে একটু তফাতে তোমার নাওয়ার কাজ সেরে তুমি চলে যাও!'

চিন্ময় খুশী হইয়া বলে, 'তবে? ছাখো তো কি সহজ সুন্দর নিয়ম।'

পরদিন চিন্ময় একটি বাড়ীর খবর দিল।

জগদানন্দ নামে এক ধনী আছে, তার গোটাকয়েক বাড়ী আছে কলিকাতায়। চিন্ময়ের বাড়ী সহরের যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলে তার একটি বাড়ী খালি আছে। একটু ঘুরিয়া যাইতে না হইলে চিন্ময়ের বাড়ী হইতে এ বাড়ীতে হাঁটিয়া আসিতে মিনিট পাঁচেকের বেশী সময় লাগিত না।

বাড়ী দেখিয়া মোহনের খুব পছন্দ হইয়া গেল। আধুনিক ধাঁচের নতুন বাড়ী, জ্যামিতিক গঠন-বৈচিত্র্যে একটু ধাঁধার মত।

ভাড়ার অঙ্কটা শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল না। এ এলাকায় এরকম একটা বাড়ীর ভাড়া যে বেশী দিতে হইবে এটা তার জানাই ছিল।

পরদিন মোহন বাড়ী ফিরিয়া গেল। বাড়ীওলার সঙ্গে কথা বলিয়াছে চিন্ময়, বাড়ীটা ভাড়া করার ব্যবস্থাও সেই করিবে।

তিন

বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মোহন খুব সমারোহ করিল।

দেশে এই তার শেষ সামাজিক কাজ, সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পরেও বহুদিন যেন মানুষ তার প্রশংসা করে।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসিল, বন্ধু-বান্ধবেরা আসিল, একটি বৃষ উৎসর্গ করা হইল, নানা জাতের আরও অনেক লোক ছাড়া শুধু ব্রাহ্মণই ভোজন করিল সাড়ে সাতশো, দু'হাজার কাঙ্গালীর পেট জীবনে হয়তো এই প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার ভরার মত ভরিয়া গেল।

চিন্ময় আসিয়া তিন দিন থাকিয়া গেল। এত টাকা খরচ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধে এমন সমারোহ করিয়াও বন্ধুর কাছে সে কিন্তু প্রশংসা পাইল না।

চিন্ময় স্পষ্টই বলিল, 'লোকজন খাওয়াচ্ছ তাতে কিছু বলার নেই। বাজে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এত টাকা নষ্ট করার মানে হয়?'

'না করলে লোকে নিন্দা করবে।'

আত্মীয়েরা সকলে বিদায় নেওয়ার আগেই মোহন আরেকবার কলিকাতায় গেল। টেবিল চেয়ার সোফা আলমারি কাঁচ ও চীনা মাটির বাসন, কার্পেট পর্দা আলো পাখা ইত্যাদি অনেক রকম জিনিস কিনিয়া ভাড়াটে বাড়ীটি ছবির মত সাজাইয়া ফিরিয়া আসিল।

দেশের বাড়ী হইতে সেকেলে জমকালো চেহারার তিনটি খাট আর বাছা বাছা কয়েকটি আসবাব ও জিনিস কেবল নেওয়া হইবে। বাকী অধিকাংশই গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। সহরের সে বাড়ীতে সেগুলি মানাইবে না।

লাবণ্যশ্রী চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'বাক্স নেব না?'

'নেব। কিন্তু খাটের নীচে ঘরের কোণে পাহাড় করে রাখতে পাবে না। সব একটা গুদাম ঘরে থাকবে।'

'একটা রুমাল বার করতে গুদাম ঘরে যাব?'

'সর্ব্বদা যা দরকার, সে সব কি আর বাক্সে থাকবে? রুমাল থাকবে তোমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে, আরও অনেক কিছু থাকবে। ড্রেসিং টেবিল্‌টা যা কিনেছি তোমার জন্যে—'

স্বামীর পছন্দে কিন্তু লাবণ্যশ্রীর একেবারেই বিশ্বাস নাই।

'একবারটি আমায় দেখিয়ে কিনলে পারতে। সত্যি বড় ব্যস্তবাগীশ মানুষ তুমি!'

লাবণ্যের রূপে এমন একটা কোমলতা আছে যে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তার বড় জম্‌কালো রঙীন শাড়ী পরার সখ, ঘষিয়া মাজিয়া ক্রীম্‌পাউডার দিয়া রূপকে তীক্ষ্ণ করার দুরন্ত সাধ। প্রক্রিয়াটা মোহন পছন্দ করে কিন্তু ফলটা তাকে দমাইয়া দেয়। সন্ধ্যা কিভাবে প্রসাধন করিত সে জানে না, মনে হইত উজ্জ্বল হইয়াও মুখখানা যেন তার কোমল হইয়াছে। অথচ প্রসাধনের পরে লাবণ্যের মুখখানা শুধু চকচকে হয়, শ্রী থাকে না। হয়তো লাবণ্যের মুখ সন্ধ্যার মুখ নয় বলিয়া। অথবা হয় তো নিজের রূপকে ঘষামাজা করার কলা কৌশল লাবণ্য জানে না। তবু রূপ যে ভারে কাটে না লাবণ্যের ধারে কাটে, এটা জানা থাকায় মোহন মুখ মাজাঘষার চেষ্টায় স্ত্রীকে প্রশ্রয় দেয়, উৎসাহও দেয়।

সহরে যাইতে লাবণ্যেরও খুব আগ্রহ এবং উৎসাহ।

ধরিতে গেলে তার পরাধীন বধূজীবনের অন্ত হইয়াছে, মোহন কর্ত্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও সংসারের কর্ত্রী হইয়াছে, রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ছেলের বৌ যেমন রাণী হয়।

কিন্তু এতদিন ধরিয়া শাশুড়ী ননদ গুরুজনদের কাছে ভীরু লাজুক বৌ সাজিয়া থাকা এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে মোহনের হুকুমেও সে নিজেকে বদলাইতে পারিতেছে না, বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না নিজের নূতন পদমর্য্যাদার। নূতন জায়গায় নূতন বাড়ীতে গেলে হয়তো কাজটা সহজ হইতে পারে। ক্রমাগত যে দায়িত্বের কথা বলিয়া মোহন তার মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে, সে দায়িত্ব হয়তো সেখানে পালন করা কঠিন হইবে না।

আরও একটা কারণ আছে তার উৎসাহের।

সে কারণটাও তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যাওয়ার চার পাঁচদিন আগে সে মোহনকে খুশীর সঙ্গে বলে, 'এক হিসেবে ভালই হবে, একটু ভালরকম চিকিৎসা হবে আমার। এ ব্যথা সত্যি আর সইতে পারি না।'

মোহন সায় দিয়া বলে, 'হ্যাঁ, আমিও সে কথা ভেবে রেখেছি, একজন ভাল ডাক্তার দেখাব তোমাকে।'

'বেশ বড় একজনকে দেখিও, সস্তায় সেরো না। একশো টাকা ভিজিট লাগে, দিও। এখন তো তোমার হাত।'

মোহন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, 'আবার? আবার এভাবে কথা বলছ? এমন করে কথা বলো তুমি, তোমার যেন কোন দাবী নেই, অধিকার নেই। তুমি না লেখাপড়া শিখেছো?'

'পরীক্ষা দিলে অনার্স পেতাম—ফার্ষ্ট ক্লাস। দিতে দিলে কই?' লাবণ্য মুচকিয়া হাসে।

এই একটিমাত্র ভরসা তার সম্বন্ধে মোহন করে, তার কিছু পড়াশোনা করা আছে। তার গরীব বাপ মেয়েকে স্কুল কলেজে পড়াইতে, তালি দেওয়া জুতাজামা পরিয়া দিন কাটাইয়াছে। এটা অবশ্য তার কন্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ অথবা উদারতার প্রমাণ নয়—আরও অনেকেই যে হিসাবে মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়, তারও ছিল সেই একই হিসাব। লেখাপড়া জানা মেয়ের ভাল পাত্র জোটে, বিবাহে খরচ কম লাগে, বিবাহের সময় যে মোটা টাকা লাগিবেই, সেটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে অল্পে অল্পে খরচ করিয়া গেলে দোষ কি?

মোহনকে জামাই করার সময় বোধ হয় ভদ্রলোকের ভুল ভাঙ্গিয়াছে।

মোটা টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে, লাবণ্যের মার গায়ের একখানা গয়নাও অবশিষ্ট নাই, দু'হাতে শুধু দু'টি সোনা বাঁধানো শাঁখা!

তবে একথাও সত্য যে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখালেই মোহনকে জামাই করার ভাগ্য তার হইত না।

মোহনের বাপের জন্য লাবণ্যের কলেজে পড়া বন্ধ হইয়াছিল, পিছনে সায় ছিল মার। এ বিষয়ে ছেলের সঙ্গে সে আপোষ করে নাই। কলেজে পড়া মেয়ে আনিয়াছে তাই যথেষ্ট—এবার তাকে অন্তঃপুরে বৌ হইয়াই থাকিতে হইবে।

মোহন তাকে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করিতে দেয় নাই—কর্মহীন অলস দিন কাটাইতে লাবণ্যও বই পড়া একটা অবলম্বন করিয়াছে।

মোহন বই কেনে, লাবণ্য পড়ে। ইংরাজী সাহিত্য সে বোধ হয় বেশীই জানে মোহনের চেয়ে। কখন যে পড়ে, মোহন ভাল বুঝিতে পারে না। নূতন বই নিজের শেষ হওয়ার আগে সে উৎসাহের সঙ্গে তাগিদ দিয়া বলে, 'তাড়াতাড়ি পড়ে নিও, আলোচনা করব—'

লাবণ্য বলে, 'পড়েছি। শেষ বয়সের লেখা বোঝা যায়।'

অন্য সব দিকে লাবণ্য তাকে হতাশ করিয়াছে।

তার খানিকটা ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস, কারণে অকারণে হাসি-কান্নার মধ্যে যার প্রকাশ, বাকীটা পরের মুখ চাওয়া পরাধীনতায় সন্তুষ্ট আড়াল-খোঁজা নিষ্ক্রিয় জড়তা। সময় সময় মনে হয়, ভয় ও সঙ্কোচে সে আচ্ছন্ন হইয়া আছে শ্যাওলা আর পানাভরা পুকুরের মত, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষীর বুদ্‌বুদ উঠে, ছোটবড় মাছের যত ভাঙ্গা ভাঙ্গা আত্মচেতনা লেজের ঝাপ্‌টায় একটু সময়ের জন্য পানা সরাইয়া দেয়।

এত বই পড়া, ইংরাজী সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করা তার মনের গড়ন, স্বভাব আর চালচলনে কোন পরিবর্তনই যেন আনিতে পারে না।

ওইটুকু ভরসাই মোহনের আছে। পড়াশোনার প্রভাব চেতনায় পড়িবেই— শুধু পরিবেশের জন্য লাবণ্যের চেতনায় সে প্রভাবটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। পরিবেশ বদল হইলে সেটা নিশ্চয় আত্মপ্রকাশ করিবে।

রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগেও মোহন তাই ভাবে, সকলকে দেশের এই বাড়ীতে রাখিয়া শুধু লাবণ্যকে নিয়া গেলেই ভাল হইত। আত্মীয়-পরিজন আর কেউ অবশ্য যাইবে না, শুধু তার মা আর ভাইবোন। ওদেরও রাখিয়া যাওয়াই হয়তো উচিত ছিল। কেবল সে আর লাবণ্য, আর কেউ নয়। একা থাকিলে নিজেকে হয়তো লাবণ্য খুঁজিয়া পাইত। কে কি মনে করিবে সর্বদা ভাবিতে না হওয়ায় সে নিজের কথা ভাবিবার অবসর পাইত।

কিন্তু তার নিজের বড় মন কেমন করিবে মা আর ভাইবোনদের জন্য! ওদের রাখিয়া বৌ নিয়া কলিকাতায় বাস করিলে লোকে নিন্দাও করিবে।

গ্রামের দু'জন মানুষ মরিয়ার মত মনোমোহনকে ধরিয়া বসিল যে, তারাও তার সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে।

পীতাম্বর এবং শ্রীপতি কামার।

সারাদিন শ্রীপতি হাপর চালায়, দা কুড়াল কাস্তে শাবল লাঙ্গলের ফলা এই সব টুকটাকি লোহার জিনিস গড়ে, কোন রকমে তার দিন চলিয়া যায়। খুব কষ্টেই চলে, তবু সে বেকার নয়। তাই মোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'তুই কলকাতা গিয়ে করবি কি?'

'আজ্ঞে, পয়সা কামাব। এমন করে কদিন চলে? খেটে খেটে দেহ ক্ষয়ে গেল, দু'টো পয়সা জোটে না। লোহার দাম চড়ে, দা-কুড়ালের দাম চড়ালে কেউ কিনবে না। বাপটার মরণ ছিল না, ব্যবসা শিখিয়ে গেছে।'

শ্রীপতির বাপ অনেককাল মরিয়া গিয়াছে।

'পয়সা কামাবি কি করে?'

'কারখানায় খাটব। হেথায় হাতুড়ি পিটি, সেথায় পিটাব। মজুরি তো মিলবে! দা' গড়ে ঘরে ঘরে সাধতে হবে না, হাটে গিয়ে হা-পিত্যেস করে খদ্দেরের পথ চেয়ে থাকতে হবে না! আমাকে নেন্ কর্তা সাথে।'

বলিতে বলিতে সটান উপুড় হইয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া দু'হাতে সে মোহনের পা জড়াইয়া ধরিল।

'পা ছাড় শ্রীপতি। আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললি তো তুই আমাকে।'

শ্রীপতি কিছুতে পা ছাড়িবে না।

'ফেসাদ করব না কর্তা। দায় ঘাড়ে চাপাব তেমন মানুষ নই। কিছু না করতে পারি, ফিরে আসব।'

অগত্যা মোহনকে রাজী হইতে হইল।

পীতাম্বর আসিল একদিন একটু বেশী রাত্রে—চুপি চুপি চোরের মত আসিল। গ্রামের পথে তখন লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কর্মচারী দু'জনকে ছুটি দিয়া মোহন বাহিরের ঘরে হিসাবপত্র দেখিতেছিল, চোখ তুলিয়া দ্যাখে নিঃশব্দে ছায়ার মত কখন পীতাম্বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পীতাম্বর ভূমিকা করিল অনেক। বলিল, 'ওদের কথা শুনো না বাবা, আমি তোমার হিতৈষী। ওরা মিথ্যে করে রটায় আমি তোমার পূর্বপুরুষের নিন্দে করি। আমার দরকার কি নিন্দে করে? তিনপুরুষ আগে কি ঘটেছে না ঘটেছে, সত্যি না মিথ্যে ঠিক নেই, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়? দশজনের কাছে আমি তোমার প্রশংসা করি, তোমার ভালই চাই বাবা। কেন ভাল চাইব না? সংসারে কটা মানুষ মেলে তোমার মত?—'

তারপর বলিল, 'একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি তোমার কাছে, মুখ ফুটে বলতে ভরসা পাচ্ছি না বাবা।'

'বলুন না, আমার সাধ্য থাকলে করব।'

'আমায় তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।'

'আপনি কলকাতা যেতে চান ?'

'হ্যাঁ বাবা, নিয়ে চল আমাকে।'

পীতাম্বরের মুখের অসহায় দীন ভাবে এখন আর একটুও অভিনয়ের ছাপ থাকে না, ব্যাকুলতার মধ্যে তার সরলতা স্পষ্ট হইয়া উঠে। সে বলে, 'শোন বলি তোমাকে, তিন দিন হাতে একটি পয়সা নেই. ঘরে এক মুঠো চাল নেই।'

'কলকাতা গিয়ে করবেন কি ?'

'পয়সা কামাব। একটা দু'টো মাস একটু মাথা গুঁজে থাকতে দিও, একটা উপায় করে নেব। সহরের পথে পয়সা ছড়ানো থাকে। কাজকম্মো না পাই, ভিক্ষে করব। গাঁয়ে আমার ভিক্ষে করার পর্য্যন্ত উপায় নেই।'

উদ্দেশ্য দু'জনেরি ভাল। অবস্থার উন্নতি করিতে চায়। মোহন রাজী হইয়া গেল। এরা সঙ্গে গেলে বিশেষ ক্ষতিও নাই, অসুবিধাও নাই। এরা আত্মীয়-স্বজন নয়।

বাড়ীর পিছন দিকে ঠাকুর চাকরের ঘরের পাশে একটা ছোট বাড়তি ঘর আছে, দু'জনে সেখানে থাকিতে পারিবে। উপার্জনের ব্যবস্থা যদি করিতে না পারে, দু'তিন মাস দেখিয়া গ্রামে বিদায় করিয়া দিলেই চলিবে।

রওনা হওয়ার আগের দিন অনেক রাত্রে গ্রামের লোকের চোখ এড়াইয়া পীতাম্বর আবার আসিল।

'একসাথে যাওয়া হল না বাবা। আমার অদেষ্টটাই মন্দ। পাঁচুর জ্বর এসেছে। পশু যাব।'

'পশু যদি জ্বর না কমে ?'

'কমবে,—কালকেই ছেড়ে যাবে। গাড়ীর ভাড়াটা বরং দিয়ে দাও আমাকে আজ, পশু টিকিট কেটে রওনা হয়ে যাব।'

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মোহন এবার মনে মনে হাসিল।

গ্রামের লোকের চোখের সামনে মোহনের সঙ্গে সে ট্রেনে উঠিতে চায় না, সকলে টের পাইয়া যাইবে মোহন তাকে দয়া করিয়া নিয়া যাইতেছে। মোহনের কাছে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা নেওয়া চলে, সে টাকা পূর্বপুরুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মোহনের দেয়, দেখা হইলে দশজনের সামনে তার সঙ্গে ভদ্রতা রাখিয়া কথাও বলা চলে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দয়া তো গ্রহণ করা চলে না, ভাব তো করা চলে না তার সঙ্গে—এত গালাগালি ও অভিশাপ দিবার পর!

লোকে ভাবিবে পীতাম্বরের এতটুকু তেজ নাই।

রওনা হওয়ার দিন পাশের গাঁয়ে ছিল হাট।

বোঝাই গরুর গাড়ী আর মানুষ হাটের দিকে চলিতেছে, সকলে জমিলে তবে হাট জমিবে। ছ'দিন হাটের আটচালাগুলি আর চারিপাশের জায়গা খালি পড়িয়া থাকে, প্রতি বুধবার সেখানে মানুষের ভিড় জমে। বাহির হইতে মানুষের ভিড় বড় এলোমেলো মনে হয়, যে যেখানে পারে বেসাতি নিয়া বসিয়াছে, যে যেদিকে পারে চলিতেছে, কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু ভিতরে গেলে দেখা যায় দোকান-পাটের মধ্যে চলিবার পথ আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ছোট বড আঁকা-বাঁকা বিভিন্নমুখী অনেক পথ।

বেচিবার জন্য বেসাতি নিয়া বসিবার স্থানও সকলের বহুকাল ধরিয়া সুনির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সকলে তাদের গাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যায়। মোহন ভাবে, সপ্তাহে এরা একদিন হাটে যায়, আবার বাড়ী ফিরিয়া আসে। রাত্রি বাড়িতে বাড়িতে একসময় হাট জনশূন্য হইয়া যায়। কলিকাতার হাটে বোমা পড়িতে থাকিলেও এবং বহু লোক পলাইয়া গেলেও টের যাওয়া যায় না হাটের ভিড়ের চাপ একটু কম হইয়াছে। সহরের হাট ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া গিয়াছে, এমনিভাবে সহরের মানুষের সেখানে সকলে শিকড় গাড়িয়াছে।

ট্রেনে মোহন একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়াছিল। চিন্ময় স্টেশনে আসিতে পারে। রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে ছাড়া মান বজায় রাখিয়া তার সামনে নামা যায় না।

মা ম্লানমুখে এক কোণে বসিয়া থাকেন। লাবণ্য আর নলিনী পাশাপাশি বসিয়া মুখ দিয়া কথা বলে আর চোখ দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে থাকে। খুকী এ জানালা ও জানালা করিয়া বেড়ায়। মার কাছে বসিয়া খোকা জানালার কলকব্জা পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকে।

নগেন অনেকক্ষণ হইতে উসখুস করিতেছিল, একটা স্টেশনে গাড়ী থামিতে সে হঠাৎ নামিয়া গেল।

'গাড়ী ছেড়ে দেবে নগেন।'

'পাশের কামরায় উঠছি। পরের স্টেশনে আসব।'

মা ও দাদার সামনে অনেকক্ষণ সে সিগারেট টানিতে পারে নাই। নতুন সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে, নেশা বড় প্রবল। কলিকাতায় একেবারে বাড়ীতে পৌছানোর আগে নির্জ্জনে সিগারেট টান দেওয়ার সুযোগ জুটিবে না· ভাবিয়া সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে যে সিগারেটে খায় কেউ জানে না, হঠাৎ পাশের কামরায় যাওয়ার কারণটা কেউ অনুমান করিতে পারিবে না। পাগলামি মনে করিয়া বড় জোর একটু বিরক্ত হইবে।

মোহন জোরে ধমক দিয়া বলিল, 'উঠে আয় নগেন, শীগগির আয়। গাড়ী ছাড়ল।'

নগেন মুখ ভার করিয়া উঠিয়া আসিল।

'সিগারেট খাবি তো? এখানে বসে খা। খাচ্ছিস যখন, এত লুকোচুরি কিসের?'

নগেন বিবর্ণমুখে বসিয়া থাকে। মোহন পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরাইয়া কেসটা আবার পকেটে রাখিয়া দেয়।

কলেজে ঢুকিয়াই এত অল্প বয়সে সিগারেট খাইতে শেখা নগেনের উচিত হয় নাই. তবে শিখিয়াছে যখন চোরের মত ভয়ে ভয়ে আড়ালে না খাইয়া সামনেই খাক। নিজেই তাকে একটা সিগারেট দিয়া মোহন তার লজ্জাভয় ভাঙ্গিয়া দিবে ভাবিয়াছিল!

দেওয়ার সময় হাত আগাইল না।

শুধু তাই নয়, মার সামনে নিজেও সে আজ পর্য্যন্ত কোনদিন সিগারেট টানে নাই, নিজেরও তার এখন দারুণ অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। সামনে ধূমপান করিলে গুরুজনের অমর্যাদা হয়, এ শুধু অর্থহীন গেঁয়ো সংস্কার, তবু মা'র দিকে খানিকটা পিছন ফিরিয়া না বসিয়া সে পারে না, কয়েকবার টান দিয়াই সিগারেটটা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। নিজেকে এই বলিয়া বুঝায় যে, মা তো এখনো তার যুক্তিতর্কের খোঁজ রাখে না, মা হয়তো মনে করিবে ছেলে তাকে অবজ্ঞা করিতেছে। মিছামিছি মার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি? কথাটা আগে মাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তারপর সামনে যত খুশী চুরুট সিগারেট টানিলেই হইবে।

'আর খাব না দাদা !'

মাথা নীচু করিয়া নগেন বসিয়া আছে ধরা-পড়া চোরের মত। সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দেওয়াকে নগেন তবে ক্রুদ্ধ দাদার ভৎর্সনা মনে করিয়া লজ্জায় অনুতাপে কাবু হইয়া পড়িয়াছে !

তাই স্বাভাবিক বটে !

এতক্ষণ সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, যাত্রা আরম্ভ করা মাত্র পারিবারিক জীবনটা তার নূতন রীতিনীতিতে চলিতে আরম্ভ করে নাই, সকলের চেতনা নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ভাই-এর সঙ্গে তার সম্পর্কটা এতকাল যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। মার মত ওকেও বুঝাইয়া পড়াইয়া না নিলে তার কথা ও কাজের ভুল মানে বুঝিবার সম্ভাবনা পদে পদে রহিয়া গিয়াছে। কেবল ওদের দু'জনকে নয়, সকলকে বুঝাইতে হইবে। সকলের চিন্তাধারাকেই তার নতুন পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। নতুবা সে কি ভাবিয়া কি বলে আর করে, ওরা বুঝিতে পারিবে না।

চিন্তাটা তাকে পীড়ন করে। মনে হয়, নূতন একটা ষ্টেজে অভিনয় করার জন্য সকলকে সে যেন নিয়া চলিয়াছে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় করিতে শেখানোর ভারটাও তার !

চিন্ময় স্টেশনে আসে নাই। স্টেশনের কুলীরাই তাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানায়।

লাবণ্য মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'বন্ধু ! তোমার সহুরে বন্ধু !'

অনেকদিন আগে চিঠিতে চিন্ময় তাকে ইঙ্গিতে গেঁয়ো বলিয়াছিল, বলিয়াছিল তাকে প্রশংসা করিবার জন্যই, কিন্তু লাবণ্য করিয়াছিল রাগ। লাবণ্য কি এখনো তাহা ভোলে নাই ?

চিন্ময় স্টেশনে আসিবে বলে নাই, মোহনও তাকে স্টেশনে হাজির থাকিতে লেখে নাই। কবে কোন ট্রেনে কখন তারা পৌছিবে শুধু এই খবরটা তাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই মোহন প্রত্যাশা করিতেছিল সে নিশ্চয়ই সাগ্রহে তাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিবে।

গ্রামের কত লোক তাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে সঙ্গে আসিয়াছিল, অনেকের চোখ সে ছল ছল করিতে দেখিয়াছে।

এখানে তার বন্ধু আছে মোটে একজন, সেও তাকে নামাইয়া নিতে স্টেশনে আসিল না ?

চিন্ময় ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছে, কাজের জন্য আপিসের পয়সায় তাকে যখন তখন বোম্বে মাদ্রাজ ছুটিতে হয়। সকালে ট্রেনে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় নামা হয়তো তার কাছে কতকটা ট্রামে বাসে ওঠা নামার মত। তবু রাগ হয়, তবু মনে হয় তার আসা উচিত ছিল।

বাড়ী পৌছিতে রাত প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। আধঘণ্টা পরে আসিল চিন্ময়ের ভাই মৃন্ময়।

চিন্ময় কাল হঠাৎ পাটনা চলিয়া গিয়াছে, তাদের দেখা-শোনা করার ভার সে দিয়া গিয়াছে মৃন্ময়কে। কখন তারা পৌছিবে চিন্ময় কিছু বলিয়া যায় নাই, তারও জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতে খেয়াল ছিল না, বিকাল হইতে এবাড়ী ওবাড়ী করিতে করিতে বেচারা একেবারে হয়রাণ হইয়া গিয়াছে।

'আমি গিয়ে আপনাদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

নগেনের সমবয়সী ছেলে, ছিপছিপে রোগা চেহারা, খুব লাজুক। চোখ তুলিয়া কারও চোখের দিকে চাহিতে পারে না। সে যেন লাজুক মেয়ে, মোহন যেন তার নূতন বর, লজ্জা ভয়ে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকদিন মোহন তাকে দেখে নাই, একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিছুদিন আগে কলিকাতা আসিয়া সে দু'রাত্রি ওদের বাড়ী খাইয়াছে, মৃন্ময় হয়তো বাড়ীতেই ছিল কিন্তু সামনে না আসিয়া আড়ালে লুকাইয়া ছিল। ছেলেটার পক্ষে তাও অসম্ভব মনে হয় না!

মোহন মমতার সঙ্গে বলিল 'টাইম টেবল দেখলেই জানতে পারতে কখন পৌছব।'

'টাইম টেবিল? ভুলে গেছি।'

'একটা চাকরকে এ বাড়ীতে বসিয়ে রাখলেও পারতে। বার বার তোমাকে খোঁজ নিতে আসতে হত না।'

'চাকর? খেয়াল হয়নি তো!'

মৃন্ময় লজ্জার সঙ্গে অপরাধীর মত একটু হাসিল—'আমি যাই, খাবারটা পাঠিয়ে দিই। আর যদি কোন দরকার থাকে—?'

পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে!

স্নেহ করার অধিকার যাদের আছে তাদের সঙ্গ তাকে পীড়ন করে। স্নেহের সুরে কেউ কথা বলিলে তার ভিতরটা কেমন অস্থির অস্থির

করিতে থাকে, মাথা গুলাইয়া যায়। এই অবস্থায় তার কথায় একটু তোতলামির ভাব দেখা দেয়, একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের জন্য পরের শব্দটি বুঝি কোথায় হারাইয়া যায়, জিভ দিয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া আনিতে হয়।

মোটামুটিভাবে জিনিসপত্র একটু গুছাইয়া সকলের শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া বেশী রাত্রে মোহন নিজে যখন শুইতে গেল, মৃন্ময়ের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে যন্ত্রণার ছাপটা তখনো তার মনে আছে।

পরিশ্রমে নয়, সহর যাত্রার উত্তেজনায় সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শোয়া মাত্র তারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—মোহনের ঘুম আসিতে একটু দেরী হয়। মৃন্ময়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে নগেনের কথা চিন্তা করে। হোষ্টেলে থাকিয়া নগেন মফঃস্বলের কলেজে পড়িতেছিল, দেশের বাড়ী হইতে তিন চার ঘণ্টার পথ। এবার তাকে কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি না করিয়া যেখানে ছিল সেখানে রাখিলে কেমন হয়? উঠতি বয়সে মফঃস্বলের সহরের অবাধ আলোবাতাস আর খোলা মাঠ ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখে, শান্ত আবেষ্টনী মনকে সুস্থ রাখে। কিন্তু কেউ বোধ হয় এ প্রস্তাবে রাজী হইবে না। নিজে সে পচা-ডোবা বনজঙ্গল কাদা আর মশাভরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এখানে বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়ার সুবিধা থাকিতে নগেনকে দূরে হোষ্টেলে গিয়া থাকিতে বলিবে কোন মুখে?

নগেনের ভালর জন্যই সে যে তাকে ওখানে রাখিয়া পড়াইতে চায়, তার এ যুক্তির মানেও কেহ বুঝিবে না। বিশেষতঃ মা।

পরদিন সকালে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আসিল। বলিল, 'আমি আপনার বাড়ীওয়ালা। পরিচয় করতে এলাম।'

মোহন একটু অভিভূত হইয়া বলিল, 'আসুন! বসুন।'

কোথায় সে যেন এইরকম একটি মূর্ত্তিমান আভিজাত্যের মত জমকালো চেহারার মানুষ দেখিয়াছে। মনের মধ্যে গভীর ভয় ও শ্রদ্ধায় আজও সেই মানুষটা জড়াইয়া আছে, তার স্মৃতিটা পরিণত হইয়া গিয়াছে অনুভূতিতে। কে সে? কবে কোথায় সে তাকে দেখিয়াছে?

জগদানন্দ বসিল।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বলিল, 'পরিচয় করার এত আগ্রহ কেন বলি। বাড়ীটার ভাড়াটে জুটছিল না। এরকম বাড়ী পছন্দ করার মত টেস্ট যাদের আছে, আর এত টাকা ভাড়া যারা দিতে পারে; তারা নিজেরাই বাড়ী তৈরী করে বাস করে। তাই একটু কৌতূহল হচ্ছিল, বাড়ীটা যিনি পছন্দ করে ভাড়া নিলেন, তিনি মানুষটা কেমন দেখে যাই।'

ধীরে স্পষ্ট কথা, বেশ বুঝা যায় বক্তব্যকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই তার অভ্যাস। মোহন জানে, এভাবে যারা কথা বলে তারা ধৈর্য্যশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষ হয়।

'বেশ বাড়ীটি আপনার। সকলের পছন্দ হয়েছে।'

জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করে, 'জমি কেনা আছে নিশ্চয় ?'

মোহন হাসিল।—'না। তবে কিনবার ইচ্ছা আছে।'

জগদানন্দ হাসিমুখে মাথা হেলাইয়া সায় দিল, 'তাহলে বছর খানেক থাকবেন আশা করা যায়।'

ধীরে ধীরে দু'জনের আলাপ চলিতে থাকে। পরিচয় গড়িয়া উঠিতে থাকে অত্যন্ত মন্থরগতিতে কিন্তু দৃঢ়ভাবে। একজন আরেকজনকে যতটুকু জানিতে পারে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। মোহনের ভালই লাগে। তার অনেক কাজ ছিল, সেগুলি স্থগিত রাখিতে হইলেও মনে হয় না বাজে গল্পে সময় নষ্ট হইতেছে।

মোহনের কলিকাতায় বাস করিতে আসাকে সমর্থন করিয়া জগদানন্দ বলে, 'বেশ করেছেন। এসব ইচ্ছাকে হাঙ্গামা বা অসুবিধার ভয়ে দমন করতে নেই। গ্রামে থাকতে ভাল না লাগলে গ্রামে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। তখন সহরে আসাই ভাল।'

'গ্রামের ক্ষতি হয়।'

'কেন ? আপনি চলে আসাতে গ্রামের কি ক্ষতি হয়েছে ? লোকে বলে শুনতে পাই শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসে বলে গ্রামের আরও অবনতি হয়। আমি তার মানে বুঝতে পারি না ভাই। শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রামে থেকে গ্রামের এতটুকু উন্নতি করে? কোন দেশে করেছে? শিক্ষিতেরা বেকার বসে থাকে,

ধনীরা টাকা খরচ করতে না পেরে টাকা আটকে রাখে। ওরা সহরে এলেই বরং দেশের উপকার বেশী। সহরের উন্নতির জন্য ওদের দরকার। সহরের উন্নতি না হলে গ্রামের কখনো উন্নতি হয় ?'

বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার, কিন্তু মোহন বুঝিতে পারে না। তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া জগদানন্দ বলে, 'সহর মানে বড় বড় বাড়ী, ট্রাম বাস লোকের ভিড় নয়। শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে প্রতিভাবান মানুষেরা যেখানে একত্র থাকে, সেটাই হল সহর। এদের দল যতই বাড়ে ততই ভাল। শিক্ষিত আর ধনীরা সহরে না এলে এদের দল বাড়বে কি করে ?'

এতক্ষণ পরে মোহন মনে মনে একটু রাগিয়া যায়। সে কি ছাত্র যে লোকটা বাড়ী আসিয়া তাকে পড়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে ? মানুষের এসব ব্যক্তিগত উদ্ভট ধারণা চিরদিন তাকে পীড়ন করে।

'আমি তিনখানা বই লিখেছি : ভারতবর্ষ ও সাম্যবাদ, ভারতের সংস্কার আন্দোলনের রূপ, আর বাঙ্গলায় শিল্পোন্নতির পথ। পড়েছেন ?'

'না। নামও শুনিনি।'

জবাব শুনিয়া জগদানন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। বলিল, 'একেবারেই কাটছে না বই ক'টা। দাম বেশী করিনি, প্রত্যেক কপিতে চার আনা করে খরচ বেশী পড়েছে। তবু কেউ কিনতে চায় না। এমনি দিয়ে দিয়েই লোককে পড়াই। আপনাকেও দেব, পড়ে দেখবেন।' জগদানন্দ হাসিল, 'তিনখানা বই কেউ পড়তে চায় না, তবু আরেকটা লিখতে আরম্ভ করেছি—মানুষের ভবিষ্যৎ। চিন্তাগুলি লিখে তো রাখি, কেউ পড়ে তো পড়বে। সত্য বলে যা জানা যায় সকলকে শোনাবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, কি বলেন ?'

'প্রত্যেকে যদি শোনায়, শুনবে কে ?'

'সকলে শুনবে। যে নিজের কথা শোনায় অন্যের কথা শুনতে তো তার বাধা নেই। তা ছাড়া, সত্যের সন্ধান ক'টা লোকে পায় ? আমার নিজের ধারণা সত্য, এ বিশ্বাস কটা লোকের আছে ?'

মোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। মানুষটা জানিয়া শুনিয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছে না সরলভাবে মনের কথা বলিতেছে ঠিক বুঝিতে পারে না।

আলোচনা তাদের এবার অন্য দিকে গড়াইত অথবা আপনা হইতে থামিয়া যাইত বলা যায় না, একটা বাধা পড়িল। হাত কাটা ফর্সা সার্ট গায়ে নতুন বাড়ীর নতুন চাকর জ্যোতি খবর দিল, মা ডাকিতেছেন।

মা ঠিক দরজার আড়ালেই ছিলেন, উৎসুক উত্তেজিতা মা।

'উনি কে ?'

মার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মোহন বলিল, 'উনি আমাদের বাড়ীওয়ালা জগৎবাবু।'

'জগৎ কি ?'

'জগদানন্দ ভটচাজ বোধ হয়।'

'জিজ্ঞেস করে আয় তো উনি শ্রীশ্রীপরমানন্দ ঠাকুরের ভাই নাকি ?'

জিজ্ঞাসা করিয়া মোহনকে আর জবাবটা মাকে বলিয়া আসিতে হইল না, জগদানন্দ তার প্রশ্নের জবাব দেওয়ামাত্র মা নিজেই ঘরের মধ্যে আসিলেন। গলায় আঁচল দিয়া পায়ের জুতায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, জুতার ঠিক উপরে পায়ে আঙ্গুল বুলাইয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিলেন, জিভে ঠেকাইলেন।

'আপনার দাদা আমাদের গুরুদেব ছিলেন।'

জগদানন্দ বিব্রতভাবে বলিল, 'তা হবে, তা হবে। আমাকে আবার প্রণাম করা কেন।'

মার মুখের ভাব দেখিয়া মোহন বুঝিতে পারিল মা ভাবিতেছেন, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, বয়সে তিনি বড় বলিয়া গুরুদেবের ভাই তাঁর প্রণাম গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন!

'আপনাদের বংশের ছোট ছেলেটিও আমার নমস্য। আপনাদের পায়ের ধূলো ছাড়া তো আমাদের গতি নেই। অনেক জন্মের পুণ্য ছিল, না ডাকতে নিজে বাড়ীতে পা দিয়েছেন। এ বেলা আপনাকে খেয়ে যেতে হবে, আমি প্রসাদ পাব।'

'এ বেলা ? এ বেলা তো হয় না। খাওয়ার জন্য কি, কাছেই তো আছি, আরেকদিন খেয়ে যাব।'

'তবে দু'টি ফল কেটে আনি ?'

মোহন স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। তার মা গুরুদেবের ভাইকে প্রণাম করিতেছে, পুণ্যের জন্য পাতের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছে। ভাগ্যে আজ চিন্ময় আসে নাই, এসব দেখিয়া শুনিয়া না জানি সে কি ভাবিত!

'ফল কেন, খাবার আর চা পাঠিয়ে দেবে যাও।'

ছেলের রুক্ষ গলার আওয়াজে মা দমিয়া গেলেন। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন ভিতরে।

এখন পরমানন্দের কথা মোহনের মনে পড়িয়াছে। জগদানন্দের ব্রাশ করা চুল, পালিশ করা জুতা, জমকালো পোষাক বাধা না দিলে আগেই মনে পড়িত। মা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন। গুরুদেবের মূর্ত্তি তাঁকে ধ্যান করিতে হয়, মোহনের মত তাঁর মনে পরমানন্দের চেহারা ঝাপসা হইয়া যাইতে পারে নাই। কয়েকবার নিজেদের বাড়ীতেই সে পরমানন্দকে দেখিয়াছে, শেষবার আট দশ বছর আগে। সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া থাকিতেন, বাড়ীতে সকলে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিত, ফিস ফিস করিয়া কথা বলিত, শিশু কাঁদিয়া উঠিলে তার মা তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিত।

শেষদিন তিনি মোহনকে কাছে বসাইয়া একঘণ্টা ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিয়াছিলেন,—সকলের সামনে।

কত বয়স ছিল তখন মোহনের? কুড়ি একুশের বেশী নয়। সে অভিজ্ঞতা মোহন জীবনে ভুলিবে না। সকলের সামনে পরমানন্দ যেন তাকে উলঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তার মনের গোপন স্মৃতি স্বপ্ন মেলিয়া ধরিয়াছেন সকলের কাছে, দুঃশাসনের চেয়ে তিনি নিষ্ঠুর।

'আমারও আপনাকে চেনা মনে হচ্ছিল। একটা আশ্চর্য্য যোগাযোগ ঘটেছে।'

'বেশী আর আশ্চর্য্য কি? দাদার কুড়ি বাইশ হাজার শিষ্য ছিল। আমাদের দু'ভায়ের চেহারারও অনেক মিল ছিল।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া একটু মুখ বাঁকাইয়া সে কাপটা নামাইয়া রাখে। মোহন বিরক্ত হইয়া ভাবে, মার সঙ্গে আর পারা গেল না। দামী চায়ের সেট কিনিয়া দিয়াছে, লিকার দুধ চিনি কোথায় ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পাঠাইয়া দিবে, একেবারে কাপে চা তৈরী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। এ যেন গ্রামের চা-পিপাসু হালদার আসিয়াছে' খানিকটা গরম সরবৎ করিয়া দিলেই তার তৃপ্তি হইবে।

আবার জ্যোতি আসে। এবার লাবণ্য ডাকিতেছে।

'মা গিয়ে প্রণাম করতে বললেন।' লাবণ্য বলে একটু ভয়ে ভয়ে, বিব্রতভাবে।

'প্রণাম নয়, নমস্কার করবে। চলো পরিচয় করিয়ে দিই।' মোহন জোর দিয়া বলে।

মা যা খুশী করুন, তাঁর অজুহাত আছে, তিনি সেকেলে মানুষ। শ্বশুর শাশুড়ার গুরুদেবের ভাই বলিয়াই একটা মানুষের কাছে স্ত্রীকে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিতে দেওয়া যায় না।

স্বামীর নির্দ্দেশ মত অভিনয় করিয়া লাবণ্য সবে বসিয়াছে, মা আসিলেন।

'প্রণাম করেছ বৌমা ?'

জগদানন্দ বলে, 'থাক থাক, প্রণাম দরকার নেই।'

লাবণ্য কাঠের পুতুলের মত বসিয়া থাকে। একবার সে যেন প্রণাম করার জন্য উঠিবার চেষ্টা করে, মোহনের দৃষ্টিপাতে সাহস পায় না। ছেলের রুক্ষ গলার কথা মা সহ্য করিয়াছিলেন, বৌ-এর অবাধ্যতা তাঁর সহ্য হয় না।

'সাধে কি তোমার এ অবস্থা হয়েছে বাছা ? পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, আজও পেটে ছেলে ধরতে পারলে না, শুয়ে শুয়ে ব্যথায় কাতরাও। আমরা হলে বিয়ের অহঙ্কারে ফেটে না পড়ে গলায় দড়ি দিতাম।'

চার

পীতাম্বর বলিয়াছিল সে দুদিন পরে রওনা হইবে।

সাতদিন পরেও সে না আসায় মোহন যখন ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা আসিবার কথাটা তার ফাঁকি, ভাঁওতা দিয়া গাড়ী ভাড়া আর সংসার খরচ বাবদ কিছু টাকা আদায় করাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, তখন পীতাম্বরের খবর পাওয়া গেল। বিনা টিকিটে কলিকাতা আসিবার চেষ্টা করিতে গিয়া কয়েক দিনের জন্য হাজতে যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

হইয়াছে জরিমানা, সে টাকা না দিতে পারিলে অগত্যা হাজতবাস।

পীতাম্বর ভাবিতেও পারে নাই টিকিট না করার জন্য কাউকে রেল কোম্পানী আবার জেলে পাঠানোর হাঙ্গামা করিতে পারে। বড় জোর টানিয়া নামাইয়া দেয়, তার বেশী কিছু নয়। গাড়ী তো কলিকাতায় যাইবেই, জায়গারও কোন অভাব নাই গাড়ীতে, একটা মানুষ বিনা টিকিটে উঠিলে কি এমন আসিয়া যায় কোম্পানীর ? রাখাল সরকার কতবার ওভাবে কেতনপুর যাতায়াত করিয়াছে।

মোহন গিয়া তাকে ছাড়াইয়া আনিবার পর এই আপশোষটাই তার বড় দেখা গেল যে অন্য সকলে দিব্যি বিনা ভাড়ায় ট্রেণে চাপিয়া বেড়ায়, জীবনে একটিবার

চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া যায় কেবল সে। অদৃষ্টে কি যেন একটা প্যাঁচ আছে তার। দেবতাদের রাগ আছে তার উপর।

সব কিছুই তার ভাগ্যে মন্দ দাঁড়াইয়া যায়।

'যে আমায় ধরল, সে লোকটা মন্দ নয়। বললে, অন্য সময় হলে ছেড়ে দিত। হঠাৎ কদিন থেকে খুব কড়াকড়ি চলছে। মাঝে মাঝে নাকি দু'চারদিন এমনি ব্যবস্থা চলে, তারপর আবার ঢিল পড়ে যায়। তা, কপাল যদি আমার মন্দ না হবে বাবা, আমি যখন আসব ঠিক সেই সময়টা ওদের জবরদস্তির সময় হয়?'

হাঙ্গামা করিতে হওয়ায় মোহন বিরক্ত হইয়াছিল, এবার রাগ করিয়া বলে, 'ভাড়া দিয়ে এলাম, বিনা টিকিটে আসবার আপনার কি দরকার ছিল? যখন ধরল, তাড়াতাড়ি টিকিট কাটতে পারেননি বলে ডবল ভাড়া দিয়ে দিলেন না কেন?'

পীতাম্বর লজ্জিতভাবে বলে, 'ভাড়া কই বাবা? সাত গণ্ডা পয়সা সম্বল করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।'

মোহন চুপ করিয়া থাকে।

'মেয়েটাকে আনালাম। এক বছর আনাতে পারিনি। প্রথম পোয়াতি মেয়ে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে, গিন্নি কেঁদে কেটে অস্থির। গাড়ী ভাড়ার টাকাটাও রেখে এলাম, এটা ওটা খাওয়াতে পারবে মেয়েকে। নইলে বাঁচবে না মেয়েটা।'

মোহন ভাবে, গরীবের কি আর অজুহাতের অভাব হয়। টাকাটা যে তাকে দেওয়া হইয়াছিল গাড়ী ভাড়া বাবদ, অন্যভাবে ও টাকা যে খরচ করা চলে না, এ যুক্তি পীতাম্বর বুঝিবে না।

শ্রীপতিকে জ্যোতির ঘরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, পাশের ছোট ঘরটি দরকার হইয়াছে মার। পীতাম্বরকে কোথায় থাকিতে দেওয়া যায় মোহন মনে মনে তাই ভাবিতেছিল। গ্যারেজের সঙ্গে ছোট একটি বাড়তি ঘর ছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া পীতাম্বর নিজেই সেখানে থাকিবে স্থির করিয়া ফেলিল। ঘর না বলিয়া খোপ বলাই ভাল, মাঝখানে শুইয়া দু'হাত বাড়াইয়া দু'দিকের দেয়াল ছোঁয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে থাকিবার কথা বলিতে গিয়া মোহন চুপ করিয়া গেল। পীতাম্বরের সাটিনের গলাবন্ধ ময়লা কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, সঙ্গে একটা

রঙচটা তোরঙ্গ আর সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। তবু সে ভদ্রলোক। বাড়ীতে ওকে নিজেদের মধ্যেও রাখা যায় না, চাকর বাকরের সঙ্গেও থাকিতে দেওয়া চলে না। তার চেয়ে এ ঘরে থাকাই ভাল।

'তোমার আমি এতটুকু অসুবিধা করতে চাই না মোহন। আমি যে আছি তুমি টেরও পাবে না বাবা। যা তুমি করছ বুড়োর জন্যে অন্য কেউ কি করত?'

পীতাম্বর এই খোপটি বাছিয়া নেওয়ার পর তাকে বাড়ীর মধ্যে থাকিতে দেওয়ার অসুবিধার কথাটা মোহনের মনে পড়িয়াছিল, আগে নয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তার মনের ভাব কি দাঁড়াইবে আগেই অনুমান কবিয়া পীতাম্বর কি গ্যারেজে থাকা ঠিক করিয়াছে? মানুষটার এতখানি বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের অস্তিত্বে মোহনের যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না।

সহরের জাঁকজমক, তার গৃহ ও গৃহসজ্জা পীতাম্বরকে এতটুকু অভিভূত করিতে পারে নাই দেখিয়াও মোহন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। এমন নির্ব্বিকার অবহেলার সঙ্গে সে নূতন পরিবেশকে মানিয়া নিয়াছে যে মনে হয় আরও বিরাট আরও অভিনব আরও বিস্ময়কর কিছু সে কল্পনা করিয়াছিল, মনের মত না হওয়ায় বরং আশাভঙ্গের ব্যথা পাইয়াছে!

বাড়ীর সকলে মহোৎসাহে চিড়িয়াখানা মিউজিয়ম দেখিতে যায়, পাশ আনিয়া মনুমেণ্টে ওঠে, নগেন প্রায় প্রতিদিন এবং তার সঙ্গে দু'একদিন পরে পরে নলিনী সিনেমা দেখিতে যায়, কোনদিন তাদের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার জন্য পীতাম্বর ভুলিয়াও অনুরোধ জানায় না। দামী একটি গাড়ী আসিয়া মোহনের শূন্য গ্যারেজ পূর্ণ করে, উত্তেজিত আনন্দে সকলে চারিদিকে পাক দিয়া গাড়ীর অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে, মোহন পুত্রস্নেহে বনেটে হাত বুলায়,—পীতাম্বর স্মিতভাবে শুধু একটু হাসে, দু'বার মাথা হেলাইয়া মোহনের গাড়ী কেনাকে সমর্থন জানায়, তারপর বিড়ি টানিতে টানিতে নিজের মনে কি যেন ভাবিতে থাকে।

নূতন গাড়ীতে চাপিয়া একদিন সহরে একটু বেড়াইয়া আসার আগ্রহ তার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। শ্রীপতি সুযোগ আর স্থান পাইলেই জীবন সার্থক করিয়া নেয়, গাড়ী গ্যারেজ হইতে বাহির হইলে পীতাম্বর কখনো সামনে আসিয়া বলে না, চলো বাবা, আমিও একটু ঘুরে আসি।

একদিন মোহন গাড়ীতে একা বাহির হইয়াছে, ভাবিয়াছে পথে গিয়া ঠিক

করিবে কোথায় যাওয়া যায়। পীতাম্বরও বাহির হইয়া ফুটপাত ধরিয়া গুটি গুটি হাঁটিয়া চলিতেছিল। দেখিয়া মোহনের বড় মায়া হইল।

তার নতুন গাড়ীতে চাপার সাধটা হয়তো বেচারা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা পায়, হয়তো সে কি মনে করিবে ভাবিয়া সাহস পায় না। নিজে যাচিয়া ওর সাধটা তার মেটানো উচিত।

গাড়ী থামে, ডাক শুনিয়া পীতাম্বর কাছে আসে। মোহন গভীর উদারতার সঙ্গে বলে, 'কোথায় যাচ্ছেন? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলে, 'মোটর চাপতে পারি না বাবা, কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।'

তাকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী আগাইয়া যায়, মোহনের মৃদু বিরক্তি ধীরে ধীরে ভোঁতা ক্রোধে পরিণত হইতে থাকে। পীতাম্বরের অজুহাত সে বিশ্বাস করে না। যে গাড়ীতে চোখ বুজিয়া থাকিলে সব সময় বুঝা যায় না গাড়ীটা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে, তার সেই গাড়ীতে চাপিলে ব্যাটার গা গুলাইবে!

এ শুধু পীতাম্বরের অহঙ্কার। অনুগ্রহ নিতে তার অপমান বোধ হয়।

পীতাম্বরের অনেক চালচলনের মানে এখন যেন মোহনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়! তার বাড়ীতে যে থাকিতে হইয়াছে এই লজ্জাতেই পীতাম্বর কাতর, প্রাণপণে সে নিজের সম্মান বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। গ্যারেজের ঘরটা বাছিয়া নেওয়ার কারণও তাই।

গলাবাজিতে গ্রামকে সে মুখর করিয়া রাখিত, এখানে আসিয়া একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছে। কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না, সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকে, সহানুভূতি চায় না, পরামর্শ চায় না, সুবিধা চায় না। সাত গণ্ডা পয়সা সম্বল করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত মোহনের কাছে একটি পয়সাও সাহায্য চায় নাই। সাত আনা কি খরচ হইয়া যায় নাই তার?

গ্রামের লোকের চোখ এড়াইয়া অনেক রাতে গাড়ীভাড়া ভিক্ষা চাহিতে আসার সঙ্গে এ সমস্তের একটা যেন মিল আছে।

এক সন্ন্যাসীর কথা মোহনের মনে পড়ে। ভিক্ষা করিতে দুয়ারে আসিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, বাড়ীর মানুষ তাকে দেখিতে পায় নাই জানিয়াও একটি শব্দ করিত না, কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অন্য বাড়ীর দুয়ারে চলিয়া যাইত। কি চাও?—জিজ্ঞাসা করিলে সে সাড়া দিত না, যেন শুনিতেই পায়

নাই। ভিক্ষা সে চাহিতে আসিয়াছে, একমুষ্টি চাল, কিম্বা একটি পয়সা তার প্রার্থনা, তবু কেউ তাকে ভিখারী ভাবিও না।

মোহন ভাবিয়া রাখে, বাড়ী ফিরিয়া আজ পীতাম্বরকে ডাকিয়া একটি টাকা দিবে, সকলের সামনে। না, এক টাকা নয়, চার আনা পয়সা। বলিবে আপনার হাত খরচের জন্য দিলাম। রোজ আপনাকে চার আনা করে দেব। চার আনায় আপনার কুলোবে তো?

শ্রীপতির চাহিতে লজ্জা নাই। চাওয়ারও তার শেষ নাই। সে পয়সা চায়, পুরাণো কাপড়, পুরাণো জুতা চায়, পেসাদ চায়, আমোদ চায়, পরামর্শ চায়, কাজ চায়।

তার চেয়েও বেশী চায় দরদ।

কারও অবহেলা সে সহিতে পারে না, কড়া কথায় তার চোখে জল আসিয়া পড়ে। প্রতিধ্বনি ছাড়া যেমন শব্দ মুহূর্ত্তের বেশী বাঁচিতে পারে না, অন্যের মুখে হাসি না ফুটিলে তার মুখের হাসি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। জিনিস তৈরী করা আর সেই জিনিস বিক্রী করার জন্য হন্যে হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর একটানা একঘেয়ে জীবন যাপনের পর এতগুলি দিনের অবসর সে বোধ হয় এই প্রথম পাইয়াছে, গম্ভীর নির্ব্বাক মানুষটা অনভ্যস্ত মুক্তির আনন্দে চপল ও মুখর হইয়া উঠিয়াছে, হাতুড়ি ধরার আগে ছেলেবেলা যেমন ছিল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সে সহরকে দেখে, পূজা করে উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে, অন্তহীন প্রশ্নে। তার ভাব দেখিয়া সকলে হাসে, কিন্তু তার ভাবপ্রবণতা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সকলের বিস্ময়ানুভূতি আবার ধারালো হইয়া উঠে।

কেবল সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গে, দুপুরে যখন অন্য সকলে ঘুমায়, রাত্রে যখন সে নিজে ঘুমাইতে যায়, মুখ দেখিয়াই টের পাওয়া যায় তার মন কেমন করিতেছে। স্তিমিত চোখ, নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া মুখের দুটি প্রান্ত। খাইতে বসিয়া সে নানা ব্যঞ্জনের দিকে তাকায়, ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করে। আসিবার দিন বৌ তাকে কুচো চিংড়ি দিয়া কচুর ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। এসব তরকারীর স্বাদ তো সে রকম নয়? বাড়ীর পিছনে জলায় এবার অজস্র কচু হইয়াছে, বৌ হয়তো রোজ কচুঘণ্ট রাঁধিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, নিজে খায়।

মন খারাপ হইলে শ্রীপতি পীতাম্বরের কাছে গিয়া খানিক তফাতে উবু হইয়া

বসে, পীতাম্বর ধরানো বিড়িটা আগাইয়া ধরিলে দু'হাত পাতিয়া জলন্ত বিড়িটা গ্রহণ করে, একটু আড়াল করিয়া বিড়িতে টান দেয়।

'চালটা মেরামত করা হয়নি।'

'হুঁ।'

'বিষ্টি আর তেমন হচ্ছে না এইটুকু ভরসা।'

'এখানে হচ্ছে না তো কি? দেশে হয়তো হচ্ছে।'

'তা হয়?'

শ্রীপতি জানে বৃষ্টি যখন হয় পৃথিবীর সব জায়গাতেই হয়। এখানে বৃষ্টি নামে না ওখানে নামে, আকাশ কি ভিন্ন ভিন্ন এখানের এবং ওখানের? দেশের আকাশ ঢাকিয়া যখন কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, এই সহর কি তখন অন্য একটি পরিষ্কার আকাশের নীচে রোদে ঝলমল করে?

পীতাম্বর বাহিরেই বেশী সময় কাটায়, কিন্তু কোথায় যায় কি করে কারো কাছে প্রকাশ করে না। পীতাম্বর বাড়ীতে না থাকিলে, জ্যোতির অবসর থাকিলে, শ্রীপতি জ্যোতির সঙ্গে গল্প করে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, চুল ছাঁটার কায়দায় আর হাতকাটা ছিটের সার্টে তাকে খুব স্মার্ট দেখায়।

প্রথমে শ্রীপতি তো ভাবিয়াছিল, সে বুঝি মোহনের কোন আত্মীয়।

জ্যোতির কথা কিন্তু বড় নোংরা। এমনি তাকে দেখিলে মনে হয় শিক্ষিত ভদ্র যুবক বুঝি চাকরের কাজ করিতেছে, তার কথা শুনিয়া শ্রীপতির চোখ কপালে উঠিয়া যায়।

কিছু কিছু অশ্লীল আলোচনায় শ্রীপতির আপত্তি নাই, গ্রামে দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে ও ধরনের গল্পগুজবে সে আমোদও পাইত, কিন্তু জ্যোতির মুখের একেবারে আটক নাই, অনায়াসে এমন কদর্য্য মন্তব্য সে করে, এমন বীভৎস বর্ণনা শোনায়, যে কিছুক্ষণের জন্য শ্রীপতির কল্পনার নরক সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়া বসে।

জ্যোতি নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনায়। আগে যাদের বাড়ী কাজ করিয়াছে তাদের সম্বন্ধে উদ্ভট ও অকথ্য কাহিনী ফলাও করিয়া রং চড়াইয়া বলিয়া যায়।

মন্তব্য করে, 'সব মেয়েলোক ওমনি,—সব, ওদের জাতটাই বজ্জাত।'

শুনিয়া শ্রীপতির বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে।

কদম ওদিকে কি করিতেছে কে জানে!

বাড়ীতে শুধু বুড়ী মা, ভাল দেখিতে পায় না। বিনয় হালদার হয়তো আবার মাছ ধরিবার ছলে ছিপ হাতে বাড়ার পিছনে বিলটার ধারে বসিয়া থাকে, দীনু হয়তো নানা ছুতায় বাড়া আসিয়া গল্প জুড়িয়া দেয়। ইন্দ্র এই জ্যোতির মত চুল ছাটে, কদমকে দেখিলেই সে শিস্ দিতে দিতে চলিয়া যাইত, সে চলিয়া আসিবার পর এখন হয়তো চলিয়া যায় না! কদম তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত, এখন হয়তো দাঁড়াইয়া থাকে।

কে জানে কি করিতেছে কদম?

চার বছর কদম ঘর করিতে আসিয়াছে, চার বছর কদম হাসে নাই। কাছে টানিতে গেলে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিয়াছে, এত কেন? পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই যে তিন ব্যাটাবেটির বাপ যোয়ান মদ্দ পুরুষের, তার অত সখ কেন? দিনরাত কানের কাছে মন্ত্র জপ করিয়াছে, গয়না দাও, শাড়ী দাও, মাছ দুধ খেতে দাও, আমি তোমার তিন ব্যাটাবেটির মা বুড়ি বৌ তো নই, আমার ওসব চাই। নিজের কচি ছেলেটা তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, বৌকে শাপিতে শাপিতে শ্রীপতির মা কাঁদিয়া ফেলিত, গুম খাইয়া কদম বসিয়া থাকিত। তাতানো লোহা হাতে শ্রীপতি তাকে শাসন করিতে আসিলে মুখ তুলিয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া কদম বলিত, 'আমি কারো মা নই। ছেলের মার বুকে দুধ থাকে, এক ফোঁটা দুধ আছে আমার বুকে?'

বলিতে বলিতে কদম উঠিয়া দাঁড়াইত, ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল সরাইয়া বুক উদ্‌লা করিয়া দিত, সামনে রুখিয়া আসিয়া বলিত, 'কেটে নাও, দা' দিয়ে কেটে নাও মাই, রক্ত যা পড়বে তাই খাইও ছেলেকে।'

তারপর কদম হাসিয়াছিল।

পয়সা রোজগার করিতে সে বিদেশে যাইবে স্থির হওয়ার পর।

একেবারে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছিল কদম। নিজেই গলা জড়াইয়া ধরিত, না বলিতে পিঠের ঘামাচি মারিয়া দিত, কিভাবে তাকে প্রসন্ন করিবে ভাবিয়া যেন দিশেহারা হইয়া থাকিত। জট ছড়াইয়া সে মৃতা সতীনের মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিয়াছিল এতকাল পরে, সতীনের ছেলের খোস প্যাঁচড়া সাফ করিয়া নিমপাতা লাগাইয়া দিয়াছিল।

এত করিয়াছিল কদম তাকে দূরে পাঠানোর জন্য! পয়সা রোজগার করিতে দূরে পাঠানোর জন্য! এখন সে কি করিতেছে?

নির্ভরশীল সরলবিশ্বাসী হাবাগোবা মানুষটাকে জ্যোতির খুব পছন্দ হইয়া গেল। কথা শুনিতে শুনিতে এমন অভিভূত বিচলিত হইয়া না পড়িলে কি আর কারো কাছে বাহাদুরী করিয়া সুখ হয় মানুষের ?

জ্যোতির কবি মন নিজেকে কেন্দ্র করিয়া গৌরবগাথা সৃষ্টি করে, উদাহরণ-সমেত জীবনের ব্যাখ্যা শোনায়, দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত ললনাকুলের হৃদয়রাজ্য জয় করে, চাণক্যের মত বুদ্ধি কৌশলে শত্রু নিপাত করে, শুধু ভাঁওতা দেওয়ার ক্ষমতায় বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পায়। বিব্রত হইয়া অভিভূত হইয়া উত্তেজিত হইয়া শ্রীপতি তার কথা শোনে। বুঝিতে পারা যায় সে ভাবিয়া পাইতেছে না এই বীরপুরুষটি, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি সতের টাকা বেতনে মোহনের বাড়ী চাকরের কাজ করিতেছে কেন !

জ্যোতি তৃপ্তি লাভ করে।

লেখকের যেন ভক্ত জুটিয়াছে, ধনীর যেন পার্ষদ জুটিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর জ্যোতি গেঁয়ো মানুষটিকে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাগ দিয়া ধন্য করার জন্য সঙ্গে নিয়া গেল।

বাড়ীর পিছন দিকটা দক্ষিণ, সে দিকে কয়েক মিনিট হাঁটিলেই সহরের পুরানো দিনের সব বাড়ী মেলে, বাড়ীগুলির সামনে পিছনে অলিগলিতে কিছুক্ষণ পাক খাইতে খাইতে আগাইয়া গেলে পাওয়া যায় খোলার ঘরের এক বস্তি। সেখানে দুদিকের মাটির দেয়াল হইতে গা বাঁচাইয়া প্রায়ান্ধকারে চলিতে চলিতে জানালা দিয়া চোখে পড়ে আলোকিত ঘর, চেনা অচেনা অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্য দুয়ারে সাজসোজ করিয়া খোঁপায় মালা জড়াইয়া মেয়েদের দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। সস্তা হারমোনিয়ামের সঙ্গে জবরদস্তি গান, হাসির হুল্লোড় আর বচসা কানে আসে, সমস্ত শব্দ ভেদ করিয়া চড়া তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

এই সরু গলিতে এত মানুষের চলাচল দেখিয়া শ্রীপতি অবাক হইয়া যায়। বস্তিতে ঢুকিবার আগে মনে হইয়াছিল জ্যোতি বুঝি তাকে গরীবের শান্ত স্তব্ধ ঘিঞ্জি এক পল্লীতে নিয়া চলিয়াছে, এখন সে অনুভব করে চারিদিকে অনেকখানি পরিধির মধ্যে সমস্ত পাড়াটা মৌচাকের মত মুখরতা আর ব্যস্ততায় সরগরম।

চাঁপার ঘর।

এখানকার অনেক খোলার ঘরেও বিদ্যুতের আলো জ্বলে, চাঁপার ঘরে লণ্ঠন। মেঝেতে বিছানা পাতা, চাদরটা ফর্সাই মনে হয়, গোটা তিনেক বালিশ আছে, তাদের ওয়াড়গুলি ময়লা আর একটু ছেঁড়া। এককোণে উপুড় করা ঘষামাজা বাসন, কাঠের আলনায় মোটে দুটি শাড়ী, একটি সেমিজ আর একটি গামছা, পুরাণো পাড়ে তৈরী ঢাকনা দেওয়া একটি বাক্স, দেয়ালে আঠা দিয়া আটকানো আর পেরেকে লটকানো অনেকগুলি ছবি, কোনটা পুরাণো ক্যালেণ্ডারের, কোনটা মাসিক পত্রের, মিলের কাপড়ে যে ছবি আঁটা থাকে, তাও আছে। হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে নধর বালগোপাল, স্থূলাঙ্গী উলঙ্গিনী দেবদেবী, বাগানের মত সাজানো বন, উইটিবির মত পাহাড় আর নালার মত নদীতে মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি দেয়ালে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া আছে।

একটি ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে। ছেলে কোলে এক গেঁয়ো মায়ের ছবি দেখিয়া।

ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে, ঘরের মাটিলেপা দেয়াল আর সোঁদা গন্ধে মনে পড়ে দেশের বাড়ীর ঘরের কথা। একটা লণ্ঠন আছে শ্রীপতির, মাঝে মাঝে জ্বলে। চাঁপার লণ্ঠনের মত এমন পরিষ্কার আলো দেয় না, ধোঁয়া তুলিয়া মিট মিট করিয়া জ্বলে। তবু সেই আলোতেই চাঁপার বাসনগুলির মত কদমের মাজা বাসনও এমনি চক চক করে।

সেদিন দশটার ডাকে কদমের একখানা চিঠি আসিল। মোহনের ভাগ্নে সুধীর স্কুলে পড়ে, তাকে দিয়া লিখাইয়াছে।

টাকা পাঠায় না কেন শ্রীপতি? সকলে কি তারা না খাইয়া মরিবে? তাড়াতাড়ি বেশী রোজগার করুক শ্রীপতি, তাড়াতাড়ি একবার দেশে ঘুরিয়া আসুক, কদম তার পথ চাহিয়া আছে।

'কি করি কত্তা এখন?'

শ্রীপতির অসহায় বিমূঢ় ভাব আর স্ত্রীলোকের মত একান্ত নির্ভর করার স্বভাব মোহনকে বিরক্ত করে, আমোদ দেয়। আমোদ দেয় বেশী, প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা জাগে। শ্রীপতি পীতাম্বরের মত নয়, একটু আশ্রয় পাইয়াই আর সব চাওয়া সে ছাটিয়া ফেলে না।

'কি করবি আবার? টাকা পাঠিয়ে দে।'

'টাকা যে নেই কত্তা ?'

'তবে আর কি হবে ? তাই লিখে দে।'

মোহন হাসে। শ্রীপতিও যেন তার খেলা বুঝিতে পারে, নিজ হইতে তার কাছে টাকা চায় না। মোহনের কাছে চাহিলে যে পাওয়া যাইবে একথা যেন মনেই পড়িতেছে না তার। বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে সে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখের পাতা মিট মিট করে।

'তুই একটা আস্ত পাঁঠা শ্রীপতি। আমার কাছে টাকা চাইবি তাও আমাকেই বলে দিতে হবে গাধা কোথাকার ?'

নিজের সহৃদয়তা কি উপভোগ্য !

নিজের আবেগের নেশায় মাতাল হওয়ার মত। দানের চেয়ে দয়ার চেয়ে উদারতার খেলা মানুষকে দেবতা হওয়ার সুখ দেয়। শ্রীপতি প্রার্থী নয়, ভক্ত। শ্রীপতির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেলে মোহন নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

মোহনের অনুরোধে জগদানন্দ শ্রীপতির একটা কাজ জুটাইয়া দিল। প্রকাণ্ড একটা কারখানা আছে, অনেকগুলি মোটর আর লরী সেখানে ভাড়ার জন্য মজুদ থাকে, রাশি রাশি গাড়া মেরামত হয়।

একটা মজুরকে কাজ জুটাইয়া দিবার অনুরোধ শুনিয়া জগদানন্দ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তার নিজের একজন ম্যানেজার বেতন পায় হাজার টাকা, তার অনুমোদনে মানুষের দু'শো চার শো টাকার কাজ জোটে, তাকে দিয়া একজন কুলীর কাজ জোটানো !

অনুমোদনের একি অপচয় ! তারপর একটু হাসিয়া একটা শ্লিপ লিখিয়া মোহনের হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'এটা নিয়ে ফ্যাক্টরীতে যেতে বলবেন।'

অতি অল্প দিনে জগদানন্দের সঙ্গে মোহনের ভাব জমিয়া গিয়াছে। দু'জনের বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে।

সর্ব্বদা যাতায়াত চলে, হাসি, গল্প, গানবাজনা, খেলাধূলায় সময় কাটে। কোথাও যাইতে হইলে দু'বাড়ীর সকলে একত্র হইয়া যায়—সিনেমায়, পিকনিক করিতে অথবা জগদানন্দের যে দু'একজন বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে মোহনের বাড়ীর সকলেরও পরিচয় হইয়াছে, তাদের বাড়ীতে।

জগদানন্দের স্ত্রী উর্মিলা সুন্দর গান জানে।

গলাটি মিষ্টি। মানুষটা রোগা, গলাটি সরু কিন্তু গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ নয়, ঝঙ্কারে সার্থক ও মধুর। তার গান শুনিয়া মোহন মুগ্ধ হইয়া যায়।

গানের স্বরে তার স্বামীকে এভাবে মুগ্ধ করার জন্য লাবণ্য তাকে একটু হিংসা করে।

অন্যপক্ষে, লাবণ্যের রূপ দেখিয়া মাঝে মাঝে জগদানন্দের চোখে দু'একটা পলক পড়ে না। রূপের জন্য লাবণ্যকে উর্মিলা একটু হিংসা করে।

চিন্ময় বড় ব্যস্ত। দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে মোহনের পরিচয় করাইয়া দিয়াই হঠাৎ সে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সময় দিতে পারে না। অফিসে কি যেন হাঙ্গামা বাধিয়াছে. পিতাপুত্রের এক মুহূর্ত্ত অবসর নাই। যতটুকু সময় বাড়ীতে থাকে দু'জনে এক সঙ্গে বসিয়া কাগজপত্র ঘাঁটে আর পরামর্শ করে।

কি হইয়াছে কেউ জানে না, তবে দু'জনের ভাবসাব দেখিয়া বাড়ীর লোকেরাও একটু হকচকাইয়া গিয়াছে।

ঝরণা বলে, 'মেজাজ যা হয়েছে দু'জনের, কি বলব আপনাকে। আমরা কেউ কাছে ঘেঁষি না।—নগেন আসে না যে? বেশ লাগে আপনার ভাইকে। এমন ছেলেমানুষ!'

নগেন ছেলেমানুষ বৈকি।

ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ বলার মানে মোহন বুঝিতে পারে না।

'সে রকম ছেলেমানুষ বলছি না, কলেজে পড়ে তবু খুব সরল। মিনু সিগারেট খায়, আমি সেদিন নগেনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খাও না? বললে কি জানেন? না, খাই না, দাদা বারণ করেছে! আপনাকে খুব ভয় করে। শাসন করেন বুঝি খুব?'

'শাসন? শাসন করার দরকার হয় না। আমায় খুব ভালবাসে। আমি যা পছন্দ করব না ভাবে, কখনো তা করে না।'

ঝরণা গম্ভীর মুখে বলে, 'তারই নাম শাসন করা। আর কি শাসন করবেন, বেত লাগাবেন? বড় ভাই সেজে থেকে ওর মনটা আপনি দমিয়ে রাখেন। ভাবলে এমন আশ্চর্য্য হয়ে যাই, আপনারা সব বোঝেন না যে, চেপে রাখলে এই বয়সে কারো মনের স্বাধীন বিকাশ হতে পারে না?'

ঝরণার কথার ঝাঁঝ মোহনের মনে গিয়া লাগে। কিছু সে বলিতে পারে না।

ঝরণা শুধু তাকে দোষ দেয় নাই। সব বড় ভাইদের—গুরুজনদের বিরুদ্ধে

তার নালিশ! মৃন্ময়ের জন্য হয়তো ঝরণার মনে গভীর দুঃখ আছে। মানুষের চোখে চোখে তাকানোর ভয়ে ভাইটি ঝরণার সব সময় আড়াল খোঁজে। ঝরণা কি সেজন্য দোষী করে চিন্ময়কে? বড় ভাই সাজিয়া থাকিয়া চিন্ময় তার ভাই-এর বিকাশোন্মুখ মনকে কোঁকড়াইয়া দিয়াছে?

মোহন বিশ্বাস করিতে পারে না।

'মিনু কি এইজন্য এত নার্ভাস হয়েছে?'

ঝরণার মুখ লাল হইয়া গেল। বুঝা গেল, ভাই-এর জন্য মনে মনে তার লজ্জা আছে।

'মিনু? ওর কথা আলাদা। ছেলেবেলা থেকেই মিনু ওরকম, গ্ল্যাণ্ডের দোষ আছে। চিকিৎসা হচ্ছে, সেরে যাবে। ওকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মোহন জগদানন্দের কাছে তার ছোট ভাই-এর ইতিহাস শুনিল। তারা তিন ভাই। ছোটজনেব নাম নয়নানন্দ। এখনো সে বাঁচিয়া আছে—শুধু বাঁচিয়া আছে।

গঙ্গার ধারে একটি বাড়ীতে বিছানায় শুইয়া তার দিন কাটে। অর্দ্ধেক অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, উঠিতে পারে না। নার্স তার সেবা করে, বৌ অনেকদিন আগেই বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভোঁতা মস্তিষ্কে বাহিরের জগৎ অতি ক্ষীণ সাড়া তোলে, সময় সময় মনে হয় সেটুকু বাহ্যজ্ঞানও বুঝি নাই। জগদানন্দ যদি কখনো যায়, যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছিস? অর্থহীন অভ্যস্ত হাসির একটু আভাস হয়তো কখনো ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে, কখনো মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে, পলক পড়ার বদলে চোখের পাতা শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

'কদাচিৎ দেখতে যাই। সহ্য হয় না।'

তবু জগদানন্দ চায় না সে সুস্থ হইয়া উঠুক!

কোন রকমে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতা হইতেই আবার আত্মঘাতী তাণ্ডব শুরু করিয়া দিবে, ভাল করিয়া সারিয়া উঠিবার জন্যও অপেক্ষা করিবে না।

আরেকবার তিন মাস ভুগিয়াছিল, জগদানন্দ কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল।

ডাক্তার আশা করিতেছে দু'চার দিনের মধ্যে সলিড ফুড দেওয়া চলিবে, হঠাৎ দেখা গেল সে বাড়ী নাই। সেই অবস্থায়, উঠিয়া দাঁড়াইলে যখন টলিয়া পড়ার উপক্রম করে, কোন সুযোগে ঊর্ম্মিলার বাক্স খুলিয়া গয়না নিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। দু'দিন পরে খবর আসিল অজ্ঞান অবস্থায় সে হাসপাতালে পড়িয়া আছে।

'ধ্যানধারণা ধর্ম্মালোচনা ছাড়া দাদা থাকতে পারতেন না, নোংরামি ছাড়া নয়ন থাকতে পারে না। দাদা তবু শরীর একটু ভার বোধ করলেই সব বন্ধ করে দিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক পর্য্যন্ত করতেন না। নয়নের সাধনা আরও জোরালো, মরতে মরতেও প্রাণপণে নিজের তপস্যা চালিয়ে যায়। আমার কি মনে হয় জানো মোহন? দাদা যদি অতবড় মহাপুরুষ না হতেন, নয়নের বিকারটা এমন চরমে দাঁড়াত না।'

মোহন চুপ করিয়া রহিল।

প্রথম অপরাধ করেছিল সতের আঠার বছর বয়সে। অনেক বাড়ীতে অনেক ছেলেই ওরকম অপরাধ করে। কোন বাড়ীতে একটু শাসন করা হয়, কোন বাড়ীতে শুধু উপদেশ দেওয়া হয়, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। ছেলেটা কিছু দিন মুখ দেখাতে লজ্জা পায়, তারপর ধীরে ধীরে সামলে ওঠে। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে ছিলেন দাদা, আধ লাখ স্ত্রী পুরুষ যাকে দেবতার মত পূজা করে। দাদার দোষ দিই না। তিনি কিছুই করেননি। তিনি শুধু ছিলেন, আর কিছু নয়। বাড়ীর সকলে নয়নের ছেলেমানুষীর কথা ভুলে গেল, কিন্তু সে যেন কেমন হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া চলছিল। নিজে কি করেছে না করেছে তার চেয়ে তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল, এমন দাদার ভাই হয়ে সে অপরাধটা করেছে।'

'ওরকম হয়।'

'হ্যাঁ, একজনের মন যখন অন্য একজনের বশে থাকে, তখন সে নিজের কাজের গুরুত্ব যাচাই করে অন্য একজনের মাপ কাঠিতে। দাদা একটি মেয়েকে ভালবাসার চিঠি লিখে কেলেঙ্কারি করলে সেটা যেমন সৃষ্টিছাড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার হত; নিজের কাণ্ডটা নয়নের কাছে ঠিক ততখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গদোষ ঠিক এইভাবে কাজ করে।'

ঝরণার অভিযোগটা সে তেমন আমল দেয় নাই। কথাটা সত্য সন্দেহ

নাই, বড়গাছের ছায়ায় চারাগাছ বাড়িতে পায় না, কিন্তু দুর্ভাবনার কি আছে? নগেনকে সে নিজের ছায়ায় ঢাকা দেয় নাই।

সংসারে সাধারণত বড় ভাই-এর কাছে ছোট ভাই যতটা প্রশ্রয় পায়, যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার অনেক বেশীই সে বরাবর নগেনকে দিয়া আসিয়াছে। গোপনে সিগারেট খাওয়া ধরিয়াছে জানিয়া উদারভাবে সে তাকে সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি পর্য্যন্ত দিয়াছিল। কোনরকমে ছোট ভাইকে দাবাইয়া রাখিবার, দমাইয়া দিবার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড় করাইতে পারিবে না।

নগেন কিন্তু সিগারেট খাওয়া সম্পর্কে তার উদারতার মানে বুঝিয়াছিল উল্টা, ভাবিয়াছিল সে তিরস্কার করিতেছে।

আরও অনেক প্রশ্রয় দেওয়া, স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারেও কি নগেন এইরকম উল্টা বুঝিয়াছে?

জগদানন্দের বেদনাবোধ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় এখন তার ভয় করিতে থাকে। নয়নানন্দের দৃষ্টান্তটা অসাধারণ। সে পরমানন্দের মত মহাপুরুষ নয়, নয়নানন্দের মত নিজেকে ধ্বংস করার প্রতিভাও নগেনের নাই। অমন সর্ব্বগ্রাসী বিকারও নগেনের কোনদিন জন্মিবে না। কিন্তু তার আওতায় সাধারণ মানুষের ভাই হিসাবে সাধারণ ভাবেই নগেন যদি বিগড়াইয়া যায়?

সে ক্ষতিও তো সহজ নয়।

মোহন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যায়।

নগেন কি করিতেছে দেখিতে হইবে। নগেনের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে মনটা তার কি অবস্থায় আছে।

মোহন বুঝিতে পারে এটা তার দুর্ব্বলতা, এসব ব্যাপারে এমনভাবে অধীর হইতে নাই। কিন্তু চরম উদাহরণের মত নয়নানন্দের কাহিনী বড় ও ছোটর সম্পর্কের একটা দিক তার কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তার কেবলি মনে হইতে থাকে, এতকাল এ বিষয়ে উদাসীন থাকা তার উচিত হয় নাই।

নগেনের মত ভাই বয়স্ক পুত্রের মত। বাপ বাঁচিয়া থাকিলে আলাদা কথা ছিল। গ্রামে হোক, সহরে হোক, ভাইকে মানুষ করিবার দায় এড়াইয়া গেলে ওই ভাইটার জন্যই তার নিজের জীবনেও অবাঞ্ছিত বিপর্য্যয় দেখা দিবে।

এমনি ব্যাকুলভাবে সে বাড়ীতে পৌঁছায়, একতলা হইতেই শুনিতে পায় নগেনের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ!

মোহন জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে।

নিজে কলেজে পড়ার সময় বালক নগেনের অসুখের খবর পাইয়া একবার সে ব্যাকুল হইয়া বাড়ী গিয়াছিল, সমস্ত পথ ভাবিয়াছিল, নগেন বাঁচিয়া আছে দেখিতে পাইবে তো?

বাড়ীর সামনে নগেনকে চাদর গায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেদিনও তার এমনি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িয়াছিল।

মোহন একটু লজ্জাবোধ করিতে থাকে। মাঝে মাঝে কি যেন তার হয়, সামান্য ব্যাপারে একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে। কল্পনায় কোন খুঁত হয় তো আছে, মাঝে মাঝে সাধারণ বিচারবুদ্ধির বাধা ভাঙ্গিয়া উদ্দাম উল্লাসে খেলা শুরু করিয়া তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

ঝরণা সকলকে হাসাইতেছিল আর বিস্মিত দৃষ্টিতে নগেনকে দেখিতেছিল। এত সহজে যে কোন কিশোরকে এভাবে হাসানো যায় সে বোধ হয় বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ছেলেমানুষ? এমন পাকা আর চালাক ছেলেমানুষ?

মোহনকে দেখিয়া সকলের হাসি থামিয়া গেল।

লাবণ্য খসা আঁচলটি খোঁপায় আটকাইয়া দিল। হাসির শব্দ বন্ধ হইলেও অন্য সকলের মুখে হাসি লাগিয়া ছিল, নগেনের মুখে শুধু হাসির চিহ্ন নাই। এক মুহূর্তে এতক্ষণের আত্মভোলা ছেলেটা সচেতন ও সংযত হইয়া গিয়াছে।

দেখিয়া হঠাৎ মোহনের মাথাটা যেন খারাপ হইয়া যায়।

সে কারও গুরুজন? ভারিক্কি গম্ভীর মানুষ সে?

সে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র সকলের উচ্ছ্বসিত হাসি থামিয়া যায়, হাসি বন্ধ করিয়া তার ভাই চোরের মত চাহিয়া থাকে?

মিথ্যা কথা! অতি ফাজিল, অতি হাল্কা মানুষ সে, এতটুকু তার গাম্ভীর্য্য বা আত্মমর্য্যাদাবোধ নাই।

থিয়েটারের কমিক অভিনেতার মত হাস্যকর অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে পা টেপা' টেপা' দৌড় দিয়া গিয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়ে, বেখাপ্পা উল্লাসের সঙ্গে ব্যগ্রভাবে বলে, 'কি কি—কি ব্যাপার? শুনি, আমিও একটু শুনি!'

স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

মোহনের মাথা ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। সে জানে এখন থামিবার উপায় নাই। অস্বাভাবিক কিছু করিয়াছে স্বীকার করিলে চলিবেনা।

'কখন এলে ঝরণা?'

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়, মুচকি হাসিয়া বলে, 'ও, এই ব্যাপার! এক কাজ করো বৌদি, দু'টো তিনটে লেবু কেটে সরবৎ করে খাইয়ে দাও। এত ভড়কে যাচ্ছ কেন? একেবারে অভ্যাস নেই, কার সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে দু'এক পেগ খেয়েছেন—মাথা ঘুরে গেছে। এতে ভাবনার কি আছে?'

পাঁচ

মোহন একদিন সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

নিজের গাড়ীতে স্টেশনে আসিয়া মোহন ট্রেণ ধরিল। অত দামী গাড়ী নিয়া সন্ধ্যার বাড়ী যাইতে তার যেন কেমন লজ্জা হইতেছিল। কলেজে পড়ার সময় মোহনের বড় টানাটানি চলিত। বেশী টাকা হাতে পাইলে ছেলে বিগড়াইয়া যাইবে ভয়ে বাবা তাকে টাকা পাঠাইত হিসাব করিয়া।

সন্ধ্যা হয়তো জানে তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। হঠাৎ অত দামী একটা গাড়ী নিয়া হাজির হইলে সে হয়তো ভাবিয়া বসিবে, গাড়ীটা দেখাইতে সে গিয়াছে, নিজের বড়লোকত্ব ঘোষণা করা তার উদ্দেশ্য। মনে মনে সন্ধ্যা হয়তো একটু হাসিবে। তার চেয়ে আগে যেমন ট্রেণে বাসে ওদের বাড়ী যাইত, আজও তেমনি ভাবেই যাওয়া ভাল।

কলিকাতা আসিয়াই একদিন সন্ধ্যার বাড়ী যাইবে ভাবিয়াছিল। বিবাহের পর সন্ধ্যাকে দেখে নাই, দেখিতে খুব ইচ্ছা হইতেছিল। তবু এতদিন যাই যাই করিয়া শুধু দিন পিছাইয়া দিয়াছে।

চিন্ময়কে না জানাইয়া সন্ধ্যার কাছে যাওয়া যায়। সে অধিকার তার আছে। চিন্ময়ের সঙ্গে সন্ধ্যার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার আগে সে তাদের বারাকপুরের বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছে, সন্ধ্যার সঙ্গে তাদের প্রকাণ্ড বাগানে হাঁটিয়া বসিয়া গল্প করিয়াছে, ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া দু'জনে গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গিয়াছে অনেক দূর।

চিন্ময়ের স্ত্রীর সঙ্গে নয়, সন্ধ্যার সঙ্গে সে যখন খুশী গিয়া দেখা করিয়া আসিতে পারে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া চিন্ময়কে বলিতে হইবে। একথা বন্ধুর কাছে গোপন করা চলে না। একেবারে উল্লেখ না করার মত তুচ্ছ নয় কথাটা।

সন্ধ্যা তাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে কয়েক বছরের মতো। দুজনের মধ্যে চিঠি লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ। এ অবস্থায় সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে চিন্ময়ের কাছে তা গোপন করা যায় না।

এই জন্য কি এতদিন সে যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যার কাছে যায় নাই? চিন্ময়কে পরে বলিতে হইবে, এই ভয়ে? হয়তো ঠিক ভয়ে নয়, কথাটা আজ তার খেয়াল হইয়াছে প্রথম। তবে মনান্তরের ফলে দু'জনে তারা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যে একজনের সহিত মাখামাখি করিতে করিতে আরেকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইতস্তত করিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা আসিয়া প্রথমে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হইলে চিন্ময়ের কাছে যাইতে সে হয়তো ঠিক এমনি অস্বস্তি বোধ করিত।

কি ভাবিবে চিন্ময়, কি বলিবে? যদি সে ভাবিয়া বসে যে মোহন তাদের মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিল? একথা ভাবিয়া যদি সে রাগ করে? যদি হঠাৎ চিন্ময়ের দুরন্ত আশা জাগে যে মোহনের কথা শুনিয়া সন্ধ্যা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, এবার সে ফিরিয়া আসিবে?

ট্রেণ চলিতে থাকে আর মোহন এমনি সব জল্পনা কল্পনা করিতে থাকে! সন্ধ্যার সঙ্গে তার কি কথা হইয়াছে শুনিবার জন্য চিন্ময় হয়তো আগ্রহে ফাটিয়া পড়িবে কিন্তু আপনা হইতে মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। যাচিয়া তাদের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ শুনাইতে সেও লজ্জা বোধ করিবে। চিন্ময় হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন আছে? সে জবাব দিবে যে ভালই আছে—এবং তার পর হয়তো চিন্ময় জোর করিয়া অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া আনিবে।

•

বাগানের গাছে গাছে তখন শেষরাত্রির বৃষ্টির জল রোদের তেজে শুকাইয়া যাইতেছে, ঘুমের বিছানা ছাড়িয়া সন্ধ্যা চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল বাথরুমে চীনা মাটির পুকুরে স্নানের বিছানায়।

রুক্মিণীর কাছে খবর শুনিয়া বলে, 'মোহন এসেছে, মোহন! চুলে সাবান দেব ভাবছিলাম, মোহন এসেছে! জানতাম আসবে।'

বাহিরের ঘরে মোহন ভাবে : এতক্ষণ আমায় বসিয়ে রেখেছে সন্ধ্যা ? আর কেউ কি বাড়ীতে নেই ? সকালে কেউ কি বাইরে আসে না ?

আরও খানিক পরে সন্ধ্যা আসিয়া বলিল, 'এই যে আমার মোহন। আমার অসময়ের মোহন।'

সামনে আসিয়া ডান হাতটি তুলিয়া দু'হাতে মুঠা করিয়া ধরিল। ভিজা ভিজা ঠাণ্ডা হাত দুটি সন্ধ্যার, গায়ে সাবানের সুবাস। প্রসাধন না করিয়াই আসিয়াছে।

'এসেছো তা' হলে ?'

সন্ধ্যা খুশী হইয়াছে।

সহজ হাসি, কথা আর দুর্লভ অন্তরঙ্গতা দিয়া সন্ধ্যা তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। এর মধ্যে ফাঁকি কিছু নাই, সবটাই আন্তরিক।

তবু মোহন যেন আশাভঙ্গের আঘাতে একেবারে নিভিয়া গেল।

সন্ধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া গেল না, এতটুকু তার উত্তেজনা জাগিল না, কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল না, এমনভাবে তাকে গ্রহণ করিল যেন বহুকাল পরে জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিবার পরে তাদের দেখা হয় নাই, যেন কালও সে আসিয়াসিল ! সন্ধ্যা তার সঙ্গে শুধু ভদ্রতা করিবে, শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন আছে, কোথায় আছে, কি করিতেছে—এসব ভাবিয়া আসিলে বিনা ভূমিকায় তাকে এভাবে কাছে টানিয়া নেওয়ার জন্য হয়তো সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। অনেক বিচিত্র নাটকীয় ব্যবহার কল্পনা করিয়া আসিয়া এমন আবেগহীন সহজ অভ্যর্থনা কি ভাল লাগে ?

'কেমন আছ সন্ধ্যা ?'

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল—'ওসব নয় মোহন। ভাল লাগে না। দেখতে পাচ্ছো না কেমন আছি ?'

তবু যেন মোহন হার মানিবে না, দীর্ঘ অদর্শনের ব্যবধানকে গায়ের জোরে খাড়া করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে সে ব্যবধান অতিক্রম করার বৈচিত্র্য উপভোগ করিবে।

'রোগা হয়ে গেছ।'

তখন সন্ধ্যার বোধ হয় মনে পড়িয়া যায় যে ঠিক এই রকম একগুঁয়েমি করিয়া আগেও মোহন তাকে মাঝে মাঝে পাগল করিয়া তুলিত, আব্‌দেরে ছোট-

ছেলেকে চকোলেট দেওয়ার মত কিছু ভাবপ্রবণতার ব্যথা মোহনের মধ্যে তাকে সৃষ্টি করিয়া দিতে হইত।

ব্যথা বোধ হয় আজ সে চায় না। একটু উচ্ছ্বাস চায়, বিস্ময় আর আনন্দের! সেই সঙ্গে এতদিন অবহেলা করার জন্য কিছু কিছু অভিমান মিশাইয়া দিলে মোহন আরও খুশী হইবে।

. কিন্তু কেন?

কেন সকলে তার কাছে এসব চায়, তার যা নাই, সে যা ভালবাসে না? সমস্ত জগৎ যেন ধরিয়া রাখিয়াছে মেয়ে বলিয়াই সে রক্তমাংসের জীবন্ত কবিতা —পুরুষের মনের মত কবিতা।

কিন্তু মোহন তাকে বড় খাতির করিত, ভাল ছেলে মোহন। বাঁচার আনন্দে ভাঁটার সময় শুধু এই মোহনকে তার ভাল লাগিত। যখন মনে হইত জীবনে আর কিছু নাই, শুধু শ্রান্তি আর বিরক্তি,—কিছুক্ষণের জন্য যখন একেবারে লোপ পাওয়ার সাধ জাগিত, পোষা কুকুরটা ছাড়া কারো সঙ্গ সহ্য হইত না, মোহনের সঙ্গে তখন কথা বলিতে পারিত,—যে কোন বিষয়ে কথা হোক। কুকুরটা কবে মরিয়া গিয়াছে। মোহন এখনও আছে, দুধ ভাত আর সুখ শান্তিতে পরিপুষ্ট দিব্যকান্তি মোহন। ভাল ছেলে মোহন, ধৈর্য্যময় মোহন, সহনশীল নিয়মতান্ত্রিক একগুঁয়ে মোহন।

ওকে কিছু ভাবালুতার খোরাক তার দেওয়া উচিত।

সন্ধ্যা বসিল, গা এলাইয়া দিল—'মানুষ কেন রোগা হয় তুমি কি বুঝবে? মনটা ভাল নেই মোহন।'

মোহন প্রায় আধ মিনিট চুপ করিয়া রহিল। কোনদিন বোঝে নাই, আজ কি আর সে বুঝিবে এই নীরব সহানুভূতি কত অসহ্য সন্ধ্যার কাছে?

'তোমার সুখী হওয়া কঠিন, সন্ধ্যা! যা জিদ্ তোমার!'

'ইস? তার মানে?—ও, জিদ! যাকগে, সুখদুঃখের কথায় কাজ নেই। বৌকে সঙ্গে আনলে না কেন, আলাপ করতাম? আচ্ছা, আমিই তোমার বাড়ী গিয়ে আলাপ করে আসব একদিন।'

মোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তুমি জানলে কি করে আমি বাড়ী নিয়েছি?'

'ওর কাছে শুনলাম।'

'সত্যি ? চিন্ময় তবে এসেছিল ? তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম, তোমাদের বুঝি কথাও বন্ধ।'

'বন্ধু তোমার আসেনি, তবে আমাদের কথা বন্ধ নয়। দরকার হলে আমরা ফোনে কথা বলি।'

মোহন ধীরে ধীরে বলিল, 'দরকার হলে ফোনে কথা বলো। কি রকম দরকার হলে ?'

সন্ধ্যা একটু হাসিল।

'যেমন ধরো আমার কিছু বাড়তি টাকা চাই। আমি ফোন করে টাকার কথা বলি, ও লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেয়।'

'শুধু টাকার কথা বলো ? আর কোন কথা হয় না ?'

'হয় বৈকি।'

সন্ধ্যার মুখের হাসি নিভিয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে মোহনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে, ভুরু কুঁচকাইয়া বলে, 'খারাপ লাগছে শুনতে ? আমাকে ভোগ করতে দিই না, তবু টাকা চেয়ে নিই, এটা খুব খাপছাড়া মনে হচ্ছে ? তাতো মনে হবেই, তোমরা পুরুষ মানুষ যে ! বিয়ে করবার আগে তোমরা বড় বড় কথা বলতে পার, বিয়ের পর সে সব কথা মনে রাখলে দোষ হয় আমাদের। সবাই নাকি জানে ওসব বড় বড় প্রতিজ্ঞা ভালবাসার প্রলাপ ! সবাই জানে জানুক, আমি জানি না। জানতে চাই না। বিয়ে করবার জন্য পায়ে ধরে তো সাধিনি আমি ? স্পষ্ট বলেছিলাম, টাকার জন্য তোমায় বিয়ে করছি, যা খুশী করব, যেখানে খুশী থাকব, কিছু বলতে পাবে না। ভাল না লাগে একসঙ্গে থাকব না, কিন্তু যতকাল বাঁচি আমায় টাকা দিয়ে যেতে হবে। মাসে মাসে আমার মিনিমাম কত টাকা চাই তাও বলেছিলাম। ও যদি মনে করে থাকে আমার সে সব ছলনা, আমি দুষ্টামি করে আবোল তাবোল বকছি, ওর সঙ্গে খেলা করছি, তার জন্য কি আমি দায়ী ? তোমরা যে কি দিয়ে গড়া বুঝতে পারি না, এখনো ওর ভুল ভাঙ্গলো না। এখনো বিশ্বাস করে আমি ওকে ভালবাসি, আমার একটা পাগলামির পিরিয়ড চলছে, এটা কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভালবাসায় তুমি বিশ্বাস কর না ?'

'না।'

'তুমি কখনও ফিরে যাবে না ?'

'না।'

মোহন যে জিদের কথা বলিয়া অনুযোগ দিয়াছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণের মত স্পষ্ট জবাব দিলে আর কি বলা যায় ?

ভালবাসায় বিশ্বাস করে না। বাস্তব জীবনে যে সব চলতি এবং সর্ব্বজন স্বীকৃত ফাঁকি আছে সেগুলিকে ফাঁকি বলিয়া মানিতে চায় না। সব ফাঁকি নয়—যেগুলি না মানিলে তার নিজের সুবিধা হয়, কেবল সেইগুলি। যেমন বিবাহের আগে প্রেমের উন্মাদনায় চিন্ময় যে সব আবোল তাবোল কথা বলিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার মত, চুক্তির মত ওই কথাগুলি চিন্ময়কে সারা জীবন মানিয়া চলিতেই হইবে !

এ বিষয়ে আর আলোচনা হইল না। ভবিষ্যতে হইবার আর কোন সম্ভাবনাও রহিল না।

মোহনের একবার ইচ্ছা হইল সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করে, চিন্ময় টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সে কি করিবে ? কিন্তু ইচ্ছাটা সে চাপিয়া গেল।

কারণ তাব মনে পড়িয়া গেল, সোজাসুজি ওদের ঝগড়া হয় নাই। এভাবে চিরকাল চলিতে পারে না, ঝগড়া একদিন ওদের হইবেই। সন্ধ্যার পক্ষেও আজ বলা সম্ভব নয় যে হয় আপোষ করা অথবা সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার ওই বাস্তব সমস্যা দেখা দিলে সে কি করিবে !

মোহনকে সন্ধ্যা তখন ছাড়িয়া দিল না। এ বেলা তাকে এখানে খাইতে হইবে। খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গে বাহির হইবে।

আজ শনিবার, কলিকাতায় রেস আছে। মনসুন কাপে একটা ঘোড়ায় সন্ধ্যা অনেকগুলি টাকা রিস্ক করিবে ঠিক করিয়াছে।

ঘোড়াটা জিতিবে,—জিতিবেই। এখন ফেভারিট না হইয়া যায় ঘোড়াটা, তা হইলে বেশী টাকা পাওয়া যাইবে না !

'রেসে কখনো জিতেছ সন্ধ্যা ?'

'উহুঁ। রেসে কেউ জেতে ?'

'তবে খেল কেন ? জিততে পারবে না জেনেও টাকা নষ্ট কর কেন ?'

'খেলে মজা পাই তাই খেলি।'

ট্রেণে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই, গাড়ীটাকে অসুখ সারাইতে হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যার এমন বিশ্রী লাগে ট্রেণে যাইতে!

ফোন করিয়া দিলে সহর হইতে গাড়ী নিয়া আসার বন্ধু অবশ্য আছে কয়েকজন, কিন্তু আজ যখন মোহন আসিয়াছে, দু'চার ছ'মাসেব মধ্যে সে যখন আর আসিবে না, আজ আর কাউকে ডাকিয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যা হাসে।

ভাবপ্রবণতা নাই বলে, তবু যে সন্ধ্যা এমনভাবে কি কবিয়া হাসে মোহন বুঝিতে পারে না।

'আমি একটা গাড়ী কিনেছি সন্ধ্যা।'

'কিনেছো? বলো কি! বাড়ীতে ফোন করে দাও না, ড্রাইভার গাড়ীটা নিয়ে আসুক?'

এগারটার সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বেলা একটার সময় তারা যখন বাহির হইল, তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে।

'তবু রেস খেলতে যাওয়া চাই?'

সন্ধ্যা আগের বারের মতই ভাবের উদ্দীপনার রসালো হাসি হাসে।

'বৃষ্টি থেমে যাবে।'

সহরের মধ্যে পথে নানা স্থানে জল জমিয়াছে, এক জায়গায় এত জল জমিয়াছে যে ট্রামবাস সব দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিয়া গ্রামের বন্যার কথা মোহনের মনে পড়ে।

পথের বন্যা কয়েকঘণ্টা পরে সরিয়া যাইবে, গ্রামের বন্যা দিনের পর দিন পথঘাট গৃহাঙ্গন জুড়িয়া থাকে, ঘরও ভাসিয়া যায় অনেক। গ্রামের মানুষ চুপচাপ সহ্য করিয়া যায়, এখানে এই সাময়িক অসুবিধার জন্যও মানুষ কি ভাবে গজর গজর করে, খবরের কাগজে কড়া কড়া মন্তব্য বাহির হয়! সহরের মানুষের কি প্রাণশক্তি বেশী? নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কি তারা বেশী বোঝে? অথবা হয়তো গ্রামের মানুষের জীবন দুর্ব্বহ করেন স্বয়ং প্রকৃতিরূপী ভগবান, যার বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে না। সহরের সুবিধা অসুবিধার ব্যবস্থা মানুষের হাতে, সহরবাসী তাই সুবিধার একটু অভাব হইলেই অসন্তোষ জানায়!

সকলে জানায় কি? সহরে উজ্জ্বল আলোর গাঢ় ছায়ান্ধকারে সহরের সব রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত যারা বাস করে?

ওদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসা ভাসা। সে শুধু আবর্জ্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলায় বাতি জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বস্তি দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে !

ওসব স্থান ও ঘরের সকলে নালিশ জানায় কি ?

অন্যপথে গাড়ী রেস কোর্সে গেল।

এই বৃষ্টিতেও মানুষ দলে দলে রেস খেলিতে চলিয়াছে। তাদের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেকেই তারা অনেক টাকা বাজি জিতিবে, সবুর সহিতেছে না।

সস্তা এনক্লোজারের সামনে লম্বা লম্বা অনেকগুলি সারি, দেখিলেই চেনা যায় এরা সেই শ্রেণীর লোক. ট্রেণেও যারা থার্ড ক্লাসে চাপে, নিয়ন্ত্রণ করা দারিদ্র্য যাদের জীবন-ধর্ম্ম।

এদিকে মোটর গাড়ীর গাদা জমিয়া গিয়াছে, মোহনের গাড়ীটার চেয়েও কত দামী সব গাড়ী। এই সব গাড়ীর মালিকদের জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাসিয়া বলিবে, 'টাকা? টাকা কে কেয়ার করে! এখানে আসা স্পোর্টসের আনন্দের জন্য।' সন্ধ্যাও যা বলিয়াছে—রেস খেলিতে মজা লাগে তাই সে রেস খেলে, টাকা জিতিবার জন্য নয়।

'আনন্দ চাই, আনন্দ! যার আরেক নাম মজা!'

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই জলকাদায় এত কষ্ট করিয়াও সে আনন্দ চাই? --এরা কি জবাব দিবে সে জানে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই একই কথা সকলে বলিবে—কষ্ট করা ছাড়া, অ্যাড্‌ভেঞ্চার ছাড়া কি আনন্দ পাওয়া যায়?

আবার যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া কষ্ট করিলে, খাটিয়া এবং বেকারি করিয়া হাড়মাস কালো করিবার কষ্ট করিলে, রোগ আর দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে বহিবার কষ্ট করিলে, আনন্দ মেলে কি? রোমাঞ্চ মেলে কি?

এ প্রশ্নেরও এরা কি জবাব দিবে সে জানে।

বলিবে, ওটা আলাদা প্রশ্ন, ওটা কম্যুনিষ্টদের প্রশ্ন।

একজন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার মাত্র মোহন রেস দেখিতে

আসিয়াছিল, থার্ড এনক্লোজারে। ঘোড়ার দৌড়নোর চেয়ে বেশী আগ্রহের সঙ্গে দেখিয়াছিল মানুষগুলিকে।

রেসকোর্সের বাহিরের জগৎ সকলের কাছে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া, জকি, ট্রেণার, পজিসন, রেকর্ড এসব ছাড়া জীবনে ও চেতনায় আর কোন কিছুর স্থান নাই।

ভিড়ের মধ্যে পরস্পরের গায়ে ক্রমাগত ধাক্কা লাগিতেছে, তবু প্রত্যেকে তারা একা। যে যার নিজের হিসাবে মশগুল, কারো দিকে তাকানোর অবসর নাই।

ঘোড়া দৌড়াইবার সময় যতই ঘনাইয়া আসে তত উত্তেজনা বাড়ে, আনন্দের নেশা চরমে উঠিতে থাকে। কোন ঘোড়ার উপর টাকা লাগানো যায়, সামান্য সম্বলের কয়েকটি টাকা? অনেক হিসাব করিয়া বন্ধু দু'নম্বর ঘোড়াটি বাছিয়া টিকিট কিনিতে পা বাড়াইয়াছে, পাশ দিয়া কে যেন সঙ্গীকে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, পাঁচ নম্বর সিউর, ও ঘোড়াকে মারবে কে? বন্ধু অমনি পাঁচ নম্বরের টিকিট কিনিতে ছুটিল। যে বাসে তারা আসিয়াছিল তার নম্বর ছিল ২২২, বন্ধু তাই নিঃসন্দেহ হইয়া গিয়াছিল সেদিন দু' নম্বরের ঘোড়া জিতিবে।

পর পর দু'টি রেসে হারিয়া সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ঘোড়া ছুটিতে আরম্ভ করিলে চীৎকার শুরু হয়, ঘোড়াগুলি যখন সামনে আসে, মনে হয় এতগুলি মানুষের ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইবে। কিছু লোক শব্দ করে না, দাঁত দিয়া জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া থাকে, কেউ চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া দেবতাকে দোহাই জানায়।

সেদিন মোহনের সব চেয়ে বিস্ময়কর মনে হইয়াছিল, সকলের দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার প্রক্রিয়া। বাজীর ফলাফল টাঙ্গাইয়া দেওয়ামাত্র একটু-ক্ষণের জন্য হয়তো মুখে প্রত্যাশার জ্যোতি নিভিয়া যায়, তারপর রেস-বুকের পাতা উল্টাইয়া পরের বাজীতে মন দেয়। এত আশা, এত উত্তেজনা যে বাজীটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তার গুরুত্ব এখন মিথ্যা, ফলাফল অর্থহীন: কোন ঘোড়া জিতিয়াছে কোন ঘোড়া জেতে নাই কি তাতে আসিয়া যায়? এবার যে বাজী আছে তাই নিয়া এখন মাথা ঘামাও।

জীবন যুদ্ধেও কি মানুষ অতীতের হারজিত তুচ্ছ করিয়া ভবিষ্যতে মশগুল হইয়া থাকে না? বন্ধুর সঙ্গে রেস দেখিতে আসিয়া সেদিনও মোহন এই কথা

ভাবিয়াছিল। রেসে আধ ঘণ্টা পরে পরে বাজী, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ বিবর্ণ হওয়ার বেশী আপসোসের সময় থাকে না, জীবনে বড় রকম পরাজয় ঘটিলে মানুষ কিছু দিন আপসোস করার সময় পায়।

এক সময় রেস শেষ হইয়া গেল সেদিনকার মত।

প্রায় সাড়ে সাতশ' টাকা জিতিয়া সন্ধ্যা গর্ব্বে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। রেসে বাজী জেতার এ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হয়তো ভাবপ্রবণতার সম্পর্ক নাই। ভাবপ্রবণতা শুধু হৃদয়ের কারবারে থাকে!

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া শ্রান্ত মোহন জলে ভেজা কাদামাখা মানুষের স্রোতের দিকে চাহিয়া থাকে, পাশে বসিয়া সন্ধ্যা অজস্র কথা বলিয়া যায়! কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু পরিষ্কার করা হইয়াছে তবু কাদামাখা মানুষগুলির চেয়ে নিজের গাড়ীর জন্য মোহনের বেশী মমতা হইতেছিল।

'বাড়ী ফিরবে তো?'

'এখন? বেশ চলো।'

'আমি আর যাব না, বাড়ীতে কাজ আছে।'

সন্ধ্যা জিদ করে, মোহন কিন্তু রাজী হয় না। চিন্ময়ের কথা তার মনে পড়িতেছিল। সারাদিন সন্ধ্যার সঙ্গে কাটিয়াছে, এখন আবার তার সঙ্গে ব্যারাকপুরে ফিরিয়া গিয়া রাত না হোক সন্ধ্যাটা কাটানো উচিত হইবে না।

শেষে সন্ধ্যা প্রায় কাতরভাবে বলে, 'তুমি না গেলে বাড়ী ফিরে একা একা কি করব? সময় কাটবে কি করে? অন্তত কোন একটা সিনেমায় যাই চলো, তারপর বাড়ী ফিরো?'

এমন করুণ শোনায় সন্ধ্যার আবেদন, এমন কাতর মনে হয় তাকে সময়ের পীড়নে! সময় না কাটার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে তো এভাবে সময়কে কেউ ভয় করিতে পারে না?

একা একা সময় তবে কি কাটে না সন্ধ্যার!

'আমার ওখানে যাবে?'

'আজ থাক।'

যাওয়ার অনেক বাড়ী আছে সন্ধ্যার, বন্ধুর তার অভাব নাই। দু'তিনটা

হোটেলের যে কোন একটাতে গেলেই বন্ধু আর বান্ধবীদের সাথে হৈ চৈ করিয়া রাত চারটা বাজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আজ সে কোথাও যাইতে চায় না, অন্য কারো সঙ্গ কামনা করে না। কারণ মোহন যে আজ সঙ্গে আছে, অনেকদিন পরে সঙ্গে আছে।

তাই তো মানে সন্ধ্যার কথার ?

শেষ বেলার সঙ্গে সন্ধ্যার ম্লান রূপের সামঞ্জস্য স্পষ্ট হইয়াছে। শাড়ীর রঙটাও কি বদলাইয়া যাইতেছে সন্ধ্যার ?

আকাশে দিনান্তের সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ?

এই অদ্ভুত রকম আধুনিক শাড়ী কিনিতে সন্ধ্যা না জানি কত টাকা আদায় করিয়াছে চিন্ময়ের কাছে।

দিনে সূর্য্যের আলোয় শাড়ীটা এক রকম দেখায়, সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঠেকাইবার জন্য বানানো আলো উজ্জ্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায় শাড়ীটার রঙের বৈচিত্র্য !

সন্ধ্যা তাকে একটা সাধারণ বিলাতী হোটেলে নিয়া যায়। দেশী মালিকের বিলাতী হোটেল, বিলাতী হোটেলের মত সহজ জাঁকজমক নাই কিন্তু ঠাট আছে। রেস খেলায় থার্ড এনক্লোজারে যারা আজ জিতিয়াছে তারা এই হোটেলে ভিড় করিবে। আসল বিলাতী হোটেলে যাইতে তারা অবশ্য কিছুমাত্র ভয় পায় না—রেসে একদিন দাঁও মারিতে পারিলে টাকাগুলি পকেটে নিয়া ওই বিলাতী হোটেলেই তারা যায়—ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া সগর্ব্বে সগৌরবে বয়কে হুকুম দিয়া পেগ আনাইয়া পান করে। সায়েবের চেয়েও কড়া গলায় বয়কে ধমক দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বয়ও জানে মানুষটা আজ দরাজ হাতে বকশিস দিবে।

সন্ধ্যা মিষ্টি হাসি হাসে।

'বুঝতে পারছি তোমার ভাল লাগছে না। একেবারে ভুলেই গেছিলাম তুমি গাঁ থেকে আসছ, মেয়ে বন্ধু নিয়ে রেস খেলা হোটেলে পেগ খাওয়া তোমার পছন্দ নয়।'

'গাঁ থেকে এসেছি বলেই কি—'

'রাগলে ? রেগো না। এটুকু তোমার বোঝা উচিত, আমি মোটেই ওভাবে কথা বলছি না, তোমায় খোঁচা দিচ্ছি না। আমি কি বলছি জানো ? এতদিন

সহর থেকে দূরে ছিলে বলেই বোধ হয় তুমি আমার একমাত্র বন্ধু আছো—খাঁটি বন্ধু আছো।'

মোহন চমৎকৃত হইয়া যায়, অভিভূত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সে একমাত্র বন্ধু —খাঁটি বন্ধু!

সন্ধ্যা ভালবাসায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে।

সে ছাড়া সন্ধ্যার বিশ্বাসী খাঁটি বন্ধু একজনও নাই।

সন্ধ্যা নিজেই একটা প্রস্তাব করে। মোহনকে বাড়ীর সামনে নামাইয়া দিয়া সন্ধ্যা গাড়ী নিয়া ব্যারাকপুর চলিয়া যাইবে, পরদিন গাড়ী ফিরত দিতে আসিবে, লাবণ্যের সঙ্গেও দেখা করিয়া যাইবে।

'তোমার তো লাইসেন্স নেই।'

'তাতে কি? পুলিশ কি ওৎ পেতে আছে!'

চিন্ময়ের মধ্যস্থতা ছাড়াও মোহনের সামাজিক জীবনের পরিধি বাড়িতে লাগিল। চিন্ময় কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল, জগদানন্দ কয়েকজনের সঙ্গে করাইয়া দিয়াছে, সন্ধ্যা আরও কয়েকজনের সঙ্গে দিল। এই পরিচিতেরা আবার যোগাযোগ ঘটাইয়া দিল নতুন মানুষের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল হরদম, বাড়ীতেও মানুষের পদার্পণ ঘটিতে লাগিল প্রতিদিন।

একদিন মোহন মস্ত একটা উৎসবের আয়োজন করিল। সেদিন তার বাড়ীর এক গেট দিয়া একত্রিশখানা গাড়ী ঢুকিয়া আরেক গেট দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েদের দামী দামী বিচিত্র শাড়ীতে বাড়ীটা ঝলমল করিতে লাগিল।

পুরুষ ও নারীর এই ভীড়ের মধ্যে সেদিন মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল চিন্ময় ও সন্ধ্যার।

দেখা যে হইবে দুজনেরি তা জানা ছিল—না জানাইয়া তাদের ডাকিতে মোহনের ভরসা হয় নাই। যারা দুজনের পৃথক বাস করার খবর জানিত তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া সেই যে তারা তফাতে সরিয়া গেল, পরস্পরের দিকে আর তারা চাহিয়াও দেখিল না।

মোহন শুধু বুঝিতে পারিল ওটা তাদের শুধু লোক দেখানো আলাপ নয়, পরস্পরকেও তাদের জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল যে বিদ্বেষ তাদের নাই।

পরস্পরের মধ্যে তারা বুঝাপড়া করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, আবার বুঝাপড়া হইলে একদিন কাছে আসিবে।

মোহনের ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। দেশে অত সমারোহের সঙ্গে বাপের বার্ষিক কাজ সম্পন্ন করিবার সময়েও তার এতখানি উদ্বেগ জাগে নাই, আজ সহরের শ'খানেক নরনারীকে বাড়ীতে আহ্বান করিয়াই সে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

দেশে কি ত্রুটিবিচ্যুতির ভয় ছিল না, নিন্দার ভয় ছিল না? দেশের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত মানুষেরা কি ভাবিবে, কি বলিবে এ চিন্তা কি এতই তুচ্ছ ছিল তার কাছে?

তাই স্বাভাবিক। তারা ছিল নীচের স্তরের মানুষ, আজ মোহনের বাড়ীতে যারা আসিয়াছে তারা উঁচু স্তরের। এই স্তরে উঠিবার চেষ্টা মোহন করিতেছে, ওদের প্রথম বাড়ীতে ডাকিয়া ভয়ে ভাবনায় কাবু হইয়া পড়িবে বৈ কি।

উৎসবের শেষে শুধু জগদানন্দ এবং সন্ধ্যা ছাড়া সকলে হাসিমুখে বিদায় নিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটা সিগারেট ধরাইয়া মোহন অসীম গর্ব্ব ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেছে, জগদানন্দ বলিল, 'ত্যাগ, উদারতা, অনুভূতি, আদর্শ এসব কিচ্ছু নেই, সব কটা স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ কুটিল। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া কিছু বোঝে না, কোন বিষয়ে মাথা ঘামায় না। শুধু বাইরের চাকচিক্য।'

এসব শোনা কথা। ব্যর্থ নিষ্পেষিত আশাহীন দুঃখী মানুষেরা এই সব অভিযোগ করে। কিন্তু কথাগুলি স্বয়ং জগদানন্দের মুখে শুনিতে হওয়ায় মোহনের চমক লাগিয়া গেল।

সন্ধ্যা বলিল, 'সহুরে মানুষ এই রকম হয়।'

'সহুরে মানুষ? সহুরে মানুষ বলে কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষ আছে নাকি? ওদের প্রকৃতিই এই রকম। যেখানে থাক ওদের জীবন কাটাবার মূলনীতিটাই এই রকমই থাকবে, ধরনটা একটু ভিন্ন হতে পারে। সহরের বাইরে ওরা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, অতটা চোখে পড়ে না। সহরে ওরা দল বাঁধে, নিজেদের সমাজ তৈরী করে আর নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে বাইরের পালিশটা কার কত চকচকে। লোকে ভাবে দোষটা বুঝি সহরের। সহরে বাস করে বলেই ওরা এ রকম হয়েছে। কিন্তু

একটা সহরের লোকের মধ্যে ওরা আর ক'জন! সহরের বেশীর ভাগ লোক সাধারণ, স্বাভাবিক। সহুরে বলতে শুধু ধরা চলে যারা গেঁয়ো মানুষ নয়, যারা গ্রামের বদলে বাস করে সহরে। অন্য রকম মনে করলে সহরের উপর রীতিমত অন্যায় করা হয়।'

সন্ধ্যা হাসিল।

'সহরের নিন্দে আপনার সয় না।'

'কেন সইবে? নিন্দে করার কি আছে সহরের?'

'সহরের জীবন বড় বেশী কৃত্রিম!'

কৃত্রিম? সহরের জীবন? প্রদীপের বদলে বালব্ জ্বালা, পুকুরের বদলে কলের জল খাওয়া, গরুর গাড়ীর বদলে ট্রামে বাসে চাপা, মেটে খড়ের ঘরের বদলে পাকা বাড়ীতে থাকা—এ সবের জন্য? অথবা সহরে হোটেল রেস্তোরাঁ সিনেমা থিয়েটার আছে বলে? অথবা খেলার মাঠ আলোবাতাস গাছপালার অভাবে শরীর মনের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে—'

সন্ধ্যা বাধা দিয়া একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে, 'আমি তা বলিনি। ও তর্ক পচে গেছে জানি।'

'শুধু পচে যায়নি, বাতিল করে নর্দ্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য যা কিছু দরকার তা কখনো কৃত্রিম হয় না। কোন একটা সহর তৈরীর দোষ থাকলে সেটা সাধারণভাবে সহরের দোষ বলে ধরা উচিত নয়। সহর যদি নোংরা হয়, সেটা কি সহরের দোষ? ওদিক থেকে তর্ক তুললে আমার রাগ হত, হয়তো ঝগড়াই করে বসতাম আপনার সঙ্গে! কিন্তু সহরের জীবনের তাড়াহুড়োকে কি আপনি কৃত্রিমতা বলেছেন? অথবা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব তুচ্ছ করে সহরের লোকের ফর্সা জামাকাপড় পরে সিনেমা দেখতে যাওয়াকে?'

'না, আমি তাও বলছি না।'

জগদানন্দ হাসিমুখে বলে, 'একথা বললেও রাগ করতাম। পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার মফঃস্বলেই বা কজনে খায়, খেতে পায়? গ্রামে যার নেংটি পরলে ভাল খাবার জোটে, সেও নেংটি পরে না, খাবারের বদলে ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। আপনার কথা বুঝেছি, নিয়মের বিকারকে আপনি কৃত্রিমতা বলছেন। আমিও তাই বলি। কিন্তু সহরের জীবনে সেটা কি গ্রামের চেয়ে বেশী আছে? তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না একই নিয়মে বাঁধা। নেশার আনন্দ আর প্রতিক্রিয়ার

বিষাদ তো তাদের দরকার হয় না। জীবনটা ওদের কৃত্রিম মনে হয় কেন জানেন? সহুরে জীবনের বৈচিত্র্য ওদের সহজে অবাক হবার ছেলেমানুষীটা নষ্ট করে দেয়। যন্ত্রের বিস্ময়, নানা-ধরনের মানুষ আর তাদের বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্র মতিগতির বিস্ময়, খাপছাড়া ঘটনার বিস্ময় এ সব যায় কেটে। আর সেই সঙ্গে রূপকথার আদর্শ আর নীতিবাদের স্বাদটা একটু পান্‌সে হয়ে যায়। আলু সিদ্ধর চেয়ে তখন আলুর চপ ভাল লাগে, স্বভাব সুন্দরীর ঘামে আর তেলে ভেজা চকচকে মুখের চেয়ে কলেজ গার্লের পাউডার দেওয়া মুখের লাবণ্য বেশী পছন্দ হয়, বোকার মত আলাপ করার বদলে কথায় কিছু প্যাঁচ আর জটিলতা আনে, দাদামশায়ের ধাঁধার বদলে ক্রসওয়ার্ড পাজল্ সলভ করে আনন্দ পায়।'

তার কথাটাই নিজের পক্ষে যুক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে সন্ধ্যা বলে, 'তার মানেই তো হৃদয় ওদের একটু শক্ত হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিকার এলে জীবন কৃত্রিম হয়ে ওঠে না? সহরের লোক যে যার নিজেকে নিয়ে থাকে, কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। পাশাপাশি বাড়ী, এক বাড়ীর লোক জানেও না আরেক বাড়ীর লোকেরা কি করে বেঁচে আছে, কেয়ারও করে না। মড়াকান্না শুনলেও একবার উঁকি মেরে দেখতে যায় না কে মরল। কেবল তাই নয়, বছরের পর বছর ধরে যাদের মধ্যে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা চলেছে তাদের মধ্যেও শুধু থাকে একটা বাইরের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব হয় না, হৃদয়ের যোগাযোগ হয় না।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক? হৃদয়হীন স্বার্থপর মানুষ স্বাভাবিক?'

'হৃদয়হীন স্বার্থপর মানুষ নয়। ব্যক্তিগতভাবে একটা মানুষ কজনের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে বলুন তো? সহরে যারা থাকে বছরের পর বছর ধরে কত লোকের সঙ্গে তাদের মেলামেশা করতে হয় ভাবুন তো? সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে হলে হৃদয়ের অবস্থা একটু কাহিল হয়ে পড়বে না? বিশ্বপ্রেমিক সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সব মানুষকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কজনের জন্য নিজের মনকে কাঁদাবার ক্ষমতা তার আছে? একশ' লোকের সঙ্গে যারা শুধু ভদ্রতার সম্পর্ক রেখে চলে, একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন ওই একশ'জন ছাড়া আরও পাঁচ সাতজন আছে, যারা তার বন্ধু। পাশের বাড়ীতে মড়াকান্না শুনলে যে উঁকি মারতে যায় না, কারো সর্দি

হয়েছে শুনলে সেই হয়তো ব্যস্ত হয়ে সহরের আরেক প্রান্তে ছুটে দেখতে যায়! গ্রামের লোকের আরেক পাড়ার বাড়ীর সঙ্গে পাশের বাড়ীর সম্পর্ক রাখা চলে, কারণ সত্যই হয় তো দুটো বাড়ীর মধ্যে আর একটিও বাড়ী নেই। সহরে পাশের বাড়ীর সঙ্গেও সে সম্পর্ক রাখা চলে না। সহরের পক্ষে সেটাই নিয়ম। মানুষের সময়, ধৈর্য্য, সহানুভূতি কিছুই তো অসীম নয়।'

সন্ধ্যা দমিয়া গিয়াছিল। পরাজয় স্বীকার করার মতই আলগোছে সে বলিল, 'যাই হোক, সহরে পাপ বেশী।'

'কোন হিসাবে পাপ বেশী? সহরে লোকসংখ্যা আর পাপের পরিমাণ হিসাব করে দেখেছেন?'

'না তা দেখিনি।'

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল।

জগদানন্দ হাসিল না, গভীর আপসোসের সঙ্গে বলিল, 'সহর সম্বন্ধে আপনাদের কত রকমের যে ভুল ধারণা, ভাবলেও দুঃখ হয়।'

নড়িয়া চড়িয়া জগদানন্দ সোজা হইয়া বসে। সহর সম্পর্কে আলোচনায় তার আগ্রহ এবং উৎসাহের আতিশয্য মোহনের বিস্ময়কর মনে হয়। কেবল তর্ক করিয়া নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করা নয়, সহরকে যেন মানুষটা প্রাণ দিয়া ভালবাসে। সহরকে সমর্থন করিয়া ধীরে ধীরে সে নিজের বক্তব্য বলিয়া যায়, রাত্রি যেন গভীর হইয়া আসে নাই, সারাদিনের হাঙ্গামা ও উত্তেজনায় কেউ যেন এতটুকু শ্রান্ত নয়! লিখিত বক্তৃতার মত তার গুছানো কথাগুলি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় এ বিষয়ে সে কত চিন্তা করিয়াছে।

শুনিতে শুনিতে নিজেকে সত্যই একটু বিপন্ন মনে হয় মোহনের। কতগুলি বিশ্বাস ও ধারণায় তার সুনিশ্চিত নির্ভর ছিল, খেলনা-বেলুনের মত সেগুলিকে এখন মনে হয় ফাঁপা।

লাবণ্যও মন দিয়া শুনিতেছিল। চোখ দু'টি তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু। সেই চোখের দিকে চোখ পড়ায় জগদানন্দ হঠাৎ থামিয়া গেল।

'ইস্, আপনাদের ঘুম পেয়েছে!'

'আপনার পায়নি?' লাবণ্য আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

প্রশ্নটা ছেলেমানুষী। দশ বছরের মেয়ের মুখে মানাইত। প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে

অপরিমাণ শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিটা অন্য যে কোন মানুষ সম্পর্কে হয় কৃত্রিম নয় বিসদৃশ মনে হইত।

তবে জগদানন্দ এ পরিবারের গুরুদেবের ভাই, এ বাড়ীতে পদার্পণ ঘটিলেই মোহনের মা তাকে প্রণাম করেন। লাবণ্যকে মন্ত্র দেওয়ার জন্য অনুরোধও তিনি জানাইয়া রাখিয়াছেন। জগদানন্দ স্বীকার করে নাই। তবু সে এই পরিবারের গুরুবংশের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তির বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। তাকে যত খুশী শ্রদ্ধা করা চলে, ছেলেমানুষের মত ছ্যাবলামি করার মত সেটা প্রকাশ করিয়া দেখানোও চলে।

তাই একমাত্র মোহন ছাড়া তার ছেলেমানুষীতে কেহ বিরক্ত হয় না। তার সরলতা সন্ধ্যার ভালই লাগে।

আজ রাতটা সন্ধ্যা এখানেই থাকিবে।

আগে কিছুই ঠিক ছিল না, সকলের বিদায় নেওয়ার আগে। মোহন জানিত সন্ধ্যা গাড়ীতে আসিয়াছে, গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। বিদায় নেওয়ার সময় আসিলে সন্ধ্যা বলিয়াছিল, 'বেশী খাওয়া হয়ে গেছে মোহন।'

'খারাপ লাগছে?'

'ভারি খারাপ লাগছে।'

'তাই তো।'

'গাড়ীর ঝাঁকুনিতে যদি—?'

'তাই তো।'

'থাক, আজ রাতে আর যাব না। গাড়ী ফিরে যাক। সকালে বরং ট্রেণেই ফিরে যাব। সকাল ছ'টা পর্য্যন্ত বাবা আমাকে গাড়ী ধার দিয়েছে, ফিরতে দেরী হলে চটবে।'

'আমার গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস'খন।'

সন্ধ্যা হাসে।

'মুখ ফুটে একটু বলো এসব কথা নিজে থেকে! রাতে এখানে থাকবার কথাটা তো যেচে বলতে হল আমাকে। তোমার মুখে খালি শুনলাম, তাইতো! তাইতো! যেচে যেচে তোমার কাছে সব আদায় করতে হবে নাকি?'

ড্রাইভারকে ডাকিতে পাঠাইয়া সন্ধ্যা বলিয়াছিল, 'মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল যে তোমার? কি হল? অসুবিধে হয় যদি তো খোলাখুলি সেটা বলো ওর

কাছেই নয় আজ রাতটা কাটাই গিয়ে। বাড়ী কাছেই আছে, এটুকু যেতে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বমি আসবে না।'

'যেচে যাবে?'

সন্ধ্যা স্নখের হাসি হাসিয়াছিল।

'যেচে? যাবার সময় অত করে সঙ্গে যেতে বলছিল, ছেলেমানুষের মত সাধাসাধি করছিল, চেয়ে ছ্যাখোনি?'

মোহন চাহিয়া দেখিয়াছিল এবং দৃশ্যটা ভুলিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্যই তবে এতখানি ব্যগ্রভাবে কথা বলিতে দেখা গিয়াছিল চিন্ময়ের? মাঝে মাঝে চিন্ময়কে আজ সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সঙ্গে যাইতে বলা হয় তো সেই দেখারই পরিণতি। না বলিয়া থাকিতে পারে নাই।

'গেলে না কেন!'

'কেন যাব? আমায় দেখতে দেখতে একজনের মোহ জাগবে, আর সে ডাকা মাত্র লক্ষ্মী মেয়ের মত তার সঙ্গে চলে যাব? আমি মানুষ নই?'

সন্ধ্যা গলা নামাইয়া প্রায় ফিস ফিস করিয়া বলিয়াছিল, 'তাছাড়া আজ এখানে থাকব। তোমার বাড়ীতে রাত কাটানোর স্নযোগ তো রোজ মেলে না।'

তারপর জোরে ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগছে না মোহন।'

'তা হলে আর দেরী না করে শুয়ে পড়। একা ঘরে ভয় করবে না তো? তা হলে মেয়েরা কেউ বরং—'

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট মুখে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, 'ভয় করবে? একটা ঘরে রোজ একলা শুই জান না?'

'সেটা তোমার নিজের বাড়ী।'

'এটা বুঝি পরের বাড়ী? আমি বুঝি পরের বাড়ীতে রাত কাটাই? তুমি অবশ্য আমাকে পর ভাব—'

সন্ধ্যা চেষ্টা করিয়া আবার একটু হাসিয়াছিল।

মোহন তখন ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই কথার পর্ব্ব শেষ করিয়া দিল। ঘুমে কাতর লাবণ্যের উপর সন্ধ্যাকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বসিবার ঘরে চলিয়া গেল।

ঘুমে লাবণ্যের চোখ মেলিয়া রাখিতে কষ্ট হইতেছিল। কোন রকমে সন্ধ্যাকে তার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া সে শুধু বলিল, 'দরকার হলেই আমাদের ডাকবেন। আমরা পাশের ঘরেই আছি।'

তারপর কোন রকমে শাশুড়ী শুইয়াছেন কিনা খবরটা নিয়াই নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় গা এলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘরে ঘরে আলো নিভিয়া তারপর একসময় সারা বাড়ীটা হইয়া গেল নীরব ও অন্ধকার, আলো শুধু দেখা গেল উপরে মোহনের নিজস্ব বসিবার ঘরে ও নীচে গ্যারেজে শ্রীপতির ঘরে।

একজনের গৃহে এবং আরেকজনের বাহিরে সঞ্চয় করা শ্রান্তিতে ঘুম টুটিয়া গিয়াছে।

শ্রীপতির ঘুম আসিতে আরও আধঘণ্টা সময় লাগিল। মোহনের তখনও ঘুম আসিল না।

তার শুধু শ্রান্তি নয়। তার বাড়ীতে তার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া যাচিয়া সন্ধ্যা এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে, কয়েক পা হাঁটিয়া ভেজানো দরজাটি ঠেলিয়া তার কাছে যাওয়ার সুযোগ! একথা ভাবিতে মোহনের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, এও যে জগতে সম্ভব হয় বিশ্বাস করিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ জীবনটা হইয়া যাইতেছে বিস্বাদ।

না, ও ঘরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নাই।

এই অক্ষমতাকে স্বীকার না করিলে আজ এত রাত্রের বর্তমান জীবনের কোন অর্থ হয় না।

ফাঁকা ঘরে একা শুইয়া সন্ধ্যার ঘুম আসিয়াছে কিনা কে জানে। সন্ধ্যা যে বলিয়াছিল তার কিছুই ভাল লাগিতেছে না সেটা কিন্তু ছলনা নয়। কথার পর্ব্ব শেষ করিয়া সন্ধ্যাকে বিছানায় আশ্রয় নিতে দেওয়ার প্রয়োজনটা খেয়াল হওয়া মাত্র মোহন সেটা টের পাইয়াছিল।

বেশী খাওয়ার জন্যই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক, সন্ধ্যার খুবই খারাপ লাগিতেছিল—দেহ এবং মন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্মার্ট থাকিতেই হইবে সন্ধ্যাকে —কথায় হারিয়া যাওয়া তার স্বভাব নয়।

জগদানন্দের সঙ্গে তর্কে সে হার মানে নাই, এমনভাবে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া

তর্ক শেষ করিয়াছিল যেন তার মোট কথাটা জগদানন্দ মানিয়া নিয়াছে, খুঁটিনাটি নিয়া আর তর্ক করিয়া লাভ নাই।

সন্ধ্যার স্বাস্থ্য সত্যই ভাল নয়। সত্যই তার গা বমি বমি করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

তবু যে আজ সে অভিসারিকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছে তার মধ্যেও এতটুকু ফাঁকি দেয় নাই। তার উপায় নাই ফাঁকি দেওয়ার।

মোহনকে জয় না করিতে পারিলে নিজে সে মিথ্যা হইয়া যাইবে।

চিন্ময়ের কাছে হার মানিবে।

সন্ধ্যার বদলে সে নিজে যদি এই সুযোগটা সৃষ্টি করিত! কত পৃথক হইয়া যাইত ঘুমন্ত জগতে চুপি চুপি তার সন্ধ্যার কাছে যাওয়া। একদিন সত্যই সে এমনি অভিসারের আয়োজন করিত। সন্ধ্যার বাড়ীতে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর হোটেলে যে দিনটা সন্ধ্যার সঙ্গে কাটিয়াছে, সেই দিনই সে জানাইয়াছিল সহরে বাস করিতে আসিয়া এই একটি অনিবার্য সম্ভাবনা সে জীবনে টানিয়া আনিয়াছে।

নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে একদিন হার মানার কল্পনায় তাঁর ফাঁকি ছিল না। এটুকু জানা না থাকিলে সন্ধ্যার ধৈর্য্যের অভাবটা হয়তো তার এত খারাপ লাগিত না।

এটা সন্ধ্যার উচিত হয় নাই।

জীবন সস্তা হইয়া যাওয়ার দুঃখে অভিভূত মোহন হয়তো আরও দু'এক ঘণ্টা তার নিজস্ব সেই বসিবার ঘরেই কাটাইয়া দিত। হঠাৎ আরও ভয়ঙ্কর একটা ভাবনা মনে আসিয়া তাকে ঝাঁকি দিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিল।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে সন্ধ্যা যদি ধৈর্য্য হারায়? নিজে যদি সে এ ঘরে তার কাছে চলিয়া আসে?

তাড়াতাড়ি মোহন টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপিয়া দেয়। দুইটি ঘরের রুদ্ধ দুয়ার পার হইয়া সন্ধ্যার ঘরের দরজায় হাত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যার দুয়ার ভেজানো নয়। ভিতর হইতে সে দরজাটি বন্ধ করিয়াছে! সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই গভীর আরামে চোখে জল আসার মত তাড়াতাড়ি মোহনের চেখে ঘুম আসে।

ছয়

সকালে সকলে দেরী করিয়া ওঠে।

সবচেয়ে বেলা হয় লাবণ্য, সন্ধ্যা আর নগেনের। আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাবণ্য আবার ফিরিয়া যায় বিছানায়। তার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াই বুঝা যায় আজ এবং হয়তো কালও সে বিছানা ছাড়িবে না।

মোহনকে ডাকিয়া সে করুণ স্বরে বলে, 'বড় ডাক্তার ডাকবে বলেছিলে যে? ডাকো না?'

'তিনজনকে তো দেখালে। আর কতবড় ডাক্তার দেখাবে?'

'আরও বড় ডাক্তার—সবচেয়ে বড়। মরে গেলে তো আর দেখাতে হবে না।'

'আচ্ছা ওবেলা ডাকব।'

'ওবেলা নয়, এখুনি।'

'সন্ধ্যাকে পৌঁছে দিয়ে আসি? ডাক্তার এসেই তো তোমার কষ্ট কমিয়ে দিতে পারবে না।'

'পারবে। সন্ধ্যাকে ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসুক। তুমি আমার কাছে থাকো।'

'বারটা একটার মধ্যে ফিরে আসব লাবু।'

'না না, তুমি যেওনা। তুমি কাছে না থাকলে সইতে না পেরে আমি হয়তো গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যাব।'

লাবণ্য অনেক খাপছাড়া কথা বলে, আজকের কথাটা অদ্ভুত রকমের মৌলিক। তবে তার কথার মানে খুব পরিষ্কার। অন্ততঃ তাই মনে হয় মোহনের।

'সন্ধ্যাকে আমি নিজে পৌঁছে দিতে না গেলেই তোমার অসুখ কমে যাবে বলছ তো লাবু?'

লাবণ্য অবাক হইয়া মোহনের দিকে তাকায়। তার সেই খাঁটি বিস্ময়ের মধ্যে নিজের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফাঁকিটা মোহন যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

সন্ধ্যার কথা লাবণ্যের মনেও আসে নাই। যন্ত্রণা তার সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, জগতে তার একমাত্র আপনার জনটিকে তাই সে কাছে রাখিতে চায়। সন্ধ্যাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার বদলে তাকে কাছে থাকিতে বলার আর কোন কারণ নাই।

নিজের একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে রাগে মোহনের মন জ্বালা করিতে থাকে।

আরেকটি ভেজানো দরজা খুলিতে গিয়া সে যেন বাধা পাইয়াছে। লাবণ্যের কষ্ট দেখিয়া তার মায়া হইত নিশ্চয়, এখন আর কারও জন্য মায়া মমতা কিছুই মাথা তুলিতে পারে না। লাবণ্যকে একটা বড়ি খাইতে দিয়া নিজে সে নীচে চলিয়া যায়, পাঠাইয়া দেয় নলিনীকে।

সকালে ঝরণা আসে।

কাল রাত্রে দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেও বুঝি কিছু টের পাইয়াছিল, সকালে উঠিয়াই সে সন্ধ্যার বাড়ীতে ফোন করিয়াছিল। সকালে সন্ধ্যা এখন কোথায় আছে তার বাড়ীর লোক বলিতে পারে নাই, শুধু জানাইয়াছে যে সে কাল সন্ধ্যায় মোহনের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে বাহির হইয়াছিল।

ঝরণারও নিমন্ত্রণ ছিল। সে অভিমান করিয়া আসে নাই।

অভিমানের কারণ, মোহন নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাকে সে নগেনকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিল। কিন্তু নগেন যায় নাই।

কিন্তু দাদার সমস্যা অভিমানের চেয়ে বড়।

সন্ধ্যা এখানে আছে অনুমান করিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

মোহন যখন কাছে আসিল, বৌদির সঙ্গে ঝরণার বুঝাপড়াটা সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে, রাগে দুঃখে অভিমানে ঝরণা কাঁদ কাঁদ এবং মুখখানা তার লাল।

'না এলে তুমি, না এলে। তুমি যা খুশী করবে, আমরা চিরকাল সয়ে যাব ভেবেছ? দু'মাসের মধ্যে দাদার যদি না আবার আমি বিয়ে দিই—'

'আমি বেঁচে থাকতে? মরে যাওয়ার পরেও পারবে না ভাই, বড্ড বেশী রকম খাঁটি তোমার দাদার ভালবাসা।'

'মরাই ভাল তোমার। তুমি মর।'

মোহনকে ঝরণা দেখিতে পায় নাই, দৃষ্টিটা সন্ধ্যার ম্লান মুখেই আটকানো ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষার মত একটা মুখভঙ্গি করিয়া সে ভিন্ন সুরে বলিতে থাকে, 'দাদার আমি বিয়ে দেব, দেখো তুমি। এমনি না পারি, আমার বন্ধুকে দিয়ে দাদাকে নষ্ট করাবো। তখন তো বিয়ে না করে পারবে না।'

এবার ঝরণার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার সঙ্গে তেজও বোধ হয় তার ঝিমাইয়া যায়, ধপ করিয়া সে বসিয়া পড়ে একটা চেয়ারে।

সন্ধ্যা বাহির হইয়া গেলে মোহনও কলের মত তার সঙ্গে যায়। সন্ধ্যাকে গাড়ীতে বসাইয়া সে কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসে।

কাঁদিতে দেখিয়াও ঝরণার সঙ্গে সে একটি কথা বলে নাই, নিজের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করা তার অসম্ভব মনে হয়। ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিতে পায় ঝরণার কান্না থামিয়াছে এবং ইতিমধ্যে কোথা হইতে নগেন আসিয়া তার কাছে কাঠের পুতুলের মত বসিয়া আছে।

নগেনের মুখ সজল মেঘের মত গম্ভীর।

ঝরণাই আগে কথা বলে।

'বৌদির জন্য দেখলেন?' মুখ তুলিয়া সে লজ্জার হাসি হাসে, 'আমিও যেমন, গায়ে পড়ে পায়ে ধরে বৌদিকে সাধতে আসি। এই নিয়ে এগারো বারো বার সাধাসাধি করলাম।'

'সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে ঝরণা।'

ঝরণা সজোরে মাথা নাড়ে।—'আপনি জানেন না। ওর মত নিষ্ঠুর মেয়ে জগতে নেই।'

'নিষ্ঠুর নয়, খেয়ালী বলতে পার।'

'নিষ্ঠুর আর খামখেয়ালী, দুই-ই। মেয়েমানুষ খামখেয়ালী হলেই এক দম বিগ্‌ড়ে যায়।'

সহুরে মেয়ের মুখে এমন কথা? কলেজ ডিঙ্গানো এই বয়সের মেয়ের মুখে, স্বাধীন মেয়ের মুখে?

মোহন কিন্তু বুঝিতে পারে। এসব চিন্ময়ের গ্রামকে অস্বাভাবিক রকম ভালবাসার সকর্মক প্রভাবের পরিচয়।

নগেনের জন্য মোহন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এসব কথার ভাঙ্গাচোরা দু'চারটি টুকরাও ওর কানে যাওয়া উচিত নয়, বয়স্ক মানুষের জীবনে এসব জটিল সমস্যার অস্তিত্বই ওর অজানা থাকা উচিত। বড় জোর দু'টি একটি সিগারেট খাওয়ার অনুমতি ওকে দেওয়া যায়, এসব অভিজ্ঞতার ছোঁয়াচ লাগার বয়স এখনও ওর হয় নাই।

কে জানে কি বলিতে ঝরণা কি বলিয়া ফেলিবে, মোহন তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।

গাড়ীতে মোহন বলিল, 'ফিরে যাও না সন্ধ্যা?'

'না আমার সহ্য হয় না।'

সুন্দর সুদীর্ঘ পথ সামনে হইতে পিছনে সরিয়া যায়, মোহনের মনে হইতে

থাকে হঠাৎ পা পিছলাইয়া সে যেন আছাড় খাইবে। গাড়ীর চাকা নয়, পা। পা টিপিয়া হাঁটার মত পেশীতে টান ধরিয়া শরীরটা যেমন শক্ত হয়, মনটা যেমন থ বনিয়া থাকে, ঠিক সেই রকম অনুভূতি।

'চিন্ময় তোমায় ভালবাসে মনে হয়।'

'তুমিও তো আমায় ভালবাসো?'

'না, তোমার জন্য আমার একটা মোহ আছে সত্যি, কিন্তু আমি জানি সেটা ভালবাসা নয়। দশজনকে সমাজকে না মেনে ভালবাসা হতেই পারে না। জীবনের আর সব তুচ্ছ করে দু'চারদিনের পাগল হওয়ার ঝোঁকটা কি ভালবাসা? জগৎ সংসার ভুলে গেলাম, সব মানুষের ভালবাসার অধিকার আছে ভুলে গেলাম, সারাটা জীবনের কথা ভুলে গেলাম। জীবন্ত মেয়ে পুরুষের মধ্যেই ভালবাসা হওয়া সম্ভব—জীবনেব হিসাব ছাড়া কি ভালবাসা হয়? কাল রাত্রে তোমার ঘরের দরজায় গিয়েছিলাম জানো? দরজা ঠেলেছিলাম?'

'জানি বৈকি। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি টোকা দিলেই ছিটকিনি খুলে দিতাম।'

'তুমি জানো আমি তোমায় ভালবাসি না। তাই ছিটকিনিটা খুলে রাখতে ভরসা পাওনি। গাঁ থেকে সহরে এসেছে মানুষটা, যদি না বুঝতে পারে ছিটকিনি খোলা রাখার মানে? ভালবাসার খেলা মিটে যাওয়ার পরেও যদি একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আরও দাবী করে মুস্কিলে ফেলে?'

সন্ধ্যা খানিক চুপ করিয়া থাকে।

'উপদেশ দিচ্ছ? স্নেহ কর বলে?'

'না। আমার মনে হয় চিন্ময় তোমাকে ভালবাসে।'

'না পেলে ভালবাসে। ফিরে গেলে কি হবে জানো? পনের দিন একমাস আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর ঘণ্টাখানেক আমায় পেলেই যথেষ্ট। রাত এগারোটায় ঘরে আসবে, একটা সিগারেট ধরিয়ে এক দৃষ্টিতে আমায় দেখবে, সিগারেটটা শেষ করে বুনো জানোয়ারের শিকার ধরার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। বারোটার সময় নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে।—'

'সন্ধ্যা মাথা নাড়ে—'ভুল বললাম। ঘুমোবার সময় নাক ওর ডাকে না।'

'এইজন্য যাও না? আমি ভাবছিলাম, ছেলেমেয়ের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের গণ্ডগোল চলছে।'

'ছেলেমেয়ের ব্যাপার? মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

সন্ধ্যা পথের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। মোহনের অজ্ঞাতেই গাড়ীর গতি বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ সন্ধ্যার অস্ফুট কাতরোক্তি তার কানে গেল, 'আস্তে চালাও না একটু! মাগো, একটু আস্তে চালাও। সবাই কি সমান তোমরা?'

গাড়ীর গতি শ্লথ হইয়া আসিলে সে যেন আরাম বোধ করিল, ভাল করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া দু'আঙ্গুলে আলগোছে মোহনের বাহুমূল চাপিয়া ধরিল।—'মেয়েদের মেয়ে বন্ধু থাকে, আমার বন্ধু পুরুষ,—তুমি। আমাকে তোমার খাপাছাড়া মনে হত, ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারতে না—এখনো খাপছাড়া লাগে। তার কারণ, তোমার সঙ্গে আমি ঠিক বন্ধুর মত ব্যবহার করতাম। তুমি না থাকায় ক'বছর বড় কষ্ট পেয়েছি মোহন। এমন একলা মনে হ'ত নিজেকে কি বলব।'

মোহন মুখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, 'না না, তুমি চুপ করে থাকো। আমায় কথা বলতে দাও।'

তবু মোহন বলে, 'তোমায় একখানা চিঠি লিখেছিলাম!'

'মনে আছে, জবাব দিইনি। চিঠি! মনের বোঝা কমাতে রোজ যার সঙ্গে কথা বলা দরকার, তার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে কি হত?—জানো মোহন, আসলে আমি চিরদিন খুব ভীরু আর শান্ত ছিলাম। তুমি ভাবতে সন্ধ্যা বুঝি খুব তেজী একগুঁয়ে স্মার্ট মেয়ে, কিন্তু ভেতরে সত্যি আমি খুব ঠাণ্ডা ছিলাম। আর দশটি মেয়ের সঙ্গে তাদের মত চলতাম, শুধু নকল করতাম! কোনদিন কোন বিষয়ে কাউকে ছাড়িয়ে যাইনি। জানো, তুমি ছাড়া কোন ছেলে আমাকে কোনদিন একলা বেড়াতে পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি? দু'চার জন মেয়ে কাছে থাকলে বুক ফুলিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতাম, এমন ভাব দেখাতাম যেন আমার অসাধ্য কাজ নেই। কেউ না থাকলেই আমার বুক দুর্ দুর্ করত। এখন আমি যার-তার সঙ্গে রাত বারোটা পর্য্যন্ত বাইরে কাটিয়ে দিই, হোটেলে বসে ককটেল খাই। কেন জানো? ওঁর ভীষণ ভালবাসা সইতে পারি না বলে। তবে—'

ভীষণ ভালবাসা! চিন্ময়ের মতিগতি ভাল করিয়া জানা না থাকিলে মোহনও হয় তো ভীষণ ভালবাসার মানে বুঝিয়া নিত কড়া ভালবাসা, দুর্দ্দান্ত ভালবাসা। সন্ধ্যা কি অর্থে 'ভীষণ' বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে মোহন বুঝিতে পারে।

চিন্ময়ের ভালবাসা শুধু কড়া বা দুর্দ্দান্ত নয়—কোমলও বটে, এদিকে আবার বড় বেশী গভীর, বড় বেশী সজাগ।

সন্ধ্যার জন্য নিজের প্রেম সম্পর্কে সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা সচেতন হইয়া থাকে, সন্ধ্যাকে এক মূহূর্ত্তের জন্য ভুলিবার সুযোগ দেয় না যে সে তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে!

সন্ধ্যাও তাই বলে। বলে, 'একেই তো মানুষটা সব বিষয়ে সিরিয়াস্—ভালবাসা পর্য্যন্ত অত সিরিয়াস হলে মানুষের সয়? তবে—।'

'তবে?'

'তুমি থাকলে এরকম হত না। আমি ঠাণ্ডাই থাকতাম। আমার কেউ ছিল না মোহন।'

'তুমি বেশ ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়েই আছ সন্ধ্যা।'

বেলা দেড়টার সময় বাড়ী ফিরিয়া জগদানন্দকে লাবণ্যের ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মোহন আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কলিকাতার সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে নামকরা ডাক্তারকে আনার জন্য নগেনকে লাবণ্য জগদানন্দের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

জগদানন্দ নিজেই ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া এইমাত্র ডাক্তার বিদায় হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যেই লাবণ্য একটু ভাল বোধ করিতেছে।

'তুমি তো চলে গেলে আমায় ফেলে, আমার এমন ভয় করতে লাগল, যদি মরে যাই? উনি বলছেন সেরে যাব।'

'কে, ডাক্তারবাবু?'

'না, উনি।'

মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, বিরক্তও হয়। লাবণ্যের কাণ্ডজ্ঞান নাই, লজ্জাসরম নাই। একি তার জ্বর হইয়াছে যে বাহিরের লোককে ঘরে বসাইয়া অসুখের কথা আলোচনা করিতেছে? মেয়েলি অসুখের অশ্লীল বিজ্ঞাপন রচনার পরামর্শ-সভা যেন বসিয়াছে তার অন্দরে তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। দু'কান মোহনের ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে।

গুরুদেবের ভাই বলিয়া জগদানন্দ যে তার মায়েরও প্রণম্য, লাবণ্যের সঙ্গে তার যে পিতার মত সম্পর্ক, এটা মোহনের খেয়াল থাকে না।

জগদানন্দ বলে, ডক্টর উপেন সাকে এনেছিলাম। আমার বাড়ীতেও উনি চিকিৎসা করেন।

জগদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমি তবে যাই এবার ?'

লাবণ্য বলিল, 'হ্যাঁ, আসুন। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, আপনার বোধ হয় খাওয়াও হয়নি।'

খাওয়া মোহনেরও হয় নাই।

কিন্তু লাবণ্য যে তার খাওয়ার কথা উল্লেখ করে নাই, সেটা অন্যায় নয়। সন্ধ্যাকে পৌছিয়া দিয়া আসিতে গিয়া সে বাড়ী ফিরিয়াছে বেলা দেড়টায়—তারা কি করিয়া ভাবিবে যে সন্ধ্যা তাকে খাইতে না দিয়া বিদায় করিয়াছে ?

লাবণ্যের সকাতর আবদার উপেক্ষা করিয়া সে সন্ধ্যাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যা স্নানাহার না করিয়া তাকে আসিতে দেয় নাই বলিয়াই তো ফিরিতে তার এত বেলা হইয়াছে।

এসব মোহন বোঝে। খিদেয় তার পেট জ্বলিয়া যাওয়ার জন্য সন্ধ্যা যে দায়ী নয়, এরা তা কেমন করিয়া জানিবে।

সন্ধ্যাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবার খানিক পরেই সে বিদায় নিয়াছিল।

এতক্ষণ শুধু সহরের রাস্তায় রাস্তায় পাক দিয়া বেড়াইয়াছে।

কেনা কাটা সারিয়া তার বাপের যেমন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল পায়ে হাঁটিয়া সহরের পথে ঘুরিয়া বেড়ানোর—বিষণ্ণ হাসি বিনিময় করিয়া সন্ধ্যার কাছে বিদায় নিবার পর তারও তেমনি একটা অদম্য ঝোঁক চাপিয়াছিল গাড়ী চালাইয়া সহরটা চষিয়া বেড়ানোর।

সহরের পথে হাঁটিবার ঝোঁকে তার বাবা মরিয়াছিল দুর্ঘটনায়।

কয়েকটা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা হইতে সে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।

বিলাতী দোতালা বাসের রোগা কালো মাঝবয়সী বাঙালী ড্রাইভার কী ভাবে ব্রেক করিয়া অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঠেকাইয়াছিল! শুধু আধ হাত— অতবড় দোতালা বাসটার গতি রুখিতে আর আধ হাত বেশী আগাইতে হইলে মোহনও হয় তো আজ পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বর্গে যাইত।

ঘণ্টা তিনেক সে অকারণে চক্র দিয়াছে, তেল ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং পকেটে

টাকা না থাকায় দামী হাত ঘড়িটা জমা দিয়া তেল কিনিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। এসব বাড়ীর লোকের জানিবার কথা নয়।

তবু মোহনের বুকে অভিমান উথলাইয়া উঠে।

একবার কি জিজ্ঞাসা করিতে নাই: তুমি খাইয়া আসিয়াছ কি?

দেশে থাকিতে সকালে আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া বেলা তিনটায় ফিরিলেও তো লাবণ্য এবং মা ছাড়াও বাড়ীর তিনচার জন মানুষ জিজ্ঞাসা করিত, খেয়ে এসেছো?

তার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বাড়ীর মানুষ উদাসীন হইয়া গিয়াছে।

লাবণ্য এবং মা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় না যে সত্যই সে খাইয়া আসিয়াছে।

জগদানন্দ বিদায় নেওয়া মাত্র মোহন বাড়ীর মানুষের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া দেয়।

স্নানের ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটির জন্য জ্যোতিকে ধমকায়, মাছ না থাকায় শুধু ডাল তরকারী এবং তাড়াতাড়ি মোড়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনা দই মিষ্টি দিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিতে হওয়ায় গর্জন করিয়া ওঠে।

মা গিয়াছিলেন দামী গরদের শাড়ী পরিয়া সহরের পাড়া বেড়াইতে। আরও ঘণ্টাখানেক পাড়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া গরদের কাপড় ছাড়িয়া থান ধুতি পরিয়া তিনি একটু শুইতেন।

মোহনের পরিত্যক্ত ধুতি পরা আশ্রিতা মঙ্গলা তাঁকে ডাকিয়া আনিল। জানাইল, মোহন বাড়ী ফিরিয়া পাগলের মত করিতেছে, লাথি মারিয়া সকলকে দূর করিয়া দিবার কথা বলিতেছে।

গরদের শাড়ী ছাড়িয়া থান ধুতি পরিতে পরিতে মা মোহনের গর্জ্জন আর ধমকানি শুনিলেন। তারপর ছেলের সামনে গিয়া শান্ত সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, 'তুই নিজেই একটা হুকুম দিবি, বাড়ীর লোক তোর হুকুম মত কাজ করলে নিজেই আবার রাগারাগি করবি? এ কোন দেশী বুদ্ধি বিবেচনা মেজাজ হয়েছে তোর?'

'কি হুকুম দিয়েছিলাম?'

'তোর মনে থাকে না বলেই তো মুস্কিল। এই সেদিন বেলা দুপুর করে বাড়ী ফিরলি, তোর জন্য উনান জ্বলছে, মাছটাছ সব রাঁধা হয়েছে দেখে যেন ক্ষেপে গেলি একেবারে। মনে নেই? সবাইকে ডেকে ঢালাও হুকুম দিলি, বারটার মধ্যে উনান নেবাতে হবে, খাওয়া দাওয়া সারতে হবে?

বারটার পর তোর জন্য কিছু রাখতে হবে না, তুই বাইরে থেকে খেয়ে আসবি।

মিষ্টতা পরিহার করিয়া হঠাৎ যেন রাগিয়া টং হইয়া যান মা।

'বাইরে খেয়ে খেয়ে কী চেহারাই করেছিস। দেখলে মনে হয় যেন বাড়ীতে মা বৌ ভাইবোন মাসীপিসী নেই, খেতে দেবার যত্ন করার কেউ নেই। সহরে এসে এমনভাবে তুই অধঃপাতে যাবি—'

কথা শেষ না করিয়াই মা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। এ যে তাঁর রাগ নয়, এতবড় ছেলেকে ধমক দেওয়া নয়, এ শুধু মায়ের অভিমানের তিরস্কার—ও ছেলে কি আর তা বুঝিবে!

মোহন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইবার কথা ভাবিতেছিল। মা চলিয়া যাওয়ায় সে আবার খাইতে আরম্ভ করিল।

সত্যিই তার মনে ছিল না কবে ঝোঁকের মাথায় অপচয় কমাইবার জন্য সে হুকুম দিয়াছিল—তার জন্যও বেলা বারটার পর উনান জ্বলিবে না, বাড়ী না থাকিলে তার জন্য বিশেষ পদ কটা রাঁধাও হইবে না।

মাঝে মাঝে চেনা লোকের বাড়ীতে এবং প্রায়ই সে হোটেলে খাইয়া আসে।

স্নানাহারের পর বিছানায় চিৎ হইয়া মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া তার ঘুম পাইতেছে, মা ঘরে আসিলেন।

'কত খরচ হল রে কাল?'

'জানি না।'

'জানি না বললে কি চলে মনু? একটু হিসেব করে খরচ করিস বাবা। শুধু খরচ করে যাওয়ার মত টাকা কি আছে আমাদের?'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।'

'ব্যাঙ্কে আর টাকা নেই?'

'আছে।'

'কাগজ ভাঙ্গালি কেন তবে হাজার টাকার?'

মোহন বিছানায় উঠিয়া বসিল।—'তোমার এত টাকার চিন্তা কেন বলত মা?'

মাও বসিলেন।

তাঁর মুখ শুধু ম্লান নয়, গম্ভীরও বটে। বেশ বুঝা যায় ছেলের রাগ ও বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন।

'তুই ওনার মত একটু হিসেবী হলে চিন্তা হত না মনু।'

'হিসেব আমার আছে। প্রথমটা খরচ একটু বেশী হয়, কত জিনিসপত্র কিনলাম—'

'অত দামী সব জিনিস কেনার কি দরকার ছিল তোর? বেশ, কেনাকাটায় যা যাবার নয় গেল, এমনি যে টাকা যাচ্ছে জলের মত? মাস মাস তিনশ' টাকা বাড়ী ভাড়া! আমি কি জানি এত ভাড়া এ বাড়ীর, দু'রাত ঘুম হয়নি শুনে। তারপর দুটো চাকর, একটা ঝি, ঠাকুর, ড্রাইভার—'

'কি হয়েছে তাতে?'

'অমন চোখ পাকিয়ে কথা বলিস নে মনু। উনি যেতে না যেতে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করেছিস তুই—'

না, মার চোখে জল আসে নাই, স্বরটা কান্নার নয়। এও তার একটা নালিশ। একটা জোরালো প্রতিবাদ।

মা যে তার এমন শক্ত মানুষ, এমন সতেজে তার সঙ্গে কথা বলিতে পারেন, মোহনের সে ধারণা ছিল না। জোর করিয়া সহরে টানিয়া আনায় মার রাগ হইয়াছিল, সে রাগ আর কিছুতেই কমিল না।

মোহন বিশ্বাস করে, মার আসল জ্বালা সেইখানে, টাকা খরচ হওয়াটা বড় কথা নয়। অন্যভাবে সে যদি আরও বেশী অপব্যয় করিত, দেশে থাকিয়া ধর্মেকর্মে, আশ্রিত-পোষণে, দেশের আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ উৎসবে—মা খুশী হইতেন।

বহুদিন হইতে মার মনে বোধ হয় এই সাধটা লুকানো ছিল। কৃপণ স্বামীর মৃত্যুর পর বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন, ছেলে এবার তাঁর সাধটা মিটাইবে। বিলাস ও বাহুল্য আসিল, দশজনকে লইয়া আনন্দ ও উৎসব শুরু হইল—কিন্তু শুরু হইল ভিন্ন একটা জগতে। নিজের জগৎ হইতে ছেলে তাঁকে এখানে ছিনাইয়া আনিয়াছে! এখানে তাঁর ভাল লাগে না মোটেই, এখানে কিছুই তাঁর মনের মত নয়।

তাঁর মন পড়িয়া আছে দেশে।

এ সব মোহন মোটামুটি বুঝিতে পারে। কেবল বুঝিতে পারে না মার চোখের জলের অভাবটা।

মার শুধু সমালোচনা, তর্ক আর নালিশ, সারাদিন গজর-গজর করা। কোমর

বাঁধিয়া ছেলের সঙ্গে শুধু স্নেহহীন লড়াই। মনের জ্বালায় মাঝে মাঝে মোহনের চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, মার মুখের কঠোর ভাবটা এক মুহূর্তের জন্যও নরম হয় না।

'আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেছি? গায়ে পড়ে করে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি শুনি? বাবা মারা যাওয়ার পর তুমিই বরং যা-তা আরম্ভ করে দিয়েছ আমার সঙ্গে!'

'আমি জানি, সব দোষ আমার। তুমি টাকা উড়োবে, বলতে গেলে দোষ হবে আমার।'

'কি দরকার তোমার বলার? হাজারবার তোমায় বলেছি, খরচ যেমন বেড়েছে, আয়ও তেমনি বাড়বে।'

'কিসে আয় বাড়বে? ব্যবসা করে? তুই করবি ব্যবসা! ব্যবসা করার মানুষ আলাদা। তারা আগে আয় বাড়িয়ে তারপর খরচ বাড়ায়—তা-ও তোর মত বাড়ায় না। ব্যবসায় লোকসান নেই?'

'লোকসান যায়, আমার টাকা যাবে।'

'টাকা বুঝি তোর একার? একা তোকে উনি সর্বস্ব দিয়ে গেছেন, তুই যা খুশী তাই করবি বলে?'

ভীত চোখে তারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল—দুজনেই। তারপর মা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—একেবারে যাকে বলে পলায়ন করা।

এমন স্পষ্ট ভাবে নগ্নভাবে মা ও ছেলের মধ্যে লড়াই হইল এই প্রথম। কে জানে এ লড়াই কোথায় গিয়া ঠেকিবে, কি পরিণাম দাঁড়াইবে?

লড়াইটা স্থগিত রহিল প্রায় পনের দিন।

তার মধ্যে আর একটা উৎসব হইয়া গেল বাড়ীতে, নগেনের জন্মদিন উপলক্ষে। আগের বারের পার্টির চেয়েও অনেক বেশী টাকা খরচ হইয়া গেল। টাকার বিষয়ে মা কর্তালি করিতে চাওয়ায় মোহনের যেন আরও বেশী খরচ করার গোঁ চাপিয়াছে।

জন্মদিনে এত লোক ডাকিয়া এত ঘটা করিয়া উৎসব করিতে হয়, এ বাড়ীতে কারো তা জানা ছিল না। বাড়ীতে এত লোক থাকিতে নগেনের জন্মদিনেই বা কেন?

বাহিরের অনেকের কাছেও ব্যাপারটা একটু দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতে লাগিল। সাত দিন পরেই ভাই-এর জন্মদিনে সকলকে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা যদি মোহনের ছিল, সেদিন অকারণে সকলকে ডাকার কি প্রয়োজন ছিল তার?

তাড়াতাড়ি সকলের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিবার জন্য মোহন যে কী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, জানা থাকিলে হাসিই সকলের পাইত

সেদিন পার্টি দিয়া মোহন টের পাইয়াছিল, মানুষের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতা জমানোর এই উপায়টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সকলকে বাড়ীতে আনিয়া উৎসব করা। একটু বাড়াবাড়ি যদি হয় তো হোক। আরম্ভ করিতেই তার দেরী হইয়া গিয়াছে অনেক, তাড়াতাড়ি না করিলে চলিবে কেন? ধীরে সুস্থে সহরের সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিবার সময় তার নাই, তাকে অন্যদিকে মন দিতে হইবে। সেদিকটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—এবং গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে।

খরচ সম্পর্কে মার অনাবশ্যক কর্ত্তালি পছন্দ না করিলেও টাকার ব্যাপারে উদাসীন থাকিবার উপায় নাই। দুশ্চিন্তা না হোক, টাকার চিন্তা করিতে হয় বৈকি। টাকা যে তাকে আনিতে হইবে, সে তা জানে—প্রথম হইতেই জানিত। গ্রামে বাস করিবার সময় সহরের জীবনের কল্পনায় আয় বাড়ানোর জন্য নিজের কর্ম্ম ব্যস্ততাও সে কি কল্পনা করে নাই?

সে সব কল্পনার অনেক কিছুই বদল হইয়াছে সত্য কিন্তু মূল কথাগুলি বদল হয় নাই। কেবল সহরের সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলা নয়, আয় বাড়াইবার ব্যবস্থাও তাকে করিয়া নিতে হইবে।

তবে খরচ যে এত বেশী হইবে, কাজে নামার আগে এদিকের জীবনটা গড়িয়া তুলিবার সময় সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে—এ ধারণা তার ছিল না।

তা হোক, সময় যা আছে, তাই যথেষ্ট। দশজনের মধ্যে নিজের স্থানটি দখল করার জন্য তাকে শুধু উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

নগেনের জন্মদিনের উপলক্ষ না থাকিলেও মোহন কোন কারণ ছাড়া এমনিই সকলকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিত। মানুষকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনন্দ করা তো দোষের নয়।

এবারও অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল—আগের বারের চেয়ে বেশী। কিন্তু মা এবার কিছুই বলিলেন না।

রাগের মাথায় সেদিন যে কথা বলিয়া ফেলিয়া ছেলের সম্মুখ হইতে তিনি

পলাইয়া গিয়াছিলেন, আরও স্পষ্ট করিয়া সেই কথা বলিয়া ফেলিবার ভয়ে একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন।

মোহন বুঝিল অন্যরকম। সে ভাবিল, নগেনের জন্মদিনের উৎসব কিনা, এটা তাই মার কাছে অপব্যয় নয়।

নগেনকে সে উপহার দিল একটি মোটর সাইকেল।

ঝরণাকে উপহারটি দেখাইতে গ্যারেজে গিয়া দু'জনে বহুক্ষণ না ফিরিয়া আসায় মোহন নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। শ'খানেক মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনায়, দায় দায়িত্ব এড়াইয়া সে গেল খবর নিতে। গ্যারেজে গিয়া শুনিল ঝরণা নগেনকে বলিতেছে, 'না না, এতেই হবে, সাইড-কার দরকার নেই। ক্যারিয়ারে বসে খুব যেতে পারব আমি।'

'কোথায় যাবে তোমরা ?'

'বজ্‌বজ্‌।'

মোটরবাইকে দু'জনে বজ্‌বজ্‌ বেড়াইতে যাইবে কিনা, তাই বাড়ীর ভিতরে মানুষের ভিড় এড়াইয়া গ্যারেজে মোটরবাইকটার কাছে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে আসিয়াছে।

পীতাম্বর রোয়াকে বসিয়া আছে, তবু এখানে পরামর্শ করাই সুবিধা, কেউ বাধা দিবার নাই। আসিয়াছে তারা অনেকক্ষণ, এক ঘণ্টার কম নয়। এত দেরী না করিলে মোহন তাদের খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করিত না।

আর কিছু নয়, সত্যসত্যই দু'জনে গ্যারেজে বসিয়া গল্প করিতেছে কি না জানিবার জন্য মোহনের বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল।

কুড়ি বছরের বালকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের নারীর বন্ধুত্ব অদ্ভুত, খাপছাড়া ব্যাপার। নগেনের এই বয়সে ঝরণার সঙ্গে চার পাঁচ বছর বয়সের তফাৎটা দু'জনের মধ্যে চাঁদ আর পৃথিবীর ব্যবধান হইয়া থাকিবে। ড্রয়িংরুমে, বারান্দায়, নগেনের পড়ার ঘরে, নির্জন গ্যারেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জনের গল্প করাটা সত্যই যুক্তিহীন অসঙ্গত ঘটনা।

'তোমায় ডাকছে ঝরণা।'

'কে ?'

'লীলা ডাকছে।'

'লীলা ? লীলা তো এসেই চলে গেছে কখন—ফিরে এসেছে নাকি আবার ?'

'কি বলছি, লীলা নয়। লাবু তোমার খোঁজ করছিল।'

প্রত্যেক মানুষকে জীবনে মাঝে মাঝে নিজের মৃত্যু কামনা করিতে হয়। ঝরণার মুখ লাল দেখায় মোহনের প্রতিফলিত অপমৃত্যুর মত।

'বলুন গে' যাচ্ছি।'

ঝরণা নীরবে চলিয়া গেলে মোহনকে মনে মনে মরিয়াই থাকিতে হইত, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার অতি মন্দ আর বিপজ্জনক কর্ত্তব্য করার গৌরবে আহত সৈন্যের মত মোহন জীবন্ত হইয়া উঠিল।

এত যখন তেজ ঝরণার, ওকে আরও অপমান করা চলে। আরও অপমান করাই কর্ত্তব্য।

'একটু দেখা শোনা করবি যা নগেন? তোর সত্যি কাণ্ডজ্ঞান নেই। একা কতদিক সামলাব?'

'যাই।'

'যাই নয়, যাও।'

দু'জনেই গেল, আগে নগেন, তার পিছু পিছু ঝরণা। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিতে গিয়া মোহন দেখিল, আঙ্গুলগুলি তার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

'কাঠিটা দাও তো বাবা, নিভিও না।'

'আপনার দেশলাই নেই? বাক্সটা তবে রেখে দিন।'

পীতাম্বর বিড়ি ধরাইয়া বলিল, 'দেশলাই আছে। তুমি কাঠিটা ধরালে তাই চেয়ে নিলাম।'

দিয়াশলাই-এর একটা কাঠিও অপচয় করে না, মানুষটা হিসাবী বটে। মোহনের বাবারও এই রকম হিসাব ছিল, উনানে জ্বলন্ত কয়লা থাকিতে দেশলাই জ্বালিয়া টিকা ধরাইয়া তামাক দিলে আর রক্ষা থাকিত না।

হিসাবের আঁটঘাঁট বাঁধা তাঁর দীর্ঘজীবন এক মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় বাসের নীচে সমাপ্তি পাইয়াছে। মনে মনে পয়সার হিসাব কষিতে কষিতেই হয়তো তিনি অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, হয়তো ভাবিতেছিলেন, হাঁটিবেন অথবা বাসে উঠিয়া কটা পয়সা খরচ করিবেন।

কলিকাতা আসিয়াছিলেন তিনি বাজার করিতে, জিনিস কিনিয়াছিলেন কয়েকশ' টাকার। তার মধ্যে তাঁর নিজের জন্য ছিল একটি চটি, দু'জোড়া কাপড়

আর এক সের তামাক। বাকী সব কিছু তাদের জন্য। লাবণ্যের জন্য একটি সেলাই-এর কলও ছিল।

ছেলে মেয়ে, ছেলের বৌ, নাতি নাতনীর জন্য সেই তাঁর প্রথম আর শেষ বাজার করা নয়। কার কি বাজার চাই জানিয়া কোন চাওয়া বাতিল আর কোন চাওয়া মঞ্জুর করিতেন, তারপর লম্বা ফর্দ্দ নিয়া বছরে তিন চারবার আসিতেন কলিকাতা। বাঁচিয়া থাকিতে বাপের বিরুদ্ধে মোহনের অনেক অভিযোগ ছিল, এখন সে কেবল দুঃখ বোধ করে। আজীবন এক সঙ্গে থাকিয়াও সে তাঁর জীবনযাপনে সামঞ্জস্যহীন হিসাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই, এখনো পারে না।

জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় কথা ছিল হিসাব এবং সে হিসাব ছিল লক্ষ্যহীন জড়ধর্ম্মী বিকার।

বাপের অসার্থক, অসম্পূর্ণ, বঞ্চিত জীবনের কথা ভাবিয়া মোহন আজও গভীর বিষাদ অনুভব করে।

পীতাম্বর বলে, 'দেশ থেকে কোন চিঠিপত্তর পেয়েছ বাবা?'

'ঘনশ্যামের চিঠি পেয়েছি।'

'কিছু লিখেছে নাকি, আমার বাড়ীর খবর?'

'না।'

'চিঠি আসে না; কদিন থেকে ভাবছি কি হল। কি লিখেছে ঘনশ্যাম? ফসল কেমন হল জানিয়েছে কিছু? তেমাথায় টিউবওয়েল বসিয়েছে নাকি? বসাবে বসাবে করে দু'বছর ঘুরে গেল, চোত মাসটা ফের শীলপুর থেকে জল এনে খেতে হবে।'

আলো ঝলমল বাড়ীর দিকে চাহিয়া নিমন্ত্রিতদের হাসি ও কথার মিশ্র কলরব শুনিতে শুনিতে পীতাম্বর ভাবিতেছে দেশে তার আপনজনের কথা, ফসলের কথা তেমাথার টিউবওয়েল বসানোর কথা! কি হইতেছে বাড়ীর ভিতরে দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও হয় না মানুষটার?

'খেয়ে এসেছেন?'

'এইবার যাব, এক ফাঁকে গিয়ে খেয়ে আসব।'

বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঝরণাকে দেখিয়া মোহন স্বস্তি বোধ করিল। এতক্ষণ

এইটুকুই সে আশা করিতেছিল। ঝরণা রাগ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকিলে এক বিষয়ে মোহনকে হতাশ হইয়া যাইতে হইত।

এখনো তার আশা আছে যে নগেন আসল কথা কিছু বুঝিতে পারে নাই, ছেলেমানুষ তো নগেন। ঝরণা যে অপমান পাইয়া রাগ করিয়াছে তাও হয়তো সে জানে না।

ঝরণা রাগ করিয়া না খাইয়া চলিয়া গেলে নগেনের কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিত না।

ঝরণার সংযমে মোহন রীতিমত কৃতজ্ঞতা বোধ করে, হঠাৎ অসভ্যতা করিয়া ফেলার জন্য তার লজ্জা ও অনুতাপ বাড়িয়া যায়।

নিজের অসঙ্গত ব্যবহারের একটা অজুহাত সে ইতিমধ্যে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এ তার দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করার ফল, যেখানে নির্জ্জনে কোন ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে, বিশেষত ঝরণার মত রূপসী মেয়েকে কথা বলিতে দেখিলেই মানুষ যা তা ভাবিয়া বসে।

নিজের ব্যবহারের জন্য নিজের অতীত জীবনকে দায়ী করিয়া—ঝরণাকে সহজভাবে চলাফেরা করিতে ও কথা বলিতে দেখিয়া ক্রমাগত বেশী বেশী দায়ী করিয়া—মোহনের আরও খারাপ লাগে। তার মত অমার্জ্জিত সঙ্কীর্ণ গেঁয়ো মানুষের পক্ষে ওরকম অসভ্যতা করাই স্বাভাবিক ভাবিয়া যদি ঝরণা তাকে উদারভাবে ক্ষমা করিয়া থাকে, তার চেয়ে ব্যাপারটা আরও কুৎসিত দাঁড়ানো ঢের ভাল ছিল।

অতি কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, সহজভাবে এক সময় মোহন ঝরণাকে বলে, 'তুমি খাবে না ঝরণা ?'

'একটু পরে খাব।'

'চিন্ময় তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলছে। ও চলে যাক, তোমায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। আমিই না হয় দিয়ে আসব। কেমন ?

'আচ্ছা।'

ঝরণার এই আরও বেশী উদারতায় মোহনের স্বস্তি যেমন বাড়ে, তেমনি নিজেকে আরও বেশী বেশী গেঁয়ো মনে হয় !

যাওয়ার সময় ঝরণা কিন্তু তাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল !

সঙ্গে গেল নগেন।

বিদায়গামী একটি পরিবারের সঙ্গে মোহন গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গল্প করিতে করিতে সামনে দিয়া দুজনে চলিয়া গেল, একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া দেখিল না!

বুঝা গেল নগেনকে সাথী করিয়া ঝরণা হাঁটিয়াই বাড়ী যাইতেছে!

পরদিন সকালে ঝরণাকে নূতন মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসাইয়া বজবজ বেড়াইয়া আনিতে বাহির হইয়া একশ' গজ পথ যাইতে না যাইতেই নগেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাইয়া দিল।

গাড়ী আস্তেই চলিতেছিল, এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়া আর ঝরণার বাঁ হাতটা একটু মচকাইয়া যাওয়া ছাড়া দুজনের কিছু হইল না।

মোহন বুঝিতে পারিল না এই দুর্ঘটনায় মনে মনে সে কেন খুশী হইয়াছে। ভয়ানক কিছু অনায়াসেই ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই বলিয়া?

দূরে গিয়া জোরে গাড়ী চলার সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া দুজনের মারাত্মক রকম আহত হওয়া, এমন কি মরিয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না।

সেটা ঘটে নাই বলিয়া সে খুশী হইয়াছে?

অথবা ওদের দুজনের বজবজ গিয়া সারাটা দিন কাটাইয়া আসা সম্ভব হইল না বলিয়া?

এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে ছেলের উপর মা আরেক চোট গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন।

বাড়ীর শ'খানেক গজ দূরে অ্যাকসিডেন্ট করিয়া দু'জনে ফিরিয়া আসিলে নগেনের এখানে ওখানে সামান্য ছড়িয়া যাওয়া কাটিয়া যাওয়ার সামান্য রক্তপাত দেখিয়াই একেবারে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া মোহনকে বলিলেন, 'কেন তুই এসব কিনে দিস ওকে? ভাইটাকে মারতে চাস?'

দুর্ঘটনায় নগেন ব্যথার চেয়ে লজ্জা পাইয়াছিল বেশী।

সে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার কিছু হয়নি মা। একটু শুধু কেটে ছড়ে গেছে।'

মোহন গম্ভীর মুখে কঠোর স্বরে বলে, 'তুমি অনেকদিন থেকে মোটর-বাইকের জন্য আবদার করছিলে—জন্মদিনে তাই ওটা প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম। তোমায় মারবার জন্য দিই নি। ওটা আমি ফিরিয়ে নিলাম।'

মচকানো হাতের ব্যথায় ঝরণা কাতরাইতেছিল - তার কাতরানি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

মোহন আরো কঠোর স্বরে বলে, 'এবার থেকে কোন আবদার জানিয়ে

আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমার যা দরকার হবে মার কাছে চাইবে। মা বললে কিনে দেব।

সকলে মুখ কালো করিয়া থাকে।

সত্যই তো।

সকলেই জানে নগেনের একটি মোটর সাইকেলের সাধ অনেকদিনের। বাপের কাছে অনেকবার চাহিয়া পায় নাই। বাপের মৃত্যুর পর মোহন ভাই-এর জন্মদিনে উৎসব করিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভাই-এর পুরাণো সাধটা মিটাইয়াছে।

সে কি তুর্ঘটনার জন্য দায়ী? মার কি উচিত হইয়াছে ও রকম বিশ্রী মন্তব্য করা যে ভাইকে মারিয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যই সে তাকে মোটর সাইকেলটা উপহার দিয়াছে?

ছেলের কাছে মা আরেকবার হারিয়া গেলেন!

ডাক্তার এবং ডাক্তারখানা বাড়ীর প্রায় পাশেই বলা যায়। ডাক্তার আসিয়া ঝরণার মচকানো হাতে ওযুধের প্রলেপ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া এবং তু'জনের কাটা ছড়ায় ওষুধ লাগাইয়া বলিয়া গেলেন, 'খুব অল্পের উপরেই গেছে। আর কিছু করতে হবে না।'

ঝরণাকে বলিলেন, 'তু'একদিন খুব ব্যথা হবে, বাস্।'

ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর ঝরণা আবার কাতরাইতে আরম্ভ করিলে মোহন বলে, 'তোমার নিজেরই দোষ। ছেলেমানুষ নতুন গাড়ীটা পেয়েছে, তোমায় ক্যারিয়ারে চাপিয়ে চালাতে পারে? স্পিডে চলার সময় অ্যাকসিডেণ্ট হলে কি হত বল তো? নগেনের হয়তো আজ প্রাণ যেত!'

বলিয়াই মোহন টের পায় এটা তার কঠোরতা নয়, নিষ্ঠুরতা নয়, স্রেফ গ্রাম্যতা। সামান্য আহত নগেনকে দেখিয়াই মা যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া তার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িতে চাহিয়াছিলেন, ঝরণা ক্যারিয়ারে চাপিয়াছিল বলিয়াই অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়াছে ঘোষণা করিয়া সেও ঠিক এইরকম গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছে!

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়।

বলে, 'যাই, বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকি।'

কী কাতরতা ফুটিয়াছে নগেনের মুখে। লজ্জায় তুঃখে মরিতে চাওয়ার মত।

মাথা হেঁট করিতে চায়, নিজের হাত পা কামড়াইতে চায়। সকলের সামনে সেটা তো করা যায় না। নীরবে ঝরণার মুখের দিকে কাতর চোখে চাহিয়া থাকে।

নিজের মনে একটা লড়াই করিতে করিতে জয় পরাজয় তুচ্ছ করিয়া মোহন বলে, 'তোমার তো বেশী লাগেনি নগেন। ঝরণাকে পৌঁছে দিয়ে এসো না? একটা রিক্‌সা ডেকে দিচ্ছি।'

রাত্রে মোহনের বক্ষলগ্ন হইয়া লাবণ্য যেন নালিশের স্বরে বলে, 'ধন্যি তুমি। কী ভাবে সকলকে খেলালে?'

'খেলালাম?'

বক্ষলগ্ন হয়ে থাকার সময় লাবণ্যের অসীম সাহস দেখা যায়, মোহনের পক্ষে চরম অপমানজনক কথাও সে অনায়াসে যেন খেলার ছলেই বলিয়া যাইতে পারে।

'কি ভাবে মাকে জব্দ করলে! কিভাবে ঝরণা হারামজাদিকে বুঝিয়ে দিলে তোমার ছেলেমানুষ ভাইটির সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না। আবার কি ভাবে ভাইটিকে দিয়েই এক রিক্‌সায় ঝরণাকে—'

মোহন উঠিয়া গিয়া আলো জ্বালে, সোফায় বসিয়া মোটা একটা বই তুলিয়া নিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলে, 'তুমি ঘুমোও। আমি কয়েকটা হিসাব নিকাশের কাজ সেরে শোব।'

লাবণ্যের কান্নার শব্দ শুনিয়া বিলাতে ছাপানো ইংরাজী বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খাটের কাছে গিয়া বলে, 'কেঁদো না। কাঁদলে মারব—তোমার এই ছিঁচকেমি কান্না বন্ধ করে অন্য কান্না কাঁদাব।'

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কান্না থামাইয়া মড়ার মত কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে লাবণ্য। ভাবে, কি তার লাভ হল সহরে বাস করতে এসে?

সাত

শীতের কুয়াশায় সহরে ধোঁয়া মিশিয়া আলোগুলিকে ম্লান করিয়া দেয়। অপরাহ্নে বাতাস যেন একেবারে মরিয়া যায়, ভাসিয়া যাওয়ার বদলে ধোঁয়া অতি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কখনো কুণ্ডলী পাকাইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

চোখ জ্বালা করে, মনে বিষাদ জাগে।

এর চেয়ে অন্ধকার যেন ভাল লাগে। ভোঁতা বিষণ্ণ তার চেয়ে যেমন ভাল লাগে অচেতন মন।

শ্রীপতির মনের বিষাদ কিন্তু কমিয়া গিয়াছে।

একবার সে দেশের গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছে।

দু'দিনের বেশী কদম তাকে তিন দিন থাকিতে দেয় নাই, তাড়া দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে কলিকাতায়!

ক'মাস দুটি পয়সা রোজগার করিয়াই রোজগারের সাধ মিটিয়া গেল নাকি শ্রীপতির? আর ভাল লাগে না? বৌ আর ছেলেমেয়ের পেটে দুটি অন্ন যাইতেছে, অমনি বুঝি শনি ভর করিল কাঁধে?

না, আরামে আলস্যে ঘরে বসিয়া দিন কাটানো চলিবে না শ্রীপতির, ঢিল দিলে চলিবে না। পয়সা রোজগারের যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে পুরোমাত্রায় তার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

কদম নিজেও তো মরিয়া যাইতেছে না, ফুরাইয়া যাইতেছে না! শ্রীপতির হইয়াই সে দেশের ঘরে কষ্ট করিয়া দিন কাটাইবে—সুখের দিনের জন্য।

জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে কদম এই একটা বিষয়ে বার বার তাকে আশ্বাস দিয়াছে—শ্রীপতির কোন ভয় নাই, কদম তারই আছে এবং চিরদিন তারই থাকিবে। কোন পুরুষের সাধ্য নাই কোন প্রলোভনে তাকে ভুলায়। স্বামী বিদেশে পয়সা কামাইতে গেলে তার মান কি করিয়া বজায় রাখিতে হয় কদম তা ভাল করিয়াই জানে।

বলিয়াছে, 'টের পাই না ভেবেছ নাকি? তুমি খালি ডরাচ্ছ—একলা পেয়ে কদমকে কে বিগড়ে দেবে। কদমকে চেনো না তুমি? এতকাল এত কষ্ট সয়ে এলাম না? আজ কদমের জন্য তুমি গেছ পয়সা কামাতে, কদম বিগড়ে যাবে! কেন, কদম মরতে জানে না বুঝি?'

গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছে, 'আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে? সহরে কত ডাইনী থাকে জানি না বুঝি?'

কদম বিদায় করিয়া দিলেও শ্রীপতির মনে কিন্তু দুঃখ হয় নাই। দুদিন কদম তাকে খুব যত্ন করিয়াছে, চুলে তেল দিয়া খোঁপা পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছে তার জন্য। শ্রীপতি সব চেয়ে আরাম বোধ করিয়াছে কদমের জন্য তার ভয় আর সন্দেহ কাটিয়া যাওয়ায়।

মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে তার।

বিকালে স্টেশনে নামিয়াছিল, তখন কিন্তু শ্রীপতি বাড়ী যায় নাই। একটু রাত হইলে চুপি চুপি চোরের মত উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু সন্দেহই কি সে অন্ধকার দেখিতেছিল জগৎ! তারপর ঝনঝনে আওয়াজে প্রশ্ন আসিয়াছিল, 'ক্যারে?'

কদমের নয়, পাড়ার নিতু পিসীর গলা। বয়স চল্লিশের বেশী, কালো মহিষের মত চেহারা। এ পাড়ায় গলা খুলিলে আরেক পাড়ায় শোনা যায়।

হ্যাঁ; শ্রীপতির বাড়ী না থাকার সুযোগে কদমের সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়াছিল গাঁয়ের দু'একটা মুখপোড়া বাঁদর। কদম নিজেই অবশ্য মুখে তাদের নুড়ো জ্বালিয়া দিতে পারত, তবু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিতু পিসীকে সে ডাকিয়া আনিয়াছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিতু পিসী তাকে পাহারা দিতে আসে।

এমনি নয়। আট গণ্ডা পয়সা নেবে মাসে।

না, কদম তেমন নয়। যা-খুশী করবার সুবর্ণ সুযোগ সে কাজে লাগায় না, নিজেই নিজের পাহারা বসায়।

শ্রীপতির বুকে জোর আসে, কাজে আনন্দ হয়, কদমের জন্য আরও বেশী, আরও অনেক বেশী রোজগার করিবার কল্পনা চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়।

এবার সহরে ফিরিবার আগে হইতেই সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কদমকেও সহরে লইয়া আসিবে!

এখনই অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। একটা ঘর ভাড়া করিয়া কদমকে কাছে আনিয়া রাখার খরচ সে কোথায় পাইবে? মোহনের বাড়ীতে থাকে আর খায় বলিয়া নিজের তার একরকম কোন খরচ নাই, কদমকে তাই টাকা পাঠাইতে পারে। ঘর ভাড়া করিয়া নিজের পয়সায় খাইতে হইলে কদমের জন্য কটি পয়সা তার বাঁচিত?

আরো টাকা চাই, অন্ততঃ এখনকার দুগুণ টাকা চাই। রোজগার না বাড়িলে কদমকে সে আনিতে পারিবে না। দিন রাত্রিগুলি তার একা কাটাইতে হইবে। একেবারে একা।

পীতাম্বর আছে, জ্যোতি আছে, মদন আছে, কারখানার কয়েকটি সহকর্মীর

সঙ্গেও তার বেশ খানিকটা খাতির জমিয়াছে। কিন্তু কদম কাছে না থাকিলে কে আছে শ্রীপতির? কদম না থাকিলে কি মানে হয় বন্ধু থাকার! কদম থাকিলে কত ভাল লাগিত সহরে নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা।

সহর আর তেমন বিস্ময় জাগায় না, হাঁ করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি দেখা আর নতুন কাজ শেখা আর তেমন ভাবে আনমনা করিতে পারে না।

চাঁপার ঘরে নেশার ধাঁধা, আর প্রচণ্ড স্ফূর্তির আকর্ষণ ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। জ্যোতি সঙ্গে নিতে চাহিলে বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে। সে বাড়ী না থাকায় কদম ওদিকে বাড়ীতে নিজের পাহারা বসায়। এখানে চাঁপার ঘরে গিয়া সে মজা করিবে? এত কষ্টের পয়সা নষ্ট করিবে?

'না ভাই ভাল লাগে না।'

'ধেৎ! ভাল লাগবে। চ'।'

'নাঃ, পয়সা নেই।'

জ্যোতির সঙ্গে না যাক, একা একদিন চাঁপার কাছে না গিয়া সে কিন্তু থাকিতে পারে না।

কদমের জন্যই যাইতে হয়। দীর্ঘ বিরহের পর কদমের সঙ্গে দুদিনের মিলন এবার তাকে যেন কি করিয়া দিয়াছে, প্রথম যৌবনে বৌকে প্রথম ঘরে আনার প্রথম দিকের রোমাঞ্চকর তেজ, ধৈর্য্যহীন অফুরন্ত আগ্রহ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতের হিসাব নিকাশের কোন জবরদস্তি যেন মানিতে চায় না।

কদমের জন্যই নূতন যৌবনের জোয়ারের মত এই উন্মাদনা।

কিন্তু কদম অনেক দূরে।

আজ নয়, কাল নয়, আগামী মাসে নয়, কে জানে কবে কদমকে কাছে আনা চলিবে!

চাঁপা কাছেই থাকে, যাইবে কি যাইবে না ভাবিতে ভাবিতেও চাঁপার ঘরে গিয়া পৌছানো যায়।

চাঁপা খুশী হইয়া আদর করিয়া বসায়, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, 'একলা কেন গো? সাঙ্গাৎ কই?'

শ্রীপতি ঢোক গিলিয়া আমতা আমতা করিয়া বলে, 'আজকে আমিই এলাম চাঁপা।'

'বটে? সে বুঝি আসবে না?'

চোখের পলকে চাঁপা যেন বদলাইয়া যায়! কোথায় যায় তার এলোমেলো দোলন দোলন নড়াচড়ার ভঙ্গি, কোথায় যায় তার অমায়িক হাসি।

মুখ বাঁকাইয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'একলা এলাম চাঁপা! সাঙ্গাৎ সাথে এনে চেনা করিয়ে দিল, আজকে আমি একলা এলাম চাঁপা! বেরিয়ে যা ঘর থেকে মুখপোড়া বজ্জাত কোথাকার!'

গাল দিতে দিতে জ্যোতির বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে সে দূর করিয়া দেয়।

জ্যোতির সে যেন বিয়ে করা সতীলক্ষ্মী বৌ, শ্রীপতি বাড়ী না থাকিলে গাঁয়ের কেউ ইয়াকি দিতে আসিলে কদম যেমন করে তেমনি করার অধিকার যেন তারও পুরামাত্রায় আছে।

দেহ বেচা যার ব্যবসা তার এটা কোনদেশী নীতিজ্ঞান? কি মানে চাঁপার এই অদ্ভুত ব্যবহারের?

দু'দিন পরে জ্যোতি তার পেটে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়া বলে, 'বেশ, দাদা বেশ, ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছো?'

লজ্জায় শ্রীপতি মাথা তুলিতে পারে না।

জ্যোতির কিন্তু রাগ হয় নাই, সে শুধু আমোদ পাইয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার পরে সে জোর করিয়া শ্রীপতিকে ধরিয়া নিয়া যায়, আলাপ করিয়া দেয় চাঁপার প্রতিবেশিনী দুর্গার সঙ্গে।

চাঁপাও আজ হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলে, সেদিন তার একলা আসার ব্যাপার নিয়া তামাসা পর্য্যন্ত করে!

জ্যোতি জানিত, চাঁপাও বুঝিতে পারিয়াছে যে বন্ধুর সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই—তার ধারণাই ছিল না যে ওভাবে চাঁপার কাছে আসিলে কোন দোষ হয়।

দুর্গা মোটাসোটা শান্ত ভাল মানুষ, চাঁপার মত চপল নয়। বেশভূষা তার দ্বিতীয় বয়সী গৃহস্থ ঘরের বৌ-এর মত, সীঁথিতে সিঁদুর পর্য্যন্ত আছে। তার চেহারায় তার কথায় কাজে আর চালচলনে যেন একটা তেজ আর আত্মমর্য্যাদা-বোধ ধরা পড়ে। ভাঙ্গাচোরা খোলার ঘরে সামান্য উপকরণ নিয়া নোংরা জীবন যাপন করিতে হওয়ায় সে যেন জগৎ-সংসারের উপর রাগ করিয়া গুম খাইয়া আছে।

প্রথম প্রথম শ্রীপতির রীতিমত ভয় করিতে থাকে। কথা না বলিয়া সে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাতি একটু বাড়াইয়া দিয়া দুর্গা জিজ্ঞাসা করে, 'নতুন এয়েছো সহরে, না?'

'না, নতুন কেন। অনেকদিন এয়েছি।'

'কারখানায় কাজ কর না?'

'হাঁ! মস্ত কারখানা।'

'বৌ আছে না?'

'আছে। দেশে।'

দুর্গার মুখে এবার একটু হাসি ফোটে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে শ্রীপতির সব খবর জানিয়া নেয়—সে কত রোজগার করে এই খবৎটা পর্য্যন্ত!

শ্রীপতি বুঝিতে পারে দুর্গা তাকে সরল হৃদয় বোকাসোকা গেঁয়ো লোক বলিয়া ধরিয়া নিয়াই এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—মনে মনে তার একটু রাগও হয়। কিন্তু দুর্গাও এমন সহজ সরল ভাবে প্রশ্ন করে যে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব না দিয়া সে পারে না।

সত্য কথাই যে সব বলে তা নয়। রোজগারের অঙ্কটা বাড়াইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়া বলে। দুর্গা একটু হাসে।

সন্ধ্যা বলিয়াছিল সহরে পাপ বেশী। তর্কের খাতিরে বলিয়াছিল। জগদানন্দ স্বীকার করে নাই। আরেকদিন ওই প্রসঙ্গে জগদানন্দ মোহনকে বলে, 'সহরের বিরুদ্ধে বড় একটা অভিযোগ, সেখানে দুর্নীতি বেশী। খারাপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা ধরে হিসেব করলে তাই মনে হয়। কত বড় স্কেলে কলকাতায় দেহ বেচার ব্যবসা চলে শুনলে আপনি চমকে যাবেন। মনে হবে সহরের একটি লোকেরও বুঝি চরিত্র ঠিক নেই। কিন্তু এই দুর্নীতির প্রথম আর প্রধান কারণ কি জানেন? দারিদ্র্য। সপরিবারে যারা সহরে বাস করতে পারে না তাদের জন্যেই এই কুৎসিত ব্যবসাটা এত বাড়তে পেরেছে। শুধু পেটে খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

মোহনের নবপরিচিত প্রতিবেশী অসীম বলে, 'কোয়াইট রাইট্'।

জগদানন্দ বলে, 'সহুরে যারা থাকে, কুলি মজুর থেকে ভদ্রলোক পর্য্যন্ত, আজ যদি তাদের সপরিবারে সহরে বাস করবার ক্ষমতা হয়, অর্দ্ধেকের বেশী খারাপ স্ত্রীলোক কাল সহর ছেড়ে চলে যাবে।'

অসীম বলে, 'আপনার কথাটা একটু জড়িয়ে যাচ্ছে।'

একটু থামিয়া সে জোর দিয়া বলে, 'একটু ভুল বললেন। ও রকম হলে সহরের অর্দ্ধেক খারাপ স্ত্রীলোক সহর ছেড়ে চলে যাবে—একথাটা ভুলও বটে বলা অন্যায় বটে। মানেটা দাঁড়ায় যে সহরের দুর্নীতির জন্য ওরাই যেন দায়ী! ভাত কাপড়ের উপায় থাকলে ওরাও কি নিজেদের দুর্নীতির শিকার হতে দিত? সহরের সব মানুষের সপরিবারে সচ্ছলভাবে সহরে বাস করার ক্ষমতা হওয়া মানেই তো এখনকার অবস্থাটা একেবারে বদলে যাওয়া। ওরকম অবস্থায় মেয়েদেরও দেহ বিক্রি করার দরকার থাকবে না।'

জগদানন্দ খুশী হইয়া সায় দেয়, বলে, 'খারাপ স্ত্রীলোক আমি ঠিক ওই অর্থে বলিনি। বাধ্য হয়ে খারাপ পেশা নিতে হয়েছে, এই অর্থেই বলেছি। এরকম পেশা নিয়ে সহরের পয়সায় ভাগ বসাবার দরকার হবে না—সহরের একদিন সেরকম অবস্থা আসবে বৈ কি। সহরের নিন্দে করে অনেকেই, তলিয়ে কোন কথাই কেউ তো ভেবে ছ্যাখে না।'

'আপনি সহরকে খুব ভালবাসেন মনে হচ্ছে।'

'তা বাসি। সহর আমার কাছে উন্নতি, প্রগতি, শ্রীবৃদ্ধির প্রতীক। কারো সখে সহর গড়ে ওঠে না, কেবল আরামে থাকা আর মজা লুটবার জন্য সহর নয়। শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি সব কিছুর হেড কোয়ার্টার হল সহর। সহর দেখে দেশকে চেনা যায়, দেশের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।'

অসীম তার শেষ কথাটা স্বীকার করে না।

'অন্য দেশে স্বাধীন দেশে তা হতে পারে, আমাদের এদেশে বোধ হয় সহর দেখে দেশ সম্বন্ধে উল্টো ধারণাই জন্মে। আপনি কি বলতে চান, কলকাতার রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী, পিচঢালা রাস্তা, দামী মোটরগাড়ীর স্রোত, এসব দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে এদেশের লোক কি অবস্থায় দিন কাটায়? কলকাতা দেখে কেউ ভাবতে পারবে কত গরীব এদেশের মানুষ, খেতে পরতে পায় না, লেখাপড়া জানে না, অসুখে ভুগে মরে?'

জগদানন্দ জোর দিয়া বলে, 'নিশ্চয় পারবে। যে কোন দেশ হোক, সহর দেখে দেশের অবস্থা বোঝা যাবেই। জাহাজ থেকে নেমে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠে মার্কেটে একটা চক্র দিয়ে কেউ যদি ভাবে এই কলকাতা সহর, সে অবশ্য পারবে না। সমস্ত সহরটা যে দেখবে তাকে আর বলে দিতে হবে না কিসের মানে কি—

একেবারে যদি অন্ধ আর মূর্খ না হয়। এত বড় সহরের কোন আর কতটুকু অঞ্চল ঝকঝকে, রাজপ্রাসাদ আর চওড়া সুন্দর পরিস্কার রাস্তাগুলি কোথায়, দুদিকের দোকানপাটগুলি কি ধাঁচের, সারি সারি দামী গাড়ী কোথায় পার্ক করছে, দেখলেই আসল ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ব্যবসা বাণিজ্যের সায়েবী অঞ্চলে পাক দিয়ে দেখতে যাবে আরেকটা অঞ্চল—আমাদের বড়বাজার। মাছ তরকারীর বাজারগুলি দেখবে। যারা মোটর চাপে তাদের পাড়া, যারা ট্রামেবাসে চাপে তাদের পাড়া, আর যারা পায়ে হাঁটে তাদের বস্তি ঘুরে ঘুরে দেখবে। কত লোক মোটর চাপে, কতলোক ট্রামেবাসে চাপে, কতলোক পায়ে হাঁটে অনুমান করবে। রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটে, তাদের কতজনের খালি গা, কতজনের গায়ে ছেঁড়া নোংরা জামা লক্ষ্য করবে। সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছে না ম্লান মুখে দুর্ব্বল শরীরটা কোনরকমে বয়ে নিয়ে চলেছে, দেখবে। সহরে কটা হাসপাতাল আছে, খুঁজে বার করবে। আর দেখবে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কি রকম। সহরতলীগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে আসবে। কত লোকের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—ফুটপাতে শুয়ে কত লোক রাত কাটায় দেখে সেটা অনুমান করবে। তারপরেও সে যদি না বুঝতে পারে আমাদের অবস্থা কি রকম—'

'আপনার সঙ্গে তর্ক করা কঠিন।'

মোহন বলে, 'নিন, চা খান, চা জুড়িয়ে গেল।'

অনেক রাত্রে শ্রীপতি গেট খুলিয়া ভিতরে আসিল।

নিজের অপরাধে মনটা তার ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। অনুতাপ নয়, সংস্কার। নিষিদ্ধ কাজ করার অস্বস্তি বোধ।

দুর্গা চাপা হইলে তার এত খারাপ লাগিত না। তিনমাস আগেও দুর্গা স্বামীর সংসারে ঘর কন্না করিতেছিল। বছর দুই আগে সে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতা আসিয়াছিল।

দেশে স্বামীটা তাকে বেশ ভালবাসিত, আদরযত্ন করিত। সহরে আসিয়া দিন দিন যেন কেমন হইয়া যাইতে লাগিল। মদ খায়, জুয়া খেলে, দুর্গাকে মারধোর করে। ঘর ভাড়া বাকী পড়ে, আজ খাওয়া জোটে তো কাল জোটে না। শেষে একদিন দুর্গার গয়না গাঁটি যা কিছু ছিল সব নিয়া কোথায় যে গেল

মানুষটা। স্বামীর একটা বন্ধু ছিল,—অঘোর। সে আসিয়া দুর্গাকে রাখিল এখানে। মাস দুই পরে সেও ভাগিয়াছে।'

'কপালের দোষ তাই মুটিয়ে গেলাম, ছেলেপিলে হল না। ছেলেপিলে হলে তেনার স্বভাব কি বিগড়াত? এরকম মুটকি না হলে কি আরেকজন দু'মাসে মায়া কাটিয়ে ফেলে পালাত?'

দুর্গাকে দেখিয়াই শ্রীপতির ভয় আর সঙ্কোচ জাগিয়াছিল। তার এই গল্প শোনার পর গা যেন তার ছম ছম করিতে লাগিল। এখন দুর্গা অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, তাকে স্পর্শ করিলে আর দোষ হয় না, এই অকাট্য যুক্তিটা সে অবশ্য এখনো মনে মনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তবু তার কেবলি মনে হইতেছে সে যেন একটা মহাপাপ করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল তার জন্যই আজ একটি পরস্ত্রী অসতী হইয়া গেল।

পীতাম্বর ডাকিয়া বলিল, 'কোথায় যাস ছিপতি এত রাতে?'

'আজ্ঞে একটু কাজ ছিল।'

আলো জ্বালিয়া এখনো পীতাম্বর দু'আনা দামের একটি খাতায় হিসাব লিখিতেছে। অনেক রাত করিয়াই বোধ হয় সে ফিরিয়াছে, আজকাল প্রায়ই তার ফিরিয়া আসিতে দশটা এগারটা বাজিয়া যায়।

পীতাম্বরের চালচলন আজকাল রীতিমত রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষটাও সে বদলাইয়া গিয়াছে অনেকখানি। আগে মুখ দেখিলেই মনে হইত সর্ব্বদা সে যেন কি একটা ধাপ্পাবাজির মতলব আঁটিতেছে, প্রার্থনা জানাইয়া ভিক্ষা করিয়া ভাঁওতা দিয়া কারো কাছে কিছু আদায়ের চেষ্টার মত কোন প্যাঁচালো মতলব আঁটিতেছে। আগে তার নিরীহ ভাবটা ছিল তাদের মত, পরের দয়ায় যারা বাঁচিয়া থাকে, এতটুকু অপরাধ করিয়া ফেলার ভয়ে সর্বদা যারা সচকিত।

এখন তার মুখে কোন চিন্তারই ছায়া দেখা যায় না, প্রশান্ত মুখে স্থির দৃষ্টিতে সে জগতের দিকে তাকায়। তার যেন কোন দুঃখ নাই, নালিশ নাই, অভাব নাই। আপনজনদের ফেলিয়া আসিয়া মোহনের এই গ্যারেজের ঘরটিতে আশ্রয় পাইয়া সকাল হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তার যেন সন্তোষের সীমা নাই। অসহায় নম্রতার বদলে গম্ভীর অমায়িকতার সঙ্গে সে ব্যবহার করে। কথা বলে কম, আর কেমন যেন দূরে সরিয়া থাকে। ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলে যেন আরও দূরে সরিয়া যায়।

চেহারা আর বেশভূষাও পীতাম্বর বদলাইয়া ফেলিয়াছে। রীতিমত বাবু সাজিয়া সে বাহিরে যায়।

ঘরে সে ময়লা মোটা কাপড় পরে, ফতুয়া গায় দেয়, প্রাচীন বালাপোষটি গায়ে জড়াইয়া শীত নিবারণ করে, বাহিরে যাওয়ার সময় ফর্সা ধুতির উপর চাপায় ফর্সা সার্ট, তার উপর পরে ভাল কাপড়ের ভাল ছাটের কোট, পায়ে লাগায় পালিশ করা নতুন জুতা।

ঘরে ফিরিয়া সযত্নে জামাকাপড় ভাঁজ করিয়া রাখে, ন্যাকড়া দিয়া জুতার ধুলা সাফ করে। দু'খানা ভাল কাপড়, দুটি সার্ট আর ওই কোটটি তার সম্বল, তবু কখনো তাকে ময়লা জামা কাপড় পরিয়া বাহিরে যাইতে দেখা যায় না। একটি কাপড় আর সার্ট যখন ব্যবহার করে অন্য কাপড় আর সার্টটি তখন লণ্ড্রীতে আর্জ্জেণ্ট হিসাবে ধোয়া হয়।

চেহারায় গ্রাম্যতার ছাপও সে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। আগাগোড়া সমান করিয়া ছাঁটা ছোট চুল নিয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এখন তার চুল বেশ বড় হইয়াছে। স্মার্ট ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়া রোজ সে সযত্নে চিরুণী চালাইয়া টেরি কাটে। ফাজিল ছোকরার বাঁকা টেরি নয়, সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত ভারিক্কি টেরি।

দাড়িও সে কামায়। প্রত্যেকদিন।

নিজেই কামায়। এজন্য সে ভাল একটি ক্ষুরও কিনিয়াছে।

ব্রাহ্মণ বলিয়া তাকে শ্রীপতি আগেও সম্মান করিত কিন্তু সেটা ছিল শুধু তার ব্রাহ্মণত্বটুকুর সম্মান, মানুষটার নয়। আজকাল শ্রীপতি মানুষ হিসাবেও তাকে সম্মান করিতে শুরু করিয়াছে।

আগে দরকার হইলেই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিত কিন্তু তার সামনে, কখনো কখনো তার সঙ্গেও, হাসি তামাসা খোস গল্প করিতে শ্রীপতির বাধিত না। পীতাম্বরকে অবশ্য খোসগল্পে টানা যাইত না, সে ম্লান গম্ভীর মুখে চুপ করিয়াই থাকিত—শ্রীপতি সেটা তেমন গ্রাহ্য করিত না।

আজ শ্রীপতি ঠিক গুরুজনের মতই তাকে মান্য করিয়া চলে, নম্রভাবে সবিনয়ে তার সঙ্গে কথা বলে!

মাঝে মাঝে সে বিস্ময়ভরা চোখে পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া থাকে। অবাক হইয়া ভাবে, কি মানুষটা এই সেদিন গাঁ হইতে সহরে আসিয়াছিল, অল্প সময়ের

মধ্যে সে কি হইয়া গিয়াছে ! চোখের সামনে বদলাইয়া না গেলে হঠাৎ দেখিয়া হয়-তো সে পীতাম্বরকে চিনিতেই পারিত না !

বাড়ীর লোকেও অবাক হইয়া তাকে ত্যাখে, নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে।

লাবণ্য বলে, 'চালাক চতুর মানুষ তো, ফন্দিফিকির করে পয়সা উপায় করছে।

মোহন বলে, 'কিছু কিছু উপায় করছে সেটা বোঝাই যায়—কি ভাবে করছে তাই ভাবছিলাম।'

পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াও এইজন্য মোহন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

সদুপায়ে—পাঁচজনকে অনায়াসে জানানো যায় এমন উপায়ে—পীতাম্বর ইতিমধ্যেই কলিকাতা সহরে পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

জিজ্ঞাসা করিয়া পীতাম্বরকে শুধু বিব্রত করা হইবে—বানাইয়া বানাইয়া কতগুলি লাগসই মিথ্যা বলিতে বাধ্য করা হইবে।

একদিন মোহনের মনে হইল যে পীতাম্বর তার বাড়ীতে থাকে, পীতাম্বরের পয়সা রোজগারের উপায়টা প্রকাশ পাইয়া গেলে তাকে বিব্রত হইতে হইবে না তো ?

পরদিন সকালে পীতাম্বরের বাবু সাজিয়া বাহির হওয়ার সময় সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কাজকর্ম কিছু করছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ, বাবা, করছি কিছু কিছু।'

'কি কাজ ?'

'এই ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি এটা ওটা।'

মোহন আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এটা ওটা বিক্রী করিতে হইলে আগে তো এটা ওটা কিনিতে হয়! সে টাকা পীতাম্বর পাইল কোথায় ? ওর কলিকাতায় আসিবার গাড়ী ভাড়াটা পর্য্যন্ত তাকে দিতে হইয়াছিল।

'কি বিক্রী করেন ?'

'এই সাইকেল, সেলায়ের কল, রেডিও, মোটর গাড়ী—'

'বলেন কি !'

পীতাম্বরকে খুব খুশী মনে হয়। একটু গর্ব্বের সঙ্গেই সে বলে, 'হ্যাঁ, বাবা,

কাল একটা গাড়ী বেচেছি। ধীরেনবাবু একটা গাড়ী কিনবেন শুনলাম কি না, চেনো না ধীরেনবাবুকে ? কাছেই থাকেন, একুশ নম্বর বাড়ীতে। তা খবরটা শুনে মোটরওলার দোকানে গিয়ে বললাম, একজন গাড়ী কিনবে, ঠিকানা বললে আমায় কত দেবে ? ঠিকানা নিয়ে ওরা লোক পাঠিয়ে দিলে, সে হল গিয়ে ওমাসের তেইশ তারিখ। কাল ধীরেনবাবু গাড়ীটা কিনেছেন। আমি ভাবছিলাম মোটরওলারা ঠকাবে বুঝি, তা গিয়ে চাইতেই কুড়িটা টাকা দিয়ে দিলে। কলকাতার লোকেরা বড্ড ভাল বাবা, কেউ কাউকে ঠকায় না।'

'মোটে কুড়ি টাকা দিলে ?'

'ঠিকানা বলার জন্য আর কত দেবে বাবা ? ওই ঢের দিয়েছে। গাড়ীটা বিক্রী করেছে ওদেরি লোক। নিজে যদি কারো কাছে একটা গাড়ী বেচতে পারি—'

মোহন নিজে হইতে সাগ্রহে বলিয়াছিল, 'আমার জানা শোনা কেউ কিনবে শুনলেই আপনাকে জানাব। কুড়ি টাকা নয়, ফুল কমিশন আদায় করে নেবেন কিন্তু। এক কোম্পানী দিতে না চায়, অন্য কোম্পানী দেবে।'

•

যত পারে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পীতাম্বর পরিচয় করে।

মোহনকে সে কোন অনুরোধ করে না, মোহনের যারা পরিচিত তাদের দিয়া চেনা লোকের সংখ্যা বাড়ায়। পরিচিত লোক মোহনের কাছে আসিলে বাড়ীতে থাকিলেও সে সামনে আসে না, অচেনা লোক আসিলে ফর্সা জামা কাপড় পরিয়া গিয়া হাজির হয়, মোহনের সঙ্গে অকারণে দু'চারটি কথা বলে, পারিলে নতুন লোকটির সঙ্গেও বলে।

বেশীক্ষণ থাকে না, মোহনকে বিরক্ত হইবার সময় দেয় না।

দু'একদিনের মধ্যে, তাকে ভুলিয়া যাওয়ার সময় পাওয়ার আগেই, সে নতুন লোকটির বাড়ীতে যায়, বলে, 'মনমোহনবাবুর বাড়ীতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওখানেই থাকি আমি। এক গাঁয়ে বাড়ী আমাদের, সম্পর্ক কিছুই নেই, তবে মোহন আমায় কাকা বলে ডাকে!'

তারপর আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিলে নিজেরই তোলা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে বলে, 'খাঁটি কথা, ঠিক বলেছেন! ব্যবসা ছাড়া পয়সা নেই। ওই মতলবেই এসেছি কলকাতায়, একটা কিছুতে নেমে পড়ব। তা আমরা হলাম অজ্ঞ গেঁয়ো লোক, আপনাদের বুদ্ধি পরামর্শ সাহায্য না পেলে—'

অনেকে সন্দেহ করে, প্রথমেই সতর্ক হইয়া যায়, স্পষ্টই তাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম পীতাম্বরের মনে লাগিত, এখন আর লাগে না। প্রথম প্রথম সে কিছু কিছু মিথ্যা বলিত, বাহাদুরী করিত, চাল দিত, কত যে চেষ্টা করিত মানুষের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জ্জনের জন্য। এখন ওসব সস্তা চালাকি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে যে এত পাকা ধাপ্পাবাজ সহরে আছে, এত রকমের ছলনা চাতুরী ধাপ্পাবাজির সঙ্গে সহরের লোকের পরিচয় যে তার গ্রাম্য বুদ্ধি দিয়া সহরের লোককে ভাঁওতা দিবার সাধ্য তার নাই।

তাই সে নূতন নীতি গ্রহণ করিরাছে।

সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, নিজের সম্বন্ধে নিজের যা ধারণা তাই প্রকাশ করে, অন্য কিছু বলিয়া প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করে না যে সে একজন চালাক চতুর কাজের লোক। আর আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করে যে মিথ্যা আর চালবাজী বাদ দেওয়ার পর কারো সন্দেহ অবিশ্বাস এবং অপমান করা এতটুকু ব্যথা দিতে পাবে না, অল্প সময়ে বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায় বেশী লোকের!

কেন এমন হয় পীতাম্বর অবশ্য বুঝিতে পারে না।

হিসাব করা বানানো কথা বলিতে গেলে যে শব্দের অর্থ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, অপরিচিত তার সম্পর্কে অনুভব-করা পরিচয়ের সঙ্গে তার বলিয়া দেওয়া পরিচয়ের বিরোধ যে তার সম্পর্কে বিশ্বাস ও ভাল ধারণা সৃষ্টিতে ক্ষতি করে, এসব বুঝিবার মত বুদ্ধি পীতাম্বরের নাই।

শুধু অভিজ্ঞতা তাকে বলিয়া দেয় যে সহজ সরলতায় কাজ দেয় বেশী। সহজ বুদ্ধিতে আরও একটা কথা সে বুঝিতে পারে, কারো কাছে টাকা ধার চাওয়া চলিবে না, অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলিবে না।

সে দয়া চায়, অনুগ্রহ চায়, নিজের দুঃখ ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী বলিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া কিছু আদায় করিতে চায়, এ ধারণা সৃষ্টি হইতে দিলে চলিবে না।

ওটা ভিক্ষা করারই রকম ফের। ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ কথাটা পীতাম্বরের অজানা নয়!

মানুষ জিনিস কেনে,' তার মধ্যস্থতায় মানুষ সেই জিনিসগুলি কিনিবে, শুধু এইটুকু তার দরকার। এর বেশী সামান্য কিছু চাহিতে গেলেই তার ক্ষতি হইবে।

একটু বিশ্বাস আর সহানুভূতি মানুষের মধ্যে জাগাইতে পারিলেই এই সাহায্যটুকু সে অনায়াসেই পাইবে।

পাইবে কেন, পাইতেছে।

মানুষ বড় ভাল, বড় উদার।

বাড়াবাড়ি করিলে, গায়ের উপর গিয়া পড়িলে, মানুষ বিরক্ত হয়, রাগ করে। অন্যায় দাবী নিয়া উপস্থিত হইলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যার যতটুকু প্রাপ্য কেউ তা ফাঁকি দেয় না। তাই যদি দিত, চাহিয়া পাওয়ার বদলে টাকা কি সে উপার্জ্জন করিতে পারিত কোনদিন? উপার্জ্জন বাড়ানোর কল্পনা করা চলিত?

একটি মোটর গাড়ী বিক্রী করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারিত ভবিষ্যতে মোহনের মত নিজের মোটর গাড়ী চাপার?

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা টনটন করে, অনেক দূর হইতে আশ্রয়ে ফিরিবার সময় কি যে লোভ হয় ট্রামে বা বাসে উঠিয়া বসিবার!

কিন্তু তখন পীতাম্বরের আপনজনকে মনে পড়ার সময়। সারাদিন কারো কথা তার মনে থাকে না, খাতা দেখিয়া দেখিয়া এক ঠিকানা হইতে সে শুধু আর এক ঠিকানায় যায়, কে কি কিনিবে আর কে কতটুকু লাভের ভাগ দিবে তাই শুধু সে ভাবে।

খাতাটি পকেটে ভরিয়া মোহনের বাড়ীর দিকে পা বাড়ানো মাত্র সহরের মানুষের দখল একেবারে শেষ হইয়া যায়, গ্রাম আর গ্রামের আপন জনেরা সকলে মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে, মনের আড়ালে গৃহিণী আর ছেলেমেয়েরা যেন এই সুযোগের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে।

ট্রামে বা বাসে পীতাম্বরের তাই আর চাপা হয় না।

গ্রামে অকর্ম্মণ্য পীতাম্বরের কাছে ওদের জন্যই একটি পয়সার দাম ছিল অনেক, এখানেও তাই আছে।

মোহনের বাবার ছিল অনেক টাকা। সে পাঁচ সাত শ' টাকার সওদা করিতে সহরে আসিত। সহরের পথে হাঁটিয়া বেড়ানোটা ছিল তার সখ, ট্রাম বাসের খরচ বাঁচানোর প্রয়োজনে নয়।

ভাবিতে ভাবিতে আলোকিত সহরের পথেই পীতাম্বর হাঁটে, গাড়ী ঘোড়া

বাঁচাইয়া চলে, মনে মনে একেবারে গ্রামে চলিয়া গিয়া ভুলিয়া যায় না সে কোথায় আছে। অতটা ভাবপ্রবণতা পীতাম্বরের নাই।

মন তার কেমন করে না, চোখের জল আসে না। কেবল দেশের ওদের কথা ভাবিতে তার ভাল লাগে। দেখিতে ইচ্ছা হয়, কাছে পাইতে সাধ জাগে।

কারো সে চাকর নয়, তবু একদিনের জন্য ছুটি তার নাই, সাধ হইলেও দেশে ওদের দেখিতে গেলে তার চলিবে না, একথা মনে হইলে তার কেমন একটা দুর্বোধ্য ভয় হয়, নিজেকে ধরিবার জন্য অনেক কষ্টে অনেক যত্নে নিজেই জাল পাতিতেছে—এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণায় সময় সময় মনে মনে কিছুক্ষণ ছটফট করার মত কষ্ট পায়।

পয়সার লোভ কি একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে তাকে ?

তখন সে প্রাণপণ চেষ্টায় আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া ভাবিবার চেষ্টা করে, আহা, কেমন চাঁদ উঠিয়াছে ভাখো। মেয়েটা আসিয়া ফুটফুটে একটি ছেলে প্রসব করিয়াছিল। আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলিয়া নাতির কপালে টিপ দিতে পারিলে মন্দ হইত না!

পীতাম্বরের কাছে শ্রীপতি পরামর্শ চাহিলে সে মাথা নাড়ে।

'না বাবু আমি কোন পরামর্শ দিতে পারবো না। আমাকে কে পরামর্শ দেয় ঠিক নেই।'

শ্রীপতি বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করে, পীতাম্বর তার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

কারো দিকেই পীতাম্বর তাকায় না, কারো জীবনের সুখ-দুঃখ আশা নিরাশা ছোট বড় সমস্যা সম্বন্ধে তার এতটুকু আগ্রহ নাই।

নিজের কথা ছাড়া কারো কথা সে ভাবে না।

জগতে আরো যে মানুষ আছে সে ছাড়া, শুধু এইটুকু সে জানে, আর কিছু জানিতে চায় না। তারা সকলেই ভাল মানুষ তাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ, এইটুকু তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কারো কান্না তার বুকে বাজে না, কারো হাসি তাকে খুশী করে না।

একটি মানুষের উপর এতটুকু হিংসা বা বিদ্বেষ পর্য্যন্ত তার নাই, স্বার্থপরতা তাকে এমন উদাসীন করিয়াছে।

লাবণ্য একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। এক বাড়ীতে থাকিয়াও এক মাসের উপর লাবণ্যকে সে চোখেও ছাখে নাই। লাবণ্য নিজেই তাকে ডাকিয়া না পাঠাইলে আরও কয়েক মাসের মধ্যে হয় তো একটিবার তার মনেও পড়িত না যে এ বাড়ীতে লাবণ্য বলিয়া কেহ আছে।

লাবণ্য তাকে খাতির করিয়া বসিতে বলে। তারই জন্য যে চেয়ারটা আগেই এ ঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই চেয়ারে বসিতে বলে।

এবং পীতাম্বরও দ্বিধামাত্র না করিযা ধীরে সুস্থে সেই চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ্ মা ?'

'সহরে এসে শরীরটা টিঁকছে না।'

পীতাম্বর চুপ করিয়া থাকে।

তারপর লাবণ্য তাকে ডাকিয়া আনিয়া খাতির করিয়া ঘরে বসানোর আসল কথাটা বলে।

'আপনি তো টোটকা জানেন অনেক রকম, অনেককে সারিয়ে দিয়েছেন। আমায় দিন না একটা কিছু ?'

জোরালো চিকিৎসা আরম্ভ করার পর লাবণ্যের অসুখ বাড়িয়াছে। কদিন বিছানায় পড়িয়া থাকে সে হিসাবের বদলে এখন সে হিসাব রাখে কদিন সে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়।

আরেকটু সে রোগা আর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তবু তাতেই যেন লাবণ্য তার বাড়িয়া গিয়াছে। গীতিকাব্যের ছাঁকা অনুভূতির প্রলেপ যেন পড়িয়াছে তার রূপে, দেখিলে আরও মৃদু আরো মোলায়েম প্রত্যানুভূতি জাগে।

এ ধরনের নিস্প্রভ মায়াবোধ্য রূপ দেখার চোখ অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতি যাদের আছে তারা বিশেষভাবে লাবণ্যকে আজ কাল ছাখে, নিশ্বাসের ঘষায় লাবণ্যের নাকের আর ঠোঁটের ছাল উঠিয়া যাইবে ভাবিয়া শঙ্কিত হয় এবং এমন একটা উপভোগ্য মমতা জাগে বৌটির জন্য প্রত্যেক সহৃদয় মানুষের যার স্বাদ অনেকটা প্রেমের মত।

পীতাম্বর কিছুই অনুভব করে না, লাবণ্যের অস্তিত্ব তার কাছে হৃদয়ের স্বাদ গন্ধহীন হইয়া থাকে। মোহনের রুগ্না বৌটির জন্য সে কিছুমাত্র মমতা অনুভব করে না।

'টোটকা ওষুধ চাইছ? দেব বৌমা, তোমায় ভাল ওষুধ দেব। তা, অসুখটা কি তোমার?'

লাবণ্য চোখ বড় করিয়া তাকায়। তার অসুখের খবর রাখে না এমন মানুষও যে জগতে আছে এ কথা বিশ্বাস করিতেও তার কষ্ট হয়। আর এ লোকটা এতদিন এক বাড়ীতে আছে, বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়া এত সমারোহ করিয়া তার চিকিৎসা হইল, আজ ও জিজ্ঞাসা করিতেছে তার কি অসুখ!

'এমনি অসুখ।'

'এমনি অসুখ? আচ্ছা, ওষুধ দেব। কিন্তু আমার ওষুধে তো ভাল ফল হয় না বৌমা?'

পীতাম্বরকে ডাকিয়া পাঠানোর আগে তারই মুখে শোনা তার নিজের টোটকার গুণ-গান লাবণ্যের মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গ্রামের বাড়ীতে আশ্রিতা একজনের ছোট একটি ছেলেকে ওষুধ দিতে আসিয়া তার ওষুধের গুণ গাহিতে এতসব বড় বড় বিশেষণ সে উচ্চারণ করিয়াছিল যে শুনিয়া তখন লাবণ্য হাসি চাপিতে পারে নাই। আজ সেই কথাগুলি মনে করিয়া হাসি পাওয়ার বদলে আশায় সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

পীতাম্বরের মুখে উল্টো কথা শুনিয়া সে রাগিয়া গেল।

'যান তবে আপনি, যান।'

'পীতাম্বর চলিয়া যাওয়া মাত্র সে মোহনকে ডাকিয়া পাঠাইল।

'পীতাম্বরকে যেতে বলো এ বাড়ী থেকে।'

'কেন? কি করেছে পীতাম্বর?'

'আমি ডেকেছিলাম, টোটকা ওষুধ কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে। মুখের ওপর এমন কাটাকাটা জবাব দিলে! ওই যেন বাড়ীর কর্ত্তা।'

'ওকে তুমি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন টোটকা ওষুধের কথা?'

'তুমি তার কি বুঝবে। আমার যন্ত্রণা বুঝি আমি।'

বলিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে লাগিল সে আত্মমমতায় স্বামীর উপর অকারণ অভিমানে, মুখে কিন্তু বলিতে লাগিল, 'অনেককাল তো আছে, এবার ওকে বলে দাও, নিজের ব্যবস্থা করে নিক। এখানে আর জায়গা হবে না। ওকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

মোহন চিন্তিত হইয়া বলিল, 'এতো মহা মুস্কিলে ফেললে। গ্যারেজের এক

কোণে পড়ে আছে, দু'বেলা শুধু দুটি খায়, কি বলে ওকে আমি তাড়িয়ে দেব ? সেটা কি উচিত হবে ?'

লাবণ্য তা জানে না। হঠাৎ তার মনে একটা ভাসা ভাসা সন্দেহ জাগিয়াছে, ওই লোকটার জন্যই তার অসুখ বুঝি সারিতেছে না, আরও বেশী ভুগিতেছে। পীতাম্বর যে মোহনদের নির্ব্বংশ হইবার শাপ দিত, গ্রামে থাকিতে এ কথাও লাবণ্যের কানে গিয়াছিল। মোহনের এক বুড়ী পিসী তাকে এমন কথাও বলিয়াছিল যে পীতাম্বরের শাপেই তার ছেলেপুলে হইতেছে না—তাকে সন্তুষ্ট করিয়া সে যাতে অভিশাপ ফিরাইয়া নিয়া তাকে আশীর্ব্বাদ করে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

মনে তখন জোর ছিল,—কলেজে পড়া, ইংরাজি সাহিত্য পড়া মনে। গ্রাম্য কুসংস্কার তুচ্ছ করিবার জন্য মোহনের তাগিদও ছিল কড়া। বুড়ী পিসীর কথাটাকে সে আমল দেয় নাই।

আজ মনে হয় অসম্ভব কি ? অসুখ তার মিথ্যা নয় কিন্তু পীতাম্বরের জন্যই হয় তো তার অসুখ হইয়াছে। অসুখের জন্য অসুখ নয়, তার যাতে ছেলেপিলে না হয়, মোহন যাতে নির্ব্বংশ হয়, সেই জন্যই অসুখ। মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক্ কিসব খাটাইতেছে লোকটা কে জানে। লাবণ্য ওসব বিশ্বাস করে না, অত কুসংস্কার তার নাই, কিন্তু যদিই বা কিছু সত্য থাকে ও সমস্তের মধ্যে ? তারা বোঝে না এমন কিছু যদি থাকে ?

'গ্রামে থাকতে আমাদের খালি শাপ দিত মনে নেই তোমার ? আমাদের সর্ব্বনাশ হোক তাই শুধু ও চায়। খারাপ মতলব না থাকলে সঙ্গে এল কেন আমাদের ?—আমাদের চোখের আড়াল করবে না। গ্রামের লোকেরা বলত শোননি ওর অনেক রকম বিদ্যা জানা আছে ? আমাদের ওপর কিছু খাটাবে বলে সঙ্গে এসেছে। নইলে আমায় ওষুধ দেবে না কেন বল ? এদিকে আমাদের খারাপ করার জন্য ক্রিয়াট্রিয়া করছে, আমায় ভাল ওষুধ দিলে দুটো শক্তিতে বিরোধ বাধবে বলে তো ?'

লাবণ্যের কথা শুনিতে শুনিতে মোহন আমোদ পায় না, অবজ্ঞার সীমা থাকে না তার। অশিক্ষিতা গেঁয়ো মেয়ে হইলেও কথা ছিল, লাবণ্য বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তার তিনটি ভাই বৈজ্ঞানিক, একজন প্রায় বিখ্যাত। মফস্বলের সহর হইলেও তার বাপের বাড়ী বড় সহরে—একটা ভাল কলেজ আছে,

কলকারখানা আছে। বিয়ের পর তার দেশের বাড়ীতে ক'বছর থাকার সময় কি লাবণ্য এসব ধারণা সঞ্চয় করিয়াছে?

সেখানে অবশ্য অনেক দিন এমন অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছে, পীতাম্বরের অলৌকিক ক্ষমতায় যারা চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করে। পরিবেশের প্রভাবও বোধ হয় মেয়েদের উপরেই কাজ করে বেশী।

সন্ধ্যার পর হাঁটিতে হাঁটিতে সে জগদানন্দের বাড়ী গেল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক বিশ্বাস করেন? টোটকা?'

'আপনি করেন না?'

মোহন নীরবে একটু হাসিল।

'কেন করেন না? অসম্ভব মনে হয় বলে? নাকের কাছে ক্লোরোফর্ম্ম ধরলে জ্যান্ত মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, গাঁজা আপিমের ধোঁয়া গিলে স্বপ্ন দেখা যায়, এমন তো লতাপাতা ওষুধপত্র থাকতে পারে যা খাওয়ালে বা পুড়িয়ে ধোঁয়া নাকে দিলে বিশেষ রকমের মোহ জাগতে পারে মানুষের? একটা বশীকরণের গল্প শুনেছিলাম। ঠিক কোন দিকে বাতাস বইছে হিসেব করে একজন মাঝরাত্রে গ্রামের ধারে ফাঁকা মাঠে আগুন জালিয়ে লতাপাতা পোড়াতে লাগল, আধ মাইল দূরের এক বাড়ী থেকে একটি বৌ ঘণ্টাখানেক পরে হাজির হল সেখানে। এটা হয়তো গল্প, কিন্তু সম্ভবপর গল্প তো? ঘটনাটা অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু বাতাসে গন্ধ উড়ে গিয়ে বৌটাকে মোহগ্রস্ত করে টেনে আনতে পারে, ঘুমের মধ্যে গন্ধটা তার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এটা খুব অসাধারণ হলেও অসম্ভব নয়।'

'গাঁয়ে কি বৌ ছিল একটি?'

'তা ছিল না। বৌটির শারীরিক মানসিক বৈশিষ্ট্য হিসাব করে হয়তো লতাপাতা বেছে নেওয়া হয়েছিল।'

'ওসব শুধু কল্পনায় সম্ভব। ঘটতে পারে এইটুকু বলা যায়, কখনো ঘটে না। দ্রব্যগুণে তবু কতকটা বিশ্বাস করা চলে, মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক—'

'তাতেও বিশ্বাস করা চলে। গানের সুর মনে কাজ করে। দূরে বাঁশী বাজছে, শুনে মনটা কেমন করতে লাগল। খুব কাছে গিয়ে শুনলে হয়তো বেসুরা আওয়াজে বিরক্তি বোধ হবে, কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসছে বলে কোন কারণে

ক্রিয়াটা হচ্ছে অন্যরকম। তা এমন মন্ত্র তো থাকতে পারে কানে এসে লাগলেও শব্দটা ধরা যায় না, মনে কাজ হয়?'

'ওসব অনেক শুনেছি জগৎবাবু। এসব বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্ক কখনো শেষ হয় না, তর্কই থেকে যায়। আমার একটা কথার জবাব দিন তো। আমি বিশ্বাস করি না, তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম, সমস্তই সম্ভব। কিন্তু যার তার পক্ষে কি সম্ভব? গানের কথা বললেন, গান শিখতেই মানুষকে কতকাল সাধনা করতে হয়। ওসব মন্ত্রতন্ত্র শেখা নিশ্চয় আরও কঠিন? কিন্তু আপনি দেখবেন, যারা ওসব জানে বলে লোকে বিশ্বাস করে তারা অধিকাংশই অপদার্থ, হামবাগ।'

জগদানন্দ মাথা নাড়ে।

'আপনার ষ্ট্যাণ্ডার্ডে হয় তো তাই, আসলে হয়তো তারা উঁচুস্তরের মানুষ। স্তরটা ভিন্ন বলেই ওদের হয় তো হামবাগ মনে করি। আপনার লজিকটা এক পেশে, সব দিক বিবেচনা করছেন না। আপনি ভাবছেন অপদার্থ কিন্তু তুকতাক খাটাবার বিশেষ ক্ষমতার জন্য হয় তো ওই রকম হতে হয়। আপনার আমার মত মানুষ হলে ওই বিশেষ প্রতিভা থাকে না। ফুটপাতে ফোঁটা তিলক কাটা জ্যোতিষী দেখলেই আপনার গা জ্বালা করে, আমার করে না। আপনি ভাবেন ওরা ভণ্ড, লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে, আমি তাও ভাবি না। আপনার মাপকাঠিতে বিচার করলে হয়তো সত্যসত্যই এক নম্বরের ভণ্ড, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, আমি ওই মাপকাঠিটাই মানি না। ওদের ওই ভণ্ডামিই হয়তো সত্য, আমরা যে সদা সত্যকথা বলি সেটাই হয়তো মিথ্যা। ওরা যে বিদ্যার ভাণ করে সে বিদ্যাটা হয়তো জানে না, কিন্তু বিদ্যাটায় বিশ্বাস করে। আমরা কিছু বিশ্বাস করি না, লোকে মিথ্যাবাদী বলবে ভয়ে সত্য কথা বলি, চল্‌তি সত্য কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতের অমিল লক্ষ্য করেছেন, কত বিষয়ে কতরকম অমিল? ওটা হল অবিশ্বাসের প্রমাণ। আমরা চোখ খুলে জানবার চেষ্টা করছি এবং বিশ্বাস অন্ধ এই অজুহাতে আমরা বিশ্বাস ত্যাগ করেছি। যন্ত্রের মত আমরা অবিশ্বাস করে যাই। বিশ্বাসী ভণ্ডরা যদি নেগেটিভ অপদার্থ, নেগেটিভ হামবাগ হয়, আমরা পজিটিভ অপদার্থ, পজিটিভ হামবাগ।'

মোহন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করে, 'আপনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন?'

জগদানন্দ মৃদু হাসিয়া বলে, 'না। আমিও তাই ভাবছিলাম—আমার কথা শুনে আপনি হয় তো মনে করছেন আমি অলৌকিকে বিশ্বাসী। আমি এতক্ষণ বললাম আমাদের একপেশে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের এখানকার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে যা অসম্ভব মনে হয়, তাই আমরা অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিই। একটা ব্যাপার কেন ঘটে কিভাবে ঘটে জানি না বলেই কি সেটা অলৌকিক হয়ে যাবে, ভুতুড়ে ব্যাপার বলে বাতিল হয়ে যাবে? একদিন হয় তো জানা যাবে ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত কিছু নয়, বাস্তব নিয়মেই ঘটে থাকে।'

কিন্তু বিজ্ঞানকে ডিঙ্গিয়ে কোন মাপকাঠিতে তবে বিচার করব? বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে কোন যুক্তিতে সেটা সম্ভব ভাবব?

'আপনি আমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছেন না। আমি বিজ্ঞানকে ডিঙ্গিয়ে যেতে বলিনি। বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে সেটা সম্ভব বলে মানতে হবে বৈকি! কিন্তু বিজ্ঞান আন্দাজে কোন কিছুকে অসম্ভব বলে না, কেন অসম্ভব তার অকাট্য বাস্তব ব্যাখ্যাও দেয়। কিন্তু আজও বিজ্ঞানের অনেক কিছু অজানা আছে—আজও নানা আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে। আজও বিজ্ঞান যা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না সেটাকেই আমরা অলৌকিক অবাস্তব ভাবব কেন? জগতে সবই যখন বাস্তব, চিন্তায় অবাস্তবের অলৌকিকের ফাঁকি থাকবে কেন? ম্যাজিক দেখে তো আমরা ভাবি না অলৌকিক কিছু ঘটেছে। বাস্তব জগতে দুর্বোধ্য কিছু ঘটলে হয় ভাবব অলৌকিক, নয় একেবারে উড়িয়ে দেব।'

মোহন বিব্রত বোধ করে। জগদানন্দ ঠিক গুরুর মতই কথা বলিতেছে।

জগদানন্দ তার মুখের ভাব দেখিয়া নিজের মুখে হাসি ফুটাইয়া বলে, 'তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের কথা বাদ দিন না। ভালবাসার কথাই ধরুন। বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না ভালবাসাটা ঠিক কি ব্যাপার। বিজ্ঞান বলছে প্রেম কবির ফাঁকা কল্পনা নয়, মানুষের প্রেম বাস্তব ব্যাপার। পশুপাখীর যৌন ব্যাপারের মতই মানুষেরও যৌন ব্যাপার—নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করা আর বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাওয়া। মানুষের যৌন ব্যাপারে আরেকটা বাড়তি বাস্তব ব্যাপার আছে—প্রেম। কাব্যে সাহিত্যে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ও রঙ দিয়ে এই বাস্তব রহস্যটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়ে আসছে। ফেনা আর রঙটা ব্যাখ্যা করে বাতিল করে যৌন বিজ্ঞান প্রেমের মানে বোঝাতে চেয়ে পারেনি। শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যৌন বিজ্ঞান, প্রেমের এদিক ওদিক সেদিকটা বুঝিয়েছে, প্রেমকে বোঝাতে পারেনি।'

'বিজ্ঞান প্রেমকে বাস্তব ব্যাপার বলে নাকি?'

'বলে বৈকি। কাব্য সাহিত্যে প্রেমের ভাববাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়। বিজ্ঞান বলে, দেহ আর মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া প্রক্রিয়া হল প্রেম। ওটা কেন আর কি ভাবে ঘটে বিজ্ঞান সঠিক বলতে পারে না। আজ পারে না, একদিন নিশ্চয় পারবে।'

রাত্রে ইজিচেয়ারে চিৎ হইয়া মোহন একটি বিলেতী ম্যাগাজিনে গল্প পড়িতেছে, গল্পটির শেষে পাওয়া গেল একজন বিখ্যাত যাদুকরের সচিত্র প্রবন্ধ।

কয়েকটি অলৌকিক অবিশ্বাস্য পুরাণো ম্যাজিক কিভাবে দেখানো হয় তার সাধারণ বোধগম্য লৌকিক ব্যাখ্যা ও বিবরণ আছে। একজন পৃথিবী বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক সম্পর্কে একটি গল্পও আছে।

অনেক দিন আগে নিজের বোনের সহযোগিতায় যাদুকর একটি অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাইয়াছিলেন, দার্শনিক উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেই খেলাটি দেখিতে দেখিতে বার বার দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল, তিনজন মহিলা মূর্ছা গিয়াছিলেন।

ম্যাজিক দেখানোর শেষে যাদুকর বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁর খেলায় অলৌকিক কিছুই নাই, আগাগোড়া সবটাই কৌশল। কিন্তু খেলাটি শেষ হওয়া মাত্র দার্শনিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত তুলিয়া প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের চুপ করাইয়া আবেগ কম্পিতকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, যাদুকর যাই বলুন তিনি বিশ্বাস করেন না অলৌকিক শক্তির সাহায্য ছাড়া এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে। যাদুকরের ভগিনীর নিশ্চয় কোন অজ্ঞাত অশরীরী ক্ষমতা আছে।

ব্যবসার খাতিরে সেদিন যাদুকরকে চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে সেই ম্যাজিকের ফাঁকিটা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বাস? ম্যাজিকের ফাঁকি তুচ্ছ হইয়া যায়, প্রেক্ষাগৃহে দার্শনিকের কাল্পনিক মূর্ত্তি আর শত শত দর্শকের মুখ ফিরাইয়া তার কথা শুনিতে শুনিতে রোমাঞ্চ অনুভব করার দৃশ্যই মোহনের কল্পনায় জাগিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের কথাই কি জগদানন্দ বলিয়াছিল? ভুল হইলেও যা বিশ্বাসের জোরে ঠিক, মিথ্যা হইলেও যা বিশ্বাসের জোরে সত্য, যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধেও যা টিকিতে পারে?

লাবণ্য কি সত্যই বিশ্বাস করে পীতাম্বরের জন্য তার অসুখ সারিতেছে না, বাড়িতেছে?

কি সঙ্কীর্ণ মন লাবণ্যের! জগদানন্দের মতে হয়তো অন্ধ অবিশ্বাসের চেয়ে কুসংস্কারের এই বিশ্বাসও ভাল। মোহনের মনটা খুঁত খুঁত করে। সৎ উদাত্ত অন্ধ বিশ্বাস হইলেও কথা ছিল, নিজের ভাল মন্দের হিসাবে ভীরুমনের এই হীন স্বার্থপর বিশ্বাস!

চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া লাবণ্য তার কপালে হাত রাখে।

'একলাটি ভাল লাগছে না।'

'উঠে এলে যে?'

'উঠব না? খালি শুয়ে থাকব?'

লাবণ্যের এ ভাবটা মোহনের জানা। তার হাল্কা ছেলেমানুষী ভাব আসিয়াছে। এখন হাসিও যত সহজ, কান্নাও তেমনি। তবে এ অবস্থায় রাগ আর বিরক্তির ঝাঁঝটা তার থাকে না।

'পীতাম্বরকে কাল যেতে বলব লাবু।'

পীতাম্বরের কথা লাবণ্যের মনেও ছিল না। মোহন না বলিলে আর হয়তো সে তাকে তাড়ানোর কথা কোনদিন বলিত না।

'থাকগে কাজ নেই। এতলোক তোমার ঘাড়ে খাচ্ছে, ওকে তাড়িয়ে আর কি হবে!'

অবাক হওয়ার উপায় নাই। একরাশি দিনরাত্রি লাবণ্যের সঙ্গে কাটিয়াছে। জানিতে কি আর বাকী আছে যে এমনিভাবে বদলানোই তার প্রকৃতি?

মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক খাটাইয়া পীতাম্বর তাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে ভাবিয়া লাবণ্য যখন গেঁয়ো মেয়ের মত লোকটাকে তাড়াইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল তখন হয় তো তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে এই লাবণ্যই আবার আধা সহুরে কলেজে পড়া মেয়ের মত গ্রাম্যভাবের ঝোঁকটা কাটাইয়া উঠিয়া ওই পীতাম্বরের টোটকা ওষুধের লোভ এবং তার মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের ভয় তুচ্ছ করিয়া উদারভাবে লোকটাকে ক্ষমা করিবে।

চিরদিন এমনি করিয়া আসিয়াছে।

শুধু এই ব্যাপারে নয়। অনেক ব্যাপারে।

পীতাম্বরকে তাড়ানোর প্রশ্ন যেন চুকিয়া গিয়াছে এমনিভাবে লাবণ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা মা যে বলে ছেলেপিলে হলে আমি সেরে যাব, তাকি সত্যি?'

'অনেকের সেরে যায় শুনেছি। যেতে বলব না পীতাম্বরকে?'

লাবণ্য ইতস্ততঃ করিয়া বলে, 'থাক এখন।'

কিন্তু মোহন এখন ভাবে, কাজ কি? লাবণ্যের মনে যখন একবার ওরকম খুঁত খুঁতানি আসিয়াছিল, কি দরকার পীতাম্বরকে বাড়ীতে রাখিয়া? আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, চিরদিন ওকে আশ্রয় দানের প্রতিজ্ঞাও সে করে নাই। ওকে এবার যাইতে বলাই ভাল।

মনে মনে হয়তো লোকটা সত্যই তার সর্ব্বনাশ কামনা করে। গ্রামে সে মুখেও তাই বলিয়া বেড়াইত, অনেকের কাছেই মোহন শুনিয়াছে। ওকে আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।

না, লাবণ্যের খাপছাড়া ধারণায় সে বিশ্বাস করে না। ক্রিয়াকলাপ তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কেউ কারো ক্ষতি করিতে পাবে, তাও পীতাম্বরের মত লোক, এই হাস্যকর ধারণায় মোহন কখনো ভয় পাইতে পারে?

তবু, কাজ নাই তার লোকটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়া। এ জগতে কিসে কি হয় কে তা বলিতে পারে?

ভোরবেলাই মা কিন্তু তাকে আবার ধাঁধায় ফেলিয়া দিলেন।

পীতাম্বরকে তাড়াইবার সঙ্কল্পে ঢিল পড়িয়া গেল, পীতাম্বর রীতিমতএকটা সমস্যা হইয়া উঠিল তার চেতনায়!

মোহন ভোরের চা খাইতেছিল—আবছা ভোরে শুধু এক কাপ চা। ছেলেবেলা হইতে বাবা চিরদিন ডাকিয়া তুলিতেন রাত্রির আঁধার ম্লান হইতে শুরু করা মাত্র। গ্রামের সংসারের একাংশ সহরে আনিয়া বাসা বাঁধিয়া সহরের জীবনের সঙ্গে এত অল্পদিনে মানাইয়া ফেলিয়াও সে বিছানায় শুইয়া সূর্য্যোদয় ঘটিতে দিতে পারে না।

দামী খাটের আধুনিক শয্যা যেন কামড়ায়।

মা ইতিমধ্যেই স্নান সারিয়াছেন।

মা বলিলেন, 'লাবু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়াতে চাইছে। তুই কি ঠিক করেছিস জানিনে। কিন্তু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়ানো কি উচিত হবে?'

'উচিত হবে না কেন? চিরকাল ওকে পুষব বলে তো আনিনি? পয়সা রোজগার করছে, এবার নিজের পথ দেখুক।'

আপসোসের আওয়াজ করিয়া মা বলেন, 'তুইও বৌমার মত এলোমেলো চিন্তা করিস। তুই না তুকতাকে বিশ্বাস করিস না? লাবু বলল তুকতাক করে মানুষটা আমাদের সর্ব্বনাশ করছে—তুইও অমনি ওকে তাড়াতে রাজী হয়ে গেলি? বৌমা যে উল্টো বুঝেছে, ছেলেমানুষী করছে এটা বুঝলি নে তুই? ওনাকে অপমান করলে তাড়িয়ে দিলেই যে সর্ব্বনাশ হবে আমাদের। ওভাবে ক্ষতি করতে চাইলে শত্রুভাবে করতে হবে তো? তোর বাড়ীতে থেকে তোর অন্ন খেয়ে তোর সর্ব্বনাশের জন্য তুকতাক চালাতে গেলে পীতু ঠাকুর নিজেই মারা পড়বে না?'

লাবণ্য তবে নিজের উদারতায় পীতাম্বরকে ক্ষমা করে নাই, মা'র যুক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়াছে!

পরদিন সকালেই তাই সে পীতাম্বরকে বলিল, 'একটা ভারি মুস্কিল হল যে পীতুকাকা! গ্যারেজের এই ঘরটা যে আমার দরকার হবে।'

পীতাম্বর বলিল, 'তা আর মুস্কিল কি? সিঁড়ির নীচে কোণের দিকে যে ঘরটা আছে আমি বরং সেখানে যাই?'

সেটা ঠিক ঘর নয়, তিনহাত চওড়া পাঁচ হাত একটা ঘুপচি, জানালার বদলে উঁচুতে একটা ছোট ফুটা আছে, ফেলিয়া দিতে মায়া হয় অথচ কাজে লাগে না এমনি সব আবর্জ্জনাই রাখা চলে।

'ও ঘরটাও কাজে লাগবে।'

পীতাম্বর চাহিয়া থাকে।

'আপনি বরং অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নিন।'

পীতাম্বরের মুখ দেখিয়া মোহনের মায়াও লয়, লজ্জাও করিতে থাকে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বলিয়া বসে, 'তাড়াতাড়ি কিছু নেই, দশ-পনের দিন আরও থাকতে পারবেন। সুবিধামত ব্যবস্থা করে না নিতে পারলে আমি কি আপনাকে তাড়িয়ে দেব? দেখেশুনে সুবিধামত জায়গা খুঁজে নিয়ে গেলেও চলবে।'

দশ-পনের দিন সময় দিয়াছে। তার মানেই অন্ততঃ এক মাসের আগে লোকটা নিশ্চয় নড়িবে না!

মোহন মনে মনে আপসোস করিতে লাগিল। পীতাম্বরকে বাড়ীতে রাখিবে না ঠিক করিবার পর অবিলম্বে তাকে তাড়ানোর জন্য তার কেমন একটা খাপছাড়া

ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। এতদিন সে আছে, যার থাকা অথবা যাওয়ার কথা এতদিন সে একবার চিন্তাও করে নাই, এখন আরও পনেরটা দিন সে থাকিবে ভাবিলেই তার অস্বস্তির সীমা থাকিতেছে না।

সারাদিন মোহন এই কথাটাই মনে মনে নাড়া চাড়া করিল, রাত্রে পীতাম্বর ফিরিলেই তাকে জানাইয়া দিবে কিনা, কাল পরশুর মধ্যেই তার যাওয়া চাই। তারপর রাত দশটার সময় খোঁজ নিতে গেল পীতাম্বর ফিরিয়াছে কিনা।

শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে জানাইল, পীতাম্বর তার যা কিছু ছিল পুঁটলী বাঁধিয়া সকালেই চলিয়া গিয়াছে।

'উনি কি কবেছেন বাবু?'

'কিছু করেনি।'

একবার বলিয়া গেল না?

এত তেজ পীতাম্বরের? এতদিন তার আশ্রয়ে থাকিতে পারিল, তার অন্ন ধ্বংস কবিতে পারিল, যাওয়ার সময় একবাব বিদায় নিয়া যাইতে পারিল না? বলা মাত্র গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল?

এরকম অকৃতজ্ঞই হয় বটে এসব অপদার্থ মানুষ।

পীতাম্বব কিছু ফেলিয়া যায় নাই, কাগজের একটি টুকরাও নয়। ফেলিয়া যাওয়ার কিছুই তার ছিল না। কোন চিহ্নই সে রাখিয়া যায় নাই।

যে স্থানটুকু মাত্র কয়েকমাস সে দখল করিয়াছিল সেদিকে চাহিয়া শ্রীপতির বুক অনিশ্চিত আশঙ্কায় ঢুব্ ঢুব্ করে।

কে জানে মোহন কবে তাকেও দূর করিয়া দিবে।

থাকা আর খাওয়াব জন্য পয়সা খরচ করিতে হইলে কদমকে তার আর টাকা পাঠানো হইবে না, দুটি চারটি টাকার বেশী নয়। কদমের মুখের হাসি মিলাইয়া যাইবে, একটু নির্ভাবনায় থাকিয়া আর পেটে দুটো খাইয়া তার চেহারায় যে জলুষ আসিয়াছে তার চিহ্ন থাকিবে না, মা-মরা ছেলেমেয়েগুলিকে খুশী মনে আদর যত্ন করার বদলে আবার গায়ের জ্বালায় দিশা হারাইয়া তিন হাতাড়ি পিটাইতে আরম্ভ করিবে।

না, আর দেরী করা নয়!

আয় বাড়ানোর জন্য কোমর বাঁধিয়া এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

দুর্গার পিছনে আর একটি পয়সা খরচা করা চলিবে না। নিজের খরচ আরও কমাইতে হইবে—কোন রকমে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য যা দরকার তার অতিরিক্ত সব কিছু ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে—বিড়ি খাওয়া পর্য্যন্ত।

রোজগারের কি ব্যবস্থা করিবে?

হাতাখন্তি দা' কুড়ুল গড়া ছাড়া কিছুই সে যে জানে না। জগদানন্দের দয়ায় কারখানায় কাজ পাইয়াছে, প্রথম দিকে কাজের কিছুই বুঝিত না, ক্রমে ক্রমে কাজ শিখিয়াছে। কারখানাতে কাজ না করিলে এ শিক্ষার কোন দাম নাই। জগদানন্দের খাতিরে প্রথম হইতেই ভাল মজুরিতে কাজ শুরু করিয়াছে। তাতে শেষ পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই। কাজ শিখিলেও সহজে তার কাজ পাকা করা হইবে না, বেতন বাড়িবে না। কারখানায় কাজ না করিয়া অন্য কিছু সে যদি করিতে চায়, লোচনের মত ছোটখাট একটি নিজস্ব মেরামতি কারখানা খোলে, ফণীর মত ভাঙ্গা লোহালক্কড় কেনা বেচা করে,—টাকা কই তার?

টাকা?

দেশে এক বিঘা জমি আছে। দু'খানা ভাঙ্গা ঘর আছে। কদমের গায়ে একটু সোনা আছে। আর আছে হাপর নেহাই হাতুড়ি সাঁড়াশীগুলি। ওসব বেচিয়া দিলে কিছু টাকা হয় না?

কাজের শেষে কারখানার বাহিরে আসিয়া খাটুনির চেয়ে দুশ্চিন্তায় শ্রীপতি বেশী শ্রান্তি বোধ করে।

বিড়ি খাইতে বড় ইচ্ছা হয়। বিড়ি সে কেনে নাই, দু'টি একটি চাহিয়া খাইয়াছে। কিনিবে না করিতে করিতে এক পয়সার বিড়ি সে কিনিয়া বসে।

শুধু একটি পয়সা। কি আসে যায় একটি পয়সাতে?

বিশেষতঃ আর কোনদিন যখন কিনিবে না, আজই তার শেষ বিড়ি কিনিয়া খাওয়া। বিড়ি না খাইয়া একটা পয়সা বাঁচানো আরম্ভ করা একটা দিন শুধু পিছাইয়া গেল।

মোটে একদিন।

দুর্গার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিবে কি?

শেষ দেখা?

দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দেওয়াও একটা দিন পিছাইয়া দিলে খুব বেশী কি আসিয়া যাইবে?

কিছু ভাল লাগিতেছে না, কেমন অস্থির অস্থির করিতেছে মনটা তার। দুর্গার কাছে গেলে কি এখন ভাল লাগিবে? দুর্গার শান্ত ঘরোয়া ব্যবহার প্রথমটা শ্রীপতির বড়ই পছন্দ হইয়াছিল, এখন কেমন যেন ভোঁতা মনে হয় তাকে। দুর্গার সরল সহজ কথা আন্তরিক সহানুভূতি আর তেমন মিঠা লাগে না।

কাবখানার ভিতরের গরমের পর বাহিরের শীতে কাতর হইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া শ্রীপতি বসিয়া থাকে, এমন অসহায়, এমন অকর্মণ্য মনে হইতে থাকে নিজেকে, এমন অর্থহীন হইয়া যায় বাঁচিয়া থাকা!

টাকার জন্য প্রাণপাত করিতে সে রাজী, তার কোন সুযোগ নাই। কদমকে ছাড়িয়া দিন কাটে না, তাকে কাছে রাখা চলে না। বিড়ি খাইতে ভাল লাগে, বিড়ি কেনা বন্ধ করিতে হয়।

কারখানায় কাজ আরম্ভ করিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছে দয়া করিয়া তাকে কাজ দেওয়া হয় নাই, তাকে খাটাইবার জন্য কর্তাদের আগ্রহের সীমা নাই।

তাকে বেশী বেশী খাটিবার সুযোগ দিয়া তাকে খাটাইতে পারিয়াই যেন তারা বর্ত্তিয়া যায়!

ভাগ্য যেন পরিহাস জুড়িয়াছে তার সঙ্গে।

এর চেয়ে গ্রামে থাকাই তার ভাল ছিল! যা জুটিত তাই খাইত, না হাসিলেও কদম কাছে থাকিত, এত সব দুশ্চিন্তার ধারও ধারিতে হইত না।

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতির মরিয়া হওয়ার প্রেরণা জাগে।

কেন এত ভাবনা? কি হইবে নিজেকে এমনভাবে কষ্ট দিয়া? খেয়ালমত যা খুশী সে করুক না কেন? যা ইচ্ছা করুক কদম, কদমের জন্য তাকে এরকম যেমন খুশী খাটানোর নিয়ম সে মানিবে না। এভাবে খাটিবে না। কারো তোয়াক্কা না রাখিয়া বাঁধা নিয়মে খাটিয়া যা রোজগার করিবে এক পয়সাও সে তাকে পাঠাইবে না, রোজগারের সব টাকা খরচ করিবে নিজের জন্যে, ফুর্ত্তি করিয়া দিন কাটাইবে।

ভবিষ্যৎ ভুলিয়া মজা করার চেয়ে মজা আর কি আছে! মজুরি পাইয়াছে পশু', এখনো কদমকে পাঠানো হয় নাই। দু'একদিনের মধ্যে মোহনের কর্ম্মচারী দেশে যাইবে, তার সঙ্গে পাঠাইবে ভাবিয়া রাখিয়াছে। কদমের জন্য টাকা না রাখিয়া জ্যোতি আর মদনকে সাথী করিয়া সে যদি দুর্গার কাছে যায়, চাঁপাকে

নিমন্ত্রণ করিয়া আনে, একেবারে গোটা একটা দেশী মদের বোতল কেনে আর হৈচৈ করে সারারাত ?

না, দুর্গার ঘরে ফুর্তি জমিবে না।

দুর্গা চাঁপার মত নয়, গেলাসে চুমুক দেওয়ার বদলে সে শুধু ঠোঁটে ঠেকায়। অনর্গল হাসি তামাসা ছলনা চাতুরীর উল্লাসে বিশ্বসংসার ভুলাইয়া দেওয়ার বদলে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে, উত্তেজনা ঠাণ্ডা করিয়া দেয়।

'দুগ্‌গা যেতে বলেছে দাদা।'

জ্যোতি তাগিদ জানায়।

তা বলিবে বৈকি, দুর্গা কি তার খবর রাখে না কবে সে মজুরি পাইয়াছে। আট দশ দিন খোঁজও নেয় নাই, এখন একেবারে তার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

মন ভুলাইতে না জানুক দুর্গা পয়সা চেনে।

না, ফুর্তি করা নয়, দুর্গার সঙ্গে আজ সে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিবে। আজ সে যাইতেছে বটে, কিন্তু সব সম্পর্ক দুর্গার সঙ্গে চুকাইয়া দিয়া আসিবে, কোন দিন যাতে আর যাইতে না হয়।

'আসো না কেন বল দিকি ? কি হয়েছে তোমার ?'

ময়লা চাদরে ঢাকা শ্রীপতির হাতুড়ি পেটা শক্ত সুন্দর শরীরটা দুর্গা দেখিতে পায় না, তাই গায়ে পিঠে হাত বুলায়। এখানে ওখানে টিপিয়া স্প্রিং-এর মত মাংস-পেশীগুলি অনুভব করিতে দুর্গার ভাল লাগে।

'পয়সাকড়ি নেই, আসব কি !'

'তোমার সঙ্গে আমার বুঝি শুধু পয়সার সম্পর্ক ? তেমন মানুষ আমি নই গো নই !'

'নিতে তো ছাড় না।'

'দিয়েছ, নিয়েছি। কেড়ে নিয়েছি তোমার ঠেঁয়ে ?'

'কেড়ে নেবে কেন, তক্কে তক্কে থাকো কবে মজুরি পাব ! ওমনি ডাক পড়ে। কেড়ে নেয়ার চেয়ে ভাল নিতে জানো তুমি।'

দুর্গা আহত হইয়া ঘাড় কাত করিয়া বলে, 'না নিলে খাব কি ? খেয়ে পরে বাঁচতে হবে না আমার ?'

তারপর ঝগড়ার ভঙ্গিতে মুখটা সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলে, 'কত দিয়েছ যে

শোনাচ্ছ এমনি করে ? ভাসিয়ে দিয়েছ দিয়ে দিয়ে। আমি তাই চুপ করে থাকি, ভাবি আসবে যাবে মায়া জন্মাবে, নিজে থেকে দেবে—আমি কেন চাইতে যাব! নইলে দশ গুণ আদায় কবতাম তোমার ঠেঁয়ে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, দেনা পাওনার হিসাবে দুর্গা এ পর্য্যন্ত শুধু ঠকিয়াছে। আর কেউ হইলে তাকে ঘরে ঢুকিতে দিত না। শ্রীপতির যেন মনেই ছিল না এটা দোকান, এখানে দাম দিতে হয়। দুর্গা আসিতে বলে তাই সে আসে বটে, কিন্তু কেউ তাকে বাঁধিয়া আনে না। দাম দিতে কষ্ট হইলে না আসিতে তাব কোনই বাধা নাই!

ঝগড়া হইল এই পর্য্যন্ত, দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কি একটা ঝগড়াই শ্রীপতি কল্পনা কবিয়াছিল,—জ্যোতি আর চাঁপার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন হয়। ওদের একটি ঝগড়া সে দেখিয়াছে। তীক্ষ্ণ তীব্র অশ্রাব্য সব কথা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয়, ভাবা যায় না এ জীবনে কোনদিন একজন আরেকজনের মুখ দেখিবে।

আজ তাদের 'দুজনের প্রয়োজনীয় ঝগডাটা যেন আরম্ভ হওয়ার আগেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

তাই বটে, চাঁপা অনেক দিন এ লাইনে আছে, চাঁপার সঙ্গে কোন বিষয়েই পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা দুর্গার নাই।

দুর্গা মুখ ভার করিয়া বলে, 'রাগ কবো না বাবু। ঝগডাঝাঁটি আমার সয় না। সাধ না গেলে একটি পয়সা তুমি আমায় দিও না। আজ পর্য্যন্ত চাইনি, কখনো চাইবো না।'

'তোমার চলবে কিসে ?'

'তুমি চালাবে। পাষাণ নও তো তুমি, মানুষ। খেতে পরতে পাই না, দেখলে সইবে তোমার ? আজ না দাও, একদিন যেচে তুমি আমায় কাপড় দেবে, গয়না দেবে। নেব না বললে বরং রাগ হবে তখন। সেদিন আসুক, আমি চুপ করে আছি।'

কদমের সতীনের মত যেন কথা বলে দুর্গা, তার বিয়ে করা বৌ-এর মত। এই তবে মতলব দুর্গার, আগে তাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধিবে, তারপর ভাগ বসাইবে কদমের পাওনায় ?

দুর্গা চা আনিয়া খাওয়ায়, গা ঘেঁসিয়া বসে, হাই তুলিয়া হাসে, বলে যে অন্য

ধরে একজনের অসুখের জন্য দু'রাত জাগিয়াছে। শ্রীপতির হৃদয়ে শুরু হয় মোহ আর ভয়ের লড়াই, দুর্গাকে সে দুহাতের মধ্যে বাঁধিতে চায় আর তারই মধ্যে অনুভব করে দুর্গার বাঁধন। দিন দিন তারই মোহকে জোরালো করিয়া দুর্গা তার বাঁধন শক্ত করিবে, তাকে বশে রাখিবে।

দুর্গাকে আজ তার মনে হয় শোনা গল্পের সেই রহস্যময় দেশের নারী, যে দেশের মেয়েরা বিদেশী পথিককে বশ করিয়া রাখে, পথিক আর দেশে ফেরে না।

দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দিতে আসিয়াছিল, ঝগড়াটা না জমিলেও সম্পর্ক সত্যই চুকিয়া গেল।

নিজের সব ভার তার উপর ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, আর কি তার ধারে কাছে ঘেঁষিতে পারে শ্রীপতি ?

একটা কদমের ভাব সে বহিতে পারে না, দুর্গার ভার নেওয়ার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে ? একটির পর একটি রাত্রি কাটে, জ্যোতি আসিয়া দুর্গার তাগিদ জানায়, জীবনব্যাপী বিরহ কল্পনার প্রথম দিকের ঘনীভূত বিষাদ বিষের মত শ্রীপতিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

একটিবার, শেষবারের জন্য শুধু একটিবার দুর্গার সঙ্গে দেখা করিয়া আসার কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতি ছটফট করে। দুর্গা সস্তা ছিল, দাম বাড়িয়াছে। তাকে বশ করিয়া শাড়ী গয়না আদায় করার মতলব দুর্গার শুধুই মতলব, তাকেও দুর্গা চায়। শ্রীপতিকে একজন চায়, সিংপুরের হাতুড়িপেটা গেঁয়ো কামার শ্রীপতিকে, মজুর শ্রীপতিকে !

জাগিয়া জাগিয়া কল্পনার স্বপ্নে তো নয়ই, ঘুমের স্বপ্নেও কোনদিন এমন ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

কদমকে সে চায়, মনে প্রাণে চায়, কিন্তু কদম তাকে চায় কিনা তা সে জানে না। কদম কোনদিন জানিতে দেয় নাই। চিরদিন সে-ই কদমকে চাহিয়া আসিয়াছে এবং বিয়ে করা বৌ বলিয়া সংসারের নিয়মে কদম তার চাওয়ার মান রাখিয়াছে। শ্রীপতির জীবনে দুর্গাই এ জগতের প্রথম এবং একমাত্র নারী তাকে যে পুরুষের সম্মান দিয়াছে।

তার কাছে দুর্গা তাই হইয়া উঠিয়াছে রাজার কাছে রাজ্যের মত দামী। রাণীর জন্য রাজার রাজ্য ত্যাগ করার মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কদমের জন্য দুর্গাকে ছাঁটিয়া ফেলা।

জ্যোতির মারফতে দুর্গার তাগিদ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া আপনা হইতেই একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। জ্যোতি আসিয়া আর বলে না যে দুর্গা তাকে যাইতে বলিয়াছে।

শুধু এই তাগিদটুকুর জন্য কয়েকদিন শ্রীপতি উৎসুক হইয়া রহিল, কখন জ্যোতি আসিয়া বলিবে যে দুর্গা ডাকিয়াছে।

তারপর, জয়ী পুরুষের গর্ব্ব আর তেজের অনুভূতি নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখে দেখার চেয়ে দুর্গাকে কল্পনায় স্পষ্টতর দেখার দৃষ্টি হইয়া আসিল ঝাপসা।

দুর্গাকে চাহিয়া শ্রীপতি আর রাত জাগে না, দুর্গাকে চাহিয়া মাঝরাত্রে আর তার ঘুম ভাঙ্গে না।

শুধু থাকিয়া গেল একটু জ্বালা আর একটু মন কেমন করা—মৃদু এবং স্থায়ী। একটা বড়রকম অসুখ হইয়া কিছুদিন পরে যেন সারিয়া গিয়াছে কিন্তু আগের মত সুস্থ হইতে পারিতেছে না।

নিছক মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নয়। মানুষটাই সে বদলাইয়া গিয়াছে।

আগের মত আর সে বিচলিত হয় না, তুচ্ছ কারণেও নয়, বড় কারণেও নয়। পীতাম্বরের মত তাকেও মোহন তাড়াইয়া দিতে পারে, এ চিন্তায় আর আতঙ্ক জাগে না। কদমকে কাছে আনিয়া রাখিতে ছ'মাস এক বছর বিলম্বের সম্ভাবনা আর তেমনভাবে কাতর করে না। আজকালের মধ্যে বড়লোক হওয়া যাইবে না বলিয়া দিশেহারা হতাশ কল্পনা নিয়া সে টাকা করার উদ্ভট অসম্ভব ফন্দি-ফিকিরের জাল বোনে না। কিসে কি হয় কে বলিতে পারে?

দেখা যাক কি হয়।

পুরুষমানুষ কারখানায় খাটিয়া যায়, কি আছে তার যে হারাইবার ভয়ে কাবু হইয়া থাকিবে?

শ্রীপতি আজকাল এমনিভাবে ভাবে।

একটা ধীর শান্ত বেপরোয়া ভাব জাগিতেছে। ধরিতে গেলে সে তো সর্ব্ব-ত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী!

তার কিসের ভয়, কিসের ভাবনা? কদম ছিল অভ্যাস। নিছক অভ্যাস। পুরুষানুক্রমিক একটা নেশা।

কদমের জন্যই দুর্গার মোহ সে জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়াছিল—

কদমকে বাদ দিয়া দিন কাটাইতে কাটাইতে তার জন্য ছটফটানিও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

দুর্গার মত কদমও মনের মধ্যে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া একটু মন কেমন করে, আর কিছু নয়।

নেশা কাটিয়া আসিয়াছে। আর সে পাগল হইবে না কদমের জন্য। দেশের ওই কদমের অভ্যাস কদমের নেশায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় পাগল হইয়া আর তাকে ছুটিতে হইবে না কদমের প্রতিনিধি অন্য কোন চাঁপা বা দুর্গার কাছে!

দেহ মনে একটা অদ্ভুত শান্ত দৃঢ়তা ও তেজ অনুভব করে শ্রীপতি।

পুরাণো নেশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছে, পচা বাঁধন খসিয়া পড়িতেছে—সে মুক্তি পাইতেছে প্রতিদিন।

নূতন জীবনের স্বাদ গন্ধও মিলিতেছে।

জ্যোতির সঙ্গে আর তেমন তার বনিবনা নাই। নূতন সাঙাৎ জুটিয়াছে।

কারখানায় তার সহকর্ম্মী ভূপাল। জ্যোতির সঙ্গে কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল সাঙাতি আর ভূপালের সঙ্গে কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে আঁতাতি!

কাজে ভর্ত্তি হইয়া শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কাজ শিখিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিত না সে গেঁয়ো কামার।

সহকর্ম্মীদের চালচলন কথাবার্ত্তা প্রায় কিছুই বুঝিত না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার কোন চেষ্টাই করিত না। কোন রকমে শুধু মানাইয়া চলিত।

এদের সঙ্গে উদয়াস্ত খাটিবে, কাজের জন্য দরকারী সম্পর্ক রাখিবে কিন্তু এই সহুরে পাকা ঝানু মজুরের সঙ্গে তার কি সম্ঝাওতা করা চলে।

সহুরে সাঙাৎ জ্যোতি। মোহনের বাড়ীর চাকর হইয়াও ফর্সা হাফ সার্ট আর ধুতি পরে, পায়ে স্যাণ্ডেল দেয়, পাঁচীর ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া মদ খাওয়ায় গান শোনায়—শ্রীপতি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কোন ভাগ্যে তার এমন সহুরে বন্ধু জুটিয়াছে সহরে আসিয়াই!

প্রথম প্রথম জ্যোতির মুখে বড় বড় লোকের বাড়ী চাকরী করা আর একধার হইতে বাড়ীর মেয়ে বৌদের সঙ্গে পীরিত করার অশ্লীল গল্প শুনিতে শুনিতে শ্রীপতির মনে হইত, কলির কোন দেবতা কি পৃথিবীতে জন্ম নিয়া সৌখীন বাড়ীর সৌখীন চাকরের বেশে লীলা খেলা করিতেছেন!

শুধু পাঁচীর ঘরে গিয়া মাতলামির লীলাখেলা করার ঝোঁকটার জন্য সে তাকে চাকররূপী দেবতা বলিয়া মানিতে পারে নাই।

এখন সে টের পাইয়া গিয়াছে যে জ্যোতির দৌড় বস্তির ওই সস্তা পাঁচী পর্য্যন্তই। বয়স কম, চেহারায় জলুষ আছে, চাকরের কাজে ঢুকিয়া দু'একটা বাড়ীতে দু'একটা কেলেঙ্কারী হয় তো করিয়া থাকিতে পারে—একধার হইতে ভদ্রঘরের বালিকা তরুণী বয়স্কা নারীর হৃদয়রাজ্য জয় করিবার উদ্ভট উৎকট কাহিনীগুলি সবই তার বানানো।

নিজের মনের বিকারকে খাতির করিবার জন্য বানানো। তার মত গেঁয়ো সবল মানুষকে শ্রোতা হিসাবে না পাইলে তাই তার মিথ্যা গল্প বলার রস জমে না।

হাতে পয়সা থাকিলে সে পাঁচীদের ঘরে গিয়া মাতলামি আর হল্লার লীলাখেলা করে, পয়সা না থাকিলে মন-মরা হইয়া তাকে উৎকট বীভৎস রসে রসাইয়া রসাইয়া গল্প বলিয়া নিজের বিকারকে সামলানোর চেষ্টা করে।

শুনিতে শুনিতে বিচলিত অভিভূত হইয়া যাইত ভাবিলে এখন শ্রীপতির নিজের গ্রাম্যতায় অজ্ঞতায় লজ্জা বোধ হয়, হাসি পায়।

একটা গেঁয়ো বৌ কদমের তাল সামলাইতে তার প্রাণান্ত হয়, দুর্গাকে পর্য্যন্ত ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়—মোহনের পেয়ারের চাকর বলিয়া এবং চেহারায় একটু জলুষ আছে বলিয়া জ্যোতির বেলা যেন প্রেম করিতে গেলে দায় ঘাড়ে করার নিয়মটা বাতিল হইয়া যাইবে।

কদম পর্য্যন্ত তাকে এতটুকু রেহাই দেয় না, সহরের চালাক চতুর মেয়েরা যেন কদমের চেয়ে বোকা!

গ্রামে থাকিতে শ্রীপতি বিশ্বাস করিত, দাম দিয়া পীরিত হয় না। এখন সে জানিয়া গিয়াছে পীরিত করার দামও পুরুষকে দিতে হয়!

জানিয়া কত দিক দিয়া যে সে স্বস্তি বোধ করিয়াছে!

ভূপালও তাকে নানারকম গল্প শোনায়—শ্রমিকের লড়াই হইতে সহরের জীবন ও ঘটনা হইতে কেচ্ছা পর্য্যন্ত অনেক বিচিত্র কাহিনী। তার কেচ্ছা জ্যোতির নিজের বাহাদুরীর বানানো কাহিনীর চেয়ে কম অশ্লীল হয় না—কারণ, শুনিলেই বুঝা যায় অন্যের ব্যাপার হইলেও ভূপাল বানাইয়া বলিতেছে না, হয় তো খানিকটা রং চড়াইয়াছে।

যখন বলে একেবারে চুটাইয়া বলে, তবে জ্যোতির মত তার এই একটিমাত্র রসই সম্বল নয়।

প্যাচ কষে না, কায়দা করে না, সোজা স্পষ্ট কাটাকাটা কথা বলে, তবু জীবনের কত রকমারী দিক, আশ্চর্য্য দিক রূপ নেয় ভূপালের কথায়। মনে হয় প্রতিদিন তার যে নতুন অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে একেবারে অজানা বিষয়ে ভূপালের বর্ণনার সঙ্গেও যেন তার কেমন একটা মিল আছে।

মজুরের লড়াই-এর কথা শুনিতে শ্রীপতির খুব আগ্রহ জাগে। কিসের লড়াই আর কেন লড়াই তার আসল কাথাটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া গিয়াছে। এসব তারও লড়াই, তার স্বার্থের সঙ্গেও এসব জড়িত।

মজুরি বাড়ানোর লড়াইটাই ধর। মজুরি বাড়িলে সে কদমদের আনিতে পারে। কাজ শিখিলে তার মজুরি বাড়িয়া কাজ পাকা হওয়ার কথা।

নিজের ছোট গেঁয়ো কামারশালায় হাতুড়ি পিটিয়া তার জীবন কাটিয়াছে, কি এমন কঠিন কাজটা তাকে এখানে করিতে দেওয়া হইয়াছে যে এতদিনেও ভাল করিয়া কাজ শিখিতে বাকী থাকিবে?

কিন্তু কেউ একথা কানেও তোলে না যে সে ভাল কাজ শিখিয়াছে, এবার তার পাকা কাজের মজুরি পাওয়া উচিত!

ভূপাল এক গাল হাসিয়া বলে, 'যা যা বড়াই করিস নে! এর মধ্যে কাজ শিখে গেছেন, পাকা কাজ চাই, বেশী হপ্তা চাই। তোর শালা ঢের দিন বাকী কাজ শিখতে।'

'কাজ শিখিনি? ঠিকমত কাজ করছি না?'

'শিখেছিস তো শিখেছিস! ঠিকমত কাজ করছিস তো করছিস! তাতে কি হয়েছে রে ব্যাটা? সময় হবে, মর্জি হ'বে, তবে কাজ পাকবে।'

স্বর পাল্টাইয়া মুখ বাঁকাইয়া একজন মধ্যস্থ কর্ত্তাব্যক্তির হাবভাব নকল করিয়া ভূপাল বলে, 'তেড়ি-বেড়ি করিস নে বাবা, তেড়ি-বেড়ি করিস নে—দোহাই তোর! তবু তো খেটে খাচ্ছিস? খেদিয়ে দিতে জবরদস্তি করিস নে বাবা, করিস নে—দোহাই তোর। আখেরে ভাল চাস্ তো চুপচাপ খেটে যা। গা থেকে পাঁকের গন্ধ যায়নি, কাজ শিখে গেছিস্!'

শ্রীপতি হাসিয়া ফেলে।

কাজ পাকা করার কথা বলিতে গেলে ঠিক এইভাবে এইরকম ভঙ্গি করিয়া এই কথাগুলিই শঙ্করবাবু তাকে বলিয়াছিল বটে।

তেমন বনিবনা না থাকিলেও জ্যোতির সঙ্গে বিবাদ বা বিচ্ছেদ হয় নাই। জ্যোতির অশ্লীল গল্প আজও কিছু কিছু শুনিতে হয়। তবে শুনিতে শুনিতে সে অভিভূত হইয়া পড়ে না বলিয়া, মাঝে মাঝে খাপছাড়া প্রশ্ন করে এবং খাপছাড়া ভাবে হাসিয়া ওঠে বলিয়া, তাকে গল্প শুনাইবার উৎসাহ জ্যোতির ঝিমাইয়া আসিয়াছে।

আগে জ্যোতি ছিল বক্তা, শ্রীপতি ছিল নীরব শ্রোতা। আজকাল শ্রীপতি কখনো কখনো তার অভাব অভিযোগ রাগ দুঃখ আপসোসের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে—একটি কলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে জ্যোতির পিরীত জমিয়া নোংরামির ক্লাইমেক্সে উঠিবার মুখে শ্রীপতির আপসোস ফাটিয়া পড়িলে—কয়েক মিনিট তাকে চুপচাপ শ্রীপতির কথা শুনিয়া যাইতে হয়!

খানিকটা অভিভূত ও বিচলিত হইয়াই শোনে।

মনটা যে তার ধাক্কা খাইয়াছে, নড়িয়া উঠিয়াছে, খানিকক্ষণ শ্রীপতির কথা শুনিবার পর তার অস্থিরতা শুরু হইলেই সেটা বোঝা যায়।

কত যে আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, 'তুই বড় বোকা ভাই। তোর কোনদিন কিছু হবে না। সংসারের চালচলন কিছুই বুঝিসনে তুই।'

'কি বুঝিনে?'

'কিছুই বুঝিস্ নে। কাজ কি তুই বাগিয়েছিস? নিজের চেষ্টায়? কাজ যারা বাগিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যা না বোকারাম হাঁদারাম! কাজ যারা জুটিয়ে দিল, কাজটা তারা পাকা করে দিতে পারবে না?'

কথাটা যে শ্রীপতি ভাবে নাই তা নয়। কিন্তু মোহনকে কাজের বিষয় কিছু বলিতে সে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করে।

তার লজ্জা হয়।

মোহন জগদানন্দকে বলিয়া তাকে যে কারখানায় ভর্ত্তি হইবার সুযোগ দিয়াছে, কাজ করিয়া কাজ শিখিবার সামান্য মজুরী পাইয়াও সে যে মোহনের বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কদমকে নিয়মিত দু'চারটাকা পাঠাইতে পারিতেছে—এই তো যথেষ্ট করিয়াছে মোহন।

সাহায্য করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীপতি ভুলিতে পারে না যে

মোহন তাকে অনুগ্রহ করে নাই, কাজটা তাকে ভিক্ষা হিসাবে জুটাইয়া দেয় নাই।

যতই দুঃস্থ হোক, নীচু জাতের লোক হোক, মোহনের সে গ্রামবাসী। উঁচু জাতের ওই পীতাম্বরের মতই সে-ও তার প্রজা নয়, তার এক কাঠা জমির ধারও সে কোনদিন ধারে নাই!

শ্রীপতির স্পষ্ট মনে আছে, তার প্রায় সমবয়সী পনের ষোল বছরের মোহন একদিন লুকাইয়া তাদের বাড়ী আসিয়াছিল, বহুকালের পুরাণো একটা তলোয়ারে ধার করিয়া দিবার জন্য তার বাবাকে অনুরোধ জানাইয়াছিল।

যেটুকু ধার ছিল তলোয়ারটায় সেটা আরও খানিকটা ভোঁতা করিয়া দিয়া তলোয়ারটা শুধু ঝকঝকে করিয়া দিয়াছিল তার বুড়ো বাবা।

মোহন খুশী হইয়া পুরো একটা টাকা মজুরি দিতে চাহিলে তার বুড়ো বাবা ফোকলা মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার খেলনা বানিয়ে দিয়ে পয়সা নেব কি গো! মোটেই পারি নাকো নিতে!'

গ্রামবাসী শত শত প্রজা আছে, খাতক আছে মোহনের। তারা একজন কেউ আবদার করিলে মোহন কি তাকে সাথে নিয়া কলিকাতা আসিতে রাজী হইত!

তারা দু'জন গরীব কিন্তু প্রজা নয়, গ্রামবাসী।

মোহন যথেষ্ট করিয়াছে, গরীব গ্রামবাসী হিসাবে আবার তাকে মজুরি বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইবে, ভিক্ষা চাওয়া হইবে।

মোহন যদি বিরক্ত হয়, যদি বলে যে একটু আশ্রয় দিলেই শ্রীপতিরা মাথায় উঠিতে চায়, বড়ই সেটা অপমানের কথা হইবে শ্রীপতির!

আগে ছিল না, মান অপমানের এই জ্ঞান শ্রীপতি সহরে আসিয়া অর্জ্জন করিয়াছে, কারখানায় অর্জ্জন করিয়াছে।

কয়েকমাস আগে হইলে অনায়াসে সময়মত সুযোগমত ভিখারীর মতই মোহনকে সে তার প্রার্থনা জানাইতে পারিত।

কিন্তু ভালভাবে কাজ শেখা হইয়াছে, পাকা কাজ ও বেশী মজুরির দাবী জন্মিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসটা তখনও জন্মে নাই। সুতরাং দাবীটা আদায় করিয়া দিবার জন্য মোহনের কাছে আবেদন জানাইবার প্রশ্নও ওঠে নাই।

ন্যায্য দাবীর বোধটা জন্মিতে জন্মিতে জন্মিয়া গিয়াছে মান অপমানের নূতন বোধটাও।

মোহনের বাড়ীতে চাকরদের ঘরে হইলেও বিনা-ভাড়ায় পাকা ঘরে থাকিবার এবং আশ্রিত ও চাকর বাকরের জন্য ভিন্ন রান্না করা অন্ন হইলেও দু'বেলা পেট ভরাইবার অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে শ্রীপতির নবজাগ্রত আত্মসম্মান বোধে বাধে না কেন ?

আশ্রয় আর অন্ন দেওয়ার বদলে মোহন এবং মোহনের সংসার তাকে চাকরের মতই খাটাইয়া নেয় বলিয়াই বাধে না !

জ্যোতি সৌখীন চাকর—মোহনের সৌখীন জীবন যাপনের প্রয়োজনেই শুধু তাকে রাখা।

বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নামে একটা ঠিকা ঝি রাখিলেও তার সাধ্য কি এতবড় সংসারের বৃহত্তম অংশটার কাজ চালায় ?

আশ্রিতা কিন্তু নিকট আত্মীয়াদের মধ্যে তিনজনকে মোহন দেশের বাড়ীতে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—মার জন্য সঙ্গে আনিতে হইয়াছে। বলিতে গেলে তাদের মধ্যে অনাদৃতা দু'জন ঠিকা ঝিয়ের সঙ্গে সংসারের ওইসব কাজ সারে।

অন্যজন মার পেয়ারের লোক। তার কাজ শুধু মার মন যোগাইয়া চলা।

কতগুলি কাজ আছে যে কাজ করিবার লোক নাই! শ্রীপতি করিয়া না দিলে মোহনকে আরেকজন সাধারণ চাকর রাখিতে হইত।

জ্যোতি বাজারে যায়, মুদি মনোহারী দোকানেও যায়। কিন্তু সে বাজার করে সওদা আনে শুধু মোহনদের এবং তার বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগতদের জন্য—যাদের জন্য রান্না-বান্না হয় ভিন্ন, টেবিলে যারা ডিসে প্লেটে খায়।

মার নেতৃত্বে সংসারের অন্য অংশের—আমিষ নিরামিষ রান্নার বাজার এবং অন্যান্য কেনাকাটা শ্রীপতি করিয়া দেয়।

সে-ই প্রতিদিন গাড়ীটা ধোয়া মোছা সাফসুফ করে বলিয়াই মোহনকে একজন ক্লিনার রাখিতে হয় নাই।

অনেক বাড়ীর অনেক গাড়ীর ড্রাইভার নিজেই এসব কাজ করে—কিন্তু মোহনকে বেশী বেতনের বাবু ড্রাইভার রাখিতে হইয়াছে। এ গাড়ীতে অন্য ড্রাইভার মানায় না।

বাবু ড্রাইভার ইঞ্জিনটা সাফ করে। ধূলা কাদা সাফ করা তার কাজ নয়।

মা'র এবং তার পেয়ারের আশ্রিতা বিধবাটির অনেক ফাইফরমাসও শ্রীপতির উপর দিয়া চলে।

কাল একাদশী গিয়াছে।

আজ সকালে মা'র ফরমাসে সে গোপনে পাঁচ রকম সহুরে মিষ্টি সহরের নাম করা দোকান হইতে আনিয়া দিয়াছে।

'কাকপক্ষী যেন টের না পায় ছিপতি।'

কাকপক্ষী টের পায় নাই।

কে জানে মোহন জানে কিনা যে সে-ও তার একজন বিনা মাইনের চাকরের সামিল হইয়াই চাকরের জন্য বরাদ্দ আশ্রয় ও অন্ন ভোগ করিতেছে।

জানা অবশ্য উচিত। অন্য কাজ করে কি করে না সেটা অজানা থাক—প্রায় প্রতিদিন ভোরে সে তো তাকে গাড়ীটা সাফ করিতে দেখিয়া আসিতেছে। তার বাবু ড্রাইভার নাক ডাকিয়া ঘুমায় চিরদিনের অভ্যাসের বশে ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া মোহন নতুন গাড়ীর টানে গ্যারেজের দিকে আসে—দেখিতে পায় তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দামী গাড়ীটা শ্রীপতি কত যত্নে সাফ করিতেছে।

শুধু ছাখে না।

গাড়ীটার ঝকঝকে তকতকে নতুনত্ব বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে তাকে এখানটা ভাল করিয়া ঝাড়িতে, ওখানটা ভাল করিয়া মুছিতে বলে।

অর্থাৎ হুকুম দেয়।

বলে, 'মাড গার্ডের ওখানে একটু ময়লা জমেছে শ্রীপতি।'

'ময়লা নয়। চলটা উঠে মর্চে ধরেছে।'

কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য জায়গাটা সে বার বার ঘষিয়া পুঁছিয়া দেখায়।

হাজার ঘষিয়াও চাঁদের কলঙ্কের মত মাড গার্ডের কলঙ্ক ওঠে না।

মোহন আপসোস করিয়া বলে, 'এর মধ্যে চলটা উঠে গেল? কি করে গেল?

অন্য কোন কথাই মোহন তার সঙ্গে বলে না। শ্রীপতি গামছা পরিয়া তার গাড়ীটা সাফ করিতেছে দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, 'তোমার কাপড় নেই শ্রীপতি? পায়জামা প্যাণ্ট নেই?'

পীতাম্বরকে তাড়াইবার আগের দিনের ভোরে শুধু একটি নিয়ম-ছাড়া প্রশ্ন সে তাকে করিয়াছিল—'পীতাম্বর ঠাকুর সাধক পুরুষ না-রে শ্রীপতি? তুই তো ওকে জানিস অনেক কাল। উনি যোগ সাধনা ক্রিয়া কর্ম্ম খাটাতে পারেন?'

প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই ক্ষোভ জাগিয়াছিল শ্রীপতির। তার মত লোককে মোহনের এরকম প্রশ্ন করা কি উচিত?

চার হাত লনের ফুল লতার বহরের এদিকে ঠেকিয়া দেওয়া চাকর বাকরের গ্যারেজ সন্নিহিত টালির ঘরে একসাথে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই তো সে ঘনিষ্ঠভাবে পীতাম্বরের বাঁচার কায়দা জানিয়াছে?

তাকে কি উচিত জিজ্ঞাসা করা পীতাম্বরের বিষয়ে কোন কথা?

কোন জবাব না দিয়াই সে বালতি নিয়া জল আনিতে গিয়াছিল।

কে জানে কোথায় গিয়াছিল মোহন অথবা নগেন, গাড়ীটাতে কাদা মাখাইয়া আনিয়াছে। কাদা সাফ করিতে তাকে কমপক্ষে সাত আট বালতি জল টানিতে হইবে।

জবাব না পাওয়ায় মোহনের হইয়াছিল রাগ। ধমক দিয়া সে বলিয়াছিল, 'একটা কথা জিগ্যেস করলাম, জবাব দিলি না যে?'

'কি জবাব দেব বলুন? পীতম ঠাকুরকে আপনে এনেছেন বামুন সাধক বলে। আমি কলে কুলি খাটি, আপনার ঘরে চাকর খাটি—'

'চাকর খাটো মানে?'

'বাজার করি, মসলা বাটি, আপনার গাড়ী সাফ করি—'

কী চালাক হইয়া উঠিয়াছে শ্রীপতি! এমনি লাগসই ভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল মোহনের।

'কে তোমায় বাজার করতে, মসলা বাটতে বলে?'

'আপনার মা বলেন।'

'মার কাছে মাইনে চাও না কেন? মা তোমাকে চাকর খাটায়, মার কাছে মাইনে আদায় না করে আমার কাছে নালিশ কর কেন?'

'মাথা গুঁজে আছি, দুবেলা খাচ্ছি—'

'সে তো আমার ব্যবস্থা শ্রীপতি। মার চাকর খাটতে আমি তো বলিনি তোমায়!'

শ্রীপতি দমিয়া যায়। মোহন তাকেও কাজে লাগাইতে চায় তার ঘরোয়া যুদ্ধে। মার কোন ভাগ নাই, নগেন কিন্তু বাপের টাকা আর সম্পত্তির সমান অংশীদার।

নগেনকে বাগাইয়া মা যুদ্ধ শুরু করিয়াছেন মোহনের বিরুদ্ধে। মোহন চায় যে শুধু তার গাড়ীটাই সাফ করিবে—মার কোন হুকুম মানিবে না।

অথচ তার তু'বেলা পেট ভরার ব্যবস্থা যে মা'র হাতে এটা মোহন জানিয়া শুনিয়া মানিয়া নিয়াছে।

মার হুকুম না শুনিলে তাকে যে না খাইয়া খালি পেটে কারখানায় খাটিতে যাইতে হইবে এই সোজা কথাটাও কি খেয়াল নাই মোহনের?

আট

সন্ধ্যা সেদিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া আসে এবং বিস্মিত মোহনকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দিয়াই একেবারে ব্যাখ্যাটা শুনাইয়া দিয়া মোহনকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

'তোমার বন্ধুর বাড়ীতেই স্বামীসোহাগিনী হয়ে রাত কাটিয়েছি মোহন। অমন করে তাকিও না মোহন। আমি যেচে আসিনি, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে।'

ঝরণার সেই হুমকি মোহনের মনে ছিল। যে ভাবে পারে সন্ধ্যাকে সে জব্দ করিবে বলিয়াছিল, দরকার হইলে বন্ধুকে দিয়া দাদাকে নষ্ট করাইয়া সন্ধ্যাকে জব্দ করিবে।

'ঝরণা?'

'দূর! আমায় আসতে বাধ্য করবে ঝরণা? অত মুরোদ থাকলে বোকা-সোকা ছেলেমানুষদের বাগাতে যেত না।'

ঝরণা আর নগেনের নিদারুণ সমস্যাটা সে যেন খেলার ছলেই উল্লেখ করে, তার কাছে যেন একেবারে তুচ্ছ কথা বয়সে ছ'সাত বছর বড় ঝরণার নগেনকে বাগানোর প্রচেষ্টা!

মোহন মুখ খুলিতে যাইতেই সন্ধ্যা অপরূপ ভঙ্গিতে আঙ্গুল উঁচাইয়া তাকে থামাইয়া দেয়।

বলে, 'ওদের কথা পরে বলব মোহন, আগে আমার কথা শোন।'

বলিয়া সে হাসে, 'শুধু নিজের কথা বলতে এসেছি ভেবো না। নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে তোমাকে এক বিষয়ে সাবধান করে দিতেও এসেছি।'

নিজের কথাটাই সন্ধ্যা আগে বলে, ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে সে কেন চিন্ময়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'এতদিনে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে তোমার বন্ধুর। পাগলের মত ভালবেসেই যে বৌকে বশে রাখা যায় না এটা বুঝে গেছে।'

টেলিফোন করিয়া সন্ধ্যা টাকা চাহিলেই চিন্ময় লোক মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিত। কিছুদিন হইতে সে টাকা পাঠাইতে টালবাহানা শুরু করিয়াছিল—টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য, সন্ধ্যার দাবীর চেয়ে কম টাকা পাঠানোর জন্য, খুব আপসোসের সঙ্গে নানা রকম জটিল আর এলোমেলো কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করিয়াছিল!

'এমন করে কথা বলত চিঠি লিখত যেন সময়মত আমার দরকারের সব টাকাটা পাঠাতে না পেরে নিজের হাত পা কামড়ে মরে যেতে চাইছে। আমি যেন রাগ না করি সেজন্য সে কি করুণ মিনতি—চিঠি পড়লে বন্ধুর জন্য তোমার চোখে জল আসত মোহন। আমিও প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সত্যিই বুঝি মুস্কিলে পড়েছে। তারপর বাড়াবাড়ি দেখে টের পেলাম যে এটা নতুন চাল। একেবারে মরিয়া হয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করে আমাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে।'

'ভুল চাল দেয়নি দেখাই যাচ্ছে।'

এটা বিষম খোঁচা। সন্ধ্যা কোনদিন খোঁচা দেওয়া ঠেস দেওয়া কথা সহিতে পারিত না। আজ সে অনায়াসে হাসে।

'তুমি ছাড়া আমার বন্ধু নেই—তাই মনের ভেতরের কথাটা তোমায় খুলে বলছি। মেয়েমানুষ মনের কথা কারো কাছে ফাঁস করে না—মুস্কিল হয়, বিপদ বাড়ে বলেই ফাঁস করে না। আমাদের বাঁচার যে কত কষ্ট কত বিড়ম্বনা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তুমি বন্ধু বলেই তোমায় খুলে বলছি।'

মোহন চুপ করিয়া থাকে। লাবণ্যের মুখেও এই রকম কথা সে শত শতবার শুনিয়াছে যে তার যন্ত্রণা পুরুষ মানুষ সে কি বুঝিবে!

সন্ধ্যা সোফায় এলানো গা তুলিয়া সোজা হইয়া বসে, তার একমাত্র পুরুষ বন্ধুর দিকে আগুনের ঝলক-মারা চোখে চাহিয়া বলে, 'তোমরা পুরুষরা আমাদের কি মনে কর বলত? তোমরা ব্যবস্থা করবে, আমরা তাই মেনে নেব? তোমাদের আইন কানুন উল্টে দেবার জন্য আমরা তাই কোমর বেঁধে লড়ছি।'

'লড়ছ?'

'লড়ছি।'

'যারা আইন বানায় তাদের সঙ্গে সোজাসুজি নয়, তোমাদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়ছি। সব কিছু পাল্টে না দিলে আমাদের আর হাসিমুখে পাশে পাবে না।'

'টাকা বন্ধ করেই পাশে টেনে এনেছে, এ কেমন লড়াই তোমার ?'

'পাশে আগে ছিলাম—বনিবনা হল না, সরিয়ে দিল। চাপ দিয়ে আবার পাশে টেনে এনেছে। হাসি মুখে এসেছি ভেবেছ নাকি ? গায়ের জোর,—মানে টাকার জোরে পায়ে টানার মজাটা বন্ধু তোমার টের পাবে !'

আবার গা এলাইয়া দিয়া সে সহজ সুরে বলে, 'যাক্ সে। ওসব কথা নিয়ে থিয়োরির তর্ক জুড়তে আসিনি। হিসাবনিকাশটা খুলে বলি তোমাকে।'

সে একটু থামে।

'বুঝলাম, একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হয় তো একদিন টাকা আর রিভলবার নিয়ে যাবে, টাকাটা হাতে দিয়ে আমায় গুলি করে নিজের মাথায় গুলি করবে। তাই বাধ্য হয়ে সামলাতে আসতে হল।'

'সামলে কি করবে ?'

'জানি না। ঠিক করিনি।'

সোফায় এলানো সন্ধ্যা যে সাপিনীর মত ফণা তুলিয়া সামনে ঝুকিয়া ফুঁসিয়া বলে, 'সামলাবার দায় আমার কেন বল তো ? টাকায় কেনা বৌ বলে ? সামলাতে দু'চার মাস লাগবে। ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা ঘুষ দিতেই হবে এবার—নইলে সামলানো যাবে না। টাকায় জব্দ করে আমাদের মা করো, ধিক্ তোমরা পুরুষমানুষ !'

মোহন ভাবে, পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যার নীতি কি আজও চালু আছে—চিন্ময় সন্ধ্যাদের সামাজিক স্তরেও ?

নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে সন্ধ্যার মন্তব্য শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

নগেনের সমস্যা তাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা এক রকম যাওয়ার মুখে নগেন ও ঝরণার প্রসঙ্গ তোলে।

'এ ব্যাপারে একদম চুপচাপ থাকবে মোহন, কিছুই করবে না। কিছুই বলবে না। হস্তক্ষেপ করতে গেলেই তুমি ঝরণাকে জিতিয়ে দেবে, তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'সোজা কথাটা বুঝতে পার না? সব কিছুতে নগেনেরও সমান ভাগ। ঝরণা ওকে খেলাচ্ছে ভোলাচ্ছে ওই ভাগটার লোভে। নগেনকে টের পেতে দেয় না—সম্পত্তির ভাগটাই আসল নগেন আসল নয় টের পেতে দিলে কি রক্ষা থাকবে? একেবারে বিগড়ে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবে নগেন।'

'কিছুই করব না?'

'কিছুই করবে না! শুধু স্নেহ দেখাবে, বিবেচনা দেখাবে। রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে মাছ দুধ মাংস খাওয়াবে, বেড়ানো দরকার বলে কাশ্মীর বেড়াতে পাঠাবে—'

মোহনের মুখ দেখিয়া সন্ধ্যা গলা নামাইয়া বলে, 'একালের ছেলে তো? অনেক কিছু জানে বোঝে। কর্ত্তালি করতে গিয়ে ওর রোখ চাপিয়ে দিও না, বিচার বুদ্ধি চুলোয় দেবার ঝোঁক চাপিও না। ঝরণার খেলা নিজে বুঝে নিজেকে ও সামলে নেবে। এ সুযোগটা ওকে তোমায় দিতেই হবে।

মোহন আচমকা জিজ্ঞাসা করে, 'কদিন এখানে থাকবে?'

সন্ধ্যার মুখে রাত্রির কালো ছায়া নামিয়া আসে।

'কে জানে। কদ্দিনে পেটে ছেলে আসবে বলা যায় কি? তারপর দশমাস দশদিন। ছেলেটাকে পাঁচ ছ'মাসের না করে নড়তে পারব কি?'

সন্ধ্যা যেন ধরিয়া লইয়াছে তার ছেলেই হইবে—যেহেতু চিন্ময় ছেলে চায়। মেয়ে যেন তার হতে পারে না!

আজকাল নূতন পরিবেশে যখন সামাজিক, পারিবারিক, দৈহিক ও মানসিক জীবন অনেকটা নির্দ্দিষ্ট রূপ পাইয়াছে, মোহন মাঝে মাঝে সহরে বাস করিতে আসার উদ্দেশ্যের কথা ভাবিতে চেষ্টা করে।

গ্রাম ছাড়িয়া কেন সে সহরে বাস করিতে আসিয়াছিল?

সভ্যতার সুখসুবিধা ভোগ করিতে আর সেই সুখসুবিধা যারা পুরামাত্রায় ভোগ করে তাদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে এবং অর্থোপার্জ্জন করিতে?

কারণটা এখন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন মনে হয়। গ্রামে বসিয়া দিনের পর দিন সে কি কল্পনা করিয়াছিল মেটে পথে হাঁটার বদলে পিচঢালা পথে মোটর হাঁকানো আর গরীব অশিক্ষিত মানুষের বদলে ধনী সুশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা

করার? এ তো পুণ্য বা শান্তি লাভের চিন্তা বাদ দিয়া তীর্থবাসের ভুয়া কল্পনার মত।

সহরের বাড়ী, গাড়ী, সঙ্গী, সাথী, সুখ, সুবিধা, আনন্দ, উৎসবের জন্য সে লুব্ধ ছিল, এসব নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তন কল্পনাও করিত সর্বদা,—অন্য কিছুর আশায়। এসব ছিল আনুষঙ্গিক, আসল কল্পনা নয়। কি যেন গড়িয়া তোলার আয়োজনের মত সহরের জীবনকে সে কল্পনা করিত।

সে কথা আজ কিছুতেই মনে করিতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠে, উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ মনে হয় জীবন, অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতও সে স্মরণ করিতে পারে না কি চাহিয়া সহরে বাস করিতে আসিয়াছিল। অথচ এটুকু বেশ ভালভাবেই মনে পড়ে যে তখন সেই উদ্দেশ্যই মিশিয়া থাকিত তার সমস্ত ভাবনা চিন্তায়, তার প্রেরণা সে অনুভব করিত স্পষ্ট।

আজ কেন খোঁজ পায় না?

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া? স্বাদের মত শুধু কল্পনা আর অনুভূতিতে মিশিয়া থাকিত বলিয়া? বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা আরম্ভ করা মাত্র বাস্তবতার সংস্পর্শে সে স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে?

মোহনের অসন্তোষ দিন দিন বাড়িতে থাকে।

যেমন ভাবিয়াছিল, সহরের জীবনটা সে রকম হয় নাই। তার ঈর্ষাতুর কামনাকে সার্থক করিয়া সহরের বিশেষ সম্প্রদায়টির মানুষগুলি তাকে নিজেদের একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে রকম মজা লাগে কই? ব্যাপক সামাজিক জীবনকে আয়ত্ত করিয়া সজাগ সক্রিয় জীবনযাপনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা কোথায়?

তা ছাড়া শুধু বন্ধু পাওয়ার হিসাবটাই সে ধরিয়াছিল, এত শত্রু তার জুটিল কোথা হইতে, তুচ্ছ কারণে আর সম্পূর্ণ অকারণে তার উপর যাদের বিরাগ জন্মিয়াছে?

মাকেও আজকাল মাঝে মাঝে মোহনের শত্রু মনে হয়। ভাইবোনদের আড়াল করিয়া মা তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন, কাছে ঘেঁষিবার উপায় নাই। ওদের মনের মত গড়িয়া তুলিবার কল্পনাটা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

মা থাকিতে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ওদের জন্য কিছু করা একেবারেই অসম্ভব।

তাকে বাদ দিয়া ওরা শুধু পরামর্শ করে না, আজকাল তার কাছে ঘেঁষিতে চায় না, কাছে ডাকিলে অস্বস্তি বোধ করে। দূর হইতে নীরবে তার দিকে তাকাইতে শিখিয়াছে। ওদের চোখে ভীত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই সে আবিষ্কার করে, খোকাখুকীর চোখে পর্য্যন্ত।

নগেনের সঙ্গে মার অফুরন্ত আলোচনা ওদের কানেও যায়। মোহন কতদিন দেখিয়াছে খেলার সময় খেলা ফেলিয়া খোকাখুকী মা'র গা ঘেঁষিয়া দু'চোখ বড করিয়া মা আর ছোড়দার কথা শুনিতেছে।

বুঝিতে না পারুক, শুনিতে শুনিতে ধারণা গড়িয়া ওঠে। দাদাকে কেন্দ্র করিয়া এক ঘনায়মান দুর্ব্বোধ্য বিপদের ভয় খোকাখুকীর মনে সঞ্চিত হইতে থাকে।

নলিনী দাদাকে খুব ভালবাসিত।

তার সঙ্গেই মোহনের ঘনিষ্টতা ছিল বেশী। নগেন ছিল ভাই, খোকাখুকী ছিল ছোট, নলিনী তাই সব টুকিটাকি কাজ করিত মোহনের, এটা আনা, ওটা ধরা, সেটা খোঁজা, এর কাছে ওর কাছে তার নির্দ্দেশ বহন করা। সেও ভয় করিতে শিখিযাছে, তবে ভয়টা বোধ হয় তার অবুঝ নয়, তের বছরেব মেয়ে অনেক কিছু বুঝিতে শেখে। তাই, দু'চার দিন বাহিরের জীবনের ব্যস্ততায় মোহন তাকে ভুলিয়া থাকিলে সেও বিগড়াইয়া যায় বটে, অল্প চেষ্টাতেই বোনের মনকে মোহন আবার হাল্কা করিয়া দিতে পারে।

এখনো পারে!

প্রথমটা নলিনী একটু আড়ষ্ট হইয়া থাকে। নূতন করিয়া যেন বিচার করে যে দাদা তার কেমন মানুষ, যেন ভাবিয়া পায় না দাদার সঙ্গে আবার ভাব করা উচিত কিনা।

'তোর চুলটা হঠাৎ এত লম্বা হল কি করে রে!'

'কই?'

'এই যে বিনুনীটি এক হাত দেড় হাত বেড়ে গেছে?'

'এক হাত দেড়হাত কখনো বাড়ে? চার পাঁচ আঙ্গুল।'

'রোজ তোর চুল চার পাঁচ আঙ্গুল বাডে নাকি?'

তখন হাসি মুখে নলিনী বিনুনীর ডগাটা দাদার সামনে মেলিয়া ধরে, বিনুনী লম্বা করার কৃত্রিম উপায়টা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সে তখন একেবারে ভুলিয়া যায় দাদার বিরুদ্ধে শোনা রাশি রাশি অভিযোগ, মোহন

ভুলিয়া যায় বোনের মন ভুলানোর জন্য অভিনয় আরম্ভ করার কষ্ট আর অপমান!

'ওরে পাজী মেয়ে, ফাঁকি শিখেছ?'

'আমি একা নাকি? সবাই করে।'

নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেই নগেনের সঙ্গে মার পরামর্শের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাও হয় মোহনের। নগেনের সঙ্গে মা কি এত পরামর্শ করেন সে বিষয়ে তার তো শুধু অপমান, তার কাছে মার স্পষ্ট অভিযোগ আর ভাইবোনের রকমসকম দেখিয়া আন্দাজ করা।

হয় তো সবই সে ভুল আন্দাজ করিতেছে—আগাগোড়া ভুল বুঝিতেছে। হঠাৎ সহরে আসিয়া সহুরে হইবার তার অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারিয়া পিছাইয়া থাকিবার ক্ষোভ দুঃখ অভিমানে ব্যাকুল হইয়া নিজেদের মধ্যে অবিরাম পরামর্শ চালাইতেছে, কি করিয়া তার নাগাল ধরা যায়। ওরা তার কাছে আসিতেই চায়, সে-ই হয়তো ওদের পিছনে ঠেলিয়া রাখিতেছে।

মনে মনে সে অনেকরকম প্রশ্ন তৈরী করে, নলিনী সে প্রশ্নের আসল মর্ম্ম বুঝিবে না, জবাব শুনিয়া সে কিন্তু সব বুঝিতে পারিবে।

অনেক ভাবিয়া, অনেক বাছিয়া প্রশ্ন যদি-বা সে ঠিক করে, নলিনীর মুখ দেখিয়া সে প্রশ্ন আর উচ্চারণ করিতে সাহস পায় না।

নলিনী কচি মেয়ে নয়, অবুঝ নয়, সরল নয়, তার কল্পনার সংসারে সাংসারিক ঘোরপ্যাঁচের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগিয়া হাসিয়া খেলিয়া সে বড় হয় নাই। তার কাছে পাকামি ভুলিয়া শিশু হইয়া যায়, সেটা শুধু অভ্যাস। যত কৌশলেই সে প্রশ্ন করুক ওর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

মা তার এক ছেলের সঙ্গে কি বলাবলি করে, মার আরেক ছেলেকে গোপনে সে খবর দেওয়ার মধ্যে হইবে নতুন এক পাকামিতে হাতেখড়ি, বাকী জীবনটা একের গোপন কথা বলিয়া বেড়াইবে অন্যকে।

কী তার আসিয়া যাইবে তাতে?

এতই কি সে স্নেহ করে বোনকে যে ভবিষ্যতে সে বিগড়াইয়া যাইবে ভাবিয়া টাকা পয়সা সম্পত্তিতে সমান অংশীদার ছোট ভাইটার সঙ্গে মা কি পরামর্শ করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে তার মন চায় না?

জটিল আবর্তে পাক-খাওয়া তার চেতনাকে শান্ত সংহত করিতে নলিনীও যেন চাবুক কষায়, লাগাম আঁটিয়া দিতে চায়।

'জুতো ছিঁড়ে গেছে, একটা ভাল শাড়ী নেই, ব্লাউজ নেই। কী করে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে চালাই বলতো? তোমারি তো নিন্দে হবে।'

যে প্রশ্ন তুলিতে পারিতেছিল না, যে প্রসঙ্গ আড়ালে ছিল, নলিনী ছেলেমানুষ অভিমানে সেই প্রশ্ন সেই প্রসঙ্গ সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

'মা কিনে দেয় না? নগেন কিনে দেয় না? কি নিয়ে এত গুজগুজ ফুস ফুস চলে তোদের?'

'সে তো মা আর ছোড়দা ভাগ হবার কথা বলাবলি করে। আমি কিছু চাই নাকি ওদের কাছে? চাইলেই তো মুখ খিঁচিয়ে বলবে দাদার কাছে যা। আমারি হয়েছে মুস্কিল।'

বাড়ীর সাধারণ বেশ নলিনীর! মিলের রঙীন ফাইন শাড়ীটির দাম কম নয়। জামাটি দেখিয়াই চেনা যায়—সন্ধ্যার। দেখাদেখি কিনিয়াছে। পায়ে রঙীন হাল্কা লপেটা। নলিনী আজকাল বাড়ীতেও লপেটা পায়ে দিয়া চলে!

মোহন অসহায় বোধ করে। অগত্যা উদারভাবে বলে, 'আজ যখন বেরোব, সঙ্গে যাস, নিজে পছন্দ করে কিনে নিস যা দরকার। ওরা ভিন্ন হতে চাইছে, না?'

'চাইছে তো। মার সঙ্গে ছোড়দার বনছে না, নইলে কবে ভাগ হয়ে যেত। মা বলছে সব ভাগাভাগি করে দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হবে, ছোড়দা চাইছে কলকাতায় ভিন্ন থাকবে। দু'জনে বনছে না বলেই তো!'

নগেনের নীরব ও নিষ্ক্রিয় উপেক্ষাই সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক মনে হয়। তাকে কাছে টানিবার চেষ্টা মোহনের ব্যর্থ হয়, নিজে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া আহত হইয়া ফিরিয়া আসে। ভাইটির সঙ্গে বাজে গল্প করিবে ভাবে, গল্প জমে না, নগেন উসখুস করিতে থাকে। তর্ক করিবে ভাবে, নগেন তর্ক করে না। তাকে খুশী করার জন্য সাংসারিক ব্যাপারে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, নগেন শুধু বলে, আমি কিছু জানি না দাদা! তার নিজের ভালমন্দের আলোচনা তুলিলে সে স্পষ্টই বিরক্ত হয়, এ যেন মোহনের অনধিকার চর্চ্চা! চুপচাপ উপদেশ শোনে, মানে না।

একদিন ধৈর্য্য হারাইয়া সে তাকে শাসন করিতে গিয়াছিল—তখন উদ্ধত

ভঙ্গিতে ঘাড় উঁচু করিয়া নগেন কি যেন ভয়ানক কথা বলিতে গিয়াছিল, কি ভাবিয়া ভাগ্যে বলে নাই!

এখনো তবু তাকে কাছে ডাকা যায়, কথা বলা যায় গল্প করা যায়। কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়া যাইত নগেন কথাগুলি বলিয়া ফেলিলে! তখন তার মনের অবস্থা এমন, হাজার অনুতাপ বোধ করিলেও মাথা নত করিয়া ছল ছল চোখে দাদার কাছে সে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, গায়ে পড়িয়া সেও পারিত না তাকে ক্ষমা করিতে।

এমন হইয়া গেল কিসে?

শুধু মার কথা শুনিয়া শুনিয়াই তার মনে এত বিরাগ জন্মিয়াছে দাদার বিরুদ্ধে, এত বিদ্বেষ, এত হিংসা জাগিয়াছে? টাকা নষ্ট করিয়া সে ভাই-বোনের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তার বিরুদ্ধে মার বক্তব্য শুধু এই। নগেন না হয় বিশ্বাস করিয়াছে তার স্বার্থপর দাদা তাদের ভাগের টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি নিজের সুখের জন্য উড়াইয়া দিতেছে কিন্তু এমন তীব্র এবং স্থায়ী বিদ্বেষ জন্মানোর কারণ তো সেটা নয়?

টাকা আর ভবিষ্যৎকে এত বেশী দাম দেওয়ার বয়স তার হয় নাই। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে এমন ভীষণভাবে সচেতন হওয়ার কারণ বা প্রয়োজন তার কি থাকিতে পারে?

যখন খুশী গাড়ী লইয়া নগেন বাহির যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে না।

মোহনের নিজের দরকার থাকে গাড়ীর, হঠাৎ জানিতে পারে নগেন গাড়ী লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কখন ফিরিবে ঠিক নাই।

মোহন বিশেষ বিশেষ এনগেজমেণ্ট রাখিতে যায় ট্যাক্সি চাপিয়া। ট্যাক্সিও মোটর গাড়ী, তবু মোহনের মনে হয় নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার সমস্ত আনন্দ মাটি হইয়া গেল।

মোহন জিজ্ঞাসা করে না, মদন নিজেই তাকে খবর দেয়, ঝরণাকে সঙ্গে করিয়া নগেন গাড়ীতে হাওয়া খাইতে বাহির হয়। কোনদিন সহরের বাহিরে, কোনদিন সহরের ভিতরে। কোনদিন ধীরে ধীরে মদনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়ের মাঠের চারিদিকে পাক খাইতে হয়, কোনদিন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে হয় উর্দ্ধশ্বাসে।

নগেন সোল্লাসে বলে, 'জোরে চালাও মদন, আরও জোরে।'

ঝরণা ধমক দেয়, 'না, স্পিড কমাও। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবে নাকি ?' মদনের কাছে সব কথা শুনিয়াও নগেনকে মোহন কিছু বলে না।

'কাল গাড়ী নিয়ে যেও না নগেন, আমার একটু দরকার আছে,'—এই অনুরোধ জানাইতে পর্য্যন্ত তার সাহস হয় না। মার শিক্ষায় হোক আর ঝরণায় প্ররোচনায় হোক, তার বিনামুমতিতে নগেনের গাড়ী দখল করার মানেটা স্পষ্ট।

বাপের টাকায় গাড়ী কেনা হইয়াছে, গাড়ী ব্যবহার করার সমান অধিকার নগেনের আছে বৈকি। যুক্তিসঙ্গত অধিকার, আইনসঙ্গত অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের সমর্থিত অধিকার।

নিজের ভীরুতাকে স্বীকার করিতে হওয়ায় এসব সহ্য করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মোহন জানে এভাবে চলিতে পারে না, পারিবারিক জীবনে তার যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাকে আর টেকানো চলে না, একদিন এ জীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবেই এবং তার বেশী দেরী নাই।

তবু সে প্রাণপণে সংঘর্ষ এড়াইয়া চলে, শেষ বুঝাপড়ার দিনটা যতদিন পারে পিছাইয়া দিতে চায়, মিথ্যা আশায় নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

টাকা চাই, টাকা।

টাকা আনিতে পারিলেই আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। কোন রকমে যদি এই অশান্তি আর অপমানের জ্বালা সহ্য করিয়া সে আর কিছুদিন সংসারে এই শোচনীয় অবস্থাকেও বজায় রাখিয়া চলিতে পারে এবং সেই অবসরে উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলে, সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে।

পরিকল্পনা তো তার অনেক আগে হইতেই ঠিক করা আছে, এখন সেটা কাজে লাগাইয়া দিলেই হইল।

কিন্তু এসব চিন্তার ফাঁকি কোথায় মোহন জানে। একটা যে মৃদু আতঙ্ক সর্বদা তার হৃদয়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সেটাই তার প্রমাণ।

তার পরিকল্পনাগুলি চমৎকার, অবাস্তব স্বপ্নও সেগুলি নয়, কারণ বাছিয়া বাছিয়া রূঢ় বাস্তবতার অনেক খুঁটিনাটি অনেক বাধাবিপত্তির চিন্তাকেও তার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তবু সেগুলি কাজে লাগিবে না। ওসব পরিকল্পনার প্রচুর

নিরপেক্ষ সংস্কার প্রয়োজন, নিজের তার প্রয়োজন অনেক অভিজ্ঞতার অনেক সময়ের এবং অনেক মূলধনের।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, অনিবার্য্য প্রয়োজন, তার নিজের অন্য ধরনের মানুষ হওয়া।

মৃদু গর্ব্বের সঙ্গে মোহন এই আত্মস্বীকৃতিকে গ্রহণ করে। সে বোকা নয়। ব্যর্থতার সঙ্কেতকে সে চোখ বুজিয়া এড়াইয়া চলে না। মিথ্যা আশা যদি সে পোষণ করে, জানিয়া শুনিয়া করে, নিশ্চিত মরণের প্রতীক্ষারত রোগীব ঔষধ খাওয়ার মত।

নিজেকে সে ধিক্কার দেয় শুধু ভীরুতার জন্য। কেন সে চুপ কবিয়া থাকে? কেন সে মাকে জোর করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেয় ন, শাসন করে না ভাইবোনকে? উপেক্ষা আর অবাধ্যতা সহ্য করার বদলে গর্জ্জন করিয়া ওঠে না?

তার সাহস নাই। সহরের জীবন-স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়াছে, নোঙরের ব্যবস্থা করিতে স্মরণ ছিল না।

সমাপ্ত

ভেজাল

ভয়ংকর

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

অসময়ে সহর থেকে টাকা এসেছিল, কারখানায় পৌঁছে দেবার জন্য ভূষণ দত্ত প্রসাদকে ডেকে সাতশো তেইশ টাকা দিল। চার মাইল দূরে বিরূপা নদীর ধারে ভূষণের মস্ত চামড়ার কারখানা। কাজ শেষ হবার পরেও আজ সকলে সেখানে ধন্না দিয়ে থাকবে, কিছু কিছু টাকা অন্তত সকলকে আজ দেওয়া চাই। নইলে কাল কেউ কাজে আসবে না। রাস্তা ধরে বীর-গাঁ হয়ে কারখানায় যেতে অনেক সময় লাগে, রেল লাইন ডিঙিয়ে পেনোর মাঠ পার হয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে হতে প্রসাদ কারখানায় পৌঁছে যাবে।

গুমোট হয়েছে। আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে, প্রসাদের চোখে পড়েছিল। বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ স্বরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না ?

বলা দূরে থাক, ভীরু চোখ তুলে ভূষণের মুখের দিকেও একবার সে তাকাতে পারল না। প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে ভূষণের কাছে।

মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাসবুনানি কদমকেশর চুল, ফোলা ফোলা গাল, নাকের বড় বড় গহ্বর দুটি কাঁচা-পাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাস রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি আর নির্মম কঠোরতার প্রতীক অবশ্য আছেন তার দেবতারা, কিন্তু তার মনে তাদের প্রভাবও ভূষণের মতো জোরালো নয়। ভূষণ প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। প্রতি মুহূর্তে তার অস্তিত্ব, তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে ?'

'আজ্ঞে না, যাচ্ছি।'

গেরুয়া রঙের ছোট টাইট জামাটি গায়ে দিয়ে সে টাকাগুলি ন্যাকড়ায় বেঁধে পকেটে রাখল। এতটুকু দায়িত্ব নিয়েই নিজেকে তার বিপন্ন অসহায় মনে হচ্ছে। আশাকে ইসারায় ডাকতে দেখে আরেকবার বুকটা তার কেঁপে গেল।

'জাম পেড়ে এনো আমার জন্যে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।'

'মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর!'—আশা গা-ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পার না?'

চেরা ঠোঁঠের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জ্বল দাঁত সবসময়েই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে। প্রসাদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশা এইরকম শুরু করলে শরীরটা তার শক্ত হয়ে যায়।

রাস্তার মোড়ে বসাকদের মন্দির। সামনে দিয়ে যাবার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের মানুষ-সমান উঁচু চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রসাদ প্রার্থনা জানাল, আজ যেন ঝড় না ওঠে, আর—আর, তার যেন সুমতি হয়।

আশার সুমতি হোক এই প্রার্থনা জানাবার ভরসা তার হয় না, আশার মনে পাপ আছে মনে করলেও তারই পাপ হবে। আশা ভূষণের স্ত্রী, আশা গুরুজন। বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে পায়ে হাত দিয়ে আশাকে সে প্রণাম করেছিল।

আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি ধরে নেড়ে দেবার সময় ঠোঁঠে আঙুল ঘষে গিয়েছে। চলতে চলতে প্রসাদ ঝাল নুন-তেলের স্বাদ অনুভব করতে থাকে। দুঃখে ক্ষোভে চোখে তার জল এসে পড়ার উপক্রম হয়। এ-বিপদ ঠেকানো যাবে না, ঠেকানো অসম্ভব। সুমতি না ছাই জাগবে তার, আশা কাছে এসে দাঁড়ালে ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়। দুটি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে, সত্য সত্যই আশা যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায়?

আশা যে কেন এমন হয়ে গেল কে জানে। মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল, বিয়ে করবে। কাকে বিয়ে করতে দেখে, কার কাছে নববধূকে শয্যাপার্শ্বে পাওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে অথবা কার সুখশান্তি-ভরা দাম্পত্য জীবনকে হিংসা করে ইচ্ছাটা তার জেগেছিল বলা যায় না। রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরু লাজুক কিশোরী একটি বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন। কমবয়সী, কুমারী, বোকাটে ধরনের এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির যে-কোনো ঘরোয়া মেয়ে হলেই তার চলত। কিন্তু তার জন্য যে-কোনো মেয়েই বা কে খুঁজে দিচ্ছে। জানাশোনার মধ্যে নিজের জন্য নিজেকেই তার একটি পাত্রী ঠিক করতে হল। মেয়ের বাপ গরীব, মেয়েটি চলনসই, সুতরাং সুলভ। তিন দিনের চেষ্টায় অনেক ভণিতার পর মেয়ের বাপের কাছে ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে পারল। মেয়ের বাপ কৃতার্থ হয়ে বলল, 'সে তো আমাদের ভাগ্যি।'

তাকে দিয়েই প্রসাদ আবেদন পাঠালে ভূষণের কাছে। ভূষণ উদারভাবে বলল, 'তা করুক না বিয়ে, বিয়ে করবে তাতে আর হয়েছে কি!'

দুপুরবেলা তাকে ঘরে ডাকিয়ে সোহাগের কৌতুকে আশা বলল, 'তুমি নাকি বিয়ে করবে? মাগো মা, কোথায় যাব!'

সলজ্জভাবে একটু হাসলেও প্রসাদ মুখ নিচু করল না। আশাকে দেখতে দেখতে গভীর স্বস্তি বোধের সঙ্গে তার মনে হতে লাগল, তার বৌ এরকম হবে না, সুন্দর রোগা প্যাটকা চেহারা তার বৌ-হবু মেয়েটার। তারপর কোথা থেকে আশার ছোট ছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ-লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হল এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে। তাছাড়া, তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ওর বিচারের মূল্য কতটুকু! মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা না-ভাবাকে!

তবে কেমন যেন প্রাণহীন মানুষ, জড় পদার্থের মতো, সাড়া দিতে জানে না। শুধু বিবর্ণ হয়ে যায়, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দিন তিনেক নেড়েচেড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আশার রোখ চেপে গেল। বিয়ের ব্যবস্থাটা দিল বাতিল করে।

মুচকে হেসে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।'

সেই থেকে এইরকম আরম্ভ করেছে আশা। এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে রাত্রে বাড়ি থাকবে না।

কোথাও চলে যাবার কথা মাঝেমাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে! অজানা অচেনা জগতকে সে কম ভয় করে না। ছোটোখাট ফরমাশী কাজ করে, সাবধানে খেয়ে দেয়ে শরীরটা ভালো রেখে কোনো রকমে এখানে মাথা গুঁজে সে টিকে আছে। দুর্বল শরীর, এতটুকু অনিয়মে অসুখ হয়। লেখাপড়াও ভালো জানে না, কোনো কাজও শেখেনি। অপরিচিত নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়লে দুদিনে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পেনোর মাঠের মাঝখানে ভীরু প্রসাদকে ঝড় ধরে ফেলল।

পরপর কদিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এলোমেলো বাতাসও উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিও নামেনি, ঝড়ও ওঠে নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ উড়ে বাতাস পড়ে গিয়েছে, দিগন্তের কোলে শুধু চোখে পড়েছে ঘনঘন ক্ষীণ বিদ্যুতের চমক। প্রসাদ প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল, আজও যেন তাই হয়। নেহাৎ যদি খারাপ হয় তার অদৃষ্ট, শুধু যেন বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজলেই তার সর্দিকাশি হবে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে জ্বর এসে হয়তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে নিমুনিয়ায়, ভূষণের সেজ শালার মতোই হয়তো চারদিনের দিন অচেতন হয়ে সাতদিনের দিন খটখটে জ্যোৎস্নার রাত্রে অজ্ঞান অবস্থাতেই সে মরে যাবে, তবু মাঠে একা ঝড়ের মধ্যে পড়ার চেয়ে তাও অনেক ভালো।

আকাশে ধূসর কালো মেঘের দ্রুত সমাবেশের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে দুরুদুরু বুকে প্রসাদ জাম পাড়ছিল, দূর থেকে ঝড়ের সোঁ-সোঁ আওয়াজ কানে এলো কারখানার দিক থেকে। ন্যাকড়ায় বাঁধা জামের পুঁটুলি পকেটে ভরে সেদিকে পিছন ফিরে প্রসাদ ছুটতে আরম্ভ করল। কোনোমতে পেনোর মাঠ পার হয়ে রেললাইন ধরে স্টেশনে পৌছে যদি আশ্রয় নেওয়া যায়। দুশো গজ

দৌড়ালেই প্রসাদকে হাপরের মতো হাঁপাতে হয়, সুতরাং হাঁফ ধরবার আগেই বাতাসের প্রথম ধাক্কায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠে বসা মাত্র ধুলো আর বালিতে দুটি চোখ যেন তার অন্ধ হয়ে গেল। একটা শুকনো ঝাঁকাটির চারা গড়িয়ে এসে তার গায়ে আটকে গেল, শুকনো পাতা তার গায়ে মাথায় ক্ষণিকের জন্য লেপটে থেকে ছিটকে উড়ে যেতে লাগল, একটা শুকনো ডাল কোথা থেকে এসে লাঠির মতো আঘাত করল তার ঘাড়ে! তারপর নামল বৃষ্টি। ঝড়ের শক্তি আর কলরব যেন দশগুণ বেড়ে গেল। দুটি বুড়ো আঙুল দুকানে ঢুকিয়ে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে প্রসাদ তখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জীবনে কখনো সে ঝড়ের মূর্তি চেয়ে দ্যাখেনি। ঝড় উঠলে সে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে চোখ কান বন্ধ করে থাকে, মাঝেমাঝে মুখ দিয়ে বার হয় ভয়ের ওঁ-ওঁ কাতরানি। কত কালবৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙে চারিদিকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায়নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের প্রথম কালবৈশাখী উল্লাসে আরও বেশি ক্ষেপে গেল। বৃষ্টি-ধারাকে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে গায়ে তার প্রচণ্ড বেগে ঝাপটা মারতে লাগল ক্রমাগত, চারিদিকের গাছে আর্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়মড় শব্দে ভেঙে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবের ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ। একটা কিশোর তেঁতুল গাছ গুঁড়ির কাছে মটকে ভেঙে আছড়িয়ে পড়ল, ডগার সরু সরু ডালপালাগুলি অসংখ্য চাবুকের মতো একসঙ্গে আঘাত করল প্রসাদের পিঠে। সেই মুহূর্তে ঠিক মাথার উপরের অবনত আকাশে প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠল বজ্র।

তখন ধীরে ধীরে প্রসাদ উঠে বসল। অন্ধ ভয়ে মনে মনে সে মুহুর্মুহুঃ মরছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় জাগায় তার খেয়াল হয়েছে যে এখানে এভাবে পড়ে থেকে সত্যসত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরণের মতো বারবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল। এত জোরে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল যে মাথাটা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবু বমির বেগ ঠেকানো গেল না, দুহাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে সে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। এমন হাল্কা মনে হতে লাগল নিজেকে যে শুকনো পাতার মতো বাতাস যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে

যাবে। কয়েক মুহূর্ত দুহাতে সে মাটি আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর উঠে দাঁড়ানো মাত্র বাতাসের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধা প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কি না ভেবে কিছুক্ষণ সে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না। আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌছতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে না। ফাঁকায় গিয়ে পৌছতে পারবে কিনা ভেবে উৎকণ্ঠায় বারবার তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো। হেডলাইট জ্বালিয়ে রেললাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে প্রবল হাসিকান্নার আবেগে প্রসাদের দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নড়তে পারল না। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেই অগভীর একটা খাদে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকু তার দুঃখ হল না, আঘাতের বেদনাও অনুভব করল না। নিজের সঙ্গে সে যেন তামাসা করছে এমনি ভাবে গোঙিয়ে গোঙিয়ে সে হাসতে লাগল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার আগে সস্নেহ পরিহাসের ভঙ্গিতে ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে বলল, 'ধুত্তোর নিকুচি করেছে, ছুটতে গেলি কেন?' হামা দিয়ে খাদের গা বেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আবার ট্রেনের আলোর দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

প্রকাণ্ড একটা গাছ ভেঙ্গে পড়ে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। একটি থার্ড ক্লাস কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রসাদ মরমে মরে গেল। একগাড়ি লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জামা কাপড় তার কাদা আর রক্তে মাখা-মাখি হয়ে গেছে, না-জানি কী ভাবছে সকলে তাকে দেখে! কামরার দরজা-জানালা সব বন্ধ, ভিতরে অসহ্য ভ্যাপসা গরম। প্রসাদের দম আটকে আসবার উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি অপর দিকের দরজা খুলে সে লাইনে নেমে গেল।

বাড়িতে পৌঁছানোমাত্র ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পৌঁছে দিয়েছিস?'

'আজ্ঞে না।'

ভূষণ কটমট করে তার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে।'

এক পকেটে ন্যাকড়া বাঁধা জাম ছিল, অন্য পকেটে ভূষণের রুমালে বাঁধা সাতশো' তেইশ টাকা। জামগুলি ছেঁচে গেছে, রুমাল শুদ্ধ টাকাগুলি কখন কোথায় পড়ে গেছে ভগবান জানেন। পেনোর মাঠেই কোথাও পড়েছে, সে যখন আছাড় খাচ্ছিল অথবা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল।

থাবা উঁচিয়ে ভূষণ তার দিকে এগিয়ে আসে, ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে আরম্ভ করে দেয়। সে ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ভূষণ তাকে মারবে! খালি পেটটা গুলিয়ে উঠে আবার তার বমি ঠেলে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরতে মাথার কাঁপুনি শুরু হয়ে যাওয়ায় চোখের সামনে ভূষণের মস্ত গোলগাল মুখখানা পাশাপাশি দুদিকে লম্বা হয়ে যায়।

কাছে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেই ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে, খানিকটা তফাতে থেমে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে! তাকে মারবার জন্য এগিয়ে এসে ভূষণের ভয় হয়েছে!

'পেনোর মাঠে খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'পাওয়া যায় ভালোই, নইলে তোকে পুলিশে দেব।'

ভূষণের ধমকে ঝাঁঝ নেই, এ যেন শুধু কথার কথা। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে এসে প্রসাদের মূর্তি হয়েছে ভীতিকর, তার লাল চোখের ভয়ার্ত চাউনি দেখে বুক কেঁপে ওঠে। আশার সখের আলমারিতে বসানো প্রকাণ্ড আয়নায় প্রসাদ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ভূষণ ভয় পেয়েছে, তাকে দেখে ভয় পেয়েছে, অনুমান করে প্রথমে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর ধীরে ধীরে জাগল উল্লাস, নিজেকে ভূত সাজিয়ে গুরুজনকে আঁতকে উঠতে দেখলে ছোট ছেলের যেমন উল্লাস জাগে সেইরকম, কিন্তু ঢের বেশী প্রচণ্ড ও উৎকট।

তার মধ্যেও মাথাটা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মনে হয়। ধীরে সুস্থে সব যেন সে হিসাব করতে পারছে, বুঝতে পারছে, ভুল হবার ভয় নেই। সে টের পাচ্ছে

রুখে ওঠার ভঙ্গিতে সে যদি এখন দুপা এগিয়ে যায়, ভূষণ আরও ভয় পাবে, আরও সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাবে, আরও নরম গলায় কথা বলবে; হয়তো দুপা পিছিয়েও যাবে! এত ভীরু ভূষণ? এত সহজে সে ভয় পায়?

কী যে উপভোগ্য মনে হয় এই মুহূর্তগুলি প্রসাদের! শেষ করে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বিকেলেও যার কাছ থেকে ছুটে পালাবার জন্য অদম্য প্রেরণা জেগেছিল, অকারণে সাধ করে তার সামনে প্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলার নেই জেনেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভাণ করে বলে, 'পড়ে গেলে কি করব! গাছ চাপা পড়েছিলাম, মরে যেতাম আরেকটু হলে। তখন কারো টাকার কথা খেয়াল থাকে?'

ভূষণ ভয়-বিস্ময়ের ভাণ করে সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'গাছ চাপা পড়েছিলে? খুব বেঁচে গেছ তো!'

তখন বিজয়ী বীরের মতো প্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আশা তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'মাগো মা, একি?'

ন্যাকড়ায় বাঁধা ছ্যাচা জামগুলি দেখিয়ে প্রসাদ বলল, 'আপনার জন্য পেড়েছিমাম।'

আশা চাপা গলায় বলল, 'সত্যি?'

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে স্টোভ জ্বেলে আশা রাঁধছে ভূষণের নৈশভোজনের মাংস। ঘরের মধ্যে গন্ধ আর গরমের অসহ্য সমন্বয়। গায়ের জামা সেমিজ সে খুলে ফেলেছে, ঘামে ভিজে সিদ্ধ মাংসের মতো তার মেটে চামড়া হয়ে গেছে স্যাঁতসেঁতে। 'একটাও ভালো নেই?' বলে মুখে পুরবার উপযুক্ত জাম খুঁজতে সে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের আলগা আঁচলটিও তার খসে পড়ল, মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল রিঙে বাঁধা একরাশি চাবি।

প্রসাদ চোখ বুজতে চায়, বুজতে পারে না। পালিয়ে যাবে ভেবে পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভূষণকে ভয় দেখিয়ে যে বিদ্রোহী উগ্র আনন্দ তার জেগেছিল, এত সহজে তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে সে-আনন্দ তাকে যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেবে না। মহাপাপ থেকে, অনন্ত নরক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের দেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে সে শুধু দেখতে পায় কোমল মাংসে

গড়া কাঁধ, বাহু আর বুক। আশা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র তার ঘামে ভেজা দেহটা সে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

গভীর আলস্যে হাই তোলার মতো মুখের ভঙ্গি করে আশা বলল, 'মরণ তোমার! বাড়ী ভরা লোক নেই?'

তবু সে তাকে বুকে চেপে ধরে রাখল আরও খানিকক্ষণ। ছোটছোট কটা চোখের বিহ্বল দৃষ্টি তার মুখে বুলিয়ে, হলুদ রঙীন আঙুলে তার কপালের এলো-মেলো চুল সরিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'পড়ে গিয়েছিলে মাঠে? খুব লেগেছে?'

বিস্ময় বা উত্তেজনা আশার নেই, মদালস অচপল নারীর মতো সে যেন বহু পরিচিত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করেছে। কতটুকু সময়ই বা প্রসাদের কাটল সেই ব্যাকুলতাহীন নিবিড় আলিঙ্গনে! ভূষণকে যতটুকু সময় ভয় দেখিয়েছিল তার চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশার এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা-কপাল কুটে সে আর্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশ বালিশকে আঁকড়ে ধরার মতো তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গমর্ত ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃৎপিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের ঢিপঢিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে ঢ্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তনের চাপে আগুন ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল। প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, 'সাফসুফ হয়ে নাও গে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বড় বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।'

আশার স্নানের ঘরে গোলাপের গন্ধ, একটানা, অনিবার্য, জমজমাট গন্ধ। তিন আনা দামের একটি সাবানে এত গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়, গোলাপের আরক কত সস্তা। মনটা প্রসাদের আশ্চর্যরকম সাফ মনে হয়, ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যু ভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ করে দিয়েছে মাছির মতো অন্যের চটচটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়। ঘষে ঘষে সাবান মেখে প্রসাদ স্নান করল। রান্নাঘরের এক কোণে বসে ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাত

পেট ভরে খেয়ে নিল। ঝড়বাদল তখন অনেকটা কমে এসেছে। প্রসাদ সদরে গিয়ে দাঁড়াতে তাকে ভয় দেখাতেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বাতাস হঠাৎ প্রবল হয়ে চারিদিকে সাঁ-সাঁ রবে শব্দিত হয়ে উঠল। প্রসাদের নবলব্ধ সাহসও এতক্ষণে অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বাতাস অনেকটা শান্ত হয়ে এলে সে পথে নেমে গেল। রেললাইনে এখনো ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। লাইন পার হয়ে যে-পথে পেনোর মাঠ থেকে সে পালিয়ে এসেছিল সেই পথে ভূষণের দামী বড় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চলল। টাকার পুঁটলিটা খুঁজে পাওয়ার পরেও যদি ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এই ট্রেনেই সে উঠে পড়বে। নয়তো স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে, যে-কোনো দিক থেকে প্রথম ট্রেনের প্রতীক্ষায়।

ভাবতেও প্রসাদের বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কোন ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে সে গিয়ে পড়বে! তবে তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের পরিচয় হলে, ভয় তার কেটে যাবে। সাতশো তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে একটা দোকান-টোকান খুলেও সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না? এমন একটি বৌ-ও কি তার জুটবে না যে কিশোরী, পূর্ণ-যৌবনা, কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে তোলা জমকালো সংসারের গৃহিণী?

রোমান্স

কলসী কাঁখে পাতলা ছিপছিপে একটি বৌ বেগুন ক্ষেতের পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। কলসীর ভারে একটু সে বাঁকা হয়ে পড়েছে। পিতলের প্রকাণ্ড কলসী, মাজা ঘষা চক্‌চকে। বৌটির পরণের কাপড়খানি ভেজা, এখানে ওখানে গায়ে এঁটে গেছে, লট্‌পট করছে। গড়ন পাতলা হলেও স্বাস্থ্য তার খুব ভালো। গায়ে রীতিমত জোর না থাকলে অতবড় কলসীর ভারে কোমর তার মচকে যেতে পারত।

সূর্য এখন প্রায় মাথার উপর। রোদের তাপে পায়ে-চলা সরু পথটির পাশে ঘাসে ঢাকা মাটি পর্যন্ত তেতে গেছে। ভিজে গামছা ভাঁজ করে বৌটি মাথায় বসিয়েছে।

বেগুন ক্ষেতের পরে ছোটখাট আম-কাঁঠালের বাগান। গাছে গাছে বাগানটি জমজমাট কিন্তু কেমন যেন শুকনো নিষ্ফল চেহারা গাছগুলির, কয়েকটি গাছে শুধু কাঁচাপাকা দুচারটি আম ঝুলছে। বাগানের ওপাশে টিনের চাল আর দরমার বেড়ার বাড়ি আছে টের পাওয়া যায়, গাছের ফাঁকে ভালো করে চোখ পড়ে না। বাকী তিন দিকে দূর বিস্তৃত মাঠ আর ক্ষেত, এখানে-ওখানে বাড়িঘর গাছপালার ছোটছোট চাপড়া বসানো। বেগুন ক্ষেতের চারিদিক নির্জন, দিনে-রাতে সবসময় কারো কারো এখানে কম বেশি গা ছমছম করে।

বেগুন ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পুরানো প্যাণ্ডাসে আলপাকার উর্দি আর কোলবালিশের সরু খোলের মতো প্যাণ্টালুন পরা মাঝবয়সী একটি লোক জোরে জোরে আম-কাঁঠালের বাগানটির দিকে চলছিল। বারবার সে বৌটির দিকে চেয়ে দেখছে। গোঁফ দাড়ি চাঁছা এবং কানের ডগা পর্যন্ত জুলপি তোলা তার লম্বা ফর্সাটে মুখে চোখ দুটি বেশ বড়-বড়, যদিও ছোট হলেই মানাতো বেশি।

বাগানে একটা কাঁঠাল গাছের নিচে সে বৌটির পথ আটকাল। পাশ কাটিয়ে যাবার পথ অবশ্য চারদিকে অনেক ছিল। পায়ে চলা যে সরু পথটি ধরে বৌটি আসছিল সেটাও কাঁঠাল গাছটির হাত তিনেক তফাৎ দিয়েই গিয়েছে। বৌটি নিজেই সরে তার সামনে আসায় এগোবার আর পথ রইল না।

'ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।'

'এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?'

'তোমারি বা এ কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিন দুকুরে নাগাল ধরা?'

দুহাতে কানা ধরে কলসীটা সে নামিয়ে রাখল। যে কাঁখে কলসী ছিল তার উল্টো দিকে বেঁকে বেঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। সুবলের ক্রুদ্ধ নালিশভরা দৃষ্টি দেখে একবার সে অপরাধিনীর মতো একটু হাসল। অবহেলার সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

'গোড়ায় তো ডরিয়ে গেলাম, কোন্ মুখপোড়া উঁকি মারছে গো? শেষে দেখি মোদের সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম।' ফিক্ করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার জন্যে। সত্যি তোমার জন্যে—কাল ফিরে যেতে হল তোমার!'

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'কাল তো প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাত দুপুর তক্ শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন,'—দুহাত জড়ো হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গেল—'সাপের কামড়ে মরব একদিন।'

সুখময়ী আপসোসের আওয়াজ করল চুকচুক, 'বালাই ষাট। কিন্তু কী করি, তেনা যে ফিরে এল গো!'

'একবার জানান দিয়ে তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে—'

'ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?'

'সোয়ামির সাথে মেয়েমানুষের আবার কী নিয়ে ছগড়া হয়? শাড়ি গয়না নিয়ে।'

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, 'তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—'

'ইস? ফতুর হয়ে যাবেন!' ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলিতে ভোঁতা ঝকমকি খেলে গেল।—

'ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হতেই তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাউড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বৌ, শাড়ী গয়না

কোথা পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি? তার চেয়ে এক কাজ করনা? শিরীষতলায় মশার কামড় খেয়ে তোমারও কাজ নেই, শাড়ি গয়না পরে বেড়ালে কেউ যে শুধোবে তাতেও মোর কাজ নেই—এমনি কিছু কর?'

সুবলের মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেল।—'তা জানি, তোর শুধু গয়না শাড়িতে মন।'

'না গো না, গয়না শাড়ি আমি চাইনে। আমার মনটি তোমার।'

'তাই যদি হত সুখী—'

'হত মানে? তুমি ভাবো গয়নার লোভে তোমায় মন দিইছি। কত গয়না দেবে তুমি? কত মুরোদ তোমার? কলকাতায় নিয়ে সেজবাবু সোনায় মুড়ে রানী সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তা গিইছি আমি? আমি বলি—না, যাকে মন দিইছি তার সাথেই চুলোয় যাব, চুলোয় যদি যাই।'

'হুঁ।'

'বিশ্বেস হয় না, না? বেশ তো, চল না এখুনি যাই। এক কাপড়ে এখুনি গিয়ে গাড়ি ধরি তিনটের। তুমিও ফকির, আমিও ফকির।'

পাতার ফাঁক দিয়ে সুবলের সর্বাঙ্গে চাকাচাকা আলো আঁকা হয়ে গেছে। ভিজে গামছা দিয়ে সুখময়ী তার মুখ আর ঘাড়ের ঘাম সযত্নে মুছে দিল। কিন্তু সুবল খুশি হয়েছে মনে হল না, সুখময়ীর কাছ থেকে এরকম ছোটখাট আদর পাওয়ার বিশেষ দাম যেন নেই, পুরানো হয়ে গেছে।

'অমন যার মন হয় সে একবারটি শিরীষতলায় আসে। কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।'

'ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্তে গেল তো কী করব আমি? হাত-পা বাঁধা মেয়েলোক বই তো নই। ঘরের বৌ, পরের দাসী, কী খ্যামতা মোর আছে বলো? তোমায় ঠকাব, তোমার জন্যে মরণ হয়েছে আমার? কিছু ভালো লাগে না সুবলবাবু, একদণ্ড ঘরে মন বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি। মন করে কি, দূর ছাই, ঘর-সংসার ফেলে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই।'

বড় একটা ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ সুখময়ীর মুখ ঘেঁষে কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে পড়েছে। আবেগ আর উত্তেজনায় এতক্ষণে যেন চোখ দুটি তার

সেই আলোতে জলজল করে উঠল। সুবল কথাটি বলে না। উসখুস করে আর এ পা থেকে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

'দেশ গাঁ ছেড়ে দূর দেশে পালিয়ে যাই, দেশে কেউ মোদের চিনবে না। সব বালাই চুকিয়ে দুজনে ঘর-কন্না করি।'

'তা হয় না সুখময়ী। চাদ্দিকে বড় নিন্দে হবে, আর ফেরা যাবে না।'

'কে ফিরছে হেথা? জমি-জায়গা সব বেচে দিয়ে আমায় নিয়ে পালাবে। মোদের ফিরবার দরকার!'

'মোক্তারি করে দুটো পয়সা পাচ্ছি—'

এখানে গাছের ছায়াতে গুমোটে গরম, সুবলের কপাল ঘেমে চোখে এসে পড়তে চায়। আঙুল দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছে মুছে ঝেড়ে ফেলতে থাকে। সুখময়ীর ভিজে চেহারায় ঘাম টের পাওয়া যায় না। আগ্রহ উত্তেজনা ফুরিয়ে গিয়ে সে শান্ত হয়ে গেছে। ঝুঁকে কাপড় তুলে সে একবার হাঁটুর কাছে চুলকে নিল, সোজা হয়ে হাঁটু চুলকানো আঙুলেরি একটার ডগা কামড়ে ধরল। ঘাড় তার কাত হয়ে গেল ভাবনায়।

কলসীর কানা ধরে তুলতে গিয়ে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। সুখময়ীর রাগ হয়েছে। কলসী ছেড়ে পাক দিয়ে সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার ফোঁস করে ফণা তুলে সাপের কামড়ে দিতে চাওয়ার মতো। কি মিষ্টি হাসিই সুখময়ী হাসল। আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে সুবলকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, সুবলের মুখের কাছে কিন্তু পৌঁছল না। গাছে পিঠ দিয়ে সুবল তখন কাঠ হয়ে গেছে।

'মোর চেয়ে তোমার মোক্তারি বড় হল?'

'কত কষ্টে পশার করেছি, দুটো পয়সা পাচ্ছি—'

সুখময়ী এতক্ষণে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। সুবল নরম হয়ে আসছে। একটি হাত তার সুখময়ীর পিঠে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'তুমি না ফতুর হতে পার আমার জন্যে? ঘর বাড়ি জমি জায়গা বেচে ঢের টাকা পাবে, ব্যবসা করে রাজা হয়ে যাবে তুমি! রানীর মতো খাটে শুয়ে আমি হাই তুলবো, আর চাকরাণী মাগীগুলোকে হুকুম করব। চানের ঘরে তুমি আমার চান দেখবে—সত্যি দেখাব, দিব্যি গালছি।'

'আচ্ছা, তাই যাব সুখময়ী, সব বেচে দিয়ে তোমায় নিয়ে বিদেশে যাব। কিন্তু সে তো দুচার দিনে হবে না—'

'মোক্তারি জানো বটে তুমি সুবলবাবু। দাঁড়াও আমি আসছি কলসী রেখে।'

কাঁখে কলসী তুলতে গিয়ে সুখময়ী আজ বোধ হয় এই প্রথম টলে পড়ে গেল। কলসীর জল শুষে নিল মাটি, আর তার ভিজে কাপড় কুড়িয়ে নিল মাটির লাল ধুলো।

'অদেষ্টে কত আছে!' বলে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভোঁতা গলায় সে বলল, 'দাঁড়াও বাবু। একটু সাবুন আনি, নইলে এ মেটে রঙ ওঠবার নয়। ফের নাইতে হবে।'

বাড়ির অঙ্গন শূন্য, ঘরের বাইরে কেউ নেই। বাইবে কেউ থাকেও না এ সময়। সুখময়ী রেঁধে বেড়ে খাইয়েছে সবাইকে, আর কোনো কাজ কারো নেই। রসুই ঘরের দাওয়ায় একতাড়া মাজা বাসন। ঘাটে গিয়ে বাসন মেজে এনে তবে তার কলসী নিয়ে নাইতে যাবার ছুটি হয়। কলসী ভরে জলটি আনা চাই। পূবের ঘরে নটবর হুঁকো টানছে, কথা বলছে পাড়ার কানাই ধরের সঙ্গে। শাশুড়ী শুয়েছে, নটবরের বৌ-মরা ভাই তার সঙ্গে পরামর্শ করছে আগামী বিয়ের—জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতুই আসতে মাসেক সময় নেই!

বাড়ির কুকুরটা উঠে এসে লেজ নেড়ে অভ্যর্থনা জানাতেই সুখময়ী তাকে একটা লাথি কষিয়ে দিল। আর সেই অবোধ প্রাণীর কেঁউ কেঁউ আর্তনাদ শেষ হবার আগেই রসুই ঘরের দাওয়ায় বাসনের গাদায় আছড়িয়ে পড়ে শুরু করল নিজেব আর্তনাদ—একটু চাপা, একটু অস্বাভাবিক স্বরে। ভয়ে তার গা কাঁপছিল।

সবাই ছুটে এল। একসঙ্গে শুধোতে লাগল, কী হয়েছে? বৌকে জড়িয়ে ধরে নটবরের মা জুড়ে দিল কান্না। কুকুরটা তখনো কেঁউ কেঁউ করে মরছে! সুখময়ীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল। কী থেকে কী হবে তা ভগবান জানেন, এই তাঁর শেষ লড়াই।

সুখময়ী কেঁপে কেঁপে কেঁদে কেঁদে বলল, 'বড্ড ভয় পেইছি মা। বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। কত বলি একলাটি ঘাটে যেতে ডর লাগে, কেউ তো যাবে না সাথে। নইলে কি ওই মুখপোড়া সুবল মোক্তার—'

শুনে সবাই একসাথে চুপ মেরে গেল। ইতিমধ্যে পাশের দুবাড়ির মেয়ে-পুরুষ

ছুটে এসেছিল। তারাও হঠাৎ চুপ হয়ে গেল জন্ম-বোবার মতো। নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি ছাড়া কি আর করার আছে এমন একটা অসম্পূর্ণ খবর শুনে? নটবরের মা'র কান্না থেমে গিয়েছিল, প্রথমে অধীর হ'য়ে শুধোল, 'কি করেছে সুবল মোক্তার? অ বৌ, বল্না কী করেছে সুবল মোক্তার?'

'বাগানে একলাটি পেয়ে হাত চেপে ধরেছিল গো, কলসী ফেলে পালিয়ে এইছি। ছুটতে ছুটতে আছাড় যা খেইছি কবার—হা ছ্যাখো।'

হাতের তালু আর কাপড়ে রক্ত-মাটি ও রক্তের দাগ সে দেখিয়ে দিল। কয়েকজনের চাপা নিশ্বাস পড়ল একটু নিরাশার সঙ্গে, কতবড় সম্ভাবনার এই পরিণতি! শুধু হাত ধরেছিল! দুপুর বেলা জনহীন বাগানে মেয়েমানুষকে নাগালে পেয়ে শুধু হাত ধরেছে সুবল মোক্তার? মামলা মোকদ্দমা হবে না, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে আজকালের মধ্যে। একি একটা ঘটনা!

তবু সবাই ছি-ছি করে আর সুবল মোক্তারকে গাল দেয়। বাগানে গিয়ে তাকে শাসন করে আসার কথাটা কেউ ভাবেও না, বলেও না। শেষে সুখময়ীকেই ঝাঁঝ দেখিয়ে বলতে হয়, 'অ ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে শুধু জটলা করবে তোমরা? যাও না, দুঘা দিয়ে এসো না বজ্জাতটাকে?'

নটবরের মা বলে, 'চুপ কর্ মাগী, চুপ কর্।'

'কেন চুপ করব? আমার হাত ধরবে, তোমরা তা চুপ করে সয়ে যাবে!'

নটবর বলল, 'ও শালা কি আর আছে, পালিয়ে গেছে।'

'থাকতে তো পারে? কলসী আনতে ফিরে যাব ভেবে থাকতে তো পারে ঘুপচি মেরে? যাও না একবার, দেখে এসো।'

তখন নটবর, শশধর, নিতাই আর পাড়ার একজন সুবলকে খুঁজতে যায়, নটবরের মা চেঁচিয়ে বলে দেয়, 'কলসীটা আনিস কেউ। শুনছিস কলসীটা আনিস।'

সুখময়ীকে ঘিরে মেয়েদের জটলা চলতে থাকে। চারিদিকে তারা রটাবে, তবু তারাই বলে যে এমন হৈ-চৈ করা উচিত হয়নি সুখময়ীর, জানাজানি হওয়া কি ভালো! চুপিচুপি শাউড়ি বা সোয়ামিকে বললেই পারত সে, পুকুরঘাটে যাওয়ার সময় একজন কেউ সঙ্গে যেত। সুখময়ী শুনে যায়, কথা বলে না। নটবরের মা'র চাপা আপসোস আর গালাগালির জবাবে শুধু ফোঁস করে ওঠে।

সুবলকে পাওয়া গেল কাঁঠাল বাগানেই, কিন্তু ধরে মারবার সাহস হল না একজনেরও।

নিতাই নেহাৎ বদরাগী মানুষ, সে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'বৌ-ঝির হাত ধরে টানা কেন মোক্তারবাবু?' সুবল রেগে বলল, 'তোর তো বড় বাড় হয়েছে নিতাই, যা মুখে আসে তাই বলিস!' শশধর মৃদুভাবে সাবধান করে দিল, 'আর যেন এসব না ঘটে মোক্তারবাবু।'

সুবল আর কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে গেল। মুখখানা তার একটু ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। সুখময়ী ফুরিয়ে গেল, চিরতরে সরে গেল তার জীবন থেকে। একটু কলঙ্ক তার রটবে—কিন্তু তীব্র অস্বীকারের জোরে সে তা উড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু আবার যদি এমন কিছু ঘটে, দুর্নাম তার জোর পাবে।

বড় একটা মামলা ছিল সুবলের এ-সময়, মনটা একেবারে খিঁচড়ে গেল! নাঃ, মনটা একটু শক্ত করতে হবে তার। সবে প্র্যাকটিস জমছে। বাকী দিনটুকুতে ছোট মহকুমা সহরের চারিদিকে যে তাদের নামে ঢি-ঢি পড়ে গেছে, সেটা সুখময়ী টের পেল সন্ধ্যার পর নটবরের হাতে বাখারি খেয়ে। বাকী দিনটা বাড়ির সকলে মুখ ভার করে থেকেছে, তাকে বাদ দিয়ে করেছে জটলা। বিকেলে আড্ডা দিতে বেরিয়ে সন্ধ্যার পর মুখ অন্ধকার করে নটবর ফিরে এল, গর্জাতে গর্জাতে মা আর ভাইকে জানিয়ে দিল সহরশুদ্ধ লোক কী বলাবলি করছে এবং খবরটা ভালো করে শুনবার আগ্রহে সুখময়ী কাছে এসে দাঁড়াতে সরু একটা বাখারি তুলে তার পিঠে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। সরু বাখারির বেতের মতো ধার, পিঠ কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল সুখময়ীর।

কিন্তু সে তীব্র ব্যথা তার কাছে অতিরিক্ত ঝাল-খাওয়া সুখের মতো লাগল। কলংক তবে রটেছে! তবে আর এখন কী বাধা রইল সুবলের তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার? এ বদনাম সয়ে সে তো টিঁকতে পারবে না এখানে। যেতে হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না কেন?

নটবরের মা বলল, 'থাক, থাক। মারধোর করে কাজ নেই। ও-বৌকে তো আর ঘরে রাখা যাবে না। কাল সকালে খেদিয়ে দিস। মামার বাড়ি যাক, নয়তো চুলোয় যাক।'

শুনে একটু ভাবনা হল সুখময়ীর। সত্যি তাকে তাড়িয়ে দেবে নাকি? গালাগালির জন্য সে তৈরী হয়েই ছিল, তার উপর নয় কিছু মারধোর হয়েছে। কিন্তু খেদিয়ে দিলে তো মুস্কিল! সুবলের যদি বেশি রকম রাগ হয়ে থাকে, তাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না চায়! পুরুষের মন তো, বিগড়ে যেতে কতক্ষণ! তবে

তো তার একুল-ওকুল দুকুল যাবে, মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে না জগতে। মামা কি ঠাঁই দেবে তাকে? মামারও তো শুনতে বাকী থাকবে না এ কেলেংকারির কথা।

ভাবে আর সুবলের প্রেমে বিশ্বাস হারিয়ে সে পিঠের জ্বালায় কাতরায়। চুলোর ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বলে আর ভাতের হাঁড়ির বাষ্পে জগৎ ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। আগুনের আঁচে মাঝে মাঝে শরীরটা শিউরে ওঠে, জ্বর আসবার মতো উদ্ভট শিহরণ। জল ছুঁতে গিয়ে গা ছমছম করে। জ্বর কি একটু এসেছে তাহলে তার? সকলকে ভাত দিয়ে হেঁসেল তুলে খাওয়ার অনিচ্ছা নিয়ে খিদের জ্বালায় কিছু খায়। রসুইঘর বন্ধ করে কুপি হাতে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় কুপিটা নিভিয়ে রেখে ঘরে ঢোকে। চৌকিতে বসে নটবর তামাক টানছে। কাল তাকে খেদিয়ে দেবে নটবর। এতকাল সোহাগ করে কাল তাকে দূর করে দেবে। সুবলের সঙ্গেই পালিয়ে গিয়ে বা তার তবে কী লাভ হবে? বৌকে যদি মানুষ খেদিয়ে দিতে পারে, দুদিন পরে সুবল কেন তাকে ফেলে পালাবে না?

নটবরকে একটু নরম করার চেষ্টার কথা মনে আসে, কিন্তু সুখময়ী উৎসাহ পায় না। রাগ কমিয়ে কতবার সে নটবরের সোহাগ আদায় করেছে, কৌশল তার অজানা নয়, কোনদিন ব্যর্থও হয়নি। আজ সে মনে জোর পায় না। বাখারির মার খেয়েছে বলে নয়। মার খেলেও মান বাঁচিয়ে সোহাগ যাচা যায়। নিজের উপরেই আজ তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে কেমন রূপহীনা, কুৎসিত মনে হচ্ছে। তার যেন কাটির মতো সরু আর কাঠের মতো শক্ত দেহ। কী দিয়ে সে নটবরকে নরম করবে? তার চেয়ে শুয়ে পড়া ভালো। মাথা ঘুরছে, পিঠ জ্বলছে, শরীর ভেঙে পড়ছে, চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে রাতটা কাটানো যাক। সুবল নটবর সকলের ভরসাই যখন তার ফুরিয়ে গেছে, কী আর হবে আকাশ পাতাল ভেবে।

চৌকিতে উঠতে তার ভরসা হল না। মেঝেতে মাদুর বিছাতে গেল। তখন কথা কইল নটবর।

'দোর দে, হুঁকোটা রাখ।'

সুখময়ী দুয়ার বন্ধ করে হুঁকোটা রেখে মাদুরে শুয়ে পড়ল। পিঠে ব্যথা ছিল, মনে খেয়াল ছিল না, অভ্যাস মতো চিৎ হয়ে শুয়েই মৃদু আর্তনাদ করে সে পাশ ফিরল। চৌকিতে বসে প্রদীপের আলোতে নটবর তাকে খানিক দেখল, পা গুটিয়ে কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে বৌটা তার শুয়েছে!

'পিঠে ব্যথা হয়েছে নাকি বৌ? গোসা হয়েছে? আর মারবো না তোকে। কোন শালা আর তোর গায়ে হাত তোলে!'

'আমায় কাল তাড়িয়ে দেবে?'

'দূর পাগলি। ও কথার-কথা বলছিলাম। তোকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?'

সুখময়ী নিজেই স্বামীকে বুকে টেনে নিয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুজল। মাদুরের ঘষায় পিঠে যেন তার করাত চলতে লাগল অনেকগুলি। একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে আবার চেতনা ফিরে এল, তবু সে শব্দ করল না। আর্তনাদগুলি বুকে চেপে, গোঙানিগুলি গলায় আটকে রেখে দিল। নটবর ছেড়ে দেওয়ামাত্র সে পাশ ফিরল। আলো নিভিয়ে চৌকির বিছানায় শোবার সময় কর্তব্যবোধে নটবর বলল, 'গা যেন তোর গরম দেখলাম, জ্বর হয়েছে নাকি?'

'একটু হয়েছে।'

'মেঝেতে কেন তবে? চৌকিতে আয়।'

'যাই।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৌকিতে সে গেল না। আলো নেবার আগে সে দেখেছে, পিঠের রক্তে মাদুর লাল হয়ে গেছে।

নটবর ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করল। তখন চুপিচুপি দরজা খুলে সুখময়ী বাইরে বেরিয়ে গেল। রাত বেশি হয়নি, শশধর জেগে আছে। পাড়ার লোকও হয়তো জেগে আছে অনেকে। থাক জেগে! কতক্ষণ লাগবে তার সুবলকে দুটি কথা শুধিয়ে আসতে? বাগান হয়ে বেগুনক্ষেত পার হলেই সুবলের বাড়ি।

ডুবুডুবু চাঁদের জ্যোৎস্না এখনও একটু আছে। বাগানের গাঢ় অন্ধকার কোন রকমে পার হলে পথের চিহ্ন নজরে পড়ে। সুখময়ী তরতর করে বেগুনক্ষেতের বেড়া ঘেঁষে এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফেরা চাই, নটবরের ঘুম ভেঙ্গে গেলে যাতে সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎটা দেওয়া যায়। সুবলের বাড়ির ঘরে ঘরে আলো নিভেছে। তার ঘরের পাশে গাঁদাফুলের বাগান। একটু তার ফুলের বাগান করার সখ আছে। বাড়ির সামনের বাগানটি তার দেখবার মতো, এখান থেকে নানা ফুলের মেশান গন্ধ নাকে আসে। প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে সুবল বেরিয়ে এল।

'চুপ। আস্তে। আবার কেন?'

'ত্মাখো, তোমার জন্যে কি মারটা মেরেছে আমায়।'

'তোমার জন্যে আমার বদনাম হল সুখময়ী। কত ভালো বলতো লোকে আমায়, কত সম্মান করতো, তোমার জন্যে সব গেল।'

'চল আমরা পালিয়ে যাই দুচার দিনের মধ্যে। সব বেচে দাও—'

'তোমার খালি বাজে কথা। সব বেচে মোক্তারি ফেলে কোথায় যাব?'

'এত কেলেংকারী হল, চারিদিকে ঢি-ঢি পড়ে গেল, তবু থাকবে? কি করে থাকবে?'

'আস্তে আস্তে ভুলে যাবে লোকে।'

সুখময়ী আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসছিল, সুবল তার হাত চেপে ধরল।

'শীগগির ফিরতে হবে।'

'একটু বসে যাও? বৌ মরে গেছে কবে, এতকাল বিয়ে করিনি তোমার জন্যে? একটু বসে যাও?'

সুবলের ঘাট বাঁধানো। মোক্তারির টাকায় সবে ঘাট বাঁধিয়েছে, এখনো কোথাও ফাটল পর্যন্ত ধরেনি। ঘাটের ধোয়া মোছা পরিষ্কার সিমেণ্টও সুখময়ীর পিঠের রক্তে লাল হয়ে গেল। সমস্ত ঘাট নয়, সুখময়ীর পিঠের নীচেকার অংশটুকু।

পরদিন নাইতে এসে লোকে বলল, কুকুর বা বিড়াল ছানা বিইয়েছে সেখানে। কিম্বা বুনো শেয়াল।

ধনঞ্জন যৌবন

মেঝেতে বিছানো মাদুরে আছড়ে পড়ে রাঘব তখন সতর্ক চাপা গলায় আর্তনাদ করার সঙ্গে বার তিনেক জোরে জোরে নিজের কপালটা চাপড়ে দেয়। গায়ে জোর আছে, কড়া-পড়া হাতের তালু। গলার চেয়ে কপাল চাপড়ানোর আওয়াজটা হয় জোরালো।

'অসতী করেছে করেছে, প্রাণে মারতে পারল না? ধম্মো নিল, প্রাণটুকু নিতে তার কী হয়েছিল!'

ফাঁসি হবে বলে নিজে সুমতিকে খুন করতে পারছে না, এ আপসোস সে জন্য নয়। আপসোস এখনো সুমতিকে নিয়ে ঘর করতে হবে বলে। তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই, বিরাগী হয়ে ছেড়ে যাবার ক্ষমতা নেই। লোহার মতো শক্ত তার দেহমন এই জীবন্ত কোমল চুম্বকে এঁটে গেছে। পিস্তলের সঙ্কেতে ছোটবাবু মৃত্যুভয় জাগিয়েছিল সুমতির, বাইরের রোয়াক থেকে এক-পা এক-পা করে পিছু হটিয়ে এই ঘরে ঢুকিয়েছিল। যাওয়ার আগে একটি গুলি সুমতির উপর খরচ করে গেলেই এসব হাঙ্গামা চুকে যেত।

সুমতি বলে, 'কি জ্বালা, বেশ্যা নিয়েও তো কত মানুষ সুখে দিন কাটাচ্ছে। তোমার বুক জোড়া ধন বিয়ে না করা ইস্তিরিটি কী ছিল আগে? যা হয়েছে, হয়ে গেছে। অত বাড়াও কেন?'

চৌকিতে তালির পর তালি দেওয়া সাবান-কাচা ময়লা মশারি। বেশি কাচবার উপায় নেই, জীর্ণ মশারি ছিঁড়ে যায়। কোমর পর্যন্ত শরীর বার করে চৌকির প্রান্তে কনুই পেতে দুহাতের তালুতে চিবুক রেখে সুমতি নির্বিকার শান্তভাবে বলে, 'আর তাও বলি, বদমাস গুণ্ডা তো নয়, লাখপতি বামুনের ছেলে। সেকালে মুনিঋষি অতিথ হলে রাজারা যেচে রানীকে পাঠিয়ে দিত তাদের কাছে, ভাগ্যি বলে মানত। একটা রাজার বংশ থাকত নইলে?'

রাঘব উঠে বসে অসহায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। একটু যদি কাঁদাকাটা করত সুমতি, একবার যদি বলত, এ-প্রাণ আমি আর রাখব না! গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত।

'বিছানায় এস। মিথ্যে কেন সারারাত মশার কামড় খাবে?'

'এ-জীবনে আমি আর তোকে ছোঁব ভেবেছিস ?'

'ছুঁয়ো না। মাঝখানে পাশ বালিশটা দেবখন।'

দরজা বন্ধ করলে মাটির ঘরখানার ছোট জানলা দিয়ে ভালো বাতাস আসে না। পচা ইঁদুরের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি। অনেক খুঁজেও ইঁদুরটা আবিষ্কার করা যায়নি। মশারির ভিতরে পচা গন্ধটা অন্য সুবাসের তলে চাপা পড়ে গেছে। তার খানিকটা রাঘবের কিনে দেওয়া সুগন্ধি কেশ তৈলের, খানিকটা ছোটবাবুর আতর মাখা রুমালের। রুমালটা ছোটবাবু ফেলে গেছে।

পিস্তলের কথাটা রাঘবের কেমন একটু গোলমেলে মনে হয়। যার টাকা আছে, সহায় আছে, সুন্দর চেহারা আছে—সে কেন এভাবে খেয়াল মেটাবে সোজাসুজি ভুলানোর চেষ্টা না করে ? সব চেয়ে বড় কথা, সুমতির জন্য পাগল হবার কী কারণ আছে ছোটবাবুর ? প্রদীপের মতো সুমতিকে ম্লান করে দিতে পারে বিদ্যুতের আলোর মতো এমন নারী-দেহের অভাবে তার স্বভাব নষ্ট হবার কথা তো নয়।

জিজ্ঞাসা করলে সুমতি প্যাঁচালো জবাব দেয়। 'আমি কি দেখেছি পিস্তল না বন্দুক ? ভয়ে বলে আমার তখন বুক টিপ-টিপ করছে। কি যেন একটা বার করলে পকেট থেকে— '

তিন দিন অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে। মাটিবহুল সহর যেন ধুয়ে যাবে মনে হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে বাঁধা সড়কের দুটি যোগাযোগ জখম হয়ে গেছে। প্রথম দুদিন নির্মলেন্দু ওয়াটারপ্রুফে গা ঢেকে তার স্পিনিং মিল এবং নারকেলের ছোবড়া ও তেলের কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। বর্ষার অজুহাতে অনুপস্থিতি বেড়েছে, কাজে আরও ঢিল পড়েছে, আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। রাগে আগুন হয়ে নির্মলেন্দু ফিরে এসেছে। অবেলায় ব্রাণ্ডি আর হুইস্কি মিশিয়ে গিলেছে, ধীরেনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, সিগারেট চাইতে চুরুট এনে দেওয়ায় নন্দের গালে মেরেছে চড়। তার ছটফটানির মতো বাইরে ক্রুদ্ধ বাতাসে আছাড়ি-পিছাড়ি করেছে বড় বড় গাছ আর ভাঙা ভাঙা যুদ্ধের গর্জনের মতো আকাশে গুরু গুরু ডেকেছে মেঘ।

খদ্দরের ভিজে জামা কাপড় কয়েক ঘণ্টা ধরে ধীরেনের স্বাভাবিক শান্ত মেজাজ আরও যেন শান্ত করে দিয়েছে। দুটি পাঞ্জাবিই ভিজে যাওয়ায় নির্মলেন্দুর

কটি গেঞ্জি ধার নিয়ে গায়ে চাপিয়ে সে বলেছে, 'এত অল্পে ক্ষেপে গেলে বড় কাজ হয় না।'

'অল্প! হিসেব মতো একটা কাজ হচ্ছেনা, সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে, ত সুবিধে দেওয়া হচ্ছে শূয়ারকা বাচ্চাগুলোর ততই বজ্জাতি বাড়ছে, এ হল তোমার অল্প! তুমি, দিবাকর, দীনেশবাবু সবাই তোমরা অপদার্থ, শুধু স্বপ্ন দেখতে জানো।'

মুষড়ানো মন নিয়ে নির্মলেন্দু গুম খেয়ে থাকে। কেউ যেন ভালো চায় না, উন্নতি চায় না। জেলায় বার-তের হাজার তাঁতি পরিবার তাঁত বোনে। হাটে বাজারে সুতো কেনে আর দিনের পর দিন এক ধাঁচের সস্তা কাপড় বুনে যায়—শতকরা সত্তর ভাগ তার শাড়ি। দূরে কোনো অজুহাত সৃষ্টি হয়, কারও একটু খেয়াল জাগে, হাটে বাজারে সুতোর দাম চড়ে যায়। সাড়ে সাতশো তাঁতি নির্মলেন্দুর প্রজা। অন্তত এই জেলার তাঁতিদের সরবরাহের জন্য স্পিনিং মিল করা আর তার নিজের প্রজা তাঁতিদের নতুন নতুন ডিজাইন শেখান খুব সহজ মনে হয়েছিল। সমুদ্রের লোনা স্নেহে এ জেলায় শ্যামল সতেজ নারকেল গাছের ছড়া-ছড়ি—নিউ ইণ্ডাস্ট্রির অজস্র মেটিরিয়াল। ভূমিহীন কর্মহীন মানুষের বাঁচবার নতুন উপায়।

ব্যবসায়ী-জমিদার বাপের সঞ্চয়-ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মতো নির্মলেন্দু ঘুরে ঘুরে লোকের অবস্থা দেখে বেড়িয়েছে আর জনসংখ্যা, চাষের জমি, গৃহশিল্প, আমদানি রপ্তানী, লাভ লোকসান এই সব হিসাব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। একটানা দিন পনেরোর বেশী নয়। কারণ, এরা ধ্বংস হয়ে গেল, এরা যে ধ্বংস হয়ে গেল, এই মন্ত্রের আবৃত্তি মনের মধ্যে প্রতিদিন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠতে উঠতে এক পক্ষের মধ্যেই সাইরেনের আওয়াজের মতো অসহ্য হয়ে উঠেছে। তখন কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে রাতের পর রাত শুনতে হয়েছে সঙ্গী-সাথীর কর্কশ কোলাহলকে ছুরি দিয়ে কাটার মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠের গান, চুমুকের পর চুমুক দিতে হয়েছে গেলাসে আর অনেক রকম পাশবিক প্রক্রিয়া দিয়ে করতে হয়েছে শিক্ষা-ভদ্রতার সঙ্গে প্যাঁচে প্যাঁচে জড়ানো বর্বরতাকে মুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস।

তারপর শ্রান্ত হয়ে একদিন দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে পোশাক বদলে রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে একবার, শুধু একবার, বাহুর বাঁধনে ধরা দেবার জন্য মাধবীকে মিনতি করা এবং এই মাটির সহরে ফিরে এসে তাদের কথা নিয়ে

মাথা ঘামান, যাদের প্রত্যেকের মুখে সে ঘোষণা-চিত্র দেখতে পায় : আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। তোমার টাকা আছে, সহায় আছে, বয়স আছে, আমাদের বাঁচাও।

নির্মলেন্দুর মনে হয়, সত্যই এ দায়িত্ব তার। যাদের ইচ্ছা ছাড়া কিছু নেই, ধীরেনের মতো যাদের দুটি খদ্দরের জামা সম্বল, তারা চেষ্টা করেও কী করতে পারে? এ-কাজ তার, ওদের নয়।

তবু ওরা প্রাণ দিতে চায়, হয়তো দিতেও পারে, তাই কাজ আরম্ভ হয়েছে ওদের রীতিতেই। কিন্তু এগোচ্ছে কই কাজ? আত্মরক্ষার সাধ কই জাগছে তাদের মধ্যে যাদের তারা বাঁচাতে চায়? অগ্রিম পুরস্কার হাত পেতে নিচ্ছে, তিরস্কার শুনে অপরাধীর মতো হাসছে। শাস্তি নেই, তাই যে যত পারে দিচ্ছে ফাঁকি। তবু এখনও ধীরেন, দিবাকর আর দীনেশ চাবুকের বিরোধী, শুধু কথা বলে বুঝিয়ে ওরা সকলের চেতনা জাগাতে চায়।

রাঘবকে একদিন খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পিঠের খানিকটা চামড়া চেঁছে নিয়ে সেখানে লঙ্কা বাটা লাগিয়ে দিলে, তার তিনটে দাঁত ভেঙে ফেললে আর ভেড়ির বাঁধ কেটে তার জমিতে লোনা জল ঢুকিয়ে দিলে, আরও সাঁইত্রিশ জন কি সুতো নিয়ে কাপড় বোনার বদলে বেচে ফেলতে সাহস পেত? মাইনে কাটা গেলে কি রোজ মজুরদের অসুখ করত? লাঠির গুঁতো খাবার ভয় থাকলে কি সাবান, ফিনাইল, ওষুধের পয়সায় তাড়ি গিলত? ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে জানলে কি কেউ দুদিনের জন্য কাজে ঢুকে কোম্পানীর পয়সায় ভাঙা ঘরের সংস্কার করিয়ে সরে পড়ত?

তৃতীয় দিন নির্মলেন্দু গিয়েছিল রাজগঞ্জে—মাইল তিনেক মোটরে, এক মাইল পায়ে হেঁটে, বাকী পথ নৌকোয়। রাজগঞ্জে রাঘব বাস করে। রাত্রে সে যখন ফিরে এল, মেজাজে তার এতটুকু উত্তাপ নেই। পরদিন মেঘহীন আকাশে তেজী সূর্য দেখা দিল, সে-ও চলে গেল কলকাতায়।

ডাক্তার বলল, 'ভয়ের কিছু আছে মনে হয় না। গেরস্ত ঘরের বৌ তো?'

নির্মলেন্দু বলল, 'ছোটলোকের বৌ, ভীষণ নোংরা। দুর্গন্ধে ঘরে দম আটকে

'কী যে খেয়াল আপনার!'—ডাক্তার হাসল, 'দেখা যাক। কদিন থেকে যেতে হবে।'

'থাকব।'

রাজগঞ্জে সুমতি তখন বালিশের তলা থেকে নির্মলেন্দুর দামী রুমালটি বার করে নাকের সামনে নাড়ছিল। সুগন্ধ অনেকটা উপে গেছে। মনের গর্ব তার একবিন্দু কমেনি। এ-জগতে তার তুলনা নেই। রাজাকে জয় করেছে, কে বলে সে রাজকন্যা নয়?

কলকাতার বাড়িতে মা-বোনেরা থাকে, আর থাকে আত্মীয়-স্বজন। তারা স্নেহযত্ন আত্মীয়তা তোষামোদ দেয় অজস্র। নির্মলেন্দু কৃতজ্ঞচিত্তে সব গ্রহণ করে, আশ্রিত ও লিপ্সুদের মন জোগানোর সস্তা চেষ্টা পর্যন্ত। মানুষের মনের মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাকে মুগ্ধ করে দেয়। সে জুড়িয়ে যায়। সিনিকের অবস্থা সে পার হয়ে গেছে অনেক দিন, দাম কষতে আর সে ভুল করে না। চার বছরের বেকার জীবন ধীরেনকে হিসেব ভুলিয়ে দিয়েছে, বাড়ি থেকে চিঠি এলে যে-ভুলের জন্য আজ তার মুখের তীব্র জ্বালা-ভরা হাসি ফুটে ওঠে। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে কিনতে হয় বলে এসব চিঠির যেন দাম নেই। টাকা দিয়ে আরাম যদি মানুষ কিনতে পারে, স্নেহ কিনতে এত বিতৃষ্ণা জাগে কেন?

নির্মলেন্দু বলে, 'যা আছে আছে, যা নেই নেই। না জেনে যা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যেতে, স্বরূপটা জানামাত্র বিগড়ে যাবে কেন? তোমরা, সিনিকেরা গণ্ডমূর্খ'।

মাধবী সম্পর্কে তার নিজের উদাহরণটা অনেকবার উল্লেখ করতে গিয়ে চুপ করে গেছে। তার টাকায় স্থায়ী অধিকারের লোভে মাধবী ধরা দেয় না, তপস্যা করার মতো তাকে ভুলানোর, আরও ভুলানোর, অভিনয় করে। দুদিনের জন্য শুধু তার বিরক্তি এসেছিল, আজ লোভী মাধবীর ছলাকলা আগের মতোই তার চোখে দুপুর বেলার রোদকে জ্যোৎস্না করে দেয়, রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই রীতি মাধবীর ভালোবাসার। অন্য রীতিতে মাধবী ভালোবাসুক, এ-কথা ভাবাও কি বোকামি নয়?

মাসীমা বলে, 'বড় রোগা হয়ে গেছিস বাবা, অমোর মাথা খাস একটু তাকা শরীরের দিকে।' পিসীমা বলে, 'কালীঘাটে তোর নামে একটা মানত করেছি, কাল একবারটি নিয়ে চ আমায়, পূজো দিয়ে মন্দিরে দাঁড়িয়েই প্রসাদী ফুল কপালে ছোঁয়াব।' আরও অনেকে অনেক কথা বলে। মাসীর ছেলে নন্তু ডাক্তারী পড়বে। পিসীর মেয়ে নলিনীর বিয়ে সামনের মাসে। আরও অনেকে অনেক উদ্দেশ্য রাখে।

নির্মলেন্দু হাসিমুখে বলে, 'নস্তুকে আমার মিলে ঢুকিয়ে দেব মাসী। নলিনীর বিয়ে দেব ধীরেনের সঙ্গে।'

মাসী ও পিসী শুকনো মুখে হাসির জবাবে কোনো রকমে হাসে। মুখের হাসি নিভে অনেকের মুখ শুকনো হয়ে যায়। সবাই ভাবে, এখন এক খেয়ালে আছে, খেয়াল বদলাক, হৃদয় মন উজাড় করে স্নেহ ঢেলে মন ভিজিয়ে সময় মতো আবদার ধরে প্রার্থনা মেটাতে হবে।

পিসীমার প্রকাশ্য অনুরোধটি কেবল সে রক্ষা করে, নিজে তাকে কালীঘাটে নিয়ে যায়। পিসীমার ভণিতাটিই সকলের চেয়ে আর্টিস্টিক। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তার সামনে জলে ভেজা কুচকুচে কালো শিশু জীবকে হাঁড়িকাঠে ফেলে সামনের পা ঘেঁষে কোপ দিয়ে বলি দেওয়া হয়, অদূরে গেটের ধারে মাংস বিক্রী করে, মাংসের কাছে নেতিয়ে পড়ে থাকে কালো চামড়াটি, পালিশ করা কালো জুতোর মতো চকচকে। বাইরে রাস্তার ধারে আটচালায় একপাল পাঁঠা নজরে পড়েছিল মনে পড়ে যায়।

পশুর চামড়া মানুষের কাজে লাগে। ট্যান করা চামড়া।

এক মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় ভাব কেটে গিয়ে নির্মলেন্দু মাটির সহরে ফিরে যাবার জোরালো তাগিদ অনুভব করে। তার জেলায় পশুর অভাব নেই। ট্যানিং-এর একটা কারখানা তো করা চলে অনায়াসে, রাজগঞ্জের উত্তরে ঝিলের ধারে যে প্রকাণ্ড জমি খালি পড়ে আছে, সেইখানে?

পরামর্শ-দানেচ্ছুরা বলে, 'আজকেই ফিরে যাবে কেন? এক্‌সপার্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে একটা প্ল্যান ঠিক করে নাও? ট্যানিং-এর প্রসেস্‌ জানা লোকও দেখে শুনে ঠিক করতে হবে তো?'

নির্মলেন্দু জবাব দেয়, সবাইকে পাওয়া যাবে। একটা বিজ্ঞাপন দিলে দলে দলে ছুটবে সেখানে।' মাধবী বলে, 'দুতিন সপ্তাহ থাকবেন বলেছিলেন যে? কদ্দিন পরে দেখা হল, থেকে যান না কটা দিন?'

আনাখামারের বাড়ীতে নির্মলেন্দুর ঘরের কাছেই একটি একক নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। জানালা দিয়ে দেখা যায়। ঝড়ের সময় একদিকে পাতা বাড়িয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখতে ভালো-লাগা কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল! রবীন্দ্রনাথের অনুশাসনে মধ্যযুগের সংস্কৃতিকে শৈশব স্মৃতি দিয়ে অনুভব করার মতো গৌরব বোধ হত। গাড়ির গতিবেগের হাওয়া মাধবীর কাঁধের আঁচল আর

মাথার আলগা কতগুলি চুল পিছনে ঠেলে দিয়েছে, তার নেতিয়ে-পড়ে হেলান দিয়ে বসার ভঙ্গিটা সামনের এক অদৃশ্য মানুষের দেহের চাপে পিছন দিকে বাঁকা হয়ে যাওয়ার মতো।

'হোটেলে একটা ঘর নিয়ে রেখেছি।'

'সত্যি, আপনি কত বড়লোকের ছেলে, কিভাবে আপনি মানুষ হয়েছেন, এসব মহৎ কাজে আপনি এমন ভাবে উঠে পড়ে লাগবেন, কখনো ভাবতেও পারিনি।'

'সেই ঘরে ফিরে যাই চলো। আজ রাত্রের ট্রেনে আর যাওয়া হবে না।'

'এমন অবাক হয়ে গেছে সকলে! সব বড়লোকের ছেলেরা আপনার মতো হলে দেশের ইকোনমিক প্রবলেম কত সহজে সলভড্ হয়ে যেত!'

গাড়ির গতি কমে আসে, হঠাৎ দমক মেরে রাস্তার বাঁ দিকে দুটি বড় বড় গাছের গুঁড়ির ব্যবধানের মধ্যে ছোট-বড় আগাছার ঝোপ ঠেলে গাড়ি কয়েক হাত গিয়ে থেমে যায়।

'এই গাড়িই তবে আমাদের বাসর ঘর হোক।'

নির্মলেন্দু গাড়ির আলো নিভিয়ে দেয়। ভিতরের বাইরের সমস্ত আলো। মাধবী দরজা খুলে টুক করে নেমে যায়। দাঁড়ায় গিয়ে পথে। এখানে পথের ধারে অনেক দূরে-দূরেও আলো নেই। দূরে মানুষের বসতি আছে এটুকু শুধু বোঝা যায় দু-একটি আলো দেখে। রাস্তা দিয়ে একটি টিমটিমে আলো দুলতে দুলতে মৃদু গতিতে এগিয়ে আসছে আর পাওয়া যাচ্ছে গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ। নির্মলেন্দু পাশে এসে দাঁড়ায়। মধ্য রাত্রির স্তব্ধতায় পাশের ঘরে ঘুমন্ত দাদার ক্রিমির দোষে দাঁতে দাঁত ঘসার শব্দ মাধবী প্রায়ই শুনতে পায়। নির্মলেন্দুও মুখে তেমনি রোমাঞ্চকর শব্দ করছে।

'নিজে থেকে ফিরে চলো, লক্ষ্মী মেয়ে! নইলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব। জান তো আমায়?'

'কী বলছিলাম? হ্যাঁ—আপনাকে আজকাল দেবতার মতো ভক্তি করি। সাড়ে দশটার গাড়ীতে চলে যাবেন, আর হয়তো সুযোগ পাব না, প্রণামটা এখুনি করে রাখি।'

সেইখানে হাঁটু পেতে বসে মাধবী প্রণাম করে। ব্যাপক প্রণাম। সাণ্ডেল পরা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে রাখে কয়েক সেকেণ্ড, সোজা হয়ে ধীরে ধীরে পায়ে

আঙুল বুলিয়ে মাথায় ঠেকায়। নির্মলেন্দু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ সমস্তই অভিনয়। কিন্তু কার ক্ষমতা আছে এ অভিনয়কে অগ্রাহ্য করার?

গরুর গাড়ি ধীরে ধীরে আরও কাছে এগিয়ে আসে। মাধবী উঠে দাঁড়ালে নির্মলেন্দু বলে, 'একটু পাশের দিকে সরে দাঁড়াও, গাড়িটা ব্যাক করি।' সঙ্গী-সাথীরা বাড়ীতে জমা হয়ে অপেক্ষা করছিল, সে ফেরামাত্র সকলে কোলাহল করে উঠল। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আজকেই নাকি ফিরে যাবে? আজ যেও না। একটা রাত, শুধু আজকের রাতটা, একটু আনন্দ করি এসো।'

নির্মলেন্দু বলল, 'আনন্দ করব, গাড়িতে।'

এক-একজন, এক-একটি কাজের ভার নিয়ে চলে যায়। স্ত্রীলোক সংগ্রহ করতে কেউ, কেউ পানীয়, কেউ খাদ্য। গাড়ি ছাড়ার আধঘণ্টা আগে কামরা জুড়ে বসে শুধু উত্তেজনায় তাদের নেশা হয়েছে মনে হয়, স্ত্রীলোক তিনটি থেকে থেকে অকারণে খিল খিল করে হেসে ওঠে। নতুনত্ব এই, এই তো অ্যাড-ভেঞ্চার! ছোটবাবু ছাড়া কার মাথায় এ বুদ্ধি আসত?

এদিকে আত্মীয়তা দাবী করে নির্মলেন্দুকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার অধিকার। গাড়ি স্টেশনে যাবে, গাড়ি ফিরে আসবে, কাউকে সঙ্গে নিতে নির্মলেন্দুর আপত্তি কেন? আপনজন কি তার কেউ নেই যে বাড়ি থেকেই সে যাত্রা করবে একা? সে সিনিক নয়, মমতা আর খাতির দুই-ই তাকে সমান মুগ্ধ করে, কিন্তু এ নেকামি কি সহ্য হয় মানুষের? প্রচণ্ড ধমকে গুরুজনেরা স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক, নির্মলেন্দুর বাপও এমনি ছিল। ভাব করতে গেলে এমনিভাবে সে খেঁকিয়ে উঠত। একজন শুধু মিইয়ে মিইয়ে কাঁদে, পাঁচ বছরের ছোট বোন। মা নিষেধ করেন, 'যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলিস নে খুকী।' খুকীর কাছে নির্মলেন্দু বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। কোলে তুলে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে খুকী বলে, 'আমার পিয়ানো কই—ছোট পিয়ানো?'

ধীরেন বলল, 'চারদিকে গোলমাল চলছে, তুমি কি বলে হঠাৎ কলকাতা চলে গেলে? একটা চেক পর্যন্ত সই করে রেখে যাওনি।'

নির্মলেন্দু বলল, 'আর গোলমাল হবে না। এবার আমি সব ভার নিলাম। আমি একা মিল চালাব।'

'আমরা কী করব?'

'কাজ করবে, মাইনে পাবে। দেড়শো টাকা এলাউন্স পাচ্ছ, মাইনে পাবে একশো। যদি পোষাবে না মনে কর, তোমায় আমি জোর করে আটকাব না ভাই।'

'তার মানে তোমার চাকর হয়ে থাকতে হবে?'

নির্মলেন্দু লোহাটে হাসি হেসে বলল, 'চাকর কেন, কর্মচারী। তাও শুধু অফিস টাইমে। অন্য সময়ে যেমন বন্ধু আছ তেমনি থাকবে। তাছাড়া, সামনের মাসে নলিনীকে বিয়ে করে আত্মীয় হয়ে যাবে। বিয়ের পর মাইনে বাড়িয়ে দেড়শো করে দেব।'

হুকুমের পর হুকুম জারি হতে থাকে, কেউ বরখাস্ত হয়, কেউ গালাগালি খেয়ে আরেকবার সুযোগ পায়, কর্মচারীর বেতন আর মজুরের মজুরী চলতি হারে নেমে যায়, অত্যাচারের যে ক্ষমতা অফিসারদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, বাড়তি সুবিধা বাতিল হয়ে যায়, চুপিচুপি নির্মলেন্দুকে খবর জানাবার স্পাই গজিয়ে ওঠে কয়েকজন। মিলের কাঠের গেটের স্থানে লোহার গেট বসে, গেট বন্ধ করবার আর খুলবার সময় লোহার শিকল ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

গোড়ার দিকে একবার শুধু কয়েকটি গোঁয়ার হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করে; গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সামনা-সামনি নির্মলেন্দুর সঙ্গে কথা বলবার দাবী জানিয়ে তারা হল্লা শুরু করে এবং পুলিশ এসে কয়েকজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যায়।

রাঘবের যে অপরাধ আগেই ক্ষমা করা হয়েছিল, এতদিন পরে সেই-অপরাধে ছমাসের জন্য তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর একদিন নির্মলেন্দু রাজগঞ্জের উত্তরে ঝিলের ধারে তার নতুন কারখানা দেখতে যায়। দ্রুত গতিতে ট্যানিং এর কারখানার অনেকগুলি ঘর উঠেছে, কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এখনো কয়েকটি ঘর তোলা হচ্ছে। বর্ষার পরে এখন শরৎকাল। শ্বেত পদ্মের পাতা আর ফুলে ঝিলের জল চোখে পড়ে না। কেবল কারখানার দিকে তীরের কাছে ফুল আর পাতা সাফ করে ফেলা হয়েছে।

আগে এই ঝিলের ধারে দাঁড়ালে পদ্মের ঘন গন্ধে মোহ জাগত। আজ এলোমেলো বাতাস শুধু দুর্গন্ধ এনে দেয়। ঘরের কোথাও ইঁদুর পচলে এরকম গন্ধ হয়।

সুগন্ধি সিল্কের রুমাল নাকে চেপে ধরে নির্মলেন্দু গ্রামের দিকে চলতে থাকে।

গ্রাম পর্যন্ত চামড়ার কারখানার গন্ধ পৌঁছয় না, তবু রাজগঞ্জের সমস্ত মানুষ ঝিলের ধারে কারখানা বসানোর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছে। আন্দোলন সে গ্রাহ্য করে না। সে জানে, ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে দুদিন পরে এ আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গাঁয়ের পথে তাকে একলা দেখে কোনো গোঁয়ার প্রজা লাঠি মেরে বসবে না তো?

মাটির ঘরের রোয়াকে সুমতি চাটাই পেতে শুয়ে ছিল। জুতোর শব্দে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ঘরে আজ পচা ইঁদুরের গন্ধ ছিল না। শুধু সুমতির চুলে একটা সস্তা কেশ তৈলের গন্ধ আছে। রাঘব তাকে যে তেলের শিশিটা কিনে দিয়েছিল এখনো সেটা ফুরিয়ে যায়নি। নির্মলেন্দুর কারখানার নারকেল তেল গাঁয়ের মুদিখানায় বিক্রী হয়। সেই নারকেল তেলের সঙ্গে একটু একটু সুগন্ধি তেল মিশিয়ে সুমতি ব্যবহার করে।

মুখে ভাত

শশধর ঘোষের বড় মেয়ে শ্রীমতী বেলারানীর প্রথম ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হবে। ভোজ রান্নার জন্য গগন ঠাকুরকে ডেকে পাঠান হল। একবার, দুবার, তিনবার। আসব ব'লেও গগন আর আসে না। শশধর উদ্বিগ্ন হলেন। বেলা-রানীর ক্রোধের সীমা রইল না।

"ওর পায়া ভারি হয়েছে বাবা। নটবরকেই ডেকে পাঠাও না?"

"আজকের দিনটা দেখি। কাল তাই ডাকব।" বলে শশধর মোটরে চেপে আপিস গেলেন।

উড়িয়া ঠাকুর নটবরের সঙ্গে গগনের পার্থক্য অবশ্য অনেকখানি, নইলে আর এভাবে বার বার ডেকে পাঠিয়ে অপেক্ষা করা কেন। গগনকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কত লোক খাবে আর কি খাবে ব'লে দিলেই গগন ফর্দ ঠিক করে দেয়; হিসাবে তার কখনো ভুল হয় না। জিনিস কম পড়ার বিপদ আর অপচয়ের আপসোস, কোনোটাই সে ঘটতে দেয় না। রান্না গগনের খারাপ হয়েছে এমন কথা কোনোদিন কারো মুখে শোনা যায় নি। মধ্যাহ্নের নিমন্ত্রিতদের বেলা পাঁচটায় আসনে বসানো তার স্বভাব নয়। থাকে সে পরিচ্ছন্ন, কাজও করে পরিষ্কার। রান্নাঘরেই হোক আর অস্থায়ী চালার নিচেই হোক, তার রান্না করা দেখে অত্যন্ত যে খুঁতখুঁতে মানুষ তারও খিদে কমে যাবার ভয় থাকে না।

তাছাড়া, মানুষটা সে জানাশোনা। কয়েক মাস সে এ বাড়ীতে কাজ করেছে। বেলারানীর বিয়ে হল পৌষের শেষে, তার আগের শ্রাবণের শেষে গগন চাকরি করতে এল নটাকা বেতনে। শ্রাবণের পর ভাদ্র, ভাদ্র মাসে বিয়ে পৈতে কোন শুভকর্ম হয় না। পেশাদার ঠিকে বামুনরা কারো বাড়িতে যদি বাঁধা কাজ করে তো করে বছরের ওই একটি মাস, বসে থাকার বদলে থাকা খাওয়া আর বেতন পাওয়া যায়, অন্য সময় এ কাজ তাদের পোষায় না। আশ্বিন মাস শুরু হতে না হতে ডাক আসতে লাগল নানা জায়গা থেকে, গগন কিন্তু কাজ ছাড়ল না। যে বৌ নেই তাকে মেরে, যে ছেলে কস্মিনকালে ছিল না তার অসুখ ঘটিয়ে এবং আরও কয়েকটা মিথ্যা ছুতোয় ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দুএক জায়গায় রেঁধে এসে সামান্য যে উপরি রোজগার হল তাতেই সে যেন খুশি হয়ে রইল। বিদায় সে হল বেলারানীর

বিয়ের ভোজ রেঁধে। বাড়ির বামুনের বাড়তি পাওনা হয় না, এই হিসাব ধরে শশধর তাকে বখসিস্ দিতে গেলেন দুটি টাকা। গগন দাবী করল দশ টাকা। টাকা দুটি নিয়ে কোমরে গুঁজে দাবীটা জানিয়ে রাগ করে সে বিদায় হয়ে গেল।

বিকেলে দেখা গেল, শশধর গগনকে একেবারে গাড়িতে চাপিয়ে বাড়ী ফিরেছেন। আপিস থেকে ফিরে ঘরোয়া জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে শশধরের ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। গগনকে বসিয়ে তিনি প্রস্তুত হতে গেলেন, বেলারানী খবর পেয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ওপর থেকে নেমে এসে বললে, 'তোমার কেমন ধারা বিবেচনা গগন? না পারলে বলে দিলেই হত আসতে পারবে না, তুমি ছাড়া কি ঠাকুর নেই দেশে?'

'আমার মতো নেই। কেমন আছ দিদিমণি?'

মুখে জবাব দেবার দরকার নেই বলেই বেলারানী যেন নিজেকে জবাবের মতো সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। বিয়ের পর, ছেলে বিয়োবার পর বেলারানী একেবারে বদলে গেছে। বিয়ের সময় তার চেহারাটি ছিল রুগ্ন বালকের মতো। সোনার হার অনায়াসে এদিক ওদিক দোল খেত। ছেলেটা এসে তাকে এমন করে দিয়েছে যে দেখলে মনে হয়, এখনো সে মা হয়নি, হতে চায়। ক্রমে ক্রমে পাওয়ার বদলে হঠাৎ পাওয়া এই সম্পদ নিয়ে বেলারানী আর বাঁচে না, তাকে চটিয়ে দিয়েও রাস্তার লোকের পর্যন্ত তাকিয়ে যাওয়া চাই। "মরণ তোমার!" —বলে অভিশাপ দিয়ে সরে যাবার সুযোগ না পেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বাপের বাড়ি এসেই বেলা সকলের আগে পাড়ার চেনা মানুষদের বাড়ী ঘুরে এসেছে, বিয়ের আগে তেরো বছরের ছেলের মতো আঠারো বছরের নিঃস্ব বেলাকে দেখে যারা না জানি কি ভাবত! বিশেষভাবে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনেছে সেই সব বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সঙ্গিনীদের, যাদের হাসাহাসি তার রক্তকে তেতো করে দিয়েছিল। বিয়ের পর, ছেলে হবার পর, গগনও তাকে আর দেখে নি। ব্যাকুল হয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে বেলারানী ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলছে। বুক দুরদুর করছে বেলারানীর। গগনের কি চোখ নেই? তাকে জিজ্ঞেস করা, সে কেমন আছে! তবে হ্যাঁ, অনেক দেরিতে দেরিতে পলক পড়ছে বটে গগনের চোখে, দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন সে মাখিয়ে দিচ্ছে সারা গায়ে, গা বাতে শির শির করে।

'ছবির মতো দেখাচ্ছে তোমায় দিদিমণি।' চাপা গলায় বেসুর আওয়াজে গগন বলল।

"মরণ তোমার!" অভিশাপ দিয়ে হেসে বেলারানী ওপরে নিজের ঘরে গেল। গগনের একটিমাত্র বেয়াদপি মাফ করবে, আগেই তার ঠিক করা ছিল। তার বেশি আর কিছু নয়। এই বেশ হয়েছে। গগন ভাববে, জয় আমার বাবরি চুলের, দিদিমণি আমায় ভোলে নি! ভুলেছে কিনা দেখিয়ে দেবে বেলারানী। এমন স্পর্দ্ধা একটা রাধুনী বামুনের, একবার দেখা করতে আসে না দেড় বছরের মধ্যে, মুনিব-কন্যা তাকে মনে রেখেছে মনে করে!

শশধরের সঙ্গে বেলার মা-ও এলেন পরামর্শের জন্য। বললেন, 'পারবে তো গগন? লোক কিন্তু খাবে অনেক।'

সফল শিল্পীর সুবিনীত অনুদার আত্মগরিমাকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দিয়ে গগন বল্‌ল, 'পরশু চিৎপুরে দুহাজার লোক খাইয়ে এলাম মা। বাবু মনভোলা মানুষ, আগের দিন রাত দশটায় আমার হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেললেন, 'কি হবে বাবা গগন, আয়োজন করেছি হাজার লোকের, লোক যে খাবে দুহাজার!' আমি বললাম, 'বাবু, আমি থাকতে ভাবছেন? মোটে হাজার লোক বেড়েছে, বলুন না আরো দুহাজার লোককে—'

শশধর বললেন, 'বাইরের লোক খাবে শ' চারেক। বিশজন বেশি ধরাই ভালো—চার শ' কুড়ি জন। ঘরের লোক হবে"—

বেলার মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি করলে গগন? একেবারে হাজার লোক ভুল! কি বিপদ, মাগো।"

ঝির কোলে বেলারানীর ছেলে। পরিপুষ্ট নধর শিশু, পেটেণ্ট ফুডের বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। সাত আট মাসের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বেশিক্ষণ ঘুরতে ঝি বেচারির বোধ হয় রীতিমত কষ্ট হয়।

'দিব্যি পুষ্টু খোকা, মা।'

'ও আবার কি কথা গগন? অমন করে বলতে আছে?'

'আমি বললে দোষ হয় নাগো, মা'ঠান। আমার বলা হল গিয়ে আশীর্বাদ—বামুনের ছেলে বটি তো।'

খোকাকে কোলে নিয়ে গগন মুখে নানারকম আদরের শব্দ করে। খোকার নতুন শেখা ফোকলা হাসি তার লাগে বেশ। মনে হয় এ যেন তার চেনা খোকা।

কোনোরকম পরিচয়ের ভূমিকা ছাড়াই তাই একেবারে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেছে। নাকটি একটু বোঁচা খোকনের, ডগা বলা চলে এমন কিছু নেই। চোখের বাইরের কোণে স্পষ্ট ভাঁজ আর রেখা আছে। কানের পাতা দুটি মাথার সঙ্গে লেপ্‌টান। মনে হয় যেন আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে, আপনা থেকে গজায় নি।

বেলার মা বল্‌লেন, 'আট মাসে জন্মানো ছেলে। বলতে নেই, ছেলে দেখে সবাই তো অবাক। ডাক্তার বললে, হিসেবে ভুল হয়েছে, এ ছেলে দশ মাসের। কি কথা মুখপোড়া ডাক্তারের! মেয়ের আমার বিয়ে হল দশ না এগার মাস—'

শশধর এসে পড়েছিলেন।

'আচ্ছা, আচ্ছা। ওসব কথা থাক। কাগজ কলম আনো দিকি, ফর্দটা করে ফেলি।

খোকাকে গগন তাড়াতাড়ি কোল থেকে মেঝেতে বসিয়ে দিল, অস্পৃশ্যকে বর্জন করার মতো। ঠোঁট ফুলিয়ে খোকা করল কাঁদবার উপক্রম। খোকার চিবুকের মাঝামাঝি একটু খাদের মতো আছে। পায়ের দু-নম্বর আঙ্গুল দুটিও কি একটু থাপছাড়া রকমের বড় নয় খোকার?

"কি যে তুমি কর গগন! কোল থেকে ছেলে নিলে, কোলে ত দিতে পারতে? মাটিতে নামালে কোন বিবেচনায়?"

বেলার মা তাড়াতাড়ি নাতনিকে কোলে তুলে নিলেন।

আড্ডা-বাসায় সে রাত্রে তাস খেলা জমল না। পিছন দেখে চিনতে পারা যায় এমন রঙচটা দাগ লাগা তাস, তাই নিয়ে খেলতে খেলতে দুদিন আগেও পঞ্চুর সঙ্গে গগনের হাতাহাতি হয়ে গেছে। আজ সাড়ে পাঁচ আনা হেরে যাবার পর কানাই সন্দিগ্ধ হয়ে বল্‌লে, "ব্যাটার লেগে মন কাঁদে নাকি রে গগন? তা কি করবি বল, এ্যারে কয় কপাল। তোর ব্যাটা বাপ বলবে অন্যকে।"

গুম খাওয়া গগন বল্‌লে, "থুক্। ছুঁতে ঘেন্না করে, মন কাঁদবে! আগে জানলে কি কোলে নিতাম? আমার হোক, যার হোক, বেজন্মা বটে তো। বামুনের ছেলে, ঘেয়ো কুত্তার গা চাটবে তো বেজন্মীর ছায়া মাড়াবে না। শাস্তরে আছে।"

জীবনে প্রথম আসল রক্তে খাঁটি আগুন ধরে যাওয়ায় গগন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিয়ের আগে তার রক্তকে বেলারানী যেন শুধু দাহ্য পদার্থে পরিণত

করে রেখেছিল, স্ফুলিঙ্গের অভাবে আগুন ধরাতে পারে নি। এবার একেবারে মশাল ছুঁইয়ে দিয়েছে।

প্রথমে বোঝা যায় নি। বিকালে টের পাওয়া গিয়েছিল শুধু ঝাঁঝ আর কিছু নয়। তা, অমন ঝাঁঝ পথে ঘাটে কত লাগে। লক্ষ্মীও একদিন লাগিয়েছিল এবং এখনও তার জের চলেছে। কে জানত তাপের চেয়ে আগুন এত বেশী গরম!

দেবতার মতো, মানুষের মতো আর পশুর মতো একনিষ্ঠ মতি। গত্যন্তর না থাকার সামিল দুরবস্থা। প্রথম থেকে বেলারানী যদি এইরকম হত, গগন এমন ব্যাকুল হত কিনা সন্দেহ। সে হত জানা কথা, একবার যা জীবনের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল আরেকবার তাই শুধু চোখে দেখা।

পাড়ায় একদিন বিয়ে হল বেলারানীর গা-জ্বালানো মোটাসোটা রূপসী একটি মেয়ের, বাসর থেকে বেলারানী এল খালি বাড়ীতে, বিনা ভূমিকায় আশ্রয় করল মেঝেতে বিছানো গগনের ময়লা বিছানা। গগন খানিক বুঝল, খানিক বুঝল না। সার্ট কিনে গায়ে চাপাল, চুল আঁচড়াতে লাগল সযত্নে, একদিন অন্তর কামাতে লাগল দাড়ি। নিজেকে মনে হতে লাগল কোন এক দিগ্বিজয়ী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। পোকায় ধরা জীবন্ত বাঁশের কঞ্চি মনে হোক, মুনিব শশধরের মেয়ে তো বেলারানী।

কি মেজাজ সে মেয়ের, কি তেজ! একজনের দাপটে সারাটা দিন বাড়ীর মানুষ যেন তটস্থ হয়ে থেকেছে। গগনকেও সে যে রেহাই দিত তা নয়। রাত দশটায় খেতে বসেই হয়তো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে, "এই ঠাকুর! এই হনুমান! কত নুন দিয়েছ ডালে?"

অন্য কারো কাছে ডাল নুনকটা লাগেনি। প্রতিবাদ জানাতে সামনে এসে থালার দিকে তাকিয়ে গগন হেসে বলেছে, "পাতের নুন মেখে ফেলেছ দিদিমণি।"

"তোমার মুণ্ডু করেছে দিদিমণি। কদ্দিন না তোমায় বলেছি মুখের ওপর জবাব দেবে না? দূর করে দেব, বজ্জাত কোথাকার।'

পরদিন নিজেই দূর হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে গগন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ির শেষ জাগা মানুষটির সাড়াশব্দ শেষ হবার আগেই হয়তো এসেছে বেলারানী। জিদ নেই, তেজ নেই, অহংকার নেই—ভিখারিণীর মতো।

অপরিপুষ্ট শরীরটির জন্য শুধু ভিখারিণী অভিসারিকার মতো অবশ্য, অন্য বিষয়ে তার একগুঁয়েমির বিকার সে সময়েও সমান জোরালই থাকত।

"সব জেগে আছে। কেউ যদি বাইরে আসে?"

"আসুক। কি আর হবে, জানবে। আমি ডরাই না।"

তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে: "আমায় তোমার পছন্দ হয়? সত্যি পছন্দ হয়? দেব গো দেব, টাকা তোমায় দেব, মাইনের তিনগুণ টাকা দেব। আগে বলো না, কেমন ধারা পছন্দ হয় আমাকে? একটুখানি? তার চেয়ে বেশি? খুব বেশি?"

এক মাসের মধ্যে সব ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, মনিব-কন্যা যদিও রাজকন্যারই স্তরের, তবু আর ভালো লাগত না। সময়মতো বেলারানীর বিয়ে না হলে গগন হয়তো নিজে থেকেই চাকরি ছেড়ে পালাত।

ভোজের আগের দিন রাত্রেই গগন হাতা খুন্তি নিয়ে শশধরের বাড়ীতে হাজির হল। শেষরাত্রে চুলোয় আগুন পড়বে। সহকারী দুজনকে তার সঙ্গে আনা উচিত ছিল, কতগুলি অকথ্য যুক্তি দেখিয়ে তাদের সে আড্ডা-বাসাতেই রেখে এসেছে। রাত তিনটেয় পঞ্চু ও কানাইকে হেঁটে এতদূর আসতে হবে; দেরি তারা করবে সন্দেহ নেই। বাড়ীর সকলে অসন্তুষ্ট হল, বেলারানী পর্যন্ত।

"তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই গগন।"

"আমি থাকতে ভাবছ দিদিমণি?"

আত্মীয় পরিজন এসে পড়েছে, বাড়ি আজ রাত্রেই সরগরম। বারান্দার একদিকে সাতটি বঁটি পেতে সাতজন স্ত্রীলোক তরকারি কুটছে, ঘিরে বসে আছে আরও পাঁচ সাত জন; তাদের আলাপ আলোচনায় সেখান থেকে উঠছে হাটবাজারের কলরব। বালিশ আর সতরঞ্চির বিছানা বগলে নিজের আগেকার শোবার কুটরিতে গিয়ে গগন দেখল, সেখানে চৌকি পেতে শশধরের নিজের লোকের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিছানার পুঁটলি নামিয়ে রেখে বেলারানীর খোঁজে সে দোতলায় গেল। অন্য সব ঘরে গাদাগাদি করে মানুষ ঘুমুবে, শুধু বেলারানীর ঘরটি বাদ পড়েছে। জামাই এসেছে অনেক দিন পরে, মস্ত ঘরের একপাশে খাটের বিছানা শুধু সে আর বেলারানীর জন্য। খোকা ঘুমিয়ে আছে মেঝেতে, লাল মশারির নিচে।

"আমি কোথায় শোব দিদিমণি?"

"তাও আমাকে বলে দিতে হবে? যেখানে জায়গা পাবে শোবে যাও বাপু, আজ রাতে আর আরাম করে শোয় না।"

"ঘুপচি টুপচি যেখানে দেবার দাও দিদিমণি, শোব কিন্তু আমি একলাটি। কেউ থাকবে না সেথা।"

চাপা গলায় গগনের কথা বলার ভঙ্গিটা আবেদনের নয়। ভুনম্বর অতি তুচ্ছ বেয়াদপিতেই বেলারানী রাগ করবে ঠিক করে রেখেছিল। হাসি পাওয়ায় ইচ্ছা থাকলেও রাগ দেখাতে পারল না।

"তুমি তো বড় নবাব হয়েছ গগন?"

"রান্না ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে—"

"কোথাও খালি নেই। কিষণলাল আর মেজমামার চাকরটা বাইরের ঘরে শোবে সেইখানে শোওগে।"

রাত্রি আরও গভীর হয়ে এলে বেলারানী যখন সংকোচ জয় করে ঘরে গিয়ে দরজা দেবে ভাবছে, গগন সিঁড়ির মাথায় পাকড়াও করল।

"আমি ছাতে গিয়ে শুলাম দিদিমণি।"

"হিমের মধ্যে ছাতে শোবে?"

"ছাত ফাঁকা হবে। কেউ যাবে না।"

ঘরের মধ্যেই চাদর গায়ে দিলে আরাম বোধ হয়, খোলা ছাতে বেশ ঠাণ্ডা। কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলি আবছা হয়ে গেছে। সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে বসে একঘণ্টা গগন বিড়ি টানল। মাঝরাত্রি এতক্ষণে পার হয়ে গেছে। নিচে থেকে আর মানুষের গলা কানে আসে না। এইবার বেলারানীর আসার সময় হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি আসাই ভালো, রাত তিনটের সময় বাড়ীর মানুষেরা আজ হয়তো আবার জাগতে আরম্ভ করবে। আধঘণ্টা পরে গগন একবার নিচে থেকে ঘুরে এল। নিচের বারান্দায় এখনো কয়েকজন অনুগ্রহপ্রার্থিনী বিধবা তরকারি কুটছে, ঘুমে ও শ্রান্তিতে তাদের কথা নাই। দোতলায় বেলারানীর ঘরের দরজা বন্ধ।

এবার সতরঞ্চিতে শুয়ে গগন বিড়ি টানতে লাগল। উনানের আঁচ সয়ে সয়ে গায়ের চামড়া বোধহয় বিগড়ে গেছে, সামান্য ঠাণ্ডাতেই বড় কষ্ট হতে লাগল। জ্বর এসে শীত করার মতো!

রাত জেগে ঘুমিয়েছে বেলারানী, তবু সে উঠল খুব ভোরেই। বাড়ীর প্রায় সকলেই অবশ্য তখন উঠে পড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে বেলারানী নিচে নামতে না নামতে কোথা থেকে গগন এসে দাঁড়াল।

"খোকা ঘুমোচ্ছে দিদিমণি, তোমার খোকা ?"

"হ্যাঁ। কেন ?"

"একবারটি কোলে নিতাম ?"

"নিও। ঘুম ভাঙ্গলে নিও।"

শিথিল শ্রান্ত বেলারানী হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ছিটকে সরে গেল।

ধোপ দুরস্ত কাপড়ে মালকোঁচা এঁটে, কোমরে গামছা বেঁধে, বাবরি চুল সামলাতে মাথায় একটুকরো লাল সালুর ফেটি জড়িয়ে গগন প্রকাণ্ড হাতা দিয়ে ডেকচির ভেতরটা নাড়তে থাকে, চেনা মানুষ কাছে এসে খাতির করে বলে, "কেমন আছ গগন ?"

হাতা খুন্তি নাড়া চাড়া শুরু করেই গগনের মুখে সফল শিল্পীর অনুদার আত্মগরিমার ছাপটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। সহকারী পঞ্চু ও কানাই উঠছে বসছে তারই হুকুমে। পঞ্চু বয়সে বড়, একটু রোগা এবং বাঁকা, কপালে তোলা গাঁজাখোরের চোখ, নেশা কিন্তু তার দেশি মদের। কানাই-এর বাড় কিশোর বয়সেই বন্ধ হয়ে গেছে, মুখের ক্ষেতে গোঁফদাড়ির ফসলে তার দারুণ অজন্মার লক্ষণ। গগনের প্রতিভাগত অসংযমের সংকট কিন্তু সেই সামলে চলে। মাঝে মাঝে গগনের ঝোঁক চাপে পুরানো খাদ্যে নতুনত্ব আনবে, এমন স্বাদ সৃষ্টি করবে মানুষের জিভ যার পরিচয় জানে না। হঠাৎ-জাগা উৎসাহে ও উল্লাসে একটানে হাতের বিড়িটা চড়চড় শব্দে আধখানা পুড়িয়ে সে বলে, "খেয়ে যদি সবাই পাত না চাটেরে কানাই, বাপ আমায় জন্মো দেয় নি।"

কানাই তখন সৃষ্টি-পূর্ব সমালোচকের মতো মাথা নেড়ে বলে, "উঁহুঁক। সেটি হবার নয়। কালিয়া যদি না কালিয়া হবে তো গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।"

গগন তা জানে, অভিজ্ঞতাও আছে। কেবল মনে থাকে না। খাবে অন্য লোকে, উপভোগ তাদের বলে পছন্দ অপছন্দের অধিকারটাও তাদেরই, তবু তাদের বৈচিত্র্য পরিবেশনের সুযোগ না পেলে সব যেন কেমন একঘেয়ে মনে হয় গগনের। কখনো সে মুষড়ে যায়, কখনো রাগের জ্বালায় থুক্ করে থুথু ফেলে দেয় মাছ তরকারির পাত্রে।

বলে, "স্বাদ হবে।"

কোণের ছোট উনুনে বেলারানীর মাসি পায়েস রাঁধতে এলেন, খোকার মুখে

দেবার পায়েস। সঙ্গে এল বেলা। ইতিমধ্যে আরেকবার কাপড় বদলে সে তাঁতের কোরা কাপড় পরেছে, সাবান মেখে করেছে স্নান। রান্নার গন্ধ পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছে তার গায়ের তেল সাবানের গন্ধ।

"মন দিয়ে রেঁধো গগন। রান্না ভালো হলে আমি তোমায় একটাকা বখসিস দেব।"

ঘণ্টাখানেক পরে আরেকবার সে এল। একা।

"কি কি নামালে গগন? পোলাওয়ের রঙ তো খোলেনি। জাফরান দাওনি বুঝি? বল্‌লাম যে দিতে?"

চারিদিকে একনজর তাকিয়ে—

"এত আগে বেগুন ভেজে রাখলে কেন?"

বিয়ের আগে দিনের বেলার দাপটের সঙ্গে তার আজকের কর্তালির তুলনাও চলে না, কিন্তু সে দাপটের ধরন ছিল ভিন্ন। চিবিয়ে চিবিয়ে গা-জ্বালানো কথা বলার কায়দাটা সে বিয়ের পর আয়ত্ত করেছে। সে চলে গেলে গগন বল্‌লে, "শুনলি কানাই? দেমাক দেখলি?"

বন্ধুর বদলে কানাই কিন্তু বেলারানীকেই সমর্থন করল। "তা, দেমাক ভাই করতে পারে।"

গগন কথাটি না বলে নুনের পাত্র হাতে তুলে নিল। কানাই তাকে চিরদিন সামলে এসেছে, আজ ঝোঁকটা কোন দিক থেকে এল ঠিক ধরতে না পারায় তার ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠল না। হতভম্বের মতো সে শুধু জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "ওকি হচ্ছে? ওকি করছিস গগন?"

ছোট ছেলেমেয়েরা খেতে বসল আগে। বেগুন ভাজা ছাড়া সব কিছুই নুন কটা, মুখে দেওয়া যায় না। বেগুন ভাজায় নুন ছড়িয়ে দিতে গগনের খেয়াল ছিল না।

মেয়ে

নীরদ ঘোষাল এককালে বড় অত্যাচারী ছিল। প্রচুর মদ খেত কিন্তু মাতাল নিয়ে যাদের কারবার সে সব স্ত্রীলোক তার পছন্দ হত না। ভালো অবস্থায়, মত্ত অবস্থায় এ জগতে তার কাছে একমাত্র স্ত্রীলোক ছিল তার স্ত্রী। এ নিয়ে সে রীতিমত গর্ব অনুভব করত। মাতাল কিন্তু চরিত্রহীন নয়, এমন মানুষ কটা আছে এ জগতে!

প্রায়ই মাঝরাত্রে অনুরূপার চাপা কান্নার গোঙানি ও হঠাৎ বাতাস-চেরা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে শুনতে প্রতিবেশীদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বেশি রাত্রে নীরদ বাড়ি ফিরেছে টের পেলে পাশের বাড়ির মেয়েপুরুষ কান পেতে থাকত। চোখের আড়ালে মাঝরাত্রির ওই মর্মান্তিক অভিনয় তাদের কল্পনায় এক ভয়াবহ রহস্য হয়ে উঠেছিল, অনুরূপার আর্তিগুলি তাদের সর্বাঙ্গে কেমন একটা অকথ্য অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে তুলত: প্রত্যেকে নিজের মধ্যে অমানুষিক নির্মমতার আনন্দ উপভোগ করত। বেশি পরিমাণে পচনশীল খাদ্য বাড়িতে এলে পাড়ায় বিলি করার প্রথা আছে। নীরদ যেন আশেপাশের কয়েকটা বাড়ীর স্তিমিত নিস্তেজ একঘেয়ে জীবনে তার উৎকট উল্লাসের স্বাদ পাঠিয়ে দিত।

সে-সব দিন গেছে।

আপনা থেকেই গেছে। নীরদ আর মদ খায় না। হৃদয় আর মনটা তার নরম হয়ে গেছে সত্য কিন্তু সেটা কাউকে মদ ছাড়তে সাহায্য করে না। মদের স্বাদটাই তার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। দেহযন্ত্র খারাপ হয়ে নয়, তার বিশাল দেহটা বরং আগের চেয়ে শক্তিশালীই হয়েছে এখন—মাথায় তার স্বাদ লাগে না মদের। মদ খেলে কেমন সে শিথিল অবশ হয়ে যায়, সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপে, মাথাটা সর্বক্ষণ আছড়ে পড়তে চায় বুকে। দুর্বল শীর্ণকায়া অনুরূপার সেবা আর সাহায্যই তখন শুধু তার প্রয়োজন হত। অথচ মদ না খেলে অনুরূপার প্যাঙাসে মুখখানা অত্যাচারে রক্তিম করে দেবার ক্ষমতা তার এখনও আছে।

নীরদ একটা কৈফিয়ৎ দেয়।—শোনায় উপদেশের মতো!

'ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে।'

'লুকিয়ে একটু আধটু—?'

'লুকিয়ে ? আরে রাম !'

আপনা থেকেই গেছে। হৃদয় মন নরম হয়ে এলে পারিবারিক জীবনটা তার বড়ই ভালো লেগে গেল। গোড়ার ছেলেমেয়েগুলি বড় হয়ে ওঠায় নতুন জীবনের বিকাশমুখর পরিবারটিও তখন তার সত্যসত্যই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। লেখা-পড়া, গান-বাজনা, খেলা-ধুলা, ঝগড়া-ঝাঁটি, অভাব-অভিযোগ, আবদার-আহ্লাদের সেকি সমারোহ বাড়ীতে! মুগ্ধ হয়ে গিয়ে নীরদের মদের পরিমাণ কমতে লাগল, বাদ পড়তে লাগল। তারপর একবার টাইফয়েডে ভুগে উঠে সে দেখল মদের স্বাদ তার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে। শরীর সুস্থ ও সবল হল, শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি এল, মদ খেতে গিয়ে নীরদ দেখল, মাথায় তার নেশাটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মদ ছাড়লেও তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় মানুষকে। নীরদ একটা কৈফিয়ৎ তৈরী করে নিল। বলবার সময় শোনাল উপদেশের মতো।—"ছেলেমেয়ে বড় হলে ওসব ছাড়তে হয় পুরুষ মানুষকে।'

নীরদের কাছে যারা বিনামূল্যে মদ পেত তারা অনেকদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে পিছু লেগে রইল। এমন কি নীরদকে আবার নেশাটা ধরিয়ে দেবার জন্য নিজেরা পয়সা খরচ করে মদ কিনে অন্য ছুতায় তাকে বাড়িতে ডেকে বলতে লাগল, 'লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধদিন—'

'লুকিয়ে চুরিয়ে ? আরে রাম রাম !'

এক বাড়িতে থেকে নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে যে বেশ একটা মোটারকম ব্যবধান ছিল এটা আবিষ্কার করে কি আশ্চর্যই যে হয়ে গেল নীরদ! আনন্দে গদগদ হয়ে সে বলতে লাগল নিজেকে, তাই বটে, তাই বটে! একটু এগিয়ে গেলেই অনেকটা ফস্‌কে যায়। নিজের জীবনের অঙ্গ বটে তো সব! ইস্‌! মেয়েটা ম্যাট্রিক দেবে সামনের বছর! ম্যাট্রিক!

মেয়েটাই প্রথম সন্তান। নাম চারু। অনুরূপার সরু কাঠির মতো দেহ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে নতুন একটি সংস্করণের মতো, রোগার বদলে ছিপছিপে হয়ে। মায়ের প্যাঁশুটে মুখের গড়নটি শুধু পায় নি, চিবুকের অভাব ঘটে গেছে।

চারুর সঙ্গেই নীরদের ঘনিষ্ঠতা সকলের চেয়ে বেশি। চারু একটু একটু বড়

হয়েছে। আর অনুরূপা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু একটু করে বাপের সেবার ভার তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। মনের আড়ালে যে বিরোধ ও বিতৃষ্ণা জমেছে অনুরূপার সেটা একদিনের সঞ্চয় নয়, নিজে সে ভালো করে জানেও না যে প্রয়োজন ও অভ্যাস ছাড়া স্বামীর কাছে যাবার তাগিদ সে কখনো অনুভব করে না! মেয়েকে বাপের সেবা শেখান যে তারই বিদ্রোহের প্রকাশ, এটা কল্পনা করার ক্ষমতাও অনুরূপার নেই। দূরে যাবার, তফাতে থাকার—তাগিদ যে অহরহ তার মধ্যে জেগে আছে, অনুরূপা তা জানে না, জানলেও বিশ্বাস করবে না।

বাবার জন্য ছোট বড় কাজগুলি করে যাওয়া চারুর জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে জড়িয়ে গেছে। বড় হওয়ার সঙ্গে যা কিছু বেড়েছে চারুর জীবনে বা নতুন এসেছে, সব মানিয়ে নেওয়া হয়েছে এই কর্তব্যের সঙ্গে। চারু ভাবে না যে বাবার জন্য দশবার উঠে আসতে হওয়ায় পড়ায় তার ছেদ পড়ল। দশবার উঠে আসার ফাঁকগুলিই তার পড়ার জন্য। সংসারের কাজে মা তাকে প্রায় ডাকেই না, সেটা অবশ্য তাকে পড়া করা আর গান শেখার সুযোগ দিতে। কিন্তু বাবার কাজ আলাদা, সংসারের কাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। চা করা, খাবার করা, ভাত রাঁধা, সংসারের কাজ, ওসব মা করে। চায়ের কাপ, খাবারের রেকাবি, ভাতের থালা বাবার সামনে পৌঁছে দেওয়া তার কাজ। বাবা জল চাইলে মা কলসী থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত করতে পারে, বাবাকে গেলাসটা কিন্তু দিতে হবে তাকেই। বাবার জামা-কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদের হিসাব রাখা, বই-খাতা-কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখা, বিছানা পাতা, চটি এগিয়ে দেওয়া, বাতাস করা, ঘামাচি মারা ইত্যাদি যত কিছু করা দরকার সেগুলি করার জন্য চারু জন্মেছিল পৃথিবীতে।

নীরদকে যেমন ভয় করে, তেমনি ভক্তি করে চারু। প্রতিদিনের চলতি সেবার অতিরিক্ত কোনো সেবা করার সুযোগ পেলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। নীরদের ছোট-খাট অসুখ হলে সে উদগ্রীব, উৎসুক হয়ে থাকে—যা কিছু করার আছে তারও বেশি কিছু করার সাধ চাপা উচ্ছ্বাসের মতো তার ছোট বুকটিতে ঠেলে উঠতে চায়। নীরদ চোখ বুজে পড়ে থাকে সামান্য অসুখের ধাক্কায়, চারু তার ভারিক্কি প্রৌঢ় মুখে ক্ষমতা, শাসন ও মমতায় গড়া মৃদু ভয়ংকর রহস্য দেখে দেখে মনের মধ্যে বিহ্বল হয়ে যায়।

অথচ আদুরে মেয়ে সে নয়। সে প্রথম এবং বড় বটে কিন্তু অনেকগুলির বড়। ভাইবোনের বন্যায় তার অতিরিক্ত আদরের দাবি গোড়ার দিকেই ভেসে গেছে। নীরদ তাকে কোনোদিন বেশি প্রশ্রয় দেয় নি, নির্ভরশীলতা যদি প্রশ্রয় না হয়। প্রধান সেবিকা বলে বরং শাস্তি ও শাসনটাই বাপের কাছে সে পেয়েছে বেশি।

তবে পরিচয়টা তাদের হয়েছে গভীর। মুখের ভাবের একটা ভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেছে দুজনের অনৈত্যিক সহানুভূতিতে। চারুর চোখ ভেজা দেখলে নীরদ তাকে আদর দিয়ে ভোলায় না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে রে ?'

চারু তখন কাঁদে না, অভিমানের জের টানে না কিন্তু বলে, 'কাপড় নেই। মা বকেছে বাবা।'

নীরদ সত্যিই রাগ করে। বলে, 'কাপড় নেই! এই না সেদিন একজোড়া কাপড় কিনে দিলাম তোকে, দুমাসও হয় নি। অত কাপড় দিতে পারব না তোমাকে। অত নবাবকন্যা হলে চলবে না তোমার।' খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মেয়ের মুখখানা দেখে আবার সজোরে মন্তব্য করে, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!'

কিন্তু কাপড় চারু পায়! ছুটির দিন সেবার প্রয়োজন ছাড়াই কাছাকাছি একটু এদিক ওদিক নড়ে চড়ে বেড়ালেই নীরদ তাকে সঙ্গে করে কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায়।

কাপড় পছন্দ করে চারু নিজেই দাম জিজ্ঞাসা করে। দাম শুনে বলে, বাব্বা! সস্তা দেখে দিন।'

নীরদ বলে, 'নে নে, ওটাই নিয়ে নে। জ্বালাস নে আর।'

স্কুলের পরীক্ষাগুলি চারু এমনিই পাশ করে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটা পাশ করিয়ে দেবার জন্য শেষ বছর একজন মাষ্টার রাখা হল। অনুরূপা বলেছিল, 'সম্বন্ধ খুঁজে বিয়ে দিয়ে দিলে হয়। বোকা হাবা মেয়ে যদি না পাশ করতে পারে?'

নীরদ বলেছিল, 'বিয়ে! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে কি গো! পড়ছে, পড়ুক।'

অনুরূপা তর্ক করে না, কথা কাটায় না। মেয়ের বিয়ের মতো বড় কথা বলেই সে বলল, 'মেয়ে তোমার ওইটুকুই আছে। দুবছর বয়স ছাপিয়ে ভর্তি করেছিলে মনে নেই? বছর বছর টেনে হিঁচড়ে ক্লাশে উঠেছে। কি হবে ওকে পড়িয়ে?'

তার পরেই চারুকে তালিম দেবার জন্য লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জগত ছেলেটি ভালো। করণ, সে গরীব এবং নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্ট সহ্য করে পড়াশোনা চালিয়ে এলেও বরাবর ভালো রেজাল্ট করে এসেছে।

জগত পড়ায়, চারুর মন পড়ে থাকে অন্দরে। 'দাঁড়ান, আসছি', বলে থেকে থেকে সে উঠে যায় বাপের খুঁটিনাটি সেবা করতে। দিন সাতেক চুপ করে থেকে জগত প্রতিবাদ করল।

'পড়ার সময় বার বার উঠে গেলে চলবে না।'

'বাবার কাজ করতে যাই।'

'আর কেউ নেই বাড়িতে ?'

'আমি ছাড়া কেউ পারে না।'

শুনে জগত আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু অবস্থাটা মেনে নিতে রাজী হয় না। জগতের মতো ছেলেদের আবার বিবেক বলে একটা মনোধর্ম থাকে, অনেক ভাব-প্রবণতা চাপা পড়ে যে বিকারটা সৃষ্টি হয়। সে তাই একদিন সোজা নীরদের কাছেই কথাটা পেড়ে বসে।

নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'সে কি! পড়ার সময় সংসারের কাজ করতে উঠে যায় ? ও তাহলে পাশ করবে কি করে।'

বহুদিন পরে অনুরূপা সেদিন ধমকের ধাক্কায় মাথা ঘোরা ও থর থর করে কাঁপবার অসুখে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল। নীরদ তবু গর্জে গর্জে শুনাতে লাগল, 'জানি তোমার মতলব জানি। মেয়েকে তুমি ফেল করিয়ে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে চাও। আমিও ভেবেছি কিনা ওকে এম-এ টেমে পর্যন্ত পড়াব, শত্রুতা না করলে তোমার চলবে কেন ?'

মেয়েকে ডেকে নীরদ বলে দিল, 'আজ থেকে তুই সংসারের কোনো কাজ করবি নে, শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকবি। ভাল করে পাশ করা চাই।'

'তোমার যে কষ্ট হবে বাবা ?'

'বেশী পাকামি করিস নে চারু। কষ্ট হয় তো হবে।'

চারু অগত্যা মনকে সরিয়ে নিল পড়াশোনার দিকে এবং তার ফলে গুরুর প্রতিও একটু মনোযোগ তাকে দিতে হল। প্রথমেই তার খেয়াল হল যে দুবেলা তিন ঘণ্টা তাকে যে পড়ায় তার গোলগাল নিরীহ ভালোমানুষী মুখখানা আর যাই হোক একটি সুনির্দিষ্ট মানুষের মুখ। তারপর সে টের পেল যে লোকটা বই পড়েছে গাদা গাদা। তারও পরে সে নিজের কাছে স্বীকার করল যে লোকটা পড়াতে পারে অতি চমৎকার, পড়ানো শুনতে তার খুব ভালো লাগে।

মেয়ের সেবা আর নীরদ গ্রহণ করে না, যতক্ষণ পারে নিজের কাছে রেখে

তার মানসিক উন্নতির সাহায্য করে। জগতও যে শুধু স্কুলের পড়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, চারুর মানসিক উন্নতির জন্য তাকে অনেক বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান সরবরাহ করছে, নীরদের তা জানা ছিল না। সে যখন মাঝে মাঝে জগতের পড়ানো শুনতে ঘরে গিয়ে বসে জগৎ তখন মধ্যযুগের ব্ল্যাক ডেথের কাহিনী বন্ধ রেখে চারুকে ইংরেজি গ্রামার শেখায়, অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়। চারুকে বাড়তি জ্ঞান এবং আদর্শ ও উপদেশ সরবরাহের ভারটা তাই নীরদ নিজেই গ্রহণ করেছে।

চারু বুঝতে পারে, জগতের তুলনায় তার বাপের জ্ঞানভাণ্ডার বড়ই সংকীর্ণ, অনেক বিষয়েই জগতের মতো তার স্পষ্ট ধারণা নেই এবং কোনো বিষয়েই সে জগতের মতো সহজ ও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে না। জগতের বিরুদ্ধে চারুর মনে একটা প্রবল নালিশ জাগে। সে যেন তার বাবাকে অপদস্থ করছে, অবজ্ঞা করছে। সময় সময় মনের রাগ সে সামলাতে পারে না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে, 'আপনার চেয়ে বাবা ঢের বেশি জানেন। কত পড়েছেন বাবা !'

'জানেন বৈকি। আমি আর কতটুকু জানি বল ? বই কেনার পয়সা নেই, চেয়ে চিন্তে ধার করে পড়তে হয়, কত কষ্টে যে আমি লেখাপড়া শিখেছি, তুমি ভাবতেও পারবে না চারু।'

তা ঠিক। রাগ উপে গিয়ে চারুর মন সমবেদনায় ভরে যায়। সে ভাবে, জানুকগে জগত তার বাবার চেয়ে অনেক বেশি, আর তো কিছুই নেই ওর তার বাবার মতো ! চাকরি নেই, পয়সা নেই, বাড়ি ঘর নেই, আপনার লোক নেই, কিছুই নেই !

চারুকে হাফ্ইয়ারলি পরীক্ষার সবগুলি সাবজেক্টে পাশ করিয়ে জগত নিজেও লেখাপড়া শেখার চরম পরীক্ষায় পাশ করে ফেলল, চাকরি সে একটা পেয়ে গেল চমৎকার। নীরদকে খবরটা জানিয়ে মাথা নিচু করে সে বলল, 'এতদিন আপনাকে বলবার মুখ ছিল না, বলতে সাহস পাই নি। আজ একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই।'

কথাটা শুনে নীরদ চমকে গেল। 'তুমি ! তোমার মধ্যে এসব আছে তা তো জানতাম না বাপু !'

জগত আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, দুশো টাকায় ষ্টার্ট পেয়েছি—'

'আমার তাতে কি ? আমি চারুকে পড়াব—এখন বিয়ে দেব না।'

'আজ্ঞে ও আর পড়তে চায় না।'

তার মেয়ে চারু, জগত আজ তাকে জানাতে এসেছে, চারু পড়তে চায় না ! রাগে ,নীরদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করে। নিজের জানা ও বোঝা অখণ্ড যুক্তি-তর্ক রীতি-নীতি যদি মিথ্যা হয়ে যায়, জগতের কথাই যদি সত্য হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত ! চারুর মতামত না জেনেই কি জগত তার কাছে এ প্রস্তাব করার সাহস পেয়েছে ?

কিন্তু তার মেয়ে চারু, তার আবার মতামত !

'তুমি আর এবাড়িতে এস না জগত।'

জগৎকে তাড়িয়ে দিয়ে নীরদ একেবারে চুপ করে গেল। চারুকে কিছুই বলল না। ধমক হোক, উপদেশ হোক কিছু একটা শুনবার জন্য মেয়ে যে তার উৎসুক হয়ে আছে, বারংবার সেটা টের পেতে লাগল নীরদ। বুঝতে তার বাকী রইল না যে একবার কথাটা তুললেই চারু তার মনের কথা জানিয়ে দেবে এবং জানাবার জন্য সে ছটফট করছে। তবু মনটা তার প্রতিদিন বিগড়ে যেতে লাগল মেয়ের মুখে তার মা'র মুখের প্যাঙাসেপনার আবির্ভাবের সূচনা দেখে। তবু নীরদ হাল যেন ছাড়তে পারল না। মেয়েকে আরও বেশি কাছে রেখে, তাকে পড়িয়ে, গল্প শুনিয়ে, বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, সিনেমা দেখিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল আগের অবস্থায়। কিন্তু কোনো দিক দিয়েই নাগাল সে যেন আর পেল না মেয়ের।

সর্বদা কি যেন ভাবে তার মেয়ে, কোথায় যেন পড়ে থাকে তার মন। তার কাছে থেকেও কোথায় সে যেন থাকে, যেখানে তার যাওয়ার ক্ষমতা নেই।

জগত চাকরি করতে চলে গিয়েছিল, মাস তিনেক পরে ছুটি নিয়ে ফিরে এল। আবার সে চেপে ধরল নীরদকে।

'আপনি যদি ওকে পড়াতে চান, পড়াবেন যতদূর খুশি। আমি আপত্তি করব না। কথাটি বলব না।'

এবার নীরদ শুধু বলল, 'হুঁ'।

অনুরূপা খবর দিল, চারু আর স্কুলে যাবে না বলছে।

'কেন ?'

'ও আর পড়বে না।'

'পড়বে না ?'

'পড়বে—জগতের সঙ্গে বিয়ে দিলে পড়বে। পড়তে ওর ভয়ানক কষ্ট হয়, তবু বিয়ের পর তোমার মুখ চেয়ে পড়বে বলেছে।'

এবার নীরদ বলল, 'যাক, ওর আর পড়ে কাজ নেই। আজকেই স্কুলে নাম কাটিয়ে দিচ্ছি!'

স্কুলে চারুর নাম কাটাবার জন্য সেদিন নীরদ আপিস কামাই করল। রাত প্রায় এগারটার সময় বাড়ি ফিরে এল আগের মতো মাতাল হয়ে।

চারু এখন বড় হয়েছে। কিছুদিন ধরে বাপের কাছে স্বাধীনতা পেয়ে এসেছে কল্পনাতীত। সে ভৎর্সনা করে বলল, 'ছি বাবা, ছি।'

নীরদ জবাব দিল না। কিন্তু অনুরূপা মেয়ের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নীরদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল।

দিশেহারা হরিণী

মৃগময়নার চোখ দুটি সত্যসত্যই হরিণীর চোখের মতো। মানুষের অবিকল হরিণীর মতো চোখ থাকলে অবশ্য অকথ্য রকমের বিশ্রী দেখায়। কিন্তু ওটা তুলনা মাত্র; কোনো মেয়ের যদি বড়, টানা, সদাচকিত অথচ ধীর ও গভীর দৃষ্টিওয়ালা চোখ থাকে এবং চোখ দুটি দেখে হরিণীর চোখ মনে পড়িয়ে দেয়, সেই মেয়েটিকে মৃগনয়না বলা যায়।

মৃগনয়নার মনটি বড় কোমল। বিশেষ এ ধরনের সরলতা তার আছে, তার নিজস্ব সত্যপালন নীতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে। একটু খাপছাড়া তার স্বভাব, কিন্তু অগোছাল নয়, চোদ্দ পনের বছরেই তার চপলতা উপে গেছে, কিন্তু কোনো ভারেই তাকে ভারাক্রান্তা মনে হয় না। শান্ত রেশালো নৃত্যছন্দের গতিতে তার চলাফেরা নড়াচড়ার অন্ত নেই, মুখে মৃদু একটু হাসির সঙ্গে মিষ্টি স্বরে সব কথাতেই কথা বলে যায়। এখন, মোটে সতর বছর বয়সে যৌবনকে নিয়ে কি করতে হয় সে যেন জানে, দেহ যতই উথলে উঠুক মনে নির্মল স্বচ্ছ রসের মতো জীবনের উত্তাপ শুধু আস্তে আস্তে ফোটে। ছাতের শান্ত জ্যোৎস্নায় একা সে আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়, মনে হয় জন্ম থেকে বড়লোকের আদুরে মেয়ের মতো সে ভগবানের আদুরে মেয়ে হয়ে আছে, কোনো অভাব তার নেই, কোনো ভাবনা নেই। আবেগ অদম্য হলে হাঁটু পেতে বসে হাতে মাথা ঠেকিয়ে সে অনেকক্ষণ ভগবানকে প্রণাম করে, ভক্তি আর ভালোবাসার কত মানুষ যে বিরাট মহান রূপ নিয়ে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়,—তার দাদার একবছরের শিশুটি পর্যন্ত আকাশ পাতাল জুড়ে কোমল চামড়ার দ্যুতিতে চারিদিক নীলাভ করে তোলে, দুটি দাঁতের ফোকলা মুখে তার দিকে চেয়ে শুধু হাসে।

এই অবস্থায় বাড়ির লোকে তাকে মাঝে মাঝে আবিষ্কার করে। ডাকলেই সে ধীরে ধীরে উঠে বসে বলে, 'মাগো, কি প্রকাণ্ড একটা আগুন আকাশ দিয়ে চলে গেল।'

মা আর মায়ের সম্পর্কিতা মাসি বলেন, 'আইবুড়ো মেয়ে, এসময় তোর ছাতে উঠবার দরকার!'

দাদা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ওটা হল ধূমকেতু। শূন্য থেকে পৃথিবীর বাতাসে এলে জ্বলে উঠে। ওসব দেখে ভয় পাসনি মিণ্ড।'

'ভয় পাব কেন ?'

যতীন শোবার ঘরে গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল, প্রায় নিঃশব্দে বলল, 'বোস, মিণ্ড।'

বসবার চেয়ারটাও সে দেখিয়ে দিল, পাঁচ সাত হাত তফাতে। মৃগনয়না হেসে তার চেয়ারের হাতলে বসে বল্‌লে, 'তোমার যে কি এক বাতিক। আগে দূরে চেয়ারে বসে নানা ছলে একটু একটু করে কাছে আসতে হবে। আজ আমার অত সময় নেই, মুখের ভাত ফেলে এসেছি।'

'তোমার নাকি আজ ফিট হয়েছিল ?'

'কে বল্‌লে ? ছাতে একা একা ভগবানকে প্রণাম করছিলাম, সবাই ভাবল কি যেন হয়েছে। বৌদি ডাকতেই উঠে বসলাম, ফাজলামি করে বললাম, আকাশে একটা আগুনের গোলা দেখে ভয় পেয়েছি। আসলে কি দেখেছিলাম জানো ?' বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফারিত করে চিন্তার চাপে ভুরু কুঁচকে বল্‌লে, 'কি দেখেছিলাম ? কিছুই তো দেখিনি।'

যতীনের কাঁধে হাতের ভর দিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, 'দেখিনি তো দেখিনি। বয়ে গেল।'

যতীন অনুভব করল, সে কাঁপছে। সমতল পথে খুব স্পীডে চালালে তার গাড়িটা যেমন কাঁপে।

যতীন স্বাভাবিক গলায় বল্‌লে, 'যাকগে ওসব বাজে কথা। এমনি ভাবে ঘুরিয়ে কাঁধে মাথা রাখো। তারপর মিন মিন করে সেই গানটা শোনাও তো। তুমি গাইবে আর আমি শুনব, আর কেউ না। বড় ভালো মেয়ে তুমি মিণ্ড, বড় ভালো মেয়ে।'

বাড়ি ফিরে মৃগনয়না সবে ভাত খেয়ে ওপরে তার ঘরে গেছে, ঝড়ের বেগে বিশু এসে হাজির। এ বাড়িতে তার ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত, মৃগনয়নার সঙ্গে অনেক দিনের ভাব। এখন সে এম-এ পড়ে ও মৃগনয়নাকে পড়ায়। কি করে যে এ বন্দোবস্তটা স্থির হল বাড়ির লোকেরা কেউ খেয়ালও করেনি। মৃগনয়নার

জন্য একজন মাস্টার রাখার প্রশ্ন উঠেছিল। একদিন দেখা গেল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে।

বিশু ব্যগ্রকণ্ঠে মৃগনয়নার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে ?'

মা বললেন, 'ভালো আছে। তেমন কিছু হয়নি। এই তো ভাত খেয়ে ওপরে গেল।'

বিশু যখন ওপরে গেল, মৃগনয়না ঘরের দরজার ভারি পর্দাটা দুপাশে ভালো করে টেনে দিচ্ছে। বিশুকে ধরে ভেতরে ঠেলে দিয়ে পর্দাটা ঠিক করে সে মুখ ফেরাল।

'এত রাতে সবার শেষে উনি খবর নিতে এলেন। কী দরদ !'

'আমি কি জানতাম ? এইমাত্র খবর পেলাম।'

'অন্য সবাই খবর পেল কি করে ? খবর যে রাখতে চায়, খবর তার জোটে।'

বিশু বিব্রত হয়ে বলল, 'তোমাকে শোনাবার জন্য বাঁশি বাজাচ্ছিলাম।'

মনে হল ছাতে তুমিই ঘুরছ, তাই একটু বাজালাম। শোন নি ?'

মৃগনয়না চুপ করে একটু ভাবল। তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! তোমার বাঁশি শুনতে শুনতেই ভগবানকে প্রণাম করলাম। এমন করে বাজাও তুমি, এমন অস্থির অস্থির করে আমার !'

বিশু মুখভার করে বলল, 'ও, তামাসা হচ্ছে !'

মৃগময়না বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ নাকি ? তামাসা নয়—সত্যি সত্যি সত্যি।'

মৃগনয়না চট করে পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দুহাত সামনে তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তেমনি ভাবে হাত তুলে দাঁড়িয়ে বিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। কলহই হোক বা কথাকাটাকাটিই হোক, এই হল তাদের সন্ধিস্থাপনের বহুকালের পুরানো রীতি। মৃগনয়না হিস্ করামাত্র দুজনে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে পরস্পরকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ফেলল। একটি চুম্বনও এই রীতির অন্তর্গত। কোন রকমে সেটা শেষ করেই মৃগনয়না বিছানায় বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি একটা অসভ্য, গুণ্ডা, বিশু।'

শুনে বিশু একেবারে নিভে গিয়ে বলল, 'কেন ? আমি কি করেছি ?'

'কি করেছ, তাও বলে দিতে হবে। তুমি এখনও পুরুষ মানুষ হওনি বিশু। কত জোরে ধাক্কা দিয়েছ জানো। কি রকম লেগেছে জানো ?'

'সত্যি লেগেছে?' মৃগনয়নার সামনে হাঁটু পেতে বসে বিবর্ণ মুখে বিশু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন মৃগনয়নার মুখে দেখা গেল হাসি। বিশুর মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়ে তার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সে মিষ্টি সুরে বলল, 'সত্যি লেগেছে। তোমার দোষ নেই, তুমি তো কিছু জানো না। তুমি আমাকে ভালোবাসতে শিখেছ, আর এইটুকু শেখনি যে ছুটে এসে আমাকে তোমার ধাক্কা দিতে নেই? আমি ছুটে যাব, তুমি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমায় ধরে ফেলবে। ষাঁড়ের মতো গুঁতো দিলে মেয়েদের লাগে না?'

বিশু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'আমারও তো লেগেছে।'

'পুরুষ হলে লাগত না।'

পাঁচ মিনিট পরে দুজনের জোরালো হাসি কানে যেতে মা হাঁক দিয়ে বললেন, 'ও বাবা বিশু, রাত যে অনেক হয়ে গেল বাবা।'

যাওয়ার আগে বিশু বলল, 'সেখানে যাবে?'

'না। আজ বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

বিশু বাড়ি পৌঁছবার আগেই মৃগনয়না ঘুমিয়ে পড়ল। মা এসে মশারি ফেলে আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েকে তিনি বুঝতে পারেন না, পেটের মেয়েকে! মেয়ে তার ভক্তিমতী। কিন্তু মায়ের মতো মন্দিরে গিয়ে কোনো দিন প্রণাম করে না, দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত বাপের সঙ্গে উপাসনায় বসত, এখন তাও বসে না। ছাতে গিয়ে একা ভগবানকে প্রণাম করে। আকাশে জ্বলন্ত আগুনের গোলা ছুটে যেতে দেখতে পায়। চলাফেরা কথাবার্তায় কিছুই ধরা যায় না। কোমল মন তার এমন মিষ্টি স্বভাব, কোন ঘরে সে যাবে ভেবে বুকটা তার ধুক্‌পুক করে। তবু মেয়েটাকে তিনি বুঝতে পারেন না। পেটের সন্তানকে যেন ভিন্ন মনে হয়।

মৃগনয়নার স্তন্যপানের ধরনটা পর্যন্ত যে তার মনে আছে! সে কেন পর হয়ে না গিয়েও অজানা হয়ে গেল!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন, কি করে অনুমান করে তাঁর স্বামী তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এঘরে তিনি একলা থাকেন, যখন ইচ্ছা ঘরে যাবার অনুমতি স্ত্রীর আছে। কিন্তু যিনি সর্বদাই আত্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকেন অথবা বই পড়েন, তার কাছে বেশি যাবার ইচ্ছা লোকের হয় না। ঘরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে এক হাতে জড়িয়ে তাকে

আরও কাছে টেনে নিলেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার অবজ্ঞায় তুমি কাঁদছ বড় বৌ? তুমি তো ইচ্ছে করলেই আসতে পার, যখন খুশি আসতে পার!'

মৃণুর মা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'সেজন্য নয়।'

মৃণুর বাবার মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গেল, জড়ানো হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এল।

'মেয়ের জন্য বড্ড ব্যাকুল হয়েছে মনটা।'

মৃণুর বাবা সহসা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, 'মিণুর জন্য? কেন, কি হয়েছে?'

রাত দুটো পর্যন্ত সেদিন তাঁদের কথা চলল।

ইতিমধ্যেই একটি সুপাত্র পাওয়া গেল। শিক্ষিত, সুশ্রী, বড়লোকের ভালো ছেলে। একটা দিনও স্থির হয়ে গেল, যেদিন পাত্র এসে মৃগনয়নাকে দেখে শুনে পছন্দ করে যাবে। না, ঠিক প্রাচীন যুগের মেয়ে দেখার অসভ্যতা তারা করবে না। বাড়িতে দুতিনটি ভদ্রলোক পরিচয় করতে এসেছেন এমনি সাধারণভাবে আগমন ও এবিষয়ে ওবিষয়ে অল্প আলোচনা হবে। বিয়ের পরেও মৃগনয়না যতদূর খুশি পড়তে পাবে। সত্য কথা বলতে কি, পাত্র নিজেই তা চায়। মৃগনয়না বাবার কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলল, 'আমি যাকে-তাকে বিয়ে করতে পারব না বাবা।'

'কেন, ছেলেটি তো সবদিক দিয়ে ভালো?' পরক্ষণে নিজের ভুল সংশোধন করে বললেন, 'ও! যাকে-তাকে বিয়ে করতে পারবে না বলছ। বেশ, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে শুনেও তো কেউ এল না আমার কাছে।'

'আজকালের মধ্যেই আসবে বাবা।'

'বেশ। কিন্তু যাদের ডাকা হয়েছে তাদের একটু অভ্যর্থনা করবে না মিণু?'

'করব বৈকি। ভদ্রলোক হলে নিশ্চয় করব।'

মৃগনয়না অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। বিয়ে না করলেও তার চলে—পারিবারিক শক্তির সমবেত আক্রমণ প্রতিরোধ করার হাঙ্গামাটা শুধু তার পোয়াতে হবে। হাঙ্গামা যখন করতেই হবে, বিশেষ একজনকে বিয়ে করার জন্য

হাঙ্গামাটা ঘটতে দিতে দোষ কি? যতীন অথবা বিশুকে বিয়ে করা সহজ, দ্বিতীয়পক্ষ হলেও বিশু ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। কিন্তু ওদের দুজনকে তার পার্টিতে সমর্পণ করার কথা, নিকগে পার্টি ওদের। হাবুলকে হলেই তার চলবে। পার্টি আপত্তি করবে না, হাবুল আগে থেকেই পার্টির মেম্বার। দুজনে মিলে তারা কাজ করতে পারবে। বাড়িতে কেবল হুলস্থূল পড়ে যাবে হাবুলকে সে বিয়ে করতে চায় শুনে! বাবাও সহজে মত দেবেন না! কিন্তু সেজন্য মৃগনয়নার বিশেষ ভাবনা নেই। বাড়িতে একটা প্রচণ্ড ঝড় তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত হাবুলকে সে বিয়ে করতে পারবে।

হাবুল ছাড়া আর কাউকে বিয়েও করা যায় না। অত তেজ, অত আগুন কার মধ্যে আছে? যতীন আর বিশু দুজনেই বড় বেশি ভালোমানুষ আর ছেলেমানুষ!

ওদের মনে ব্যথা লাগবে। পার্টির কাজে জীবন উৎসর্গ করেও হয়তো ব্যথাটা সম্পূর্ণ উবে যাবে না। মৃগনয়না ওদের জন্য যতদূর সম্ভব করবে। সর্বদা তাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার সুযোগ ওরা পাবে।

সন্ধ্যার পর পার্টির পাঁচজন প্রধানদের মধ্যে চারজনের কাছে মৃগনয়না তার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল। মিসেস বসাককে আজ বিশেষ করে আনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েদের তিনি বোধ্য বিষয় চমৎকার বুঝিয়ে দিতে পারেন। সেক্রেটারি ধরণীবাবুর মুখ প্রতিদিনের মতো একান্ত নির্বিকার, কালা ও বোবা মানুষের মতো তাঁকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র মনে হয়। কিন্তু কথা যখন তিনি বলেন, মনে হয় একজন পরমাত্মীয় এতক্ষণ ছদ্মবেশ ধরে ছিলেন। ধীরেন বড়লোকের ছেলে, কলেজে পড়ে এবং একজন স্টুডেণ্ট-লীডার, পার্টির কোন মেয়েকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। রহমন প্রপাগাণ্ডা সেক্রেটারি। নরেশ আগে চুপচাপ মানুষ ছিল, পার্টির একটি সমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করার পর আজকাল বড় বেশি কথা কয়।

মৃগনয়নার কথা শুনে সে উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'বিয়ে করবে? কন্‌গ্র্যা-চুলেশান্‌স্! বিয়ের সাধটা শেষ পর্যন্ত উপে যাবে ভেবে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম ভাই। যে কাজের ভারটাই নিয়েছ!'

মিসেস বসাক বললেন, 'আঃ, আপনি চুপ করুন। কিন্তু মৃগনয়না, তোমার কাছে যে আরও অনেক কিছু পার্টি আশা করছে! আরও কয়েকবছর তুমি আরও

কয়েকজনকে পার্টিতে আনতে পারবে, এখনো তোমার সরলতা, সহজ ছেলেমানুষী ভাব আরও' কয়েক বছর থাকবে। তুমি বলেছিলে পার্টির জন্য জীবন দেবে। এত শীগগির একজনকে হৃদয় দান করে ফেলা তোমার উচিত হয়নি। সাধারণ বাজে মেয়েরা এরকম করে, পার্টির চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ তাদের বড় হয়ে দাঁড়ায়। তুমি তাদের মতো নও। যতীনবাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা কোনো মেয়ে জোগাড় করতে পারেনি, তুমি তাকে পার্টির মেম্বার করেছ, তাঁকে দিয়ে প্রেস কিনিয়ে দিয়েছ। বিশুকে তুমি পার্টিতে এনেছ, কয়েক বছর ট্রেনিং পেলে ও দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেবে - বিশেষত, তোমাকে পেলে পার্টির জন্য ও করবে না এমন কাজ নেই। তোমার মতো ওয়ার্কার পার্টিতে একজনও নেই। বিয়ের বয়স তোমার ফুরিয়ে যাচ্ছে না, ক'টা বছর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পার না ?'

ধরণীবাবু বললেন, 'তাছাড়া, আমরা ভাবছিলাম সামনের বছর তোমাকে কমিটিতে নেওয়া হবে। এখন পার্টি ছেড়ে যাওয়া—'

মৃগনয়না মৃদুস্বরে বললে, 'পার্টি ছাড়ব কেন ? আমি একজন পার্টির লোককে বিয়ে করছি—দুজনে আমরা পার্টির কাজ করব।'

মিসেস বসাক সভয়ে বললেন, 'যতীনবাবুকে ? না বিশুকে ? দফা সেরেছ তুমি। যাকে তুমি বিয়ে করবে, তাকেই পার্টি হারাবে। শুধু নামটা হয়তো লেখা থাকবে খাতায়।'

'আমি হাবুলমামাকে—মানে, প্রশান্ত দত্তকে বিয়ে করব।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নরেশ প্রশ্ন করল, 'হাবুলমামা বলছ—?'

'না' সম্পর্ক কিছু নেই। মাকে দিদি বলেন, তাই হাবুলমামা বলি। ওঁর মনের জোরের তুলনা হয় না। সারাদিন খেটে সকলকে খাটান, তারপর এতটুকু বিশ্রাম না করে পার্টির কাজ করেন। অমন স্বাস্থ্য তাই, অন্যলোক হলে মরে যেত।'

মিসেস বসাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা, বিয়ে যদি করতে চাও, বাধা দেবার অধিকার আমাদের নেই। শুধু ভাবছি, বিয়ের পর যতীনবাবু, বিশু এদের মতো কাউকে কি পার্টিতে আনতে পারবে।'

মৃগনয়না চুপ করে রইল। ঘরের স্তব্ধতায় তার বক্তব্য যেন মুখর হয়ে

রইল তার শব্দহীন কথায়, পার্টির জন্য সে প্রাণ দেবে কিন্তু তার চুম্বক ধর্মকে আর কাজে লাগাতে পারবে না। দুজনকে টানতেই তার হাঁফ ধরে গেছে।

মৃগনয়না খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল। হাবুল সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে সবে স্নান শেষ করেছে, মৃগনয়না তাকে গ্রেপ্তার করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সব শুনে কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল মৃগনয়নার হাবুলমামা!

'আমি তোমাকে বিয়ে করব? পাগল নাকি! আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বড়লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা—'

'বড়লোকদের বিরুদ্ধে নয়।'

'ওসব কূটতর্ক রাখ। গরীবের মেয়ে হলেও তোমাকে আমি বিয়ে করতাম না মিণ্ড। বিয়ে যদি কোনদিন করি, পার্টির কোনো খাঁটি ওয়ার্কারকে করব, যাতে দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে পারি।'

মৃগনয়না বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করল, 'আমি কাজ করি না?'

'তুমি?' হাবুলের চোখে মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি দেখা গেল, 'তুমি পার্টির যতীনবাবুদের মোটরে ঘুরে বেড়াও, হোটেলে খানা খাও, বিশুর সঙ্গে সিনেমায় যাও—পার্টির কাজ কর বৈকি!'

মৃতজনে দেহ প্রাণ

ঈষৎ ঢাল সমভূমিতে এলোমেলো ভাবে ছড়ান বাড়িগুলি শেষ দুপুরের রোদ পোয়াচ্ছে। শীতকালের খাঁখাঁ টনটনে পাহাড়ী রোদ। পশ্চিমে সরু একফালি সাফস্রুৎ অরণ্যের এক মাথায় টিলার মতো ছোট পাহাড়টি বসান। দুদিকে শাখাপ্রশাখা ছড়াতে ছড়াতে এসে প্রধান রাস্তাটি পাহাড়ের প্রায় দেড়শ গজ তফাৎ দিয়ে এগিয়ে গেছে। পথ আর পাহাড়ের মধ্যে বাড়ি আছে তিনটি। দুটি বাড়ির গেট প্রায় পথের উপরে, অন্য বাড়িটি পাহাড়ের ঠিক নিচে। পথ-ঘেঁষা বাড়ি দুটির ব্যবধানকে মাঝামাঝি চিরে মাটি পাথর আর শুকনো পাতার এবড়োখেবড়ো পথ পাহাড়-ঘেঁষা বাড়িটির সঙ্গে বড় রাস্তার সংযোগ ঘটিয়েছে।

বাড়িটি ছোট এবং সাদাসিদে। একসারিতে পাশাপাশি তিনখানা ঘর, সামনের সমস্তটাই খোলা বারান্দা। বাড়ির আনুসঙ্গিকটি অনেকখানি তফাতে চাকা-বসান কুয়োর ধারের বিচ্ছিন্নতায় এবং আগাগোড়া টিনের হওয়ার তুচ্ছতায় প্রায় চোখেই পড়ে না।

বারান্দার একধারে সাধারণ দুটি বেতের চেয়ারে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক রোদে বসেছিল। পুরুষটি মাঝবয়সী, সুস্থ সবল উন্নত চেহারা, মোটা চিবুক কামানো দাড়িতে কড়া দেখায়। তার স্ত্রী হবার মানানসই বয়স মেয়েটির, যদিও সে ক্ষীণাঙ্গী। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে দুজনেরি ঠোঁট ফেটেছে, মেয়েটির পাতলা ঠোঁটের দুটি ফাটলে রক্ত জমে আছে দুই রত্তি। উদ্বিগ্ন প্রত্যাশায় দুজনকেই একটু উতলা মনে হচ্ছে। পথের দিকে তাকাবার ভঙ্গিতে এবং বড় রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ হলে দুজনের নড়েচড়ে বসবার রকমে প্রত্যাশার স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'সময় চলে গেছে। আজ আর আসবে না।' ঠোঁট বাঁচিয়ে প্রমীলার কথা বলার চেষ্টা দেখে পরাশর নিজেও ঠোঁট বাঁচিয়েই একটু হাসল। 'গাড়ি আজকাল তিন চার ঘণ্টাও লেট করছে। তবে না-ও আসতে পারে, চিঠি লেখার পর হয়তো মত বদলেছে। ধাপ্পাও হতে পারে।' প্রমীলা মাথা নাড়ল। 'এতকাল পরে হঠাৎ ধাপ্পা দিতে যাবে কেন?' 'কেন? কে জানে কেন! এতকাল পরে হঠাৎ দেখা করতেই বা আসবে কেন? এমন খাপছাড়া কাজ

কেউ করে বলে তো শুনি নি।' তিনবার কথা বলতে গিয়ে প্রমীলা চেপে গেল। তারপর আচমকা বলে ফেলল, 'আমাকে হয়তো একবার দেখতে চায়।'

'তোমাকে? পাঁচ ছ বছর চুপ করে থেকে হঠাৎ স্ত্রীর জন্য ভূপতিব মাথাব্যথা হবে কেন?'

'মনস্তত্ত্ববিদ!' বলে প্রমীলা হাসল এবং 'উঃ' শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। পরাশরের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাতের ভর দিয়ে মাথায় গাল রেখে মৃদুস্বরে বলল, 'মন বুঝেও মান রেখে কথা কইতে তুমি আর শিখলে না। আমি জানি তুমি কী ভাবছ—টাকা বাগাবার চেষ্টায় আসছে।' 'ভাবি নি ঠিক, ওই রকম কিছু আন্দাজ করছিলাম। তবে একটা খটকা লাগছে, এতদিন চুপ করে রইল কেন?'

'সাহস পায় নি হয়তো। তুমি যে স্পষ্ট বলে দিলে একটু গোলমাল করলেই খুন করে ফাঁসি যাবে। মেয়েমানুষ নিয়ে জগতে ঢের খুনটুন হয়ে গেছে জানে তো। তোমাকেও জানে ছেলেবেলা থেকে, কী রকম মাথা খারাপ তোমার। তারপর মানুষটা যা ভীরু। তুমি যে শুধু ভয় দেখিয়ে—'

'ভয় দেখাই নি। এসে যদি গোলমাল করে সত্যি খুন করব।'

'না। সত্যি বলছি ভালো হবে না যদি মাথা গরম কর। দরকার হলে মারধোর করে তাড়িয়ে দাও, সে আলাদা কথা। ওর জন্যে তুমি বিপদে পড়বে, মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

প্রমীলা ফিরে এসে চেয়ারে বসল। শুকনো বাতাস দুজনেরি মুখের তৈলাভ লাবণ্য শুষে নিয়েছে; পরিবর্তনহীন স্থায়িত্বের মধ্যে এই মৃদু রুক্ষতার কারণটা অতিশয় প্রত্যক্ষ। মুখ দেখে দুজনের দুর্ভাবনার ঠিক মতো হদিস পাওয়া কঠিন। মনের আলোড়ন আড়াল করে রেখে সহজ হয়ে থাকবার চেষ্টাই বরং প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়েছে। দুচোখে প্রশ্ন নিয়ে একজন আরেকজনকে নিরীক্ষণ করছে, অপরের মধ্যে শুধু ভাবনা অথবা ভয় জানবার ইচ্ছায়।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে পরাশর বলল, 'টাকার জন্য নাও হতে পারে, মিলু।'

'কী তবে?' প্রমীলাও দেখাদেখি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে লাগল।

'কোন রকম প্রতিশোধ নিতে হয়তো আসছে।'

'প্রতিশোধ নিবে? ও?' ঈষৎ বিবর্ণ মুখখানা প্রমীলার আন্তরিক অবজ্ঞা ও

ঘৃণায় কালচে মেরে গেল, 'যে মানুষ অন্যায় সয়ে চুপ করে থাকে—' প্রমীলা ঢোক গিলল, 'আমরা যে অন্যায় করেছি তা বলছি না, তবু—' কথা বলার সুযোগ আর তারা পেল না। দেখা গেল, চুনীলালের ভাড়াখাটা গাড়িটা সর্বাঙ্গে আওয়াজ তুলে মাটি পাথর আর শুকনো পাতা দলন করে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে।

গাড়ি থেকে নামল একটা কঙ্কাল।

পরাশর ও প্রমীলা দুজনেই চমকে গেল ভূপতিকে দেখে। মুখে হাড়ের ওপর যেন আলগা করে চামড়া বসান আছে, শুকনো রঙচটা বাদুড়ের পাখার মতো পাতলা চামড়া। চোখ কোটরে, মাথায় বেশির ভাগ চুল উঠে গেছে, গলা এমন সরু যে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয় মাথার ভারে মট করে মচকে যাবে। হাতের শীর্ণ আঙ্গুলগুলি যেন লম্বায় বেড়ে তেরচা হয়ে গেছে। গা উদলা থাকলে হয়তো তাকে এতবেশি জীবন্ত কঙ্কাল বলে মনে হত না। যে টুকু বাইরে আছে তার বীভৎস শীর্ণতাই যেন ঘোষণা করছে গরম জামা কাপড়ের আড়ালে শুধু আছে শ্যাওলা-ধরা ময়লা হাড়।

নামতে ভূপতির কষ্ট দেখে বোধ হয় তাকে সাহায্য করার প্রেরণাতেই প্রমীলা সিঁড়িতে একধাপ নেমে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে সে ভূপতিকে দেখতে লাগল। ভূপতি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, দেহটাই তার বাঁকা হয়ে গেছে। হাত পা নাড়তে তার সময় লাগে। ধীরে ধীরে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে চুনীলালের ভাড়া মিটিয়ে দেবার সমস্ত সময়টা সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। পা টেনে টেনে সিঁড়ির নিচে এসে মৃত চোখের অসহায় দৃষ্টিতে সে দুজনের দিকে তাকাতে লাগল। পরাশর চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি, দু হাতে চেয়ারের দু প্রান্ত সজোরে চেপে ধরে মেরুদণ্ড টান করে বসে আছে। মনে হল, প্রমীলাকে ধরে বুঝি ভূপতি বারান্দায় উঠবার চেষ্টা করবে। খানিক ইতস্তত করে সে সামনে ঝুঁকে দু হাত সিঁড়িতে রাখল, তারপর শ্লথ মন্থর চতুষ্পদের মতো তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল কোঁকাতে কোঁকাতে। প্রমীলার চেয়ারে বসে পেছনে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজল।

প্রমীলা চোখ বুলোতে লাগল কদম, পেয়ারা, ইউক্যালিপটাস গাছ গুলিতে। ল্যাজফোলা চপল কাঠবেড়ালিটাকে প্রাণপণে দেখে, ঘন ঘন পলক ফেলে, চোখ

বুজে সে যেন দৃষ্টিজোড়া অবান্তর, অপার্থিব, অসম্ভব দৃশ্যটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল ভুল বা স্বপ্নের মতো।

'তোমার কী হয়েছে?' পরাশর শুধোল। মৃদুস্বরে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতেই তার গলাটা গেল কেঁপে।

'টি-বি!' ভূপতি চোখ মেলল না।

'এখানে এলে কেন তুমি?'

'মরতে।'

'এ অবস্থায় এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি।'

'উচিত হয় নি মানে? পাঁচ সাত দিনের মধ্যে আমি মরে যাব।'

ভূপতির গলার আওয়াজ মাঞ্জা দেওয়া সরু তারের মতো ধারাল, বড় মানানসই তাই শোনাল তার কথাগুলি। প্রমীলার কপালের ঠিক মাঝখানে, মেয়েরা যেখানে টিপ পরে, শির শির করতে লাগল আর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ক্ষণস্থায়ী তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতি লোমকূপে ছুঁচ বিঁধল একটা করে।

তারপর পরাশর ও প্রমীলার মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। পরাশর কী বুঝল, কী ভাবল সে-ই জানে, মুখের শূন্যতাকে বার কয়েক চিবিয়ে নিয়ে সে রূঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি কি আর মরবার জায়গা পেলে না?'

'না।'

'এখানে তোমায় আমরা রাখতে পারব না।'

'পারবে।'

'গায়ের জোরে নাকি তোমার?'

'জোর কই গায়ে?'

'তোমার মতলব জানি, তুমি প্রতিশোধ নিতে এসেছ। ভেবেছ, মরতেই যখন হবে, ওদের ওখানে গিয়ে মরি, দুজনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। সিনেমার গল্প ঘেঁটে ঘেঁটে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে ভূপতি। এ রকম উদ্ভট নাটুকেপনা করে তাই মরতে এসেছ প্রতিশোধ নিতে।'

'চার বছর সিনেমা ছেড়েছি ভাই, অসুখে ভুগছি। কিসের প্রতিশোধ?'

'বাজে বোকো না ভূপতি।'

'বাজে বকতে সত্যি কষ্ট হয়।'

'এসেছ, আজ রাতটা থাকো। কাল সকালে নিজে থেকে যদি না যাও,

তোমায় হাসপাতালে ফেলে রেখে আসব। জিদ্ করে মদ খাওয়াতে গিয়ে আমি বৌয়ের দাঁত ভেঙ্গে ফেলি না, কিন্তু আমিও নিষ্ঠুর হতে জানি।'

'এমনিতেই পাঁচ সাত দিন মোটে টিঁকব। জোর করে তাড়াতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে।'

পরাশর হার মেনে চুপ করল। কতদিন থেকে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ভূপতির কাছে ভয়-ডর দ্বিধা-সংকোচ লজ্জা-মান সব কিছু বাতিল হয়ে গেছে কে জানে! শিশু আর মুমূর্ষুর সঙ্গে কে লড়াই করবে? এতক্ষণে পরাশরের নজরে পড়ল, ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে প্রমীলা তাকে নিষেধ করছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে প্রমীলার।

ভূপতি আবার চোখ বন্ধ করল। অস্ফুটস্বরে বলল, 'একজন ডাক্তার ডাকাও। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকাও একজন। আমায় বিছানায় শুইয়ে দাও। কটা দিন বাঁচিয়ে রাখ। মরতে দিও না।'

ব্যাকুলতায় পাগলের মতো হয়ে প্রমীলা বলল, 'শিগ্‌গির যাও, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। কী করি এখন আমি!'

তারপর ডাক্তার এল, ওষুধ এল, পথ্য এল, রচিত হল মুমূর্ষুর রোগশয্যা। ভূপতি মরবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনো যখন মরেনি তাকে বাঁচাবার সমস্ত চেষ্টাই করতে হবে বৈকি। চার বছরের চেষ্টায় কোনো ফল হয় নি তাও সত্য, কিন্তু ভূপতি শেষ হয়ে যাবার আগে তো চেষ্টা শেষ হতে পারে না। হাড়কাঁপানো পাহাড়ী শীতে অনেক রাত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে পরাশর যে চিকিৎসার আয়োজন করে ফেলল তাতে আর খুঁত রইল না। র‍্যাপার-কম্বল জড়িয়ে রোগীর শিয়রে বসে দুজনে রাত কাটিয়ে দিল।

রাতভোর দুজনেই যে কতবার সন্তর্পণে পরীক্ষা করে দেখল ভূপতির দেহে প্রাণ আছে কি না!

ঘুমে অথবা অবসাদে সারারাত ভূপতি মড়ার মতো পড়ে রইল। প্রথম সে চোখ মেলে চাইল অনেক বেলায়, ভাঙ্গা গলায় ফিসফিস আওয়াজে প্রথম কথা কইল, 'আমি মরি নি?'

ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যে এসব রোগের চিকিৎসা চিকিৎসা-কেন্দ্রেই ভালো হয়। আশা যদিও নেই বিশেষ কিছু, তবু ভূপতিকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

প্রমীলা তাকিয়ে রইল পরাশরের মুখের দিকে।

পরাশর বলল, 'থাকগে, কাজ নেই। আমরাই যতটা পারি করি।'

পাঁচদিন গেল, সাতদিনও গেল। ভূপতি মরল না। চেঞ্জ, নতুন ডাক্তারের চিকিৎসা, পথ্যের অদল-বদল, সেবা-যত্নের নতুনত্ব, মানসিক পরিবর্তন কিসে যে কি হল কেউ জানে না, তিন সাতে একুশ দিন পরেও ভূপতি বেঁচে রইল। ডাক্তার, স্পেশালিষ্ট নন বলে এখানে রেখে ভূপতির চিকিৎসা করতে যিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে জানিয়ে দিতে লাগলেন দিন দিন ভূপতির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। জানিয়ে দেবার অবশ্য কোনো প্রয়োজন ছিল না, পরাশর ও প্রমীলার চোখেও সে উন্নতি ধরা পড়ছিল।

একদিন পরাশর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর সত্যি টি-বি হয়েছিল তো ডাক্তারবাবু? না, খেতে না-পেয়ে ওরকম হয়েছিল?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন। বললেন, 'সে, কি! তাই কখনো হয়? আমি টি-বির চিকিৎসা করছি—'

যে বাঁচায়

দশ বছর পরে মাধব দেশের গাঁয়ে ফিরল। রিলিফ ওয়ার্ক চালাবার জন্য। গাঁয়ের নাম বাঙ্গাতলা। গাঁয়ের গৌরব ধনঞ্জয় সরকার। কলকাতায় ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে তিনি বাঙ্গাতলাকে ধন্য করেছেন। প্রতিবছর তিনি একবার গাঁয়ে আসেন, সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে এবং একদিনের জন্য। বাঙ্গাতলা ও আশে-পাশের আরও কয়েকটা গাঁয়ের লোক তাঁকে অজস্র সম্মান দেয়। দুচারশো টাকা দান করে তিনি ফিরে যান। সম্মানের বিনিময়ে নয়, এমনি। সম্মান তাঁর পাওনাই আছে। বাঙ্গাতলায় যে অবৈতনিক বিদ্যা, দাতব্য চিকিৎসা, টিউব ওয়েলের জল ইত্যাদি পাওয়া যায় সে সব সরকার মশায়েরই কীর্তি।

তাঁরই আপিসে মাধব চাকরি করে। নির্ভরযোগ্য হাসিখুশি ভালোমানুষ, গুছিয়ে কাজ করতে পারে এবং কাজ করিয়ে নিতে জানে। আদর্শবাদী অথচ বেশ হিসেবী। প্রচুর বিনয় ও ট্যাক্ট আছে। মাঝে মাঝে বই পড়ার সখ চাপে, আবার কেটে যায়। স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসে। ছেলেটিকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে আদর করে অবর্ণনীয় সুখ পায়। ধনঞ্জয় তাকে পছন্দ করেন এবং দেড়শো টাকা মাইনে দেন।

বাঙ্গাতলায় লোকে না খেয়ে মরছে শুনে ধনঞ্জয়ের ভাবনা হয়েছিল। গাঁয়ের লোকের ভালোমন্দের দায়িত্ব তো তাঁর। গাঁয়ের একত্রিশ জনকে তিনি সম্প্রতি আপিসে কাজ দিয়েছেন। ধনঞ্জয় নিজেই যে ফাঁপছিলেন তা নয়, তাঁর জানাশোনা আরও অনেকে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছিল। লোকের প্রয়োজনও বেড়েছিল সেই অনুপাতে—আপিসে, কারখানায় এবং মফস্বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা ওটা গড়ে তোলবার স্থানে। শুধু বাঙ্গাতলা নয়, আশেপাশের আরও কতগুলি গাঁয়ের হাজার খানেক লোককে কাজ দেবার সাধ ধনঞ্জয়ের ছিল। কোশপুরে মস্ত কাজ হচ্ছিল, সকলকে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। সবাই খাওয়া পেত, থাকার ঘর পেত, মজুরি পেত—তিনটিই ভালো পেত। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রকাশ পাওয়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর নামে কুৎসা রটে গেল, তিনি নাকি কুলি চালানের দালালি নিয়েছেন। যত চাষী মজুর হতে রাজী ছিল তাদের একজনকেও তিনি তাই কাজ দেন নি। নিন্দেটা তাতে প্রমাণ হয়ে যেত! তারপর ধনঞ্জয় স্থির করেছেন বাঙ্গাতলায়

দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ করবেন। না করে উপায়ও তাঁর ছিল না। নানা দিক থেকে চাপ পড়ছিল। তার মতো বড়লোক অনেকে বিতরণ করছে, এ একটা চাপ। কনট্রাক্ট দেবার কর্তারা ইঙ্গিত করছেন, সে আরেকটা চাপ। বাঙ্গাতলা হিতৈষিণী সমিতি (প্রেসিডেন্ট—ধনঞ্জয় সরকার) গাঁয়ের লোকের প্রত্যাশাকে আবেদন নিবেদনের রূপ দিচ্ছে, সেও চাপ। তাছাড়া পূর্বোক্ত কুৎসাটির প্রতিকার করার বাসনার চাপ এবং হৃদয় নামক অঙ্গটির দয়াদাক্ষিণ্য ও উদারতার চাপ তো আছেই।

কাজের ভারটা তিনি দিয়েছেন মাধবকে; সেই সঙ্গে দরকারী উপদেশও দিয়েছেন। মাধবকে বেশি বলা বাহুল্য, কি ভাবে কি করতে হবে তার পলিসিটা বাৎলে দিলেই সে সব সমঝে নেয়। মাধবের নীতিজ্ঞান অতি তীক্ষ্ণ।

'একটু সামলে চোলো হে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কলকাতায় লোকারণ্য কেন? ফুটপাতে মানুষ মরতে আসছে কেন? কলকাতায় খাবার আছে। বেশি খেতে দিলে চাদ্দিকের লোক বাঙ্গাতলায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামলাতে পারবে না। কি অবস্থা!'

'ছোট মগের মাপে দেব ভাবছি। বেশি সইতেও পারবে না, পেট খারাপ হয়ে যাবে।'

'অন্নই আসল জীবন। ব্যঞ্জন নয়, স্বাদগন্ধ নয়।'

'নিশ্চয়ই। ভিক্ষের চালের আবার কাঁড়া-আঁকাড়া।'

'এমন অবস্থা আর হয় নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোথা লাগে! ভালো কথা মাধব, অক্ষয়ের বোনটা নাকি নিখোঁজ হয়েছে?'

'নিখোঁজ মানে ওই আর কি যা হয় বুঝলেন না?'

'তা, দোষ কি করে দি? যুবতী মেয়ের খিদে একটু বেশিই হয়। আহা, এদিকে খিদের জ্বালা, ওদিকে বদ্‌লোকের প্রলোভন, যুবতী মেয়ে তো যতই হোক! গাঁয়ের কেউ ওকে দুটি খেতে দিতে পারল না? ভদ্র ঘরের বাড়ন্ত যুবতী মেয়ে, চাইতে পারে না বলে কি দিতে নেই? ছি ছি! এ গাঁয়ের কলঙ্ক, আমার কলঙ্ক। বিপাকে পড়লেও ভদ্রঘরে ভিক্ষে নেবে না। লুকিয়ে কিছু কিছু চাল ডাল ঘরে দিয়ে এলে ওদের মানটাও বাঁচে, প্রাণটাও বাঁচে।'

'আমার দোষ নেই। অক্ষয়ের বিধবা মা আর যুবতী বোনটা যে গাঁয়ে পড়ে

আছে কেউ আমায় জানায় নি। তবু আমিই দোষী। জেল থেকে বেরিয়ে অক্ষয় ভাববে কি না বলো যে সরকার মশায় থাকতে তার এই সর্বনাশ হল?'

'তা ঠিক। দেখি কি করতে পারি।'

স্টেশনে ভিড় করেছিল একদল নরনারী যাদের দেখলেই মরণাপন্ন গাছের কথা মনে পড়ে যায়। মাধব তাদের জন্য কলকাতা থেকে চাল ডাল আটা ময়দা নিয়ে আসছে খবর শুনে তারা স্টেশনে ছুটে এসেছে। না, ঠিক ছুটে তারা আসে নি, ধীরে ধীরে হেঁটেই এসেছে। বাঙ্গাতলা থেকে স্টেশন মোটে তিন মাইল পথ, দশ পনের মাইল হলেও তারা আসত। কারণ, দান এগিয়ে গিয়ে সবার আগে নিতে হয়, নইলে ফুরিয়ে যায়। জগতে চিরকাল চাওয়ার তুলনায় দান কম পড়ে এসেছে, সবার আগে হাত পাতবার প্রয়োজনটা তাই সবাই জানে।

বেলা তিনটের গাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যা সাতটায়। স্টেশনের গ্রাম্যতা তখন অন্ধকারের রূপ নিচ্ছে। লোক দেখে মাধব প্রথমে ভেবেছিল, সরকার মশায আসবে শুনে সবাই বুঝি তাকে অভ্যর্থনা করতে এসে ভিড় জমিয়েছে, তারপর আসল ব্যাপার টের পেয়ে তার বেশ একটু উল্লাস ও গুরুত্ববোধ জাগল। কারণ যাই থাক, তারই প্রতীক্ষায় এতগুলি লোক জমা হয়েছে এ চিন্তা মানুষকে উল্লাস দেবেই, নয়তো কোনো চাপরাসী কোনোদিন খাতির পেয়ে খুশি হত না। গুরুত্ববোধ জাগল দায়িত্বের হদিস পেয়ে। এদের প্রত্যাশা যে কত অধীর এই ভিড তার প্রমাণ। তাকে কারবার করতে হবে এদের নিয়েই।

মাধবের সঙ্গে শুধু বিছানা আর সুটকেস নামতে দেখে জনতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ্য উপলব্ধি করে মাধবের গা ছমছম করতে লাগল। খালি হাতে স্টেশনে নেমে সে যেন হৃদয় মনের এক বিরাট অভিযানকে বিপথে চালিয়ে দিয়েছে; পাক দিয়ে এসে সেটা রক্তমাংসের আক্রমণে পরিণত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

হেডমাষ্টার ভূপতি চক্রবর্তী বললেন, 'আপনি ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি বলেছিলাম, বিশ্বাস করে নি।'

মাধব কি আর করে, দুবার খুক্ খুক্ করে কেশে নিয়ে চিৎকার আরম্ভ করল: সকলে শোন—

সকলে শুনল। সেই ভয়ানক স্তব্ধতা ভেঙে গেল। উন্মুখ ভিক্ষুক বোধ হয় মরে গেলেও আশ্বাসের মন্ত্রে বেঁচে ওঠে। নয়তো পৃথিবীতে এত মানুষ আজও

বেঁচে আছে কেন? ভিড় যেন সম্বিৎ ফিবে পেয়ে সশব্দ উত্তেজনায় জীবনের গুঞ্জন তুলে গাঁয়ের দিকে রওনা হল। আজ আসেনি কিন্তু তাদের জন্য অন্ন আসবে। খেতে তারা পাবেই। স্বয়ং ধনঞ্জয় সরকার তাদের সকলকে খাওয়াবেন। স্টেশনে আসা তাদের সার্থক হয়েছে। ঝোপে আর গাছে ছড়ান জোনাকিগুলি যেন টেপা টেপা সংকেতে সায় দিতে লাগল।

স্কুলের ঘরে মাধবের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুল আজ মাস দুই বন্ধ আছে। ছেলে হয় না বলে ধনঞ্জয় পূজোর ছুটি পর্যন্ত স্কুল বন্ধ বাখবাব হুকুম দিয়েছিলেন। স্কুলের লাগাও হেডমাস্টারের বাড়ি, মাধবের জন্য তিনি খাওয়ার আয়োজনটা করে-ছিলেন ভালোই। হেডমাস্টারের স্ত্রী নিজে পরিবেশন করে তাকে খাওয়ালেন, পান এনে দিল তার মেয়ে। অতিথিকে ঘরের লোক করে নেওয়াটা গ্রাম্য ব্যবহার। তবে এক্ষেত্রে সেটা একটু খাতির করায় দাঁড়িয়ে গেল। স্কুলের মাস্টারদের বেতন এক পয়সা বাড়ান হয়নি, এই দুর্দিনে তাদের দিন চলে না। এদিকে মাধব ধনঞ্জয়কে একটু বললেই এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে। এটুকু উহ্য থাকলে ভূপতির বাড়ির পারিবারিক আদর-যত্নে মাধব মুগ্ধ হয়ে যেতে পারত।

স্কুলের কেরানি শ্যামল এ বাড়িতেই থাকে। খাওয়াদাওয়ার পর আড়াল থেকে স্বার্থের কথাটা সেই সামনে টেনে আনল। শ্যামলের বয়স ত্রিশের নিচে, অজীর্ণের চেহারা। বিনিয়ে বিনিয়ে শোকের শোভাযাত্রার মতো কথা বলে।

'আমাদের দিকে একটু না তাকালে আমরা আর বাঁচি না, মাধববাবু। বাবুর আপিসের পিয়ন পর্যন্ত রেশন পাচ্ছে, আমরা ইদিকে—' শ্যামল প্রায় কখনোই মুখের কথা শেষ করে না। যেটুকু বলা হলে বক্তব্য বোঝা যায় সেইটুকু বলেই সে সার্থক হাসির ভঙ্গিতে নীরবতার জের টানে।

মাধব হেসে বলল, 'আপনারা তো সুখে আছেন মশায়। ছুটিও ভোগ করছেন, মাইনেও পাচ্ছেন।'

ভূপতি বিমর্ষভাবে বললেন, 'সরকার মশায় হঠাৎ যে কেন স্কুলটা বন্ধ করলেন। প্রায় নব্বুইটি ছেলে অ্যাটেণ্ড করছিল—'

'নব্বুই? বলেন কি সার!' মাধবের পান চিবানো বন্ধ হয়ে গেল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নিজে অ্যাটেণ্ডান্স রেজিস্টার দেখে অ্যাভারেজ কষে পাঠিয়েছি। বাবু বুঝি বিশ্বাস করেন নি?' ভূপতি শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করলেন।

আবার পান চিবোতে আরম্ভ করে মাধব বলল, বিশ্বাস অবিশ্বাস জানি না মাস্টার মশায়। বাবুকে জানেন তো, কখন কি খেয়াল চাপে কেউ টেরও পায় না। উনি রসিক পিয়নকে পাঠিয়েছিলেন ছেলে গুণতে। ও ব্যাটা এক নম্বর ধূর্ত। গিয়ে বলে কি, নিমতলায় গামছা কাঁধে ঠায় বসে থেকে এক এক করে' গুণে দেখেছে, তেত্রিশটি ছেলে স্কুলে এল।'

শ্যামল হাত কচলাতে লাগল। ভূপতি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেদিন—হয়তো কিছু কম ছিল। মানে, কি জানেন, মেলা-টেলা থাকলে ছেলেরা আসে না।'

স্কুলের ঘরে শুতে গিয়ে ধনঞ্জয়ের আশ্চর্য উদারতার কথা ভাবতে ভাবতেই মাধব সে রাত্রে ঘুমোল। তাকে পর্যন্ত ধনঞ্জয় জানান নি যে ভূপতি ছেলের সংখ্যা বাড়িয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন, মিথ্যাটা তিনি ধরে ফেলেছেন! মিথ্যাকে তিনি মিথ্যা বলে গ্রহণ করেন নি, ভূপতির প্রবঞ্চনা ক্ষমা করেছেন, চেপে গেছেন। এদের আতঙ্ক তিনি টের পেয়েছিলেন। স্কুল বন্ধ হলে মাইনেও বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মরিয়া হয়ে ভূপতি অন্যায়টা করে ফেলেছেন অনুমান করে রাগ হওয়ার বদলে তাঁর অনুকম্পা জেগেছে। কী মহৎ তিনি! ফিরে গিয়ে সর্বাগ্রে মাধব তাঁর পদধূলি গ্রহণ করবে। তিনি যে জেনেছেন একথা জানিয়ে ভূপতিকে লজ্জা দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটা পর্যন্ত দমন করার মহত্ত্বেই ধনঞ্জয় মাধবের কাছে দেবতার চেয়ে বড় হয়ে যান। ভক্তির উত্তাপে মাধবের মোহ ঘন আঠালো হয়ে আসে।

দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রে তার দুবার ঘুম ভেঙে গেল। দুবারই শেয়ালের ডাক শুনে প্রায় আধঘণ্টা করে' সে জেগে রইল।

সকালে চা খেতে গিয়ে দিনের আলোয় মাধবের খেয়াল হল ধনঞ্জয় যাদের যুবতী বলেন ভূপতির মেয়েটি সেই পর্যায়ে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্য, শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য মাধবের মনটা একটু খিঁচড়ে গেল। এর জন্যই কি ভূপতির প্রতি ধনঞ্জয়ের এত দয়া? স্বাদগন্ধহীন গেঁয়ো চা-টুকু গিলতে গিলতেই মানসিক বিশ্বাসঘাতকতার প্রক্রিয়াটি সে সামলে নিল। ওসব দোষ ধনঞ্জয়ের নেই। তিনি শুধু অধ্যবসায়ী কৃতী পুরুষ নন, চরিত্রবানও বটে। তাঁর শত্রুও একথা স্বীকার করবে। ভূপতির মেয়েকে হয়তো তিনি কোনোদিন চোখেও দেখেন নি। হয় তো শুধু শুনেছেন যে ভূপতির একটি যুবতী মেয়ে আছে। যাদের বাড়িতে যুবতী বোন বা মেয়ে আছে তাদের ধনঞ্জয় একটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। চাকরি দেবার

সময় প্রত্যেকের পরিবারের খবর তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে এসে খালি হাতে ফিরে যায় নি। মাধব জানে, ধনঞ্জয়ের এই সদাজাগ্রত সহানুভূতি সূর্যের আলোর মতো নির্মল। যুবতী মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, তাঁর সবটুকু সহানুভূতি শুধু যুবতী মেয়ের বাপ ভায়ের জন্য।

'অক্ষয়ের বোনটার খবর জানেন মাস্টার মশায়? নলিনীর?'

'সে সদরে আছে।'

'সদরে নাকি! শুনছিলাম একেবারে নিখোঁজ?'

'না, সদরে নৃসিংহবাবুর রিলিফ ওয়ার্ক করছে।'

'বটে? তবে যে শুনলাম নৃসিংহবাবুর ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে খেতে না পেয়ে?'

'ঠিক পালিয়ে যায় নি, চলে গেছে। বলা হল অনেক, কারো কথা শুনল না। ওর মা তো ওকে গাল দিয়ে কিছু রাখেনি। শিববাবু, ভোলানন্দী এঁরা সবাই কিছু টাকা সাহায্য দিতে চাইলেন, সরকার মশায়কে বলে সব ঠিক করে দেওয়া হবে জানান হল, ও তা গ্রাহ্যও করল না। খালি বলতে লাগল, 'যান্, যান্, আপনারা যান্।' মাকে ফেলেই চলে গেল।'

শেষ কথাটায় মাধব মুচকে হাসতে থাকে। ওটা যেন বলাই বাহুল্য ছিল।

শ্যামল বলে, 'সে এক কাণ্ড মাধববাবু। মা টেনে হিঁচড়ে মেয়েকে আটকাতে চায়, মেয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় মাকে। বুড়ী কেন গায়ের জোরে পারবে অমন জোয়ান মেয়ের সঙ্গে! টানতে টানতে বেলতলা তক্ নিয়ে গেছ্‌ল। বুড়ী তখন হাঁউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। আমরা মেয়েটাকে ধমকে ছাড়িয়ে দিলাম।'

ভূপতির মেয়ের মুখখানা বিবর্ণ ম্লান দেখাচ্ছিল। তিনবার সে ঘরে এসেছে, গেছে। এসব কথা শুনে সে যেন সইতে পারছে না, থাকতেও পারছে না না-শুনে। হঠাৎ সে বলল, 'নলিনী আমায় চিঠি লিখেছে বাবা। পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছে ওর মার জন্য।'

ভূপতি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আন্ তো চিঠিটা, দেখি কি লিখেছে।'

চিঠিখানা প্রথমে দেখল মাধব, সে উপস্থিত থাকতে প্রথম কিছু করার অধিকার আর কারো থাকতে পারে না। মস্ত লম্বা চিঠি, মনকে ঢেলে দেবার সব চেয়ে

উপযোগী ব্যক্তিগত সস্তা ভুল ভাষায় লেখা বলে স্পষ্ট পরিষ্কার মানেতে আগাগোড়া ঠাসা। সবাই কি ভাবছে আর তার কি হবে ভেবে নলিনীর কান্না পাচ্ছে। বাঙ্গা-তলায় পড়ে থেকে মরে গেলেই তার ভালো ছিল। নলিনী আর বাঁচতে চায় না, কিন্তু বেশ আছে সে দিনরাত খাটতে খাটতে মরে যাওয়ার মতো কাজের মধ্যে, তবে কিনা বুক ফেটে যায় মানুষের দুর্দশা দেখলে। নলিনীর দাদা তাকে বলত যে ভিক্ষে করা আর ভিক্ষে দেওয়া দুটোই সমান পাপ। কারো কাছে ভিক্ষে নেবে না বলেই তো সে চলে গেছে, ভিক্ষে নেবেও না, ভিক্ষে দেবেও না। তবে ভিক্ষে দেওয়ার কাজ যে সে করছে সেটা ভিন্ন। নিজে তো আর সে ভিক্ষে দিচ্ছে না, সে শুধু কাজ করছে। কাজ তো তাকে করতে হবে, তাই সে কাজ করছে। কি কাজ করতে হচ্ছে তা সে ভাবতে যাবে কেন? মানে, নলিনী শুধু কাজটাই করছে, আর কিছু নয়। যাদের সে খেতে দিচ্ছে ইচ্ছে করে দিচ্ছে না। ক্ষমতা থাকলে সে কিছুতেই দিত না। সবাই মরলেও দিত না। দাদার কথা নলিনী পালন করছে।

চিঠি পড়ে বোঝা যায় এই কথাটা বুঝিয়ে লিখতে নলিনী বেশ ফাঁপরে পড়েছিল। দুলাইনেই তার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেটা তার বোধগম্য হয়নি, সম্ভব বলে ভাবতেও পারেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে লিখেও তার মনে সন্দেহ রয়ে গেছে যে মনের আদর্শ মনে রেখে কাজের জন্য কাজ করার নীতি-কথাটা সে বুঝিয়ে বলতে পেরেছে কিনা এবং ভূপতির মেয়ে বুঝবে কিনা।

চিঠি পড়ে মাধব বা ভূপতি কেউ কোনো মন্তব্য করল না। শ্যামল টেনে টেনে বলল, 'ফাজিল মেয়ে। যেমন ভাই তার তেমনি বোন। ভর্তি হতে চায়নি আমাদের এই স্কুলে? এ যেন মেয়ে স্কুল, ধেড়ে মেয়ে নিলেই হল। বলে কিনা মেয়েদের একটা সেকসান করুন। ওর হুকুমে মেয়েদের সেকসান খোলা হবে! ছেলেদের স্কুলেই ছেলে হচ্ছে না—'

'আমার চিঠি দিন!' ভূপতির মেয়ে ফোঁস করে উঠে শ্যামলের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।—'আপনি তো যেচে পড়াতে চেয়েছিলেন ওকে। রোজ গিয়ে পড়িয়ে আসবেন বলেছিলেন।'

ভূপতি শ্যামলের হয়ে অপরাধীর মতো বললেন, 'লেখাপড়া শেখার খুব ঝোঁক আছে মেয়েটার। বড় উত্যক্ত করে তুলেছিল। শেষে কি আর করি, আমার মেয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে পড়াতাম।' ভূপতি একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'আর

মেয়েদের লেখাপড়া শেখা। ছেলেরাই এডুকেশন পাচ্ছে না, মেয়েরা কি করবে এডুকেশন দিয়ে?'

মাধব বলল, 'দাঁড়ান, মেয়েদের একটা স্কুল খুলিয়ে দিচ্ছি।'

ভূপতি চমকে গেলেন। শ্যামল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চলে যেতে যেতে ভূপতির মেয়ে থমকে দাঁড়াল।

'সরকার মশায় রাজী হবেন? কিন্তু মেয়ে তো বেশি হবে না!'

'দশটি মেয়ে তো হবে? তাই ঢের।'

ধনঞ্জয়ের ছোঁয়াচ লেগে লেগে মাধবের কি হয়েছে, হঠাৎ সৎকর্মের অদম্য প্রেরণা জাগে। মেয়ে স্কুল খোলবার চিন্তায় সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তাকে যে কমিটি গড়ে, ভলাণ্টিয়ার জোগাড করে, সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা ঠিক করে, স্কুলের একটা অংশ ঘিরে এবং আরও বহু হাঙ্গামা করে অন্নসত্র খুলতে হবে সে ভাবনা প্রায় চাপা পড়ে গেল তখনকার মতো। ধনঞ্জয় রাজী হবেন। খুব সহজেই মাধব তাঁকে মেয়ে স্কুল খুলতে রাজী করাতে পারবে। পড়ানোর কাজ দিয়ে তিন চার জন যুবতী মেয়ের উপকার করার সুযোগ ধনঞ্জয় ছাড়বেন না।

মাধবের কাছে এই নতুন পরিকল্পনা পেয়ে তিনি খুশি হবেন। ধনঞ্জয় খুশি হলে মাধবের হবে সুখ।

বাঙ্গাতলা হিতৈষিণী সভার কয়েকজন মাতব্বর সভ্য এবং স্কুলের অন্য মাষ্টাররা এসে পড়ায় মাধবকে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত হতে হল। মনটা তার একটু আনমনা হয়ে রইল।

গাঁয়ের চারিদিক ঘুরে আসবার ইচ্ছা মাধবের ছিল। দুপুরে বিশ্রাম করে বিকালের দিকে ভূপতি, শ্যামল এবং আরও দুজন হিতৈষিণী সভ্যের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে ভূপতির মেয়ের কাছ থেকে নলিনীর মার পাচটা টাকা চেয়ে নিল। নিজেই সে টাকাটা পৌছে দিয়ে আসবে।

'আর গোটা তিনেক টাকা দিয়ে আট টাকা করে দেব। বলবখন মেয়েই সব টাকা পাঠিয়েছে।'

'ভালোই তো।'

মুখে সায় দিলেও সকলে একটু শঙ্কিত হলেন। আট টাকাকে বারো চোদ্দ টাকা করতে মাধব আবার চাঁদা না চেয়ে বসে। মাধব সিনেমার স্বাদ পাচ্ছিল।

গোপনে পাঁচ টাকাকে আট টাকা করে মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলা তার মেয়ে

'ছেলেবেলা খুব আদর করতেন। কত মোয়া আর তিলুড়ি যে খেয়েছি। হ্যাঁ, চন্দ্রপুলিও খাওয়াতেন। এখনো জিভে স্বাদ লেগে আছে মনে হয়। কি কপাল দেখুন মানুষের, উপযুক্ত ছেলে থাকতে কেউ দেখবার নেই।' সকলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা গেল। নলিনীর মার উপযুক্ত ছেলে যে থেকেও নেই, এটা বড় খাপছাড়া সত্য।

ধনঞ্জয় দাতব্য ঔষধালয়ের কিছু দূরে নন্দীদের বাড়ির কাছে নলিনীর মার বাড়ি। ঘর তিনখানা ভাঙাচোরা, উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ান। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ নাকে লাগছিল, উঠোনে পা দিতে গন্ধটা ঘন ও গাঢ় হয়ে উঠল।

দক্ষিণের ঘরে দরজা খোলা। পায়ের শব্দে একটা শেয়াল খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের কানাচ দিয়ে ডোবার পাশে বাঁশবনে চলে গেল।

বিলামসন

ষ্টিফেন এফ বিলামসনের মনটা সরল, কেবল বুদ্ধিটা একটু প্যাঁচালো, জাত বেনের যেমন হয়। দরকার না হলে অকারণে কখনো সে প্যাঁচ কষে না এবং প্যাঁচ যাতে গভীর হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকে। মিথ্যাকে সে আমল দেয় না। সাদাকে যদি বা কালো বলে, এমন জোরের সঙ্গে বলে এবং এতখানি তেজ আর আন্তরিকতা থাকে তার বলার মধ্যে, যে লোকে থতমত খেয়ে ভাবে তারই বোধ হয় ভুল হয়েছে। বিলামসনের সাহস দুর্জয়। যেখানে ভয়ের কিছু নেই, যেখানে প্রতিপক্ষ তার চেয়ে দুর্বল, সেখানে সে দুঃসাহসী। শঙ্কার কারণ থাকলে শঙ্কিত না হয়ে সে উদারভাবে সাহস দেখাতে বিরত থাকে, তাতে তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়ে যায়। অন্যায় সে কখনো করে না, অন্যায় করতে হলে আগে ঈশ্বরের, কর্তব্যের, মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে সে বিশ্ব জগতের কাছে ঘোষণা করে নেয় যে সেটা অন্যায় নয়, অতিশয় ন্যায়। সাতান্ন বছর বয়স হয়েছে বিলামসনের। মেহেদি রঙের চুলে সাদার ছোপ ধরেছে। মিসেস বিলামসনের বয়স হবে ছেচল্লিশ, তবে বয়স গোপন করার কৌশল ভদ্রমহিলা এত ভালো জানেন এবং ওই সাধনায় প্রতিদিন এত সময় ব্যয় করেন যে মনে হয় ত্রিশ বছরের যৌবনে যেন ভাঁটা ধরেনি। তবে জোয়ারের জল প্রাচীর তুলে আটকে দিলে তাতে যেমন শ্যাওলা জন্মায়, জল খারাপ হয়ে পচাপচা দেখায়, মিসেস বিলামসনের রূপও তেমনি হয়ে গেছে। বিশ বছরের মেয়েটির পাশে বিশেষ করে বদ দেখায়। মেয়েটির নাম অরেল্যো। অরেল্যো যে খুব বেশি রূপসী তা নয়, নীল চোখ, গালের উঁচু হাড় আর বৈচিত্র্যহীন ছিপছিপে গড়নে রূপ সৃষ্টি হয় না। তবু, ছেচল্লিশের সঙ্গে কুড়ির তফাৎ অনেক।

একটি ছেলে আছে বিলামসনের, আর্থার। অরেল্যোর চেয়ে আর্থার কিছু বড়। আর্থারের তেতাল্লিশটা বিভিন্ন রকমের টাই আছে।

বিলামসন সম্প্রতি সপরিবারে নগরগড়ে মহীধর রায়ের বাড়ীতে বাস করছে। বাস করছে অনেকদিন, যদিও মহীধর তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল দিন কয়েকের জন্য। মহীধর অত্যন্ত অতিথিবৎসল, তাঁদের বংশে চিরদিন এই বাৎসল্যের প্রবল প্রকোপ

দেখা গিয়েছে। বিলামসন নড়বার নামও করত না, তবু মহীধর প্রত্যেক সপ্তাহেই দু'চার বার তাকে আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করত।

বিলামসনেরা সপরিবারে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলত, 'অত করে বলবার দরকার নেই রায়। আমরা নিশ্চয় থাকব।'

কয়েক সপ্তাহ অতিথি হয়ে বাস করবার পর বিলামসন মহীধরের ম্যানেজার হয়ে বাস করছে। সেকেলে বিশাল তিনমহাল বাড়ীটার গায়ে লাগিয়ে দক্ষিণে নদীর দিকে মহীধর যে একেলে ধাঁচের নতুন বাড়ীটি তুলেছে, তাতে। বাড়ীটিতে শোবার ঘরের সংখ্যাই হবে ডজনখানেক। অতিথি পরিবারটিকে প্রথমে মহীধর তিনখানা শোবার ঘর আর একটি বসবার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর বিলামসন নিজে কাজ করবার জন্য একটি অফিসঘর, আর্থারের জন্য একটি পড়ার ঘর এবং অরেল্যের জন্য একটি বসবার ঘর চেয়ে নিয়েছে। তারপর আরও একটি বাড়তি ঘর তার কি কারণে দরকার হয়েছে মহীধর ঠিক বুঝতে পারে নি। তারও পরে মহীধরের বাড়ীর এই আধুনিক অংশটির সমস্তটাই বিলামসন আয়ত্ত করে ফেলেছে।

মহীধরের একটি বন্ধুর সপরিবারে আসবার কথা ছিল, নতুন বাড়ীর একাংশেই তারা থাকবে। এ বাড়ীতে পাঁচ সাতটি পরিবার একসঙ্গে আরামে বাস করে গেছে।

মহীধরের বন্ধু পরিবার এসে পৌঁছবার আগে বিলামসন বলল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে রায়। অন্য কোথাও ওদের যদি থাকবার ব্যবস্থা করে দাও, বড় ভালো হয়। ভেবো না, দেশীলোক বলে আপত্তি করছি। মোটেই তা নয়। তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার বনে না। তা ছাড়া তোমার ও বাড়ীতে তো জায়গার অভাব নেই।'

তারপর আরও অনেকবার মহীধরের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে কিন্তু বাড়ীর নতুন অংশে কেউ স্থান পায়নি। কয়েকবার বিলামসন নতুন নতুন অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে আব্দার ধরেছে তার অংশে সে যেন একলা থাকতে পায়। এখন আর বিলামসনকে যুক্তি দেখাতে হয় না, কিছু বলতেও হয় না। অতিথি যারা আসে পুরানো বাড়ীর সাতান্নটি ঘরের সব চেয়ে ভালো খান দশেক ঘরে তাদের থাকতে দেওয়া হয়, বিলামসনের শান্তি ভঙ্গ করার কথা মহীধর মনেও আনে না।

জেলার কালেক্টর জ্যাকসন সাহেব যখন সস্ত্রীক তিনদিন মহীধরের অতিথি হয়েছিলেন, তখন পুরানো বাড়ীতেই তাদেরও থাকতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, বিলামসন অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'মিষ্টার জ্যাকসনের সঙ্গে আমার সর্বদা নানা

বিষয়ে আলোচনা করতে হবে বুঝতে পারছ না, রায় ? নতুন রাস্তা, স্কুল, কারখানা আরও কত বিষয়ে কত কথা বলতে হবে। ওরা আমার বাড়ীতেই থাকবে।'

এই প্রথমবার বিলামসন মহীধরের নতুন বাড়িকে আমার বাড়ি বলে ঘোষণা করল। কিন্তু কথাটা যেন মোটেই খাপছাড়া শোনাল না তার মুখে।

জ্যাকসন সাহেবের পর এসেছিলেন স্মিথ সাহেব ও বেনেট সাহেব। এদের দুজনেরই পত্নীরা মিসেস বিলামসনের এবং ছেলেমেয়েরা আর্থার ও অরেল্যের প্রাণের বন্ধু। সুতরাং এরাও যে বিলামসনের বাড়ীতে বাস করে যাবে সেটা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল সকলের।

একটা রাজ্যের সমান মহীধরের জমিদারী—বিলাসনের তত্ত্বাবধানে দিন দিন জমিদারীর উন্নতি হতে লাগল।

লোকটা বিলক্ষণ কর্মঠ এবং উৎসাহী সন্দেহ নেই। নাইবা হবে কেন। পুষ্টিকর, উত্তেজক খাদ্য ও পানীয়ের অভাব নেই, বিশ্রাম সে কাজেরই অঙ্গ হিসাবে নেয়, অবসর বিনোদন তার অপরিহার্য নিত্যকর্ম, সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স দিয়ে মনকে সর্বদা তাজা রাখে, তার উপর বেনের মতো বাস্তববাদী বলে মানসিক কর্মের মানেই সে বোঝে না। মহীধরের বাড়ীতে ও এষ্টেটে সে যে কত কি করেছে এবং করছে তার বিবরণ সত্যই চমকপ্রদ। পথঘাটের সংস্কার দিয়ে কাজ শুরু হয়। আশে-পাশের গাঁয়ের লোক আজ নগরগড়ে নতুন পিচ ঢালা পথে উঠবার আগে ভালো করে পায়ের কাদা ধুয়ে নেয়। গরুর গাড়ী চলে চলে এতকাল সদরে যাবার বড় রাস্তার দফা নিকেশ করে দিত, মাইল পাঁচেক রাস্তায় এখন গরুর গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। ওপথে এখন মহীধরের, তার অতিথি অভ্যাগতদের এবং বিলাম-সনের মোটরগাড়ী হুস্ হুস্ করে চলে—খানা ডোবার জন্য টিপে টিপে সাবধানে চালাতে হয় না। গরুরগাড়ীগুলি চলাচল করে অন্য পথে। একটু ঘুর হয়, সময় বেশি লাগে; আর কোন অসুবিধা নেই। রামপুর গাঁ থেকে হানাতিয়া আগে ছিল ক্রোশখানেকের পথ, এখন তিনি ক্রোশের সামান্য বেশি কি কম হবে। নগরগড় থেকে সদরের দূরত্ব গরুর গাড়ীতে সাত মাইল বেড়ে গেছে। তবে বিলামসনের বন্ধু স্মিথের কোম্পানী নগরগড় থেকে মালপত্র সদরে নিয়ে যাবার জন্য আট দশটি লরি কাজে লাগিয়ে দেওয়ায় অনেক গাড়ীর এখন আর খ্যাটর খ্যাটর করে সদরে যাবার দরকার হয় না।

মহীধরের বাড়ীর কাছাকাছি নদীর ধারে একটা বিদ্যুত তৈরীর কল বসানো

হয়েছে। মহীধরের বাড়ীতে ঝাড়বাতি লণ্ঠন আর টানাপাখার পাট গেছে উঠে। ত্রিশবছর প্রতি সন্ধ্যায় আলো জ্বালার ভার যে লোকটির ছিল, তাকে ছাড়ানো হয় নি। পাখা টানার এগারটি ছেলেবুড়োর কাজ গেছে। বিদ্যুতের কল বসানো আর চালানোর খরচ উঠেও যাতে কিছু লাভ থাকে সে ব্যবস্থা বিলামসন করেছে। নগরগড়ের অধিবাসীদের নিজের নিজের কাঁচা-পাকা বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাতে রাজী করানোর সমস্যাটা তাকে মোটেই কাবু করতে পারে নি। অর্ধেক লোক বুদ্ধিমানের মতো নিজেরাই রাজী হয়েছিল। কাজেই, রাজী করাতে হয়েছিল মোটে বাকী অর্ধেককে। নগরগড়ের যে বাড়ীতে সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টার মধ্যে বাতি নিভিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়ত, এখন রাত বারটা পর্যন্ত বাল্‌ব জ্বালিয়ে সে বাড়ীতে সকলে জেগে থাকে।

আলো জ্বলুক বা না জ্বলুক, টাকা মাসে মাসে দিতে হবে। আলো না জ্বালিয়ে টাকা দেবার কথা ভাবতে অনেকের গা জ্বালা করে।

তিনটে কারখানাও বিলামসন বসিয়েছে। তার মধ্যে কাঁচের কারখানাটিই সব চেয়ে বড়—স্যামুয়েল, পিটার অ্যাণ্ড ডেভিড্‌সন কোম্পানী ম্যানেজিং এজেণ্টস। অন্তত একটা কোম্পানীর মূলধন মহীধরের দেবার ইচ্ছা ছিল। তার এষ্টেটে তার জমিতে কারখানা বসাতে বিলামসনের বন্ধুরা শুধু পকেট থেকে টাকা ঢালবে, সহায়তা করা ছাড়া সে কিছুই করবে না, এটা তার কাছে কেমন লজ্জাকর মনে হয়েছিল। কেমিকেলের কারখানার সমস্ত মূলধন, অন্তত অর্ধেক, দেবার জন্য মহীধর উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যা হবার নয় তা তো আর হয় না। বিলামসন তাকে বুঝিয়ে বলল, 'সত্য কথা বলি রায়, এতবড় দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তোমার নেই। কি দরকার তোমার অত হাঙ্গামায়? তোমার যথেষ্ট লাভ থাকবে। তোমার এষ্টেটের কত উন্নতি হয়েছে, আরও কত উন্নতি হবে ভাব তো!'

আরও অনেক কিছু বিলামসন করেছে এবং করছে। এষ্টেটের বিলি বন্দোবস্ত আদায়পত্র হিসাবনিকাশ ইত্যাদি ব্যবস্থায় যেখানে যতটুকু ঢিল ছিল সব এমন আঁট করে দিয়েছে যে সমস্ত এষ্টেট সে টানের চোটে টন্ টন্ করছে। নিয়ম হয়েছে অসংখ্য এবং নিয়মানুবর্তিতার কড়াকড়ি হয়েছে বিস্ময়কর। দেড় আনার গোলমাল নিয়ে দেড় ডজন চিঠি লেখালেখি হয়, প্রশ্ন, কৈফিয়ৎ, মন্তব্য, ব্যাখ্যা ইত্যাদি ষ্টেট-মেণ্টে দেড় দিস্তা কাগজ লাগে, দেড়দিন খেটে একজন কেরানী স্থায়ী ফাইল তৈরী করে। কারও প্রতি বেআইনী অন্যায় হবার উপায় নেই, আইন ছাড়া এক পা

চলা নিষেধ। সামান্য বলে কোনো ব্যাপারকে তুচ্ছ করা হয় না, বিচারের জন্য সোজা আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এক ধমকেই সাড়ে চার টাকা খাজনা আদায় হয় বটে কিন্তু ধমক দেওয়া তো আইনসঙ্গত নয়। দুটো মিষ্টি কথায় আপোষে অনেক ব্যাপারের মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো প্রেষ্টিজ থাকে না।

বিলামসন বলে, 'প্রেষ্টিজ বজায় থাকার ওপর সব নির্ভর করে রায়, এটা কখনো ভুলো না। প্রেষ্টিজ বজায় রাখা চাই, প্রেষ্টিজ।'

এত কাজ ও দায়িত্বের বিনিময়ে বিলামসন মাসে মাসে মোটে দেড় হাজার টাকা নেয়। মহীধর অবশ্য তাকে থাকবার বাড়ি দিয়েছে। আসবাব দিয়েছে, চাকর বাকর দিয়েছে, খাদ্য এবং পানীয় যোগাচ্ছে, মাঝে মাঝে সে যে পার্টি দেয় তার খরচটাও দিচ্ছে, তবু ধরতে গেলে বিলামসন যত কিছু করেছে এবং করছে তার তুলনায় মাসে দেড় হাজার টাকা কিছুই নয়। দূরে থেকে তাকে আসতে দেখলে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ চোখের পলকে উধাও হয়ে যেত বলে গোড়ার দিকে বিলামসনের বড় আপসোস ছিল। পালিয়ে যাবে কেন? কি দরকার পালিয়ে যাবার? যে যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক, সে কাছাকাছি গেলে সেলাম করুক, পালিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়ার মতো অসভ্যতা করা কি উচিত? মাঝে মাঝে দু'চারজনকে ঘরের ভেতর থেকে টানিয়ে এনে বিলামসন তাদের সঙ্গে আলাপ করত।

সঙ্গের আর্দালিকে বলত, 'সেলাম করনে বোলো। বাত্‌লা দো।' সেলাম করা হলে কয়েকবার মাথা হেলিয়ে বলত, 'ডরতা কাহে? ডরো মৎ।' বলে আলাপ সাঙ্গ করে এগিয়ে যাবার আগে হাতের সরু বেতগাছা দিয়ে সপাং করে পথের ধারের আগাছার ডগাটি উড়িয়ে দিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখত, অভয় পাওয়া লোকটি কেমন চমকে উঠে ভড়কে যায়!

খুব বেশি রকম বেয়াদবি না করলে বেতগাছা সহজে মানুষের পিঠে পড়ত না। দীনু বাগদি একদিন অরেল্যের ঘোড়ায় চড়া দেখে বোকার মতো হাসছিল, লম্বা লাঠিটা দু'হাতে মুঠা করে ধরে সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হাঁদারামের মতো হাসছিল। বিলামসন কি আর জানত না এরকম করে হাসাটা যে অপমানকর অসভ্যতা দীনু তা জানে না। তাই রাগ করে নয়, দীনু যা জানে না তাকে শুধু সেটা জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তার নিকষ কালো পিঠের চামড়ায় বিলামসন চার

পাঁচটা লম্বা দাগ এঁকে দিয়েছিল। দাগগুলি থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ার আগেই দীনু বাগ্দী গিয়েছিল পালিয়ে।

আরেকদিন বিলামসন সপরিবারে নদীর ধারে বেড়াতে আর পাখী শিকার করতে গেছে বিকালের দিকে। পাঁচু গোয়ালার ছেলে মধু মাঠের গরু নিয়ে ফিরছে বাড়ি! কালি নামে পাঁচুর একটি গরু ছিল একটু বেশি রকম চপল, মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার সময় তার ঢং যেত বেড়ে। এদিকে যেত, ওদিকে যেত, থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে রুখে দাঁড়াত, হঠাৎ শিং নেড়ে চার পা তুলে ছুট দিত দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান হারিয়ে। তবে গুঁতোনোর স্বভাব তার ছিল না, দুবছর বয়সের মধ্যে একটি মানুষকেও সে গুঁতোয় নি। শিং নেড়ে যেদিক লক্ষ্য করে সে ছুটছিল তাতে বিলামসনদের হাত দশেক তফাৎ দিয়েই সে বেরিয়ে যেত। কিন্তু মিসেস বিলামসন আব অরেল্যে ভয় পেয়ে এত জোরে আর্তনাদ করে উঠল যে বিলামসন ও আর্থার তুনলা দুটি বন্দুকের চারটি টোটার ছর্‌রাগুলি কালির গায়ে ঢুকিয়ে দিল। মধু হাউমাউ করে ছুটে এলে এমন বিপজ্জনক হিংস্র জন্তুকে দড়ি ছাড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য হাতের বন্দুক দিয়ে বিলামসন কয়েক ঘা এবং আর্থার কয়েক ঘা মারল। আর এমনি ক্ষীণজীবী যুবক ছিল মধু যে সেই কয়েকটা ঘায়েই সেইখানে সে পড়ে গিয়ে হয়ে গেল অজ্ঞান!

ত্রিলোচন তরফদারের ছেলে ধূর্জটিকে বিলামসন এক দিন খালি হাতেই মেরে বসেছিল। ধূর্জটি সহরে কলেজে পড়ে, সিগারেট খায়। নদীর ধারে বাঁধানো নালায় বসে বিলামসন-পরিবার আশ্বিনের স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করছে, বলা নেই কওয়া নেই একহাত তফাতে বসে পড়ে ধূর্জটি ফুস ফুস সিগারেট টানতে লাগল, ধোঁয়া উড়ে আসতে লাগল মিসেস এবং মিস বিলামসনের মুখে। আর্থার টানছিল সিগার, বিলামসন টানছিল পাইপ। ছেলের হাত থেকে সিগারটা টেনে নিয়ে বিলামসন তার জলন্ত প্রান্তটি চেপে ধরেছিল ধূর্জটির গলায়।

এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট হবে ভেবেছিল বিলামসন, হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কলেজে বিদেশী শিক্ষার কুফল প্রমাণ করতে ধূর্জটি বিনা দ্বিধায় সজোরে বিলামসনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল।

বাপ ব্যাটায় তখন চার হাতে ধূর্জটিকে মারতে লাগল। কিন্তু একালের বাবু ছেলে শুধু বেয়াদব হওয়া নয় গায়েও যেন তারা কি ভয়ানক জোর বাগিয়ে

ফেলেছে, ঘুষি মারার কৌশল শিখেছে অকাট্য। দুজনে তাকে যত না মারল, একা সে ফিরিয়ে দিল তার দ্বিগুণ।

বিলামসনদের সঙ্গে সেদিন বন্দুক ছিল না।

ধূর্জটি কোঁচার খুটে নাকমুখের রক্ত মুছতে লাগল আর বিলামসনেরা নাকে রুমাল চেপে ধরে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। বিলামসনের দুটি প্রকাণ্ড দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কুকুর ছিল, চাকরের সঙ্গে তারাও প্রতিদিন হাওয়া খেতে বার হত। একটু এগিয়েই কুকুর দুটির সঙ্গে বিলামসনদের দেখা হয়ে গেল!

বিলামসন চিরদিনই চটপটে। কুকুর দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের বাঁধন খুলে একটু তফাৎ থেকে ধূর্জটির দিকে লেলিয়ে দিল। তীরের মতো ছুটে গিয়ে বাঘের মতো সেই কুকুর ধূর্জটিকে একেবারে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

বিলামসন ভেবেছিল ছোকবাটাকে একটু নাস্তানাবুদ করে কুকুর দুটিকে ডেকে নেবে। ধূর্জটি মারাত্মক রকমের নাস্তানাবুদ হল বটে, কুকুর দুটিকে বিলামসনের আর ডেকে নেওয়া হল না। এখান থেকে গোয়ালাপাড়া বেশি দূরে নয়। নদীব ওপারেই বাগ্দীদের এক বস্তি, অগ্রহায়ণের গোড়ায় এখন হাঁটু ডুবিয়ে হেঁটে নদী পারাপার করা চলে। চারিদিকে কাছে ও দূরে ত্রিশটি দর্শকের সমাগম বিলামসনদের সঙ্গে ধূর্জটির হাতাহাতির সময়েই হয়েছিল। এইবার তারা হৈ হৈ করে ছুটে এল। দশ বার জনের হাতে ছিল লাঠি, লাঠির ঘায়ে বিলামসনের কুকুর দুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল।

কুকুর দুটিকে না মেরেও ধূর্জটিকে বাঁচান যেত। কুকুর অতি প্রভুভক্ত জীব। কিন্তু বিলামসনের কুকুর বলেই বেচারিদের সেদিন প্রাণটা দিতে হল।

বিলামসন কিন্তু অস্বীকার করে বলল, 'ওসব মিছে কথা। ভয়ে ওরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।'

বিলামসনের ভাবগতিক দেখে কারো সন্দেহ রইল না যে তার কুকুরপ্রেম সত্যই বড় গভীর ছিল। কুকুরের শোকে সর্বদা মুখে সে গরর্ গরর্ আওয়াজ করতে লাগল পাগলা কুকুরের মতো। যখন তখন যাকে তাকে সপাং সপাং বেত মারছে, কথায় কথায় পাইকপেয়াদা আমলারা বরখাস্ত হচ্ছে, জরিমানায় জরিমানায় মাইনে কেউ পাচ্ছে না অর্ধেকের বেশি। চাপ দিয়ে দিয়ে কাবু করে লোক ঢুকিয়ে ঢুকিয়েও কারখানাগুলিতে কিছুতেই লোকের অভাব মিটছিল না, এবার

একেবারে সোজাসুজি ধরে বেঁধে কারখানায় নির্বিচারে লোক ঢোকানো শুরু হয়ে গেল—নিজে না চষলে ক্ষেতে যার চাষ হবে না তাকে পর্যন্ত।

গোয়ালাপাড়া উঠে গেল এক মাইল তফাতে একটা জলার ধারে, ওখানে ছাড়া অন্য কোথাও তাদের ঘর তুলতে অনুমতি দেবার উপায় বিলামসন খুঁজে পেল না। নদীর ওপারের সেই বাগ্দীপাড়ার সকলকে পুরো একমাস মাটি ফেলে নদীর ধার উঁচু করার কাজে লেগে থাকতে হল।

অতি ক্ষুদ্র সে নদী, বছরে দুমাসের বেশি জল থাকে না, আজ পর্যন্ত এ নদীতে কোনদিন বন্যা হয়েছে বলে কেউ স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু বিলামসনের ধনুকভাঙ্গা পণ, একটা মাস বেগার খেটে বন্যার হাত থেকে নিজেদের তারা বাঁচাবেই বাঁচাবে।

দিন এনে দিন কিনে তারা আধপেটা সিকিপেটা খেত, তিনদিন বিনা পয়সায় মাটিকাটার পর তাদের উপোস শুরু হয়ে গেল। যে হাতে লাঠি ধরে বিলামসনেব কুকুর ঠেঙ্গিয়ে মেরেছিল সেই হাতে কোদাল ধরার জোরও আর রইল না। তখন বিলামসন একটা কারখানা থেকে অগ্রিম মজুরি আনিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল কিন্তু মাটিকাটা বন্ধ হল না। গুর্খা দরোয়ানেরা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পুরো একটি মাস তাদের দিয়ে তাদের নিজেদেরই মঙ্গল করাল।

একমাস শয্যাশায়ী হয়ে থেকে ধূর্জটি সেরে উঠল। মনে হল, বিলামসনের কুকুরের কামড় খেয়ে তার মাথাটাও বিগড়ে গেছে। শোভায় বিচিত্র এই যে একটা সুন্দর জগৎ আছে, সুখ শান্তি আরামের মতো অপূর্ব আশীর্বাদ আছে, জীবনে একশ দেড়শ টাকার চাকরি আর সুন্দরী বৌ প্রভৃতি বিস্ময়কর সম্ভাবনা আছে অদূর ভবিষ্যতে, এসব সে যেন স্রেফ ভুলে গেল। দিবারাত্রি টো টো করে ঘুরে ঘুরে অন্য সব মাথাগুলি বিগড়ে দেবার চেষ্টা ছাড়া তার যেন আর কাজ রইল না।

মাথা প্রায় সকলেরই কমবেশি খারাপ হয়েছিল, তবু সে মাথাগুলি বিগড়ে দিতে কী পরিশ্রমটাই যে করতে হল ধূর্জটির! এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল মাথাগুলি।

কয়েকজন শিষ্য জোটায় অতিকষ্টে মাথাগুলিকে ধূর্জটি কাছাকাছি এনে ফেলল। কি যেন ঘটে গেল তখন নিরীহ গোবেচারী মানুষগুলির মধ্যে, চারিদিকে অভিশাপ শোনা যেতে লাগল, বিলামসন নিপাত যাও!

ব্যাপার দেখে মহীধর বিব্রত হয়ে বলল, 'তুমি বরং কিছু দিন বাইরে থেকে ঘুরে এসো বিলামসন।'

বিলামসন মৃদু হেসে বলল, 'ভেবো না রায়। দুচারজন অকৃতজ্ঞ বদমায়েস যদি চেঁচাতে চায়, চেঁচাতে দাও। বেশির ভাগ লোক আমাকে পছন্দ করে, আমাকে চায়।'

'তবে একটু নরম হও।'

'ক্ষেপেছ? এই তো শক্ত হওয়ার সময়!'

মহীধর তবু ইতস্তত করছে দেখে অরেল্যো তাকে ইসারা করে নিজের বসবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল। তাকে কৌচে বসিয়ে পিছন থেকে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে মাথায় মাথা রাখল। মহীধরের রঙ কালো, রীতিমত কালো। তাকে অরেল্যো এইভাবে পিছন থেকে আদর করে। কারণ, মহীধর তার মুখ দেখতে পায় না বলে মুখের ভাব গোপন করার কষ্টটা তাকে করতে হয় না।

'আমায় দেখলেই এইটুকু এইটুকু বাচ্চা ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে মারছে। কত বিস্কুট আমি খাইয়েছি ওদের! সেদিন যে কজনকে চাপা দিয়েছিলাম, সেটা কি আমার দোষ? রাস্তার মাঝখানে ওরা খেলা করবে, দূর থেকে হর্ণ দিলে সরবে না, কাছাকাছি এসে অত স্পীডের মাথায় কেউ গাড়ি থামাতে পারে? তাই বলে আমাকে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারবে! কি বলে তুমি বাবাকে চলে যেতে বলছ, ওদের অত্যাচার চুপচাপ সইতে বলছ?'

মহীধরের মাথা ঘুরতে থাকে। অরেল্যো তার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব, রুচি, কৃষ্টি, ক্লাব, হোটেল, সিনেমা, ট্রেণ, মোটর, এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ, বেতার, সিভিল-কোড, পেনাল-কোড, ডেমোক্রেসি প্রভৃতির অভ্যস্ত চেতনার মতো। মনে হয়, অরেল্যোর অভাবে সে অচেতন হয়ে যাবে। বিলামসনের ভয় তো আছেই, অরেল্যোকে হারাবার ভয়ও তার কম নয়। ভয়টা কমতে চায় না কিছুতেই। মহীধর কাবু হয়ে থাকে।

মহীধর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও বিলামসনেরা কিন্তু যা কিছু ঘটতে লাগল সমস্তই তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে লাগল। গুলি করে, লাঠি মেরে, বেতিয়ে, বেঁধে রেখে, লুট করে, আগুন দিয়ে, বিলামসন জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। উৎসাহ উদ্দীপনা ও উত্তেজনার নেশায় সে যেন হয়ে গেল নতুন মানুষ। মুখে শুধু তার ফুটে উঠতে লাগল, আতঙ্ক ও আপসোসের কতগুলি রেখা।

একদিন রাত্রে খবর এল, পরদিন সকালে নিষিদ্ধ পথে পাঁচশো গরুর গাড়ী চলবে। সাধারণের রাস্তা সেটা নয়, দয়া করে যে রাস্তায় সাধারণকে পায়ে হেঁটে অথবা রবার টায়ারের গাড়ীতে যেতে দেওয়া হয়, বিলামসনের সেই পথে বিলামসনের হুকুম তুচ্ছ করে কাঠের চাকাওলা পাঁচশো গরুর গাড়ী একসঙ্গে সদরে রওনা হবে।

মহীধর কাতর হয়ে বলল, 'যাক না বিলামসন?'

বিলামসন বলল, 'ক্ষেপেছ? তাই কখনো যেতে দেওয়া যায়?'

মহীধর তবু ইতস্তত করছে দেখে অরেল্যে তাকে ইসারা করে নিজের বসবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় পরপর পাঁচশোখানা গরুর গাড়ী বিপুল ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে নগরগড় থেকে সদরে রওনা হল। বিলামসনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল, মাইল দুই এগিয়ে যাবার পর গাড়ীগুলি থামিয়ে প্রত্যেক গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। গাড়ী পিছু গড়পড়তা পেট্রোল খরচ হল তিন গ্যালন। আরও কম পেট্রোলেই কাজ হত কিন্তু এসব ব্যাপারে কার্পণ্য করা বিলামসনের স্বভাব নয়।

গোয়ালারা ক'দিন থেকে তাদের পুরানো ভিটেয় ছোট ছোট চালা তুলতে আরম্ভ করেছিল। বিলামসন ভেবেছিল ঘরগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আজ আগুনের নেশা চেপে যাওয়ায় গাড়ীর পর সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত চালাগুলিতেও সে আগুন ধরিয়ে দেবার হুকুম দিল।

এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে মানুষ মরল মোটে একজন। ধূর্জটি সামনের গরুর গাড়িটিতে ছিল। গাড়োয়ানেরা পালাবার অবসর পেল কিন্তু ধূর্জটিকে বেঁধে রাখায় গাড়ীর সঙ্গে সেও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই গাড়ীটাতে পাঁচ ছ গ্যালন পেট্রল ঢালা হয়েছিল। গাড়োয়ান ও দর্শকদের কারো কারো শরীরে একটু ছ্যাঁকা লাগল এবং গোয়ালাদের কয়েকজনের মাথা একটু ফেটে গেল। আর কিছুই হল না।

অপরাহ্ণে নগরগড়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মহীধরের কাছে দরবার করতে গেলেন। বললেন, 'এবার আপনি বিলামসনকে বিদায় দিন।'

মহীধর বিব্রত হয়ে বলল, 'কি করে বিদায় দেব?

'চলে যেতে বলুন।'

'যেতে বললে কি যাবে !'

কথাটা তার নিজের কানেই একটু অদ্ভুত শোনাল বৈকি ! তার জমিদারী, তার বাড়ী, তার লোকজন, তার পয়সা—সে যেতে বললে বিলামসন যাবে না একথার যেন সত্যসত্যই কোনো মানে হয় না।

ভদ্রলোকেরা বললেন, 'ওকে যেতে বলুন, আজকেই যেতে বলুন। ওর সঙ্গে আপনিও কেন মারা পড়বেন ?'

মহীধর সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, দেখি বলে কি হয়। আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না, একটু সময় দিন আমাকে।'

বিলামসনেরা বৈকালিক চা পান করছিল, মহীধর সেখানে গিয়ে চা খেতে অস্বীকার করে গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'এবার সত্যি সত্যি তোমার মাস ছয়েকের বিশ্রাম নেওয়া দরকার বিলামসন। তুমি কালকেই যাও। আমি এখুনি ঢ্যাটরা দিয়ে দিচ্ছি যে তুমি কাল থেকে ছমাসের ছুটিতে বেড়াতে যাবে।'

বিলামসন শুধু বলল, 'ক্ষেপেছ ? এ অবস্থায় তোমাকে ফেলে কি আমি যেতে পারি। আমি গেলে কি অবস্থা দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ ? সবাই মারা পড়বে।'

মহীধর ভীরু নয় কেবল মনের গড়নটা তার খাপছাড়া। জীবনে কোনদিন যে কথা উচ্চারণ করতে পারবে ভাবে নি, আজ অনায়াসে বিনা দ্বিধায় সেই কথাগুলিই বলে ফেলল, 'তা হোক, তোমায় আমি আর থাকতে দিতে পারি না বিলামসন। তোমার আমার দুজনের ভালোর জন্যই তোমাকে আমায় যেতে বলতে হচ্ছে। তুমি কাল সকালে রওনা হবে। আমি এখুনি খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, শুনলে সকলে শান্ত হবে।'

বিলামসন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে রায়। আমি চলে যাব শোনা মাত্র ওদের সাহস বেড়ে যাবে, উত্তেজিত হয়ে তোমার ঘরবাড়ী কাছারি আক্রমণ করবে, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। আমি আছি বলেই ওরা কিছু করতে পারছে না, তা জানো ?'

মহীধর আমতা আমতা করে বলল, 'তা হোক। এ অবস্থায় ওসব ভয় করলে চলে না।'

অরেল্যো ক্রমাগত ইসারা করছিল, মহীধর জোর করে কার্পেটের দিকে চেয়ে রইল।

বিলামসন নিজে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বোতল নিয়ে এল, গ্লাসে ঢেলে মহীধরের সামনে ধরে দিয়ে বলল, 'খেয়ে ছাখো খাসা জিনিস। তারপর এস আমরা মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করি। কর্তব্যের চেয়ে বড় কিছু নেই রায়। আদর্শের জন্য দরকার হলে প্রাণও দিতে হয়। ঈশ্বর যে নির্দেশ আমায় দিয়েছেন আমাকে তা মানতেই হবে।'

বাস্

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধানো পাথুরে রাস্তার খানিক তফাতে আসল খড়পা গ্রাম। গ্রামটি ছোট, কিন্তু তারই একটি শাখা রাস্তার দুপাশে গড়ে উঠেছে। কয়েকটি ঘরবাড়ী, দোকান ও আড়ত। এদিকে তেইশ মাইল দূরে সদর সহর, ওদিকে সতর মাইল দূরে মহকুমা সহর। ছোট বড় দুটি সহরের মধ্যে একটি বাস যাতায়াত করে। সদর থেকে সকালে যায় মহকুমায়, মহকুমা থেকে বিকালে ফেরে সদরে। যাত্রীরা অধিকাংশই সদর ও মহকুমায় আসা যাওয়া করে মামলার খাতিরে। কোর্ট বন্ধ থাকলে বাসও সেদিন বন্ধ থাকে।

খড়পায় বাস থামে এবং জল নেয়। যাত্রীরা গজেন ও রাজেনের দোকানে ভাগাভাগি করে খাবার কেনে, জগতের চায়ের দোকানে চা পান করে। রঘুনাথের দোকানে খড়পার বিখ্যাত তাঁতের কাপড়-গামছা দর করে। মধু মাইতির পান বিড়ির দোকানে পান বিড়ি কেনে—কেউ কেউ সস্তা সিগারেট। দোকান আরও কয়েকটি আছে, ঘনশ্যাম দাসের একাধারে মনিহারী, মুদিখানা ও লোহার জিনিসের দোকান, নিতাই সামন্তের বাসনের দোকান, রঘু সামন্তের কামারখানা, আর ধনেশ সাহার ধান চালের আড়ত। আড়তে ধান প্রায় থাকেই না, দুচার বস্তা চাল কেবল মজুত দেখা যায়। কে যে কখন সে দুচার বস্তা চাল কিনে নিয়ে যায় এবং কোথা থেকে আবার দুচার বস্তা চাল আড়তে আসে, খড়পার সকলেই তা জানে কিন্তু বলার অধিকার নেই জেনে উচ্চবাচ্য করে না।

উপাধিহীন ডাক্তার দণ্ডধারী মাইতির ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকানও এখানে আছে। আড়াই হাত উঁচু ও দেড় হাত চওড়া একটি নীল নীল কাঁচ লাগানো আলমারিতে ওষুধ এবং সেই অনুপাতে একটি ছোট পালিশহীন কাঠের টেবিলের সামনে টুলে উপবিষ্ট স্বয়ং ডাক্তার দণ্ডধারী মাইতি, টেবিলে দুখানা পাতা এবড়ানো বই, হিসাবের খাতা, কাঠের দোয়াতদান ও বুক পরীক্ষার একনলা যন্ত্র। এখানকার সবচেয়ে নতুন এই ডাক্তারী দোকানটিকে সবচেয়ে প্রাচীন মনে হয়।

ডাক্তার মাইতির পসার আছে। তার ওষুধের দাম কম, ভিজিটের টাকা কম অথচ চিকিৎসা আশ্চর্য ফলপ্রদ। পাঁচ দশ মাইল দূরের গাঁ থেকেও তাকে

ডাকতে আসে। তবু, দণ্ডধারীর মক্কেলের সংখ্যা বেশি বলা যায় না। এ অঞ্চলে বসতি বড় কম, গাঁ গুলি সব দূরে দূরে। সাঁওতালদের বস্তি বাদ দিয়ে খড়পার দশ মাইলের মধ্যে পনেরটির বেশি গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ। এইসব গ্রামের কোনো কোনোটি আবার দশ বারটি গৃহস্থের ঘরবাড়ী নিয়েই সম্পূর্ণ।

খড়পার পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে শালবন। বনের বহিঃরেখা দক্ষিণ দিকে ক্রমে ক্রমে বাঁক নিয়েছে পুবে এবং উত্তর দিকে ক্রমে ক্রমে বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। উত্তরে গাঁয়ের কাছাকাছি যে শালতরুরেখা চোখে পড়ে সেটা বন নয়, একশো গজের চেয়েও অগভীর এলোমেলো শাল গাছের লম্বা একটা ফাঁকি। ওপাশে ফাঁকা মাঠ আর ক্ষেত আছে, মাইলখানেকের মধ্যে বাতুসী গাঁ, যেখানকার 'বাবরসা' কয়েক বছর আগেও মুখে দিলে গলে যেত। বাতুসী থেকে পুবে এক ক্রোশ দূরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার প্রথম বাঁক চোখে পড়ে, খড়পায় যা অদৃশ্য। ওই বাঁক থেকে রাস্তাটি সাপের মতো এঁকে বেঁকে গিয়েছে মহকুমার দিকে। পুবের শাল বনও বড় বা খাঁটি বন নয়। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরেও বটে। বনের মতো শালবন শুধু পশ্চিমে। খড়পা পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এই বনে প্রবেশ করে, সাত আট মাইল গিয়ে বনের অপর প্রান্ত পাওয়া যায়। এতখানি পথের গা ঘেঁষে দুপাশে থাকে শুধু শাল—সিধা, নিশ্চল, ভূমি-প্রোথিত উদ্ভিদ সেনার বিরাট বাহিনীর মতো।

খড়পায় এখন সূর্যাস্ত ঘটছে।

সূর্য শালবনের আড়ালে গেলে রোদ ফুরিয়ে শুধু আলো থাকে, দিগন্তের আড়ালে যাবার সময় আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। স্থানীয় লোকে বলে, সূর্যের নাকি একবার ক্রোধ হয়েছিল। আকাশে বাতাসে লেগেছিল আগুন, মাটি পাথর পুড়ে গিয়েছিল। সব দেবতারও যিনি দেবতা তিনি সূর্যদেবের ক্রোধ শান্ত করলেন।

সূর্য। হে বিষ্ণু, হে জগৎপতি, আমার ক্রোধ সত্য।

বিষ্ণু। তোমার ক্রোধ সত্য।

সূর্য। ক্রোধ ত্যাগ করলে আমি সত্যভ্রষ্ট হব। আমি নিভে যাব।

বিষ্ণু। হে সূর্য, তুমি সত্য রক্ষা কর। দুই বিন্দু ক্রোধ দুই দিবাভাগে সঞ্চিত কর। ক্রোধে তোমার উদয় হোক, ক্রোধে তুমি অস্ত যাও।

সূর্যের সেই ক্রোধে এখানকার মাটি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে—উর্বর,

অকৃপণ মাটি। বর্ষার প্রথম জলধারা মাটিকে নরম করে দিলে তবে এ মাটিতে লাঙ্গলের ফলা বসে, বর্ষায় সরস হলে তবে মাটিতে বীজ বেঁচে থাকে, অঙ্কুরিত হয়; তারপরেও বর্ষার কৃপাতেই অঙ্কুর বড় হয়ে ফসল ফলায়। কতবার বর্ষার খেয়ালে মানুষকে মাঠে বীজ ছড়াতে হয়েছে দুবার তিনবার—আধহাত উঁচু চারা, ফসল ধরবার আগের চারা, কতবার ঝলসে পুড়ে গেছে। বর্ষার খেয়াল খানিকটা বনের বৃষ্টি সামলে নেয়—কিন্তু বন দিন দিন ছোট হচ্ছে, আগের মতো আর তার ক্ষমতা নেই। বনের গাঁ ঘেঁষা আর বনের ভিতরের জমি শুধু বনের প্রচুর স্নেহ আজও পায়।

এবার খড়পাকে বর্ষা ফেলেছে বিপদে। অসময়ে একটু দেখা দিয়েই কোথায় কোন দেশে যে চলে গেল এবারের বর্ষা, সময় পার হয়ে আবার অসময় হল, তবু তার দেখা নেই। এবার আসুক বর্ষা। আজ না আসে, কাল আসুক। শেষ বেলায় একপ্রান্ত ধূসর করে বিদ্যুতের চমক দিতে দিতে বাতাসের বল্গা ধরে মহা-সমারোহে আকাশ ছেয়ে আসুক। ওগো মা কুণ্ডেশ্বরী—আসুক। নইলে যে বড় বিপদ হবে গো মা। একদিন একরাত উপোসী থেকে তোমায় পাঁচ পয়সার ভোগ দেব মা—আসুক।

গরু মহিষ নিয়ে গোবর্ধন বাড়ী ফিরছিল। ছেলেটা মহিষের পিঠে চেপে বসেছে। গোবর্ধনের দুটি মহিষের রঙ বাদামী ধাঁচের, অর্জুনের মহিষগুলির মতো নিকষ কালো নয়। হাড়পাঁজরা সব গোনা যায় তার দুটি মহিষের, পিঠের উঁচু হাড়টার ওপর বসে ছেলেটা কি আরাম ভোগ করছে কে জানে! তিনটি গরু। আর বলদ দুটিও তার কঙ্কালসার, তবু জমকালো চেহারার জন্য মহিষ দুটির শীর্ণতা বেশি চোখে পড়ে। কি প্রকাণ্ড পালান তার ও ই দুব্‌বা'র, দুদিন ভালো করে খাওয়াতে পারলে কি দুধটাই ও দেয়। খেয়ে যেন ও নিজের দেহ পুষ্ট করে না, দুধে পরিণত করে তার জন্য পালান ফুলিয়ে রাখে। তার ছেলেকে পিঠে নিয়ে ধীরে মন্থরগতিতে দুব্‌বাকে গাঁয়ের দিকে চলতে দেখে এক সময় গোবর্ধনের বুক বা মন কোথায় যেন বেশ জ্বালা করে।

মনটা গোবর্ধনের ভালো ছিল না। চোখে জল আসবে টের পেয়ে জোর গলা খাঁকরি দিয়ে সে গরু মহিষকে তাড়া দেয়—টকাস্, টকস্, হেই-ই! চ্চঃ, চ্চঃ।

রাস্তার ধারে তৃণহীন শক্ত মাঠ। প্রতি পদক্ষেপে যেন ফিরে আঘাত করে। রাস্তায় উঠে গোবর্ধন একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

বাস্‌

বিকালে বাসের প্রতীক্ষায় পথপ্রান্তের খড়পা যেমন চঞ্চল হয়ে থাকে, এখনো তেমনি চঞ্চল হয়ে আছে। চঞ্চল এবং উদগ্রীব হয়ে আছে।

'কি ব্যাপার গ ?'

'বাস এসে নি।'

'এসে নি ? না ?'

'উঁহুঁক। সদরে না গেলি মোর চলবে নি কিনা, শালার বাস তাই আজ এসবে নি তো মোকে লিয়ে যেতে !'

পুঁটলি হাতে শ্রীধন পাল অনেকক্ষণ হল অস্থির হয়ে এদিক ওদিক চলা-ফেরা করছে। পুব দিকে যতদূর রাস্তা দেখা যায় তাকিয়ে থাকছে, জগতের চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিটায় ধপ্‌ করে বসে বিড়ি ধরাচ্ছে এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার উঠে অস্থির হচ্ছে। কাল তার মস্ত মোকদ্দমা আছে সদরে। সদরে পৌঁছতে না পারলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেড়শো দুশো টাকার সর্বনাশ !

গোবর্ধনের গরুর গাড়ী ঠিক নেই, চাকা মেরামত করতে হবে। বলদ আছে। গাড়ী একটা হয়তো ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

'বাস না এসে তো মোর গাড়ীতে যেও'খন। খেয়ে লিয়ে রওনা দিলে—' গোবর্ধনের প্রস্তাবে শ্রীধনের মুখে ভেংচি দেখা দিল। 'গরুর গাড়িতে ? দুপুর রাতে বন পেরিয়ে লিয়ে যাবি তোর গরুর গাড়িতে ? রাতে কটা বাঘ রাস্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়ায় জানিস্‌ ?'

নটবর ঠাকুর মৃদু হেসে বলল, 'গণ্ডা তিনেক, আর কত !'

দণ্ডধারী ডাক্তারের ভাগ্নে পাশ দিয়ে আসল খড়পার দিকে যাচ্ছিল, বলে গেল, 'বাঘগুলোও হন্যে হয়ে আছে। একটা মানুষে আগে ওদের চারবেলা পেট ভরত, এখন একবেলা আধপেটা হয়। দীনু সেদিন বাঘ দেখে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল, বাঘ তাকে দুচারবার শুঁকে গর্জন করে চলে গেল। হাড় চামড়া বাঘ খায় না।'

পেটের কথায়, খাওয়ার কথায়, ক্ষুধার কথায় গোবর্ধনের হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা কুমড়ো কাল সে নামিয়েছিল, গাঁয়ের কেউ ভালো দর দেয় নি। নটবর ব্রাহ্মণত্বের দাবীতে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল দশ পয়সা বাকী দামে। বাসের যাত্রীদের কারো কাছে হয়তো কুমড়োটা বেচা যেতে পারে। অবশ্য বাস যদি আসে। কেউ কি জানে না কি হয়েছে বাসের, কেন বাস এখনো আসে নি আজ ?

দেখা গেল এ খবরটা সকলেই জানে। সেন সাহেব সদরে ফিরবার পথে দয়া করে তাঁর গাড়ী থামিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে বাস বিগড়ে গেছে, আসতে দেরি হবে। কি রকম বিগড়ানো বিগড়েছে বাস? কত দেরি হওয়া সম্ভব বাসের আসতে? এসব খবর সেন সাহেব দেন নি। ' খুঁটিনাটি বিবরণের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পীড়ন করার ভরসাও অনেকের ছিল না। কেবল ডাক্তার দণ্ডধারী আর গজেন সাহস করে দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে গিয়েছিল।

দণ্ডধারী আরম্ভ করেছিল, 'সার—'

গজেন আরম্ভ করেছিল, 'হুজুর—'

তখন হুস করে বেরিয়ে গিয়েছিল সেন সাহেবের গাড়ী। শ্রীধন যদি তখন এখনকার মতো মরিয়া হয়ে থাকতো, সে হয়তো সেন সাহেবের কাছ থেকে বাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আদায় করে ছাড়ত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঘাঁটাতে শ্রীধনও কম বিমুখ নয়। তবে, স্বার্থ মানুষকে শক্ত করে, বিপদ সাহস যোগায়। তাছাড়া গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বাস সম্পর্কে একটু বিশদ বিবরণ জানতে চাইলে তার উপর দিয়ে মিঃ সেন গাড়ি চালিয়ে দিতে পারতেন না। সে দিনকাল যে আর নেই, শ্রীধনের পর্যন্ত তাতে বিশ্বাস জন্মেছে।

বাস কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। তবে শেষ পর্যন্ত এসে যে পৌঁছবে তাতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। সেন সাহেব স্পষ্টই বলে গেছেন বাস আসবে—দেরি করে আসবে। বাস কি না এসে পারে? কুমড়ো বিক্রীর আগ্রহে গোবর্ধনেরও মনে হল, বাস আসবে। বাড়ী গিয়ে কুমড়োটা এনে রাখা ভালো। কখন বাস এসে পড়বে কে জানে। গরু মহিষ তার তখন ঘরে চলে গেছে। গোবর্ধন তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ে যাবার সরু মাটির পথে নেমে গেল। গাঁয়ের কোনো ঘরেই এখনো আলো জ্বলেনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য যে সন্ধ্যাদীপ জেলে আবার নিভিয়ে দেওয়া হয় ঘরে ঘরে তেলের অভাবের জন্য, সে দীপগুলির আর জ্বলে উঠতে বেশি দেরি নেই, দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে।

প্রতিদিনের মতো শ্রীমন্তসহায় পুরানো মন্দিরের সিঁড়িতে এসে বসেছে। প্রাচীন বিষ্ণু মন্দির, এদিকে এরকম বহু মন্দির দেখা যায়। খড়পার মন্দিরের পাথরে ফাটল ধরে আজ পর্যন্ত একটিও আগাছা গজায় নি। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কোথা থেকে এক সন্ন্যাসিনী এসে বিষ্ণুহীন মন্দিরে কুণ্ডেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করে

গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব· যুগে বিষ্ণুর জন্য নির্মিত মন্দিরটি সেই থেকে সিঁদুর ঢাকা কুণ্ডেশ্বরী দখল করে আছেন। এ সময় মন্দিরের সিঁড়িতে বসে প্রতিদিন শ্রীমন্ত-সহায় গাঁয়ের লোককে আশ্চর্য সব কথা শোনায়। মানুষের আগের কথা, মাঝের কথা, আজের কথা, জমির কথা, চাষীর কথা, কলের কথা, কুলির কথা, টাকা এবং গরীব ও বড়লোকের কথা। কখনো অনর্গল বলে, বোঝা যায় না। কখনো উদাস কণ্ঠে, কখনো মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে বলে—কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না, শ্রোতাদের মনে গভীর অস্বস্তি জাগে।

কখনো একেবারে তাদের ভাষায় সে বলে, তারা বুঝে শুনে থ' বনে যায়। সমাজ সংসার সব মিছে? ভাঙ্গতে হবে, গড়তে হবে? টাকার খেলা ফক্কিকার, লুটলে অনেক থাকে, নইলে থাকে না? বড়লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভগবানের শাস্ত্রে বে-আইনী—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার তাদের যারা গরীব?

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে শ্রীমন্তসহায় বলে, 'উঁহু, তোমাদের এ সব বলা তো উচিত হচ্ছে না! গাঁ ছেড়ে বাইরে যাওয়া বারণ, ঘর থেকে বেরুতে পাব না শেষে! রামাবতার আবার সব শুনলো।'

থানার রামাবতার সোৎসাহে বলে, 'ঠিক বাত হ্যায়। গরীবকা লোহু পিনেসে ধনী বনতা, নেহি তো নেহি বনতা। জওহরলালজী তো—'

'একটা গান শোন রামাবতার।' বলেই শ্রীমন্তসহায় গলা ছেড়ে হিন্দী গান ধরে দেয়।

আধ ঘণ্টা পরেই হয়তো দেখা যায় শ্রীমন্তসহায় ডাক্তারখানায় বসে ওষুধপত্রের হিসাব দেখছে, ভিজিটের টাকার বখরা নিয়ে মৃদু কোমল সুরে দণ্ডধারী মামার সঙ্গে কলহ করছে, আর নয় তো পরিদর্শন করছে তার যে কাঠ চালান যাবে তার ব্যবস্থা। ওষুধের দোকানের আসল মালিক শ্রীমন্তসহায়, দণ্ডধারীর পশারও দাঁড়িয়েছে তারই জন্য। গোড়াতেই একটা বখরার ব্যবস্থা স্থির হয়েছিল। খুব সহজ ব্যবস্থা—দোকানের লাভ আর ডাক্তারির আয় যত হবে সেটা দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে আধাআধি। যতদিন এই উপার্জনে দুই ছেলে তিন মেয়ে এবং বৌ আর শালীকে নিয়ে তার প্রকাণ্ড সংসারের খরচ না চলে, শ্রীমন্তসহায় কিছু কিছু সাহায্য করবে। আয়ের ভাগ ছাড়বে না এক পয়সা, কিন্তু সাহায্য করবে। ভাগের দশ গুণ দিতে হলেও সাহায্য করবে।

কারণ, ব্যবসাতে কে কার ভাগ্নে, কে কার মামা! মামা হয়ে খেতে পাচ্ছ না,

ভাগ্নের সাহায্য নাও! দুবেলা আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকো সেই সাহায্য নিয়ে, ব্যবসাতে পাওনার বেশি আধলাটি পাবে না।

'রাজা হয়ে বেঁচে থাক বাবা!' বলে ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরে সেদিন, বছর চারেক আগে, কৃতজ্ঞতায় দণ্ডধারী কেঁদে ফেলেছিল। ডাক্তারীর আয়টা বেশ ভালো রকম হওয়ায় আজকাল বখরার ব্যবস্থা নিয়ে সে খুঁত খুঁত করে।

বলে, 'রুগী দেখার পয়সাতে তোর বখরা কিসের? তুই যাস্ রুগী দেখতে? তিন ক্রোশ পথ হেঁটে আমি দেখব রুগী—'

শ্রীমন্তসহায় বলে, 'সব রুগী আমার মামা। তুমি শুধু দেখতে গিয়ে ভিজিট নিয়ে এস।'

গোবর্ধনকে দুর্বোধ্য রহস্যের কথা শোনাতে শ্রীমন্তসহায় বড় ভালোবাসে। গোবর্ধন বোকা মানুষ, কিছু বোঝে না, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে কি যেন আঁচ করে সে বিহ্বল হয়ে যায়। সেই বিহ্বলতা স্পর্শ করে এদিক ওদিক সেদিক থেকে আঘাত পাওয়া শ্রীমন্তসহায়ের আঁকাবাঁকা মন। শ্রীমন্তসহায়ের মনগড়া দর্শন, আকাশ পৃথিবী সূর্যচন্দ্র তারায় জড়ানো তার আবেগ, জীবন মরণ সুখ দুঃখ ব্যথা বন্ধন মুক্তিকে আশ্রয় করা তার উদাস, মৃদু গম্ভীর গলার আওয়াজ সমস্ত মিলে গোবর্ধনের হৃদয়কে আকুলি ব্যাকুলি করিয়ে ছাড়ে।

আজ বাস-এর গোলমালে কেউ আসে নি। বুড়ো শশীধর শুধু অনেক তফাতে বসেছে—সে কিছু শোনে না, শুনতে পারে না। নটবরের বিধবা বোন মন্দিরে আলো জ্বেলে রেখে গেছে, নটবর এক সময়ে এসে ঘণ্টা নেড়ে দিয়ে যাবে। মন্দিরে আজকাল এক ছটাক চালও হয় না। একবেলা—চার পাঁচটা সরা দিলেও নয়। গোবর্ধনকে দেখে শ্রীমন্তসহায় ডাক দিল। কাছে গিয়ে গোবর্ধন বলল, 'বসবার সময় নেই গো নায়েক মশায়। বাস এলে কুমড়োটা বেচব।'

'কোথা তোর বাস? বোস। ভালো করে নজর রাখ দিকি গোবর্ধন, ঠিক কখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা লাগে বলতে হবে তোকে।'

'খিদে পেয়েছে নায়েক মশায়।'

'খিদে পেলেই খাস বুঝি তুই? রাজা মহারাজা হলি কবে থেকে? এ গাঁয়ে কেউ আর খিদে পেলে খায় না গোবর্ধন—তুই আর আমি ছাড়া। দুবেলা আধপেটা খাস? তবে তুইও বাদ গেলি। আমি চারবেলা খাই, পেট ভরে খাই, রাজভোগ খাই! বৌটা এলে সেও খাবে। সবার খিদে সয়, আমার কেন সয়

না বলতো? খিদেয় আমার পেট জ্বলে না, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে।' শ্রীমন্তসহায় হাসল, 'যা বাবা, যা। গাঁয়ে আটক আছি, তাই না তোদের ডেকে দুটো কথা কই!'

সত্যই বড় খিদে পেয়েছিল গোবর্ধনের। কিছু না খেয়ে কুমড়োটা নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করা যাবে না, শেষ পর্যন্ত বাস হয়তো আসবে অনেক দেরিতে।

খাওয়ার তাগিদ শুনে কিন্তু তার বৌ গুণমতী মাথা নাড়ল—

'সন্দে লাগুক, বাতিটে জ্বালি? সবুর কর খানিক।'

'মুড়ি দে দুটি?'

'কাণ্ডজ্ঞানটি খুইয়েছো একদম। বাতিটে জ্বালি? আগে এসতে পারলে নিকো একটুকু?'

'বাতি জ্বাল।'

'সন্দে হোক?'

গোবর্ধনকে সায় দিতে হল। সন্ধ্যাকে হতে না দিয়ে সত্যই এখন আর বাতি জ্বালা যায় না। দিন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা এখনো হয় নি। অথচ ইচ্ছে করলেই সে অনেক আগেই বাড়ি ফিরতে পারত। বাস আসে নি, আসতে দেরি হবে শুনেই সোজা বাড়ি চলে এলেই হত। কিন্তু কোনো একটা ব্যাপার বুঝে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে যেন তার জন্ম কেটে যায়। তাড়াতাড়ি করার তাগিদ বোধ করেও সে ঢিমে তালে কাজ করে যায় চিরদিন—শ্রীমন্তসহায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে যাবার বদলে দাঁড়িয়ে খানিক আলাপ করে আসে। এমনি করে সব তার পণ্ড হয়ে গেল—সব। মনটা খিঁচড়ে যায় গোবর্ধনের। সে ভাবে, কুমড়ো নিয়ে যেতে যেতে বাসটা এসে চলে যাবে নিশ্চয়, চিরদিন এমনি ঘটনাই তো ঘটে এসেছে তার জীবনে! নাঃ, খিদে মেটাবার জন্য দুদণ্ডও সে দাঁড়াবে না বাড়ীতে।

ছেলের হাতে রাস্তায় দুটি মুড়ি পাঠিয়ে দিতে বলে কুমড়োটি সে বার করতে যাবে, গুণমতী তাতেও বাধা দিল। বাতি জ্বালার আগে ঘর থেকে এখন কুটোটি সে বার করতে দেবে না।

'ধুত্তোর বাতি জ্বালা!' পনের সের ওজনের মস্ত কুমড়োটি কাঁধে তুলে গোবর্ধন বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে গুণমতী কাতর হয়ে বলল, 'ওগো, যেওনি তুমি, যেওনি। কেউ কুমড়ো কিনবে নি তুমার, সবুর করে যাও।'

গুণমতীর শরীর ছিপছিপে, গলাও বাঁশির মতো সরু। কাতর হলে ভারী মিহি আর মিষ্টি শোনায়। পেটের জ্বালায় কাতর হয়ে না থাকলে গোবর্ধন হয়তো রাগও করত না, কুমড়ো নিয়ে অসময়ে ঘরের বাইরে যাবার সাহসও খুঁজে পেত না।

'কিনবে নি তো কিনবে নি। নালায় ফিঁকে দিয়ে চলে এসব।'

এই বলে কাঁধের নিটোল কুমড়োটি বাগিয়ে ধরতে গিয়ে গোবর্ধনের হাত পড়ল গর্তে। অঙ্গনে নামিয়ে রেখে সে তাকিয়ে রইল কুমড়োটির দিকে। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চার আঙ্গুল চওড়া একটি ফালি কুমড়ে থেকে কে কেটে নিয়েছে।

এক চড়েই গুণমতী কেঁদে ফেলল—ডুকরে নয় ফোঁস ফোঁসিয়ে। শুধু কাঁদল না, বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের পক্ষ সমর্থনও করে চলল সেই সঙ্গে। গোবর্ধন যে বলেছিল কুমড়োটা সে বেচবে না! লোকের কিপ্টেপণাকে গাল দিতে দিতে জোর গলায় সে যে বলেছিল কুমড়োটা ঘরে পচাবে তবু বেচবে না! তাই শুনে গুণমতী যদি এক ফালি কেটেই নিয়ে থাকে আর রানীকে এক রত্তি একটু দিয়ে, তরকারী রেঁধে থাকে গোবর্ধনের জন্য, কি এমন ঘাটতি হয়েছে তার যে তাকে চড় মারবে গোবর্ধন।

গোবর্ধন কুমড়ো নিয়ে বেরিয়ে যাবার পরেই তার কান্না থেমে গেল। কান্না যে শেষ হয়ে গেল তা নয়, তোলা রইল। গোবর্ধন ফিরে এলে, ঘর সংসারের সব কাজ চুকে গেলে গোবর্ধনের তামাক টানা শেষ হলে সময় বুঝে সে আবার একটু কাঁদবে। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে নিজের মনে নিজের অদেষ্টকে গাল দিয়ে দুকথা বলতে আরম্ভ করলেই বুক ঠেলে তার কান্না আসবে।

গোবর্ধন বলবে, ইদিকে আয় নান্টুর মা।

সে ফুঁপিয়ে বলবে, ন্যাকামি কোরোনি বলছি, ভাল হবেনি কিন্তু হাঁ!

গোবর্দ্ধন আরও নরম হয়ে তাকে সাধবে। তারপর—

কিন্তু যেমন সে ভাবছে তেমন ঘটবে কি—তাদের চিরদিনের রাগ সোহাগের এক ঘটনা? শরীরটা তার শুকিয়ে গেছে ঢের, ঘুমের মতো কেমন একটা ঝিম ধরা ভাব সদাই যেন জড়িয়ে ধরে আছে। গোবর্ধনও কেমন হয়ে গেছে, অসহায়ের মতো কেমন দিশেহারা ভাবে চায়। আহা, পাঁজরাগুলো বেরিয়ে গেছে জোয়ান মানুষটার।

কোথা থেকে রানী এসে বলল, 'মিনসে বড় গোঁয়ার দিদি, নয়? কী চড়টা মারলে!'

গুণমতী চটে বলল, 'তোর মুখ বড় মন্দ রানী। সোয়ামি লিতে চায় না, তুই কি করে জানবি সোহাগ কেমন ধারা হয়।'

বন্ধুর বিরাগে থতমত খেয়ে রানী বলল, 'মারলে নাকি সোহাগ হয়!'

গুণমতী মুচকে হাসল।—'মারলে? মারবে কেনে লো বোকা ছুঁড়ি। গালটা টিপে দিয়েছে এমনি করে।'

গুণমতীর গাল টিপুনিতে বড় ব্যথা লাগল রানীর, টনটনে ব্যথা। গুণমতীর ভাব দেখে যে কথা চেপে যাবে ভেবেছিল, সে কথাটা না বলে সে থাকতে পারল না, 'অত কান্না হচ্ছিল কেনে শুনি তবে?'

'ওমা! সোয়ামির সোহাগে কান্না এসবেনি?'

নিতাই সাহার বাসনের দোকানের সামনে ছোট রোয়াকটির এক পাশে কুমড়োটি নামিয়ে গোবর্ধন বাস আর ছেলের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। গুণমতী সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বাললেই নানু তার মুড়ি আর গুড় নিয়ে আসবে কি ভয়ানক খিদে তার পেয়েছে জেনে নানুকে পাঠাতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না গুণমতী।

চারিদিকে অন্ধকার হয়ে আসে। কদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ আজ উঠবে একটু দেরিতে। দোকানগুলিতে একে একে আলো জ্বলে ওঠে,—লণ্ঠন, প্রদীপ আর কুপি।

নিতাই সাহা আনমনেই শুধোয়, 'চোদ্দ পয়সায় দিবি? আধখানা ত কেটেই লিয়েছিস।'

গোবর্দ্ধন সংক্ষেপে বলে, 'না।'

বাস সম্বন্ধে সকলের মনে একটু হতাশা দেখা দিয়েছে। এখন বাস এলেও বেশিক্ষণ থামবে না, আরোহীরা ঘুরে ফিরে দরদস্তুর করে সদরের চেয়ে সস্তায় কিছু কিনতে সময় পাবে না। তারা খিদে আর চায়ের তৃষ্ণায় কাতর হয়ে থাকবে, চা আর খাবার খাওয়া ছাড়া কোনো দিকে নজর দেবার অবকাশ কি তারা পাবে! গোবর্দ্ধনের রাগ পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকে। একটা চড়, শুধু একটা চড়ের জন্য গুণমতী তাকে দুটি মুড়ি পাঠাল না? রাগটা মনের মধ্যে পাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত প্রায় অভিমানেই দাঁড়িয়ে যায় গোবর্দ্ধনের। রাগের মতো অভিমানও শাস্তি দিতে চায় কি না, তাই বাড়ী ফিরে আরও কয়েকটা চড়চাপড়

বসিয়ে দেবার বদলে না খেয়ে থেকে গুণমতীকে শাস্তি দেবার কল্পনায় সে বিশেষ কোনো তফাৎ খুঁজে পায় না। তাছাড়া তার অভিজ্ঞতা আছে। চড়চাপড়ের চেয়ে শেষের শাস্তিটাই জোরালো হয়। চড় মারলে গুণমতী শুধু কাঁদে, রাগ করে উপোস দিলে মাথা কপাল খুঁড়তে আরম্ভ করে!

গোবর্ধন ভাবে, জগতের কাছে দুপয়সার চা খেয়ে চাঙা হওয়া যাক। ছ সাত মাস আগে কারা যেন এসে চায়ের আশ্চর্য গুণের কথা তাদের জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর দু'একবার খিদের সময়—মাঠে খাটবার সময় যে খিদে শরীর ভেঙ্গে আনে আর মাথা ঝিম ঝিম করায়—মুড়ি চিড়ার বদলে কাঁচের গ্লাসে চা খেয়ে দেখেছে। মন্ত্রবলে যেন খিদে মরে যায়, সারা দেহ চাঙা হয়ে ওঠে। কেবল একটা আক্ষেপ থেকে যায়—তৃষ্ণার। মনে হয়, সমস্ত শরীর, সমস্ত শরীরের ভেতরটা যেন হাত-পা আছড়ে মূর্ছা যাচ্ছে! আধ ঘটি জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করলেই সেটা সেরে যায়। অনেকক্ষণ খিদে পায় না, সর্বনেশে খিদে!

জগতকে গোবর্ধন দুধ জোগায়, দেনা-পাওনার হিসেব আছে। চাইতেই চা পাওয়া গেল, আর এক পয়সার ছোলাভাজা। একদিকে কাঁচবসানো টিনের পাত্রে নোনতা মিষ্টি বিস্কুটগুলি চিরদিন গোবর্ধনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিস্কুট তার কপালে জোটে না। কয়েকবার একখানা করে কিনেছিল, খেতে পারেনি। নান্থু রোজ বিস্কুটের পয়সার জন্য বায়না ধরে, কাঁদে। নিজের জন্য বিস্কুট কিনে কোণা ভেঙ্গে একটু শুধু স্বাদ গ্রহণ করে নান্থুর জন্য তুলে রাখতে গোবর্ধন কোনোদিন এতটুকু মজা পায় না, তবু তার কেনা বিস্কুট শেষ পর্যন্ত নান্থুর পেটেই যায়। তার একগাল হাসি আর ভাবভঙ্গির খুশি খুশি ভাবটা জগৎ-সংসারের ওপর গোবর্ধনকে চটিয়ে দেয়। একবার সে দুখানা বিস্কুট কিনেছিল একসঙ্গে, ভাগ্যকে পরাস্ত করবে বলে। কিন্তু হায়রে কপাল গোবর্ধনের, বিস্কুট সম্পর্কে যার কথা কোনো দিন তার মনে আসেনি, সেদিন তারই কথা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল—গুণমতী বোধ হয় জীবনে কখনো বিস্কুটের স্বাদ পায়নি!

কত দিক থেকে এমনি ধারা কত চাপ যে ঠেসে ধরে রেখেছে গোবর্ধনের মনকে! আজকের মতো যাতনাময় ক্ষুধায়, প্রতিদিনের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধায়, সেই চাপগুলি সে স্পষ্ট অনুভব করে। বহুক্ষণ নিঃসঙ্গ থাকলে তার যখন ঝিম ধরে যায় তখন মনে হয়, পায়ের তলার শক্ত মাটি ছেড়ে খানিকটা উপরে উঠে সে যেন নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে, দড়াম করে পড়ল বলে।

গোবর্ধনের অনেক আগে থেকে জলভরা বালতি নিয়ে অপেক্ষা করছে নিবারণ। তার অপেক্ষা করাটা যেন ছটফটানোর সামিল। হঠাৎ উঠে ঘর চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে দশ পনের মিনিটের মধ্যে। বাড়ীতে তার একমাত্র বোনটি ছাড়া সকলের অসুখ। বৌ ছেলে আর ভায়ের গা-হাত-পা ফুলে জ্বর হয়েছে, দণ্ডধারী দেখে বলেছে যে এটা ভালো চাল একদম না খাওয়া আর খারাপ চাল একটুখানি করে খাওয়ার ফল। অনাহারের বদলে খাঁটি সজী আর ফ্যানের বদলে তুটি ভাত খেলেই সেরে যাবে। বুড়ী ঠাকুমার বয়সের ব্যারামটা হঠাৎ খারাপের দিকে চলতে শুরু করেছে। ঠাকুমা মরবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরেকজন কাউকে সে পাছে সঙ্গে নিয়ে যায়, এই হয়েছে নিবারণের ভয়। বারবার সে তাই ঘরে ছুটে যাচ্ছে। আবার এদিকে বাসের ড্রাইভার তার জন্য সের তিনেক চাল আনবে, ঘরেও তার তাই মন টিকছে না। নইলে, বালতিভরা জল রয়েছে, একটা দিন কি তার হাজির না থাকলে চলে না!

'তোমার কি দাদা, যখন খুশি কুমড়োটি লিয়ে ঘর যাবে। মোকে ঠায় বসি থাকতি হবে যত্‌খন না শালার বাস এসে।'

'এসবে। ইবারে এসবে।'

কিন্তু বাস আসে না। রাত বেড়ে চলে। গাঁয়ে কখন রাত তুপুর হয় বাসের কি জানা নেই? আলাপ বিলাপের শব্দ চারিদিকে ঝিমিয়ে আসে। তুএকটি দোকান বন্ধ হয়ে যায়, অসময়ের বাসের সঙ্গে এদের স্বার্থ তেমনভাবে জড়িত নয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে নিবারণের মাথাটা ধীরে ধীরে বুকে নেমে আসে এবং তার গলায় শুরু হয় শ্লেষ্মার একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড় আওয়াজ। গোবর্ধনেরও ঘুম পায়। শ্রীধন বলে, 'অ গবর্ধন, এ যে খিদে পেয়ে গেল দস্তুরমত! বাড়ী থেকে চট করে খাওয়াটা সেরে আসি। বাস যদি এসে পড়ে, ড্রাইভারকে এই চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে একটু দাঁড়াতে বলিস বাবা।'

'আজ্ঞে, বলব।'

'শব্দ শুনেই ছুটে আসব। তবে কি জানিস, মোটাসোটা মানুষ অত ছুটতে পারিনে।'

শ্রীধন মাইতি চলে গেলে গোবর্ধন ঝিমোতে ঝিমোতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ কানের কাছে একটা উৎকট সোরগোলে সে সজাগ হয়ে ওঠে। আরেকটু

পরে সে ভালো করে ঘুমিয়ে পড়ার পর সোরগোলটা আরম্ভ হলে গোবর্ধন নিশ্চয় দাওয়া থেকে নিচে পড়ে যেতো।

কুকুরের লড়াই।

গজেনের খাবারের দোকানের সামনে দুটো কুকুর সর্বদা পড়ে থাকে—তিনকু আর ভুলি। বাস তারা করে গজেনের বাড়ীতেই, গজেন দোকান খুলতে এলে সঙ্গে আসে, আবার দোকান বন্ধ হলে গজেনের সঙ্গে ফিরে যায়। কেবল দোকানের ফেলনা ঘিয়ের খাবার খেয়েই বেঁচে থাকে না বলে দুজনের সব লোম খসে যায়নি, ঘন লোম একটু পাতলা হয়েছে আর দু'একটা ছোটখাট টাক পড়েছে এখানে ওখানে। তিনকুর চেহারা বেশ জমকালো, গম্ভীর গোমড়া মুখ, মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ কুকুর। তার কাছে রোগা ছোটখাটো ভুলিকে কেমন বেমানান দেখায়। বয়সে কিন্তু ভুলি তিনকুর চেয়ে বড়ই হবে। তেজ কিন্তু তার কম নয়, মাঝে মাঝে তার দাঁতখিচুনিতেই তিনকুকে বিনা প্রতিবাদে তফাতে সরে যেতে দেখা যায়।

গত বছর পাঁচটি বাচ্চা হয়েছিল। শরীরটা ভালো ছিল না ভুলির, পাঁচটিকে বাঁচাতে পারবে না জেনে দুটিকে বেছে নিয়ে মাই না দিয়ে নিজেই সে মেরে ফেলেছিল। একটি খেয়েছিল শেয়ালে, একটি মরেছিল দুর্বোধ্য রোগে এবং অন্যটিকে চেয়ে নিয়ে নান্টু গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে বেড়িয়েই শেষ করে দিয়েছিল। বর্ষা ঋতুর আসন্ন আবির্ভাব ওদের দুজনকেই একটু চঞ্চল ও জীবন্ত করে তুলেছে। দোকানের সামনে চুপচাপ পড়ে থেকে সারাক্ষণ ওরা শুধু জিভ বার করে হাঁপায় না। খানিক আগেও গোবর্ধন ওদের ছুটোছুটি লাফালাফির খেলা দেখেছে, লড়ায়ের অভিনয়ে ভুলির আদরের কামড়ে তিনকুকে হার মেনে শূন্যে চার পা তুলে চিৎ হয়ে পড়তে দেখেছে।

গোবর্ধনের কালোও যে বর্ষা ঋতুর তাগিদে বসন্ত-ব্যাকুল মানুষের মতো চঞ্চল হয়ে সঙ্গিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, কে তা জানত! তিনকুর সঙ্গে তার বেধেছে লড়াই এবং দুজনকে ঘিরে চারিদিকে পাক দিতে দিতে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার জুড়েছে ভুলি। তিন দফা লড়ায়ের পর কালোকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে গোবর্ধনের মনটা বিগড়ে গেল। কালোর সম্বন্ধে সে একান্ত উদাসীন, তার আস্তাকুঁড় ঘেঁটে আর মাটির খেলায় গুণমতীর দেওয়া একমুঠো ভাত খেয়ে কালো বেঁচে থাকে উঠানের কাঁঠাল গাছটার নিচে সারাদিন বিশ্রাম করে। রাত্রে হয়তো

দাওয়ায় উঠে শোয়, কেউ টের পায় না। লেজ নাড়তে নাড়তে কখনো কাছে এলে গোবর্ধন তাকে দূরদূর করে ভাগিয়েই দিয়েছে চিরদিন। তবু আজ কালোর পরাজয়ে কেমন একটা অপমান বোধ ভেতরে কামড়াতে থাকে। গজেনের লোম ওঠা বুড়ো কুকুরের কাছে তার চিকন কালো কুকুর হেরে গেল!

তারপর আর তো ঘুম আসে না গোবর্ধনের! জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ আর নালিশ যেন একসঙ্গে পাক দিয়ে উঠে তার কণ্ঠ রোধ করে দিতে চায়। সেও প্রায় জগতের ছোট-বড় আপন-পর সকলের জিদের কাছে এতকাল হার মেনেছে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কুঁকড়ে দিয়েছে সবাই মিলে। অপরাজেয় বিরাট দৈত্যের মতো একটা অদৃশ্য শত্রুর সান্নিধ্য গোবর্ধন স্পষ্ট অনুভব করে।

এদিকে ততক্ষণে শুরু হয়েছে ওষুধের দোকানে মানুষের লড়াই। দণ্ডধারী ও শ্রীমন্তসহায়ের দৈনন্দিন কথা কাটাকাটি আজ প্রচণ্ড কলহে পরিণত হয়েছে। শ্রীমন্তসহায় চিরদিন কড়া কথাও আস্তে বলে, গলা চড়ায় না। গলা ছেড়ে আজ সে মামাকে গাল দিচ্ছে শুনে গোবর্ধন আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর যে কাণ্ড করল শ্রীমন্তসহায়, দেখে শুনে তাক লেগে গেল গোবর্ধনের। গর্জন করতে করতে দণ্ডধারীকে টেনে হিঁচড়ে দোকানের বাইরে এনে সজোরে এক ধাক্কা দিল। দণ্ডধারী একেবারে আছড়ে পড়ল বাঁধান পাথুরে রাস্তার ধুলোয়।

আলো নিভিয়ে দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে শ্রীমন্তসহায় বলল, 'আর ঢুকো না মোর দোকানে তুমি। যেখানে খুশি ডাক্তারী করে বড়লোক হওগে যাও। একটি পয়সা ভাগ চাইব না।'

দণ্ডধারী তখনও রাস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নি। সামনে পা ছড়িয়ে এপাশে রাস্তায় দু'হাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে সে বোধ হয় রাগ আর ব্যথা সামলে নিচ্ছিল। ক্রুদ্ধ আর্তনাদের মতো উদ্ভট সুরে সে জবাব দিল, 'মারলি! গুরুজনকে মারলি! সর্বনাশ হবে তোর, ঘরে তোর মড়ক লাগবে। তখন যদি পায়ে ধরে এসে কাঁদিস, মাথা কপাল কুটিস চিকিচ্ছের জন্যে—তুই মরবি, মা ছেতলার কিরপা হয়ে একুশ দিন ভুগে মরবি।'

এতক্ষণে সকলে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পুবে সদ্যোদিত ম্লান নিষ্প্রভ চাঁদের আবছা আলোয় দণ্ডধারীকে রাস্তায় পড়ে তীক্ষ্ণ চড়া কান্নার সুরে অভিশাপ দিতে শুনে দুচারজনে শিউরে উঠল। এ বছর চারিদিকে বেশ ভালো করেই বসন্ত রোগের আবির্ভাব ঘটেছিল, এখন একটু নরম পড়েছে। দণ্ডধারীর অভিশাপ

হয়তো ফলেই যাবে! গাঁয়ের এক প্রান্তে একটু তফাতে ফচ্‌কের মাসী এই রোগে সেদিন চিতায় উঠেছে—ফচ্‌কে আর শ্রীমন্তসহায় শুধু দুজনের কাঁধে একটা বাঁশে বাঁধা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে উঠেছে চিতায়। শ্রীমন্তসহায় কত ছোঁয়াছুঁয়ি করেছিল ফচ্‌কের মাসীকে! তার অবশ্যম্ভাবী ফলটা গুরুজনের অভিশাপের তাগিদে দু-চার দিনের মধ্যেই নির্ঘাৎ ফলে যাবে নিশ্চয়।

শ্রীমন্তসহায় এগিয়ে এসে বলল, 'বড্ড লেগেছে নাকি মামা? ওঠ, বাড়ি যাও।'

ধীরে ধীরে দণ্ডধারীকে ধরে তুলে সে দাঁড় করিয়ে দিল। এ কাজটা এতক্ষণ অন্য কারুর করাই উচিত ছিল বটে, কিন্তু উচিত কাজ কি সব সময় করতে পারে মানুষে? শ্রীমন্তসহায় রাগ করতে পারে এ ভয়তো ছিলই, তাছাড়া একটু শুধু অপেক্ষা করছিল সকলে, তারপর কি ঘটে দেখবার জন্য। মামাকে যে ঘাড় ধরে রাস্তায় আছড়ে ফেলতে পারে, অভিশাপ শুনে তার পক্ষে তেড়ে এসে আরও দু চার ঘা বসিয়ে দেওয়া বিচিত্র কি।

শ্রীমন্তসহায়ের নতুন ধরনের কথা ও ব্যবহারে দণ্ডধারীও একটু ভড়কে গিয়েছিল। হাত ছাড়িয়ে হন হন করে খানিকটা তফাতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে ভাগ্নেকে পাজী, বজ্জাত, বেজন্মা, চণ্ডাল প্রভৃতি কতগুলি বাছা বাছা গাল শুনিয়ে গাল দিতে দিতেই আবার হন হন করে কাঁচা পথে নেমে বাড়ির দিকে চলে গেল।

শ্রীমন্তসহায় সকলকে শুনিয়ে বলল, 'চারটে গাঁ ঘুরে আজ চার টাকা পেয়েছে। কাল পেইছিল দেড় টাকা। বললাম, কালকের বারগণ্ডা পয়সা যদি না দিলে তো নাই দিলে মামা, আজকের দুটো টাকা দাও? বলে কিনা, মোর পাওনা নেই!—বাপের শালা কুথাকার! দূর করে দিলাম দোকান থেকে। কদ্দিন ভণ্ডামি সয় বলো? ওটা কি ডাক্তার? আমি একটা চটি বই কিনে দিইছি, তাই পড়ে ডাক্তারি করে, আবার আমারি মুখের পরে চোটপাট। পাওনা নেই! মোর সব কিছু—মোর পাওনা নেই!'

চায়ের দোকানে গিয়ে সে লোহার চেয়ারটা দখল করে বসল, 'হাঁক দিয়ে বলল, 'এক কাপ চা দে দিকি বাবা কে আছিস। দুধ মিষ্টি দিস্ বাবা একটুখানি, তেতো না লাগে।'

ধীরে সুস্থে চা পান করে বিড়ির বদলে এক পয়সার একটা সিগারেট কিনে

সবে সে ধরিয়েছে, দূরে দেখা গেল বাসের আলো। বাসেরই আলো। মোটর গাড়ির আলো আরও নিচে থাকে।

গোবর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে কুমড়োটা তুলে নিল কাঁধে আর নিবারণ গিয়ে দাঁড়াল তার জলভরা বালতির কাছে। জগত চা-ভরা পাত্রটি উনানে তুলে দিল আর দোকানের ঘুমন্ত ছোকরাটাকে এক গাঁট্টায় জাগিয়ে দিল আধো কান্নায়। কয়েকটি মিট মিটে আলোজ্বালা স্তব্ধ ঘুমন্ত পুরী যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলার মতো লোক নেই, বহুলোক চলে গেছে, কিন্তু অবশিষ্ট কয়েকজনের অতিরিক্ত উত্তেজনা সে অভাব পূরণ করে দিল।

বাসের দৃষ্টিগোচর চোখের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তসহায় তখন অনিচ্ছুক শ্রোতা গোবর্ধনকে বলছে, 'গাঁ থেকে বেরুতে পারি না, তাই না শ্বশুরের এত জোর! পাঁচ দিন আগে পৌঁছে দিয়ে যাবার কথা, আজও এল না। তাই না বলছিলাম মামাকে, আজকের বাসে এলো তো এলো, না এলে কাল তুমি গিয়ে নিয়ে এসবে। তা মামা বলে, 'উঁহু, সেটা নিয়ম নয়। মামাশ্বশুর একলাটি ভাগ্নে বৌকে নিয়ে এসবে কি করে, মামাশ্বশুরের ছায়া দেখতে নেই ভাগ্নে-বৌয়ের? শুনলি? এমনি করে রসাতলে যাচ্ছে দেশটা। একবারটি এসে নিক। কি করব জানিস? একটা গোটা দিন রাত বৌ আর মামাটাকে এক ঘরে কুলুপ দিয়ে রেখে দেব।'

সর্বাঙ্গে আওয়াজ করতে করতে পুরানো বাস এসে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত যাত্রীরা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল চা ও খাবারের দোকানে। ড্রাইভার ঈশ্বর এবং ক্লিনার ও কণ্ডাক্টর পটল পর্যন্ত নেমে গেল চা খেতে।

নিবারণ গাড়িতে জল দিতে গিয়েছে, ঈশ্বর চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ও নিবারণ, জল দিস্ নি।'

নিবারণ বিস্মিত হল, প্রতিবাদ করল না। কাছে গিয়ে বলল, 'চাল কটা দেন ঈশ্বরবাবু, ঘর গিয়ে দুটি রাঁধি!'

'মোদের জন্যে রাঁধবি না?' ঈশ্বর নির্বিকার চিত্তে হাসল, 'না, তোর ঘরে আবার রুগী সব কটা। চাল কিন্তু মোটে দেড় সের মিলেছে ভাই।'

মৃত্যুর নিমীলনের বদলে জীবনের বিস্ফোরণে দুচোখ প্রায় গোলাকার হল নিবারণের, সে বলল, 'দেড় সের?'

'দাম চড়ে গেছে ভাই।' চায়ে চুমুক দিয়ে ঈশ্বর গলা নামাল, 'বাবুকে বলেছি,

সেন সাহেবকে ধরে কিছু চাল সস্তায় পাইয়ে দিতে। পেলে পাঁচদশ সের দেব তোকে।'

এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রীধন মাইতি এসে পড়ল। বাস একেবারে খালি দেখে বিস্ময় ও আনন্দে তার ভরা পেট মোচড় দিয়ে উঠল। এভাবে বাস খালি করে এক সঙ্গে নেমে যায় না মেয়ে পুরুষ সবাই, তবে নেমেছে যখন ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে জায়গা দখল করে নিয়ে আরাম করে বসাই ভালো।

ঈশ্বর চায়ের দোকান থেকে হাঁক দিয়ে বলল, 'আরে ও মশায়! ওটা করছেন কি? বাস আজ যাবে নি।'

'যাবে নি কি হে? এলো তো যাবে নি কেনে?'

'বাসের গোসা হয়েছে। এক পা লড়বে নি।'

'আমার সাথে ফাজলামি করবি নি তুই বেয়াদব কুথাকার।'

ঈশ্বর নির্বিকারচিত্তে দুহাত দুদিকে কাত করে উদাসভাবে বলল, 'তবে চালিয়ে লিয়ে যান আপনি। বাজারের মোড়ে লিয়ে যাবেন। বাবু খুশি হবে।'

এবার উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে শ্রীধনকে নামতে হল। কাল তার মোকদ্দমা সদরে, দেরি করে বাস যদিবা এলো, সে বাস যাবে না! গোবর্ধন এদিক ওদিক কুমড়ো বিক্রীর চেষ্টায় ঘুরছিল। কিন্তু এত রাত্রে এ অবস্থায় কুমড়োর দিকে তার তাকাবে কে! বাস ভর্তি লোক এখানে আজ আটকে পড়েছে, কোথায় খাবে কোথায় শোবে কি করবে কিছুই তারা জানে না। তবে শুধু এইটুকু ভরসা যে, যেমন হোক একটা গ্রামে এসে বাসটা থেমেছে। মুড়ি চিড়ে খাবার টাবার কিছু খেয়ে আশ্রয় চাইলে কেউ অস্বীকার করবে না। মাথা গুঁজে রাত কাটাবার জায়গা সবাই দেবে।

শ্রীধন গোবর্ধনকে শুধোল, 'বাস যাবে না কেনরে?'

'কি বিগড়েছে কে জানে।'

শ্রীধন চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, 'তুমি ঈশ্বর ড্রাইভার না?'

ঈশ্বর তাকে চিনেছিল অনেকক্ষণ। দেহখানি দূর থেকে দেখলেই শ্রীধনকে চেনা যায়। এতক্ষণে ভদ্রতা করে বলল, 'মাইতি মশায় যে! আমি ভাবলাম, কে না কে হবে, গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে ।বে সন মাইতি মশায়, বসেন।'

'বাস নিয়ে যাবে না কেন হে? অ্যাদ্দুর এসে এখানে বাসটা ফেলে রাখা—'

'আজ্ঞে তেল নেই এক ফোঁটা।'

এখানকার কেউ তো জানতই না বাস কেন খড়পায় এসে আটকে গেল, যাত্রীরাও অনেকেই ভালো করে জানত না। সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কারণটা ঈশ্বরের মুখে শুনল। সেন সাহেবের তেল কম পড়ায় দু গ্যালন তেল ধার চেয়েছিলেন। সেন সাহেবের ড্রাইভার বাসের তেল পাম্প করে সাহেবের গাড়ি চালান দিতে লাগল, সেন সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে। 'সব নিয়ো না হে!' সেন সাহেব বল্লেন।

'না, হুজুর। বহুত তেল হ্যায়।' বল্লে তাঁর ড্রাইভার।

গাড়ির ইঞ্জিন তখন মেরামত হচ্ছে। ঈশ্বর কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়েছিল তেল চালানের কাছে। পাম্পে যখন আর তেল ওঠে না, তখন দু গ্যালন তেল ধার নেওয়া শেষ হল।

'তুমি কিছু বললে না সাহেবকে? বললেই তিনি সদর পর্যন্ত পৌঁছবার তেল নিশ্চয় ফেরত দিতেন। বাসভরা এতগুলো লোক —'

ঈশ্বর মাথাটা কাত করে প্রায় ঘাড়ে ঠেকিয়ে সায় দিল, 'বল্লে দিত। একবার ভেবেছিলাম বলি। বাবুর কথা ভেবে সামলে গেলাম। দোষ আমারই কি না। আল্‌গা টিনে তিন চার গ্যালন তেল মোদের রাখতে হয়। একটা টিনে খানিকটা তেল মোটে ছিল। বাবুকে বলতে হবে, টিনের তেলও সাহেব লিয়েছেন।'

একজন বলল, 'সাহেব যদি না বলে?'

ঈশ্বর অবাক হয়ে বক্তার নিরীহ গোবেচারী মুখখানার দিকে খানিক চেয়ে বলল, 'সাহেব না বলবে! কে জিজ্ঞেস করতে যাবে সাহেবকে? এ কি আদালত পেয়েছো না কি? বাবু যখন বিশ বস্তার জায়গায় দুশো বস্তা চাল গায়েব করবে, সাহেব কি তখন শুধোতে যাবে, না কাউকে শুধোতে দেবে?'

শ্রীধন্ আগাগোড়া ঠোঁট কামড়ে বিরক্তি জানিয়ে ইসারা করছিল, ঈশ্বর থামল না দেখে এবার রুক্ষ স্বরে বলল, 'এসব কথা যে ফাঁকা করে বেড়াচ্ছ ঈশ্বর—'

'বাবুর হুকুম আছে।'

'হেঁ?'

'আরে বাবা, সোজা বোঝে না কেউ? সেন সাহেব বড় ঠ্যাটা। বাবু ওকে সরাতে চান।'

শ্রীমন্তসহায় একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল।

'মশায়রা, দয়া করে আমার দুটো কথা শুনুন। আমার কিছু বলার হুকুম নেই। মুখ একদম সিল্ করা। তবে কিনা এ অবস্থায় দুটো কথা না বলে কি থাকতে পারি? মোদের গাঁয়ে এসে আপনারা আটক পড়েছেন। অতিথি হয়ে পড়েছেন আমাদের। তা আগের দিনের মতো অতিথি সৎকারের সাধ্য গাঁয়ের নেই, আপনারা সব জানেন। গাঁ থেকে দুটি খিচুড়ি রেঁধে দিলে কি গ্রহণ করবেন? ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে তারপর রাতটা আপনারা একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দেবেন। আমার ঘর খালি—একদম খালি। কেউ নেই আমার বাড়িতে। সাত আটজন আমার বাড়িতেই থাকতে পারবেন।

ঈশ্বর ব্যঙ্গ করে শুধোল, 'আপনার গাঁয়ে কত চালডাল আছে মশায়?' চেয়ার থেকে নেমে শ্রীমন্তসহায় সোজা ঈশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘুঁষি মারার জন্য ডান হাতের মুষ্টি তার তৈরি হয়ে আছে। ঈশ্বরের ব্যঙ্গকে ভেংচি দিয়ে সে বলল, 'তোমার তা দিয়ে দরকার কি মশায়?' ঈশ্বরও উঠে দাঁড়াল। মুষ্টি বাগিয়ে বলল, 'দরকার আছে বৈকি! তুমি তো গাঁয়ের দশটা বাড়ির চাল ডাল নিয়ে এতগুলো লোককে ভোজ দেবে—কাল উনানে হাঁড়ি চড়বে না দশটা বাড়িতে। আমি মুফতে চাল ডাল জোগাড় করে দেব। বুঝলে মশায় দরকারটা এতক্ষণে?'

'কে দেবে মুফতে চাল ডাল?'

ঈশ্বর ধনেশ সাহাকে সম্বোধন করে বলল, 'সা-মশায় দরকার মতো চাল ডালটা আপনিই দেন আজকের মতো।'

ধনেশ কিছু বলার আগেই শ্রীমন্তসহায় মাথা নেড়ে বলল, 'না মশায়, খাতিরের চাল ডাল আমরা খাইনে। পরিবার এসবে বলে কিছু চাল রেখেছি ঘরে, তা পরিবার এখন এসবে নি। আমার ঘরের চাল ডালেই ঢের হবে। খিচুড়ি হবে আর কুমড়ো ভাজা হবে। দেতো তোর কুমড়োটা গোবর্ধন—'

গোবর্ধনের হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল—পনের সেরি কুমড়োর ভার এতখানি সময়ে বড় সহজ দাঁড়ায় না। শ্রীমন্ত টানতেই কুমড়োটা মাটিতে পড়ে কয়েক খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল।

শ্রীমন্তসহায় যেন আরও উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বাপ্, এ যে বিরাট কুমড়ো তোমার গোবর্ধন! যাক যাক ওটাতো কাটতেই হত। একটা ঝোড়ায় তুলে ঘরে

দিয়ে আয় দিকি পঞ্চু। তোমাকে দেড়সের—আচ্ছা, দুসের চাল দেব গোবর্ধন—কুমোড়োটার দাম।'

ঈশ্বর মুচকে হেসে বলল, 'আপনি মহৎ লোক মশায়, তাতে সন্দ নেই। ঠকিয়ে যারা প্রাণে মারছে তাদের ঠেঁয়ে দুটি চাল বাগিয়ে নিতে অভিমানে আপনার মরণ হয়।'

ধনেশ সাহা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, 'কার কথা বলছ? কে ঠকায়? কারা প্রাণে মারছে শুনি?'

জবাব না দিয়ে ঈশ্বর বাসটি রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখতে গেল। ওষুধের দোকানের পাশে রাস্তার সঙ্গে সমতল খানিকটা জায়গা ছিল। পটল হাতল ঘুরিয়ে ষ্টার্ট দিয়ে সরে যেতেই ঈশ্বর বাস চালিয়ে দিল, পরক্ষণে তীক্ষ্ণ আর্তনাদে খড়পার আকাশ গেল চিরে। দুটি প্রাণীর আর্তনাদ। গোবর্ধনের কালো একবার আর্তনাদ করেই সামনের চাকায় পিষে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, পিছনের চাকায় লেগে ভুলির পিছনের দুটি পা ভেঙে গেছে। একটানা আর্তনাদ করতে করতে ভুলি সামনের পা দুটির সাহায্যে দেহটাকে কোনোমতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জগতের দোকানের সামনে।

গাড়িটা যথাস্থানে রেখে ঈশ্বর ফিরে এলে জগত তাকে কটু একটা গাল দিল। গোবর্ধন প্রায় আর্তনাদ করেই বলল, 'তোর কি চোখ নেই? অরে অ খুনে ব্যাটা, তোকে কি চোখ দ্যায় নি ভগ্‌মান্!'

ঈশ্বর কারো কথার জবাব দিল না, পটলকে ধরে আথালি পাথালি মারতে আরম্ভ করল।

'শূয়ার বাচ্চা, চোখ নেই তোর? বলতে পারলি নি মোকে? ইঞ্জিন ঘেঁষে ওরা ছিল, মোব সেথা নজর যায়?'

শ্রীমন্তসহায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'রাখো তোমাদের ঝগড়া। এটার কি করা যায়। কোলে করে গাঁয়ে লিয়ে যাই?'

ঈশ্বর বলল, 'ও বাঁচবে না।'

শ্রীমন্তসহায় হঠাৎ যেন কাবু হয়ে গেছে। ভিজে গলায় বলল, 'তবু একটা দুটো দিন যা বাঁচবে—'

বাসে ষ্টার্ট দেবার হাতলটা নিয়ে ঈশ্বরকে এগিয়ে আসতে দেখে সে থেমে

গেল। জগত চিৎকার করে উঠল, 'খপর্দার! তুমি আমার কুকুরের গায়ে হাত দিও না।'

মোটা খন্তি হাতে জগত ঈশ্বরকে মারতে আসছিল, শ্রীমন্তসহায় তাকে জড়িয়ে ধরে আটকে রাখল। লোহার হাতলের একটিমাত্র আঘাতে ভুলির আর্তনাদ একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে সে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এই ঠিক হয়েছে ভাই।'

খন্তি কেড়ে জগতকে শান্ত করে আবার সে বলল, 'জানি সব, ভুলে থাকি। গাঁয়ের বাইরে যাওয়া বারণ। কাঠপোড়া যত শুকনো গাঁ হোক ভাই, বাঙ্গলা দেশের গাঁ। রসে একদম টইটুম্বুর। একটা মোটে মামী মশায়—পরিবারটিকে শ্বশুরব্যাটা পাঠাই পাঠাই করে পাঠাচ্ছে না—একটা মামীর স্নেহ লেগে লেগে মনটা আঠার মত চটচটে হয়ে গেছে, কি বলব আপনাকে!'

শ্রীমন্ত সহায় সকলকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে বসিয়ে দণ্ডধারীর বাড়ির কাছে গিয়ে একবার শুধু ডেকেছে, মামী বেরিয়ে এসে দেহের মত মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কজন খাবে র‍্যা ছিমন্ত?'

কজন খাবে? সেটাতো হিসাব করে নি শ্রীমন্ত সহায়। মামী চটে বললেন, 'কজন খাবে না জানলে কি করে রাঁধব শুনি? দশ জনের কম পড়াটা ভালো, না দশজনেরটা নষ্ট হওয়া ভালো? কাণ্ডজ্ঞান থাকলেকি মামাকে তুই মারতে পারিস।'

ঈশ্বর মনে মনে হিসাব করছিল।

'আজ্ঞে, আমরা একুশ জনা খাব। উনিশ প্যাসেঞ্জার আর আমরা দুজন। তারপর ছিমন্তবাবু আছেন'—

শ্রীমন্তসহায় যোগ দিল, 'গোবর্ধনও খাবে। ওর কুমুড়োটা নেওয়া হল, ওকে দিতে হবে।'

মামী তার বিধবা বোনকে নিয়ে অল্প দূরে শ্রীমন্তসহায়ের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। উঠানের বড় চুলোটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, উনানে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি চাপান হল। শ্রীমন্তসহায়ের বাপের আমলের হাঁড়ি! দশ বছর বাদে হাঁড়িটা শুধু ধুয়ে নেওয়া হয়েছে, মেজে ঘষে নেবার সময় কোথায়!

না ডাকলেও গাঁ থেকে খিচুড়ি খেতে এল গাঁয়ের প্রায় তিনভাগ লোক, মেয়ে এবং পুরুষ তার মধ্যে কয়েকজন শুধু ভাণ করে বলল যে তারা শুধু ব্যাপারখানা দেখতে এসেছে। বাকী সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল, কারো কারো

মাথাটা শুধু নিচু হয়ে রইল আগাগোড়া। ঈশ্বর চুপি চুপি শ্রীমন্ত সহায়কে বলল, 'পেট ভরে খাওয়া কি সইবে এদের ? কাল সব কটার না অসুখ করে।'

পেট ভরে খিচুড়ি খেল গোবর্ধন, তার কুমড়ো ভাজা দিয়ে। বহুকাল একবারও এমন পেটভরে খাওয়া তার জোটেনি, শরীরটা ক্রমে অবশ থেকে অবশ-তর হয়ে আসতে লাগল। সকলের শোবার ব্যবস্থা করার কাজটাতে ফাঁকি দিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। ভরা পেট, অলস দেহ, ঘুমের আবেশ কিছুতেই কিন্তু তার মনে একটি কাঁটার খচখচানি বন্ধ করতে পারল না। গুণমতী গুড় মুড়ি পাঠায় নি। একবেলা সে আধপেটা ভাত খায়, ঘরে কিছু মুড়ি থাকলেও গুণমতী একমুঠো তার স্বামীকে পাঠায় নি !

'মুড়ি পাঠাস্ নি যে ?'

'পাঠাই নি ! মিন্সে বলে কি গো ! নান্নুকে দিয়ে পাঠালাম যে ?' নান্নুকে দিয়ে গুণমতী তবে মুড়ি পাঠিয়েছিল ? পেটের জ্বালায় নান্নুই সেটা খেয়ে ফেলেছে ? অসংখ্যবার ক্ষুধার জ্বালা সয়ে সয়ে জ্বালাটা ভুলে যাবার অভ্যাস জন্মে গেছে গোবর্ধনের। আজ সন্ধ্যার অসহ্য জ্বালাটাও সে ভুলে গিয়েছিল। তার শুধু জ্বালা ছিল অভিমানের, সেটা মিটে যেতে গোবর্ধন গভীর তৃপ্তি বোধ করল।

ঘুম আসতে কিন্তু তার দেরি হল অনেক। কতকাল পরে পেটভরা খাওয়া ! চোখ বুজে ঝিম ধরে পড়ে থাকলেও একটু চেতনা তার সজাগ হয়েই রইল।

স্বামী-স্ত্রী

রাত দশটায় মেনকা ঘরে এল। এ বাড়িতে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা চুকে যায়।

ছোট ঘর, চওড়ার চেয়ে লম্বায় দুহাতের বেশি হবে না। মেনকার বিয়েতে মেনকার স্বামী গোপালকে দেওয়া খাটখানাই ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে। খাটের সঙ্গে কোণাচেভাবে পাশ কাটানোর কৌশলে পাতাআছে গোপালের ক্যাম্পচেয়ার, চারিদিকেই চেয়ারটির পাশ কাটিয়ে চলাফেরা সম্ভব। সামনে ছোট একটি টুলে পা উঠিয়ে এই চেয়ারে চিৎ হয়ে গোপাল আরাম করে, বিড়ি মেশাল দিয়ে সিগারেট খায় আর বই পড়ে। পপুলার বই—উঁচুদরের বই যাঁরা লেখেন তাঁদের পর্যন্ত—যে-বই পড়ে সময় কাটিয়ে মনকে বিশ্রাম দিতে হয়। ঘরের এককোণে ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ, স্টিল, চামড়া আর টিনের। ট্রাঙ্কটি মেনকার বিয়ের সময় পাওয়া। রঙ এখনো উজ্জ্বল, তবে কিসে ঘা লেগে যেন একটা কোণ থেব্‌ড়ে গেছে। দেয়ালে কয়েকটি বাজে ছবি আর মেনকা ও গোপালের বড় একটি ফটো টাঙানো। শাড়ী, শাড়ী পরার ঢং, গয়নার আধিক্য আর চুল বাঁধার কায়দা ছাড়া ফটোর মেনকার সঙ্গে যে মেনকা ঘরে এল তার বিশেষ কোনো তফাৎ চোখে পড়ে না। গায়ে একটু পুরন্ত হয়েছে মনে হয়, আবার সন্দেহও জাগে। ফটোর গোপালের চেয়ে ক্যাম্পচেয়ারের গোপাল কিন্তু অনেক রোগা। এতে ফটোর ফাঁকি নেই, বিয়ের পর সত্যই গোপাল রোগা হয়ে গেছে। বিয়ে করার জন্য অথবা চাকরি করার জন্য বলা কঠিন, চাকরি আর বিয়ে তার হয়েছে প্রায় একসঙ্গে।

ঘরে এসে দরজায় খিল তুলে দিয়ে মেনকা সেমিজ ছাড়ল। খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসে জোরে জোরে পাখা চালিয়ে বলল, 'বাবা, বাঁচলাম।'

গোপাল বই নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সায় দেওয়া হাসি একটু হাসল। তারপর আবার বই তুলে নিল।

'উঃ মাগো, সেদ্ধ হয়ে গেছি একেবারে।'

এবার গোপাল বই নামাল না, পড়তে পড়তেই বলল, 'বিশ্রী গরম পড়েছে।'

'টেবল ফ্যানটা তুমি আর কিনলে না।'

'তুমি শাড়ীটা না কিনলে—'

'ন্যাংটো হয়ে তো থাকতে পারি না।'

পাখার হাওয়া গায়ে লাগাতে তাই সে এরকম হয়ে আছে। ঘর যেন

নির্জন, একজোড়া চোখও যেন ঘরে নেই। তিনমাস বাপের বাড়িতে কাটিয়ে সাতদিন আগে এখানে এসেছে। প্রথম দিন এভাবে হাওয়া খেতে পারে নি। ছি, লজ্জা করে না মানুষের! একদেহ, একমন, একপ্রাণ যারা, তিন মাসের ছাড়াছাড়ি তাদের এমনি করে দেয়, দেখা হওয়ামাত্র চট্ করে এক হয়ে যেতে পারে না। তিনমাস তারা পরস্পরকে কল্পনা করেছে, কামনা করেছে, ব্যথা আর ব্যর্থতার নিশ্বাস ফেলেছে, মুক্তির আস্বাদ আর স্বাধীনতার গৌরবে আনন্দ অনুভব করেছে শাস্তির মতো, রাত জেগেছে, আবেগের চাপে সময় সময় দম যেন আটকে এসেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কত অভিনব পরিবর্তন ঘটেছে দুজনের মনেই দুজনের। দেখা হবার পর আবার একদেহ, একমন, একপ্রাণ হতে খিল দেওয়া ঘরে একটা রাতের, অন্ততঃ আধখান বা সিকিখানা রাতের, সময় লাগবে বৈকি। যন্ত্রের পার্ট্স খুলে আবার ফিট করতে পর্যন্ত সময় লাগে—বিধাতা মিস্ত্রী হলেও লাগে।

শরীরের ঘাম শুকিয়ে গেলে মেনকা পুবের দুটি পর্দা লাগানো জানালার একটিতে গিয়ে দাঁড়াল। পাশের একতলা বাড়ির ছাতে গরম জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। তার পরের তেতালা বাড়ির সাতটা জানালা দিয়ে ঘরের আলো বাইরে আসছে। আজকাল কখন সবগুলি জানালার আলো নেভে কে জানে! বিয়ের পর কিছুদিন এ-খবরটা সে জানত। চারটে জানালা অন্ধকার হত প্রায় এগারটায়, দুটি হত বারটার কাছাকাছি, আর তেতালার কোণের জানালাটি নিভতো রাত দেড়টা দুটোর সময়। ওই ঘরটিতে কে বা কারা থাকে তাই নিয়ে সে কত কল্পনাই করেছে। অন্য সম্ভবপর কল্পনাগুলি তার মনে আমল পেত না, পরীক্ষার পড়া করতে ও ঘরে কাউকে রাত জাগতে দিতে সে রাজী ছিল না, তার কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল তেতালার ওই কোণের ঘরটিতে তাদের মতো এক দম্পতি থাকে, বিয়ে যাদের হয়েছে অল্পদিন। তাদের মতো ভালোবাসতে বাসতে কখন রাত দুটো বেজে যায় ওদেরও খেয়াল থাকে না। তারা অবশ্য আলো নিভিয়ে দেয় অনেক আগেই। বাড়ির ভেতরের দিকে তাদের জানালাটি শুধু ঘষা সার্সির, ঘরের মধ্যে নজর চলে না কিন্তু আলো জ্বলছে কিনা জানা যায়। ওদের তেতালার কোণের ঘরটিতে হয়তো আলো জ্বালিয়ে রাখার অসুবিধা নেই।

বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার দিন তারা প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিল। কিন্তু সেদিন ও বাড়ির জানালার দিকে তাকাতে খেয়ালও হয় নি। মেনকা আপন মনে আপসোসের অস্ফুট আওয়াজ করল। সে রাত্রে বড় বাড়া-

বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। একরাত্রে সব একঘেয়ে হয়ে গেল, বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে একটানা ছমাস একসঙ্গে কাটিয়ে যেমন হয়েছিল।

ঘুম আসছিল। আপসোসটাই যেন ঘুম কাটানোর বেশি কি করে দিয়ে গেল মেনকার। স্তিমিত চোখের একটু চমক আর পিঠের ঠিক মাঝখানে মৃদু শির শির। গোপাল মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। পড়ায় বাধা দিলে সে বড় বিরক্ত হয়। কিছু বলে না, কিন্তু বিরক্ত হয়।

বিছানায় ফিরে গিয়ে মেনকা ইতস্ততঃ করে, যতক্ষণ না তার মনে পড়ে যায় যে বেশি রাত জেগে বই পড়লে গোপালের মাথা গরম হয়ে যায়। ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বড় জ্বালাতন করে গোপাল। মনে হয়, শান্ত সুবোধ মানুষটা যেন বদলে গেছে, মদ খেয়েছে। এমন বিশ্রী লাগে মেনকার, এমন রাগ হয়! সে কি পালিয়ে যাবে? পরদিন সে কি ঘরে আসবে না? দিনের পর দিন? ঘুম ভাঙিয়ে একটা মানুষকে কষ্ট দেওয়া কেন—যার শরীরও ভালো নয়! অথচ সে যদি কোনো দিন দরকারী কথা বলতে মাঝরাতে গোপালের ঘুম ভাঙায়—যেদিন কোনো অজানা কারণে তার নিজের ঘুম আসে না অথবা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনটা অদ্ভুত রকম খারাপ লাগে আর সমস্ত শরীরটা অস্থির অস্থির করায় ছটফট্ করতে ইচ্ছা হয়—গোপাল শুধু বলে, কাল শুনব, সকালে শুনব!

তবু যদি সে নিজেকে তার বুকে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে করতে করুণ সুরে বলে, 'ওগো শুনছো? বুকটা কেমন জ্বালা করছে।'

'একটু সোডা খাও', বলে সে পাশ ফিরে বালিশটা আঁকড়ে ঘুমোতে থাকে। তখন মেনকার বুকটা সত্যি জ্বালা করে। নমাসে ছমাসে একটা রাতে হয়তো এরকম ঘুম আসে না অথবা এভাবে ঘুম ভেঙে যায়—হলই বা তা অম্বলের জন্য, কথা কইবার একটা সে লোক পাবে না, পাওনা আদরের একটু তার জুটবে না এই ভয়ানক দরকারের সময়! ইতস্ততঃ করার কয়েক মিনিটে আবার ঘুমটা ফিরে এসেছিল, হাই তুলে মেনকা বলল, 'শোবে না? এত যে পড়ছ, চোখ তো আবার কট কট করবে কাল?'

গোপাল বলল, 'চ্যাপ্টারটা শেষ করেই শোব, পাঁচ মিনিট।'

মেনকা শুয়ে চোখ বুজল। ঘুমে শরীর অবশ হয়ে আসবার আরাম অনুভবের ক্ষমতাটুকু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, বই ফেলে টুল ঠেলে চেয়ার সরিয়ে গোপালের উঠবার শব্দে একটু সচেতন হয়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে একবার গোপালের

মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চোখ বুজল। গোপালের মাথা গরম হয় নি, ঘুম পেয়েছে। এক নজর তাকালেই মেনকা ওসব বুঝতে পারে। গোপালের চোখ মুখের সব চিহ্ন আর সঙ্কেত তার মনের মুখস্ত হয়ে গেছে।

আলো নিভিয়ে মেনকার পা মাড়িয়ে গোপাল নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

মেনকা জড়ানো গলায় শুধোল, 'কাল ছুটি না ?'

গোপাল জবাব দিল, 'হুঁ।'

দুজনে মিনিট দশেক ঘুমিয়েছে, এমন সময় ট্যাক্সি করে বাড়িতে এল অতিথি। একেবারে পর নয়, সস্ত্রীক গোপালের ভায়রাভাই-এর ভাই রসিক। গত অগ্রহায়ণে রসিক বিয়ে করেছে। বৌকে বাপের বাড়ি রেখে আসবার জন্য আজ বারটার গাড়িতে তারা রওনা হয়েছিল, সাড়ে ছটায় কলকাতা পৌঁছে আবার রাত নটার গাড়ি ধরবে। অ্যাক্সিডেন্টের জন্য লাইন বন্ধ থাকায় তাদের গাড়ি কলকাতা এসেছে দশটার সময়। এত রাত্রে কোথায় যায়, তাই এখানে চলে এসেছে। নইলে এতরাত্রে কোন খবর না দিয়ে—

'মনে করে যে এসেছো, এই আমাদের ভাগ্যি !'

স্টোভ ধরিয়ে মেনকা লুচি ভাজতে বসল, গোপালের ভাই সাইকেল নিয়ে বার হল খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে। অন্ততঃ চার রকমের ছানার খাবার আর রাবড়ি আনবে, মোড়ের পাঞ্জাবী হোটেল থেকে আনবে মাংস। ঘরে ডিম আছে, মেনকা মামলেট বানাবে। বাড়িতে কুটুম এসেছে, নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় একটু সমারোহ করা গেল না, ছি ছি।

তবে কাল বিকেলে ওদের গাড়ি, দুপুরে ভালোরকম আয়োজন করা যাবে। মাসের শেষে টাকা ফুরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কুটুম বাড়িতে এলে টাকার কথা ভাবলে চলবে কেন !

পিসীমাকে মেনকা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'একখানা ভালো কাপড় তো বৌকে দিতে হবে, না পিসীমা ?'

'দেওয়া তো উচিত।'

বাড়িতে হঠাৎ অতিথি আসার উত্তেজনা ছাপিয়ে গোপালের জন্য এবার মেনকার মমতা জাগে। আবার এ মাসে বেচারীকে টাকা ধার করতে হবে। একটা মানুষ, খেটে খেটে মরে গেল, ভাই বোন মাসী পিসী সবাই লুটেপুটে তার রোজগার খাচ্ছে। তার ওপর আবার কুটুমের এসে অতিথি হওয়া চাই। একটা

টেবল ফ্যান কেনার সাধ পর্যন্ত বেচারার মেটে না। সেই বা কেমন মানুষ, ঘেমে-চেমে আফিস থেকে ফিরলে দশমিনিট একটু হাওয়া পর্যন্ত করে না তাকে! আজ রাত্রে পাখার বাতাস দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তবে সে ঘুমোবে। এক হাতে হাওয়া করবে, অন্য হাতে মাথার চুলে—

রসিক খেতে বসল ঘেরা বারান্দায়, রসিকের বৌকে বসানো হল ঘরে। রসিকের কাছে বসলেন পিসীমা, তার বৌয়ের ডাইনে বাঁয়ে গা ঘেঁষে বসল মেনকার দুই ননদ। পরিবেশন করতে করতে মেনকা লক্ষ্য করল, এদিকে ওদিকে নড়েচড়ে বেড়াতে বেড়াতে গোপাল রসিকের বৌকে দেখছে, আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। প্রথমে রসিকের বৌকে দেখে গোপাল যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আলাপ করতে গিয়ে লজ্জায় তাকে কাবু হয়ে পড়তে দেখে যেন একটু আহত হয়েছিল। সহজ একটা ঠাট্টায় তাকে ফিক্ করে হাসিয়ে কথা বলাতে পারায় খুশির যেন তার সীমা ছিল না। লুচি ভাজতে ভাজতে এসব মেনকা লক্ষ্য করেছে। এখন দুজনের খাওয়া তদারকের ছুতোয় ক্রমাগত বারান্দা থেকে ঘরে গিয়ে চোখ বুলচ্ছে রসিকের বৌ-এর সর্বাঙ্গে। অন্য কারো চোখে পড়বার মতো কিছু নয়। অন্য কারো সাধ্য নেই গোপালের চলাফেরা আর হাসিমুখে মানানসই কথা বলার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আবিষ্কার করে। মেনকার মতো চোখ তো ওদের কারো নেই। কিন্তু গোপাল এরকম করছে কেন? রসিকের বৌ সুন্দরী বলে? মেয়েটার রূপ আছে, একটু কড়া ধাঁচের রূপ। যে রূপ কাপড় জামায় বিশেষ চাপা পড়ে না, বরং আরও উগ্র, আরও অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তার লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির মানুষ সশঙ্ক অবস্থায় দিন কাটায়। আর রূপের অহঙ্কারে রূপসীটির মাটিতে পা পড়ে না।

গোপাল শান্ত, ভদ্র, মিষ্টি রূপ ভালোবাসে—মেনকার মতো রূপ। রসিকের বৌকে দেখে তার তো বিচলিত হবার কথা নয়।

ঘরে গিয়ে একটু খোঁচা দিতে হবে। বুঝতে হবে ব্যাপারখানা কি।

অতিথিদের খাওয়া শেষ হতেই তাদের শোয়ার সমস্যা নিয়ে পিসীমা, মেনকা আর গোপালের পরামর্শ হল।

পিসী বললেন, 'ভূপাল আর কানাই এক বিছানায় শোবে। ওর বৌকে অম্বুবিন্দুদের ঘরে দেওয়া যাক। একটা রাত তো।'

গোপাল বলল, 'না না, তাই কি হয়! নতুন বিয়ে হয়েছে, ওদের একটা ঘর দেয়া উচিত। ওরা আমার ঘরে থাকবে।'

পিসীমা ঢোঁক গিলে বললেন, 'তবে তাই কর।'

তারপর রাত একটায় বাড়ির সব আলো নিভল। গোপাল শুল ভূপালের ছোট চৌকির ছোট বিছানায়, মেনকা শুল অম্বুবিম্বু দুই ননদের মাঝখানে। রাত্রিবেলা একান্ত দুর্লভ বৌদিকে ঘটনাচক্রে কাছে পেয়ে অম্বুবিম্বুর আহ্লাদের সীমা নেই। না ঘুমিয়ে সারারাত গল্প করবে ঘোষণা করে মিনিট দশেক ফোয়ারার মতো এবং তারপর আরও দশ মিনিট ঝিমিয়ে কথা বলে আধ ঘণ্টার মধ্যে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। মেনকা রইল জেগে। গোপালকে তার কত কথা বলার ছিল, কিছুই বলা হল না। আজকের রাতটা কাটবে, এই দীর্ঘ অফুরন্ত রাত, তারপর সারাটা দিন যাবে, কিছুতে কাটতে চায় না এমন একটা দিন, রাত দশটায় সে গোপালের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাবে। ততক্ষণে বাসি হয়ে যাবে সব কথা। বলার কোনো মানে থাকবে না। তাছাড়া, পিসীমা কাল ওদের এখানে থেকে যেতে বলেছেন। কাল দিনটা বড় খারাপ, যাত্রা শুভ নয়। রসিকেরা হয়তো কালও এখানে থেকে যাবে, রাত্রে দখল করবে তার ঘর। তাহলে সেই পরশু রাত্রের আগে গোপালকে সে আর কাছে পাচ্ছে না। কি হতচ্ছাড়া একটা বাড়িই গোপাল নিয়েছে, একটা বাড়তি ঘর নেই। বাড়তি ঘর থাকবেই বা কি করে? ভাই বোন মাসী পিসীতে বাড়ি গিজ গিজ করছে। গোপালের দোষ নেই, এই বাড়ির জন্যই মাসে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া গুনছে। সকলের সুখের জন্য খেটে খেটে সারা হয়ে গেল মানুষটা। একটু রোগাও যেন হয়ে গেছে আজকাল।

নিশ্চয় রোগা হয়ে গেছে। পশু যখন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কই, আগের মতো জোরে তো ধরে নি! কাছে থাকলে আজকেই পরখ করা যেত কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাল সকালে চেয়ে দেখতে হবে গোপালের চেহারা কেমন আছে। কাল থেকে একটু বেশি মাছ দুধ খাওয়াতে হবে তাকে।

এখন গিয়ে যদি একবার দেখে আসে? ভূপাল আর কানাই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আলো জ্বালালে যদি ওদের ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে গায়ে হাত বুলোতে গেলে গোপাল যদি জেগে যায়।

আজ রাত্রে কিছু হয় না। আজ সে ফাঁদে পড়ে গেছে। হার্টফেল করে এখন সে যদি মরেও যায়, গোপালের একটু আদর পাবে না। কোনো উপায় নেই, কোনো ব্যবস্থা করা যায় না। একটা বাড়তি ঘর যদি বাড়িতে থাকত! রাত্রির স্তব্ধতা মেনকার কানে ঝম্‌ঝম্ শব্দ তুলে দেয়। ছুতো আর কৈফিয়তের

আশ্রয় ছেড়ে, যুক্তি আর সঙ্গতির স্তর অতিক্রম করে, চিন্তা তার সোজাসুজি স্পষ্টভাবে গোপালকে চেয়ে বসে। পুরানো অভ্যস্ত মিলনের পুনরাবৃত্তি। তারপর মেনকা মরে যেতে রাজী আছে।

'শুনছো ?'

একসঙ্গে শীত আর গ্রীষ্ম অনুভব করে মেনকা শিউরে উঠল।

জানালার শিকে মুখ ঠেকিয়ে গোপাল গলা আরেকটু চড়িয়ে বলল, 'ঘুমিয়েছ নাকি ? আমায় একটা অ্যাস্‌পিরিন দিয়ে যাও।'

মেনকা সাড়া দেবার আগেই ঘরের এক প্রান্ত থেকে পিসীমা বললেন, 'কে রে, গোপাল ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?'

'না গরমে মাথা ধরেছে। অ্যাস্‌পিরিন খাব। তুমি উঠো না। উঠো না কিন্তু পিসিমা। তোমার উঠে কাজ নেই।'

মেনকা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।'

'অ্যাস্‌পিরিন যে ঘরে রয়েছে ?'

'তবে অ্যাস্‌পিরিন থাক। ছাতে গিয়ে একটু শুই। ভূপালদের ঘরটাবড় গরম।'

'খোলা ছাতে শোবে ! অসুখ করে যদি ?'

'কিছু হবে না। একটা পাটি বিছিয়ে দাও।'

ঘর থেকে মেনকা পাটি আর বালিশ নিয়ে এল—একটি বালিশ। বারান্দা পার হয়ে ছাতের সিঁড়ির দিকে যাবার সময় তাদের ঘরের সামনের সার্সির জানালার কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে গোপাল চুপিচুপি বলল, 'দেখেছ ? এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে !'

সার্সি অন্ধকার। রসিকের নাক ডাকার শব্দ বাইরে শোনা যাচ্ছে। মেনকা বলল, 'ঘুমোবে না ? রাত কি কম হয়েছে !'

ছাতে পাটি বিছিয়ে মেনকা বালিশ ঠিক করে দিল। গোলাপ শুধালো, 'তোমার বালিশ আনলে না ?'

'আমিও শোব নাকি এখানে ?'

গোপাল হাত ধরতেই সে পাটিতে বসে পড়ল।—'সবাই কি ভাববে !'

গোপাল জড়িয়ে ধরতে কিছুক্ষণ তার শ্বাস বন্ধ হয়ে রইল।—'আর সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। একটা বালিশেই হবে'খন।'

তেতালা বাড়ির কোণের সেই ঘরের জনালাটা আলিসার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। এখনো সে ঘরে আলো জ্বলছে।

হলুদ পোড়া

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গাঁয়ে দু'দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝ বয়সী যোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নীচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্তীর এই রকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হৈ চৈ হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মত বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত কোনদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ীর পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মত মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুর বাড়ী ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে? বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমন ভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে সম্পর্ক

আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটু-খানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরী ছেড়ে সহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, "পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাঠে ঝুলোতে না পারি—"

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ীর পূব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের চাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাষ্টারী করে। গাঁয়ে সেই একমাত্র ডাক্তার পাশ-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস্-সি পাশ করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু'বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরীর বইএর সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারী তার বাড়ীতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু'চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু'তিনবার তরুণ-সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রী করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধবে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে। তুমি আমার কথা শোন বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও!'

গাঁয়ের যারা ভিড় করছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন! আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়! লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভাল ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিনচার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাশ ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু'জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর সাঁঝে ভর করেছেন সহজে ছাড়বেন না!'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষে তক্। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না!'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল

পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারী দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও বাছাধন রও। এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছে, নবীন ?'

'তুমি চুপ কর, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশী। কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মত এতগুলি মেয়েপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন ষ্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানী করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

একলা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মত একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময় খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোঁজ' বোঁজ' চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢ্‌লু ঢ্‌লু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।'

'চাটুয্যে বাড়ীর শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো? কে শুভ্রাকে খুন কবেছিল শুধিয়ে নাও চট্ করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিস ফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোন জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মত গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসি কাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুধ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।"

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ীর শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার

তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কাণ ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কাণে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরীপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তালগাছের গুড়ির ঘাটটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্দ্ধেকের বেশী ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ী বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোনদিক থেকে কি ভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, এই পুরাণো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ্। যা খুশী মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপর্দার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল: কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষমোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় বাড়ী থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ীর সকলের ধারণের জন্য মাদুলী নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাশ ছিল। অর্দ্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকী অর্দ্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙের মত মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাষ্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারী। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ী পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এই রকম ঘুরে উঠেছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে! অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, একমাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে পায়ে না

ধরাই ভাল। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তা হলে মুস্কিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ী চলেছে। বাড়ী গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ-ঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মত কি যেন একটা নাড়াচাড়া করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উটিপড়ি' করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশ-ঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি মাষ্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তি পিসী বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধ্যের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙ্গিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধা বাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশ পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলে-মেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসী ভূত হয়েছে।'

হলুদ পোড়া

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পূব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু'ধারের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি-ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াসায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ী আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দু'টি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু'প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোন কিছু এ বাঁশ ডিঙ্গোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভাল করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজ-কাল সে মাছ রান্না করে না, এটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু'তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট দু'মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরী না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মত ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙ্গিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপাগর্জনের মত গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙ্গিয়ে এসো! বাঁশ ডিঙ্গিয়ে চলে এসো! কি হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙ্গোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ চেরা তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল! মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

বোমা

পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়···অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক জায়গায় এখনকার মত অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশী কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজী অতি বেঠিক হিসাবও হয়ত অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন : এত বোমা ফাটে কেন?

জীবন্ত প্রশ্ন জবাব আবিষ্কার করবেই। তার ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়ত বোমা ফাটাফাটি সম্বন্ধে এমন কড়া ব্যবস্থাই হবে যে বোমা আর একরকম ফাটবেই না।

আর তার ফলে হয়তো পৃথিবী জুড়ে এমন ভীষণ নিঃশব্দ শান্তি বিরাজ করবে যে গোপালের পর্যন্ত মনে হবে আর একবার পৃথিবীটা পাক দিয়ে আসা যাক। ঘরের চেয়ে বাইরের শান্তি বেশী হলে অশান্ত মানুষের কি ঘরের টান থাকে?

আহা, এত ভাল মানুষ হয়েছে গোপাল, দোতলা একটা বাড়ীতে এত যত্নে সে এমন নিবিড় শান্তিপূর্ণ সংসার পেতেছে, রোজ রাত্রে নীল আলো জ্বালা ঘরে তাকেই বিবসনা করার অধিকার পেয়েছে, যার জন্য একবার পৃথিবীটাই সে পাক দিয়ে এসেছিল, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোমার ফাটাফাটিতে উড়ে যেতে হলেও কি আর তাকে ঘর ছাড়া করা উচিত?

এই ধরনের ভাবনাই সুধা ভাবে,—সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। সে এমন ভীরু আর চালাক মেয়ে যে আরও কয়েকটা বছর গোপালের দিনান্তের কর্মান্তিক অবসাদের সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য সে বজায় রাখবেই। এখনও স্নায়বিক দুর্বলতা সে পছন্দ করে না। এখনও হিষ্টিরিয়াকে সে ঘেন্না করে। কারণ সুধার স্নায়ু এখনও বড় দুর্বল। মাঝে মাঝে এখনও তার হিষ্টিরিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু তো একদিন সবল হবে? হিষ্টিরিয়া তো একদিন সেরে যাবে? নিজমূর্তি ধারণ করলে কি বিপদটাই না জানি তখন তার হবে!

পৃথিবীর আর কোন জীবন্ত প্রাণী বাঁচুক মরুক কিছুই তার এসে যায় না এমনভাবে সুধাকে গোপাল ভালবাসে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে

আরম্ভ করে নৈতিকনীতি পর্যন্ত চুলোয় পাঠান যায় এমনভাবে গোপাল সুধাকে ভালবাসে। তবু সুধার ভয় আর চালাকির শেষ নেই। আবার যদি গোপাল পৃথিবী পাক দিতে চলে যায়? কিছুতেই মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলছিল না বলে কথাটা বলবার জন্য একজনের কাছে আত্মসমর্পণের ভাণ করায় কুমারী অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে সাত বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে আর ভাণটা কার্যে পরিণত করা সত্ত্বেও সাত বছর পরে ফিরে এসে সেই আর একজনের বিধবা অবস্থায় পেয়েও তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে যে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। একা সে তাকে বেশীদিন বেঁধে রাখতে পারবে না। সেজন্য ছেলে মেয়ে চাই।

যে দুটি ছেলে তার আছে তারা নয়। গোপালের নিজের ছেলে মেয়ে।

ছেলে সুধার হল,—পর পর তিনটি। স্নায়বিক দুর্বলতাও সুধার কমে গেল, হিষ্টিরিয়াও বিদায় হল। কিন্তু দুই আর তিনে যে পাঁচ হয় এই হিসাবটাই তাকে করে রেখে দিল কাবু। পর পর পাঁচ ছেলে কোলে পাওয়া যে কোন মেয়ে মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার,—অদ্ভুত অকথ্য রহস্য। মেয়ে কই? কেন মেয়ে হয় না তার? গোপাল ছাড়া এ জগতে কার কাছে কবে সে কি অপরাধ করেছে যে তার মেয়ে হয় না,—হয়ত হবে না?

এবারও যদি ছেলে হয়?

টের পাওয়ার একমাসের মধ্যে সুধা দুর্ভাবনায় শুকিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ নয়, অন্য কিছু, এরকম হয়, ভাবনার কিছু নেই, টনিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করতে পারলে—

সুধা রাগ করে বলে, 'চেঞ্জ না হাতী। ছুটি তো তোমার একদিনও পাওনা নেই, কার সঙ্গে যাব?'

'তোমার দাদার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে রেখে দাদার সঙ্গে চেঞ্জে যাব—অত সখে আমার কাজ নেই।'

পাঁচবার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পাঁচবার ছেলে হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য এবার যদি মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে? সুধা টনিকও খেল না, চেঞ্জেও গেল না, খারাপ শরীর খারাপ করেই রেখে দিল। এমন কি, বেশী রকম চুল উঠে যেতে আরম্ভ করায়

চুলের সঙ্গে জীবনটাই যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল বটে তবু চুলের জন্য পর্যন্ত টনিকের ব্যবস্থা করল না।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবারও যদি ছেলে হয়?'

গোপাল উদাসভাবে বলল, 'হলে হবে।'

খানিকটা ঝিমিয়ে সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এমন কি কোন উপায় নেই, যাতে লোক ছেলে চাইলে ছেলে পায়, মেয়ে চাইলে মেয়ে?'

গোপাল হঠাৎ সচেতন হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি শুনি? তোমার হয়েছে কি?'

সুধা রেগে বলল, 'ব্যাপার পরে শুনো, আগে যা বললাম তার জবাবটা দিয়ে নাও।'

জবাব গোপাল কি দেবে? এ তো জীবন্ত প্রশ্ন নয় যে মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবার পর অনেককাল কেটে গিয়েছে বলেই জবাব একটা আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে, —জীবনের এ একটা সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ কৌতূহল। গোপাল তাই চিরন্তন যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হয়তো উপায় আছে, মানুষ তা জানে না।'

মানুষ কেন জানে না এরকম কুটিল প্রশ্ন করার মত জটিল মনোবিকার সুধার জন্মে নি, সে তাই বিনা প্রতিবাদে প্রতিদিন রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রোগা হতে হতে মাস দেড়েকের মধ্যে এমন রোগাই হয়ে গেল যে জন্মাবার আগেই মেয়েটি তার গেল মরে।

সুধা কেঁদেই অস্থির। হায়, মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে মেয়েকেই সে হারিয়ে বসল! মাথা খারাপ না হলে মেয়ে কিনা জানার আগে মেয়ে নয় মনে করে মানুষ এমন ব্যাকুল হয়? কদিন খুব কাঁদাকাটা করে সুধার মন শান্ত হবার আর স্নায়ু অবসন্ন হবার সুযোগ পেল। তার ফলে ধীরে ধীরে এল স্থায়ী বিষাদ, যা অনেকটা পরিতৃপ্তির সামিল।

পরের বার একটি মেয়ে হল সুধার। অনেকদিন পরে—প্রায় চার বছর।

এইখানে উনিশ বছরের ছেদ দেবার সুযোগে সুধার মেয়ে হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বোমা ফাটাফাটি সম্পর্কটা সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করি। এটা অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত কিন্তু সেজন্যে কিছু এসে যায় না। দুয়ে আর দুয়ে যে যুক্তিতে চার হয় দু'লাখে আর দু'লাখে সেই যুক্তিতেই হয় চারলাখ। তুলনামূলকতার ঘোরপ্যাঁচ

ছাড়া আর এর মধ্যে আর কোন বিস্ময়কর অসত্য নেই,—অতি সহজ কথা। এ যুগের চরম আর পরিণত দৃষ্টান্ত হিসাবে না ধরে সুধাকে ছেঁটে কেটে যদি যুগের মৌলিক আর অপরিণত দৃষ্টান্তে দাঁড় করান হয়, তবু দেখা যাবে এই সুধার এভাবে মেয়ে হওয়ার মত সেই সুধার অতি সামান্য রকম এভাবে মেয়ে হওয়ার জন্যই মানুষের দাঁত আর নখে বোমার রক্তপিপাসা জেগেছিল। নখের আঁচড় আর বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে যে পার্থক্য নেই, এই ধারণা পোষণ করাই প্রত্যেকের উচিত। তা না হলে তুলনামূলক ঘোরপ্যাঁচের ফাঁদে পড়ে মানুষ তর্ক আর হাতাহাতি করে,—কোন সময় নখ দিয়ে আঁচড়ায় আর দাঁত দিয়ে কামড়ায়, কোন সময় এক ঝাঁক এরোপ্লেন পাঠিয়ে বোমা বৃষ্টি করায়।

মন্দা একদিন সুধাকে বলল, 'মা আজ বাড়ী থেকো, সন্ধেবেলা অনাদি আসবে। বাবাকে বলতে পারবে না, তোমায় বলবে। তুমি বাবাকে বোলো।'

সুধা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বলল, 'অনাদি? তাই তো।'

মন্দার মুখ গম্ভীর হল, চোখ বড় হল, দৃষ্টিতে তীব্রতা এল। ভীরু মাকে একটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, 'তুমি ভাবচ এখনো আমি কচি খুকীটি আছি, না? কিছু বোঝো না, কেন ভেবে মর, কি দরকার তোমার এত ভাবনার? কাল সন্ধেবেলা সমীর আসবে—আসতে বলেছি।'

সুধার বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাগুলি সরল হতে আরম্ভ করায় ভয় পরিণত হয়েছে বুকের ধড়পড়ানিতে আর চালাকি পরিণত হয়েছে প্রায় নির্বুদ্ধিতায়। কিছুই যেন সহজে বোধগম্য হয় না। গল্পের মাঝখানে আমার গল্প ব্যাখ্যা করার মত মন্দাকে তাই আবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয়।

'আমি ওপরে থাকব। সমীর এলেই অনাদির কথাটা বলবে—বেশ হাসিমুখে বলবে, তোমাদের যেন মত আছে এমনিভাবে, বুঝলে? তারপর সমীরকে ওপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে বুঝলে?

সুধা কাতরকণ্ঠে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস মন্দা? আজ অনাদি কাল সমীর—এসব কোন দেশী কাণ্ড?'

সুধার তখনকার মুখ দেখেই যে কোন বুদ্ধিমতীর রাগ করার কথা, তবু সুধার কথা শুনেই যেন হঠাৎ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা খেয়াল করে মন্দা একেবারে ঝিমিয়ে গেল। গম্ভীর মুখ ম্লান হল, বড় চোখ স্তিমিত হল, দৃষ্টি ভিজে এল। কাঁদ' কাঁদ'

হয়ে বলল, 'কেন ভাবচ তুমি? ভেবোনা। সমীরের জন্যেই তো—না বলালে কোনদিন মুখ ফুটে বলবে ভেবেছ?

বলে সুধাকে হাত ধরে বসিয়ে তার পাশে বসে কোলে মুখ গুঁজে মন্দা আরম্ভ করে দিল কান্না। সুধার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আহা, সমীরের জন্য মেয়ে যখন তার এমন করে কাঁদছে, সমীরকে নিয়েই সে তার নীড় বাঁধুক। কি আসে যায় একটু যদি একগুঁয়ে মানুষ হয় সমীর, অনাদির সঙ্গে কবে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বলে মেয়েকে যদি এতকাল একটু পীড়ন করেই থাকে সমীর? সব ভাল যার শেষ ভাল।

তোমরা সবাই ভালো

আঠার মিনিট লেট। সারারাত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কলকাতা পৌঁছুতে আঠার মিনিট লেট করে গাড়ীটা কি অমার্জনীয় অপরাধই তার কাছে করেছে।

দিবাকর বাবুর বোন সুবালা জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ীতে ভিড় ছিল না?'

'ভীষণ ভিড়। কোনমতে একটু বসবার জায়গা পেয়েছিলাম।'

সুবালা ভাবল, ছেলেটা কি মিথ্যাবাদী! সারারাত গাড়ীতে জেগে বসে এলে কারো এমন তাজা চেহারা থাকতে পারে!

'সারা রাত ঘুমোওনি বুঝি?'

'ঘুমিয়েছি। আমার এই বাক্সে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি একেবারে নৈহাটি পৌঁছে গেছি।'

ষ্টীলের ফোঁড়ায় কণ্টকিত তার ট্রাঙ্কটির দিকে তাকিয়ে কেবল সুবালা নয় উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল। ট্রাঙ্কের ওপর বিছানা পেতে নিয়েছিল নিশ্চয়? কিন্তু বিছানা কই রমেনের? সঙ্গে তো শুধু একটা সতরঞ্চি!

'আমি তো তোষক বালিশে শুই না। চৌকিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে নিই। শক্ত বিছানায় শোয়া খুব উপকারী পিসীমা।'

পিসীমা? কাকে সে পিসীমা বলছে?

'আমি তোমার পিসীমা নই।' সুবালা প্রতিবাদ জানাল।

'পিসীমাই হন আপনি।' রমেন মৃদু মৃদু হাসছে!

'আমি তোমার এই পিসে মশায়ের বোন—ছোট বোন।' সুবালা দিবাকর বাবুকে দেখিয়ে দিল। 'তোমার পিসীমা রান্নাঘরে আছেন।'

মনে মনে সুবালা ভীষণ চটে গেল। কোথাকার হনুমান ছেলে! দিবাকর বাবুর বয়স ষাট হতে চলল, রমেনের পিসীমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আর তাকে সে মনে করে বসল পিসীমা, বয়স তার এখনো সাতাশ হয় নি! চোখে না দেখে থাকলেও এটুকু তো তার জানা আছে যে তার পিসীমার বড় ছেলেটার একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি, তার পিসীমার এখন ঠাকুরমা পদবী!

রমেন বলল, 'এই পিসীমার সম্পর্কে আপনাকে পিসীমা বলিনি। নন্দ পিসে-মশায়ের সম্পর্কে আপনি পিসীমা হন।'

শুনে কেবল সুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই থ বনে গেল। সকলের মনে পড়ল, সত্য সত্যই রমেনের সঙ্গে সুবালার দু'দিক থেকে সম্পর্ক আছে, সে তার এক পিসেমশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দিবাকর অনেক অনেক দূর সম্পর্কের পিসেমশায়, কিন্তু প্রথমে রমেনের বাবার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলে সুবালার স্বামী নন্দগোপাল তার খাঁটি মাসতুতো পিসেমশায়। ছেলেটা ভুল করেনি, সুবালাকে জন্মে কখনো চোখে না দেখে থাকলেও সে যে কে মনে মনে আন্দাজ করে তার সঙ্গে ডবল সম্পর্কের মধ্যে কোনটা বেশী লাগসই তাও স্থির করে ফেলেছে। এতো যেমন তেমন ছেলে নয়!

ইতিমধ্যে দিবাকর বাবুর স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। মানুষটা তিনি রোগা এবং লম্বা, মুখখানা বদমেজাজী। চশমার ভেতর দিয়ে রমেনকে নিরীক্ষণ করে তিনি যথাবিহিত স্নেহার্দ্র বিস্ময়ের ভদ্রতা করে বললেন, 'ওমা, তুমি চারুদাদার ছেলে?'

রমেন বলল, 'বাবাকে আপনি দাদা বলেন পিসীমা? আমি শুনেছিলাম বাবা আপনার চেয়ে ছোট।'

পিসীমা ঢক করে ঢোঁক গিলে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলি।' তারপর প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ হাত-ধুয়ে নাও।'

রমেনের প্রণাম গ্রহণের জন্য গুরুজনেরা প্রস্তুত হয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন প্রণাম করার কথাটা বুঝি তার মনে নেই। রমেন জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করায় সুবালা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'পিসীমা পিসেমশাইকে প্রণাম কর রমেন।'

'আমি তো কাউকে প্রণাম করি না, ছোট পিসীমা?'

'প্রণাম কর না।'

'প্রণাম করা ছেড়ে দিয়েছি!'

এমন ভাবে রমেন কথাটা বলল, যেন একটা তার বদ অভ্যাস ছিল, খুব মনের জোর দেখিয়ে অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে। সুবালা আর পিসীমা বাক্যহারা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিসীমার সেজ মেয়ে রানী খিল খিল করে হেসে উঠেই বিবর্ণ হয়ে চুপ করে গেল। দিবাকরবাবু ঘরে আছেন ভুলে গিয়ে সে হেসে ফেলেছিল। বাড়ীতে বিশেষ করে তার সামনে, কারো শব্দ করে হাসাটা দিবাকরবাবু পছন্দ করেন না। অন্য সময় হয়তো তিনি হাসি বন্ধ করা সত্ত্বেও রানীকে

ধমক দিতেন, এখন নবাগত ছেলেটার চমকপ্রদ পাকামিতে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ায় মেয়েকে শাসন করতে বোধ হয় ভুলে গেলেন। যতবড় বেয়াদপ হোক, বাড়ীতে যে পা দিয়েছে মোটে পাঁচ মিনিট, তার ওপর গর্জন করে ওঠা উচিত নয় ভেবে আত্মসম্বরণের অতি কষ্টকর চেষ্টায় কাতর হয়েই সম্ভবতঃ তিনি হঠাৎ ধপ করে চৌকিতে বসে পড়লেন। চৌকীটা কচ্‌মচ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল। দিবাকর বাবুর দেহটি প্রকাণ্ড, চুলে পাক ধরলেও গায়ে তার এখনো অসম্ভব জোর। এই কদিন আগে তার বিরাট থাবার থাবড়া খেয়ে মেজছেলে সুকান্ত ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সকলের মুখের ভাব দেখে রমেন কি বুঝল সেই জানে, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'তাই বলে গুরুজনদের ভক্তি করি না ভাববেন না কিন্তু ছোট পিসীমা। মানুষের পায়ে কত ধুলোবালি ময়লা লাগে, পায়ে হাত দেয়া উচিত নয় বলে প্রণাম করি না। বাবাও তাই বলেন। গুরুজনকে ভক্তি করি, পায়ের ময়লাকে তো ভক্তি করি না। একজনের পা থেকে ময়লা নিয়ে নিজের কপালে লাগানোর কোন মানে হয়?'

দিবাকরবাবু আর সামলাতে পারলেন না, সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, 'মানে বুঝেছি। তুমি একটি এক নম্বরের জ্যাটা ছেলে। যা, ওঘরে যা।'

রমেন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, একপা দিবাকরবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল 'রাগ করলেন পিসেমশাই?'

দিবাকরবাবুও নির্বাক্ বিস্ময়ে একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চৌকী ছেড়ে উঠে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন আপন মনে বলল, 'পিসেমশাই রাগ করেছেন।'

সে যেন বুঝতে পারছে না কেন দিবাকরবাবু রাগ করলেন, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না দিবাকরবাবু সত্য সত্যই রাগ করেছেন।

বেলা তখন প্রায় ১১টা বাজে। রমেনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও ছিল না। লোক তো বাড়ীতে কম নয়, নাওয়া খাওয়ার হাঙ্গামাও তাদের সহজ নয়। তাছাড়া আশ্রিত হিসাবে বাড়ীতে থাকবার জন্য যে এসেছে তাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হবার গরজই বা হবে কার।

রমেনের ট্রাঙ্কটা বৈঠকখানা থেকে ভেতরের একটা ঘরে নিতে সাহায্য করে সেই যে চাকরটা কোথায় গেল আর তার পাত্তা নেই। দরজার সামনে দিয়ে

যাবার সময় সুবালা একবার রমেনকে চান করে নিতে বলে গেল, আর কেউ খবর নিতে এল না। ঘরটা বেশী বড় নয়, দুটি চৌকি একটি টেবিল আর দু'খানা রঙ করা লোহার চেয়ার আছে। দুটি চৌকিতেই বিছানা গুটানো আছে। একটি সুকোমলের, অন্যটি দিবাকরবাবুর ছোট ভাই সুধাকরবাবুর শালা রঞ্জিতের। টেবিলের একপাশে আই, এ, ক্লাসের বই, বাকী অংশ জুড়ে স্কুলের নীচু ক্লাসের ইংরাজী বাংলা অঙ্কের মলাট ছেঁড়া বই আর খাতা ছড়ানো। দেয়ালে বসানো কাঠের তাক দু'টিতে ঘুড়ি লাটাই, মার্বেল, রবারের বল, টিনের কৌটা, কাগজের বাক্স থেকে শুরু করে পালিশ-চটা জুতো পর্যন্ত কি যে নেই বলা কঠিন। সুকোমল আর রঞ্জিৎ এ ঘরে থাকে এবং বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক ছেলে-মেয়ে দু বেলা এ ঘরে বসে নকুল মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করে।

সুকোমল সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে দু'চারটি কথা বলার চেষ্টা করে রমেন সুবিধা করতে পারল না। কাটা কাটা জবাব দিয়ে সুকোমল কুটিল চোখে তাকে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল। রমেন যখন ট্রাঙ্ক খুলে তার বই আর কাপড় বার করছে, হঠাৎ সে চিবিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় ওপরে ভাল ঘরে থাকতে দেবে।'

'ঘর খালি নেই নিশ্চয়।'

'নেই? দেখে এসো না আছে কিনা। দোতলায় আছে তিন তলায় আছে।' সব বড়মামার নিজের লোকের দখলে—এক একজনের এক একটা ঘর! খাটে না শুলে বড় মামার ছেলেমেয়েদের ঘুম আসে না।'

'খাটে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো।'

সুকোমল ফোঁস করে উঠল, 'আমরা কেন নীচের স্যাতস্তেঁতে ঘরে গাদাগাদি করে থাকব?'

'পিসেমশায়ের ভাইও তো নীচের তলায় থাকেন ভাই।'

'সাধে থাকেন? বাত নিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারেন না বলে। ছোট মামীরা ওপরে থাকেন।' রাগে অভিমানে সুকোমলের মুখখানা বাঁকা দেখায়, 'এই তো সবে এলে। দু'দিন থাকো, টের পাবে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে তাই যেন ঢের!'

রমেন এক গাল হেসে বললে, 'ধেৎ, তাই কখনো হয়? খারাপ ব্যবহার যদি

করবে, বাড়ীতে থাকতে দেবার দরকার। মনে কষ্ট দেবার জন্যে কেউ কাউকে ইচ্ছে করে বাড়ীতে রাখে নাকি ?'

সুকোমল হতভম্বের মত বলল, 'রাখে না ?'

রমেন বলল, 'কেন রাখবে ? একজনকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট হয়, মিছামিছি নিজে কষ্ট পাবে এমন বোকা কেউ নয় ভাই। আমরা জোর করে থাকতে আসতাম তা'হলে বরং কথা ছিল। তা তো আমরা আসিনি। আমার কথা ধরো। বাবা পিসেমশাইকে লিখলেন আমি এখানে থাকতে পারব কি না, পিসেমশাই জবাবে আমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন। লিখলেন, কোন অসুবিধে নেই। অনাদর করবার জন্যে আমাকে ডেকে আনার তাঁর কি দরকার ছিল ? বাবাকে তাহলে লিখে দিতেন সুবিধে হবে না।'

কথা বলতে বলতে রমেন টেবিলে ছড়ানো বইগুলি গুছিয়ে ফেলেছে। বইখাতা সমস্ত টেবিল জুড়ে ছিল, এখন দেখা গেল টেবিলে অনেক জায়গা। তাকের জঞ্জালগুলি সরিয়ে, নামিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে জায়গা খালি করতে করতে রমেন হঠাৎ বলল, 'তুমি ওপরের ঘরে থাকবে ভাই ? আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

রমেন ব্যবস্থা করে দেবে! সেই যেন বড়ীর কর্তা। সুকোমল চটে গিয়ে একটা ব্যঙ্গোক্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হল রমেন বাহাদুরী করে নি, ওপরে তার থাকবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতায় নিজের বিশ্বাসটা শুধু প্রকাশ করছে।

'আমার দরকার নেই।—সুকোমল জবাব দিল।

এগারটা পর্যন্ত নীচের তলায় কোন রকম গোলমাল ছিল না, তারপর এমন হৈ চৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল যেন হাট বসেছে।

সুকোমল বলল, 'বড় মামা ওপরে গেলেন।'

এ বাড়ীতে দিবাকর বাবুর প্রচণ্ড শাসন কেবল তার নিজস্ব সুখসুবিধা আর জ্বালাতন হওয়া না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চোখ আর কাণের আড়ালে কি ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই, তাঁর সামনে সবাই ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করবে, জোরে কথা বলবে না, হাসবে না, ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত চেঁচামেচি দুরন্তপণা বন্ধ রাখবে—এইটুকু হলেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই তিনি একতলায় নামলে দোতালা হাঁফ ছেড়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, দোতলায় শুরু হয় চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। বড়রা অবশ্য মারামারিটা করে না, সেটা ছেলেমেয়েদের

একচেটিয়া হয়েই থাকে, বড়রা শুধু তাদের মারে। যখন তখন যার যাকে খুশী হরদম মারে। মনের মধ্যে সকলে যেন কি জ্বালা পুষে রেখেছে, ছোটদের ওপর কারণে অকারণে ঝাল না ঝেড়ে থাকতে পারে না।

নিজের বইখাতা গুছিয়ে রমেন একা ঘরে বসে আছে। সুকোমল বলেছিল, সারাদিন না খেয়ে ঘরে বসে থাকলেও কেউ আর তাকে ডাকতে আসবে না। রমেন তা স্বীকার করেনি এবং তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্য তাকে নাইতে পাঠিয়ে নিজে প্রতীক্ষা করছে। তেল মেখে গামছা হাতে সে একেবারে তৈরী হয়ে আছে, দু'চার মিনিটের মধ্যেই যে আদর আহ্বান আসবে তাতে যেন তার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সত্য সত্যই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে এলেন। ঠিক নাইতে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে নয়, পরিচয় করতে। রমেনের বেয়াদবির গন্ধ ইতিমধ্যেই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে উপন্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মনোরমা এতক্ষণ তাই শুনছিলেন। দিবাকরবাবুর স্ত্রী অনুপমা আর সুধাকর বাবুর স্ত্রী মনোরমা এই দু'টি জা'য়ের মনের গতি সর্বদাই পূব আর পশ্চিমের মত পরস্পর-বিরোধী। একজন লালপাড় শাড়ী পরলে অন্যজন পরেন কালোপাড় শাড়ী, একজন রুইমাছ খেলে পরে অন্যজন খান কৈ মাছ, একজন কারো নিন্দে করলে অন্যজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। একজনের কোন ছেলে বা মেয়ে পর্যন্ত যদি অন্যজনের একটু বেশী আদর পায় নিজের সেই ছেলে বা মেয়েকে ধরে তার মা আচ্ছা করে পিটিয়ে দেন। এখন, রমেন যখন আজ এল, মনোরমার কাছে সংবাদ ঠিকমতই পৌঁছেছিল কিন্তু অনুপমা তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন বলে তিনি তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাওয়ারও উচিত মনে করেন নি। তারপর অনুপমা যখন তীব্রভাবে রমেনের নিন্দে শুরু করলেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে দিলেন যে বাড়ীর ছেলেদের মাথা খাবার জন্য এ শনিগ্রহকে তিনি বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবেন না, দু'চারদিন দেখে দূর দূর করে খেদিয়ে দেবেন, তখন মনোরমার মনে হল এই তেজী সুবিবেচক, আদর্শ চরিত্র ছেলেটির সঙ্গে তো অতি অবশ্য তাঁর ভাব করা দরকার! ঘরে ঢুকেই তাই হাসিমুখে অত্যন্ত মিষ্টি স্বরে বললেন, 'একলাটি বসে আছো বাবা? বাড়ী ছেড়ে এসে মন কেমন করছে?'

রমেন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

মনোরমা একটু ভড়কে গেলেন। এত বড় ধাড়ী ছেলের মুখে এমন ধারা জবাব

কি শোভা পায় ? বাড়ীর জন্য মন কেমন করার অভিযোগ রমেন অস্বীকার করলে তিনি তাকে কি বলবেন মনে মনে তাই মনোরমা ঠিক করে রেখেছিলেন, চার পাঁচ বছরের ছেলের মত সে সহজ সরল জবাব দিয়ে বসায় তাকে এবার কি বলবেন খানিকক্ষণ তিনি ভেবেই পেলেন না। বোকা হাবা নয়তো ছেলেটা ? মাথার কোন দোষ নেই তো ?

সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের অনভ্যস্ত ধাক্কা সামলে মনোরমা তারপর বললেন, 'প্রথম দু'চার দিন ওরকম লাগবে বাবা। তা আমরাও তোমার পর নই। আমি হলাম গিয়ে তোমার—' মনোরমা থমকে থেমে গেলেন। তিনি রমেনের কে হন ? দূর সম্পর্কের পিসীমার জা'এর সঙ্গে কি সম্পর্ক হয় !

'আপনি আমার ভালো পিসীমা।'

পিসীমা ? তাই বটে, রমেনের পিসীকে তিনি যখন দিদি বলেন, তিনিও রমেনের পিসীমা হন বটে। কিন্তু ভালো পিসীমা কেন ? ছোট, বড়, মেজ, সেজ, রাঙা কালো মাসী পিসী দিদি বৌদি শুনেছেন, ভালো-পিসীমা তো শোনেন নি কখনো ! তিনি কি ভালো ? রমেন কি দেখেই চিনেছে তিনি মানুষটা মন্দ নন, মন তার ভালো ? মনোরমা একটা বিস্ময়কর আনন্দ অনুভব করেন। অনেক দিন ধরে মনের ওপর যেন একটা ভার চাপানো ছিল, ভারটা হাল্কা হয়ে গেছে। কতকাল ধরে শুনে আসছেন তিনি হিংসুটে, স্বার্থপর, ঝগড়াটে এবং আরও অনেক কিছু ! শুনতে শুনতে ধারণা জন্মে গেছে যে তিনি সত্যই তাই। হিংসা, স্বার্থপরতা আর ঝগড়াঝাটি নিয়েই দিনও তার কাটছে বৈকি ! রমেনের কথা শুনে হঠাৎ মনে হল, ওসব কিছু নয়, অনেক কাল আগে অল্প বয়সে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন,—সাদাসিদে ভালোমানুষ। তিনি ভালো।

কাছে বসিয়ে আদর করে মনোরমা রমেনকে খাওয়ালেন। অনুপমার পিত্তি জ্বলিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, খাসা ছেলে দিদি। ছেলে-মেয়েদের একটিবার ধমক দিলেন না, কারো দিকে কড়া চোখে তাকালেন না, ছেলেবুড়ো চাকর দাসী প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইলেন হাসিমুখে। মনে হতে লাগল, খোলস ছেড়ে মনোরমা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। খাওয়ার পর তিনি রমেনকে বললেন, এইটুকু ঘরে কি তিনজনের জায়গা হয় ? তুমি ওপরে থাকবে রমেন ?'

তখন রমেন বলল, 'ভালো-পিসীমা, আমি এ ঘরে থাকি, সুকোমলকে ওপরে নিয়ে যান।'

মনোরমা হেসে বললেন, 'এ ঘরে থাকতে চাও তুমি? বেশ বাবা, তাই হবে। সুকোমল ধীরেনের ঘরে যাক্, তুমি এখানেই থাকো।'

এ ব্যবস্থায় খুশী হওয়ার বদলে সুকোমল কিন্তু ভয়ানক চটে গেল। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগল কি না। এতদিন বাড়ীর লোকের উপেক্ষায় তার অভিমানের সীমা ছিল না, আজ তাদের পক্ষপাতিত্বে সে হিংসায় পুড়তে লাগল। তাকে কেউ গ্রাহ্যও করে না, রমেনের মুখের কথায় তার দোতলায় ভাল ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাড়ীতে পা দিয়েই ছেলেটার এতখানি প্রতিপত্তি জন্মে গেছে?

কৃতজ্ঞতা বোধ করার বদলে রমেনের বিরুদ্ধে সে তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, উপকার করার বদলে রমেন তাকে ভীষণ অপমান করেছে। মনটা তার আরও বেশী খিচড়ে গেল, ওপরের ঘরে যেতে একান্ত অনিচ্ছা জানাতেও কেউ যখন তার কথা কানে তুলল না, ধমক্ দিয়ে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দোতালায়।

কেবল সুকোমল নয়, অনুপমারও এমন রাগ হল বলবার নয়। একে তো প্রথমেই রমেনের ব্যবহারে তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তার ওপর তার সম্পর্কে তার বাড়ীতে এসে মনোরমার দলে ভিড়ে তাকে যে অপমানটা সে করল তার জ্বালা চেপে রাখতে গিয়ে গায়ে জ্বর আসার মত শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন। মুখে যাই বলুন, দু'দিন দেখে সত্যি সত্যি কি আর রমেনকে তিনি তাড়িয়ে দিতেন? এখন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, তেরাত্রি পোয়ানোর আগে ছোঁড়াটাকে তিনি বিদেয় করবেন, কাণ্ড করে ছাড়বেন একটা। তাকে ডিঙ্গিয়ে তার ভাইপোকে ছোট-বৌ কিসের জোরে দখল করে তাও দেখে নেবেন।

দুপুরবেলা একবার অনুপমার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে রমেনের সঙ্গে তাকে গল্প করতে দেখে মনোরমার চশমা-পরা চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হল।

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, না, আগে রমেনকে বাড়ী থেকে তাড়ান হবে না। আগে শিক্ষা দিতে হবে ছোট-বৌকে। রমেনকে বশ করে ওকে দিয়ে অপমান করতে হবে। ডাকলে রমেন ছোট-বৌয়ের কাছে যাবে না, কথা বললে শুনবে না, অবজ্ঞা দেখাবে, অপমান করবে—এই যদি করতে পারেন, তবেই অনুপমার বেঁচে থাকা সার্থক।

রমেনকে দেখেই সকলের মনে যে একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল সেটা একেবারেই অমূলক নয়। ছেলেটাকে আয়ত্ত করা একরকম অসম্ভব। তাকে স্নেহ করার, খাতির করার, খুশি করার আঘাত দেওয়ার কোন প্রচলিত পদ্ধতি কারো জানা নেই। নিজে থেকে কাউকে সে এড়িয়ে চলে না, কারো সঙ্গে বেশী খাতির জমানোর চেষ্টা করে না, একজনকে ছোট করে আরেক-জনকে বড় করার এতটুকু উৎসাহও তার নেই। বেশী বেশী আদর যত্ন স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে বশ করা যেমন অসম্ভব, অবজ্ঞা করে নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে তাকে কাবু করাও তেমনি অসম্ভব। মমতা আর অবহেলার দাম তার কাছে যেন সমান। কয়েকদিনের মধ্যে তার ব্যাপার দেখে অনুপমা আর মনোরমার দু'জনেরি ধাঁধা লেগে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের দু'জনের মধ্যে কেউ রমেনের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব অর্জন করতে পারলেন না। কিশোর সন্ন্যাসীর মত সে যে একেবারে নির্বিকার হয়ে থাকে তা নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মত খুশী হয়ে উঠে, কিন্তু গলে পড়ে না। ভালবাসা দেখানোর আগে যেমনটি ছিল পরেও তেমনি থাকে। লেজও নাড়ে না, পা'ও চাটে না!

প্রথমদিন অনুপমা ভেবেছিলেন, মনোরমা আগেই ভাব আরম্ভ করেছে তার সঙ্গে তিনি বোধ হয় পাল্লা দিতে পারবেন না। বিকেলে মিষ্টি আনিয়ে লুচি ভেজে রমেনকে খেতে দিলেন। অন্য সকলেই অবশ্য লুচি আর মিষ্টি খেল, কিন্তু তার মিষ্টি কথাগুলি পেল শুধু রমেন। পুলকিত হয়ে অনুপমা লক্ষ্য করলেন, এ বাড়ীতে তাকেই যেন সে আপন মনে করে, তার স্নেহ আর যত্নই সে যেন চায়, এমনি ভাব রমেনের। নতুন পরিচয়ের সঙ্কোচ নেই, পর মনে করা নেই। কি আগ্রহের সঙ্গেই রমেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই প্রাইজগুলি আছে পিসীমা? দেখাবেন আমায়?'

কবে সেই অল্প বয়সে সেলায়ের কাজ আর গানের জন্য অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন, বাপের কাছে শুনে সেগুলি দেখবার জন্য রমেন উৎসুক হয়ে আছে। মনটা অনুপমার কেমন করে উঠল। কই, দশবিশ বছরের মধ্যে কেউ তো কোনদিন জানবার আগ্রহ দেখায়নি তার এককালে বিশেষ কি গুণ ছিল, কিসের জন্য বাড়ীতে আর পাড়াতে এককালে তিনি সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতেন! আজ আড়ালে লোকে তাকে শুঁটকি মাছ বলে, তার মাথায় নাকি ছিট আছে, সাদা চোখে তাকালে ছেলেপিলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে বলে তিনি নাকি চশমা

পরে থাকেন! সত্যই কি তিনি এই রকম মানুষ? বড় ট্রাঙ্কের তলা থেকে খুঁজে পেতে পুরানো দিনের প্রাইজগুলি দেখাবার সময় রমেনের চোখভরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দেখে তো তার মনে হচ্ছে আজও তিনি সেই আগের অনুপমার মতই আছেন, যার হাসিখুশী ভাব আর মিষ্টি স্বভাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত, পাড়ার মেয়ে বৌ ভিড় করে যার কাছে আসত সেলাই শিখতে আর গান শুনতে!

অনুপমা স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন ভেতরটা তার অনেক দিন শুকনো হয়ে ছিল আজ হঠাৎ একটা মধুর রসালো আবেগে ভিজে সরস হয়ে উঠেছে। ঠিক এই রকম মনের অবস্থা ছিল বলে সন্ধ্যার পর মনোরমার ঘরে রমেনকে দেখে রাগ হবার বদলে তার খুব অভিমান হয়ে গেল। খানিক পরেই রানীকে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে উদাসভাবে বললেন, 'আমার নিন্দে শুনতে বেশ ভাল লাগছিল, না বাবা? আমি তো মন্দ আছিই—'

'না, পিসীমা।'

অনুপমা কাতর হয়ে বললেন, 'তুমি কি জানবে, সবাই আমায় মন্দ বলে। যার জন্যে যত করি তার কাছে আমি তত মন্দ।'

রমেন হেসে ফেলল। অনুপমা যেন হাসির কথা বলেছেন এমনি ভাবে হেসে ফেলল।—'কেউ মন্দ বলে না পিসীমা। আপনি কেন মন্দ হতে যাবেন? ভালো-পিসীমা নিন্দে করেন নি, দুঃখ করছিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালবাসতেন ভালো-পিসীমাকে, এখন আর বাসেন না। শুনে আমি কি বললাম জানেন?

'কি বললে?'

বললাম, 'তা নয় ভালো-পিসীমা, পিসীমার শরীর ভাল নেই। তাই আগের মত আদর যত্ন করতে পারেন না। সত্যি নয়?'

সত্যি নয় আবার! আজ কতকাল ধরে কত অসুখে ভুগছেন পিসীমা কে তার খবর রাখে! কে তাকিয়ে ছাখে তার দিকে, তিনি মরলেই বা কার কি এসে যায়। সংসারের জন্য উদয়াস্ত তিনি খেটে যাবেন, সকলের ভাবনা ভেবে জর্জরিত হবেন, তা'হলেই সবাই খুশী। কিন্তু এ'ছেলেটার দয়ামায়া আছে, দেখেই বুঝতে পেরেছে তার শরীর ভাল নয়।

'ছোট বৌ কি বললে?'

'বললেন স্বর্ণসিন্দুর খেলে আপনার উপকার হবে। ওঁর এক মামা কবিরাজী করেন, তার কাছে খাঁটি ওষুধ পাওয়া যায়, আমিয়ে দেবেন বললেন!'

অনেককাল পরে সেদিন রাত্রে হেসেলে খেতে বসে অনুপমা আর মনোরমার মধ্যে কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের গল্প হল!

তারপর কাটল অনেকগুলি দিনরাত্রি। বাড়ীর অসংখ্য সংঘর্ষ, ছোট আর বড়, সামান্য ও সাংঘাতিক, যেন আপনা থেকে উপে যেতে লাগল অতীতে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল বাড়ীতে।

সবাই ভাবতে লাগল, আমি ভালো। আমি কেন খারাপ হতে যাব?

চুরি চুরি খেলা

দ্রষ্টব্য খুব বেশী অসাধারণ নয়, কিন্তু কমলার দেখিবার ভঙ্গিতে মনে হয় এ যেন পৃথিবীর অপূর্ব দৃশ্য।

মাঠের দক্ষিণে একসারি নিষ্কম্প নারিকেল তরু, মাঠের মাঝখানে পাতা-ঝরা একটি পেয়ারা গাছ, উত্তরে আমবাগানের জমাট শ্যামলতা এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধচক্রাকার ইটবাঁধানো লাল পথ। পথের ধারে, ঘোষসাহেবের সাদা বাড়ীর সামনে, টেলিগ্রাফ পোষ্টে হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে। রায়বাবুদের জমাদার কিষণ প্রত্যহ দুইবেলা গাভীটিকে আনিয়া ওই পোষ্টে বাঁধিয়া ঘোষ-সাহেবের চাকরের সামনে খাঁটি দুধ দুহিয়া দিয়া যায়।

নিকটে বাছুরটি দাঁড়াইয়া আছে, নিষ্কম্প, নিশ্চল,—বীভৎস। দু'মাসের বাছুরটি মানুষের সীমাহীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পনের দিন আগে মরিয়া গিয়াছিল, মানুষ তবু তাহাকে রেহাই দেয় নাই। চামড়া ছাড়াইয়া নিয়া ভিতরে খড় পুরিয়া কাঠের পায়ে সামনে দাঁড় করাইয়া প্রতিনিয়ত গাভীটিকে প্রতারণা করিতেছে।

নির্বোধ পশু মৃত্যু বোঝে না। ক্রমাগত চাটিয়া চাটিয়া সন্তানের নিথর অঙ্গে জীবনের সাড়া আনিবার চেষ্টা করে। এতদূরে জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার গভীর কালো চোখের সকাতর চাহনি কমলা যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়। তার চোখ জ্বালা করিতে থাকে, সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে কিষণকে অভিশাপ দেয়, মানুষকে ঘৃণা করে।

তার মনে পড়ে ফুকা নামক প্রক্রিয়ার কথা, গরুর দুধ বাড়ানোর যে বীভৎস উপায়ের কথা কিছুদিন আগে সে শুনিয়াছে। কমলার মনে হয় মানুষ পারে না এমন কাজ নেই।

মাথা ঝিম-ঝিম করে কমলার।

কমলা এদিকের জানালায় সরিয়া আসে।

নীচে ফুলের বাগান, বাগানের শেষে ফল-বাগিচা। তাহার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের ঘর তিনখানা এ বাড়ীরই পরিসীমার অন্তর্গত। গাছের ফাঁক দিয়া ঘর তিনখানির দিকে কমলা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

তার চোখ দিয়া ত্ব'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

বারান্দায় জুতার শব্দ হয়।

স্বামীর পদশব্দ কমলা চেনে তবু সে যেন চমকাইয়া ওঠে। ছিটকাইয়া গিয়া সে দরজায় খিল তুলিয়া দেয়।

ছোট ছোট নিশ্বাসের দোলনে তার অপরিপুষ্ট স্তন তুটিতে দোলা লাগে। কমলা ব্লাউজের বোতাম লাগায় না। লোকের সামনে শুধু শাড়ীর আঁচলটা গায়ে জড়ায়।

দরজায় টোকা দিয়া খানিকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অনন্ত ম্লান মুখে ফিরিয়া যায়। ঘরের মাঝখানে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা যতক্ষণ শোনা যায় কাণ পাতিয়া তাহার পদশব্দ শোনে।

তার চোখ ছল ছল করে।

আজ কিন্তু অনন্ত ফিরিয়া গেল না। রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল, আমার সাড়া পেয়ে দরজা বন্ধ করলে যে? মুখ দেখবে না?

খুলচি।

খিল খুলিতে কমলার অনাবশ্যক সময় লাগিল। হাতে সে ত্ব'গাছা শাঁখা পরিয়াছে, খিল খুলিবার সময় সরু রুলির পাশে শাঁখা তুটি কি চমৎকার মানাইয়াছে চোখে পড়ায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

অনন্তের বয়স ত্রিশ বত্রিশ, সুঠাম চেহারা। শরীর দেখিয়া স্বাস্থ্যের অভাব অনুমান করা যায় না, চোখ ত্ব'টি কিন্তু তাহার সর্বদা ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। যারা হাইপাওয়ারের চশমা ব্যবহার করে, চশমা খুলিয়া রাখিলে তাদের চোখ যেমন ঢুলু ঢুলু দেখায় তেমনি।

হাসিয়া বলিল, এ যেন আমার নিদ্রাপুরী কমলা। তুয়ার খুলেও খুলতে চায় না।

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

কমলার মুখ দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া অনন্ত বলিল, বিরক্ত করলাম?

না।

কিন্তু মুখ দেখে যে মনে হয় বিরক্তির সীমা নেই! মনে হয়—

কি মনে হয়?

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, মনে হয় এটা যেন জেলখানার সেল, আর তুমি

তার কয়েদী। তোমায় জেল দিয়েছে হাকিম, কিন্তু নিরপরাধ জেলারকে দেখে রাগে চোখ লাল করে ফেলেছ!

কমলা মৃদুস্বরে বলিল, রাগে নয়।

অনুরাগে?

এই পরিহাসের জবাবে কমলা নীরব হইয়া রহিল। খাটের প্রান্তে বসিয়া তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত বলিল, ভূষণের অন্তর্দ্ধান, বসনের বিদ্রোহ! এ শাড়ী তোমার কে এনে দিয়েছে শুনি?

আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

এনে দিয়েছে কে?

আমি আনিয়েছি।

আমি এনে দিই নি।

কে এনে দিয়েছে শুনবে? সুশীলবাবু।

অনন্তের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

সুশীল? ওকে বরখাস্ত করতে হবে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া অনন্ত গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিল।

কমলা বলিল, বরখাস্ত করতে হবে কেন? আমার আদেশ পালন করেছে বলে?

না। আমার আদেশ পালন করেনি বলে।

কমলা ম্লান ভাবে হাসিল, ও! তবে বরখাস্ত করতেই হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অনন্ত বলিল সুশীলের স্পর্দ্ধা এত বেড়েছে কেন জান কমল? ওর ছেলেকে তুমি অতিরিক্ত আদর কর বলে।

কমলা উদাস ভাবে বলিল, হবে! কিন্তু এ স্পর্দ্ধা নয়। এতে আমি ওঁর বিনয়ের লক্ষণই খুঁজে পাই। কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করছ কেন? দিও তুমি সুশীল-বাবুকে বিদায় করে!

অনন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার চুরুটের ধোঁয়া পাক খাইতে খাইতে উপরে উঠিতে লাগিল; মন্থর গতি। এদের কলহও এমনি অলস, এমনি সংক্ষিপ্ত, এমনি ভীরু। কেহ রাগ করে না, ধৈর্য হারায় না, কড়া কথা বলে না। এই যে সামান্য একটু আলোচনা হইয়া গেল ইহা শুনিয়া বাহিরের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, সুশীলকে বরখাস্ত করিতে না পারিলে অনন্ত বহুদিন

ধরিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে, পারিলে তাহার জের কমলা সহজে মিটিতে দিবে না। কিন্তু ইহাদের অভিজ্ঞতা এমনি প্রচুর যে ভবিষ্যতের এই অতিরিক্ত দুর্গতির সম্ভাবনায় সন্দেহ করিবার সুযোগও পায় না। সুশীল থাক্ বা যাক্, আজ হইতে দু'জনের সম্পর্ক আরও বৈচিত্র্যহীন আরও নীরস হইয়া উঠিবে, কমলা চট পরিয়া থাকিলে অনন্ত তাহা দেখিতে পাইবে না, অনন্তের কোন কথার মৃদুতম প্রতিবাদ করিতেও কমলা ভুলিয়া যাইবে!

কমলার চোখ জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। একি জীবন। আনন্দের অভাব শুধু নয়, নিরানন্দের প্রাচুর্য! অথচ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুল অনন্ত অনেক করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভুল নিন্দনীয়, কিন্তু পরমাত্মীয়ের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিতে-তো খুব বেশী উদারতার প্রয়োজন হয় না? কেন সে তা পারে না? তা ছাড়া এ তো ক্ষতি, নিজেকে অধিকতর বঞ্চিত করা।

চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অনন্ত বলিল, সময় সময় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি লজ্জা পাই কমল।

সে তো আমারি লজ্জা।

তা বটে! কতদিন আমরা পরস্পরের কাছে লজ্জিত হয়ে আছি?

কমলা বলিল, মনে নেই।

মনে না থাকা আশ্চর্য কিন্তু অসঙ্গত নয়। অনন্ত আর কিছু বলিল না।

লঘুপদে ঘরে ঢুকিল মাধুরী। কোলে তার বছর দেড়েকের একটি রুগ্ন শিশু। শিশুটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছিল।

কমলার দিকে খোকাকে বাড়াইয়া দিয়া মাধুরী বলিল, গিয়ে থেকে কাঁদছে। বাপমার কাছে এক ঘণ্টা ছেলে থাকতে চায় না একি লজ্জা বলুন ত?

বলিয়া সে সকৌতুকে হাসিল। সে হাসিতে লজ্জার চিহ্নও ছিল না। কমলাই চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, খোকাকে কোলে নিয়া অপরাধীর মত বলিল, সুশীল বাবু কি বললেন?

মাধুরী হাসিল, কি আর বলবে? সখ মিটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কথাতো শুনবে না। সকাল থেকে বল্‌ছি, কি হবে খোকাকে এনে? থাকবে তোমার কাছে খোকা? তা কেবলি বলতে লাগল, নিয়েই এসো না একবার খোকাকে, দুদিন যে ওকে আমি দেখিনি। অসুখ হলে ওর ন্যাকামি যেন বেড়ে যায়।

কমলা নীরবে জানালায় গিয়া দাড়াইল।

দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন মাধুরীর ছিল না কিন্তু কমলার পিঠে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। পরের কোলে গিয়াই ছেলে যে চুপ করিয়াছে এতে তার যেন কৌতুকের সীমা নাই। ছেলে পর হইয়া যাওয়ার আনন্দ যথাসাধ্য উপভোগ না করিয়া সে যেন এখান হইতে নড়িবে না।

অনন্ত স্তিমিত নেত্রে মাধুরীর দিকে চাহিয়া ছিল, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের পর তার যেন বড় ঘুম পাইয়াছে। হঠাৎ সে সোজা হইয়া বসিল। এমন জমজমাট সৌন্দর্য সে জীবনে কখনো ছাখে নাই, পাথরে খোদাই করা এমন অর্থহীন তীব্র হাসিও নয়। মাধুরীর চোখের পাতাটি যেন কাঁপে না, এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অবসাদ আসে না, অনেক দিনের ইট চাপা ঘাসের মত এক মুহূর্তে সমস্ত মুখ অসুস্থ সাদা হইয়া ওঠে,— প্রতিফলিত সূর্যালোকের মত তার সেই বর্ণহীন শুভ্ররূপ দুই চক্ষুকে পীড়ন করে।

কমলা অস্ফুটস্বরে খোকার উদ্যত কান্না সংযত করে, বারেকের জন্যও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না।

কমলার দিকে চাহিয়া অনন্তের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। পরের ছেলে কোলে নিয়া ও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না কেন? কি ভাবে ও? সে যে সুশীলকে কেন বরখাস্ত করিতে চায় মনে মনে তারই একটা ভুল বিশ্লেষণ করিয়া চলিতেছে কি?

অনন্তের মনে হইল মাধুরী উপস্থিত না থাকিলে আজ সে কমলাকে না বলিয়া থাকিতে পারিত না, কোন নিগ্রহের একটানা আতঙ্কে তার দিনগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, পরের দিনের কি দুর্ভাবনায় অর্দ্ধেক রাত্রি তার বিনিদ্র কাটিয়া যায়।

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাকে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরবেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নীচে নামিয়া পিছনের মৃদু আহ্বানে অনন্ত চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধুরী বলিল, আমি আজ নিজে সন্দেশ করেছি। খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে?

অনন্ত বিবর্ণ মুখে বলিল, রোজ রোজ কষ্ট করে কেন তুমি এসব করতে যাও মাধুরী?

আমার কোন কষ্ট নেই। তবে আপনি যদি বিরক্ত হন—

তার চোখের সামনে কমলার দিকে চাহিয়া উদ্ধত হাসিবার পর এই সকরুণ বিনয় প্রকাশে অনন্তের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, সুশীলের অসুখ শুনলাম—

সামান্য অসুখ। আমি কাছে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সারাদিন আজ কবিতা লিখেছেন—

সামান্য কয়েকটি কথায় কৈফিয়ৎ ও অনুনয়ের কি অপূর্ব সমন্বয়। অনন্ত যেন হতাশ হইয়া গেল,—কবিতা?

হ্যাঁ। লিখবার সময় ওকে দেখলে আমার এমন ভয় করে! চোখ রক্তবর্ণ, কপালে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে—

জ্বরের জন্য বোধ হয়।

মাধুরী ম্লান ভাবে হাসিল, হবে। কিন্তু আমার ভয় করে।—কোথায় বসবেন?

লাইব্রেরীতে।

অনন্ত চিন্তিত মুখে লাইব্রেরীতে গিয়া বসিল। একটা প্লেটে একটিমাত্র সন্দেশ আনিয়া কাগজপত্র সরাইয়া টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া মাধুরী বলিল, করেছি বোধ হয় পঞ্চাশটা, খাবেন মোটে একটা।

বেশী খেলে তুমি খুশী হবে?

মাধুরী ম্লান মুখে বলিল, হ'তাম, বেশী খেলে যদি আপনার শরীর খারাপ হওয়ার ভয় না থাকত।

একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া সন্দেশটা খাইয়া অনন্ত বলিল, জীবনটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে মাধুরী!

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ওঠার পরেই জীবন সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক মন্তব্যে মাধুরী একটু বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, জীবন দুর্বোধ্য বৈকি।

একচুমুক জল পান করিয়া অনন্ত বলিল, শুধু অসামঞ্জস্য, কেবল খাপছাড়া বিধান। উচিত অনুচিতে এতটুকু মিল নেই। প্রমাণ ঢ্যাখো, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, তোমার তৈরি সন্দেশ একটার বেশী খেতে পারি না, মনে শক্তি নেই, সামান্য উত্তেজনার সূত্রপাতে আতঙ্ক হয়। তবু তো জীবন আমার নিঃস্ব নয়।

নয়? মাধুরীর কণ্ঠস্বর যেন অনুযোগ করিল, আপনি তো উদাসীন, সন্ন্যাসী!

অনন্ত করুণ ভাবে হাসিয়া বলিল, উদাসীন নই, ভীরু; সন্ন্যাসী নই, দুর্বল।

ছেলেবেলা চোর চোর খেলায় আমার ছিল বুড়ী ছুঁয়ে বিশ্রামের খেলা। আজও আমি তেমনি অশক্ত হয়ে আছি মাধুরী! নিজে চুরি হয়ে গেলেও ঠেকাবার ক্ষমতা আমার নেই। যে খেলা শক্তিমানের, আমার কি উচিত সে খেলায় যোগ দেওয়া?

মাধুরীর সমস্ত মুখ আবার সাদা হইয়া গিয়াছিল, নতচোখে অস্ফুটস্বরে সে বলিল, জানিনে। কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে ছাড়া যে খেলতে পারে না সে তবে কি করবে?

সে সকলের খেলা দেখবে, একটা মোটা বই টানিয়া নিয়া অনন্ত বলিল, হাল্কা মানুষ ভেসে উঠবে আকাশে। সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকবে। মর্ত্যের সুখদুঃখের সঙ্গে ওছাড়া তার আর সম্পর্ক কি?

আকাশ ছোঁয়া কথা। অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত মোটা বইটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে মাধুরী বলিল, আপনার ওষুধ আনব? কিছু খেয়ে সেটা খেতে হয়?

অনন্ত মুখ তুলিয়া বলিল, আনো। কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। সুশীলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলাম বলে কমলার সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে।

আর ঝগড়া করবেন না।

বলিয়া মাধুরী ওষুধ আনিতে চলিয়া গেল।

ওষুধ খাইবার সময় অনন্তের মনে হইল একবার উপরে গিয়া গোপনে আর্শিতে দেখিয়া আসিবে তার চোখ দুটিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিনা, কপালের একটা শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে কিনা। সেও কি আজ অসুস্থতার কবি নয়?

প্রথমদিন কমলা খালি পায়ে কাঁকর-বিছানো পথে হাঁটিতে পারে নাই। এখন কোনই অসুবিধা হয় না।

পথের দু'দিকে ফুলের চারাগুলি যেন ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতা শুরু করিয়াছে। পট্ পট্ করিয়া কয়েকটা রক্তগোলাপ ছিঁড়িয়া কমলা খোকার হাতে দিল। ফুলগুলির দিকে হাত বাড়াইয়া খোকা অস্ফুট আবেদন জানাইয়াছিল বলিয়া নয়, ফুল ছিঁড়িতে আজকাল আর তার দ্বিধা হয় না।

সুশীলের ঘর তিনখানার পিছনে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়ার ডগায় পড়ন্ত রোদ বিবর্ণ সোনার রঙ্ মাখাইয়াছে। আকাশে মেঘ নাই কিন্তু কার্তিকের কুয়াশার ইঙ্গিতে শূন্য ভরাট। রোদের রঙ তা আংশিক আত্মসাৎ করিয়াছে।

তিনটা সিঁড়ি ভাঙ্গিলে একেবারে স্থশীলের শয়নকক্ষে পৌঁছানো যায়। স্থশীল শুষ্কমুখে বিছানায় বসিয়াছিল! একটু নিঃশব্দ হাসি দিয়া সে কমলাকে অভ্যর্থনা করিল।

খোকাকে নিয়ে এলাম।

তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওটাকে ফেলে এলেই ভাল করতেন। ওকে দেখলে জীবনে আমার যত ক্ষতি হয়ে গেছে সব একসঙ্গে মনে পড়ে।

কমলা চমকাইয়া উঠিল। জীবনে যার বোধ হয় সবটাই ক্ষতি, জীবনের সমস্ত ক্ষতির কথা তার একসঙ্গে মনে পড়া কি ভয়ঙ্কর!

সজল চোখে সে বলিল, আপনার কাছে মাপ চাইতেও আমার লজ্জা করে। জানেন, সব দেখে শুনে দিন দিন আমার স্নেহ মমতা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। আপনার ছেলে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচতাম।

খোকাকে সে বিছানায় নামাইয়া দিল। ক্ষীণ শিশুটি যেন ক্রমেই তার অপরাধের মত অসহ্য ভারি হইয়া উঠিতেছিল।

কমলা টুলটাতে বসিলে স্থশীল বলিল, আপনাকে বলাই ভাল। খোকার জন্য আমার কোন নালিশ নেই।

কমলা সংশয় ভরে বলিল, কেন?

আপনার মধ্যে ও যে আমার আপন হয়ে রইল এই আমার পরম লাভ। না, কোন কিছুর জন্যই আমার নালিশ নেই।

কমলা নীরব হইয়া রহিল। নালিশ নাই! বালিশের তলা হইতে একটি ক্ষুদ্র ছিটের জামার যে অংশটুকু বাহির হইয়া আছে সে যেন সেটা চেনে না, তাকে আসিতে দেখিয়া স্থশীল যে জামাটি বালিশের নীচে লুকাইয়াছিল এ যেন সে অনুমান করিতে পারে না! কি ভাবে তাকে স্থশীল?

কমলার মনে হইল, এ তার শাস্তি। স্ত্রী-পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে শূন্য ঘরে শূন্য মনে এর দিন কাটে, ঘরের বিশৃঙ্খলতায়, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, ওই মলিন শূন্য শয্যায়, বিষাদের প্রলেপ পড়িয়াছে। এ ঘরে এ ভাবে বসিয়া থাকার বাড়া শাস্তি আর কি হইতে পারে মানুষের?

অপরাধই বা তার কম কি? কিছুই তো তার অজানা নাই। প্রতিকার প্রথম হইতেই স্থশীলের আয়ত্তে ছিল! যেদিন খুশী ওই রঙচটা তোরঙ্গে জামা কাপড় ভরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বিদায় নিলে কে তার পথ আটকাইত? এ বিপদ

এমনি শ্রীহীন এমনি ভয়ানক যে পলায়নে লজ্জা ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত সর্বনাশকে সে নীরবে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করে নাই। তা যে অকারণে নয় তার চেয়ে কে তা ভাল করিয়া জানে?

এলোচুলে মুখ প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, কমলা তাহা সরাইবার চেষ্টা করিল না। ঘোমটার মত কালো চুল তার মুখের লজ্জা ঢাকিয়া রাখুক।

চালে আগুন লাগার সুযোগে গৃহস্থের ঘরের ভিত্তিতে যে সিঁদ কাটিয়াছে এ ভাবেই তাহাকে লজ্জা গোপন করিতে হয়। কমলা তা জানে। অনেকদিন ধরিয়া অনেক রাত্রি জাগিয়া বাদামী রঙের তিনখানা ঘরে অনেক স্বপ্নের সংসার পাতিয়া এ বিষয়ে তার পুরাপুরি জ্ঞান জন্মিয়াছে।

ঘরের আলো আব্ছা হইয়া আসার সঙ্গে সুশীল কখন শুইয়া পড়িয়াছিল কমলা টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া দেখিয়া তার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। এতক্ষণ চুপ চাপ বাপের কাছে থাকিয়া তার দুই বাহুর আবেষ্টনীতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

খোকা বুঝি ঘুমালো?

সুশীল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, হ্যাঁ। আমার গায়ের গরমে বোধ হয় আরাম পেয়েছিল!

গায়ের গরম! জ্বর বাড়ল আপনার?

জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া কাছে গিয়া কমলা তার কপালে হাত রাখিল। জ্বর বাড়িয়াছে।

অসুস্থ শরীরে সারাদিন কেন কবিতা লিখলেন?

সুশীল মৃদুস্বরে বলিল, অসুখ শরীরে বিনা কাজে দিন যে কাটে না। আলোটা জ্বালুন তো, অন্ধকার হয়ে এল। তারপর খোকাকে নিয়ে যান। অসুস্থের সঙ্গ ওর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

কমলার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসুস্থের সঙ্গ কার পক্ষে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন শুনাইবে জানা না থাকায় কথা বলিতে সে সাহস পাইল না।

আলোটা খুঁজিয়া নিয়া দেশলাই জ্বালিতে সে অনাবশ্যক দেরী করিয়া ফেলিল। একটু বদল না করিয়া মুখের ভাবটা সে সুশীলকে দেখাইতে চায় না।

* হাত মক্‌স করার সময় লেখা।

ধাক্কা

দুই বৎসর পূর্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুমতি কম্পিত পদে দুরু-দুরু বুকে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে সংসারের সর্বত্র মূল্য বিস্তার করিয়াছে, প্রয়োজনের কল্যাণে এত মূল্য পাইয়াছে নিজের, পরগাছা যার স্বপ্নই শুধু ছাখে।

আসিয়াছিল দুটি কাজের জন্য—ছেলে রাখা ও রুগ্না গৃহিণীর সেবা করা। আর এখন বাড়ীতে প্রত্যেকটি মানুষ আহার আরাম বিশ্রামের সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারই যেন জন্ম-জন্মান্তরের দায়িত্ব।

অলকার হইয়াছে পক্ষাঘাত। অর্দ্ধাঙ্গ অবশ।

দিবারাত্রি বিছানায় শুইয়া থাকে, কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবে, বিড় বিড় করিয়া নিজের অদৃষ্ট-দেবতাকে শাপে আর প্রতিরাত্রে শান্ত স্বামীর সঙ্গে কলহ করে।

বলে, 'তুমি? তুমি ছাইএর ডাক্তার, কচুর ডাক্তার।'

'তুমি নির্লজ্জ। স্ত্রীর যার এক বছরের বেশী বিছানায় পড়ে, কোন লজ্জায় সে পরের চিকিৎসা করতে যায় শুনি!'

উপসংহারটা করুণ!

'একটিবার খোকাকে কোলে নিতে পারি না এমনি অদেষ্ট।'—বলিয়া সছিদ্র হাপরের মত নিশ্বাস নিতে নিশ্বাস ফেলিতে সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া অলকা কাঁদে।

এদিকের ঘরখানা সুমতির। তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। খোকাকে বুকে ফেলিয়া গালে গাল রাখিয়া ঘুম পাড়ানোর কায়দাটা অবশ্য অলকার চোখে পড়ে নাই, ঘুমপাড়ানো ছড়াটাই শুধু কানে গিয়াছে। তাহাতেই এত।

আধ ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়া সুমতি ওঘরে যায়।

'আপনার পাশে খোকাকে একটু শুইয়ে দেব দিদি?'

অলকার শরীর বলিতে শুধু হাড় আর চামড়া। কোটর-গত চোখে অনেক-খানি জল জমিলে তবেই গড়াইয়া পড়িতে পারে। চোখ মুছিতে গিয়া তাহার সমস্ত মুখ চোখের জলে মাখা হইয়া যায়।

সে রাগিয়া বলে, 'আড়ি পেতে শোনা হ'ল বুঝি কথা? না হল না! কচি খুকী কিনা আমি, বুঝিনে কিছু। লজ্জা করে না? বেহায়া!'

তাহার শীর্ণ দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। একটানা দুঃখ শ্রেয় জানিয়া সে যেন সংযম অভ্যাস করে, সুমতি প্রলোভনটা সামনে ধরিয়াছে বলিয়া তাই তার এত রাগ!

দক্ষিণের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অক্ষয় মোটা ডাক্তারি বই পড়ে। বারেকের জন্যও সে মুখ তুলিয়া তাকায় না। ঘরে যে বেদনার একটা স্থূল অভিনয় হইয়া গেল সে বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবার মত অনুভূতিও তাহার যেন নাই।

তা অক্ষয় এমনি বটে,—নির্বিকার, নিস্পৃহ। কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গৃহে শয্যাগত স্ত্রীর আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন বোঝা, বাহিরে কেবল রুগ্ন ও আহত মানুষের সাহচর্য এবং মরণের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার ক্ষুব্ধ স্তিমিত বিষাদ,—সবই যেন তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ। সুপ্রাপ্য বলিয়াই বেদনা যেন মূল্য হারাইয়াছে।

দিনটা এক প্রকার বাহিরেই কাটে।

সকাল সাতটায় ডিসপেন্সারীতে যায়, সেখান হইতে কলে। বাড়ী ফিরিতে একটা বাজিয়া যায়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার আগে সে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে,—'ও খেয়েছে?'

সুমতি বলে, 'হ্যাঁ।'

'তুমি?'

মুখের দিকে তাকায় না বলিয়া প্রশ্নটা নিছক ভদ্রতাসূচক মনে হয়।

'আপনি তো জানেন আমি শেষবেলায় হবিষ্য করি।'

'ও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ বেলায় হবিষ্য করার কি দরকার? রাত্রে কিছু খাও না বুঝি সুমতি?'

'খাই।'

'তবে?'

বলিয়া জবাবের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অক্ষয় উপরে উঠিয়া যায়।

জবাব যে সুমতি দিতে পারে না এমন নয়, ইচ্ছা করিয়াই দেয় না। রাত্রে সে অবশ্য কিছু জলযোগ করে কিন্তু এগারটার আগে নয়, তার আগে তাহার সময়

হয় না। খাওয়ার সময়-বিভাগ সম্বন্ধে অক্ষয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে তাহার লজ্জা করে, জবাব না দিবার ইহাই কারণ।

নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য দু'ঘণ্টার বেশী সময় অক্ষয় পায় না। বাহিরে রোগী ডাকাডাকি করে, টেলিফোনের যন্ত্রটা বার বার শব্দিত হইয়া উঠে, তিনটা না বাজিতেই আবার সে বাহির হইয়া যায়। ফেরে রাত্রি আটটা নটায়।

তখনও কিন্তু সে নিজেকে বিশ্রামের অবকাশ দেয় না। পড়ার ঘরে বসিয়া মোটা মোটা ডাক্তারি বই পড়িতে আরম্ভ করে। সুমতির মনে হয়, শোবার ঘরে ঢুকিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছার কাছে তাহার শ্রান্তি হার মানিয়াছে।

এমন খারাপ কথা মনে হয় বলিয়া মনে মনে নিজের উপর সুমতি রাগ করে।

অলকা এদিকে নিত্যকার কলহ ও কান্নার জন্য থাকে ব্যাকুল হইয়া, বেচারীর জীবনে এখন ওইটুকুই বৈচিত্র্য; অক্ষয় ফিরিয়াছে টের পাইলেই এমন কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেয় যে, ও ঘরে উঠিয়া না গিয়া অক্ষয়ের আর উপায় থাকে না।

অলকা বলে, 'ও ঘরে এত কি মধু? এঘরে বসে পড়।...ছাখো গো, গালে আমার একটা ব্রণ উঠেছে। বড় ব্যথা।'

চটচটে ঘামে ভেজা অলকার গাল—কে যেন আঠা মাখাইয়া রাখিয়াছে। অক্ষয় আদর করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুই গালে একটি ব্রণও সে খুঁজিয়া পায় না, সস্নেহে বলে, 'ইস, বড্ড ঘেমেছ যে!'

জীবন্ত পত্নীর শবের মত শীতল ক্লেদাক্ত স্পর্শ আঙুল বাহিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের মনে ধাক্কা দেয় কিনা কে জানে! বোধ হয় দেয় না। শব ঘাঁটা অক্ষয়ের বহুদিনের অভ্যাস।

ইহার পর খানিকক্ষণ অলকা চুপ করিয়া থাকে, তারপর প্রথমে ভালভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং তাহা নালিশ ও কান্নায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অক্ষয় এমনি নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িয়া যায় যে সে একটা কথাও শুনিতেছে না এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে।

অলকা সহসা ক্ষেপিয়া যায়।

'—বকে মরছি, শুনছ না যে? কেনই বা শুনবে, আমি মরলেই যে তোমার ঘাড়ে বাতাস লাগে।'

অক্ষয় মুখ তুলিয়া নিদ্রাতুর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বলে, 'আহা, অলক,

এমন করে রাগ ক'রো না, কিছু না জেনে শুনে। তোমার কথা শুনছি বৈকি, শুনছি।'

'ছাই শুনছ! পড়া তোমার পালাবে না গো, আমি কিন্তু পালাব। আমি চিতায় উঠি তারপরেই না হয় ওসব ছাইপাঁশ পোড়ো? কদিন বাকী আর!'

অক্ষয় শান্তকণ্ঠে বলে, 'দেখ দিকি তুমি কি সব বলছ! এসব বই ছাইপাঁশ মোটেই নয় অলক, সব তোমার অসুখের বই। তোমায় সারিয়ে তুলতে হবে না?,

'হবে?'

অলকা যেন স্তম্ভিতা হইয়া যায়। উত্তেজনায় মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলে, 'হবে? আমাকে সারিয়ে তুলতে হবে? এ তুমি কি বলছ গো? রাত জেগে আমার অসুখের বিষয়ে তুমি বই পড়! আমায় মাপ কর গো, মাপ কর!'

মাথাটা সে বেশীক্ষণ উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না, থপ্‌ করিয়া বালিশে পড়িয়া যায়। বিড় বিড় করিয়া কতবার সে যে 'মাপ কর, মাপ কর' বলে তাহার ঠিকানা নাই।

কিন্তু দেখা যায় তাহার এই কৃতজ্ঞতা অস্থায়ী। চোখের জল ভাল করিয়া শুকাইবার পূর্বেই স্বামীর ভালবাসার এতবড় প্রমাণও তাহার নিকট মর্যাদা হারায়।

হতাশ কণ্ঠে সে বলে' 'ছাই! তুমি আবার আমায় সারিয়ে দেবে। আমি কি আর বুঝতে পারি না, কিসের জন্য তুমি বই পড়।'

'আমার মরাই ভাল',—এই বলিয়া সাঁ সাঁ করিয়া কাঁদে।

ও ঘরে সুমতির মনে হয়, এতক্ষণে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আসিয়াছে। পৃথিবীর মত খারাপ গ্রহ সৌরজগতের যে আর নাই একথা টের পাইবার পর আর জাগিয়া থাকা চলে না। এবার ঘুমানো দরকার।

কিন্তু সুমতি ঘুমোয় না। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া খোলা বারান্দায় দাঁড়ায়। দেখিতে পায় নীচে অন্ধকার উঠানে নন্দর ঘরের জানালা দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

সুমতির ইচ্ছা হয় ওই আলোয় কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ওই আলোর দিকে চাহিয়া না ওই আলোয় দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছাখে।

নন্দ—অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার। অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার আছে দু'জন। তিন বছর মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে নন্দর মানও বেশী, মাহিনাও বেশী।

সে অক্ষয়ের বাড়ীতেই থাকে ও খায়। কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভোর পাঁচটায় উঠিয়া ডিসপেনসারীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তখন আলো-অন্ধকারের মেশামেশি।

খাবার ও খাবার জল পৌছাইয়া দিতে ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুমতির গা ছম ছম করে। সকলের ঘুমের আড়ালে এই কর্তব্য পালনে কেমন যেন গোপন অভিসারের আমেজ আছে, অনুভূতির মধ্যে সেটুকু ধরা পড়া কোন মতে নিবারণ করা যায় না।

নন্দর যত কাব্যও কি এই ভোরকে নিয়াই।

'কাল ঘুম আস্‌তে একটা বেজে গিয়েছিল, সুমতি। তবু এত ভোরে উঠলাম। হয়ত আজ এখন দোকানে যাব না। তুমি চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব।'—বলিয়া নন্দ হাসে।

সুমতি রাগ করিয়া বলে, 'আজ থেকে রাত্রেই আপনার ঘরে খাবার রেখে যাব। ভোরে ওঠার কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।'

নন্দ তথাপি হাসে—'তাতে আমার ঘরে রাত-অতিথি ইঁদুরগুলিরই উপকার হবে আর কিছু হবে না। আমি ক্ষুধার্ত হয়েই দোকানে যাব।'

'তাতে আমার ক্ষতিটা কি?'

কথাটা বলিয়াই নিজের বোকামিতে সুমতির মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়। সবটুকু রাগ নিজের উপরে গিয়াই পড়ে। ফাজলামি করিবার এমন সুযোগ অবহেলা করিবে নন্দর কি সে উদারতা আছে? কথাটা বলা তাহার কোন মতেই উচিত হয় নাই।

নন্দর সত্যই উদারতা নাই, সকৌতুকে হাসিয়া সে জবাব দেয়, 'সত্যি কোন ক্ষতি নেই? তবু যদি শেষরাত্রে উঠলেও খাবার হাতে হাজির না হতে!'

'আমি রোজ এমনি সময় উঠি।'

'ওঠই তো! কে তা অস্বীকার করছে? কেন ওঠ তাই নিয়ে প্রশ্ন।'

কথায় নন্দর সঙ্গে পারিবার যো নাই। সুমতি মুখ গোঁজ করিয়া বাহির হইয়া আসে। দুপুরে নন্দ খাইতে আসিলে সাম্‌নে বসিয়া খাওয়ায় না। রাত্রে এক

ফাঁকে ঘরে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসে। ইঁদুরের কথাটা সে ভোলে না। ঢাকনির উপর একটা দশসেরি শিল চাপাইয়া দেয়। রান্নাঘর হইতে শিলটা নন্দর ঘরে বহিয়া নিয়া যাইতে তাহার যে রীতিমত কষ্ট হয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাকরকে বলিলে সে অবশ্য কাজটা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু চাকরকে সুমতি বলে না। নন্দর সঙ্গে তাহার কলহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে চাকরকে টানিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

পরদিন সকালে খাবারের খবর নিতে দিয়া ছাখে অমন ভারি শিলটা সরাইয়া ঢাকনি উন্টাইয়া ঘরময় খাবার ছড়াইয়া রাতারাতি ইঁদুরে কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে! ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া সুমতি হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। কি ছেলেমানুষ নন্দ! কি করিয়া রাগের জবাব দিতে হয় আজও তা শেখে নাই। ঘরময় মিনতি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—আমায় প্রশ্রয় দিও করুণাময়ী!

অথচ এ যেন খাপ খায় না, এ যেন অর্থহীন। সুমতির চোখে সহসা জল আসিয়া পড়ে। ঘরের কোণে ওই রঙচটা তোরঙ্গ, দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো আধ ময়লা একটা পাঞ্জাবী, তক্তপোষে পুরানো তোষকের বিছানা আর বালিশের পাশে ওই এক তাড়া মনিঅর্ডারের রসিদ—ছড়ানো খাবারগুলির সঙ্গে এই সবের সামঞ্জস্য নাই যে একেবারেই। সুমতির মনে হয় বজ্রের মত কঠোর ফুলের মত কোমল এই লোকটি যে তাহার জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তার মধ্যে প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা লুকানো আছে, ইহাকে তাহার ভয় করিয়া চলা উচিত। এ একদিন তাহাকে বিপন্ন করিবে।

নন্দর প্রকৃতির গভীর দিকটার সঙ্গে সুমতির পরিচয় বেশী দিনের নয়।

এক সপ্তাহও হয় নাই একদিন ভোরবেলা খাবারের বাটি ও জলের গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফস করিয়া সুইচ্ টিপিয়া নন্দ আলো জ্বালিল।

সুমতি চমকাইয়া বলিল, 'ইস্! এ আবার কি?'

'একটা কথা আছে সুমতি। আলো না জ্বাললে তো তুমি দাঁড়াবে না। অথচ একটা ভয়ানক দরকারী কথা তোমাকে এখন না বললেই নয়।'

এ ভূমিকা সুমতি চিনিত। নন্দর বক্তব্য অনুমান করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, 'পাঁচটা টাকা চাই, এই ত কথা?'

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, 'কি করে জানলে ?'

যেন জানাটা সুমতির পক্ষে আশ্চর্য ব্যাপার। নন্দর যে দু'টার বেশী জামা নাই, ক্রমাগত তালি লাগাইয়া এক জোড়া জুতাই সে যে আজ একবৎসর ব্যবহার করিতেছে, মাসের দশ দিন না কাটিতে জলখাবারের কটা পয়সাও যে তাহার হাতে থাকে না, এসব যেন সুমতির অজানা !

'যেমন করেই জানি, টাকা চাই কি না বলুন !'

'চাই।'

'দিচ্ছি এনে। কিন্তু মাইনের টাকাগুলো কি করলেন ?'

নন্দর চোখ দুটি সহসা স্তিমিত হইয়া গেল।—'জুয়া খেলেছি।'

'ষাট টাকা জুয়া খেললেন ?'

'না, পঞ্চাশ। দশ টাকা একজন ধার নিয়েছে।'

সুমতি গম্ভীর হইয়া বলিল 'শেষটা সত্যি হতে পারে, প্রথমটা খাঁটি মিথ্যা।'

'মিথ্যা নয়। রূপক।'

'রূপক না ছাই !' বলিয়া সুমতি বালিশের তলা হইতে মনিঅর্ডারের রসিদের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিল। বলিল, 'কেদার মুখুয্যেকে আপনি প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠান। মুখুয্যেটি কে ?'

নন্দ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ভগ্নীপতি।'

'আমিও ওই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এ তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার ! সীতা থাকে আপনার কাকার কাছে, মাসে মাসে মাইনের সব টাকাগুলি আপনি পাঠিয়ে দেন ভগ্নীপতিকে। পণে'র টাকা শোধ হচ্ছে নাকি ? শোধ না হলে সীতা স্বামীর ঘর করতে পাবে না ?'

'না। সীতাকে যে স্বামীর ঘর করতে হয় না ও তার দাম সুমতি।'

ইহার পর নন্দ সব কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছিল। কেদার মুখুয্যে ছিল নন্দর পিতৃবন্ধু—নেশার বন্ধু ;—মদের। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নন্দর বাবার মাথাটাও বোধ হয় একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আর কোন যোগাযোগ ঘটিয়াছিল কিনা এখন আর জানিবার নাই, জানিয়া লাভও নাই। কেদারের সঙ্গে হঠাৎ একদিন সীতার বিবাহ হইয়া গেল।

নন্দ কিছুই জানিত না। যে রাত্রে সীতার বিবাহ হয় সে রাত্রে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে সে মহানন্দে থিয়েটার দেখিতেছে।

'জানো সুমতি, ওদিকে সীতাহরণ হচ্ছে, আর আমি দেখেছি থিয়েটার। থিয়েটার!—শিশির ভাদুড়ীর সীতা প্লে দেখছি।'

কাহিনী শুনিয়া সুমতি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া ছিল। শেষে আস্তে আস্তে একটা অতি ছেলেমানুষী প্রশ্ন করিয়াছিল, 'সীতাকে আপনি খুব ভাল বাসেন, না?'

নন্দ সহজ ভাবেই ইহার জবাব দিয়াছিল 'বাসি। কিন্তু একটি মাত্র বোনের অমন অবস্থা হলে কোন ভাই তা সইতে পারে না। সিঁথির লাল ঘায়ের যন্ত্রণায় সীতার ছটফটানি তুমি যদি দেখতে সুমতি!'

সিঁথীতে লাল ঘা! কি বর্ণনা! সুমতি আর কথা কহিতে পারে নাই। অথচ তাহার অনেক বক্তব্যই ছিল। স্বামী বৃদ্ধ হোক মাতাল হোক হিন্দু মেয়ের স্বামীর ঘর না করিয়া কেমন করিয়া চলে নন্দকে একথাটা সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল। বৃদ্ধ মাতাল স্বামীও যে স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতে পারে, অন্তত বিবাহের পর কয়েকটা বছর; মাতাল স্বামীর ছেলেমেয়ে নিয়াও যে একটা নারী-জীবন এক দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে এই ধরনের কয়েকটা কথা আভাসে ইঙ্গিতে নন্দকে জানাইয়া দিবে কিনা মনে মনে সুমতি নাড়া চাড়া করিয়া দেখিতেছিল।

কিন্তু সীতার সিঁথীর বর্ণনা শুনিয়া কিছু বলিতে তাহাকে ভরসা হয় নাই। নিজের সিঁথী তাহার বড় বেশী সাদা হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালেই সুমতি খাবার নিয়া আসে।

নন্দ সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র রকমের খুশী হইয়া উঠে। হাসিয়া বলে 'আঃ, খাবারে আজ ক্ষমার অমৃত। দোকানে গিয়া খানিকটা সায়ানাইড খেয়ে দেখব মরি কিনা।'

'খাবেন না, মরবেন। এ ক্ষমা নয়। দয়া।'

নন্দর মুখ ঘনাইয়া আসে—'দয়া?'

'তবে কি ভাবেন আপনি?'

দু'জনের উদ্ধত দৃষ্টি নীরবে খানিকক্ষণ কলহ করে।

সহসা বাটিটা তুলিয়া নিয়া নন্দ মেঝের উপর আছড়াইয়া ফ্যালে। আঙ্গুল বাড়াইয়া খোলা দরজাটা দেখাইয়া চাপা গলায় বলে 'যাও। দয়াবতী দয়া করে যাও।'

ক্ষমা চায় দুপুরে খাইতে আসিয়া। অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল করিয়াই আসে।

হাত জোড় করিয়াই হাসিয়া ফ্যালে। বলে, 'ক্ষমা সুমতি।'

ইহাতে নন্দকে ক্ষমা করিবার সুবিধাই হয়। কারণ সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া সে আর হাসিতে পারে না! তাহার চোখ দুটি ছল ছল করিতে থাকে।

বলে 'এবারকার মত ক্ষমা করে ফেল সুমতি, সত্যি বলছি আর কোন দিন তোমাকে ঠাট্টা করব না।'

ঠাট্টা! সুমতি গম্ভীর মুখে বলে 'আচ্ছা।'

'না।'

খুশী হইয়া শিস্ দিতে দিতে নন্দ চলিয়া যায়। কি অপরাধে সুমতির কাছে হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল, বাকী দিনটুকুর মধ্যেই সে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

রাত্রে সে যখন ফেরে অক্ষয় হয়ত খাইতে বসিয়াছে, অদূরে বসিয়া সুমতি তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছে ; খাইতে বসিয়া অক্ষয় কথা বলে না, কখন কি প্রয়োজন খেয়াল রাখিয়া চাহিয়া নিতে পারে না, সুতরাং তাহার খাওয়ার উপর সুমতিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয়। উঁকি দিয়া দেখিয়া নন্দ নিজের ঘরে চলিয়া যায়। আহারান্তে আঁচাইয়া অক্ষয় উপরে চলিয়া না গেলে সে খাইতে আসে না।

আসনে বসিয়া বলে 'ওর সঙ্গে কেন খেতে বসি না জান?'

নন্দর ছলো ছলো চোখদুটির কথা সুমতির মনে ছিল, সে সদয়ভাবে হাসিয়া বলে 'জানি বৈকি। যতই হোক উনি মনিব তো।'

'ওঃ ভারি মনিব! আর তিনটা বছর পড়লে আমি ওর চেয়ে বড় ডাক্তার হ'তাম এ্যাদ্দিনে, তা জান? বলতে পারলে না।'

সুমতি একটু ভাবিবার ভান করিয়া বলে 'তবে ওঁকে দেখতে পারো না বলে বোধ হয়।'

নন্দ ভাবিয়া বলে 'তাও নয়। ভাগের পূজায় আমার রুচি হয় না বলে।

'ভাগের পূজা! পূজা! সুমতির যেন চমক ভাঙ্গে। এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ তাহার রাগে লাল হইয়া উঠে।

এমনিভাবে দিন কাটে। মনের জোরে যে দূরত্ব সুমতি বজায় রাখিতে পারে

না, বিষাদ ও বেদনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহার সৃষ্টি হয়। নিজের দুর্বলতার অপরাধটা ধীরে ধীরে নন্দর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাও সে বোধ করে। নন্দর পরিহাসে আর সে রাগ করেনা, নীরবে উপেক্ষা করিয়া যায়, পরিহাসস্পৃহাও নন্দর সুতরাং আপনা হইতেই কমিয়া আসে।

'জেনে শুনে যত দোষ করেছি সব তুমি ক্ষমা করেছ সুমতি। না জেনে এমন কি দোষ করলাম—'

সুমতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করে না। ইহাকে আবার ভাব জমাইবার হীন প্রচেষ্টা মনে করিয়া তাহার গা জ্বলিয়া যায়, রুক্ষ স্বরে সে বলে 'আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি ?'

নন্দর মন সরল সে তথাপি হাল্কা সুরে বলে 'আমার শত্রুর অসুবিধা হচ্ছে। তবে খাওয়ার সময়ে তুমি উপস্থিত থাক না বলে অসুবিধাই বল দুঃখই বল একটু হচ্ছে।'

'আমার সময় হয় না।'

শেষ পর্যন্ত নন্দ রাগিয়া উঠে, বিশ্রী কথা বলে :

'ভালই, ভালই। আমি শুধু কম্পাউণ্ডার যে !'

ইহার একটা কড়া জবাব নন্দ প্রত্যাশা করে কিন্তু সুমতি নীরবে আপনার কাজ করিয়া যায়, সে রাগ করিয়াছে কিনা তাহা পর্যন্ত নন্দ অনুমান করিতে পারে না।

ইহার পর সেও সাবধান হইয়া যায়, হাসি খুশী কম করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকে। সুমতিকে জানাইয়া দেয়—'তোমার জন্য নয়, সীতার অসুখ করেছে।'

সুমতি বুঝিয়াও না বোঝার ভান করিয়া বলে, 'কিসের ? কি বলছেন ?'

'আমি যে আজকাল গম্ভীর হয়ে থাকি তার কথা বলছি। তোমার জন্য নয়।'

সুমতি ভাবে, বাঁচিয়া গেলাম। ভাবে, ভগবানের অনেক দয়া তাই মনের গায়েও একটা কালির আঁচড় পড়া নিবারণ করা গেল।

আহ্নিকে বসিয়া সে যেন আবার ভুলিয়া যাওয়া স্বামীকে স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারে। জীবন যেন জীবনের সীমা ছড়াইয়া আলো ও আনন্দ ভরা একটি অভিনব স্বর্গে উঠিয়া যায়।

নন্দ নিজের ঘরে বসিয়া রাত জাগিয়া মনিঅর্ডারের রসিদ গোণে আর সীতাকে চিঠি লেখে। লেখে—

'আর ভাবনা নেই দিদি, শীগ্‌গিরই একটা বাড়ি ভাড়া করে তোকে আনাচ্ছি। ঘর সংসারের সব কাজ কিন্তু তোকে করতে হবে। তোর দাদা—গরীব মানুষ, ঝি চাকর রাখতে পারবে না। বুঝলি? তবে তুই যদি খুব জোর বায়না নিস, উঠতে বসতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার 'বৌদি চাই' বৌদি চাই' আব্দার করিস তাহলে দেখে শুনে খুব খাটতে পারে এমন একটা বৌদি তোকে এনে দিতে রাজী আছি।

আচ্ছা, তোর বৌদি যদি ধর বিধবাই হয়—'

অর্থাৎ নন্দ লিখতে চায় যে সে যদি একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করে, তাহাকে বৌদি হিসাবে পাওয়া বিষয়ে সীতার মতামত কি, বাক্য যোজনার দোষে জিজ্ঞাসাটা নিজের মৃত্যু বিষয়ক হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে আর লেখে না; হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অলকা মরিয়া গেল। রাত্রি তখন ন'টা।

মরণকে যে কোন সংসারে এমন বিনা আড়ম্বরে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে সুমতির সে অভিজ্ঞতা ছিল না। শোকের কলরব নাই, বেদনার বাহুল্য নাই, ঘরের আবহাওয়া শুধু অতি মাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় এবাড়ীর কর্ত্রী যেন আজ মহাপ্রস্থান করে নাই, সুদীর্ঘ কালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ঘুম ভাঙ্গিবার পরেই সকলের এই নীরবতা, অন্য কোন কারণে নয়।

বার কয়েক উঃ আঃ করিয়া দাস দাসী শোকপ্রকাশের অন্ত করিয়াছে। অক্ষয় গম্ভীর মুখে তাহার আরাম কেদারার দুই বাহুতে কনুই ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকবার অশ্রু মার্জনা করিতে সুমতির নিজের চোখের জলও গিয়াছে ফুরাইয়া। নন্দ কোথায় যেন গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

খাটের উপর চাদর ঢাকা অলকার মৃতদেহ।

নীচে ঝির কাছে খোকা কাঁদিতেছিল, সুমতির মনে হইতেছিল, খোকার কান্নার শব্দটুকু শুধু ভিতরে নিয়া সে কানে ছিপি আঁটিয়া দিয়াছে, ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কেহ যদি মড়া কান্নাও কাঁদিয়া ওঠে সে শুনিতে পাইবে না।

কিন্তু মড়া কান্না কাঁদিবে কে? সে? সে আর সবই পারে, নিজের কান্নায় শব্দ যোজনা করিতে পারে না। নন্দর কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মুখখানা

তাহার আজ একটু অতিরিক্ত শুকনো মনে হইতেছে বটে, কিন্তু সুমতি শপথ করিয়া বলিতে পারে তাহার কারণ অলকার উপস্থিত মরণ নয়, অনুপস্থিত আঘাত অথবা দুশ্চিন্তা।

ঘরে ঢুকিবার পর ঠিক কতক্ষণ সময় নন্দ সীতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল জানিবার জন্য সহসা সুমতির মন কেমন করিয়া উঠিল।

মানুষের মরণ বাঁচন যাহার ব্যবসা, ঔষধ ও আশ্বাস নিয়া যাহার দোকানকারী কান্না তাহার একেবারেই সাজে না। তবু অক্ষয়ের আরাম কেদারার সন্নিকটে একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত মোটামোটা বইগুলির দিকে চাহিয়া সুমতির বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বইগুলির নৈকট্য সম্বন্ধে অক্ষয় যে কি করিয়া এমন উদাসীন হইয়া আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সুমতির বার বার মনে হইতে লাগিল। অক্ষয় যে বইগুলি দেখিতে পায় নাই সুমতি কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

অক্ষয় সুমতির দৃষ্টিকে অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিল 'খোকা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে, সুমতি। ওকে নিয়ে এসো।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। খোকাকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক হইয়া দেখিল তেপায়ার উপর হইতে বইগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া সুমতি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখান থেকে বই সরালে কে?'

নন্দ বলিল 'আমি। ডাক্তারবাবু ওঘরে রেখে আসতে বললেন।'

সুমতির মুখ পাংশু হইয়া গেল।

'ভয় করছে নাকি সুমতি?'

'ভয়? কিসের ভয়?'—বলিয়া সুমতি সরিয়া গেল। ভয়! অলকার মরণে তাহার ভয়! মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন তাহার প্রথম পরিচয়! সর্বাঙ্গে সে যে একজনের মরণের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে নন্দ কি তাহা দেখিতে পায় না?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, না বুঝিয়া সেই অনেকক্ষণ মার মরণের মান রাখিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অক্ষয় বলিল 'খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে সুমতি, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

খোকার উপর আজ যেন তাহার দরদের সীমা নাই।

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া সুমতি দেখিল এবার স্বয়ং নন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

'নন্দ লোক ডাকতে গিয়াছে সুমতি।'

সুমতি প্রশ্ন করে নাই, আপনা হইতে বলিল বলিয়া অক্ষয়ের কথাটা একটু যেন কৈফিয়তের মতই শোনাইল।

সুমতি বলিল 'ও।'

'ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে তোমায় একটা কথা বল্‌তে চাই সুমতি।'

অলকার শবকে শোনাইয়া তাহাকে অক্ষয়ের কি বলিবার থাকিতে পারে সুমতি ভাবিয়া পাইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল 'কি কথা?'

অক্ষয়ের স্বর অচঞ্চল, মুখের ভাব নির্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সে যেন সাক্ষ্য দিতেছে।

'ও যে বাঁচবে না, প্রথম থেকেই আমি তা জানতাম সুমতি।'

'জানতেন! না না, জানতেন না।'

'কিন্তু ওকে বাঁচাবার চেষ্টা যে আমি প্রাণপণেই করেছি, তুমি তার সাক্ষী।'

অক্ষয় এতক্ষণ সোজা হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার আরাম কেদারায় ঠেস দিল।

যত নিঃশব্দেই চুকিয়া গিয়া থাক অলকার মরণ যে তুচ্ছ হইয়া নাই বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না।

সেদিন রাত্রে মুমূর্ষুর ঘরের আবহাওয়ায় যে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দেখা গিয়াছিল সমস্ত বাড়ীতে তাহা যেন ব্যাপ্তি নিয়াছে।

অক্ষয় বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রোগী অন্য ডাক্তার সংগ্রহ করে, অক্ষয় নিজের ঘরে খোকাকে নিয়া দিন কাটায়। ইজি চেয়ারটা সে এ ঘরে আনাইয়া নিয়াছে।

বলে, 'আলস্য নয় সুমতি, এ আমার বিশ্রাম। আর কিছুদিন ওভাবে চললে মারা পড়তাম।'

সুমতি কিছুই বলে না। নীরবে খোকাকে দুধ খাওয়ায়।

এঘরে অলকার স্মৃতির আমেজটুকুও নাই। কবে যে সে এ ঘরে আসিত, আলমারি খুলিয়া গুছানো জামা কাপড়গুলি মেঝেতে নামাইয়া আবার গুছাইয়া তুলিত, বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধা শেষ হইলে হাই তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, অক্ষয়ের বিশ্বাস সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

সুমতি কেন যে ঘরের সর্বত্র অলকার অবলুপ্ত স্মৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে অক্ষয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরের বাতাস ভিজিয়া ভারি, আলো ম্লান। খোকাকে নিতে গিয়া কেমন করিয়া সুমতির হাতশুদ্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়াছিল অক্ষয় জানে না। ইচ্ছা করিয়া যে নয় সুমতি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই অক্ষয়ের অনুমান। তথাপি কয়েক-মিনিট পরেই আলমারির উপরের তাকে লুকানো একতাড়া চিঠি সে খুঁজিয়া পাইল।

অলকাকে লেখা অক্ষয়ের প্রেমপত্র। একখানা নয় দু'খানা নয় পঁচিশ ত্রিশখানা। সে যেন রঙিন সূতায় বাঁধা একরাশি পুরাতন, ব্যবহৃত, বিবর্ণ, প্রেম!

আজ নিশ্চয় নয়! কবে যেন সুমতি চিঠিগুলি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। নহিলে সোজা আলমারি খুলিয়া ভাঁজ করা শীতের পোষাকগুলির পিছনটা এখন সে হাতড়াইবে কেন?

চিঠির তাড়াটা নিয়া গম্ভীর হইয়া অক্ষয় বলিল, 'মরা মানুষের জন্য শোক করা কর্তব্য, একথা তুমিও জান আমিও জানি।'

সুমতি কিছুই বলিল না।

'কিন্তু তার অত্যাচারটাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমত সন্দেহ আছে সুমতি।'

এবারেও সুমতি নীরব হইল।

'ওটা ভূতের উপদ্রবেরই সামিল। আত্মীয় পর কোন ভূতের উপদ্রব গ্রাহ্য করা উচিত কি? সে কত বড় ভীরুতার লক্ষণ বলত!'

এ যেন বিশেষ করিয়া তাহাকেই তিরস্কার করা। বড় আয়নার মধ্যে নিজের বিধবা বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া সুমতির চোখে জল আসিল।

মাঝে মাঝে স্থগিত হইতে লাগিল বটে কিন্তু বৃষ্টি একেবারে কমিল না। দিনগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিতে উঠিতে আবার জলে ভিজিয়া যাইতেছে, এ বাদল আশীর্বাদের মতই। কিন্তু সুমতির ভাল লাগিতেছিল না। দ্বিপ্রহরে খোকাকে কোলে নিয়া নিজের ঘরে সে বসিয়াছিল, সকাল হইতে যে স্তিমিত বেদনা পীড়া দিতেছিল এখন তাহা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নন্দ আজ সারাদিন খায় নাই। দোকান হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া সেই যে সে শুইয়াছিল আর ওঠে নাই।

ডাকিতে গিয়া সুমতি শুনিয়াছিল তাহার শরীর ভাল নয়, সে খাইবে না। শরীরের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব মেলে নাই।

অথচ কোথায় যে তাহার অপরাধ সুমতি ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার বয়স তেইশ, সে যুবতী সে সুন্দরী তাহার স্বামী নাই ইহা যদি সকলে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, এবার তাহার মরাই ভাল। কিন্তু কিছুই তো সে করে নাই! প্রাণপণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টার কবে তাহার ত্রুটি ঘটিয়াছে? তাহাকে নিয়া নন্দর অনধিকার চর্চায় শুধু ততটুকু রাগই সে করিয়াছে যতটুকু রাগ না হইলে মানায় না, সে রাগের জের টানিয়া চলিবার চেষ্টাও সে করে নাই। সকলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সহজ ও সাধারণ করিয়া রাখিতে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিয়াছে।

অথচ ইহাদের কল্যাণে জীবন তাহার আজ অযথা জটিলতায় ভরা। সব বিষয়ে সেই হইয়া উঠিতেছে অপরাধী।

সীতার দুর্ভাগ্য উপলক্ষ্যে ষাট টাকার কম্পাউণ্ডারি করাই যে নন্দ জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছে সে অপরাধ তাহারই। এক সাহেবের প্রকাণ্ড ওষুধের দোকানে একশ দশ টাকার চাকরীটা যে নন্দ পছন্দ করিল না সে জন্য সুমতি ভিন্ন আর কেহ দোষী নয়। স্বাস্থ্য যে নন্দর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সে দায়িত্বও সুমতির।

অলকা যে বাঁচিল না, মরিয়াও স্বামীর দু'ফোঁটা চোখের জলের তর্পণ পাইল না, এ জন্য স্বয়ং ভগবানও হয়ত একদিন সুমতিরই বিচার করিবেন।

এমনি সব কটু চিন্তায় সুমতি ব্যাপৃত ছিল, ও ঘর হইতে অক্ষয় তাহাকে আহ্বান করিল। অনুযোগ করিয়া বলিল 'একা একা দুপুরটা যে কাটেনা সুমতি!'

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'খোকাকে রেখে যাব?'

'খোকার সঙ্গে এক তরফা আলাপ করব কতক্ষণ? তাছাড়া দুপুর বেলা আর রাত্রিটা তোমার কোল দখল করে থাকা ওর অভ্যাস, আমার কাছে কাঁদবে।'

সুমতি নতমুখে বলিল 'কিন্তু দুপুরে একটু না শুয়ে যে আমি পারব না। কাল একাদশী করেছি।'

অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া বলিল 'ও, আচ্ছা, তবে তুমি যাও সুমতি, শোবে যাও। কাল তোমার একাদশী গেছে জানতাম না। তুমি বুঝি নির্জলা একাদশী কর?'

সুমতি নীরবে স্বীকার করিল। অক্ষয়ের আর কিছু বলিবার আছে কিনা

ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল নন্দও একদিন নির্জলা একাদশীর কথাটা তুলিয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়ের মত এমন ভদ্র ও সংযতভাবে নয়। সে নির্জলা একাদশী করে শুনিবামাত্র একটুকরা কাগজ টানিয়া নিয়া মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছিল 'নির্জলা', তারপর কাগজটা সামনে ধরিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল 'হঠাৎ দেখলে কথাটাকে 'নির্লজ্জ' মনে হয় না? হয়, কি বল? বলই না ছাই হয় কি না হয়, তাতে আর তোমার এমন কিছু মহাপাপ হবে না?'

বিছানায় শুইয়া সুমতির মনে হইল অক্ষয়ের ভদ্রতার চেয়ে নন্দর সেই অসংযত হাসিতে যেন কুটিলতা কম ছিল। নন্দর বিশ্রী মন্তব্যটার মধ্যেই যেন সহানুভূতি ছিল বেশী।

বিকালের দিকে বৃষ্টি কমিয়া গেল। অনেক ভাবিয়া সুমতি নন্দর খবর নিতে গেল। বলিল 'উপোস করছেন কেন?'

নন্দ সবগুলি জানালা বন্ধ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটা ভোরবেলার মতই আবছা।

'আমার জ্বর হয়েছে।'

'বেশী জ্বর?'

'কপালে হাত দিলেই টের পাবে জ্বর বেশী কি কম।'

কপালে হাত দিতে সুমতির সাহস হইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল 'একটু দুধ খান্।'

নন্দ ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

'সমস্ত বাড়ীতে পচা ঘিয়ের গন্ধ, লুচি ভাজছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে এসো খানকত লুচি, লুচিই খাব।'

'জ্বরের মধ্যে লুচি খাওয়া কি ঠিক হবে?'

নন্দ হাসিল।

'কপালে হাত দিয়ে যে জ্বর দেখতে পারে না তার সে ভাবনা কেন?'

ইহার জবাব অবশ্য সুমতি দিতে পারিল না, কিন্তু লুচিও সে নন্দকে খাইতে দিল না। এক বাটি গরম দুধ আনিয়া কড়া সুরে বলিল 'খান, ছেলেমানুষী করবেন না।'

কি মনে করিয়া নন্দ আর গোলমাল না করিয়া দুধ খাইল।

রাত্রে আবার দুধ খাইবার পালা। অন্ধকার গাঢ় বলিয়া এখন আর আলো জ্বালিতে কোন বাধা নাই।

আলো জ্বালিয়াই সুমতির চমক লাগিল। নন্দর অভূতপূর্ব ভাবপরিবর্তন ঘটিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া সে একটা পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়াছে, দুই হাতের দশটা আঙুলে টেবিল ঠুকিয়া অত্যন্ত জলদ একটা ধ্বনি তুলিয়া তাহারি তালে তালে মাথা নাড়িতেছে। রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া যায়, কপালের একটা শ্রীহীন কুঞ্চনের বারংবার লয় ও আবির্ভাব ঘটে, মুখখানি অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

সুমতি ভীত হইয়া উঠিল। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?'

পা নামাইয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। চোখ খুলিতেই বোঝা গেল দু'চোখ তাহার জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ কথা সে কহিল রসিকতা করিয়া।

'আমার প্রবল আনন্দ হয়েছে সুমতি!'

আনন্দই বটে! বিবর্ণ মুখে সুমতি বলিল 'কেন? কেন আপনার এমন আনন্দ হ'ল?'

'পড়'—না! একটি দুমড়ানো পত্র সুমতির হাতে গুঁজিয়া দিল। সুমতি পড়িল। নন্দর কাকার পত্র। সংবাদ সংক্ষিপ্ত। বিগত সতেরই শ্রাবণ সীতার বৈধব্য ঘটিয়াছে। নৌকা করিয়া কেদার গ্রামান্তরে যাইতেছিল। নৌকাতেই সে প্রাণ ভরিয়া মদ খায়। সুতরাং বর্ষার নদীতে টলিয়া গিয়া আর উঠিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া কেদার নদীর মধ্যে টলিয়া পড়িয়াছিল চিঠিতে সে কথা লেখে নাই।

সুমতি বহুক্ষণ মুখ তুলিতে পারিল না। শুষ্ক চোখ দেখিয়া নন্দ কি ভাবিবে কে জানে! নন্দর মধ্যস্থতায় অচেনা সীতার জন্য সুমতি সত্যই একটু একটু মমতা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা দুফোঁটা চোখের জল ফ্যালে। কিন্তু অশ্রু আজ দুর্লভ। জীবনটা সম্প্রতি নানাবিধ নাটকীয় উপাদানে এমনি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে যে চোখে জল আনা আর সহজ নয়।

মণিঅর্ডারের রসিদগুলি খাঁচা-ছাড়া পাখীর মত সর্‌সর্ করিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সুমতির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নন্দ বলিল, 'জান সুমতি, উত্তেজনায় আমার যে জ্বর এল সে শুধু মুক্তির আনন্দে নয়। নিজেকে খুনী বলে জানলে—'

'খুনী কি গো?' সুমতি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল।

'না না, চমকাবার কিছু নেই সুমতি। সে খুনের কথা বলছি না। তিন বছর ধরে মনে মনে যে কেদারের মারণ যজ্ঞ করেছিলাম সে তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাই কেবলি মনে হচ্ছে সে লোক যে অপঘাতে মরল তার দায়িত্বটা আমারই। ইবসেনের একটা নাটকে—আচ্ছা, থাক ইব্‌সেনের কথা।'

সুমতি চুপ করিয়া রহিল।

'শরীরটা এমন দুর্বল মনে হচ্ছে। যেন কতকাল রোগে ভুগেছি।'

সুমতি তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

নন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'বিশ্বাস করছ না? কিন্তু সত্যি এরকম হয়। A sudden shock to the mind and its subsequent disturbances may result in severe physical sickness. কেন হয় তাও বলছি শোন। আনন্দ ব্যথা ভয় এই সব উত্তেজনা মনে দেখা দিলেই শরীরের অনেকগুলি গ্ল্যাণ্ড থেকে রসস্রাব শুরু হয়। আনন্দ কম আর স্বাভাবিক হলে যে রস বার হয় শরীরের তাতে উপকার হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রবল আনন্দের রস ঠিক বিষের মত কাজ করে, ঠিক—'

'চুপ করুন।'

বলিতে বলিতে নন্দ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, থতমত খাইয়া চুপ করিল। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া বলিল 'অক্ষয় বাবুকেই জিজ্ঞাসা কোরো কথাগুলি সত্য কি মিথ্যা। তিন বছর ওমনি মেডিকেল কলেজে পড়িনি সুমতি, কিছু কিছু সবই জানি।'

'আচ্ছা! দুধটা খেয়ে ফেলুন।'

নন্দ মুখ ভার করিয়া দুধ খাইয়া বলিল 'এবার কি করতে হবে? লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোব? না ক খ শিখব?'

'আপনার খুশী' বলিয়া সুমতি চলিয়া যাইতেছিল, নন্দ ডাকিয়া ফিরাইল।

'চলে যাও যে? আমায় ঘুম পাড়িয়ে যাও। আমার আনন্দে বৈচিত্র্য দিয়ে যাও ভাল চাও ত', নইলে রাতারাতি হার্টফেল করব।'

সুমতি উদ্ধতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যে জবাব সে দিতে চাহিয়াছিল নন্দর মুখ দেখিয়া তাহা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শান্ত কণ্ঠে বলিল 'কি করতে হবে বলুন।'

নন্দ আঙুল বাড়াইয়া বিছানাটা দেখাইয়া বলিল, 'বালিশ সরিয়ে বিছানায় বোস, তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি শোব। ব্যস্, আর কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেও।'

সুমতি বিবেচনা করিয়া দেখিল, নন্দর দাবী যে অসঙ্গত নয় তাহার সপক্ষে যুক্তি আছে। আনন্দে তাহার বৈচিত্র্য না আসলে রাত্রে সত্যই সে ঘুমাইতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি এই উত্তেজনায় ছটফট করিয়া কাটাইলে আজিকার সামান্য অসুখ কাল বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া এতরাত্রে এই উত্তেজিত মানুষটির মাথা কোলে নিয়া ইহার বিছানায় সে বসে কি করিয়া?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সুমতি বলিল 'না। বোন বিধবা হয়েছে এই অজুহাতে এতবড় অন্যায় করতে আপনার না বাধুক, আমার বাধবে।'

কথাটার সমস্তটুকুর অর্থ বুঝিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়া নন্দ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

'তোমার সঙ্গে আর কোন দিন যদি আমি কথা বলি—আচ্ছা তুমি যাও। আর এক মিনিট দাঁড়ালে তোমায় আমি সত্যি অপমান করে বসব সুমতি। এক্ষুণি তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। নন্দ অপমান করিবে বলিয়া নয়, আর দাঁড়াইয়া থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। নন্দকে জানিতে তো তার বাকী ছিল না। নন্দ ছেলেমানুষী করিতে জানে ভাল করিয়াই, অপমান করিতে শেখে নাই আজও।

উপরে উঠিয়া বারান্দায় পা দিতেই অক্ষয় খপ করিয়া সুমতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

'তুমি নন্দর ঘরে ছিলে?'

দুর্বিনীত প্রশ্ন। সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'ছিলাম।'

'কেন ছিলে?'

'নন্দ বাবুর ভগ্নীপতি মারা গেছে খবর এসেছে, খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই—'

অক্ষয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল 'কিছু মনে কোরো না সুমতি।'

সুমতি অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিল 'না।'

অক্ষয় কৈফিয়ৎ দিল :

'মনটা ভাল নাই সুমতি। খোকা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল আর তুমি ওদিকে গল্পে মেতে আছ ভেবে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল।'

সুমতি বলিল 'খোকা কেঁদেছিল? কই শুনিনি ত।'

কেঁদেছিল বৈকি। আমি কি তোমায় মিথ্যে বলছি সুমতি?'

অক্ষয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুমতি ভাবিতে লাগিল সকাল বেলা চিঠির তাড়া খুঁজিয়া পাওয়ার প্রতিক্রিয়াটা যে অক্ষয়ের দিক হইতে প্রতিশোধের রূপ নিয়া আসিবে এ তাহার জানিয়া রাখা উচিত ছিল। নন্দর মত অক্ষয় ছেলে মানুষ নয়। অলকা তাহাকে প্রচুর নারী-অভিজ্ঞতা দিয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অক্ষয়কে তাহা কাজে লাগাইতেই হয়।

সে রাত্রির অপমানে রাগ করিয়া থাকার সুযোগ নন্দ পাইল না কারণ সুমতি তাহার উত্তেজনার জোরালো প্রতিষেধক দিয়া গেলেও পরদিন তাহার ভালমতেই জ্বর আসিল। মাথা কোলে তুলিয়া না নিলেও সুমতি সারাদিন তাহার মাথায় বরফ দিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর অক্ষয় নিজেই ওষুধ দিয়া গেল। সুমতির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল 'এর মধ্যে বিষ আছে, বুঝলে?'

সুমতিও বোধ হয় সেই প্রকার কিছু অনুমান করিতেছিল, সভয়ে বলিল 'বিষ?'

'হ্যাঁ। ভাল করে দাগ দেখে খাইও।'

সুমতি ছল ছল চোখে বলিল 'বিষ কেন?'

অক্ষয় হঠাৎ হাসিয়া বলিল 'সে তো তোমায় আমি এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারব না। ওর যা অসুখ একমাত্র বিষেই তা সারে।'

'একদাগের বেশী পড়লে মরে যাবে?'

'না, বেশীরকম নেশা হবে। শিশির সমস্ত ওষুধ খেলেও মরবে না, দিন তিনেক নেশায় অজ্ঞান হয়ে থাকবে বড় জোর। ডাক্তার অনেক মানুষ মারে, কিন্তু ইচ্ছা করে একজনকেও মারে না সুমতি।'

তা নিশ্চয় মারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার ডাক্তারের জন্মায়? সুমতির বয়স ত কম হয় নাই যে ইহাকে হেঁয়ালি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, কোন জবাব দিবে না। একান্ত অবিচলিত ভাবেই সুমতি বলিল, 'তা বৈকি। কর্তব্যের সঙ্গে সব সময় হৃদয়ের যোগ থাকবে তার তো কোন মানে নেই।'

অক্ষয় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুমতির মুখখানি অনেকক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল 'কিন্তু কোনমতে একটা কর্তব্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটে গেলেই আর সব কর্তব্য ভুলিয়ে দেয়।'

ইহাও হেঁয়ালি নয়। সুমতি বলিল 'তা দেয়, কিন্তু কোন কর্তব্যের সঙ্গে কার হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটেছে অন্য কর্তব্যে অবহেলা দেখেই সব সময় সেটা ধরা যায় না। কর্তব্যের তো ছোট বড় আছে।'

ওষুধের শিশি হাতে আকাশের সন্ধ্যার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া আত্মসমর্থন করিতে সুমতির গলা বুজিয়া আসিতেছিল। অথচ এ সমস্ত অক্ষয়কে জানানো প্রয়োজন। হৃদয়ের হিসাব-নিকাশ যে চিরকালের মত সে চুকাইয়া ফেলিয়াছে অক্ষয়কে ইহা বিশ্বাস করাইতে না পারিলে তাহার আর উপায় নাই।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা টাকার কাছে হার মানিতে পারে।—একটি মরণাপন্ন শাঁসালো রোগীর জীবন মরণের ভার নিতে অক্ষয় আপত্তি করে নাই।

রাত বারোটা অবধি তাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয় বাড়ী ফিরিতেছিল। দারোয়ান প্রভুর প্রতীক্ষায় ঢুলিতে ঢুলিতে রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, সেই অক্ষয়কে দরজা খুলিয়া দিল।

নন্দর ঘরের সামনে দিয়া অন্দরে যাইবার পথ। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দরজা খোলা। জেলখানার আধ ঘুমন্ত শান্ত্রীর মত বুকে চিবুক ঠেকাইয়া নন্দ লম্বালম্বি ঘরটা পরিক্রমণ করিতেছিল, গতি অত্যন্ত মন্থর, যে কোন মুহূর্তে ঘুমাইয়া পড়িয়া মেঝের উপর ঢলিয়া পড়া যেন আশ্চর্য নয়।

মেঝেতে লাঠি ঠুকিয়া অক্ষয় বলিল 'তুমি যে যাওনি হে?'

নন্দ দাঁড়াইল।

'না, যাইনি।'

'কেন? যাওনি কেন?'

'একটু দরকার ছিল তাই যাইনি। কাল যাব।'

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল 'কাল যাবে, কাল!—কাল আমার নতুন কম্পাউণ্ডার আসবে সকালবেলা, সে কোথায় থাকবে শুনি?'

'সে আসবার আগেই আমি যাব অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয় বিরক্ত হইয়া বলিল 'আমার মাইনে করা কম্পাউণ্ডার আমায় অক্ষয়বাবু বলে এ আমি পছন্দ করি না নন্দ। চিরকাল ডাক্তারবাবু বলে এসেছ, যাবার আগে আজ অকারণে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি কোরো না।। তা তুমি ঘরের মধ্যে এত রাত্রে পাক খাচ্ছ কেন?'

নন্দ ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল 'পরিশ্রম করছি। ঘুম আসে না ডাক্তারবাবু।'

'কোথাও যাবার সময় এরকম হয়' বলিয়া অক্ষয় অন্দরের দিকে পা বাড়াইল।

সিঁড়িটা অন্ধকার—নিবিড় জমাট অন্ধকার। অক্ষয়ের চোখ যেন অন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সুইচের অবস্থান জানা সত্ত্বেও আলো সে জ্বালিল না। বরং সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠিয়া অন্ধকারে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুয়ারের সামনে পুরা পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া আলোটা চোখে না সহাইয়া সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না। কাল যে আহার্য আগলাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে নাই তাহারি কৈফিয়তের মতে খোকাকে বুকের কাছে নিয়া মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া সুমতি জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

সিঁড়ি দিয়া নামা, উঠান পার হওয়া এবং নন্দর ঘরের দুয়ারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সংযত ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকা এই তিনটি কাজ করিতে সুমতির এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া সে যে একবারও পড়িয়া যায় নাই এইটুকুই আশ্চর্য।

ওপরে খোকার চীৎকার শোনা যাইতেছিল, ঘুমের চোখে সুমতি তাহার হাত মাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। কান পাতিয়া খোকার কান্না শুনিয়া সুমতি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। অমন করিয়া দিশেহারা হইবার কোন কারণ ছিল না। খোকার হাত যদি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে? এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়া এমন ভাবে খোকার কাছে বিদায় নিতে হইল তাহার!

নন্দ বলিল 'কি সুমতি শেষ বিদায় নিতে এলে বুঝি?'

জোর বাতাসে যেমন আকাশের মেঘ কাটিয়া যায় নন্দর মুখের কালো ছায়াটা তেমনি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশে পাশাপাশি দুই টুকরা সাদা মেঘ যেমন সূর্যালোকে ঝক-ঝক করে নন্দর চোখ দুটি তাহার সঙ্গে তুলনীয়।

সুমতি ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরময় এত ছেঁড়া কাগজ উড়িতেছে যে মনিঅর্ডারের রসিদগুলি এখনো মেঝেতে ছড়ানো আছে কি না বোঝা যায় না। চৌকীর উপর দড়ি দিয়া বাঁধা বিছানা, জিনিস বোঝাই তোরঙ্গটা এদিকে হাঁ করিয়া আছে।

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'না, বিদায় নিতে আসি নি। আপনার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। সকালে লজ্জা করবে, এখনি বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

রাত দুপুরে তাহার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে নন্দর চমক লাগার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্তে তাহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

'সে হয় না সুমতি!'

সুমতি বিহ্বলের মত বলিল 'হয় না?'

নন্দ মাথা নাড়িল 'না। এতবড় অনুচিত কাজে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। কি জান, আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাছাড়া, আমার সময় নেই।

ভয় পাইয়াছে। সময় নাই। সুমতি আগাইয়া গিয়া নন্দর চৌকীতে বসিয়া পড়িল। সম্বৎসর সাধনা করিয়া নন্দর আজ সিদ্ধিলাভের সময় নাই।

বহুকষ্টে সুমতি শান্ত হইয়া রহিল। কি ঘটিয়াছে জানা দরকার। কিছু যে ঘটিয়াছে—ভয়ানক একটা কিছু যে না ঘটিয়াই পারে না সুমতির তাহাতে সংশয় ছিল না। এভাবে হঠাৎ মানুষ বদলায়—নিজেকেই সে কি এখন চিনিতে পারিতেছে?—কিন্তু অকারণে বদলায় না।

নন্দ আবার বলিল 'রাগ কোরো না সুমতি, সত্য আমার সময় নেই। আমার এমন বিপদ হয়েছে বলবার নয়। সকাল বেলাই আমার সীতাকে খুঁজতে যেতে হবে—কতদিনে খুঁজে পাব ভগবানই জানেন।'—বলিয়া সে একটু থামিল, 'কিন্তু আজকের জন্যে তুমি যেন লজ্জিত হয়ো না সুমতি। তোমার এই মাঝরাত্রির দুর্বলতা আমি ভুলে যাব। সত্যি, এ আমার মনেও থাকবে না। সীতাকে যদি খুঁজে পাই, সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যানের সঙ্গে তোমার কাহিনীও তাকে আমি শোনাব সুমতি।'

বলিতে বলিতে নন্দ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

'তাতে তুমি আপত্তি করবে? তোমার জীবন কাহিনী শুনবার অধিকার কি সীতার আর নেই? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না?'

নন্দ পায়চারি আরম্ভ করিল। সীতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তার সহিত কথা কহিতে সুমতি যেন অস্বীকার করিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল 'তুমি কথা না কইলে অভিমানে সে কি করে বসবে কে জানে? ছেলেমানুষ তো, তোমার চেয়ে অনেক ছোট,—ভাল মন্দ বোঝে না। ছেলেটাকেও আমি চিনি সুমতি, কচি মেয়ে ভোলাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কতকাল ধরে সীতার মন ভাঙ্গছিল কে জানে।

'অন্ততঃ আজ রাত্রির কথা মনে করে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারবে না?'

বলিয়া নন্দ করুণ চোখে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওমিলনাইন

একুশ বছর বয়েসের সময় সুনীতি নামে একটি প্রায় একুশ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রমথের কয়েকমাসের জন্য খুব ভালবাসা হয়। সেই তার প্রথম বাস্তব ভালবাসা, সুতরাং, ব্যাপারটা তার পক্ষে একটু প্রচণ্ডই হইয়াছিল। বাকী জীবনটা সুনীতিকে ভালবাসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে নিজেকে সে ধন্য জ্ঞান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুনীতি নিজের বেলা পাতলা একগাছি চুল আর প্রমথের বেলা জাহাজ-বাঁধা কাছি দিয়া পরস্পরের বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা করায় তৃতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটামাত্র বাঁধনটা গিয়াছিল ছিঁড়িয়া। প্রমথ বীভৎস রকম বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে সুনীতির জীবনে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব যেন তারই আবির্ভাবের পুনরভিনয় এবং বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থাটাও অবিকল একই রকম। তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি প্রমথ তাই হিংসার লেশটুকুও অনুভব করে নাই। তার বরং মনে হইয়াছিল যে কয়েকমাস পরে নিজের ভালবাসার দড়িতে বেচারীর যে ফাঁসি লাগিবে সে জন্য ওকে তার মায়া করাই উচিত।

এখন, এধরনের দু'চারটা ছেলেমেয়ে সংসারে থাকিবেই একঘেয়ে জীবনযাপনের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য, ছুটিছাটায় বেড়াইতে যাওয়ার মত মাঝে মাঝে জীবনে যারা প্রেমের বৈচিত্র্য আনে। টানিয়াই আনে, মন অথবা গায়ের জোরে: অর্থাৎ, কালচার অথবা রূপের আকর্ষণে। এই আকর্ষণে যখন সেই ধরনের ছেলে মেয়েরা সাড়া দেয় বেহিসাবী আত্মসমর্পণ যাদের স্বভাব, তখন হয় একটু মুস্কিল। মিলন তাদের প্রেমকে আরও জোরালো, আরো ঘনীভূত করিয়া দেয় এবং তার পর যথাসময়ে যখন আসে বিচ্ছেদ তখন সামলানো হয় কঠিন। ব্যর্থ প্রেম কিছু নয়, বিরহ শুধু মনের কষ্ট, ও-সমস্তের জন্য মানুষের খুব বেশী আসিয়া যায় না,—ছেলে স্বর্গে গেলে মাকেও তো তা সহিতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক মনে হয় ট্রাজিডিটা, যখন বুঝিতে পারা যায় যাকে ভালবাসিয়াছিলাম তার হৃদয় হৃদয়ের রীতিনীতি মানে না, আমাকে সরল সহজ ভালমানুষ পাইয়া, আমার প্রথম যৌবনের অমূল্য সম্পদটুকু সে আমাকে ঠকাইয়া গ্রহণ করিয়াছে—শুধু একটু মজা করার জন্য। বিবাহের আগেই সুনীতির সঙ্গে তার যে অন্যায় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এই অপরাধটা প্রমথ নিজের বলিয়াই জানিত: ও দোষটা কখনো মেয়েদের হয় না। তার লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া সুনীতি হাসিত।

বলিত তুমি বড় ছেলেমানুষ।

প্রমথ ভাবিত, তার অনুতাপ দেখিয়া মমতার বশে সুনীতি তাকে সান্ত্বনা দিতেছে। তারপর যখন সে জানিতে পারিল চিরদিনের জন্য তাকে জীবনের সাথী করিবার সাধ সুনীতির কোনদিনই ছিল না, তখন সে হইয়া গেল একেবারে স্তম্ভিত। আত্মসম্বরণ করার জন্য সে একেবারে সাড়ে চারশো মাইল তফাতে কিছুদিনের জন্য চলিয়া গেল বটে কিন্তু সেখানেও সময়ে অসময়ে সুনীতির মাথার চুলের ওমিলনাইন তেলের মৃদু গন্ধ অনুভব করিয়া মাথা-ধরা ও গা বমি বমি আরম্ভ হওয়ায় সে আরও বেশী হতভম্ব হইয়া গেল। সাড়ে চারশো মাইল বাতাসে গন্ধ ভাসিয়া আসিবে এমন ম্যাজিক তো ওমিলনাইন কেশতৈলের নাই! যে বাড়ীতে সে অতিথি হইয়া আছে সে বাড়ীর মেয়েরা ওমিলনাইন তেলের নামও জানে না, সুনীতি ভিন্ন ন'রকম দেশী ও বিলাতি কেশতৈল একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারার মত টাকা অনেকের থাকিতে পারে কিন্তু সখ কারো আছে কিনা সন্দেহ! সুনীতির সাড়ী, ব্লাউজ, খোঁপা, চালচলন প্রভৃতি অনেক মেয়ে নকল করার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তার কেশতৈলের সুবাসটি চিরদিন হইয়া থাকিয়াছে অননুকরণীয়। সুনীতির আরেকটা নাম ছিল ওমিলনাইন হেয়ার অয়েল।

সুনীতির স্মৃতি যে একটা কেশতৈলের গন্ধ হইয়া রহিল প্রমথের কাছে, এ এক ধরনের মানসিক বিকার। নারীসংক্রান্ত না হোক এরকম অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই আছে। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ দশ-পনের বছর কিম্বা তারও বেশী পুরানো দিনের এক অবর্ণনীয় অনুভূতি দু'একবার কে না অনুভব করে জীবনে? পৃথিবীর রূপ, বাতাসের স্পর্শ ও গন্ধ, হৃদয়ের রসানুভূতি সমস্ত মিলিয়া জীবনের বহু পুরাতন ক্ষুদ্র এক অংশকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া দেয়। কচুবনে বৃষ্টি পড়িতে দেখিলে এখনো প্রমথ হইয়া যায় বারো বছরের বালক, বসিয়া থাকে নবাবদের আমলের পুরানো এক সহরে একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা একটা ঘরে ইটের স্তূপের আড়ালে, শোঁকে ঝাঁটি, কুকুরশোঁকা প্রভৃতি বুনোচারার গন্ধ আর অনুভব করে মৃদুবিষাক্ত বাচ্চা একটা সাপের কামড়। সুনীতির স্মৃতি তেমনি পরিপূর্ণ হইয়া আছে ওমিলনাইন তেলের গন্ধে। এখন, সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার চার বছর পরে সুনীতির স্মৃতি আর সবদিক দিয়াই প্রায় প্রমথের কাছে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে, শুধু একটা গভীর অবসন্নতা ও মেয়েদের প্রতি

একটা গভীরতর বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে করিতে সুমিলনাইন তেলের গন্ধ শুঁকিবার জন্য সুনীতিকে সে মনে করে।

এতকাল পরেও মেয়েদের প্রতি প্রমথের এই বিতৃষ্ণার ভাব বজায় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তার এই ভাবটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুনীতির কাছে তার দেহ-মন একদিন যে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিল জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা রদ করিবার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন তার ভিতরে আপনা হইতে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই আভ্যন্তরিক প্রতিবাদ তার এত জোরালো যে ভ্রান্তি টুটিয়া যাওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা আর কোন রক্তমাংসের মেয়ের সঙ্গে তার জন্মানো সম্ভব নয়। সব মেয়েই যে সুনীতির মত এ বিশ্বাস প্রমথের জন্মে নাই, সাধারণভাবে মেয়েদের সে অশ্রদ্ধা করে না। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া নারীবিদ্বেষের সমর্থক যুক্তিতর্কের আবিষ্কার করার চেষ্টাও সে করে না। মেয়েদের বিচার করিতে সে একেবারেই ভালবাসে না, ওবিষয়ে মাথাঘামানোকে সে মনে করে ছেলেমানুষী। তবু সেই আঘাতটির পরবর্তী বিকারে যে অন্ধ আতঙ্ক তার হৃদয়মনে বাঁচিয়া আছে, এই বয়সে তরুণী নারীর ভালবাসা লাভ করার স্বাভাবিক পিপাসার স্থানে সে আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিয়াছে ততোধিক স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। মেয়েরা ভাল, মেয়েরা দেবী। মেয়েরা ভালবাসিলে মানুষ ধন্য হইয়া যায়। কিন্তু কাজ নাই বাবা কারো ভালবাসায় প্রমথের!

এই সময় পাইবে না পাইবে না করিয়া প্রমথ একটা হাকিমী চাকরী পাইয়া গেল এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিবাহ করিবে না করিবে না ঘোষণা করিতে করিতে প্রায় হইয়া উঠিল পাগল। কোনদিন বিবাহ না করার ইচ্ছা প্রমথের ছিল না, আর দশটি সাধারণ সুস্থচেতা মানুষের মত জীবনটা কাটাইয়া দিবার দিকেই বরং তার ছিল বেশী ঝোঁক। কিন্তু চিত্ত তো এখন তার সুস্থ নয়। এখন মন্ত্র-পড়া সামাজিক বিবাহের পবিত্র বাঁধনে বাঁধিয়া একটি মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করিলে যদি মনের অসুস্থতা বাড়িয়া যায়, রূপান্তর নেয়! নিজের বৌকে আদর করিতে গেলেই যদি নাকে আসিয়া লাগে ওমিলনাইনের গন্ধ, মাথা ঘুরিয়া উঠে, গা করে বমি বমি, আর মনে হয় যে এই রক্তমাংসের জীবটির মুখ-চোখ হাসি-গল্প মান-অভিমান চাল-চলন সব সুনীতির প্যারডি? তার চেয়ে আর কিছুদিন মনটাকে সুস্থ হইবার সময় দিয়া একটু ভারিক্কি বয়সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করাই নিরাপদ।

এগারমাস মফস্বলে একা একা হাকিমী করিয়া ভারিক্কি বয়সের ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রমথ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিল কিনা বলা যায় না, এক মাসের ছুটি লইয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে আসিয়া তিনদিন স্পষ্ট 'না' ও চারদিন আমতা আমতা 'না' বলিয়া, গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে হইয়া গেল মৌন। সুতরাং যথাসময়ে তার একটি বৌ আসিল। ঠিক বৌ নয়, সহধর্মিণী অথবা জীবন-সঙ্গিনী,—সংসারযাত্রা নির্বাহের উপায়স্বরূপিণী। কারণ, এই বয়সে প্রথম বৌকে প্রথমদিকে মানুষ সচরাচর যে ভাবে চায়,—প্রিয়া বা প্রেমিকা হিসাবে, বিশেষ আত্মবিস্মৃত অবস্থাতেও প্রমথ কখনো বৌকে সেভাবে চাহিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

নাম হাসিরাশি। একটু বেঁটে কিন্তু দেখিতে বেশ, শুনিতে আরো। অর্থাৎ গলাটি তার ভারি মিষ্টি। মাথা- ধরার অসুখ থাকার জন্য যদিও হাসিরাশি খুব বেশী হাসিখুশি নয়, স্বভাবটি ভারি শান্ত, প্রকৃতিটি কোমল। এবং বোধ হয় ওইজন্যই বয়সের তুলনায় সে একটু বেশীরকম ভারিক্কি। মেয়েটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় সংসারে বাঁচিয়া থাকাটাকে সে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করে, জীবনধারণের যে-সব রীতি নীতি সে এতকাল জানিয়াছে ও মানিয়াছে অথবা এবার হইতে জানিবে ও মানিবে সেগুলি চিরকাল পাইয়াছে তার গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্মান এবং চিরকাল তাই পাইবে।

প্রথমবার প্রমথ যখন তার সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল তখন হাসির ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া দেহ-মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিয়া প্রমথ শুরুতেই হঠাৎ আলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে কিছু মনে করে নাই। পরেব বার তার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকায় ভাই যে-ভাবে বোনের সঙ্গে গল্প করে প্রমথ তার সঙ্গে তেমনি ভাবে গল্প জুড়িয়া দিতে অবাক হওয়ার বদলে সে খুশীই হইয়াছিল। এইসব আবেগবিহীন সহজ মানুষকেই হাসিরাশি ভালবাসে। ব্যস্ততার বদলে নিজের বৌ-এর সঙ্গেও যে এইরকম আস্তে আস্তে ভদ্রভাবে প্রথম চেনাপরিচয়টা ঘটিয়া উঠিতে দেয় সে কত ভাল লোক! একবার সে যে পায়ে হাত দিয়াছিল সেটা সত্যসত্যই পিঁপড়া ঝাড়িয়া ফেলার জন্যই। এবং সেজন্য সলজ্জভাবে পায়ে হাত দিয়া তাকে প্রণাম করার সময়ও আচমকা হাত ধরিয়া সে যে তাকে খানিকটা আদর করিয়া বসে নাই এ-ও কি তার সহজ ভদ্রতার পরিচয়!

বিবাহের পর হইতেই অনেক বিষয়ে প্রমথ আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল, হাসিরাশিকে সঙ্গে করিয়া পূর্ববঙ্গের একটা সহরে প্রথম সংসার পাতিয়া বসিবার পর

আরও বেশী আশ্চর্য হইয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল যে মানুষের জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই একপেশে ও অসম্পূর্ণ, অধিকাংশ ধারণা ও মতবাদ অসম্বদ্ধ ও অযৌক্তিক। তা না হইলে হাসিরাশির সাহচর্য তাকে কেন এভাবে বদলাইয়া দিবে? কেন রসালো হইয়া উঠিবে আগেকার নীরস মুহূর্তগুলি, কেন তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে হইবে না এতদিন যে সমস্তকে সে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করিত? যে নিজেটাকে সে এত ভালভাবে জানিত বলিয়া তার ধারণা ছিল এখন সেই নিজেরই এত সব অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত পরিচয় কোথা হইতে তার কাছে ধরা পড়িতে থাকিবে? কি বোকার মতই এতগুলি বছর ওরকম বিশ্রীভাবে সে জীবন-যাপন করিয়াছিল! সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবামাত্র সে যদি হাসিরাশির মত একজনকে বিবাহ করিয়া এইরকম পবিত্র মধুর গার্হস্থ্য-জীবন আরম্ভ করিয়া দিত, যাতে, কোন বেলা কি রান্না হইবে সেটা পরামর্শ করিয়া ঠিক করার মধ্যে পর্যন্ত অনায়াসে যত খুসী প্রণয়ের আমদানী করা যায়, জীবনের এতগুলি বছর তবে তার ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

ওগো, শুনছ?—প্রমথ বলে।

হাসি বলে, না, শুনছি না। একশোবার এমন বুড়ো মানুষের মত ডাকবে কেন শুনি?

কি বলে ডাকব তবে?

কেন, এই!—বলে ডাকবে, শিস্ দিয়ে ডাকবে, নয় তো একটা আদরের নাম দিয়ে তাই বলে ডাকবে।

প্রমথ গম্ভীর মুখে বলে, তুমি যেচে সোহাগ নিচ্ছ, হৃদয়রাণী?

হাসি আরও বেশী গম্ভীর হইয়া বলে, নিজের জিনিস আমি যেভাবে খুশী নেব, তোমার তাতে কি? তা ছাড়া যারা ভাল মেয়ে তারা বুঝি ছল ক'রে সোহাগ নেয়? স্পষ্ট দাবী করে।

সুনীতির সঙ্গে আরও ঢের বেশী সূক্ষ্ম হাসি তামাসা চলিত, সুনীতি আরও ঢের বেশী আর্টিষ্টিক ভঙ্গির সঙ্গে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কবিত্বের সৃষ্টি করিতে পারিত, তবু স্ত্রীর হাসির ভঙ্গি ও কথাই প্রমথের বেশী উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। হঠাৎ সুনীতির প্রতি সে একটা স্পষ্ট জোরালো ঘৃণার ভাব অনুভব করে। এতকাল পরে তার আজ প্রথম আপসোসের সঙ্গে মনে হয় যে ক্লীবের মত, দার্শনিকের মত সুনীতির অপরাধকে তার উপেক্ষা করা যেন উচিত হয় নাই, ওই ক্ষমাটা

পর্যন্ত সুনীতি তাকে বোকা পাইয়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। সুনীতিকে একটা। ভাল রকম শাস্তি দিলে বড় ভাল হইত,—মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইত।

স্ত্রীর সঙ্গে এই তুচ্ছ কথোপকথনটি তার সকালবেলার। কাল হাসি সোডা দিয়া চুল সাফ করিয়াছিল, আজ তেল দিয়া স্নান করিবে। তার রুক্ষ ফাঁপানো চুলে একফোঁটা তেলের চিহ্নও নাই। তবু এই অসময়ে কোথা হইতে যে প্রমথ ঘ্রাণ পাইতে লাগিল কেশতৈলের! সেই চির পরিচিত ওমিলনাইনের গন্ধ!

হাসি হাসি বন্ধ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হল? কি হল তোমার হঠাৎ?

প্রমথ বলিল, তোমার তেলের শিশিটা নিয়ে এসো তো চট্ করে!

কেন?

আগে আনো, বলছি।

হাসি তেলের শিশি আনিয়া দিল।

দেশী তেল। গন্ধটা চড়া। ছিপি খুলিয়া শিশিটা নাকের সামনে ধরিয়া প্রমথ জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল, হাসি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল তার বিবর্ণ কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘর্মের আবির্ভাব। আগেও সে দু'একবার স্বামীর এরকম আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু কোনবারই এত স্পষ্ট ও প্রবল ভাবে নয়। জিজ্ঞাসা করিতে প্রমথ ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে, ও কিছু না।

আজ প্রমথ শান্ত হইলে কারণ জানিবার জন্য হাসি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। প্রমথ বলিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল!

মাথা ঘুরে উঠল বলে তেলের গন্ধ শুঁকবে কেন?

তেলের গন্ধ শুঁকলে আমার মাথাঘোরা সেরে যায়।

কি বলছ পাগলের মত? তাই কখনো হয়? কি হয়েছে তুমি বলছ না আমায়।

ওই তো বললাম!

আবোল-তাবোল কতগুলি কৈফিয়তে তখনকার মত হাসিকে শান্ত করা যায় বটে কিন্তু তার কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না। পরদিন সে আবার একথা তোলে। তারও পরের দিন। একবার প্রমথের মনে হয় সুনীতির কথা সব সে শোনাইয়া দেয়। কিন্তু এতকাল পরেও সুনীতির মাথার চুলের কাল্পনিক ঘ্রাণ নাকে লাগিয়া

সে অতদূর অসুস্থ হইয়া পড়ে একথা জানিলে হাসি ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাকে সব কথা জানাইতে তার সাহস হয় না। কে জানে হাসি বিশ্বাস করিবে কি না যে আজকাল সুনীতির প্রতি আকস্মিক ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও জোরালো ভাবে সে ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আগের চেয়েও বেশী বিচলিত হইয়া পড়ে। হয়ত ধীরে ধীরে হাসির সঙ্গে তার যে গভীর অন্তরঙ্গতা জন্মিতেছে এসময় হাসিকে সুনীতির কাহিনী জানাইয়া দিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে। সুখে শান্তিতে জীবন-যাপনের যে সম্ভাবনা তার দেখা দিয়াছে চিরদিনের জন্য তাহা হইয়া যাইবে অসম্ভব।

এতদিন পরে সুনীতির সম্বন্ধে নিজের মানসিক পরিবর্তন প্রমথকে আশ্চর্য ও চিন্তিত করিয়া রাখে। ব্যক্তিগতভাবে একজনের সম্বন্ধে এতকাল উদাসীন থাকিবার পর, একটা বিষাদময় বৈরাগ্যে জীবনের সুখ-দুঃখকে মৃদুভাবে উপেক্ষা করিয়া দশজনের মাঝখানে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া আবার বাস্তবজীবনকে ভালবাসিয়া নূতনভাবে জীবনটা আরম্ভ করিবার পর সেই একজনের প্রতি এমন ভয়ানক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আসিবার অর্থ কি? এসব মানসিক বিকারের কি আবির্ভাব ঘটা উচিত ছিল না তখন, সুনীতির ব্যবহার যখন তাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল? সুনীতিকে প্রায় ভুলিয়া যাওয়ার পর সে কি তার জন্য নূতন করিয়া বিরহের জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল? এ তো বড় খাপছাড়া কথা!

মাঝে মাঝে কি ভাব এত?—হাসি জিজ্ঞাসা করে।

তোমার কথা ভাবি।

হাসি খুশী হইয়া বলে, সত্যি? কিন্তু আমি যখন কাছে থাকব না তখন আমার কথা ভেবো,—এখন থেকে কেন? মা তো কদ্দিন থেকে লিখছেন যাবার জন্য, এসেছিও তো অনেকদিন হল, মাসখানেকের জন্যে দাও না পাঠিয়ে আমাকে মার কাছে?

প্রমথ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, না না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমায় ছেড়ে আমি এখন একদিনও থাকতে পারব না।

আগে প্রথমে নাকে লাগিত ওমিনাইন তেলের গন্ধ তারপর আসিত অন্য উপসর্গ। আজকাল প্রথমে প্রমথ সুনীতির কথা ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া তোলে তারপর আসে ওমিলনাইনের সুবাস ও পরবর্তী কষ্টগুলি। ব্যাপারটা প্রমথকে বেশীরকম দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে এইজন্য যে এই অস্বাভাবিক আক্রমণ

ঘটিবার সময় ছাড়া বাকী প্রায় সব সময়েই সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে করিতে মহানন্দে বাঁচিয়া থাকে। আগে সে তার বিকারকে গ্রাহ্যই করিত না, এখন এরকম কেন হয় বুঝিবার চেষ্টা করে, এরকম হওয়া বন্ধ করার কোন উপায় আছে কি না বসিয়া বসিয়া তাই ভাবে।

তবে, মোটামুটি তাকে সুখীই বলা যায়। পাঁচবছরের বেশী সময়ের ব্যবধানে ও কে জানে কতখানি দূরত্ব পার হইয়া সুনীতির মাথায় ওমিলনাইন তেলের গন্ধ তার নাক ও মনের সঙ্গে যে রসিকতা করিতে আসে, সেই অল্প সময়ের জন্যই। কিছুক্ষণ একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে। তখন আর বুঝিবার উপায়ও থাকে না যে তার শান্ত হাসিখুশী মুখের পিছন দিকে, চুলেঢাকা খুলির শক্ত হাড়ের তলে যে নরম মগজটা আছে তার মগ্ন-চেতনার অংশটুকুতে বাস করে এমন খাপছাড়া একটা বিকার।

হাসিরাশিকে প্রমথের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, কয়েকদিনের জন্যও তাকে ছাড়িয়া থাকিবার কথা ভাবিলে সত্যসত্যই তার কষ্ট হয়। এ রকম সরলা; স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী ও সহজাত সু-ভাবাপন্না স্ত্রী পাওয়ার জন্য নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করে। বিবাহ করার আগে যা ছিল শুধু অসম্ভব কল্পনা, যে সুখ ও শান্তির স্বরূপ সে প্রায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, জীবনের নিরপেক্ষ সদয় দেবতার কল্যাণে আজ সে প্রায় সবই ফিরিয়া পাইয়াছে। শুধু ওমিলনাইনের অত্যাচার সহ্য করিবার দুর্ভাগ্যটা যদি তার না হইত! আদর্শ জীবন হইত তার, কোন দিকে এতটুকু খুঁত থাকিত না।

এমনিভাবে দিন কাটিতে কাটিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ছুটিটা কাটাইবার জন্য প্রমথ সস্ত্রীক আসিল কলিকাতায়। কলিকাতায় পৌঁছিবার দিনই সন্ধ্যার পর তার রহস্যময় মোহের রাজ্য হইতে ওমিলনাইনের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া তাকে ভয়ানক উতলা করিয়া দিল। পরদিন সকালে সে হাসিকে বলিল, তুমি মাথায় যে তেল মাখো ওটার গন্ধ ভারি বিশ্রী। আমি একটা আশ্চর্য তেল এনে দিলে মাখবে?

আশ্চর্য তেল আবার কি জিনিস গো, এ্যাঁ?

কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন তেল মিশিয়ে আমি নিজেই তৈরী করে দেব, মাখবে তো?

ওমা, কেন মাখব না? চুল উঠে গেলে কিন্তু মজা দেখাবো তোমায়! সে দায়িত্ব তোমার।

প্রমথ বলিল, উঠে যাবে? চুলের ভারে হাঁটতেই পারবে না দেখো। কি নাম জান তেলটার? ওমিলনাইন।

কিছুকাল হইতে এই কথাটা প্রমথ ভাবিতেছিল। অস্তিত্বহীন ওমিলনাইনের যদি তাকে এরকম ভাবে বিরক্ত করে, নিজের চারিদিকে আসল ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া রখিয়া ক্রমেক্রমে গন্ধটা অভ্যস্ত করিয়া আনিলে হয়তো আর সে বিচলিত হইবে না? সব সময় যে গন্ধ সে অনুভব করিবে সে গন্ধের কাল্পনিক আবির্ভাব হয়তো সে টেরও পাইবে না? প্রথমটা হয়তো সর্বদা এই গন্ধ শুঁকিতে তার খুবই খারাপ লাগিবে, হয়তো অল্প সময়ের ব্যবধানে বারংবার তার মনের বিকার জাগিয়া উঠিবে, মাথা-ঘোরা গা বমি বমি করার আর বিরাম থাকিবে না। তবু আসল ওমিলনাইনকে অভ্যাস করিয়া শেষ পর্যন্ত নকল ওমিলনাইনকে যদি জয় করিতে পারা যায়, একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল।

একবার স্নীতিকে প্রমথ ওমিলনাইনের উপকরণগুলি উপহার দিয়াছিল। শুধু এইজন্ম ন'টি বিভিন্ন তেলের নাম এতকাল পর্যন্ত কারো মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রমথের জীবনে ওমিলনাইন কেবল একটা মিশ্রিত কেশ-তৈল নয়, স্নীতির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর স্নীতির চেয়ে এই তেলটার কথাই বোধ হয় তাকে ভাবিতে হইয়াছে বেশী, এখনো না ভাবিলে চলে না। ন'টি তেলের প্রত্যেকটির নাম আজও তার নিজের নামের চেয়েও স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সেইবেলাই ওমিলনাইনের উপকরণ আসিল। ছোট-বড় দেশী-বিলাতী ন'টি বিভিন্ন কেশতৈলের শিশি। তাকে তেল মাখানোর জন্য স্বামীর আয়োজন ও আগ্রহ দু'টারই পরিমাণ দেখিয়া হাসিরাশি হাসিতে লাগিল।

এতগুলি তেল মাখব?

দাঁড়াও না, এমন তেল তৈরী করে দেব, গন্ধে সবাই মূর্চ্ছা যাবে। বিকেলে এই তেল দিয়ে চুল বেঁধো, কেমন?

দুপুরে একটা কাচের পাত্রে তেলগুলি মেশানো হইল। তখন প্রমথ আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল তার এতদিনকার কাল্পনিক ওমিলনাইনের সঙ্গে এই আসল ওমিলনাইনের গন্ধের কিছু পার্থক্য আছে। যতক্ষণ এই পার্থক্যটুকু খেয়াল করিয়া সে বিস্মিত হইয়া রহিল ততক্ষণ তার আর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। মাথা ধরিল না প্রমথের, গা বমি বমি করিতে লাগিল না, একটা নূতন ধরনের অস্বস্তিকর রহস্যময়

যন্ত্রণা বোধ করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ানক একটা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও কি ঘটে দেখিবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইলে মানুষের যেমন লাগে সেইরকম একটা ক্লেশদায়ক বিপন্নতার অনুভূতি। এক একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ থাকে, তামাসা করিয়া একটা ছোট ঘরে কয়েক মিনিটের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলেও যাদের দম আটকাইয়া আসে, ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ওমিলনাইনের গন্ধের আবেষ্টনী তেমনি পীড়ন করিতে লাগিল প্রমথকে। সে জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল।

প্রথমটা হাসিরাশি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, কি হোল তোমার? তেলের গন্ধে নিজেই মূর্চ্ছা যাচ্ছ নাকি সত্যি-সত্যি?—গন্ধটা সত্যি ভারি অদ্ভুত!

তারপর ভয় পাইয়া সে কাচের পাত্রটা প্রমথের সম্মুখ হইতে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই সেখানে বসিয়া পড়িল, প্রমথকে নাড়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, কি হোল? কি হোল তোমার হঠাৎ? এমন করছ কেন?

প্রমথ কাতরভাবে বলিল, কিছু হয় নি।

হাসিরাশি ব্যাকুল হইয়া বলিল, হয়নি। তোমার মুখ দেখে বুকের মধ্যে কাঁপছে আমার। কি হয়েছে বল না?

প্রমথ একথার কোন জবাব দিল না। উঠিয়া জামা গায়ে দিল।

হাসি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছ?

ভবানীপুর যাব।

ভবানীপুর সে গেল বটে কিন্তু গেল পার হইয়া। হাজির হইল বালীগঞ্জে, সুনীতির গৃহে। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে যে-ভাবে সোজা ওখানে গিয়া পৌছিল তাতে একথা মনে করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল যে সুনীতিকে দেখিবার জন্যই সে বাড়ীর বাহির হয় নাই।

সুনীতি আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি আশ্চর্য! কি ভাগ্য আমার! বোসো, বোসো। কবে এলে কলকাতায়? তুমি এখন কুমিল্লায় পোষ্টেড আছ, না? তুমি অবিশ্যি আমায় ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি কত খবর রাখি দেখছো! বিয়ে করেছ নাকি?

প্রমথ বলিল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব সুনীতি। তুমি এখনো চুলে ওমিলনাইন তেল মাখো? গন্ধ পাচ্ছি না তো?

সুনীতি আরও আশ্চর্য হইয়া বলিল, এ্যাদ্দিন পরে এসে, প্রথমেই এই কথা জিজ্ঞাসা করলে? না, ওমিলনাইন ফোমিলনাইন মাখি না আর। ও সব আর ভাল লাগে না। মানুষ কি চিরদিন একরকম থাকে?

হঠাৎ সুনীতি গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া গেল।—তুমিই বল, চিরদিন কি মানুষ একরকম থাকে? তখন ঐরকম স্বভাব ছিল, খাপছাড়া কাজ করতেই ভালবাসতাম। মাথার তেলটা পর্যন্ত নতুন কিছু না হলে চলত না। সে স্বভাব অনেকদিন গেছে। এখন—

আচ্ছা, আজকে উঠলাম সুনীতি।

আসতে না আসতে উঠলে কি রকম? এরকম আসার মানে? বোসো না একটু, খানিক কথাবার্তা বলি?

প্রমথ সহজ ভাবেই বলিল, না, বসার সময় নেই। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে সঙ্গে করে সিনেমায় যেতে হবে।

সুনীতি বলিল, ও, এবার বুঝতে পারছি। একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছো এই খবরটা দিতে এসেছিলে। তিনি কি রকম রূপসী আর গুণবতী সে বর্ণনাও দাও, মন দিয়ে শুনছি। একটা কিছু করতে এসে কাজটা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে নেই।

প্রমথ বলিল, রূপ-গুণ তেমন কিছু নেই সুনীতি। তবে মনটা খুব সরল আর চরিত্রটা ভাল।

সুনীতির বাড়ী হইতে প্রমথ নিজেদের বাড়ী ফিরিল না, এদিক-ওদিক খানিক ঘুরিয়া একাই সিনেমা দেখিতে গেল। মানুষের সরলতা ও সুচরিত্রতা তার কাছে হঠাৎ মূল্যহীন, অর্থহীন, অকারণ মনে হইতেছিল। কি আসিয়া যাইত সে সময় সুনীতিকে ক্ষমা করিলে, তার চাকরীর খবর গেজেটেড হওয়ার পর সুনীতি যখন তাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল?

হাসিরাশি ওমিলনাইন তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, সারারাত তার মাথাটি থাকে প্রমথের মাথার পাশে। ভাল ঘুম হয় না প্রমথের। দিনের বেলা বাড়ীর যেখানে যায় সেখানেই যেন প্রমথ ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আত্মীয়স্বজনেরা যেন ঘুরিয়া বেড়ায় ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া। ওমিলনাইনের সুবাসে বাড়ীর সকলে মূর্চ্ছা যায় নাই কিন্তু মোহিত হইয়া গিয়াছে। সকলে আগ্রহের সঙ্গে ওই তেলটাই ব্যবহার করে। হাসিরাশি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই তেলটা বিলায়। স্নানের আগে প্রমথকেও মাখিতে দেয়।

প্রমথ হঠাৎ বলে, ইয়ার্বি হচ্ছে নাকি আমার সঙ্গে ?

হাসিরাশি স্তম্ভিত হইয়া বলে, ইয়ার্কি ? কি বলছ তুমি ?

প্রমথ মুখ ফিরাইয়া বলে, আমি সর্ষের তেল ছাড়া কিছু মাখি না জান না তুমি ?

একদিন অন্য তেল মাখতে বললে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?

হাসিরাশি অভিমান করিয়া থাকে। স্ত্রীর অভিমান ভাঙ্গাইতে গিয়া এবার প্রমথের মন ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়া যায়। আর একজন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া ভাঙ্গাইবে শুধু এই জন্য যে অভিমান, এবার সে অভিমানকে তার অতি কদর্য বলিয়া মনে হয়। সরলতা না ছাই। একরঙা ছবির মত শুধু বৈচিত্র্যের অভাব। হাসিরাশি আগে যে সাধারণ একটা তেল মাখিত, ওমিলনাইন তেলের তুলনায় সে তেল যেমন, কুটিল ও জটিল স্থনীতির তুলনায় হাসিরাশিও তেমনি।

ছুটি শেষ হওয়ার দু'দিন আগে প্রমথ একদিন হঠাৎ হাসিরাশিকে বলিল, তোমাকে নেবার জন্যে ওরা খুব ব্যস্ত হয়েছে, না ?

হাসিরাশি বলিল, হবে না ? প্রায় আট মাস হল এসেছি।

তোমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে তো ?

ওমা, বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না কার ?

সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া হাসিরাশির মাথার ওমিলনাইন তেলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রমথ বলিল, তা'হলে চল কাল আমরা বেরিয়ে পড়ি। তোমাকে বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি একা কুমিল্লা চলে যাব। একা একা আমার খুব কষ্ট হবে বটে, তবু—

জন্মের ইতিহাস

খোকার আসার যখন মাস কয়েক বিলম্ব ছিল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দুজনের জল্পনা কল্পনার আর বিরাম থাকিত না। তার অর্দ্ধেক বাস্তব অর্দ্ধেক অবাস্তব এবং প্রায় সমস্তটাই স্বপ্নবৎ মনোরম। এ হেন আশ্চর্য সম্ভাবনা যেন জগতের আর কোন নরনারীর জীবনে আজ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই। তিন বছর ধরিয়া তাহাদের যে অনন্যসাধারণ প্রেম বসন্তের ফুলবনে পথ-ভোলা পথিকের মত লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন বাধাহীন অবস্থায় ঘুরিতেছিল আজ লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র সে প্রেম তাহাদের স্বর্গে মর্ত্যে অতীত ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সকল প্রেমের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠন নিবাইয়া সুলতা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়াছে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবার পরেও ঘরের কোণে এ দীপ জ্বলিতে থাকে। খানিক আবোল তাবোল বকিবার পর বিকাশ বলে, 'বৌ অনেকের থাকে সুলতা, কিন্তু তোমার মত বৌ—'

সুলতা মনে মনে বলে, 'কত জন্মের তপস্যা আমার সেটাতো দেখতে হবে?'

বিকাশের উচ্ছ্বাস জাগে, আন্তরিক নাটকীয় সুরে সে বলে, 'না সুলতা, তুমি শুধু আমার প্রিয়া নও, প্রিয়ারও বেশী। ঠিক যে তুমি কি তা অবশ্য আমি বলতে পারি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তুমি প্রিয়ারও অতিরিক্ত কিছু।'

লজ্জায় সুলতা হাসে, বলে, 'দ্যাখো, এত বাড়িও না। এতদিন বাইরের লোক স্ত্রৈণ বলেছে, এবার তাহলে আমিও বলতে শুরু করব।'

বিকাশ বলে 'হুঁ বল না। গলা বুজে আসবে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসতে পারে না তারাই পরকে স্ত্রৈণ বলে গাল দেয়। তুমি কি ওকথা বলতে পার?'

সুলতার চোখ ছল ছল করিয়া আসে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসিতে পারে না তাহারা সুলতার অজানা জগতের মানুষ নয়। পাশের বাড়িতেই চরম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কি কান্নাই বৌটা এক একদিন কাঁদে? ভালবাসুক আর না বাসুক স্ত্রীকে যার অমন ভাবে কাঁদতে হয় সে দুর্ভাগা বৈ কি!……

ভালবাসার ভবিষ্যৎ ভাগবাঁটোয়ারা নিয়া রোজ তাহাদের তর্ক হয়।

সুলতা স্বীকার করে না তার ভালবাসার সীমা আছে। ছেলেকে ভালবাসা

দিতে হইলে স্বামীর ভাগটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে'—একথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

'তোমার জন্যে যে ভালবাসা সে তোমারি থাকবে গো, খোকার জন্য নতুন ভালবাসা জন্মাবে। তুমিই বরং আমাকে আর তেমন,—'

'দেখো। খোকাকে নিয়ে আমার দিকে যখন তাকাবারও সময় পাবে না—'

এমনি সব অর্থহীন কথার খেলা। অথচ ইহারি ভিতর দিয়া—দুজনের যে অনির্বচনীয় মিলন ঘটিয়া চলে প্রেরণার মুহূর্তেও কি কোন কবি কোনদিন তার মানসীর সঙ্গে তেমন মিলনের স্বাদ পাইয়াছে?

—'যে কাঁথাটা ধরেছিলে শেষ হ'ল?'

'একটু দেরী আছে। আজ হয়ে যেত, ঠাকুরঝি এমন ঠাট্টা শুরু করলে--'

—'মিনুর খোকার জন্য মা আর কাঁদে না দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। কেন বলত?'

'তোমার খোকার পথ চেয়ে আছেন। তোমার যে খুকীও হতে পারে একথা কিন্তু মার মনেও পড়ে না!'

'তোমার পড়ে?—'

—'আমি হার দিয়ে খোকার মুখ দেখব সুলতা।'

'মা যে হার দেবেন ঠিক করেছেন।'

'ও, হ্যাঁ। মনে ছিল না। আমি তবে কি দেব বলত?'

'ওর মাকে একটু ভালবাসা দি'ও।'

এমনি ভাবে তাহারা কথার পিঠে কথা গাঁথিয়া চলে, কখন যে তাহা হাস্য পরিহাসে দাঁড়াইবে কখন গভীর আলোচনার রূপ নিবে কিছুই স্থিরতা থাকে না। দুজনের মনেই যেন স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোন ও এক স্তূপ রেকর্ড আছে, কীর্তনের পরেই কমিক গান বাজিয়া যায় এবং গ্রামোফোনের প্রথম শ্রোতা বালকবালিকার মত তাহাতেই তাহাদের সবিস্ময় পুলকের অন্ত থাকে না।

শেষরাত্রে হঠাৎ সুলতার ঘুম ভাঙ্গাইয়া খোকা কার মত দেখিতে হইবে এবং কি নাম রাখিলে সমবেত ভাবে দুজনের পছন্দের মর্যাদা থাকিবে এ আলোচনা করা বিকাশের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে হয় না। কিন্তু দিন ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ছেলেমানুষী আলোচনা কমিয়া যায়। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটিবার প্রতীক্ষায় সুলতার দেহ যেমন অস্থির করে মনে তেমনি একটা একটানা

ভয় বাসা বাঁধে। স্বামীর একটা হাত বুকে চাপিয়া সে অনেক রাত্রি অবধি নীরবে জাগিয়া থাকে, বিকাশ তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে।

'ভয় কি সুলতা ?'

সুলতা আরও শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

আত্মীয় পরিজন সকলের মুখে অল্পবিস্তর চিন্তার লক্ষণ দেখা দেয়, বয়স্কেরা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে নানারকম পরামর্শ করেন, মন্থরগতিতে আগামী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে।

বিকাশের বিধবা মা, মা কালীর কাছে মানত করেন, ভালয় ভালয় একটি খোকা দিও মা, খোকা দিও। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।

কোথা হইতে গোটা তিনেক মাতুলি সংগ্রহ করিয়া পুত্রবধূর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুধু কি মাতুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায় ? মা কালীর ঘাড়েও দায়িত্ব চাপাইয়া তিনি স্বস্তি খোঁজেন।

কি জানি কি হইবে ? একবার ভালয় ভালয় হইয়া গেলে পরের বার অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। প্রথমবারই যত ভয়।

আপিসের কাজে বিকাশের মন বসে না, চলিতে বার বার কলম থামিয়া যায়, সময় যেন ভ্রূণভারবাহী মন্থর-গমনা অলস বধূ। বাহিরে কোনদিন রোদ ওঠে কোনদিন মেঘের ছায়া পড়ে কোনদিন অবিশ্রাম ধারাপাত হয়। ফ্যানের বাতাসে কাগজপত্র মৃদুশব্দ করিয়া নড়িতে থাকে, চোখ বুজিলে মনে হয় কোরা তাঁতের শাড়ী পরিয়া সুলতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুলতার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য দূরে থাকাটাও বিকাশের কাছে আজকাল অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাবনার মধ্যে সুলতার সঙ্গ সে এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে পারে, মমতার এমন সব অভূতপূর্ব অনুভূতির সন্ধান সে পায় যে তাহার মনে হয় শুধু সুলতার নয় নিজেরও অনেক আশ্চর্য গোপন পরিচয় ধরা পড়িতেছে।

এ অমৃত যে একদিন ভালবাসার ভিত্তিগত দৈহিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল বিকাশ আর তাহা বিশ্বাস করে না। তাহার মনে হয় বহুকাল ধরিয়া সে শুচিশুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিল এতদিনে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রতি

মানুষের যুগধর্মের প্রতি বিকাশের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। স্ত্রীকে সে আজ সত্যই শ্রদ্ধা করে।

স্থলতার মনে হয় সে যেন নেশা করিয়াছে। আনন্দের নেশা আতঙ্কের নেশা প্রাণধারণের নেশা।

স্বামীর অতিরিক্ত ভালবাসার কথা একান্তে বসিয়া ভাবিতে গেলে কোথায় যেন তাহার একটু বাধিত, মনে হইত ইহাকে প্রাপ্য মনে করা অনুচিত, এত বেশী করিয়া পাওয়া অন্যায়। আজ আর পাওনার কাছে দাবীকে ছোট মনে হয় না। নিজের মূল্য নিজের কাছেই স্থলতার অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

ছুপুরটা ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অলসভাবে ঠেস দিয়া স্থলতা চোখ বোজে। এই ঘরে সে তিন বছর ধরিয়া বাস করিতেছে, তিন বছরের ইতিহাসে এ ঘর যেন ঠাসা, বাতাসে যেন পুরানো মাটির গন্ধ।

এই ঘরে তার প্রথম স্বামী স্পর্শ জুটিয়াছিল।

সেদিনের বুক দুরু-দুরু পুলক আবার আসিয়াছে। আকাশের অশ্রু-ছাকা সূর্যালোক যেমন আকাশের গায়েই রামধনু আঁকিয়া দেয়, আত্মীয়-বিচ্ছেদ-বেদনায় পরমাত্মীয়দের সোহাগ মনে সেদিন তেমনি রঙ মিশাইয়াছিল ; ভ্রূণস্পন্দনে যেন তাহারই চঞ্চল চেতনা!

তারপর একদিন ছুপুরে খাইতে বসিয়া স্থলতা খানিকক্ষণ মাখা ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করিল, শেষে পাংশুমুখে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

মৃন্ময়ী বলিল, 'ওকি বৌ? খাও? ভারি মাসে আবার কিসের অরুচি।'

স্নেহলেশ-শূন্য কণ্ঠ। এবং তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! আর হৃদয়ে স্নেহ নাই, মমতা নাই, ঘুমানো আগ্নেয়গিরির মত তার বুকভরা শুধু জ্বালা। স্বামী তাহাকে নেয় না, এই সেদিন পাঁচ বছরের ছেলেটা মরিয়াছে। সহ্যের অতিরিক্ত বলিয়া তাহার শোক আজ আর বেদনার ব্যাপার নয়,—মনের বিকার, হৃদয়ের রুক্ষতা।

স্থলতা বলিল, 'আমার গা কেমন করছে ঠাকুরঝি—বড্ড খারাপ লাগছে।'

'বলো কি বৌ' বলিয়া মৃন্ময়ীর যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল একাগ্র দৃষ্টিতে সে ভ্রাতৃবধূর মুখখানি নিরীক্ষণ করিল। কতকাল পরে তাহার শুষ্ক চোখ ছুটি আজ আবার জলে ভরিয়া উঠিতে চায়।

মুখ ফিরাইয়া নিয়া হঠাৎ অনাবশ্যক শব্দ সহকারে মৃন্ময়ী হাঁকিল, 'ওমা! মা! শুনছ? বৌএর শরীর কেমন করছে দেখে যাও।'

মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'কি বৌমা, কি? কি রকম বোধ করছ?'

কি রকম যে বোধ করিতেছে সুলতা নিজেই তাহা বোঝে না, শাশুড়ীকে বলিবে কি। দেহের প্রত্যেকটি অণু যেন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাথাটা এমন ভারি যে মাটিতে না নামাইলে খসিয়াই পড়িবে বোধ হয়, অজস্র এলেমেলো চিন্তা জড়াজড়ি করিয়া মনের মধ্যে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে!

সে করুণস্বরে বলিল, 'কেমন যেন লাগছে মা, অস্থির অস্থির করছে।'

মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, 'কি জানি, এখনো কিছু বলা যায় না। ঘরে গিয়ে তুমি বরং শুয়েই থাক বৌমা, খেয়ে আর কাজ নেই। ব্যথা ট্যথা টের পাওয়া মাত্র আমায় কিন্তু জানিয়ো বাছা, দাই ডাকতে হবে, বিকুর কাছে খবর পাঠাতে হবে—'

সুলতার ইচ্ছা হইল বলে, দাই ডাকিতে লোক যাক, বিকাশের কাছে লোক ছুটুক, যত কিছু আয়োজন দরকার সব সমাপ্ত হইয়া থাক। ডাক্তার ডাকার কথাটা তো শাশুড়ী কই উল্লেখ করিলেন না? শুধু দাই এর উপর ইহারা নির্ভর করিয়া থাকিবে নাকি?

বিকাশ বলিয়াছে দরকার হোক বা না হোক (ভগবান করেন যেন দরকার না হয়) প্রথম হইতে একজন ডাক্তার আনিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিন্তু সে খবর পাইয়া আপিস হইতে আসিবার পূর্বেই যদি ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যায়? সে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে? যদি মরিয়া যায়?

মৃন্ময়ী তীব্র দৃষ্টিতে সুলতার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখিতেছিল, ঠোঁট ভাঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল, 'বৌ-এর মুখ দেখেছ মা? যেন ফাঁসি যাচ্ছে। সারাজন্ম ছেলে বিইয়ে কাটবে, মেয়ে মানুষের এতে এত ভয় কিসের শুনি?'

মা বলিলেন, 'আহা, তুই চুপ কর মিনু।'

মৃন্ময়ী উদ্ধত ভাবে বলিল, 'কেন চুপ করব? হক্ কথা বলব তার আর চুপ করা করি কি!'

সুলতা ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে থাকগে। ভাত তো মুখেও করলে না, একটু গরম দুধ খাবে?

সুলতা মাথা নাড়িল। মৃন্ময়ী বলিল, 'খোকা যখন হয়, আমার শাশুড়ী আমায় একবাটি দুধ গিলিয়েছিল মা। শেষে মরি আর কি বমি করে!'

সুলতা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই অকারণেই তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ও কি ঠিক সময়ে আজ আসতে পারবে? সকাল বেলাই শরীর ভাল ঠেকছিল না, কেন বললাম না তখন?

ছোট ননদ সুধাময়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসিল, কানে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল, 'বৌদি সেই যে বলবে বলেছিলে, এবার বল!'

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কিশোরী মেয়ের একি কৌতূহল! বিবাহের কথায় যে এখনো ভাল করিয়া লজ্জা পাইতে শেখে নাই, সে জানিতে চায় পৃথিবীর আলোবাতাসের ডাকে খোকা সাড়া দিতে চাহিলে জননীর কেমন লাগে।

মাংসের সীমানায় আলোর জন্মেরও পূর্বেকার যে আদিম অন্ধকার নিয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর আলো কোনদিনই যে অন্ধকারের নাগাল পায় না, চিতাগ্নির পথে যে অন্ধকার আবার আলোর যবনিকার ওপারে চলিয়া যায়, সেই অন্ধকারে শিশুর অস্তিত্ব সুধার মনে জিজ্ঞাসা জাগায় না। জীবনের আরম্ভ তাহার কাছে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর,—আঁতুড়ে। সে শুধু জানিতে চায়, ওই আরম্ভটা কেমন, শিশুর কাছে উহা কেমন লাগে। অকস্মাৎ চারিদিকে আলো ও শব্দের সমারোহ তাহার নিজের একদিন কেমন লাগিয়াছিল? যে মা হইতে বসিয়াছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সে এই দুর্বোধ্য ঝাপসা কৌতূহলের সমাপ্তি খোঁজে।

গতকল্য বেশ মনে পড়ে, গতবৎসর এতটুকু অস্পষ্ট নয়। এই উজ্জ্বলতা কমিয়া কমিয়া সীমান্তের কাছে স্মৃতি শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহার পরেই এক অদ্ভুত রহস্য ভরা কুয়াশা।

সুধা জানিতে চায় ওই রহস্যের মধ্যে সে কি ছিল।

জবাব না পাইয়া তাহার রাগ হইয়া গেল। বলিল, 'বল্‌বে না তো? আচ্ছা, নাই বললে।'

সুলতা বলিল, 'বলছি। বড় মাথা ধরেছে।'

সুধা হতাশ হইয়া বলিল, 'এই শুধু?'

'আর ভয় করছে।'

ভয়! মনে হইল এবার যেন সুধা তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছে। চোখ

বড় বড় করিয়া সে বলিল, 'ভয় করছে বৌদি ? ভারি আশ্চর্য তো!' বলিয়া কিশোরী মেয়েটি এক মুহূর্তে গম্ভীর বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বিকেলের দিকে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, আজ রাত্রির অন্ধকারেই আকাশে একটি নূতন জন্মতারকা দেখা দিবে।

ক্লিষ্টস্বরে সুলতা বলিল, 'সুধা ভাই, মাকে বল ওঁর কাছে লোক যাক্।'

সুধা বলিল, 'দাদার আসবার সময় হয়েছে, এক্ষুণি এসে পড়বে।'

সুলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বাড়াবাড়ি করিতে লজ্জা বোধ হয় কিন্তু কি করিয়াই বা চুপচাপ থাকা যায় ? ছেলের চেয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাটাই তাহার কাছে অধিকতর দুঃসহ হইয়াছে। এই কথাটা ইহাদের সে বোঝায় কেমন করিয়া ?

খানিক পরেই সুলতা আবার বলিল, 'কিন্তু আপিস থেকে ও যদি কোথাও চলে যায় ভাই ? কোন বন্ধু যদি বায়স্কোপে ধরে নিয়ে যায় ? কি হবে তা'হলে ?

মৃন্ময়ী সারা দুপুর বার বার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, এ কথাটা সে শুনিতে পাইল। উঁকি দিয়া বলিল, 'কি আর হবে তা হোলে পৃথিবী রসাতলে যাবে! সে পুরুষ মানুষ এসে তোমার কাছে কি করবে শুনি ? আমরাও ছেলে বিইয়েছি বৌ, এমন বেহায়াপনা কখনও করিনি!'

সে অতীত কথা। মনে হয়, এ জন্মে বোধ হয় ঘটে নাই। কী যন্ত্রণার মধ্যেও বাহিরে স্বামীর অস্থির পাদচালনার বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল আজ তাহা অস্পষ্ট মনে পড়ে মাত্র।

সেই খোকা আজ নাই, সেই স্বামী আর খবর নেয় না। অস্পষ্ট ভাবেও সেই শীতের রাত্রির কথা যে স্মরণ আছে ইহাই যেন আশ্চর্য। হয়ত আজ রাত্রে অস্পষ্ট থাকিবে না,—কে বলিতে পারে ? বৌ যখন ব্যথায় কাতরাইতে আরম্ভ করিবে তাহার চিত্তেও হয়ত অচেতনার স্পর্শ লাগিবে, বুকের মধ্যে চঞ্চল পদে একজন হাঁটিয়া বেড়াইবে, বিনিদ্র রজনী আর পোহাইতে চাহিবে না।

মৃন্ময়ীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার পা দুটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রোয়াকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল আজ রাত্রিটা কোথাও কাটাইয়া আসা যায় না ? পাড়ার কাহারো বাড়ীতে হোক, ভবানীপুরে পিসিমার বাড়ীতে হোক, এবাড়ীর সমারোহের সংবাদ যেখানে আজ পৌছিবে না ?

ছোটবাড়ী, অন্দরের গা ঘেঁষা বৈঠকখানা। ভিতরের দিকে দরজায় একটি মুখ উঁকি দিতেছিল, মৃন্ময়ীকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল, 'বিকুদা বাড়ী আছে ?'

মৃন্ময়ী তীব্রকণ্ঠে বলিল' 'যান্, যান আপনি। চাষা।'

এতক্ষণ অবধি ছাদের রোদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে কালিমার ছাপ পড়িয়া ছিল, আরও একটু কালো হইয়া মুখখানা সরিয়া গেল। মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতালায় গেল,—কপালে সিঁদুর পরিতে সিঁদুরের ফোঁটার অভাবে তাহার কপাল স্থর স্থর করিতেছিল। কপালই বটে। সাদা হাড়ের উপরে খানিকটা টান করা সাদা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিঁদুরের টিপ পরিয়া মৃন্ময়ী আয়নায় মুখ দেখিল। মনে হইল কপালটা তাহার এমনি সাদা যে লাল সিঁদুরের চেয়ে কালো কাজলের ফোঁটা হইলেই যেন মানাইত ভাল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র পাঁচু টের পাইল বাড়ীর আবহাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বারান্দায় ষ্টোভ জ্বলে নাই, বৈকালিক জলযোগের কোন আয়োজন দেখা যায় না। একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে, প্রাইজ বিতরণের দিনে স্কুলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবার আগে যেমন হয়, তেমনি। পশ্চিমের ছোট অন্ধকার ঘরখানা ইতিপূর্বে একদিন পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এই অবেলায় দিদিমা আবার সে ঘরের মেঝে পুঁছিতেছেন, দিদিমার মুখের ভাব অন্ধকার ঘরখানার মতই সন্দেহ-জনক। বড় মাসীর মুখের রুক্ষতা যেন বাড়িয়াছে, ছোটমাসী বসিয়া আছে মামীর শিয়রে।

কি শিথিল অবসন্ন মামীমার পা গুটাইয়া শুইবার ভঙ্গি। কাহাকেও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না, পাঁচু মুহূর্তমধ্যে সব বুঝিতে পারিল। বইখাতা হাতে বিস্ফারিত চোখে সে স্থূলতার দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তেজনায় তাহার ছোট বুকখানির মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল। ঘরে সে ঢুকিতে পারিল না। চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার ক্ষমতা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুধা বলিল, 'কি রে পাঁচু ?'

পাঁচু সলজ্জ হাসিয়া সরিয়া গেল। বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়া পাইল না কোন দিকে যাইবে, এ বাড়ীর কোন ঘরে আজ তাহার কি প্রয়োজন।

মার জন্য পাঁচুর আজ সহসা বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তাহার দুই চোখ জলে

ভরিয়া গেল। তাহার মা থাকিলে মামীমা তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারিত না।

দাইএর কাছে খবর গিয়াছিল, একটা কাপড়ের পুঁটলি হাতে পান চিবাইতে চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণের মোটা কাপড়খানা তাহার যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ। তা, কাজটাও তাহার অতিশয় নোংরা বৈকি।

হাতে মুখে সে অনেকগুলি উল্কির ছবি আঁকাইয়াছে, গায়ের রঙ এত কালো যে আর একটু কালো হইলে গায়ের উল্কিগুলি দেখা যাইত কিনা সন্দেহ।

কোনদিকে দৃকপাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিতে করিতে তাহার প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল, 'গিন্নিমা কুথায় গো?'

মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দাই বলিল, 'এস্‌লাম তো গিন্নিমা, উদিকে যে আবার ফ্যাকড়া বাঁধল।'

মা শঙ্কিতা হইয়া বলিলেন, 'কি আবার ফ্যাকড়া বাঁধল বাছা?'

'হোই ও পাড়ার ভূষণবাবুর মেয়েরও আজ ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি টানাটানিই না করলে!—দত্তমশায় নিজে, লজ্জায় মরি গিন্নিমা! বললে, তুমি থাকলে বুকে ভরসা পাই রাখীর মা, ভালয় ভালয় খালাস করে দাও, পঁচিশ টাকা নগদ আর তোমার যা রোজ বাঁধা আছে দু'টাকা করে—'

একটু নিরুপায় হাসি হাসিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাই মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, 'ওইতো বাছা তোমাদের দোষ। একেবারে শেষ সময়ে মোচড় দিয়ে পাওনা বাড়িয়ে নিতে চাও। দেনা পাওনার কথা তোমার সঙ্গে তো হয়েই আছে কবে থেকে?'

দাই বলিল, 'কথা হয়ে থাকলেই কি গরীবের চলে মা! যেখানে দুটাকা বেশী মিলবে আমাদের সেইখানেই নাগতে হবে।'

মার সাংসারিক অভিজ্ঞতা কম নয়, বলিলেন, 'তবে তুমি সেইখানেই যাও বাপু, আমরা অন্য লোক দেখছি। সিধুর বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে।'

শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। এমন বিপর্যয় ব্যাপার ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শাশুড়ী তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য এমন করিতেছেন! যে টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে! প্রথমেই পাওনা নিয়ে গোল বাধিলে দাই কি

আর মন দিয়া নিজের কর্তব্য করিবে? আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধটা দাই যদি তার উপরেই নেয়?

স্থলতার মনে হইল, পরমাত্মীয়ের মৃত্যুকালে এ যেন জীবনের মূল্য নিয়া ধন্বন্তরির সঙ্গে দর কষাকষি করা!

মনে মনে সে স্থির করিয়া ফেলিল, দাইকে এক সময় চুপি চুপি জানাইয়া দিবে টাকার ব্যাপারে তাহার কোন দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় স্থলতা গোপনে তাহার হাতে দিবে, সে যেন তাহার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে কৃপণতা না করে, এবারের মত সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভবিষ্যতে—

মা আর মরিয়া গেলেও হইবে না।

বায়স্কোপ নয়, বিকাশ খেলা দেখিতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিতে তাহার সাতটা বাজিয়া গেল।

কালও যে খেলা দেখিয়া এমনি সময়ে সে বাড়ী ফিরিয়াছিল সে কথা বিকাশের মনে পড়িল না, বিশেষ করিয়া আজকার দিনটিতে দেরী করার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্তি গোপন করিবার কোন চেষ্টাই সে করিল না।

'আমায় একটা খবর পাঠাতে পারলে না কেউ? কি যে সব ব্যবস্থা তোমাদের।'

মা মলিলেন 'খবর পাঠাবার যখন দরকার হ'ল বাবা, তোর ছুটির সময় হয়েছে। কোথায় তোকে খুঁজে বেড়াত?'

বিকাশ যেন এই কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিল!

মা আবার বলিলেন 'এই তো গেল আঁতুড়ে, এখনো কিছুই নয়।'

বিকাশ জামা কাপড় ছাড়িল না, বিরস মুখে জল-চৌকীতে বসিয়া রহিল। এখনো কিছুই নয় সত্য, কিন্তু তাহার দুঃখ অন্য কারণে। স্থলতার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহার হইল না এমন ক্ষতি এ জীবনে আর সম্ভব নয়। ও ঘরে ঢুকিবার আগে তাহার নিকট হইতে শেষ সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া নিবার কি অধীর ভাবেই না জানি স্থলতা প্রতীক্ষা করিয়াছিল! তাহাকে এতখানি প্রয়োজন আর কোনদিন একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যও কি স্থলতার হইবে?

স্থলতার নির্ভরশীলতার চরম অভিব্যক্তি অগোচরে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া বিকাশের ক্ষোভের সীমা রহিল না।

ও ঘর হইতে স্থলতা বাহির হইবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া, সন্তানের জননী এই

পরিচয়ের কাছে তাহার প্রিয়া ও পত্নী সংজ্ঞা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যাক্, তাহা অপ্রিয় নয়, কিন্তু এই মহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকট হইলে প্রিয়ার বিবর্ণ কপোলে যে ক্ষুদ্র একটি চুম্বন দেওয়া হয় নাই সে আপসোস এ জীবনে আর ঘুচিবে না।

সুধাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বিকাশ বলিল 'বৌদিকে বলগে আমি এসেছি।' সুধা আঁতুড় ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'বৌদি জানে।'

জানে! কেমন করিয়া জানিল? সে জোরে কথা বলে নাই, শব্দ করিয়া হাঁটে নাই, তবু খবর পৌঁছিল? বিকাশ চাহিয়া দেখিল ঘরে কি আলো জ্বালা হইয়াছে জানালাটা পর্যন্ত ভাল করিয়া আলো হয় নাই। আলোর কার্পণ্যে তাহার রাগ হইয়া গেল। সে ভাবিল, আর আধঘণ্টার মধ্যে ও ঘর যদি ইহারা ভাল ভাবে আলোকিত না করে সে নিজে ডে লাইট ভাড়া করিয়া আনিবে।

'ওঘরে কে আছে রে সুধা?'

'মা ও বাড়ীর পিসীমা আর দাই।'

'মিনু?'

'দিদির শরীর ভাল নয়, শুয়েছে।'

বিকাশের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ শুভ নয়! মৃন্ময়ীকে সে ভালবাসে, তাহার জীবন সবদিক দিয়া ব্যর্থ হইবার পর করুণার রসে সে মমতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুলতার সন্তান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাইবার পর তাহার মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল অন্য কাহারো কাছে ধরা না পড়িলেও তাহা বিকাশের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ মৃন্ময়ীর শরীর খারাপ হওয়ায় সবটুকু ইতিহাস অনুমান করিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সুলতার শুভকর বিপদে একি অমঙ্গলের ছায়াপাত!

জুতা খুলিয়া বিকাশ বারান্দার একপাশে রাখিয়া দিল। জামা খুলিয়া কলতলায় মুখহাত ধুইয়া আবার জল-চৌকীটাতেই বসিল। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে। তামাকের তৃষ্ণাও যেন ক্ষুধার মতই অবুঝ। আপিস যাওয়ার সময় সুলতাকে সে নারকেল কোরাইতে দেখিয়া গিয়াছিল। তক্তি টক্তি কিছু করিতে পারিয়াছিল কিনা কে জানে! করিয়া থাকিলেও চাহিয়া খাইতে বিকাশের ইচ্ছা হইল না। ক্ষুধার জ্বালা সামান্য, সুলতা অমন কষ্ট পাইতেছে সামান্য ক্ষুধার জন্য সে ব্যস্ত হইবে? সুলতার যন্ত্রণা তাহার খাওয়া না খাওয়ার উপর নির্ভর করে না, খাওয়ার স্বপক্ষে এ ছাড়া আর কি যুক্তিই বা আছে।

রান্নার ভারটা এবেলা সুধার উপরেই পড়িয়াছিল। মুখ তাহার গম্ভীর ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। একটা বাটিতে মুড়ি আর কয়েকটা নারকেল সন্দেশ আনিয়া সে দাদার হাতে দিল, তামাকও সাজিয়া আনিল। তার পর অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল 'বৌদিকে একবার দেখবে দাদা? সারাক্ষণ তোমায় খুঁজছিল।'

বলিতে বলিতে দাদার প্রতি উচ্ছ্বসিত মমতায় কচি মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল 'থাক।'

'আচ্ছা।' বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সুধা চোখ মুছিতে লাগিল।

দাদার দুঃখ এ বাড়ীতে তাহার চেয়ে কে ভাল করিয়া বোঝে! সারাদিন খায় নাই, কিন্তু কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে দাদা মুখে খাবার তুলিতেছিল? হুঁকা হাতে নিয়া কতক্ষণ টান দিতে খেয়াল থাকে নাই? সমবেদনায় সুধার বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ডালে কাঁটা দিতে দিতে মুখ চোখ বিকৃত করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ ঠেকাইয়া রাখিল। মনোবৃত্তির এমন ভয়ানক বিপর্যয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে আর দেখা দেয় নাই। প্রথমে এতটা হয় নাই, দাদার ম্লান মুখ ও ছলছল চোখ দেখা অবধি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে তামাক টানিতে টানিতে চারিদিকে চাহিয়া বিকাশ ক্রমাগতই মনে মনে আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল। এই সময়টির যে কল্পনা সে মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। সে রকম ছুটাছুটি হাঁকা-হাঁকি হইতেছে কই? সমস্তই ধীর মন্থর গতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে। পুরাতন কাপড় নিতে আসিয়া মা পরম নিশ্চিন্ত মনেই যেন চাকরকে জিনিসের ফর্দ লিখিয়া পয়সা বুঝাইয়া দিলেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোসগিন্নির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করিলেন, রান্না সম্বন্ধে সুধাকে কয়েকটা উপদেশও দিলেন। মৃন্ময়ী উপরে শুইয়া আছে, পাঁচু বোধ হয় তার ছোট আলোটি জ্বালিয়া অঙ্ক কষিতে বসিয়া গিয়াছে, বেচারীর হাফইয়ারলি পরীক্ষা আসন্ন। আঁতুড়ের দিক হইতে কাঠকয়লা পুড়িবার একটা গাঢ় গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। দাইয়ের অবিশ্রান্ত বকুনি ও মাঝে মাঝে মুলতার মৃদু কাতরাণি ছাড়া ও ঘরে শব্দ নাই চাঞ্চল্য নাই।

অথচ এ কি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার! পুরা দশটি মাস ধরিয়া বিধাতা

স্বয়ং যে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজন করিয়াছেন এই কি তাহার উপযুক্ত সমারোহ? বিধাতার খেলায় তাড়াহুড়া নাই বলিয়াই কি সকলে চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কোন মতে ধৈর্য ধরিয়া আছে?

এই চিন্তার শেষটা নিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে যাহা ঘটিবার ধীরে সুস্থে তাহা ঘটিবেই একথা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য আছে বিকাশ নিজেও সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিকাশের মনে হইল তাহার দুশ্চিন্তা ও স্থূলতার যন্ত্রণা যে অশেষ নয় এই কথাটাই সে বাড়ীতে পা দেওয়া অবধি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত বারোটা একটার মধ্যে সব চুকিয়া যাইবে আশা করা যায়। যত কষ্টই পাক স্থূলতা বারোটা একটা তো একসময় বাজিবেই আজ! সাতাশ বৎসর ধরিয়া তাহার জীবনে সংখ্যাহীন রাত্রি পোহাইয়াছে আজিকার রাত্রিও পোহাইবে বৈকি!

আগামী কল্যের যে সূর্যালোকে সে সন্তানের মুখ দেখিবে, সে সূর্যকে মাটির পৃথিবী কয়েক ঘণ্টার জন্য আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

জোরে জোরে হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বিকাশ জামাটা তুলিয়া নিয়া দোতলায় গেল। নিজের ঘরে পা দিয়াই তাহার চমক লাগিল। এখানেও কে যেন অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে।

ঘরের মেঝেতে আলোটা কমানো ছিল, বাড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বিকাশ দেখিতে পাইল, একটা বালিশ আঁকড়াইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পাঁচু থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং মাঝে অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার পিঠে হাত দিয়া বিকাশ বলিল, 'তোর আবার কি হল রে পাঁচু?'

পাঁচু তৎক্ষণাৎ মামাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল 'ভয় করছে মামা।'

'কেন ভয় করছে কেন? যা ভয়ের কিছু নেই।'

পাঁচু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে 'একটা শাঁকচুন্নী ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুল বাঁধছিল একটা ভূত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

ছেলেটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, ভয় সে সত্যই পাইয়াছে, কিন্তু কারণটা বিকাশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খোলা জানালা দিয়া ছাদের খানিকটা দেখা যায়, অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় মন্দ আলো হয় নাই। ওই ছাদের কিসের উপলক্ষে আজ শাঁকচুন্নীর আবির্ভাব হইল, তাহার চুল বাঁধা দেখিতে ভূতই বা আসিল

কোথা হইতে? কিন্তু যে কারণেই ভয় পাইয়া থাক পাঁচুর ভয় ভাঙ্গানো দরকার।

'তুই ছায়া দেখেছিস পাঁচু। চল্ দেখবি, ছাদে কিচ্ছু নেই।'

পাঁচু সভয়ে বলিল 'না মামা!, কিন্তু বিকাশ তাহা শুনিল না, পাঁচুকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাদের দিকে চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তোর ভয় কিরে? ভূতের আমি কাণ মলে দেব।'

ছাদে গিয়া দেখা গেল শাঁকচুন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। চুল এলাইয়া দিয়া মৃন্ময়ী অসম্বৃত বেশে ছাদের আলিসার সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। পায়ের শব্দেও সে মুখ তুলিল না।

'তুই যে এখানে মিনু?'

মৃন্ময়ী কলহের স্বরে বলিল 'কেন এখানে কি আমার থাকতে নেই নাকি?'

বিকাশ বলিল 'মিথ্যে চটিস্ কেন? পাঁচু বড় ভয় পেয়েছে। মাথা ধরা কমাতে তুই ছাতে বেড়াচ্ছিলি, ও মনে করলে আমাদের বাড়ীতে আজ একটা শাকচুন্নীই বা এলো। যে ফর্সা কাপড় তুই পরিস্।'

মিনু ঝাঁঝালো স্বরে বলিল 'এবার থেকে ময়লা কাপড় পরব। ধোপার পয়সা দিতে তোমার কষ্ট হয় জানতাম না দাদা।'

বিকাশ অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময়ীর মেজাজ সব সময় ভাল থাকে না, কিন্তু এ ভাবে কলহ করাও তাহার স্বভাব নয়। তথাপি সকৌতুকে হাসিয়াই বিকাশ বলিল 'হয়ই ত কষ্ট। তোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোর ভূতটা কই রে?'

মৃন্ময়ী চমকাইয়া উঠিল 'ভূত! ভূত কি?'

'পাঁচু দেখেছে। তুই বেড়াচ্ছিলি, একটা ভূত এসে তোকে জড়িয়ে ধরল।'

মৃন্ময়ী হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল 'তুই দেখেছিস্ পাঁচু? মিথ্যেবাদী হারামজাদা, দেখেছিস তুই।'

চাঁদের আলোয় তাহার গালে জলের দাগ চকচক করে, চোখ যেন পাগল মেয়ের রাগ করা চোখ। মনে হয়, পাঁচুকে সে আঘাত করিবে। কিন্তু হঠাৎ সে সুর বদলাইল।

'ওটাকে ভূত মনে করেছিল বোধ হয়।'

মৃন্ময়ী নিজের ছায়াটি দেখাইয়া দিল। একটি হ্রস্ব বাহু বাড়াইয়া ছায়াও তাহার কথায় সায় দিল।

পাঁচুকে নীচে নামাইয়া দিয়া বিকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিল "কি ভাবছ শুনি!"

'ভাবছি পাঁচু কেন ভয় পেল। তোকে তো ও কতদিন অন্ধকার ছাতে ঘুরতে দেখেছে, আর আজ এমন জ্যোৎস্না। এও কি স্থলতার দোষ রে?'

মৃন্ময়ী শুষ্কস্বরে বলিল 'তা ছাড়া কি?'

বিকাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'চল্ মিনু, আমরা নীচে যাই।'

'নীচে গিয়ে কি করব? তোমার বৌএর সেবা?'

'করলে কি তোর পাপ হবে? বড় নির্লজ্জ তুই। বড় ছোট মন তোর।'

এমন কঠিন কথা দাদার কাছে মৃন্ময়ী জীবনে আর শোনে নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

'বৌকে আমি হিংসা করি না দাদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি একটুও হিংসা করি না।' বিকাশ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, সংক্ষেপে শুধু বলিল 'তা জানি। চল নীচে।'

রাত নটায় স্থলতা চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, থামিল এগারোটার সময়; একেবারে অজ্ঞান হইয়া। বিকাশ সভয়ে বলিল 'ওকি হ'ল? মরে গেল নাকি ডাক্তার বাবু?'

ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন 'যান মশাই, আপনি রাস্তায় যান।' বিকাশ মিনতি করিয়া বলিল 'আপনি আর একবার দেখে আসুন ডাক্তার বাবু। এমন আচমকা চুপ করে গেল, আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার উঠিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, স্থলতা শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

'অজ্ঞান!'

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'আচ্ছা পাগল তো আপনি! আপনার জন্য দরকার মত উনি অজ্ঞানও হতে পারবেন না?'

বিকাশ ছটফট করিতেছিল, এবার বসিল। কোলাহল সমারোহ নাই বলিয়া সন্ধ্যায় সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন আর ও বিষয়ে নালিশ করিবার কিছু নাই। স্থলতা একাই সমারোহের সীমা রাখে নাই।

সমস্ত বাড়ীটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। স্থলতা হয়ত আর শব্দ করিবে না, এ স্তব্ধতা ভাঙ্গিবে একেবারে শঙ্খধ্বনিতে,—যদি ছেলে হয়। শাঁখ

সম্ভবতঃ মৃন্ময়ীই বাজাইবে। শঙ্খ হাতে সেই যে সে প্রহরীর মত আঁতুড়ের দরজায় বসিয়াছিল, একবারও সেখান হইতে নড়ে নাই।

ভীত পাঁচুর সঙ্গে সুধাকেও শুইতে হইয়াছিল, তাহারা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অবসাদের গাঢ় ঘুম, কাল সকালের আগে টানিয়া তুলিলেও তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না। সুস্থ সানন্দ-চিত্তে কাল তাহারা নবাগতকে দেখিবে। কিন্তু আজিকার অভিজ্ঞতা তাহারা ভুলিবে না কোনদিন। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খাপ খাইতে হয়ত ক্রমাগত রূপান্তর নিবে, কিন্তু কখনো বিস্মৃতিতে তলাইয়া যাইবে না।

হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বিকাশ ভাবিতে লাগিল, সমস্ত জীবন মানুষ দুঃখ ভোগ করে, রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন ? এই অনাবশ্যক বীভৎসতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায় ?

খোকা আসিবে আসুক' কিন্তু এ যে বর্গী আসারও বাড়া !

ফাঁদ

সুভদ্রার বাবা একটি নাম করা যাত্রার দলে তবলা বাজাইত। সেই যাত্রার দলেই বার তের বছর বয়স পর্যন্ত সুভদ্রা কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। কৃষ্ণ সাজিয়া গোপিনীদের পাকা পাকা কথা ও মিষ্টি মিষ্টি গান শোনানো বন্ধ করিতে করিতে সুভদ্রার বয়সটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় বন্ধ করিয়া বাড়ী পাঠানোর কথা তুলিলেই সুভদ্রা ক্ষেপিয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত বাড়ী অবশ্য তাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ না সাজিয়াই পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম আরম্ভ করায় কলঙ্কের আর সীমা রহিল না। আরেকজনের সঙ্গে সুভদ্রা তখন একদিন গেল পালাইয়া। পালানোর সময় কোন আপজনের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্য তার ছিল না, কিন্তু পালানোর আগে যার সঙ্গ ছাড়া সে একটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না ভাবিয়াছিল, দু'দিনের মধ্যে তাকে দেখিলেই তার সমস্ত শরীর রাগে সির্‌সির্‌ করিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া সে তাই গিয়া হাজির হইল দূরের এক গ্রামে তার দিদির কাছে। সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গান গাহিয়া সকলকে সে মুগ্ধ করিয়া দিল, আর একটু ভাব করিল ভগ্নীপতির সঙ্গে। সে খেলা ভগ্নীপতি বুঝিত না, যে খেলায় শুধু পরস্পরের মন ভুলানো আর সব আছে কিন্তু ধরা দেওয়া নাই। একদিন তাই অসময়ে জোর করিয়া সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরায় সেটা দিদির চোখে পড়িয়া গেল।

কিছু দূরের একটি গ্রামে মহেন্দ্র নামে ভগ্নীপতির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সদ্য' সদ্য বৌ মরিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বড় ভাব হইয়া গেল সুভদ্রার। ভয়ানক বদমেজাজী মানুষ মহেন্দ্র, লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তার শরীর আর শরীরে যাঁড়ের মত জোর। মেয়ে-মানুষ যে মোলায়েম জীব, এটা বোধ হয় তার জানাই ছিল না। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠুর পৌরুষ, বীভৎস ভালবাসা আর বাস্তব দরদ যেন সাবান দিয়া আছড়াইয়া কাপড় কাচার মত সুভদ্রার মনের ছেলেমানুষী ময়লা সাফ করিয়া দিল। মনের আনন্দে সুভদ্রা বৌ হইয়া কাটাইয়া দিল কয়েকটা বছর।

তারপর আবার তার মনটা কেমন করিতে লাগিল একটা অজানা কিছুর জন্য।

মহেন্দ্রের আলিঙ্গনে শিহরণ জাগার বদলে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মনে হইতে লাগিল, রসিক নামে যে রোগা লম্বা ভীরু ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে, তার কাছে কি মন কেমন করার ওষুধ আছে? সাধন বৈরাগী নামে যে রূপবান পুরুষটা তার মন ভুলানোর চেষ্টায় নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়াছে, সে কি তাকে দিতে পারিবে সে যা চায়?

একদিন মাঝরাত্রে সুভদ্রা ধরা পড়িয়া গেল। রাশি রাশি মেঘে ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল টিপি টিপি, মোলায়েম একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সারা-দিনের গা জ্বালানো গরমের পর, একেবারে অচেতন হইয়া ঘুমানো উচিত ছিল মহেন্দ্রের। আগের রাত্রে গরমে সিদ্ধ হইতে হইতেও সে মরার মত ঘুমাইতেছিল, সুভদ্রা কখন উঠিয়া গিয়া কখন বিছানায় ফিরিয়া আসিয়াছিল কিছুই টের পায় নাই। দু'চারটি রাত্রি বাদ দিয়া তার আগের আরও পাঁচ সাতটি রাত্রেও টের পায় নাই। আজ যে কেন তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

হয় তো জাগিয়াই ছিল, কে বলিতে পারে। একবার ঘুমাইলে মহেন্দ্রের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। উঠিয়া যাওয়ার সময় সুভদ্রা আস্তে তার গায়ে একবার ঠেলাও দিয়াছিল; গায়ে ঠেলা দেওয়ায় যে জাগে নাই কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতে তার ঘুম তো ভাঙ্গিবার কথা নয়।

রসিক গায়ে জড়াইয়া আসিয়াছিল ছেঁড়া একটা সস্তা কম্বল। ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কম্বল জড়ানো সেই চেনা মানুষটিকে দেখিয়া সুভদ্রা হয় তো মূর্চ্ছা যাইত। তার বদলে বর্ষা বাদলের রাত্রে ভালবাসিয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে বলিয়া রসিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাকে সে টানিয়া নিয়া গেল উঠানের দক্ষিণে ধানের মরাইটার গা-ঘেঁষা ছোট আটচালার নীচে। আটচলার অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চ্যালানো আম কাঠে আর বাকী অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চাষের যন্ত্রপাতি আর ভাঙ্গা গরুর গাড়ীর চাকা হইতে আরম্ভ করিয়া তুমড়ানো কেনেস্তারা পর্যন্ত রকমারি জঞ্জালে। তার মধ্যে একটু স্থান করিয়া রসিকের গায়ের কম্বল বিছাইয়া তারা বসিয়াছিল।

তারপর রসিকের বুকে মাথা রাখিয়া ভৎর্সনার সুরে সুভদ্রা সবে বলিয়াছে, 'আজ আবার কেন এলে শুনি মুখপোড়া?'

আর আবেগ ও আবেদনে কাঁদ কাঁদ গলায় রসিক সবে জবাব দিয়াছে, 'না এসে থাকতে পারলাম না, মাইরি বুলছি—'

এমন সময় সেখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির। দু'জনকেই মহেন্দ্র সম্ভবতঃ খুন করিয়া ফেলিত কিন্তু নাগাল সে পাইল না একজনেরও। লম্বা রোগা বাইশ বছরের ছোকরা রসিক চোখের পলকে উধাও হইয়া গেল, আর স্বভাব খারাপ হইলেও ঘরের বৌ এত রাত্রে ঘরেই থাকিবে জানিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া গেল রসিকের পিছনে। সেই অবসরে গোয়ালের পিছন দিয়া সুভদ্রা পলাইয়া গেল উল্টা দিকে।

সেদিকেও ঘুমন্ত গ্রাম ছিল অনেক দূর অবধি ছড়ানো, কুকুর ডাকিতেছিল এদিকে ওদিকে, দূরে শোনা যাইতেছিল চৌকিদারের হাঁক আর জমকালো ভেজা অন্ধকার ভরাট করিয়া খেয়ালের নাগাল ছড়াইয়া উঠিয়াছিল ব্যাঙের একটানা আওয়াজ। সোহাগী বৌ রঙীন শাড়ী পরিতে পায় বলিয়া আর রঙীন কাপড় অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মত সহজে চোখে পড়ে না বলিয়া নিজেকে সুভদ্রার মনে হইতেছিল ভাগ্যবতী।

গ্রামের শেষ বাড়ীটি শুধু গোটা দুই ভাঙ্গা ঘর, তারই একটিতে এত রাত্রে একজন গান গাহিতেছিল। চেনা চল্‌তি গান, সুভদ্রার নিজের গান। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল। খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জনের জন্য তখন সে যে গানটি গাহিত ভাঙ্গা মোটা গলায় ভুল সুরে কথা বদলাইয়া গাহিতেছে বটে অদৃশ্য গায়ক, কিন্তু আবেগ আছে লোকটার।

আবেগভরা লোকগুলি বড় অধীর হয়। ভিজা শাড়ীখানা গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে, দেখিবামাত্র হয় তো সাপটাইয়া ধরিবে। ওভাবে কেউ সাপটাইয়া ধরিলে বড় খারাপ লাগে সুভদ্রার। গা বমি বমি করে, দম আটকাইয়া আসে, মনে হয় সে যেন হঠাৎ এগার বছরের মেয়ে হইয়া গেছে আর যাত্রা দলের সেই যুধিষ্ঠির শেষরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বেশধারী তাকে আসরের খানিক তফাতে একটা ছোট আটচালার নীচে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এক হাতে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে আর আরেক হাতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কাছি দিয়া বাঁধার মত।

কিন্তু উপায় ছিল না। এত রাত্রে কে আর তাকে খাতির করিবে? সুভদ্রাকে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সাধন বৈরাগী মূর্চ্ছা গেল না, দু'চোখ বড় বড় করিয়া গানের বদলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুভদ্রা বলিল, 'আমি গো আমি।'

তখন সাধন বৈরাগী শান্ত হইল। কিন্তু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল অল্পক্ষণের মধ্যেই, আনন্দ ও উত্তেজনায়।

প্রথমে সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, রসিকের জন্য বোধ হয়একটু মন কেমন করিবে। একটু যেন পছন্দ হইয়াছিল রসিককে তার, দু'একদিন গভীর রাত্রে তার যেন মনে হইয়াছিল, বেতালা বাঁশীর সুরে জানান দিয়া আজ কি রসিক আসিবে? ভাসা ভাসা একটু রসজ্ঞান ছিল রসিকের, দুপুর রাতের গোপন মিলনে মাঝে মাঝে একটু রসের সঞ্চারও যেন সে করিতে পারিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া যে ভাবে তার মন কেমন করিয়া আসিয়াছে এখনও তেমনিভাবে মন কেমন করিতে লাগিল বটে, সেটা রসিকের জন্য নয়। স্বামীর ঘরে ফেলিয়া আসা শাড়ী গয়নার মত রসিকও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু আপসোসও সুভদ্রার নাই। রসিক বলিয়া কেউ কি কোনদিন তার মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বর্ণনা করিত আসিবার সময় কোন বাড়ীতে নতুন বর ও বধূর ঘরে বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়া একজনকে কি ভাবে আর একজনের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, শুনিতে শুনিতে তার মনে হইত সে যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, চাঁচের বেড়ায় ঘেরা চারকোণা জেলখানায় জোরালো দু'টি বাহুর বন্ধন যেন তার আর নাই।

মনটা সুভদ্রার খুঁত খুঁত করে, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। রসিকও শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁকি দিল, এতটুকু স্থান দাবী করিতে পারিল না তার মনে।

সাধন বৈরাগীর চেহারাটি বড় সুন্দর। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই সুভদ্রা তীব্র বিদ্বেষ আর হিংসা অনুভব করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল এই লোকটাই বুঝি জীবনযুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তারপর সাধনের অনেকদিনের প্রাণপাত সাধনার পুরস্কারস্বরূপ দূর হইতে একটু একটু ভাব করিয়া এতকাল তাকে শুধু সে যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। এখন হঠাৎ একেবারে ধরা দিয়া, অনেক দূরের অচেনা এক সহরে অজানা মানুষের মধ্যে ছোট একটি টিনের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করিবার মত ভয়ানকভাবে ধরা দিয়া, সুভদ্রা দেখিল লোকটাকে সে যেরকম ভাবিয়াছিল সে মোটেই সে রকম নয়। বিদ্বেষ বা হিংসার কোন কারণ নাই, বরং রীতিমত অবজ্ঞা করা চলে। যে জোরালো আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা সে করিয়াছিল সেটা জোয়ারের মত নয়, কলের ফোয়ারার মত। তাও আবার সে উৎসের ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় কম, কলটাও গিয়াছে বিগড়াইয়া, হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে উথলাইয়া উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়ে। শুধু চেহারার টানে অনেক মেয়ে আসিয়া তার রসটুকু শুষিয়া

নিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। আর রাখিয়া গিয়াছে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা আর পাগলামি, যে সব কোনদিন কোন মেয়ের কোন কাজেই লাগে না।

সুভদ্রা হতাশ হইয়া ভাবিল, তাইতো।

সে রাত্রে ভিজা রঙীন শাড়ীটি ছাড়িয়া সুভদ্রা সাধন বৈরাগীর গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়াছিল। পরদিন পথে তার জন্যে দু'সেট শাড়ী ও সেমিজ কিনিয়া গেরুয়া রঙে ছাপাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। তখন দু'জনকে দেখিয়া মানুষের মনে হইয়াছিল, স্বর্গের কোন দেবতা বুঝি একটি অপ্সরাকে সেবাদাসী করিয়া মর্ত্যলোকে বেড়াইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

এখানে ওখানে যে ক'টা দিন তারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত লোক সাগ্রহে তাদের সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রণামীও দিয়াছে। সুভদ্রার বড় ভাল লাগিয়াছিল সে জীবন। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে জানে! পথ চলিতে আলস্য বোধ করিলে একটা গরুর গাড়ীকে থামাইয়া উঠিয়া বসিলেই হইল। বাঁধানো বড় সড়কে একদিন দামী একটা মটরগাড়ী দাঁড় করাইয়া দুজনে উঠিয়া বসিয়াছিল, হাওয়ার বেগে চল্লিশ মাইল পথ পার হইয়া গিয়া পৌঁছিয়াছিল সদরে। ক্ষুধা পাইলে ময়রার দোকানে খাবার চাহিয়া খাইলেই হয়, মুদীর দোকানে চাল-ডাল চাহিয়া গাছতলায় রাঁধিলেই হয়, নয়তো গৃহস্থের বাড়ী গিয়া বলিলেই হয়, আমরা আসিয়াছি অন্ন দাও। পয়সা দরকার হইলে, দু'চার দশজনের কাছে চাহিলেই চলে। আশ্রয় তো আছে সর্বত্র, মুচির ভাঙ্গা ঘরে নোংরা মেঝেতে সঙ্গের কম্বল বিছাইয়া চামড়ার গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, ফুল ও চন্দনের গন্ধভরা মন্দিরের বাহিরে অতিথিশালায় জীবন্ত মানুষের ভাপ্‌সা গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, চোর ডাকাতি কি খুনির আস্তানা সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আশ্রয় নেওয়া যায় বড়লোক গৃহস্থের বাড়ীতে। গেরুয়াধারী নরনারীর তো সম্পদ কিছু থাকে না পুণ্য ছাড়া, যা থাকে তার উপরেও তো লোভ করা চলে না, কামনাও করা চলে না সুন্দরী সন্ন্যাসীকে। তাতে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। এমন নির্ভর নিশ্চিন্ত বাধাবন্ধনহীন সহজ সরল জীবন যাপনের সুযোগ থাকিতে মানুষ যে কেন দম আটকাইয়া পচিয়া মরে ঘরের মধ্যে!

কিন্তু সাধন বৈরাগী বলিয়াছে, 'উঁহু, এক জায়গায় স্থিতি হয়ে না বসলে কি চলে?'

সুভদ্রা যদি বলিত খুব চলে, সাধনকেও অবশ্য তা মানিয়া নিতে হইত। কিন্তু মন মরা বিরক্ত আর নিরুৎসাহ সঙ্গী যদি সারাদিন প্যান প্যান করে কাণের কাছে আর মুখ ভার করিয়া থাকে চোখের সামনে, মুক্তিও কি মানুষের ভাল লাগে? এই সহরে তাই তারা নীড় বাঁধিয়াছে।

সুভদ্রা ভাবিয়াছে, আর যাই হোক, যা খুশী তো করা চলিবে এখানে, পরের কর্তালি, পরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিধি নিষেধ তো তাকে ঘেরিয়া থাকিবে না।

ঘর বাঁধিলে রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধন বৈরাগী বলিল, 'ভিক্ষে করা চলিবে না কিন্তু।'

কোন রকমে দিন কাটানোর সঙ্গতি সাধন বৈরাগীর ছিল, তার মা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে সে প্রথম একতারা হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে সুভদ্রার জন্য। বাহির হইয়াছে অসময়ে, মানুষ যখন ভিখারীকে তাড়াইয়া দেয়। সুভদ্রা তাকে বঞ্চিত করে নাই, নিজেই ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'একটা গান কর তো বৈরিগি ঠাকুর।'

সুভদ্রা তাই তামাসা করিয়া বলিল, 'কেন ভিক্ষে তো তুমি করতে বৈরিগি ঠাকুর?'

অনেক তামাসাতেই সাধন বৈরাগী পুলকিত হইতে জানে না, এদিক দিয়া মানুষটা সে একটু ভোঁতা।

রোজগারের উপায়টা ঠিক করিল সুভদ্রা। বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে যে হাত তিনেক চওড়া বারান্দাটুকু আছে সেখানে দু'টি দোকান খোলা হইল, পান বিড়ি আর তেলেভাজার দোকান। পানবিড়ির দোকানের ভার রহিল সাধনের, তেলেভাজার দোকানের ভার রহিল সুভদ্রার। বাড়ীওয়ালা এবং বাড়ীর আরও তিন ঘর ভাড়াটের কাছে চাওয়ামাত্র অনুমতি পাওয়া গেল।

দোকান খোলার আগের দিন সুভদ্রা বলিল, 'সবাইকে বলে এসো, আজ সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণলীলা গান গেয়ে শোনাব। দোকান যে খুলছি জানানো তো চাই সবাইকে?'

আসর করা হইয়াছিল উঠানে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে মানুষ আর আঁটে না। কৃষ্ণলীলার অনেক গান সুভদ্রা জানিত, একাই সে তিন ঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিল। অনেকদিন এ সব গান সে গায় নাই, একটু ভয় তার ছিল গানগুলি ঠিকভাবে গাহিতে পারিবে কি না। কিন্তু আরম্ভ করা মাত্র আগের মতই

গানের মোহ কখন যে তাকে মাতাল করিয়া পৃথিবী ভুলাইয়া দিল। এ বাড়ীর একজন ভাড়াটে গিরিন সাউ চমৎকার বেহালা বাজায়, হারমোনিয়াম আর তবলা বাজানোর লোকও সেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, শুধু বসিয়া থাকিয়াই গানগুলি গাহিয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম গানের অর্দ্ধেকটাও বসিয়া বসিয়া গাওয়া চলিল না। রাধার কাছে যাওয়ার সময় পথে চন্দ্রাবলী তাকে ধরিয়া নিজের কুঞ্জে টানিয়া আনিয়াছে, রাধার জন্য মন আকুল হইয়া আছে কিন্তু বাহিরে সে চতুরালি করিতেছে চন্দ্রাবলীর সঙ্গে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া এ কি প্রকাশ করা যায়? একটি হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পায়ে না ধরিলে কি খণ্ডিতা রাধার কাছে নিবেদন করা যায়, হৃদয়ে যার শুধু রাধার চিহ্ন আঁকা বাহিরের অঙ্গে তুচ্ছ নখচিহ্ন দেখিয়া তার উপর রাগ করা রাধার উচিত নয়?

গানের শেষে সুভদ্রা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সাধন ঘরে গেল অনেক পরে। খোলা দরজার বাহিরে এখনও মানুষকে চলাফিরা করিতে দেখা যাইতেছে, কলরব শোনা যাইতেছে। সাধন ঘরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তার সামনে এক হাঁটু মাটিতে নামাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া দু'হাতে তার পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যি বলছি আমি, তুমি ছাড়া আমি কাউকে জানি না। কোন দিন কোন পর-পুরুষের দিকে আমি তাকাই নি—'

সাধন তার গালে টোকা দিয়া বলিল, 'সত্যি?'

সুভদ্রা কাতর হইয়া বলিল, 'কেন সন্দেহ করছ? রসিককে যে মাঝে মাঝে আসতে দিতাম তাও তো তোমার জন্যেই? মাইরি বলছি, যখন আর সইতে পারতাম না, মনে হত আর একটু'খন তোমায় না পেলে বুক ফেটে যাবে, শুধু তখন একটু সময়ের জন্যে—'

বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'উঃ, মাগো! আমি আর বাঁচব না।'

বেহালা-বাদক গিরীন সাউ-এর বৌ কালিদাসী আসিয়া বলিল, 'খাবে না বষ্টুম দিদি? কি গানটাই গাইলে বষ্টুম দিদি?'

সুভদ্রা উঠিয়া খাইতে গেল এবং পেট ভরিয়াই খাইল। সে রাত্রে সাধনকে সে আর কাছে ঘেঁষিতে দিল না। কালিদাসী যে সম্মান করিয়া তাকে আজ প্রথম বষ্টুম দিদি বলিয়া ডাকিয়াছে তাতে তার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

পরদিন সকালে এত খদ্দের আসিয়া জুটিল যে সাধনের দোকানের অল্প বিড়ি

সিগারেট ফুরাইয়া গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে, বেগুনি ফুলুরি ভাজিয়া সুভদ্রা অর্দ্ধেক লোকের দাবী মিটাইয়া উঠিতে পারিল না। সকলেই সুভদ্রার গানের প্রশংসা করিতে চায়, বলিতে চায় যে বেগুনি ফুলুরির এমন স্বাদ তো জীবনে তারা পায় নাই। সঙ্কীর্ণ বারান্দায় উবু হইয়া বসিয়া আর বারান্দার সামনে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া সকলে যেন একটি বৈঠক বসাইয়া দিল। লোচন কামার প্রতিমা গড়িতে ওস্তাদ, একটি মাত্র বেগুনি খাইয়া যেন নেশা হইয়াছে এমনি ভাবে সে আধঘণ্টা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল সুভদ্রার বুকের দিকে, আর ভাবিতে লাগিল, একটিবার মুহূর্তের জন্য কাপড়ের নীচে সুভদ্রার স্তন দু'টি দেখিতে পাইলেই সে ঠিক বুঝিতে পারিত তার প্রতিমার বুকের মাটির ঢিপিগুলির চেয়ে ও দু'টি নিটোল বর্তুলাকার কি না। সতীশ গোয়ালা ভাবিতে লাগিল, ইনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবতী। বংশী হালদার সারাদিন মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সুভদ্রার গেরুয়া বেশ যেন রোদে ঝলসানো সহরের সুরকির পথের মত চোখে তার ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতে লাগিল। নটবর একজন বড়লোকের খাতিরের খানসামা, সে ভাবিতে লাগিল, সুভদ্রার সঙ্গে একবার যদি ঘনিষ্ঠতা করাইয়া দেওয়া যায়, কি খুশীই বাবু হইবেন। এই চারজন ছাড়া সকলেই কম বেশী কথা বলিতেছিল, দু'একজন কথা বলিবার চেষ্টায় গিলিতেছিল ঢোঁক।

'এবার আমি রাঁধতে যাই?' বলিয়া এক সময় সুভদ্রা ভিতরে চলিয়া গেল। আবার দোকান খুলিল একেবারে সেই বিকালে। একবেলাতেই দোকানদারিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। লোকগুলি বড় ভোঁতা, বড় নীরস। বেগুনি ফুলুরি কিনিতে আসিয়া তাকে যেন সকলেই বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তার সাহচর্যে ভুলিয়া যাইতে চায় নিজেদের।

বিকালেও খদ্দের আসিল অনেক এবং দিন দিন খদ্দেরসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বেগুনি ফুলুরি ভাজিবার জন্য একজন লোক রাখিয়া দেওয়া হইল। সুভদ্রা মাঝে মাঝে আসিয়া পাঁচ দশ মিনিট বারান্দায় বসিতে লাগিল আর নিজের হাতে বিক্রী করিতে লাগিল ভাজা জিনিসগুলি। বৈঠক তাই ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু সেজন্য বিক্রী কমিল না। বেগুলি ফুলুরিও কম মুখরোচক জিনিস নয়।

বৈঠক না বসুক, লোচন, সতীশ, বংশী আর নটবর নিয়মিত ভাবে আসে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে। সুভদ্রা না থাকিলে গল্প করে সাধনের সঙ্গে, সুভদ্রা আসিলে দু'এক পয়সার বেগুনি কেনে আর দু'একটি কথা কয়।

নটবর একদিন তাকে বাবুদের বাড়ী গান গাহিবার বায়না দিয়া গেল। শুনিয়া লোচন বলিল, 'না, না, অমন কম্মোও কোরো না। ওর বাবু বড় খারাপ লোক।'

সতীশ এবং বংশীও সায় দিয়া বলিল, 'যেও না, বিপদ হবে।'

সুভদ্রা বলিল, 'বিপদ হবে? কিসের বিপদ?' তারপর হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, তোমরা তবে দশটা টাকা দাও আমায়, যাব না। তোমাদেরি না হয় গান শুনিয়ে দেব।'

পরদিন সত্যই তারা দশটা করিয়া টাকা নিয়া হাজির। দশটা করিয়া টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে এমনিই সহজ নয়, প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ থাকিলে সেটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিয়া সুভদ্রা খুশী হইল বটে, মন কিন্তু তার ভিজিল না। এসব ফাঁকি সে জানে। সাতদিন একত্র বসবাস করিবার পর সে একটি টাকা বাজে খরচ করিলে এরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করিবে। তা ছাড়া, এবেলা টাকাটা নিলে ওবেলা এরা একা পাওয়া মাত্র তার হাত ধরিয়া টানিবে। তার চেয়ে নটবরের বাবুর বাড়ী গান গাহিতে যাওয়া অনেক ভাল।

গান কিন্তু সেখানে জমিল না,—সুভদ্রার গান। আসরে ঝালরবসানো তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপস্থিত ছিল শুধু বাবুর কয়েকটি বন্ধু এবং তবলচি ও সারেঙ্গীর কাছে সহজ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসিয়াছিল আরেক জন মানুষ। তার চোখে কাজল আর ছোট নূরটি লালচে রঙে রাঙ্গানো। ধৈর্যের প্রতীকের মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, আর বাঁ হাতের আঙ্গুলের সন্তর্পণ স্পর্শ ধীরে ধীরে বিলাইয়া দিতেছিল নূরে। সুভদ্রা প্রথম গানটি আরম্ভ করার পরেই বাবু আর তার বন্ধুদের মুখে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল কিন্তু এ লোকটি চোখের একটি বাড়তি পলকও ফেলিল না। সুভদ্রা তিনটি গান গাহিবার পর বাবু বলিল, 'এবার তুমি বিশ্রাম কর। ওস্তাদজি, আপনি এবার মেহেরবানি করুন তবে?'

ওস্তাদ এবার একটু হাসিয়া মাথাটি সামনের দিকে সামান্য নীচু করিল।—'সোজা সুরের একটা বাংলা গান গাই?

'বলেন কি ওস্তাদজি, আপনি বাংলা গান জানেন?' সিগারেটের ধোঁয়া না ছাড়িয়াই সবিস্ময়ে কথাটা বলিয়া বাবুর এক বন্ধু কাশিতে লাগিল।

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'জল খান, দু'ঢোঁক জল খেলেই সেরে যাবে।'

বন্ধুর কাশি থামিলে ওস্তাদ বলিল, 'জানি কিনা সে তো মালুম হবে শুনলে?'

ঠুংরীতে হাফেজের বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ। শুনিতে শুনিতে সুভদ্রার মনে হয়, ওস্তাদের অমন সুন্দর ফুলকাটা পাঞ্জাবীর তিন চার জায়গা ছেঁড়া কেন ? আরও শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে পাৎলা পাঞ্জাবী, ছুঁচ সূতায় সে কি ছেঁড়াগুলি রিপু করিয়া দিতে পারিবে ? গান শেষ হইলে তার মনে পড়ে, রিপুর কাজ সে জানে না, যাত্রার দলে যে ছেলেটি তার রাধা সাজিত সেই যেন কোথা হইতে খুব ভাল রিপুর কাজ শিখিয়াছিল।

ওস্তাদ সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল ?'

সুভদ্রা নির্বিবাদে বলিল, আরেকটা শুনি ?'

ওস্তাদের কয়েকটি গান শুনিয়া সকাল সকাল সুভদ্রা বাড়ী ফিরিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তার গানও বাবুর পছন্দ হয় নাই, তাকেও পছন্দ হয় নাই।

পরদিন ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়া ওস্তাদ সুভদ্রার বাড়ী আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সুভদ্রা গান শিখিবে কি, গান ? ভাল ভাল গান ?' সেই ফুলকাটা জামা পায়জামা পরিয়াই ওস্তাদ আজ আসিয়াছে, মাথায় শুধু আজ একটি জরি বসানো টুপি, আর চোখের কাজল আরও একটু স্পষ্ট। সুর্মা নয়, কাজল। কালিদাসীর ছেলের কাজলপরা চোখের মতই আশ্চর্যরকম কচি কচি দেখাইতেছে ওস্তাদের চোখে।

দেখিয়াই সাধন একটা কুৎসিত প্রশ্ন করিল, 'নটবরের বাবু বুঝি গান শিখাইতে পাঠাইয়াছে ওস্তাদকে ?'

ওস্তাদ বলিল, 'তোবা তোবা, নটবরের বাবু আমার কে ?'

জগতে এমন বড়লোক কে আছে যে ওস্তাদকে মনিবের মত হুকুম দিবে ? বাবু তো শুধু তার সাকরেদ, ওস্তাদের বাড়ীতে যে দু'চারজন গান শিখিতে আসে তাদের সঙ্গে বাবুর তফাৎ এই যে, বাবু গাড়ী পাঠায় আর ওস্তাদ তার বাড়ী গিয়া গান শিখায়।

তার পর প্রতি সন্ধ্যায় সুভদ্রা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে লাগিল। কালিদাসী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'মোছলমানের কাছে গান শিখছ বষ্টুম দিদি ?'

সুভদ্রা বলিল, 'মোছলমান-ই ভাল।'

কিন্তু গান শিখতে ভাল লাগে না সুভদ্রার, কিছুই ভাল লাগে না। দোকানে নিয়মিত কেনা-বেচা চলিতেছে, ভিতরে নিয়মিত ঘর-কন্না চলিয়াছে, নিজেই সে নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করিতেছে নিয়মের ফাঁকি আর বন্ধন। :যা-খুশী সে করিতে

পারে, কিন্তু যা-খুশী করিবে কি ? কি আছে যা-খুশী করার ? পথে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিবে ? সহরের পাশে যে নদী আছে তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে ? না, বিষ খাইবে ?

সাধনকে সে মিনতি করিয়া বলে, 'এখান থেকে পালাই চল, এঁ্যা ? তেমনি ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াব দু'জনে, কি মজাটাই হবে।'

সাধন বলে, 'দূর পাগলি ! ঘুরে বেড়ানোতে আবার মজা কি ?'

তা ঠিক, ঘুরিয়া বেড়ানোতে হয় তো মজা লাগিবে না। সুভদ্রা এখন টের পাইয়াছে, সাধন বৈরাগীর সঙ্গে ক'দিন পথে পথে কাটানোর আসল মজাটা কি ছিল। কি সুখ ছিল সে ঘুরিয়া বেড়ানোর ? কিছুই না। শুধু একটা উত্তেজনা ছিল, প্রতি মুহূর্তের উত্তেজনা, পর মুহূর্তে বুঝি কিছু ঘটিবে, জীবনে কিছু আবির্ভাব ঘটিবে কোন কিছুর। ক্ষণে ক্ষণে তখন সব বদলাইয়া যাইত, মাটির পথের পরে আসিত সুরকির পথ, হাট বাজারের পরে আসিত মাঠ, তাড়িখানার পরে আসিত দেব মন্দির, একজনের কুৎসিত মন্তব্যের পর আসিত আরেকজনের সভক্তি প্রণাম, মুচির ঘরের আশ্রয়ের পরে আসিত বড়লোকের বাগানবাড়ীর আশ্রয়। এই পরিবর্তন যেন প্রমাণের মতই আশা জাগাইয়া রাখিত. এ সমস্তের অতিরিক্ত আরও একটা নতুনত্ব নিশ্চয় আসিবে। সুভদ্রা কৃতার্থ হইয়া যাইবে। আর তার মন ছটফট করিবে না, উল্লাসে গদগদ হইয়া সেই নতুনত্বকে বরণ করিয়া বলিবে, এতদিন আসোনি যে বড়, আচ্ছা খামখেয়ালী নিষ্ঠুর মানুষ তো তুমি ?

মানুষ ? সে নতুনত্ব কি তবে মানুষ সুভদ্রার ? ফাঁপরে পড়িয়া সুভদ্রা এদিক ওদিক তাকায়। কত মানুষ চলিতেছে পথ দিয়া, সকলেই একরকম, দেহকাণ্ডের সঙ্গে দু'টি হাত আর পা আঁটা, এবং উপরে একটা মাথা বসানো। কোন নতুনত্ব তো নাই এদের মধ্যে। এদের মধ্যে যাকেই সে বরণ করুক, মুখে হাত চাপা দিয়া সে শুধু তাকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যা চায়, কি চায় তা অবশ্য সে জানে না, কিন্তু যা সে চায় মানুষের মূর্তি ধরিয়া আসিলে তো তার চলিবে না।

সুভদ্রার মনে তাই সন্দেহ জাগিয়াছে, সাধনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর ভাল লাগিবে কিনা। জ্ঞান বাড়িয়াছে, প্রত্যাশার উত্তেজনাটুকু পর্যন্ত হয়তো এবার জুটিবে না।

কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে যদি নিরুদ্দেশ যাত্রা করে ? কাছাকাছি গ্রাম আর সহরে ঘুরিয়া বেড়ানোর বদলে যদি আজ যায় দিল্লীতে আর কাল যায় বোম্বায়ে এবং তার

পরদিন যায় দিল্লী বোম্বায়ের মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আরও যে সব জায়গা আছে, যার নামও সে কোনদিন শোনে নাই ?

কদিন পরে তাই গেল সুভদ্রা, তবে দিল্লী বা বোম্বাইয়ে নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অন্য কোন জায়গাতেও নয়। সুভদ্রার অত পয়সা কই ? ওস্তাদ গরীব মানুষ। তাই ক'দিন এখানে ওখানে ভাসিয়া বেড়াইয়া দু'জনে কলকাতা আসিয়া ঠেকিয়া গেল। তবে ওস্তাদ ভরসা দিয়া বলিল, তাতে কি আসে যায় ? যেখানে খুশী যাওয়ার সাধ মনে থাকে, যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে যেখানে খুশী যত দিন খুশী দিন কাটিয়া যাক, একদিন তো তারা যাইবেই যাইবে। তার বেশী আর কি চাই মানুষের ? যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার আয়োজন তো তুচ্ছ নয়, মনটাই তো যায় মানুষের মাটির পৃথিবীর বুকে এখান হইতে ওখানে ! নাই যদি যাওয়া হয় এখানকার ঘরবাড়ী লোকজন দেখার বদলে ওখানকার ঘরবাড়ী যানবাহন দেখিতে, এখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটার বদলে ওখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটিতে, একটা যাত্রা তো একদিন তাদের শুরু করিতেই হইবে, অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে সব যাত্রার চরম একটা যাত্রা ?

তা বটে। সজোরে ওস্তাদকে জড়াইয়া ধরিয়া সুভদ্রা বলে, 'তবে তাই চলো ওস্তাদ, সেখানেই আমরা যাই। তুমি আমার গলাটা টিপে ধরো, আমি তোমার গলাটা টিপে ধরি।'

ওস্তাদ কি বলিতে যায়, বাঁ হাতটি আলগা করিয়া সুভদ্রা তার মুখে চাপা দেয়। দেহের ভারে মুসাফিরখানার ছেঁড়া নোংরা মাদুরের বিছানায় তাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তার বুকের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

নরম কোমল হাতটি মুখ হইতে সরাইয়া স্ফূর্তির সঙ্গে ওস্তাদ বলে, 'বহুৎ আচ্ছা, মেরাজান ! কেয়াবাৎ !'

সুভদ্রা আবার তার মুখে হাত চাপা দেয়।

শেষরাত্রে ওস্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাদের দু'জনের বড় পুঁটলিটি খুলিয়া সুভদ্রা তার শাড়ী-সেমিজের একটি ছোট পুঁটুলী করিতেছে।

মুখ ফিরাইয়া ওস্তাদকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুভদ্রা বলিল, 'পালাচ্ছি ওস্তাদ। চুপি চুপি পালাচ্ছিলাম, তুমি জাগলে কেন ?'

ওস্তাদ বাজে কথা কিছু বলিল না, ব্যস্ত হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

'সেখানে ফিরে যাবে?'

'দূর! ফিরে গেলে সাধন বৈরাগী রক্ষা রাখবে আমার? যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

ওস্তাদ উৎসুক হইয়া বলিল, 'বেশ তো' চলো না আমিও সাথে যাই? পিছে পিছে যাব, খুশ হলে কাছে ডাকবে, নয়তো ডাকবে না?'

সুভদ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, এবার একা পালাব ওস্তাদ। পুরুষকে সঙ্গে নেব না। পুরুষ জাতটাই বড় খারাপ, কেবল জড়িয়ে ধরে!'

ওস্তাদ মাথাটা সামনে একটু হেলাইয়া সায় দিল, মুখে কিছু বলিল না। বাঁ হাতে সন্তর্পণে নিজের ছোট লালচে নূরটিকে আদর করিতে লাগিল। একাই যাইতেছে বটে, তবে সে থাকিবে না, ওস্তাদ তা জানে। পুরুষ মানুষ একা থাকিতে পারে না, ও তো মেয়েমানুষ। একজন কেউ আসিবেই, সুভদ্রা নিজেই যাকে জড়াইয়া ধরিবে, আর ছাড়িবে না। আর সেই একজন যদি কখনো আনমনে জড়াইয়া ধরিতে ভুলিয়া যায় চোখে সুভদ্রার জল আসিবে, রাগে সে ফোঁসফোঁস করিতে থাকিবে।

সুভদ্রার পুঁটলি বাঁধা হইলে ওস্তাদ একটি প্রস্তাব করিল। চুপি চুপি যখন পালানো গেল না, বাকী রাতটুকু বসিয়া গল্প করিলে হয় না, ভোরবেলা সুভদ্রা চলিয়া যাইবে? ভোর হইতে বেশী বাকী নাই।

'তুমি জ্বালালে ওস্তাদ।'

সুভদ্রা কাছে আসিয়া বসিল। গল্প তেমন জমিল না। একটিবার তাকে জড়াইয়া ধরার জন্য মনটা ওস্তাদের আঁকুপাঁকু করিতেছিল। টের পাইয়া সুভদ্রাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, কখন ওস্তাদ একটু ভয়ে ভয়ে তার হাত ধরিয়া মৃদু সলজ্জ হাসির সঙ্গে চোখে চোখে চাহিয়া নীরবে জড়াইয়া ধরিবার অনুমতি চাহিবে। বাহিরে ভোর হইয়া আসিল, রাস্তার আলো নিবিয়া গেল, ওস্তাদ কিন্তু কিছুই করিল না।

তখন সুভদ্রা নিজেই বলিল, 'একবারটি জড়াবে না ওস্তাদ? শেষবারের মত?'

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বেশ বুঝা যায়, ধৈর্য আর সংযমের তলে চাপা পড়িয়া ভিতরের উত্তেজনা ওস্তাদকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে, দম-আটকানো উদ্বেগে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ছোট ছোট। ক'দিন কাজল পরা হয় নাই, তবু কাজলের একটু আভাস

ওস্তাদের চোখে পাওয়া যায়। আশা, হতাশা, ঈর্ষা, উদারতা, রাগ, দুঃখ, অভিমান, ক্ষমা ও ত্যাগের ভাব মিশিয়া তার মুখে প্রলেপের মত মাখা হইয়া গিয়াছে, আর চোখ দুটি যেন পলকে পলকে বদল করিয়া ওই ভাবগুলি এক একটি বাছিয়া বাছিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুভদ্রা চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তুমি সত্যি জ্বালালে ওস্তাদ। যাব না নাকি?' একটু ভাবিয়া সে আবার বলিল, 'না পালাই, তোমার সঙ্গেও আমার বনবে না।'

ওস্তাদের চোখের ঔৎসুক্য নিবিয়া গেল, আটকানো নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের আলো আরেকটু স্পষ্ট হইয়াছে। সুভদ্রা চলিয়া গেল, ওস্তাদ আর একটি কথাও বলিল না। শেষ চেষ্টা কাজে লাগিল না, আর কি বলিবার আছে? এখন আপনা হইতে ফাঁদটি খসিয়া গিয়াছে ভাবিয়া খুশী হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু সে চেষ্টা করিতে গিয়া ওস্তাদ দেখিল, ফাঁদ খসিয়া গেলেও ফাঁদে পড়া বেকুব প্রাণীর মতই ছটফট না করা অসম্ভব।

ভাঙা ঘর

আকাশ-ভাঙা বর্ষার মধ্যে আমাকে পথহারা পথিক হিসাবে কল্পনা করতে হবে। পথ দিয়ে হাঁটছি না মাঠ দিয়ে হাঁটছি মাঝে মাঝে তাও ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কারণ, জলের নীচে পথ আর মাঠ একাকার হয়ে গিয়েছে। পথটাও অবশ্য ছিল নামেই পথ, মাঠের বুকে পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা একটা রেখা। তবু, সে রেখা ধরে চলবার একটা সুবিধা থাকে যে শেষ পর্যন্ত লোকালয়ে পৌছানো যায়, অন্ধের মত আধ হাত জলে ছপ্-ছপ্ পা ফেলে যেদিকে খুশী চলতে থাকলে ডোবা পুকুরে পড়বার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং শ্মশানে বা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবার সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে কিছু কম।

তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোন লাভ নাই, সমস্ত রাত বৃষ্টি না ধরলে সমস্ত রাত্রিটাই তার ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়। তাই, আন্দাজে এগিয়ে চলছিলাম। সামনে অথবা পিছনে, তা বলতে পারব না।

এমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে ভাঙা ঘরখানার সন্ধান পেলাম। আকাশ অবশ্য মাঝে মাঝে আলো সরবরাহ করছিল, সেই আলোতে চোখে পড়ল খড় অথবা শণের প্রকাণ্ড একখানা কাঁচা ঘর ভেঙে পড়ে আছে। আশে পাশে আর ঘর না দেখে একটু বিস্ময় আর বিরক্ত বোধ করলাম। এক ভিটায় এত বড় একখানা ঘর তুলে সাধারণতঃ কেউ বাড়ী করে না, চার ভিটায় না হোক্ এবং প্রত্যেক ভিটায় এত বড় না হোক্, অন্ততঃ তিন ভিটায় তিনখানা ঘর তোলা হয়। বিদ্যুৎ চমকাবার প্রতীক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এটা কি তবে গৃহস্থের বাড়ী ছিল, না কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোন একদিন মাঠের মাঝখানে কেউ একখানা ঘর তুলেছিল, তারপর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘরখানা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াতেও কেউ খেয়াল করেনি? কিন্তু তা'হলে তো চারিদিকে আগাছার জঙ্গলের মাথা তুলবার কথা।

ভাঙা ঘরের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে যাবার পর এ সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে গেল। বাড়াটা যে গৃহস্থের, চার ভিটাতে সে চারখানা ঘরই তুলেছিল বটে। ভাঙা ঘরের দু'পাশের ভিটায় আরও দু'খানা ঘর ভেঙে পড়ে আছে এবং বিপরীত দিকের ভিটায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট একখানা ঘর। প্রথম ভাঙা ঘরখানার কাত হ'য়ে পড়া প্রকাণ্ড চালাটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি।

এবার সহজেই বুঝতে পারলাম এতক্ষণে বাড়ীর ভিতরের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছি, যে অঙ্গনের অর্ধেকের বেশী দখল করেছে পাশের ভিটায় ভাঙা ঘরখানা। একটু দ্বিধা করলাম। তিনখানা ঘর—বড় আর ভাল তিনখানা ঘর—ভাঙা; দাঁড়িয়ে আছে শুধু টিনের চালের ছোট ঘরখানা, সামনে যার রোয়াক পর্যন্ত নেই। ওখানে আশ্রয় খোঁজ করার চেয়ে গাছতলায় নিরাশ্রয় হ'য়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

যা কিছু দেখছিলাম, সমস্তই কয়েক মিনিট পরে পরে চোখের পলকে—প্রায় না দেখারই সামিল। তাই বুদ্ধির ওপর বেশী নির্ভর না করে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ ঝাঁপের দরজা ঠেলে গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, কে আছেন? ও মশায়! শুনছেন?'

ভয়ার্ত পুরুষ কণ্ঠে সাড়া এল: 'কে?'

প্রথমে বললাম, 'আমি।' তারপর সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল্‌লাম যে পথ হারানো একজন পথিক—ভদ্রলোক। ঝাঁপে কান লাগিয়ে ভিতরের শব্দ শুনবার চেষ্টা করছিলাম, চাপা মেয়েলি গলার প্রশ্ন শুন্‌তে পেলাম: 'খুল্‌বে? যদি চোর ডাকাত হয়?' চাপা পুরুষ গলার জবাব শুনলাম: 'চোর ডাকাত হ'লে কি ঝাঁপটা খুল্‌তে পারবে না?'

একটু পরে ঝাঁপ খুলে গেল, সন্তর্পণে ভিতরের অন্ধকারে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিজা জামা-কাপড়ের জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না। ঘরের ভিতরে ভাপ্‌সা গরম আর গন্ধে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আমার মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগে একবার একটা মালগুদামে কয়েক ঘণ্টা সময় নিশ্বাস নিতে আমার ঠিক এই রকম কষ্ট হইয়াছিল আর ঠিক এইরকম অকথ্য অস্বস্তির সঙ্গে মনে হয়েছিল আমারই পেটের ভিতরের সিক্ত উষ্ণতা বাইরে এসে চারি দিক থেকে আমার সর্বাঙ্গে মাখা হ'য়ে যাচ্ছে।

কালিপড়া একটা লণ্ঠন জলবার পর টের পেলাম, ঘরে অনেকগুলি নানাবয়সী মানুষ বাস করলেও এটাকে মালগুদামও বলা চলে। তবে পৃথিবীর কোন মাল-গুদামেই এত রকমের বিভিন্ন আর বিচিত্র মাল থাকে কি না সন্দেহ। আর ঘরে তিল ধারণের স্থান নেই। ঘরের অর্দ্ধেক জুড়ে আছে সেকেলে একটা খাট আর একেলে চৌকী, খাটের ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে একগাদা ছেলেমেয়ে। চৌকীতে গোটা দুই তোরঙ্গ, পিতল ও মাটির হাঁড়ি-কলসী, বস্তা বাঁধা লেপ,

কাপড়-জামার পুঁটুলি এবং সাধারণ গৃহস্থের ঘরকন্নার অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের অর্ধেকটাতে ছেলেদের স্কুলের ছেঁড়া বই-খাতা, বাকী অৰ্দ্ধেকটাতে শিশি-বোতল, টিনের কৌটা, কাগজের ঠোঙ্গা—ইত্যাদি। একদিকের বেড়ার গায়ে কাঠের থামে ঠেসান্ দেওয়া একটি পুরানো ভাঙ্গা সাইকেল গোটা চারেক রঙচটা লোহার আর গোটা দুই বেতছেঁড়া কাঠের চেয়ার, একটা পায়া ভাঙ্গা টুল আর সাত আটটি ছোট বড় কাঠের পিঁড়ি প্রভৃতি বসবার সরঞ্জামেরও অভাব নেই। একখণ্ড তক্তার উপরে বোধ হয় তিনটি চালের বস্তা, কাছেই তিনটি তরকারীর ঝুড়ি। চৌকীর তলে অসংখ্য আবছা জিনিসপত্রের একপাশে মস্ত একটা বঁটির ফলা চকমক করছে। খাটের তলাটাও জিনিসে ঠাসা, কিন্তু সেখানে বোধ হয় নিজেকে ঘোষণা করতে পারে এরকম ঝকমকে কিছু নেই। এককোণে পুরানো ভাঙ্গা জিনিসপত্রের স্তূপ—আবর্জনার সামিল। অন্য কোণে বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক, ছোটখাট একটা চৌকীর সমান। সিন্দুকের উপরে বিছানা পাতা, বিছানায় বসে আছে বছর পঞ্চাশেক বয়সের শীর্ণ-দেহ একটি লোক। দুয়ারের কাছে একটু স্থান ছাড়া মেঝে আর চোখে পড়ে না, যে জায়গাটুকুতে জিনিস নেই সেখানে বিছানা পাতা হয়েছে। কেবল মেঝেতে নয়, টিনের চাল থেকে দড়ি বেঁধে যত কিছু ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব তাও রাখা হয়েছে। ঘরের সমস্ত জিনিসের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে মস্ত এক সম্পন্ন গৃহস্থের শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর রান্নাঘরে যত জিনিস থাকে তার প্রত্যেকটির নাম করতে হয়।

মাথার উপরেও যে জিনিস ঝুলছে এটা আমাকে আবিষ্কার করতে হল বাধ্য হয়ে। মেঝের বিছানাতেও চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তাদের মধ্যে একটি মেয়ের বয়স পনের যোলর কম হবে না। ছোট ভাইবোনদের মত পরণের শাড়ীখানাকে সেও একেবারে ত্যাগ করেছে। নজরে পড়ামাত্র চোখ তুলে মাথার উপরে ঝুলানো একটা বেতের ঝাঁপির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বেতের ঝাঁপি তো ঝুলানো থাকেই না, এই বয়সের মেয়ে দম আটকানো গরমেও ঘুমের মধ্যে অঙ্গের আবরণ ঘুচিয়ে দেয় না।

সাত আট মাসের একটি শিশুকে কাঁখে নিয়া যে মহিলাটি কালিপড়া লণ্ঠন জ্বালিয়েছিল দরজার ঝাঁপও বোধ হয় খুলেছিল সে-ই, কারণ সিন্দুকের উপরের বিছানা ছেড়ে লোকটি যে নীচে নামেনি বুঝতে কষ্ট হয় না। এতক্ষণ উবু হয়ে বসে

সে বোধ হয় আমাকেই দেখছিল, এবার মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'দেখেছ? হারামজাদি মেয়ের কাণ্ডখানা দেখেছ?'

মহিলাটি মেঝের পাতা বিছানার কাছে এগিয়ে গেল নীরবেই কিন্তু মেয়েটির গালে একটা চড় বসিয়ে দিল সশব্দে। চড়ের শব্দ না শুনলে আমি হয় তো ঝাঁপি থেকে চোখ নামাতাম না। আর্তনাদ করে জেগে উঠে মেয়েটি কাঁদবার উপক্রম করছিল, মহিলাটির উদ্যত চড় দেখে কান্না বন্ধ করে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় ঘুম তার তখনও ভাঙেনি, আরও বোঝা যায় যে মস্তিষ্কের যে অঞ্চলটিতে জীবনের সাড়া ওঠে সেখানটা তার খুঁত-ধরা। মহিলাটি পায়ের তলা থেকে শাড়ীখানা কুড়িয়ে এনে তাকে ঢেকে দিতে গেল কিন্তু ততক্ষণে সচেতন হয়ে ওঠায় নিজেই সে কাপড়টিকে ছিনিয়ে চোখের পলকে নিজেকে ঢেকে ফেলল।

'মরণ হয় না তোর?'—ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটির তীব্র ধমক শুনতে পেলাম।

আমি এদিকে ভিজা জামা কাপড়েই দাঁড়িয়ে আছি আর জল ঝরে ঝরে পায়ের তলায় জমা হচ্ছে। এ কোন্ দেশী আতিথ্য? আমাকেই কি বলতে হবে, ভিজা কাপড় ছাড়বার জন্য আমাকে একখানা কাপড় দেওয়া দরকার?

'এই বিষ্টির মধ্যে এতরাত্রে মশায় এদিকে—?' সিন্দুকের ওপর থেকে প্রশ্ন এল।

আমি বললাম, 'আপনাদের এখানে তো জায়গা হওয়া মুস্কিল, আশেপাশে কারও বাড়ী আছে বলতে পারেন?'

'আছে বৈকি, আমবাগানটার ওপাশে ঢের বাড়ী আছে।'

আটহাতি কিন্তু পরিষ্কার একখানা কাপড় আমার দিকে এগিয়ে ধরে ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটি বলল, 'কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন। বাড়ী খুঁজে পাবেন না।'

সিন্দুকের ওপর থেকে সায় এল, 'তা বটে, বাড়ী এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত বটে। কি বাদলাটাই নেমেছে, বাপ্!'

জামা কাপড় ছেড়ে দিতে মহিলাটি সেগুলি চিপে মেলে দিল,—মেলবার স্থান যে ঘরে পাওয়া গেল তাই আশ্চর্য। আমি সিন্দুকে লোকটির পাশে উঠে বসলাম। মহিলাটি খাটে উঠে আমার দিকে পিছন ফিরে বসল, বোধ হয় কোলের শিশুটিকে মাই দিতে।

'খান্, বিড়ি খান্—'

বালিশের তলা হাতড়িয়ে বিড়ি আর দেশলাই বার করে লোকটি আমার হাতে দিল। বিড়ি টানতে গেলেই আমার কাশি আসে, সিগারেট কেসে সিগেরেটগুলিও সম্ভবতঃ ভিজে যায় নি, তবু আমি বিড়িই ধরালাম। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির মধ্যে লোকটির মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা কঠিন কিন্তু এখন যে গাম্ভীর্য নেমে আসতে দেখলাম গোঁফদাড়ির জঙ্গলেও বোধ হয় তা আড়াল হয় না।

'বাড়ীর কথা জিগ্যেস্ করলেন তাই বললাম বাগানের ওপাশে বাড়ী আছে। আপনি যেতে চাইলেও কি আপনাকে যেতে দিতাম মশায়! আজ পর্যন্ত এ বাড়ী থেকে একজন অতিথি ফিরে যায় নি।

ব্যাখ্যা, কৈফিয়ৎ এবং আত্মসমর্থন। বিড়িতে টান দিয়ে আমি কয়েকবার কাশলাম।

'ঘর তিনটে না হয় পড়েই গিয়েছে, তাই বলে জল-ঝড়ের মধ্যে বাড়ীতে লোক এলে তাড়িয়ে দেব! একটা ঘর তো আছে।'

আমিও একটু কৈফিয়ৎ দিয়ে বললাম, 'আহা, তাড়িয়ে দেবেন কেন—ঘরে তো আপনি ঢুকতেই দিয়েছিলেন। তবে এইটুকু ঘরে আপনাদেরি শোবার জায়গা নেই'

লোকটি সংক্ষেপে বলল, 'আপনি ওই খাটে শোবেন। ওদের সরিয়ে এখুনি বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

ক'মাইল পথ হেঁটেছি ঠিক নেই, পা আমার টন টন করছিল, গা আমার ব্যথা করছিল, চোখ আমার জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। তবু এ প্রস্তাবটিতে সায় দিতে পারলাম না। খাটে যতগুলি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে, ঘরকন্নার জিনিসের মত তাদের গাদা করে রাখবার উপযুক্ত একটু স্থানও ঘরের কোথাও চোখে পড়ল না। বললাম, 'না আমি শোব না। আপনারা শোন, আমি এই সিন্দুকের ওপরে ওই খানটাতে ঠেস্ দিয়ে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'তা কি হয় মশায়! আপনি বসে থাকবেন আর আমরা দিব্যি শুয়ে নাক ডাকাব! নরকেও তো আমাদের ঠাঁই হবে না!'

'কিন্তু খোকা খুকীরা যাবে কোথায়?'

'আহা, ওদের একটা ব্যবস্থা হবে বৈকি। তোমরা যে বসেই রইলে চুপচাপ? ভদ্রলোককে কিছু খেতে দাও, বিছানাটা ঠিক করে দাও?'

বড় মেয়েটি মুখের কাছে হাঁটু জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল আর থেকে থেকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। আমার মত শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমকাতুরে মানুষের দৃষ্টিকেও পীড়ন করে মুখে তার এমন গভীর ক্লিষ্টতার ছাপ। খাটের ওপর থেকে মহিলাটি তাকে ডেকে বলল, 'ছোট একটা থালায় নাড়ু আর নারকেলের সন্দেশ দে—দুটো আম কেটে দে।'

আমি হাত জোড় করে লোকটিকে বললাম, দোহাই আপনার, এত রাত্রে আর খেতে বলবেন না, মরে যাব। আশ্রয় যে পেয়েছি তাই ঢের—'

লোকটি ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'কিছুই খাবেন না, সামান্য কিছু?'

ঘোমটার ভেতর থেকে উৎসুক কণ্ঠে শব্দ এল, 'সব ঘরেই আছে, হাঙ্গামার কথা মনে করে যেন—'

যে চোখে দশ মিনিট আগে তাকে উলঙ্গ দেখেছিলাম আমার সেই চোখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'দিই না?'

আমি ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলাম, এ বাড়ীতে আমিই প্রথম অসময়ের অতিথি নই, হয়তো এই ছোট ঘরখানাতে এরকম অবস্থাতেও আরও অতিথি বাস করে গিয়েছে। কর্তা, গিন্নি, বা মেয়ে, কারও কাছে আমি অনভ্যস্ত বিপজ্জনক আবির্ভাব নই। আমার খাওয়া এবং শোয়ার ব্যবস্থা করার ভাবনায় তলে তলে এদের পাগল হওয়ার উপক্রম হয় নি—এঁদের পরিচর্যার ভূমিকাটুকুই আমাকে যা করে ফেলার উপক্রম করেছে।

মুখ গম্ভীর করে বললাম, 'পেটের অবস্থাটা ভাল নয়, কিছু খেলে সইবে না।'

তখন কর্তা আর গিন্নি প্রায় একসঙ্গেই সায় দিয়ে বলল, 'তবে থাক্।'

কিন্তু ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে কয়েকটিকে টানা হেঁচড়া করার ব্যবস্থাটা যে কি করে রদ করা যাবে ভেবে পেলাম না। অতবড় একটা খাট দখল করে আমি একা শুয়ে থাকব আর ওরা কেউ শোবার জায়গা পাবে না। ওদের সঙ্গেই খাটে শোয়া চলে কিনা একবার বিবেচনা করে দেখলাম, কিন্তু সেটাও সম্ভব মনে হল না। কাঠের সিন্দুকের উপরে বসে খাটের জোরালো গন্ধটা অনুভব করছিলাম, ছেলে-মেয়েদের সরিয়ে নতুন চাদর বিছিয়ে দিলেও গন্ধটা অন্তর্ধান করবে বলে ভরসা হল না।

ভেবে চিন্তে বললাম, এক কাজ করা যাক আসুন। আপনি খাটে খোকা-খুকীদের কাছে শোবেন যান, আমি এখানে শুয়ে থাকি।'

'আপনি কি এখানে শুতে পারবেন মশায়! পা বেরিয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'একটু পা বেরিয়ে থাকলে কিছু আসবে যাবে না।'

লোকটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'তা'ছাড়া সে বড় হাঙ্গামা।'

অতগুলি ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে তুলে খাট খালি করার চেয়ে এ ব্যবস্থার হাঙ্গামা বেশী হওয়া কি করে সম্ভব কোন মতেই ভেবে পেলাম না। লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল, 'কি জানেন, আমাকে তাহলে আপনার ধরাধরি করে খাটে নিয়ে যেতে হবে, উনি একা পারবেন না।'

কাপড় তুলে ধরতে দেখলাম হাঁটুর নীচে থেকে দুটি পা-ই ভদ্রলোকের কাটা।

'সিন্দুকের ওপরে শুতে আমার অসুবিধে নেই, পা বেরিয়ে যায় না। আপনি অবিশ্যি এতক্ষণ ভাবছিলেন, বাড়ীতে অতিথি এলো আর এ ব্যাটা দিব্যি আরাম করে সিন্দুকের ওপর গাঁট হয়ে বসে আছে। কি করব মশায়, নামবার ক্ষমতা থাকলে তো নামব।'

আমি বললাম, 'আহা, আপনার তো বড় কষ্ট। ঘর চাপা পড়ে পা ভেঙেছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে না, ট্রেনে কাটা গেছে, দশ বার বছর আগে। ঘর তো আমার ভেঙ্গে পড়েছে গত বছর—সেই যে ভীষণ ঝড় হয়েছিল সাতই আশ্বিন?—সেই ঝড়ে। বড় ঘর তিনখানাই পড়ে গেল, খাড়া রইল শুধু এই ছোট ঘরখানা।'

ঝড়ে বড় ঘরই পড়ে। বড়র পতনের এই বিধানটা চিরদিন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মহিলাটির সাহায্যে লোকটিকে খাটে চালান করে দিয়ে আমি সিন্দুকের ওপর পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম—বেড়ার দিকে মুখ করে। ঘোমটা টানা মহিলা এবং তার বড় মেয়েটিও তো শোবে। আলোটা জ্বলতে লাগল, সম্ভবতঃ ঘরে অজানা অচেনা মানুষ থাকার জন্য।

শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের উচিত হয়েছে? আশ্রয় না দেওয়ার অধিকার তো এদের ছিলই, কেবল তাই নয়, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের অন্যায় হয় নি?

অন্ধ ও ধাঁধাঁ

নিদ্রাপুরীর সদর গেটটা প্রত্যহ ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া খুলিয়া যায়। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলিয়াই যেন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ রাস্তায় জল দিবার গাড়ীতে প্রচুর শব্দেরও ব্যবস্থা রাখিয়াছে।

সমস্ত বিছানা হাতড়াইয়া বালিশের পাশে চশমার খোঁজ মিলিল। কাল ঘুমের চোখে খাপে ভরিয়া রাখিতে মনে ছিল না, কখন মাথার চাপে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে। টিপিয়া টিপিয়া ডাঁটগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া চশমা নাকে লাগাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। মন্দ হয় নাই। অস্বাভাবিক চাকচিক্যে ভোরের আলো একেবারে অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া হেরম্ব পথের উপরে খোলা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। ধূলা ভিজাইবার সমারোহ সমাপ্ত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী বিদায় নিয়াছে। পথের ওদিকে ছোট গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া আছে একটা ছ্যাক্ড়া ঘোড়ার গাড়ী।

গলির ভিতরে বোসেদের একতলা বাড়ীটি খালি পড়িয়াছিল, কোন অজ পাড়াগাঁ হইতে তাহার ভাড়াটে আসিল বোধ হয়। গাড়ীর ছাদে যে জিনিসগুলি হেরম্বের চোখে পড়িল, গ্রাম্য গৃহস্থের সংসার ছাড়া কুত্রাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রঙ চটা টিনের তোরঙ্গ, বাক্সহীন সিঙ্গল রীড হারমোনিয়াম ও ময়লা কাপড়ের বোঁচকা হইতে আরম্ভ করিয়া চালের বস্তা, ডালের হাঁড়ি, মসলা রাখা টিন, ঝুড়ি ভরা কড়াই, খন্তি হাতা প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, এক পোঁট্‌লা অর্দ্ধ শুষ্ক পুঁইশাক এমন কি গোবর মাখা গরু বাঁধা দড়ি পর্যন্ত গাড়ীর ছাদে স্থান পাইয়াছে।

ক্ষুদ্র এক টুকরি কয়লাও ইহারা মমতা বশে ফেলিয়া আসে নাই।

ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখের সামনে এ যেন পরম উপভোগ্য দ্রষ্টব্যের আবির্ভাব। সকাল বেলার আলস্য এ হেন উপলক্ষ্য পাইয়া সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। মন্থর চিন্তাযুক্ত মন দিয়া স্তিমিত নেত্রে হেরম্ব আরোহীর অবতরণ দেখিতে লাগিল।

প্রথমে নামিল একটি দৈত্য। গায়ের রঙ নিকষ কালো, মাথার চুল ধবধবে সাদা। বয়স বড় কম হয় নাই, কিন্তু যে গ্রামে ইহার বাস তার আশে পাশে ডাকাতি হইলে এখন পর্যন্ত পুলিশ সর্বপ্রথমে ইহাকে ধরিয়া নিঃসন্দেহ টানাটানি

করে। গায়ের বিবর্ণ থাকী সার্টটা শরীরের চাপে ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে, পরণে ছয় হাত মলিন ধুতি, নিজেও সে পাঁচ হাতের কম লম্বা নয়, পায়ে ধুলি মলিন চটি।

তুচ্ছ মানুষ, দেহের মানুষ। শক্তি যতই থাক, কুরূপের সীমা নাই। শুধু হেরম্বের দু'চোখে ঈর্ষা ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। এক হাতে গাড়ীর দরজা চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে শাড়ীর প্রান্ত উঁচু করিয়া (হাঁটুর কাছে একটি লম্বা ক্ষতের দাগ হেরম্বের চোখে পড়িল ; বহুদিন পরে মেয়েটির কথা ভাবিতে গেলে এই চিহ্নটি সর্বপ্রথমে তাঁহার স্মরণে আসিত) এবার যে সন্তর্পণে অবতরণ করিল তাহাকে দেখিলে চোখের পলক বন্ধ হইয়া যায়।

দৈত্যের পিছনে এ যেন অপহৃতা রাজকন্যার আবির্ভাব।

আধ হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকা পাছাপাড় কোরা শাড়ী পরা দৈত্যবধূর পরিবর্তে ইহাকে নামিতে দেখিয়া হেরম্বের চুরুট টানা বন্ধ হইয়া গেল। দৈত্যকে গাড়ীর ছাদের জিনিসগুলির কর্তা বলিয়া অনায়াসে ভাবা যায়, কিন্তু এই মেয়েটির ভর্তা বলিয়া কল্পনা করা চলে কেমন করিয়া? রূপার হাঁসুলিতে হীরার পদকের মত তাহা একান্ত অবিশ্বাস্য!

ভর্তা নিশ্চয়ই নয়,—ভৃত্য। স্বামী গাড়ীতে আছে, এইবার নামিবে। হেরম্ব উগ্র কৌতূহলের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নামিল শুষ্ক শীর্ণ এক বৃদ্ধ। ঠিক যে নামিল তাহা নয়, দৈত্য তাহাকে একপ্রকার কোলে করিয়াই নামাইয়া দিল। মেয়েটি তাহার হাত ধরিয়া এক পাশে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া জিনিস নামানোর তদ্বিরে ব্যাপৃত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ নড়েনা চড়েনা সেইখানে ঠায় দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপায়। হেরম্ব বুঝিতে পারিল সে অন্ধ।

অন্ধ! গত রাত্রির জ্যোৎস্নার চেয়ে বিস্ময়কর আলো চারিদিকে খেলা করিতেছে, হাত বাড়াইলে দু'চোখের একটি জীবন্ত তৃপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারে তবু বেচারা অন্ধ! হেরম্ব সভয়ে দেখিল, বৃদ্ধের চোখের পাতার তলে চোখ নাই, আছে চামড়া ছাড়ানো তাজা মাংসের রক্তাক্ত বীভৎসতা! অদৃশ্য জগতের শব্দকে অনুসরণ করিয়া দৃষ্টিহীন গহ্বর দুটি এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিল, হেরম্ব অভিভূতের মত তাকাইয়া রহিল।

পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। জিনিসগুলি নামানো হইলে মেয়েটি কি ভাবিয়া বারান্দার নীচে আগাইয়া আসিল। মধ্যাহ্নের সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বলিল, একবার নীচে আসবেন ?

যাই, এখুনি যাচ্ছি।

একটু সময় লাগিল। জামাটা গায়ে দিতে হয়, চোখের ও মুখের রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লিষ্টতা ধুইয়া ফেলিতে হয়, প্রভা চায়ের জল চাপাইয়াছে তাহাকে এখনই ফিরিয়া আসার আশ্বাস জানাইতে হয়।

বাহিরে গিয়া হেরম্ব দেখিল মেয়েটি পথ ছাড়িয়া রোয়াকে উঠিয়া আসিয়াছে, দু'পাশে প্রত্যেকটি বাড়ীর জানালা খুলিয়া গিয়াছে, কিষণ মুদীর দোকানে ক্রেতাদের মুখ এই দিকেই ফেরানো, পথের কয়েকজন পথিকও হঠাৎ চলিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, এও দেখছি আমাদের গাঁয়েরি মতন। মানুষ দেখতে মানুষ ভিড় করে।

এতক্ষণ সেও যে ওই কাজই করিতেছিল হেরম্বের তাহা মনে পড়িল না। বলিল, সব ছোটলোক। আপনি বরং ভিতরেই চলে আসুন। আমার স্ত্রী—

মেয়েটি বলিল, আপনার স্ত্রীকে আর বিরক্ত করব না। আপনার কাছেই আমার একটু সাহায্যের প্রার্থনা। আমার ওই চাকরটার শরীর যত বড় বুদ্ধি তত কম। তাছাড়া বাজার হাট পথঘাটও চেনে না। আপনার চাকরকে যদি দয়া করে এক ঘণ্টার জন্য ধার দেন—

সারাদিনের জন্য চাকরকে ধার দিতে স্বীকার করিয়া হেরম্ব বলিল, আপনাদের এবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের এখানে হতে পারে না ?

মেয়েটি একটু ভাবিল।—না, রান্না আমিই করে নেব। তোলা উনুন কয়লা সব সঙ্গে আছে, অসুবিধা হবে না।

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, জোর করা আমার পক্ষে অশোভন ! আমার স্ত্রীকে আনি সে পীড়াপীড়ি করতে পারবে।

মেয়েটি হাসিল, তা তিনি করবেন না। আমার সঙ্গে যে বুড়োমানুষটি আছেন ওর জন্যে বিশেষ কায়দা করে' রাঁধতে হবে। আমি ভিন্ন সে কায়দা কারো জানা নেই। কিন্তু আমরা ক্ষুধাতুর হ'য়ে আছি, মুড়ি চিড়া সুজি যাহোক কিছু জল-খাবার আর একটু দুধ পাঠিয়ে দেন—

বৃদ্ধকে নির্দেশ করিয়া হেরম্ব বলিল, উনি কে?

উনি আমার আত্মীয়, অভিভাবক!

হেরম্ব মনে মনে হাসিল। অভিভাবকই বটে। চিরন্তন গাঢ় অন্ধকারে বসিয়া চক্ষুষ্মতীর সম্বন্ধে কি অভিনব ভাবনাই না জানি ও ভাবে?

এক ঘণ্টার জন্য চাকরকে ধার দিয়া সদ্য-আগতা প্রতিবেশিনীর প্রতি কর্তব্য শেষ করা গেল না। বাড়ীটার সবে সংস্কার হইয়াছিল, চুন, সুরকি, ভাঙ্গা ইট ও নানা আবর্জনায় এমনি নোংরা হইয়াছিল যে, পরিষ্কার করিতেই দৈত্য ও হেরম্বের চাকরের একদিন লাগিয়া যাইত। হেরম্বই দু'জন কুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাড়ী পরিষ্কারের কাজে লাগাইয়া দিল, নিজের বাড়ী হইতে একটা তক্তপোষ আনাইয়া বৃদ্ধের শয়নের বন্দোবস্ত করিল এবং নিজেই কুয়ার ধারে গোটাতিনেক খুঁটি পুঁতিয়া কাপড় দিয়া ঘেরিয়া রাধার স্নানের অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাধা মৃদু হাসিয়া বলিল, গাঁয়ের মেয়ে, পুকুরে স্নান করি, ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরি। সহরে এসেই মানুষের দৃষ্টিকে অপমান করব?

এ অবশ্য প্রকারান্তরে কৃতজ্ঞতা জানানো, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল এ ভাবে ঘুরাইয়া বলিবার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। রাধার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ওদিকে দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে দৈত্য তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। দু'চোখে তাহার অকথ্য বিতৃষ্ণা।

হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া দৈত্য সরিয়া গেল।

ও ডাকাতটাকে সঙ্গে এনেছেন কেন?

রাধা হাসিল, আত্মরক্ষার জন্য। অতখানি অনুগত অন্ধ শক্তি আর কোথায় পাব?

শক্তির অন্ধতা বিপজ্জনক।

অন্যের পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। বিপজ্জনক অন্ধ শক্তি পৃথিবীতে আছে বলেই ওকে সঙ্গে এনেছি। নইলে—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। বারান্দার শেষপ্রান্তে কোণের ঘরখানা অন্ধ বৃদ্ধের, সেদিক হইতে কড়া তামাকের দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ সে-ঘরে এমন বীভৎস একটানা কাশির শব্দ আরম্ভ হইয়া গেল যে, হেরম্ব চমকাইয়া উঠিল।

ওকি? কে কাশে অমন করে?

রাধা পাংশু মুখে বলিল, আমার সেই অভিভাবক। বলিয়া সে দ্রুতপদে অন্ধের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হেরম্ব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওই শীর্ণকায় মুমূর্ষু বৃদ্ধ এমন ভয়ানক শব্দ করিয়া কাশে!

কাশি যেন আর থামিতে চায় না। একটা প্রকাণ্ড বকযন্ত্রের মধ্যে তোড়ে জল প্রবেশ করিবার চেষ্টায় মুহুর্মুহু থামিয়া থামিয়া গর্জন আরম্ভ করিয়াছে। হেরম্বের মনে হইল আর খানিকক্ষণ এভাবে কাপিলে বৃদ্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি খসিয়া চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িবে।

খানিক পরে দম আটকানোর মত একটা বিশ্রী আওয়াজ হইয়া কাশি থামিয়া গেল। রাধা ফিরিয়া আসিলে হেরম্ব বলিল, এ তো দেখছি সাংঘাতিক কাশি?

রাধার ফ্যাকাসে মুখে ধীরে ধীরে রক্ত ফিরিয়া আসিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে' ভুগছেন। ভুগে ভুগেই ওঁর এমন চেহারা হয়েছে, নইলে বয়স খুব বেশী নয়। মোটে চল্লিশ।

হেরম্ব অবাক হইয়া বলিল, কাশির অসুখে মাথার চুল সাদা হয়ে যায়?

তাইতো গিয়েছে দেখছি। জানেন, ওর চুলের দিকে তাকালে আমার ভয় করে। এমন হঠাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেল! তিন চার মাস আগেও সব চুল কালো ছিল। সেই থেকে স্বভাবও বদলে গেছে। কেশে কেশে মরবার দাখিল হয়েছে, তবু তামাক খাওয়া চাই। এমনি পায় না, আজ চাকরের হুঁকো কল্কে খুঁজে নিয়ে—

কি ক'রে খুঁজলেন?

তাই ভাবছি। চোখ নষ্ট হবার পর থেকে ওর কতগুলি আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মেছে।

উনি আপনার কে হন?

সে তো আপনাকে বলেছি। আমার আত্মীয়।

কি রকম আত্মীয়?

পরমাত্মীয়। বলিয়া রাধা হাসিবার চেষ্টা করিল।

এ বিষয়ে হেরম্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাশির পক্ষে এ জায়গাটা খুব উপকারী। মাসখানেকের মধ্যে ওঁর অনেক উপকার হবে।

সেই জন্যেই তো এখানে এলাম। ওর বেঁচে থাকা বড় দরকারী, বড় দরকারী। এই বলিয়া রাধা এমন এক প্রকার রহস্যময় দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের পানে চাহিয়া

এত বেশী অন্যমনস্ক হইয়া গেল যে হেরম্বের মনে হইল শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নয়, একটা অন্যতম বৃহৎ কারণে অকাল-বৃদ্ধের বাঁচিয়া থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিয়াও সে এই উদ্যত প্রশ্নটাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না ; বেঁচে থাকা দরকারী কেন ?

অতর্কিতে একটা অতি বড় অপরাধ যেন ধরা পড়িয়াছে, এমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া রাধা কেমন বিহ্বল হইয়া গেল।

সে আপনি বুঝবেন, আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি আজ আমায় একটা ভিক্ষা দিন। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। করবেন ?

হেরম্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, করব বৈ কি। নিশ্চয় করব।

পরম আশ্বস্ত হইয়া রাধা বলিল, ডাক্তার বলেন দু'এক বছরের মধ্যে ওর কিছু হবে না। আপনার কি মনে হয় ?

আমার মনে হয় উনি সেরে উঠবেন।

না, সে আশা আর নেই। বলিয়া রাধা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেমিজ খুলিয়া চুল এলাইয়া দিয়া গামছা হাতে রাধা বাহির হইয়া আসিলে হেরম্ব বিদায় চাহিল।

রাধা বলিল, বিকালে ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসবেন।

হেরম্ব হাসিল, কার ছেলে মেয়ে ? আমার ? কোথায় পাবো !

ছেলে মেয়ে নেই আপনার !

এ যেন অকথ্য, অবিশ্বাস্য, কল্পনাতীত দুঃসংবাদ ! হেরম্বের মনে হইল ইচ্ছা করিয়াই গামছাটা ফেলিয়া নিয়া কুড়াইবার ছলে রাধা কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখখানা আড়াল করিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল ওইটুকু সময়ের মধ্যে মুখের হতাশাব্যঞ্জক ভাবটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া দিতে পারে নাই। একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আপনাকে দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল আপনার ঘরভরা ছেলেমেয়ে। এমন স্বাস্থ্য এমন রূপ এমন প্রতিভার জ্যোতি মুখে চোখে—

রাধা দ্রুতপদে স্নানের ঘেরা স্থানটুকুতে ঢুকিয়া পড়িল।

হেরম্ব খানিকক্ষণ নড়িতে পারিল না। রাধার মন্তব্য খুব বেশী অদ্ভুত ও আকস্মিক তাহা নয়, ছেলে মেয়ে নাই শুনিয়া যে আশ্চর্য মুখভঙ্গি সে করিয়াছিল এ মন্তব্যের জন্য তার চেয়ে বিশদ ও সুস্পষ্ট ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু

তাহার স্বাস্থ্য রূপ ও প্রতিভার অপচয়ে রাধা এমন বিচলিত হইল কেন? পরিচয় তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার!

পাতলা কাপড়ের আড়ালে রাধাকে ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল, একটুখানি বিদেহী সোনালী আভা। হেরম্ব বুঝিতে পারিল মাথায় জল দেবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া রাধা জলচৌকীতে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া হেরম্বও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

বারান্দা যেখানে বাহিরের ঘরের দিকে দিক্‌পরিবর্তন করিয়াছে সেখান হইতে একটি সুদীর্ঘ কালো ছায়া উঁকি মারিতেছিল, হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া চোখের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চলিতে আরম্ভ করিয়া হেরম্বের মনে হইল, এ মন্দ নয়। সমুখে যখন স্বহস্ত-রচিত বস্ত্রাবাসে স্বর্ণাভ ছায়া জ্বলজ্বল্ করে পিছনে তখন বিপুল কালো ছায়া নিঃশব্দে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া থাকে।

বাহিরের ঘরে পা দিতে দৈত্য সোজা দাঁড়াইয়া গম্ভীর আওয়াজে বলিল, সেলাম বাবু।

সেলাম। তুমি মুসলমান নাকি?

গোলাম মোছলমান।

লোকটার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া হেরম্ব পথে নামিয়া পড়িল। ইহার লোমশ হাতের এক টিপুনিতে গলার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইতে পারে কল্পনা করিতে গিয়া কৌতুকানুভূতির পরিবর্তে তাহার গলার মধ্যে খুস্ খুস্ করিয়া উঠিল।

দিন যায় আর হেরম্বের মনে হয় রাধা নিজে যেন ধাঁধাঁ নয়, একটা অদ্ভুত রহস্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতেছে। বায়ুর মতই হয়ত তাহা স্বচ্ছ, কিন্তু ধূলাবালিতে এমনি আবিল হইয়া উঠিয়াছে যে রাধাকে ঝাপ্সা মনে হয়।

জীবনে একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়াই তাহার যতটুকু অভিনবত্ব, নহিলে রূপের হিসাব ছাড়া প্রভার সঙ্গে তাহার পার্থক্য সম্ভবতঃ এতখানি নয়।

বিকালের দিকে প্রভা রাধার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। কেমন ভয়ে ভয়ে কথা

কইল, খালি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তোমার বৌকে দেখে ওর লজ্জা পাবার কি আছে?

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, বোধ হয় কৌতুক। ওকে দেখে আমার বৌয়ের লজ্জা পাওয়া উচিত।

প্রভা ম্লান মুখে বলিল, পাড়ায় যে সব কথা উঠছে কানে গিয়েছে বোধ হয়।

হেরম্ব হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, পাড়ার অজুহাত না দিয়ে যেদিন মনের কথাটা স্পষ্ট করে' বলবে সেদিন এ বিষয়ে আলোচনা করব প্রভা।

কিন্তু তুমি হতাশ হ'য়ো না। একদিক দিয়ে ভগবান 'যে তোমায় বঞ্চিত করেছেন সেইটাই বোধ হয় আর একদিক দিয়ে এবার তোমার কাজে লাগবে।

জামা পরাই ছিল, প্রভার বিস্ময়কে উপেক্ষা করিয়া হেরম্ব বাহির হইয়া গেল। চশমাটা সে বদলাইয়াছে এবং এখন সকাল নয়, অপরাহ্ণ। তথাপি তাহার চোখে পড়ন্ত সূর্যালোক বড় অস্বাভাবিক ঠেকিল। এতকাল অলস বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে যেন দেখিতে জানিত না, আজ দেখিতে শিখিয়াছে।

রাধা বলিল, আপনাকে আজ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। পাড়ায় নাকি কি সব কথা উঠেছে শুনলাম। আপনি কি মনে করেন আমার আসা যাওয়া কমিয়ে দেওয়া উচিত?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাধা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল, ঠিক বুঝতে পারছি না। এ আমার কঠিন সমস্যা বিনামূল্যে সুনাম বিলিয়ে দিলে আপনার যে সবটাই ক্ষতি দাঁড়াবে।

আর আপনার?

রাধা করুণভাবে হাসিল, আমার আবার লাভ ক্ষতি! সে হিসাব চুকিয়ে ফেলেছি। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলে যাব কেউ তা জানে না, কলঙ্ক কিনতে আমার ভয় কি? একটু ভাবিয়া নতমুখে বলিল, কলঙ্ক রটলে বরং আমার সাহায্যই হবে। আমি জোর পাব।

কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাইল, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল বিন্দুমাত্র বেমানান্ নয়। রাধা কবিত্ব করিতে বসে নাই, যে রহস্য নিয়ে সে জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তাহাকে অর্থহীন ইঙ্গিতের সাহায্যে ঘনীভূত করিবার ইচ্ছাও রাখে না। বলিবামাত্র বুঝিতে পারার মত বক্তব্য তাহার নয়।

রাধা আবার বলিল, আপনি আমায় এমন দ্বিধায় ফেলছেন! দশ বছর ধরে

মনমরা হয়ে থেকে সেদিন যখন সকাল বেলা আপনার বাড়ীর সামনে নামলাম, মনে হল এতদিনে আমারও বুঝি কপাল ফিরল। কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন কথাই শোনালেন যে প্রদোষের আধ' অন্ধকার আমি আর অতিক্রম করতে পারলাম না। আচ্ছা,—কম্পিত আঙ্গুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে বলিল, আচ্ছা আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন ?

সাত বছর।

সাত বছর! শিশু যে এল না সে অপরাধ তবে কার? লজ্জা করবেন না, বলুন। এ না জানলে আমার চল্‌বে না।

সেটা এখনও নির্ণীত হয়নি।

নির্ণীত হয়নি! রাধা স্তব্ধ হইয়া গেল।

হেরম্বের চোখে পলক নাই, শিরার রক্ত চলাচলের মাঝখানে একবার একটা উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল আবার তাহা শান্ত হইয়া গিয়াছে। কথা হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া, উঠানের একপাশে দৈত্য হাঁসের পালক ছাড়াইতেছিল,—বৃদ্ধের জন্য মাংসের জুস্ হইবে। দেখিতে দেখিতে হাঁসটা কদর্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। হেরম্বের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

প্রাণিহত্যা দেখলে কষ্ট হয়, না ?

হেরম্ব উদাসভাবে বলিল, না।

আশ্চর্য! আমারও হয় না। তবে হয়ত আমার যে জন্য কষ্ট হয়—

আমারও সেজন্য কষ্ট হওয়া উচিত ? হেরম্ব মৃদু হাসিল, তা হয়। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেই আমার সীমা, এ চিন্তা সুখদায়ক নয়।

ইহার পর দু'জনে বহুক্ষণ কথা বলিল না। আকাশে বিকাল হইয়াছে, প্রভা যে বৈকালিক জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে বারংবার সে কথা হেরম্বের মনে পড়িতে লাগিল। এবং তাহাতে বিস্ময়ের তাহার সীমা রহিল না। ক্ষুধার সাড়া নাই, প্রভার খাবারের কথা এত করিয়া মনে পড়ে কেন ? বিশেষ করিয়া আজিকার এই অপরাহ্ণে, এই রহস্যময়ীর সান্নিধ্যে চিন্তার জটিল পাক খাওয়ায় ?

মাংস কাটিয়া দৈত্য উঠিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ হেরম্ব সচেতন হইয়া উঠিল, কড়া তামাকের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

রাধা চকিতভাবে বলিল, তামাকের গন্ধ পাচ্ছেন ?

পাচ্ছি। দৈত্য খাচ্ছে বোধ হয়।

রাধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, তা কি ও খাবে! বাড়ীতে তামাক টানিতে ওকে আমি নিষেধ করে' দিয়েছি।

দৈত্য যে তামাক খাইতেছে না প্রমাণ পাইতে দেরী হইল না। উভয়ের চোখের সামনে উঠান পার হইয়া সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। রাধা ত্বরিদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হেরম্ব বলিল, যান কেড়ে নিন গিয়ে। আজ সারাদিন যদি কেশে থাকেন এ তামাকের ধোঁয়া ফুসফুসে গেলে বাঁচবেন না।

রাধা বিবর্ণমুখে বলিল, ক'মাস আগে মরবার ভয়ে ও দিশেহারা হ'য়ে যেত, এখন এমনভাবে তামাক খেতে আরম্ভ করেছে কেন হেরম্ব বাবু? এতো নেশা নয়!

না, নেশা নয়। বোধ হয় রোগযন্ত্রণায়—

রোগযন্ত্রণা? কি জানি কিসের যন্ত্রণা। আমার গা কাঁপছে হেরম্ব বাবু। রাধার মুখ অস্বাভাবিক সাদা হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সে যেন ভয়ঙ্কর ভয় পাইয়াছে। হতাশ কণ্ঠে বলিল, ও টের পেয়েছে। নিজে মরে' আমায় তাই মেরে রেখে যেতে চায়।

রাধা অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িবার শক্তি যেন তাহার লোপ পাইয়াছে। প্রথম দিনের কথা হেরম্বের মনে পড়িল, এমনি বিহ্বলভাবে অন্ধকে। বাঁচাইয়া রাখিতে রাধা তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। অধরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, আসুন, পরে শুনব।

ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল তামাকে টান দিবার সুযোগ তখনো অধর পায় নাই, হুঁকা হাতে উঠিয়া বসিবার পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল।

হুঁকা কাড়িয়া নিতে চোখের রক্তবর্ণ গহ্বর দুটি উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, দুটো টান দিতে দাও রাধা। অনেক কষ্টে ধরিয়েছি। দাও, দাও বলছি আমায় হুঁকো কল্কি!

অমন প্রচণ্ড শব্দ করিয়া কাশিলেও অধর কথা কয় ফিস্ ফিস্ করিয়া। হেরম্বের মনে হইল কথাকে বঞ্চিত করিয়া সে যেন কাশির জন্য শব্দ সঞ্চয় করে।

রাধা বলিল, তুমি মরতে চাও কেন?

চোখের গহ্বর আরও বেশী উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, আমি বাঁচতে চাইব কেন?

এ প্রশ্নের জবাব নাই, বিছানার পাশে বসিয়া রাধা চুপ করিয়া রহিল। কয়েক

মুহূর্ত কান পাতিয়া থাকিয়া অধর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, ঘরে কে·নিশ্বাস ফেলছে? কে এসেছে আমার ঘরে? সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টার সঙ্গে আন্দাজে হেরম্বের দিকে তর্জনী উদ্যত করিয়া সে যেন অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, কে ও? চোরের মত আমার ঘরে কে এল?

রাধার ঠোঁট কাঁপিল কিন্তু কথা বাহির হইল না। হেরম্ব নিজের পরিচয় দিতে যাইতেছিল, ইঙ্গিতে রাধা বারণ করিল।

অধরের মাথা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বিছানার চাদরটা দুই হাতের শীর্ণ আঙ্গুলে মুঠা করিয়া ধরিয়া ভীতস্বরে অধর বলিল, ও যেই হোক, ওকে অত জোরে নিশ্বাস নিতে বারণ কর রাধা। না হয় তুমি কথা কও।

রাধা মৃদুস্বরে বলিল, উনি আমাদের প্রতিবেশী। তোমায় দেখতে এসেছেন।

অধর যেন এই সংক্ষিপ্ত জবাবটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। একমুহূর্তে তাহার সকল উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। নির্জীবের মত বালিশে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, আমার ঘরে ওকে কেন আনলে রাধা? এতো ওর প্রতিবেশীর ঘর নয়। এ ঘরে কথা নেই, হাসি নেই, চোখে চোখে চাওয়া নেই, শুধু আছে অন্ধকার। এ ঘরে উনি হাঁপিয়ে উঠবেন।

পরস্পরের চোখে চাহিয়া দু'জনে অন্ধের কথা শুনিতেছিল, রাধা চোখ নামাইয়া নিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, উনি বুড়ো মানুষ, এ সব অসুখের বিষয়ে অনেক বোঝেন শোনেন, তাই এসেছেন। উনি এলে আমি অনেক ভরসা পাই।

অধর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অকাল-বৃদ্ধের অসুখ বুড়ো মানুষেরা বোঝে না রাধা। তাদের অভিজ্ঞতা নেই।

এই বলিয়া অভ্যস্ত ভাবে প্রথমে দুই হাতে বুক চাপিয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস নিবার চেষ্টায় হাঁপাইয়া উঠিয়া সে কাশিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেকটি কাশির সঙ্গে সমস্ত চৌকী এমন ভাবে নড়িতে লাগিল যে হেরম্ব বুঝিতে পারিল না রাধার সর্বাঙ্গ ঠিক কি কারণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

হুঁকাটা রাধা হেরম্বের হাতে দিয়াছিল। কলিকার আগুন নিবিয়া যায় নাই, পাক খাইয়া খাইয়া তাহা হইতে ধোঁয়া উর্ধ্বে উঠিতেছিল। হেরম্ব অকস্মাৎ খোলা দরজা দিয়া হুঁকা কল্কি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য কাশি স্থগিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু একেবারে

কমিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল অধরের সঞ্চিত শব্দ তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কাশিতেছে হিক্কা ওঠার মত। কাশির বিরামের অবসরে মাথা উঁচু করিবার চেষ্টায় চোখের গর্ত জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। প্রথম হইতে রাধার একটি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, এখনো ছাড়ে নাই। যে দুর্নিবার স্রোত আজ তাহাকে মরণের পরপারে ভাসাইয়া নিয়া যাইতে চায়, নোঙরের মত রাধা যেন তাহাকে ব্যর্থ করিবে।

দেয়ালে ঠেস দিয়া রাধা মড়ার মত চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে।

দৈত্যের মুখখানা দেখিবার জিনিস। অত বড় বিপুল দেহে অমন অসীম শক্তি নিয়া সে যে শিশুর মত ভীত অসহায় দৃষ্টিকে চারিদিকে সঞ্চালন করিতেছে অন্ধের যন্ত্রণার চেয়ে তাহা যেন সকরুণ। ওর অল্প পরিমাণ মস্তিষ্কে কি ক্রিয়া চলিতেছে কে জানে? হঠাৎ রাধা বলিল, হেরম্ব বাবু, ওকে বাঁচান। বেশী নয় আর কয়েকটা মাস—শুধু আর কটা মাস ওকে বাঁচিয়ে রাখুন।

ডাক্তার উপস্থিত থাকিতে তাহাকে এই মিনতি জানানোর মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর একটা ইঙ্গিত ছিল যে হেরম্ব কোন আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলিলেন, ভয় পাবেন না। উনি বাঁচবেন বৈ কি নিশ্চয় বাঁচবেন।

আশ্চর্য আশ্বাস. বিস্ময়কর মিথ্যা!

ডাক্তারের মুখের কথা শেষ হইবার এক মিনিট পরেই ভয়ঙ্কর একটা কাশির ধমকে একেবারে আধবসা অবস্থায় উঠিয়া অন্ধের মৃত দেহটা আবার শুইয়া পড়িল।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই ডাক্তার নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

সকলে নীরব। প্রত্যেকের নিশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যায়। অকস্মাৎ এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দৈত্য হাউ হাউ করিয়া উঠিল। ঠিক যে কান্না তাহা নয়, এক প্রকার দুর্বোধ্য ভয়ের শব্দ, আতঙ্ক-ভরা আর্তি।

পাড়ার কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন, হেরম্ব একজনকে নিম্নস্বরে বলিল, ও লোকটি মুসলমান, ঘর থেকে বের করে দিন।

বাহিরে যাওয়ার আদেশটা দৈত্য প্রথমে বুঝিতে পারিল না, বোঝা মাত্র তীর-বেগে বাহির হইয়া গেল।

প্রভা দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরে আসিয়া রাধার পাশে বসিয়া

পড়িল। হেরম্বের বিধবা পিসীমাও আসিয়াছিলেন, রাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাক বাছা, একজনের ছুঁয়ে থাকতে হয়।

কাশির শেষ ধাক্কায় রাধার কব্জি হইতে অধরের মুষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। তাহার পায়ে হাত রাখিয়া চোখ তুলিয়া পিসীমার বিধবা বেশ দেখিয়া রাধা যেন অবাক হইয়া গেল।

আমি তো কিছুই জানি না, এখনি কি সিঁদুর শাঁখা খুলে ফেলতে হবে?

তাহার এই কথার কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলের সময় লাগিল। হেরম্ব বলিল, এখন নয়, ফেরার সময়, শ্মশানে।

শ্মশান কোথায় হেরম্ব বাবু? সহরের বাইরে? লোকালয় ছাড়িয়ে?

দু'জনের মধ্যে শুধু মৃতদেহের ব্যবধান। সামনে ঝুঁকিয়া সকলের অশ্রাব্য স্বরে রাধা আবার বলিল, এবার থেকে শ্মশানে বাস করব—জীবনের শেষ সীমায়। মানুষের মধ্যে বাস করার অধিকার আমার ঘুচ্‌ল।

রাধার দাদা আসিয়াছিলেন, হেরম্বের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতায় তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাইনা হেরম্ববাবু দু'দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছি, ফিরে দেখি রোগা স্বামীকে নিয়ে রাধা কোথায় যে গেছে কেউ বলতে পারে না। আপনার তার পাওয়া পর্যন্ত কি দুর্ভাবনাতেই যে দিন যাচ্ছিল।

হেরম্ব বলিল, আপনার খবর দেওয়ার মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আপনার বোন তার করতে বলেছিলেন।

অ! বলিয়া দাদার কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস জুড়াইয়া গেল।

বিকালেই বিদায়ের আয়োজন। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া গলির মুখে দাঁড়াইল। রাধার দাদা গাড়ীতে জিনিস তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

রাধা বলিল, এ বেশে ফিরতে হ'বে জানতাম, এ ভাবে ফিরব জানা ছিল না।

হেরম্ব নীরব হইয়া রহিল।

রাবণের অবস্থা হ'ল আমার। দ্বিধা করে' করে' স্বর্গের সিঁড়ি আর তৈরী হল না। আজ থেকে দশমাস সময় এখনো মানুষ আমায় দিয়েছে, মানুষ খুব বিবেচক, নয়?

এ আলোচনা হেরম্বের আজ সহ্য হইতেছিল না। প্রসঙ্গান্তরের প্রত্যাশায় জিজ্ঞাসা করিল, দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

ওকে বিদায় করে' দিয়েছি।

কেন ?

সন্দেহে। ওর বুদ্ধি খুবই কম, কিন্তু কেশে কেশে যে মরতে বসেছে চাইলেই তাকে তামাক দিতে নেই, এটুকু কি আর ও বোঝেনি ? প্রথমটা মনে করেছিলাম বোকামী, শেষে সন্দেহ হ'ল শয়তানী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

শয়তানী ! হেরম্ব চাহিয়া দেখিল উঠানে হুঁকোকলিকাটা এখনও পড়িয়া আছে।

গ্রন্থ পরিচয়

দর্পণ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫২। জুন ১৯৪৫। প্রকাশক বুক এম্পোরিয়াম। প্রকাশকের নামপত্রে গ্রন্থপ্রকাশের তারিখ নেই। 'লেখকের কথা' নামক ভূমিকার তারিখ থেকে প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্দেশিত হ'ল। 'লেখকের কথা' থেকে জানা যায় যে, গ্রন্থরূপে প্রকাশের প্রায় তিন বছর আগে উপন্যাসটির কিছু অংশ অন্য নামে পাটনার একটি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত পত্রিকাটি অধুনালুপ্ত 'প্রভাতী'।

প্রথম সংস্করণের শেষে লেখা ছিল: সমাপ্ত (প্রথম ভাগ)। কিন্তু বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় মুদ্রণে (ভাদ্র ১৩৫৮) এ-জাতীয় কোন উল্লেখ না-থাকায় অনুমান হয় যে, উপন্যাসটির পরবর্তী কোন খণ্ড রচনার প্রাথমিক পরিকল্পনা লেখক কর্তৃক পরে পরিত্যক্ত হয়।

সহরবাসের ইতিকথা

লেখকের ত্রয়োদশ সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ: শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ আশ্বিন ১৩৪৯। ৯ অক্টোবর ১৯৪২।

গ্রন্থরূপে প্রথম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৫২। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী।

সংশোধিত, পরিবর্ধিত এবং লেখকের ভূমিকা সংযোজিত দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬০। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধন ও পরিবর্ধনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লেখক নিজেই তাঁর ভূমিকায় বলেছেন। ভূমিকার শেষাংশে লেখকের মন্তব্য, " 'সহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সবচেয়ে বড় ভূমিকা জুটল", আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'প্রতিবিম্ব' (দ্র. গ্রন্থাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড) উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা আলোচ্য ভূমিকার চেয়েও দীর্ঘতর, এবং লেখকের দীর্ঘতম ভূমিকা।

[illegible]গ্রন্থাবলী।

ভেজাল

লেখকের সপ্তম গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৩৫১। ১৯৪৪। প্রকাশক [illegible] প্রেস। 'প্রকাশকের কথা' নামক ভূমিকা ও প্রতিটি গল্পের শিরোনামচিত্র সম্বলিত। দ্বিতীয় কোন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ভয়ঙ্কর'-এর একাঙ্ক নাট্যরূপ লেখকের পরবর্তীকালের গল্পগ্রন্থ 'মাটির মাশুল'-এ (১৩৫৫) একই নামে সংকলিত হয়।

হলুদপোড়া

অষ্টম গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২। ১৯৪৫। প্রকাশক কমলা পাবলিশিং হাউস। দ্বিতীয় কোন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। তবে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত [illegible] 'মানিক-গ্রন্থাবলী'র প্রথম ভাগে (১৩৫৭। জুলাই অগাস্ট [illegible]লিত হয়।

[illegible] 'চুরি চুরি খেলা' গল্পের শেষে লেখকের তারকাচিহ্নিত টীকা: "হাত নকল করার সময় লেখা"। [illegible] 'হলুদপোড়া'র ইংরেজী অনুবাদ Burnt Turmeric নামে [illegible]প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক নির্বাচিত ও সম্পাদিত Primeval And Other Stories (1958) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত।